সমকালীন

চোখের দেখার উপরে
ক্রেতাদের পছন্দ নির্ভর করে
আপনার
জিনিস তাড়াতাড়ি
বিক্রি করার পরিকল্পনা
করছেন? জিনিসটিকে চোখে
পড়ার মত করে তুলুন —রোটাস
প্যাকেজিং কাগজে মুড়ে জিনিসগুলিকে
আরো আকর্ষণীয়, গ্রহণীয় এবং একান্ত
বৈশিষ্টময় করে তুলুন। ভাল মোড়ক, কাগজের
বাক্স ও কার্টনের জন্য প্রস্তুতকারকগণ সব-
সময়েই রোটাস প্যাকেজিং কাগজ ও বোর্ড
পছন্দ করেন কেননা এগুলি উৎকৃষ্ট। উজ্জ্বলরং,
ব্র্যাণ্ড নাম ও বিক্রির বিষয়বস্তু এদের উপরে
ছাপা হলে চোখে পড়বেই।
রোটাস প্যাকেজিং কাগজ বহুদিন টেঁকে,
চমৎকার দেখতে এবং আপনার জিনিসকে
ধুলো ময়লা ও আর্দ্রতার হাত থেকে রক্ষা করে।
এতে আপনার জিনিসের সদ্য তৈরী ঝক্‌ঝকে
চেহারা বজায় থাকে।
ROHTAS
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড
ডালমিয়া নগর (বিহার)
ম্যানেজিং এজেন্টস: সাহু জৈন লিমিটেড ১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা-১
IPC-RI. 302. BEN

Orient
ENGINEERED
TO OUTLAST
MANY MANY SUMMERS
Orient
CEILING FAN
GUARANTEED FOR TWO YEARS
ORIENT GENERAL INDUSTRIES LTD.
CALCUTTA-54
ASP/OGI-2/6

একমাত্র
লক্ষ্মীবিলাসে
নিয়মিত
ব্যবহারেই তা
সম্ভব।
সতর্কীকরণ
নকলের হাত থেকে বাচবার জন্য
কিনিবার সময় ট্রেডমার্ক শ্রীরামচন্দ্র
মূর্ত্তি, পিলফার প্রুফ ক্যাপের উপর
RCM মনোগ্রাম ও প্রস্তুতকারক
এম.এল.বসু এণ্ড কোং দেখিয়া
লইবেন।
এখন থেকে ৩ রকম
সাইজে পাওয়া
যাচ্ছে

আপনার যদি থাকে
র‍্যালে সাইকেল—
গর্বে মাটিতে পা পড়বে না

হ্যাঁ, সাইকেল হ'ল র‍্যালে! যেমনি চলন, তেমনি গড়ন। চড়ে গেলে লোকে তাকিয়ে দেখে। হবে না' দুনিয়ার সবচেয়ে নামী সাইকেল। র‍্যালের কদরই আলাদা। যার র‍্যালে থাকে, তার খাতির বেশী হয়। র‍্যালে যদি আপনার বাহন হয়, গর্বে আপনারও মাটিতে পা পড়বে না।

SRC-80 BE

গরমে চলুন
হালকা পায়ে
পা গলিয়ে খানিক এদিক-ওদিক চলুন, নিমেষেই
বুঝবেন বাটার স্যান্ডাল আর চপ্পল এদের বৈশিষ্ট্য কী।
কী আরাম এদের পায়ে দিয়ে! কী মসৃণ চামড়া!
এমন হাওয়া-খেলানো নকশা, নির্মাণশৈলী আর
মৌসুমী নকশার সমাবেশ দুর্লভ বলা যেতে পারে।
স্টাইলের বহুমুখী বৈচিত্র্য এদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য।
আজই এসে দেখে যান বাটার দোকানে স্যান্ডাল ও
চপ্পলের নতুন মনোজ্ঞ ফ্যাশান।
শ্যামল ৭.৯৫
Bata
অলোক ৯.৯৫
প্রীতীশ ৭.৯৫
এয়ারকুল ১৬.৯৫
এয়ারলাইট ১৮.৯৫

পঞ্চদশ বর্ষ ১ম সংখ্যা বৈশাখ তেরশ' চুয়াত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনস্টাইন, বন্ধুত্ব-ইতিহাস

অশ্রুকুমার সিকদার

রোটেনস্টাইনের ভারতদর্শন

প্রথম যেদিন দেগার ষ্টুডিয়োতে রোটেনষ্টাইন ছাঁচে ঢালাই করা অপ্সরা মূর্তি দেখেন সেদিন থেকে ভারতশিল্পের অনাবিষ্কৃত জগৎ তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে, এই কথা জানিয়েছেন Robert Speaight তাঁর William Rothenstein : The Portrait of an Artist in his time নামক জীবনীগ্রন্থে। আনন্দ কুমারস্বামী ও হ্যাভেলের সাহচর্যে সেই উৎসাহ ক্রমেই বাড়ে। অজন্তাগুহার দেওয়ালচিত্রাবলীর কপিপ্রস্তুতের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য ভারতশিল্পানুরাগিণী শ্রীমতী হেরিংহ্যাম দ্বিতীয়বার ভারতভ্রমণের উদ্যোগ করলে রোটেনষ্টাইন তাঁর সঙ্গী হতে স্বীকৃত হন। এ ব্যাপারেও তাঁর উৎসাহদাতা ছিলেন কুমারস্বামী ও হ্যাভেল। বারাণসীর আলোকচিত্র দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন; সেই মুগ্ধতা যে ভারতভ্রমণে তাঁর আগ্রহের অন্যতম কারণ এ কথা তিনি নিজেই আত্মচরিতের দ্বিতীয় খণ্ডে (Men and Memories Vol. II) বলেছেন। ভারতের প্রতি তাঁর সহানুভূতিশীল মনোভাবের পরিচয় পেয়ে বিলাতস্থ শাসকগোষ্ঠী অবশ্য তাঁর যাত্রায় সাহায্য করতে উৎসাহ বোধ করেন নি।

ভারতে পৌঁছে তিনি এলিফান্টা গুহা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এলিফান্টার গুহাভাস্কর্য দেখে তাঁর মনে হয়েছিল, তিনি আত্মচরিতে লিখেছেন—

How much sculpture loses when detached from its original setting and placed in a museum.

এবং স্তম্ভিতবিস্ময়ে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন,

Here in Elephanta the powerful figures, menacing or lost in meditation, suggest the terror and the peace, the destractive and the creative aspects of nature—the agony of birth, the peace of sleep and of death.

তিনি খাজুরাহোর মহিমা দেখেছিলেন এবং যে চিতোরের কথা তিনি কর্ণেল টডের রাজস্থান—উপাখ্যানে পড়েছিলেন সেই চিতোর এবং অম্বর জয়পুর পরিদর্শনের পরে তিনি বারাণসী গিয়েছিলেন। বারাণসী প্রথম দর্শনেই তাঁকে অভিভূত করেছিল। বারাণসীর ঘাটগুলিতে দিনের বেলায় স্নানের মাদক দৃশ্য এবং সন্ধ্যারাত্রিতে তার শান্তসৌন্দর্য তিনি দিনের পর দিন আকণ্ঠ পান করেছেন। আত্মচরিতে তিনি লিখেছেন,

Each evening I was exalted by the peace and beauty of the scene. Over the water came the sound of women's voices, chanting hymns, as the boats glide down the swift flowing river.

বারাণসীর দৃশ্য রোটেনষ্টাইনকে কী ভাবে মুগ্ধ করেছিল তার প্রমাণ, ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথের বিলাতভ্রমণকালে রোটেনষ্টাইন হাউজ অব কমনসে কয়েকটি বৃহৎ আকারের ভারতদৃশ্য আঁকার নিমন্ত্রণ পেলে বারাণসীঘাটের একটি দৃশ্য অঙ্কন মনস্থ করেন এবং দৃশ্যের প্রধান দণ্ডায়মান পুরুষমূর্তি অঙ্কনের জন্য তিনি রবীন্দ্র-সহচর কালীমোহন ঘোষ মহাশয়কে নির্বাচন করেন (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের On the Edges of Time দ্রষ্টব্য)।(১) রোটেনষ্টাইন নিজেই লিখেছেন যদি আরো কিছুদিন তিনি বারাণসী থাকতেন এবং কলকাতা দার্জিলিং পুরী ভ্রমণের বাসনা পরিত্যাগ করতেন তাহলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর কোনদিন হয়তো সাক্ষাৎ হতো না। রবীন্দ্রনাথের কাছে রোটেন-ষ্টাইন কী ছিলেন সে কথা Michael Field তাঁর Works and Days গ্রন্থে তিনি অল্পকথায় বলেছেন,

Rothenstein had been England to Tagore—welcome, fame, introduction to friendships, with their ideas, aims, the zeal of the West, its active discussions, its practical publication.

সেই রোটেনষ্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যদি ঘটনাচক্রে দেখা না হত তাহলে রবীন্দ্রজীবনের উপর তার প্রভাব কত সুদূরপ্রসারী হত তা আজ অনুমান করাও কঠিন।

সাক্ষাৎ, রোটেনষ্টাইন-কৃত রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি

Men and Memories-এর দ্বিতীয় খণ্ডে রোটেনষ্টাইন লিখেছেন আনন্দ কুমারস্বামী প্রথম তাঁকে অবনীন্দ্রনাথের ও কলকাতার অন্যান্য শিল্পীদের ছবি দেখান। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে অসাক্ষাতে এই প্রথম যোগাযোগ। কলকাতায় এলে অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ (২) তাঁকে নানা সুন্দর সামগ্রী পূর্ণ জোড়াসাঁকোর বাড়িতে নিয়ে আসেন। সেখানে তিনি প্রথম রবীন্দ্রনাথকে দেখেন এবং প্রায় যেচে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন। অবনীন্দ্রনাথের এই খুল্লতাত যে তৎকালের একজন সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি তার আভাস অথচ কেউ তাঁকে দেয় নি। ঠাকুর পরিবারের সংগে

ঘনিষ্ঠ ভারতবিশারদ সার জন উডরফ্ও যে রবীন্দ্রনাথের কথা বলেন নি এই কথা ভেবে রোটেন-ষ্টাইন বিস্মিত হয়েছিলেন।

I was attracted, each time I went to Jorasanko, by their uncle, a strikingly handsome figure, dressed in a white dhoti and chadur, who sat silently listening as we talked. I felt an immediate attraction, and asked wheather I might draw him, for I discerned an inner charm as well as great physical beauty, which I tried to set down with my pencil.

সুতরাং প্রথম সাক্ষাতের ফল রোটেনষ্টাইন-অঙ্কিত রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি। তারপর রবীন্দ্রনাথ যখন ১৯১২ সালে বিলাত গেলেন তখন সেই গ্রীষ্মে রোটেনষ্টাইন তাঁর আরো কয়েকটি প্রতিকৃতি অঙ্কন করেন; রোটেনষ্টাইনের জীবনীকার Robert Speaight যেগুলিকে বলেছেন, 'Six magnificent portrait drawings of Tagore' সেগুলি পরে (১৯১৫) ম্যাকমিলান কোম্পানী প্রকাশ করে।

কালক্রম বিসর্জন দিয়ে এই 'dulcet' বা মধুর প্রতিকৃতিগুলি ও প্রসঙ্গত শিল্পী ও শিল্পীর বন্ধু সম্বন্ধে রোটেনষ্টাইনের জীবনীকার যে মন্তব্য করেছেন তা উদ্ধার করি।

The 'dulcet' harmony of line and shading echoed, unquestionably, an inner and spiritual sweetness; and it reflects also a tranquillity in william himself which was among the most precious legacies of the Indian journey, and which the visit of his friend had reinforced. William's conception of friendship was almost oriental in its serious intensity and Tagore was among the few who shared it.

ছয়টির মধ্যে চারটি বসা অবস্থায় আঁকা, একটি দণ্ডায়মান অবস্থায় পাশমুখ আঁকা এবং এইটিতে কবির মাথায় রামমোহনের ধরণে পাগড়ি বাঁধা, আর একটী ছবিতে মাত্র মুখমণ্ডল। কোনটিতে কবি বই-পড়া অবস্থায়, কোনটিতে কোলে হাত জড়ো করা, কোনটিতে চোখ বোঁজা, একটি ছবিতে কবি মাটিতে উপবিষ্ট। এই চিত্রাবলীর কোনকোনটিতে Robert Speaight 'a slight weakness and hint of vanity' দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু জাতীয় গ্রন্থাগারের রক্ষিত Six Portraits of Rabindranth Tagore-এর পৃষ্ঠা কয়টি অনেকবার উল্টেও বর্তমান লেখকের কাছে এই 'weakness' বা 'hint of vanity' পরিদৃশ্যমান হয় নি। তবে রোটেনস্টাইনের এই জীবনী লেখক এতই ছিদ্রান্বেষী ও নিন্দুকস্বভাব যে তিনি সর্বত্র নানা চারিত্রিক দুর্বলতা আবিষ্কার করেন এবং ফলে সব সময় তথ্যগত নির্ভুলতার দিকে দৃষ্টি দিতে পারেন না। (৩) যাই হোক এই ছয়টি রেখা প্রতিকৃতি সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যের আরো কিছুটা উদ্ধৃত করছি।

These drawings, in which a certain formality of treatment is tempered by a deeply affectionate familiarity with the sitter, are enough in themselves to attest the power of William's draughtsmanships......Each portrait left the

same impression, summed up by Andre Gide when he wrote to Willlam : 'J'y retrouve cette mysterieuse fuite de regard, qui toujours elude le votre, regarde ailleurs et ne se laisse rejoindre qu'en Dieu'. (অর্থাৎ আমি এতে সেই রহস্যময় দৃষ্টি দেখলাম, যা সব সময়ে সাধারণভাবে দেখাকে এড়িয়ে আরও কিছু দেখে এবং ঈশ্বরানুভূতি না ঘটিয়ে ছাড়ে না।)

এই-রেখাপ্রকৃতির সংগ্রহটি রোটেনস্টাইন "To Dr. Brajendranath Seal and Bhai Promctto Lall Sen these six drawings of their friend are affectionately dedicated", এবং রোটেনস্টাইনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ম্যাকস্ বীয়ারবম তার ভূমিকা লেখেন। ভূমিকার প্রধান অংশ এই—

For more than twenty years he has been drawing his friends ; and during that period few of the eminent in thought or in art or in scholarship have not moved into the circle of his friendship. The eminent are drawn to him as well as by him ; for he has not merely an eye to see them and a hand to limn them he has a brain to understand them. Nay more, he helps them to understand themselves and to be understood by us others...Four or five years ago he visited Asia and met there a modest sage whom he liked very much. Soon after his return to England he learned that the sage was a poet also, and wrote to him begging that he would send over some translation. Mr. Rabindranath Tagore complied and—well, there it was, and here Sir Rabindranath is. And here in this book is the essence of him, for you and me,...From certain photographs I gathered that he was one of those men who rather resemble their souls and their work. That coincidence is not usual. Most men are not at all lire themselves. The test of fine portraiture is in its power to reconcile the appearance with the reality—to show through the sitter's surface what he or she indeed is. I take it that Tagore was for Rothendstein a comparatively simple them.(৪) The surface here was rather a guide than an obstruction.

চিত্রপরিচয় প্রসঙ্গে বীয়ারবম এখানে রবীন্দ্রনাথের উচ্চতম প্রশংসা করেছেন—অন্তরে-বাহিরে কোনো ব্যবধান নেই, কোনো মানুষ সম্বন্ধে এর চেয়ে বড় কথা কী হতে পারে ?

এই চিত্রসংগ্রহ উপহার পেয়ে রবীন্দ্রনাথ চিত্রীবন্ধুকে ৩১ ডিসেম্বর ১৯১৫-য় লিখলেন,

Your book containing six portraits of mine has delighted my heart. Your love is there in those sketches, and that is what makes them so valuable to me. It is a lasting memorial to our friendship. Max Beerbohm's introduction is perfectly charming, and while reading it I was struck with the fact that you had

been discovered long before I met you by your friends. I have been entertaining in my heart a secret pride for having truly known you, but I am ready to give up that pride and shall be content to share my love for you with your other friends.

ইংরাজীতে রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশ

অজিতকুমার চক্রবর্তী ডক্টর পি, কে, রায়ের সুপারিশের জোরে মানচেস্টার বৃত্তি লাভ করে ১৯১০ সালে বিলাতযাত্রা করেন। ১৯১১ সালের প্রথমেই তিনি আবার ফিরে এলেন, সুতরাং তিনি মাত্র কয়েক মাস অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মানচেস্টার কলেজের ছাত্র ছিলেন। তৎকালে তাঁর অন্যতম সহপাঠী লিখেছেন (Poets in the Flesh গ্রন্থলেখক R. F. Rattray)

I got to know Rabindranath Tagore before he was known in this country or in America. In the academic year 1910-11 I was senior student of Manchester College, Oxford, and there was an Indian student in the College, Ajit Kumar Chskravarti. He was not very well and I had to look after him. He talked a great deal about a wonderful man we had never heard of called Rabindranath Tagore. He made translations of some of Tagore's poems and asked me to read them and in this way it is possible that I was the first European to become acquainted with Tagore's poems in English. I am glad to say that I recognised high quality in the poetry and of course said so to chakrabarti.(৫)

যে বছর জানুয়ারিতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রোটেনস্টাইনের প্রথম সাক্ষাৎ হয় সেই বছর অর্থাৎ ১৯১১-র ফেব্রুয়ারি মাসে শান্তিনিকেতনে বসে আনন্দ কুমারস্বামী অজিতকুমার চক্রবর্তীর সহায়তায় রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের 'জন্মকথা' ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। সেই অনুবাদ ঐ বৎসরের মার্চ সংখ্যা মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এপ্রিল সংখ্যায় কুমারস্বামীর সহযোগিতায় 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের 'বিদায়' কবিতার রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ প্রকাশিত হয়। আনন্দ কুমারস্বামীরও আগে আচার্য জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে স্বীয় রচনার বিশেষত গল্পের ইংরেজি অনুবাদ করতে উৎসাহিত করেন (চিঠিপত্র ৬-এ সংকলিত তথ্যপঞ্জী দ্রষ্টব্য)। জগদীশচন্দ্রের ক্রমান্বয় তাড়নায় শেষে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ১৯০০ সালের ১২ই ডিসেম্বর লেখেন,—'আমার রচনালক্ষ্মীকে তুমি জগৎ-সমক্ষে বাহির করিতে উদ্যত হইয়াছ—কিন্তু তাহার বাঙ্গালা ভাষা—বস্ত্রখানি টানিয়া লইলে দ্রৌপদীর মত সভাসমক্ষে তাহার অপমান হইবে না? সাহিত্যের ঐ বড় মুসিকল—ভাষার অন্তঃপুরে আত্মীয় পরিজনের কাছে সে যে ভাবে প্রকাশমান, বাহিরে টানিয়া আনিতে গেলেই তাহার ভাবান্তর উপস্থিত হয়।' ১৯১১-র মার্চ মাসে দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের সঙ্গে বিলাতযাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও অসুস্থতার ফলে কবির সেই যাত্রা শেষ মুহূর্তে স্থগিত হয়। রথীন্দ্রনাথ লিখছেন,

Father could think of no better place for recouping his health and spirit than Shelidah—his favourite retreat of earlier years.

সুতরাং তিনি সেখানে চলে গেলেন এবং অসুস্থতাকালে গুরুতর কোনো মানসিক পরিশ্রম নিষিদ্ধ থাকায় তিনি অবসর বিনোদনের উপায় হিসাবে নিজের কবিতার তর্জমা আরম্ভ করলেন।(৬) রথীন্দ্রনাথের মতে (On the Edges of Time),

The immediate incentive, if I remember aright, came from encouraging remarks made by Ramsay Mac Donald, to whom, during his visit to Santiniketan a few months earlier, translations of a few stray writing that had appeared in the Modern Review were shown by Ajit Kumar Chakrabarti—then a teacher at Santiniketan.

কিন্তু রথীন্দ্রনাথের স্মৃতি এখানে বাস্তবিকই তাঁকে ছলনা করেছে, কারণ "১৯১১ সালে ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় কনগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাহাতে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের প্রথম শ্রমিক সদস্য র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের সভাপতি হইবার কথা ছিল; তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হেতু তিনি ভারতবর্ষে আসিতে পারেন নাই; পণ্ডিত বিষণনারায়ণ ধর সভাপতির কাজ করেন। এই সভায় কবির 'জনগণমন' সঙ্গীতটি প্রথম গীত হয় (রবীন্দ্রজীবনী ২)।" ইসলিংটন কমিশনের সদস্যরূপে ভারত ভ্রমণকালে যখন ম্যাকডোনাল্ড ১৯১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে শান্তিনিকেতনে আসেন ততদিনে ম্যাকডোনাল্ডের উৎসাহ-বাক্যের প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

রোটেনস্টাইনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের বৎসর কাল পরে ১৯১২ সালের জানুয়ারির মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশিত ভগিনী নিবেদিতা-কৃত 'কাবুলিওয়ালা'র তর্জমা পড়ে রোটেনস্টাইন মুগ্ধ হয়ে যান। এই প্রথম তিনি জানতে পারেন সেই ঋষিকল্প ব্যক্তিটি একজন প্রতিভাশালী সাহিত্যিক। রবীন্দ্রনাথের ঐ শ্রেণীর আরো গল্প আছে কিনা জানার জন্য তিনি অবনীন্দ্রনাথদের চিঠি দেন। সেই চিঠির উত্তর অজিতকুমার-কৃত রবীন্দ্রনাথের কবিতার তর্জমাপূর্ণ একটি খাতা রোটেনস্টাইনকে পাঠানো হয়। সেই খাতা পড়ে তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল এবং খাতা পড়ার বাস্তব ফল কী হয়েছিল তা রোটেনস্টাইন আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডে সবিস্তারে লিখেছেন—

The poems, of a highly mystical character, struck me as being still more remarkable than the story, though but rough translations. Meanwlile I met one of the kooch Behar family, Promotto Lall Sen, (নববিধান সমাজের নেতা) a saintly man, and a Brahmo of course. He brought to our house Dr. Brajendranath Seal, then on a visit to London, a philosopher with a briliant mind and a childlike character.(৭) They both wrote to Tagore, urging him to come to London; he would meet they said, at our house and elsewhere, men after his heart.

জগদীশচন্দ্রের পুনঃপুনঃ উৎসাহবাক্যে ও আনন্দকুমারস্বামীর তাড়নায়, অজিতকুমারের অনুবাদ পড়ে ইংরেজ সহপাঠীদের আগ্রহের বিবরণ শুনে যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল, ব্রজেন্দ্রনাথদের

চিঠিতে রোটেনস্টাইনের আগ্রহ ও মুগ্ধতার কথা শুনে তাতে বীজ বপন হলো। সুযোগ এলো অসুস্থতায়, শিলাইদহের নির্জন অবকাশে। ইংরেজি গীতাঞ্জলি সম্বন্ধে দীর্ঘকাল পরে ইয়েটস্ লিখেছিলেন এই কবিতাগুলি এসেছে নদীপ্রান্তর থেকে এবং নদীপ্রান্তরের অপরিবর্তনীয়তা এই কবিতাগুলিতে প্রতিফলিত। রথীন্দ্রনাথও স্মৃতিকথায় শিলাইদহের শর্ষে ক্ষেত ও বালুচরের পটভূমিতে এই অনুবাদ প্রসঙ্গে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন,

I have a feeling that the English translation reflects in some strange way the spirit of those days that he spent at shelidah.

২৭শে মে বোম্বে থেকে জাহাজ ছাড়লো বিলাতের উদ্দেশে। সঙ্গী রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী ও সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা। শিলাইদহে যে অনুবাদকর্ম আরম্ভ হয়েছিল, জাহাজেও সেই কর্মে কবি নিযুক্ত। এমনি করে জাহাজ জগৎ-জোড়া খ্যাতির বন্দরের দিকে এগিয়ে চললো।*

(১) বারানসীর ঘাটে সন্ন্যাসীবেশে কালীমোহন ঘোষকে অঙ্কনের জন্যই কি তিনি সন্ন্যাসীর পোষাক খুঁজছিলেন? উর্বানা থেকে লেখা তিনটি চিঠিতে (শরৎ ১৯১২, ১২ই নভেম্বর, ৮ই ডিসেম্বর ১৯১২)দেখি রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন যে দেশ থেকে সন্ন্যাসীর পোষাক রোটেনস্টাইনকে পাঠাবার ব্যবস্থা করছেন।

(২) দুই বন্ধুর প্রথম পরিচয়কালে গগনেন্দ্রনাথকে পাই। আবার হুটন গ্রন্থাগারে সংগৃহীত সর্বশেষ পত্রের অব্যবহিত পূর্বের পত্রে গগনেন্দ্রনাথের কথা। তাঁর মৃত্যুতে সান্ত্বনা দিয়ে রোটেন-স্টাইন চিঠি দিলে রবীন্দ্রনাথ লেখেন (১২ মার্চ ১৯৩৮)—"It is a heavy price to pay for living along, this constant loss of one's dear ones. A long life, like many other acquisitions, is a blessing if it is enjoyed by all whom one loves and cherishes. I was however, reconciled to Gaganendranath's death long before it actually came—ever since that fatal disease deprived him of his power of expression. Body had become literally a prison to his noble and adventurous spirit. Death has only released it."

(৩) তার বইয়ে অসিতকুমার হালদার হয়েছেন অজিতকুমার; অপসরা লিখতে সর্বত্র তিনি aspara লেখেন এবং লেখেন Golden Book of Tagore-এর ভূমিকা রোটেনস্টাইন লিখেছিলেন, যা তিনি আদৌ লেখেন নি।

(৪) রোটেনস্টাইনের নিজের মত নাকি উল্টো ছিল। সীতা দেবী 'পুণ্যস্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন—"Rothenstein যখন প্রথমে রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকিবার চেষ্টা করেন তখন খানিকক্ষণ চেষ্টা করিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, 'আপনাকে আঁকা যায় না।"

(৫) Rattray-র বই থেকে আরো একটি কৌতূহল জাগানো তথ্য জানা যায়। ১৯১৩ সালের প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ যখন হারভার্ডে তখন ইনিও হারভার্ডের ছাত্র ছিলেন। তখনকার অজ্ঞাতপরিচয় কবি সম্বন্ধে যিনি সামান্য জানতেন তিনি ভারতীয় দর্শনের অধ্যাপক উডস্ সাহেব।

উভস্ দম্পতী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপের জন্য যাদের নিমন্ত্রণ করতেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন কবি এলিয়ট, যিনি হারভার্ডে র‍্যাটরের সহপাঠী ছিলেন; রবীন্দ্রনাথের অশীতিবর্ষপূর্তি উপলক্ষে এই কথা উল্লেখ করে র‍্যাটরে চিঠি লিখলে রবীন্দ্রনাথ পত্রোত্তরে জানান—"I am interested to read what you say about Mr. T. S. Eliot—some of his poetry have moved me by their evocative power and consummate craftsmanship. I have translated—that was sometime ago—one of his lyrics called The Journey of the Magi."

(৬) জনৈক ইংরাজ প্রতিবেশীর অনুরোধে বহুপূর্বে ১৮৯০ সালে একবার তিনি স্বীয় কবিতার ইংরেজি তর্জমা করেন—কবিতাটি 'মানসীর' 'নিষ্ফল কামনা' বিশ্বভারতী প্রকাশিত Poems-এর ৩নং কবিতা। পরবর্তীকালে এই কবিতার একটি অতি সংক্ষিপ্ত ভাষান্তর তিনি প্রকাশ করেন, Lover's Gift-এর ২৫ নং কবিতা। বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিতও এটির তর্জমা করেন, প্রকাশিত হয় মডার্ণ রিভিয়ুর ১৯৩৩-র মে সংখ্যায়।

(৭) এঁদের দুজনকেই পরবর্তীকালে রোটেনস্টাইন Six portraits of Rabindranath Tagore উৎসর্গ করেন।

* রোটেনস্টাইনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হুটন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। উক্ত পত্রাবলীর অংশসমূহ এই প্রবন্ধে গ্রন্থাগার-কর্তৃপক্ষ ও কবিবন্ধুর পুত্র সার জন রোটেনস্টাইনের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত। উক্ত পত্রাবলীর মাইক্রোফিলম সংগ্রহে সাহায্য করেছেন ওয়েস্টার্ণ ওয়াশিংটন স্টেট কলেজের ভূগোলবিদ্যার অধ্যাপক লেখকের বন্ধু শ্রীযুক্ত দেবনাথ মুখোপাধ্যায়। মিশোরি বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীমতী মেরি লেগোর সৌজন্যও স্মরণীয়। অন্যান্য ঋণ যথাস্থানে স্বীকার করা হয়েছে।

ভারতের সমস্যা

সম্বরণ রায়

ভারতবন্ধু বিদেশিনী তায়া জিনকিন তাঁর অধুনাতন গ্রন্থে আমাদের দেশের অনগ্রগতির চারটি কারণ নির্দেশ করেছেন : "Poverty, corruption, caste, make believe, these are the shackles which keep India down."(১) নিঃসন্দেহে বলা চলে, এই চারটি হ'ল ভারতের সমস্যার চতুর্বর্গ। দারিদ্র্য, দুর্নীতি, জাতিভেদ এবং ভানবিলাসিতা—এদের কবল থেকে মুক্তি না পেলে সোনার ভারত গড়বার স্বপ্ন, স্বপ্নই থেকে যাবে।

আমাদের দারিদ্র্য সম্বন্ধে নূতন করে কিছু বলবার নেই। এটা বিশ্ববিশ্রুত সমস্যা। সেইজন্যই "দারিদ্র্য দূর করো" আমাদের জাতীয় স্লোগান। কিন্তু দারিদ্র্য দূর করা তো আর "সিসেম দ্বার খোলো"—র মতো মায়ার খেলা নয়। দারিদ্র্য-বিতাড়ন যে কষ্ট সাপেক্ষ প্রচেষ্টা সে বিষয়ে কোনো মতদ্বৈধ নেই। এবং এ কথাও সকলে মেনে নি যে, এই প্রচেষ্টার সাফল্যের জন্য আমাদের পক্ষে অনেক ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন।

অশোক মেহ্‌টা চতুর্থ পাঁচশালা পরিকল্পনা সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে পার্লামেণ্টারি কমিটির কাছে যে বক্তব্য পেশ করেছিলেন তার মর্মার্থ হ'ল : "Socialist transformation tried to bring to the top the underprivileged the dispossessed and the neglected. It was like turning up the earth that had not been ploughed for a long time."(২) এই যে আমূল পরিবর্তন, এই বিপ্লবী ওলট-পালট—এ তো আর অমনি অমনি ঘটতে পারে না। তার জন্য অকাতরে বহু-কিছু ত্যাগ করতে হবে। যে অবস্থা চালু আছে তাকেই যদি আঁকড়ে ধরে থাকি, তবে কোনোরকম ওলট-পালট কখনো সম্ভব হ'তে পারে না। কিন্তু ত্যাগ স্বীকার তো একটা উপায় মাত্র—আদর্শের লক্ষ্যে পৌঁছুবার পথ। সুতরাং আদর্শবোধের প্রেরণা ছাড়া ত্যাগ এবং সাধনা অর্থহীন। আবার, আদর্শবোধের সক্রিয়তার জন্যই নীতিনিষ্ঠার প্রয়োজন। আমি আদর্শের পিছনে ছুটছি, কিন্তু আমার কোনো নীতিবোধ নেই—এটা অনেকটা শূন্যে কুসুমোদ্যানের মতই অসম্ভব। এই পরিপ্রেক্ষিতে দুর্নীতি একটা মস্ত বড় সমস্যা, সন্দেহ নেই। কারণ, দুর্নীতি প্রবণতা চারিত্রিক দৌর্বল্যের প্রতীক। আদর্শের অনুপ্রেরণা, ত্যাগনিষ্ঠ সাধনা—এগুলো কখনোই চারিত্রিক দুর্বলতার জলো জমিতে উদ্ভিন্ন হ'তে পারে না।

আমাদের আদর্শ কি? ইস্কুলের ছাত্ররাও এর উত্তর জানে। জনজাগরণ। জনজাগরণের জন্য জনগণের যৌথ প্রচেষ্টা দরকার। যে-কোনো গঠনমূলক পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে যৌথপ্রয়াসের আন্তরিকতার উপর। তার কারণ, জনগণই হ'ল জাতীয় প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য এবং বিধেয়, দুইই। কিন্তু আমরা প্রকৃতপক্ষে যৌথপ্রচেষ্টার গোড়া কেটে আগায় জল ঢালছি। আমরা মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি করি ধর্মের আওতায়, সাংস্কৃতিক উন্নাসিকতায়, প্রাদেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। মন আমাদের ভেদবিশ্বাসী। তাই কোনো যৌথপ্রচেষ্টায় মন-মেলানো সাড়া পাইনা।

অবশ্য এ কথা ঠিক যে, আমরা মানুষে মানুষে ভেদাভেদ আইনত অস্বীকার করেছি। এক জাতি এক মন—ছাপার অক্ষরে সে কথা ঘোষণা করেছি। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, এই সাম্যের আদর্শকে কেন আমরা ব্যবহারিক জীবনে রূপায়িত করতে পারছি না? কেন আমাদের আদর্শগত জীবন এবং ব্যবহারিক জীবনে এমন আশমান-জমিন ফারাক্?

প্রশ্নটার মধ্যেই আমাদের দুরূহতম সমস্যার সংকেত আছে। সমস্যাটি হ'ল আমাদের আত্ম প্রবঞ্চনা। আমরা একটা ভাবের জগৎ রচনা করেছি—আমাদের world of make-believe। এবং সেটাই আমাদের কাছে সত্য বলে প্রতিভাত হচ্ছে। যে-লোকটা রজ্জুকে রজ্জু হিসেবে দেখে না, তার উপর সর্প আরোপিত ক'রে লাফাতে আরম্ভ করে তাকে আমরা "মায়াচ্ছন্ন" জীব বলি। আমাদের দশাও তাই। মায়াচ্ছন্ন। অস্তিমান জীবনটা ভান দিয়ে ভরা। দৃষ্টি মোহে আবিল।

ভানবিলাসিতার দু'টি লক্ষণ উল্লেখযোগ্য। একটা হ'ল, সত্যাসত্য সম্বন্ধে ধারণা। সত্য যদি অপ্রিয় হয় ভানবিলাসী তাকে এড়িয়ে চলে বা অস্বীকার করে। কিছুদিন আগে আমাদের একজন ধর্মপ্রবর্তক সম্বন্ধে একটি গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত-হয়েছিল; সেটাকে তুরন্ত্ বাজেয়াপ্ত করা হ'ল কারণ বইটা অপ্রীতিকর সত্যভাষণে উদ্যোগী হয়েছিল। অপর পিঠে, অসত্য যদি প্রিয় হয়, তবে সেটাকেই সত্য বলে বিশ্বাস করতে হয় এবং সেই সঙ্গে অপরেও তাই বিশ্বাস করবে বলে আবদার তুলাও হয়। অযোধ্যাবাসীর মন আমাদেরই মতো কুৎসাপ্রিয়। সীতার কলঙ্ক তাদের কাছে বড়ই মুখরোচক হয়ে উঠেছিল। সেইজন্য সেটাকে বিশ্বাস করতে এবং তদনুযায়ী কাজ করতে তাদের বিলম্ব বা সংকোচ হয় নি।

দ্বিতীয় লক্ষণটি হ'ল, ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে আত্মিক জীবনের বিচ্ছেদ। ব্যবহারিক জীবনে আমরা যা করি, আত্মিক জীবনের উপর তার কোনো ছায়া পড়ে না। আত্মা বিশুদ্ধ সত্তা। আগুন যখন তাকে দহন করতে পারে না, শাস্ত্র যখন তাকে ছেদন করতে পারে না, তখন ব্যবহারিক জীবনেয় দু একটা অপকর্ম তাকে ক্লেদাক্ত করবে কেমন ক'রে? এই লক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীমতী জিনকিনের একটি মন্তব্য কৌতূহলকর: "Many a corrupt financier in India leads an impeccable private life, continues to be a teetotaler and a vegetarian, to say his prayers regularly, gives much to charity in his home town, supports hospitals and scholarships for his own caste, would never think of cheating his particular God to whom he may give as much as ten percent of all his net earnings, yet he will do anything to cheat the income tax."(৩) কালীমন্দির থেকে মায়ের আশীর্বাদীফুল নিয়ে মিথ্যে সাক্ষী দিতে যাওয়ার মধ্যে কোনোরকম দুমুখীনতা আছে ব'লে ভানবিলাসী বিশ্বাস করে না।

এই লক্ষণদুটি তলিয়ে দেখলে প্রতীয়মান হবে যে, ভানবিলাসিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল জীবনকে দ্বিখণ্ডীকরণ: ভাষণে ও ভাবনায়, সত্যে ও মিথ্যায়, বিশ্বাসে ও কর্মে, আদর্শে ও জীবনযাত্রায় আধাআধি করা। অবশ্য, আধাআধি ক'রেই যে ভানবিলাসিতা ক্ষান্ত হয়, তা নয়। এ রকম দ্বিখণ্ডীকরণ যে ঘটেছে বা ঘটছে বা ঘটতে পারে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য বা অচেতনতার ঘোর ছড়ানোও তার ধর্ম। আমাদের জীবনযাত্রার কয়েকটা দিক আলোচনা ক'রে দেখা যেতে পারে

এই লক্ষণগুলি প্রকাশিত কি না।

ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতা সুপ্রচারিত। এই আধ্যাত্মিকতার মূলমন্ত্র হ'ল—তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। ত্যাগের মাধ্যমেই আমাদের ভোগের অধিকার জন্মায়। ভারত ত্যাগধর্মে উজ্জীবিত, এ কথা কবিকণ্ঠে আখ্যাত হচ্ছে, দার্শনিকীতে ব্যাখ্যাত হচ্ছে। তাত্ত্বিক গূঢ়তা ছেড়ে দিয়ে আমরা যদি ত্যাগ শব্দটার সাদামাঠা অর্থ করি তবে মানে দাঁড়ায়, আমার যা আছে তা ছেড়ে দেওয়া। যা আমার নেই তাকে ত্যাগ করবার প্রশ্ন ওঠে না। দেশবাসী দিনের পর দিন শুনে আসছে ত্যাগের মাহাত্ম্য, ভোগের অন্তঃসারশূন্যতা। যারা নিঃসম্বল তাদের ত্যাগ করার মতো কিছুই নেই শুধু একটি জিনিস ছাড়া—সম্বলের স্বপ্ন। সুতরাং ত্যাগের উপদেশ যখন তাদের জন্যে উচ্চারিত হয়, তখন বুঝতে হবে যে, ঐ সম্বলের স্বপ্নটা তাদের ছাড়তে বলা হচ্ছে; অর্থাৎ, মা মা গৃধঃ, লোভ ক'রো না।

জনসাধারণকে লোভ ছাড়তে বলছি, ভালো কথা। অনুন্নত দেশ আমাদের। 'লোভ-জটিল পন্থে' চলবার মতো সংগতি নেই। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, সেই সঙ্গে আমরাই আবার চতুর্দিকে লোভের মালমশলা ভোগের পশরা সাজিয়ে ব'সে আছি আর সকলকে ডেকে ডেকে বলছি, 'ভোগ করো, ঘি খাও, দরকার হ'লে ধার ক'রেও। Live now, pay later। সহজ কিস্তিতে শোধ ক'রো।' সকালবেলায় খবরের কাগজের পাতায় পাতায় বিজ্ঞাপনগুলো বড় বড় চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে মায়াবী সুরে বলতে থাকে, "আমায় কেনো, আমায় খাও, আমায় পরো, আমায় ব্যবহার করো।" ভাঙা বাসার অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে তাদের সুর যেন ব্যঙ্গ করতে থাকে, 'তোমার দ্বারা কিছুই হ'ল না। কিছুই হবে না।' তারপর বেরিয়ে আসি কর্মজীবনের সদর রাস্তায়। সেখানেও নিস্তার নেই। ভোগ্যবস্তুরা চতুর্দিক থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে আরম্ভ করে। সুসজ্জিত দোকানের লোভনীয় জানলায়, পথচলতি সুবেশীর পোষাক আসাকে, পাশ ঘেষে বেরিয়ে-যাওয়া গাড়ীর হর্ণে, বিলাসবহুল রেস্টুরেন্টের মোগলাই গন্ধে। যার সম্বল অতি সীমিত, নেই বললেই চলে—তার সামনে সোনার হরিণ চরিয়ে বেড়াই। লোকটি যদি বলে ওঠে, "আমার সোনার হরিণ চাই," তবে বিস্মিত হয়ে ভাববো, একি অধৈর্য!

অবস্থাটা আরও অন্তরবৈষম্যে পূর্ণ হয়ে ওঠে যখন উপদেষ্টারাই ভোগসাগরে ডুবে থাকে এবং মাঝে মাঝে মাছের মতো জলের উপরে উঠে এসে ব'লে যায়, "ত্যাগ মহান্ ধর্ম"। তাদের ভানবিলাসী আধ্যাত্মিক দৃষ্টির কাছে এই কথায়-কাজে অসামঞ্জস্যটা ধরা পড়ে না বটে, কিন্তু জনসাধারণ প্রশ্নোন্মুখ হয়ে ওঠে। ভোগের মেলায় ত্যাগের বোল বেসুরো ঠেকে। যখন বাস্তব সত্য সম্বন্ধে ঔদাসীন্য দেখা দেয়, তখন এই ধরণের ভাষণ-জীবন দ্বিখণ্ডীকরণ যুক্তিসংগত বলে গৃহীত হয়।

বৃটিশ আমলে 'Viceregal disregard of the common man'-এর সঙ্গে জনসাধারণ সুপরিচিত ছিল। কিন্তু স্বাধীন দেশে সেই উপেক্ষার পুনরাবৃত্তি, সেই ইংরেজ আমীরিয়ানায় অনুচিকীর্ষা, কেমন ক'রে সম্ভব হয় সেটাই দুর্বোধ্য। সব দেখে শুনে মনে হয়, বিদেশী রাজশক্তি বিদেয় নিয়েছে বটে কিন্তু রাজকীয় জীবন যাত্রার লোভ জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে আমাদের মনে। তাই সাম্যবাদী স্বপ্ন দেখবার জন্য রাজভবনের সিংহাসন দরকার। সত্যি কথা বলতে কি,

আমীরিয়ানার মোহ দেশের মন থেকে কাটেই নি। তাই আজো আমরা রাজকীয় স্টাইলে জমকালো শোভাযাত্রা বার করি, দলে দলে দেখতে ছুটি। ক্যাডিলাকে চ'ড়ে গলায় হীরের হার দুলিয়ে ভোট চাইতে এলে বিগলিত বোধ করি। আলোকসজ্জিত প্রাসাদ দেখলে চোখে আমাদের আজো প্রশংসার ফুলঝুরি ছোটে।

জনসাধারণের মন থেকে আমীরি মোহ কাটে নি ব'লেই স্থিতাবস্থার পৃষ্ঠপোষকেরা সুযোগ পায় জমিদারী জেল্লা জিইয়ে রাখতে। কেউ যদি সমালোচনা করে, তাকে unpractical বলা হয়। Practical দৃষ্টিভঙ্গী বলে—দারিদ্র-বিতাড়ন আমাদের লক্ষ্য, দারিদ্র্য বিতরণ নয়। অর্থাৎ, যারা উপরতলায় আছে তাদের টেনে নীচে নামিয়ে সবাইকে গরীব বানানো আমাদের উদ্দেশ্য নয়। নীচতলার লোক যাতে উপরতলায় উঠতে পারে সেটাই আমাদের চেষ্টা। তদর্থে, সকলকেই একদিন উপরতলায় তুলব, এবং সেইদিনই দেশ বিশ্ববাজারে অর্থ-নৈতিক সম্মানের দাবি জানাতে পারবে। অবশ্য, যতদিন সেটা না ঘটছে নীচতলায় কষ্ট হবে বটে, তবে ভবিষ্যতের আশায় দেশের স্বার্থে সেই কষ্ট সহ্য করতে হবে। একথা যারা বলে তারা নিজেদের বাস্তববাদী ব'লে বিশ্বাস করে। কেউ যদি তাদের বলে বসে, 'কষ্টটা না হয় সকলেই ভাগ ক'রে নিক্,' তাহ'লে তারা এই ধরণের অবাস্তব মতামতে বিচলিত বোধ করে।

বাস্তববাদী ধারণায় দেশের অর্থ-নৈতিক উন্নতির প্রমাণ হ'ল ভোগ্যবস্তুর প্রাচুর্যে। অধ্যাপক গলব্রেথের ভাষায়: "Growth consists increasingly of items of luxury consumption. Thus, we perform the considerable feat of converting the enjoyment of luxury into an index of national virtues. This arouses at least some doubts." (৪) গলব্রেথ যে সন্দেহের ইঙ্গিত করেছেন, সেটা হ'ল এই যে রেডিওগ্রাম, মোটরগাড়ী, ফ্রীজ, আসবাবপত্র সৌখীন পোষাক-আসাক ইত্যাদি ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় উৎপাদন করতে পারলেই কি আমাদের সদ্-গতি লাভ হবে? বাস্তববাদী উত্তর দেবে, নিশ্চয়ই। এই উত্তরটাই আমাদের দেশে চালু। তাই অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন দ্রুত প্রসার লাভ করছে। জাতীয় আয় যত বাড়ছে, ততই দেশে বিলাসবহুল ভোগ্যপণ্যের চাহিদা ফেঁপে উঠছে। পাড়ায় পাড়ায় রকমারি ফার্নিচারের দোকান, সৌখীন পোষাক-আসাকের মেলা, মণিহারী দোকানের জলুস, গাড়ী—এয়ারকণ্ডিশানার-রেফ্রিজারেটর-ট্র্যান্‌জিস্‌টারের বাসনা। কি নেই? ভ্রম হয়, এটা দরিদ্র ভারত না ঋদ্ধিমান বিলেত?

চারিদিকে শোনা যায়: উৎপাদন বাড়াও। কিসের উৎপাদন বাড়াবো? বিলাস ব্যসনের? আমরা যে-আদর্শে বিশ্বাস করি, অধ্যাপক টনীর ভাষায় সেই আদর্শের উত্তর হ'ল: "Produce what? food, clothing, house-room, art, knowlege? By all means! But if the nation is scantily furnishel with these things had it not better stop producing a good many others which fill shop windows in Regent street?...would not 'Spend less on private luxuries, be as wise a cry as 'Produce more'?" (৫) কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই আদর্শকে আমরা সযত্নে পরিহার ক'রে চলি।

বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে একটা গলদ চোখে পড়ে। যারা নিঃসম্বল বা স্বল্পবিত্ত, তাদেরকে

বলা হয় Tighten the belt। নইলে বেতন বৃদ্ধির দাবি ওঠে এবং ইনফ্লেশানের দরজা খুলে যায়। আবার ঠিক সেই সঙ্গেই বিজ্ঞাপনগুলি তাদের বলতে থাকে : loosen the belt। বলতে থাকে : আরো চাও, নামে সুখশান্তি। বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রসঙ্গে একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞাপনিক উপদেষ্টা সম্প্রতি তাঁর আর. কে. সরকার মেমোরিয়াল লেকচারে বলেছেন : "the mass market for consumer goods consists of millons of people, and it was to this section that at our advertising must communicate persuasively."(৬) লাখ লাখ বিত্তহীন লোকের দরজায় লোভের বাণী পৌঁছে দেওয়া হ'ল বিজ্ঞাপনের কর্তব্য। ওই লাখ লাখ বিত্তহীন লোকেরা এখন কি করবে? তারা কি বেল্ট আঁটবে, না আল্‌গা করবে?

ভারতের লক্ষ্য কি? আমরা কি এক ভোগবাদী সমাজ সৃষ্টি করতে চাই? সকলেই একবাক্যে হয়তো উত্তর দেবে : না। সাম্যবাদী মানবিক সমাজ-সৃষ্টি হ'ল আমাদের আদর্শ। তাই যদি হয় তবে ধনিকতন্ত্রের ভোগদর্শনকে আমরা কেন এমন ক'রে জীবনে প্রতিফলিত করছি? ধনিকতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে তফাৎ যে আকাশ পাতাল। ধনিকতা মনে করে মানব জীবনের একমাত্র কাম্য হ'ল ভোগবাসনার আত্মতৃপ্তি এবং কর্মের উদ্দেশ্য হ'ল এই তৃপ্তির পথকে সুগম করা। মানবতা বিশ্বাস করে, জীবনের পূর্ণতা আত্মক্রান্তিতে। জৈবিক জীবনের সংকীর্ণতা অতিক্রম ক'রে এক যখন বহুর সঙ্গে মিলিত হ'তে পারে তখনই তার মানব পরিচয়ের প্রকাশ। কর্মশক্তির লক্ষ্য হ'ল এই আত্মক্রান্তির পথকে সুগম করা।

এটা একটা ভুল ধারণা যে ভোগবৃত্তি ধনিক সমাজ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। ভোগবৃত্তির সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবের গভীর আত্মীয়তা আছে। সামন্তচক্র ধনিক সমাজ ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হ'লেই যে জায়গীরদারী মন বিদেয় নেবে তা মোটেই নয়। সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবের ধুয়া হ'ল : খরচ করো। এই ধুয়াটাকে ধনিকতন্ত্র আপন ক'রে নিয়েছে। সামন্ততন্ত্রের ইতিহাসে দেখা যায়, খরচ করবার ক্ষমতা হ'ল আভিজাত্যের দাড়িপাল্লা। ব্যয় বাহুল্য যার যত বেশী, সে ততো অভিজাত। শুধু তাই নয়, অপ্রয়োজনীয় ব্যয়বাহুল্য হ'ল আভিজাত্যের পরাকাষ্ঠা। ভেব্‌লেন যাকে law of conspicuous waste বা canon of honorific waste বলেছেন, সামন্ততান্ত্রিক জীবনবাদ সেই আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ধনতান্ত্রিক ভোগবাদীর ধুয়াও হ'ল : 'খরচ করো, প্রয়োজন-অপ্রয়োজন বিচার ক'রো না।' তফাৎ শুধু, সামন্ত যুগে খরচ করবার ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ; বর্তমান mass consumption-এর যুগে সেই সীমা সুদূর প্রসারিত। মোদ্দা কথা, খরচ করতে হবে। যার দুজোড়া শার্ট হ'লে চ'লে যায়, তার অন্তত ছজোড়া চাই! দশ টাকার জুতোয় পা ঢাকা চ'লে বটে, কিন্তু চল্লিশী জুতো না হ'লে সমাজে পা দেখানো যায় না। সাধারণ চেয়ারেও বসা চলে। কিন্তু সম্ভ্রান্ত নীতমেয় প্রয়োজন আধুনিকতম সোফা। অপ্রয়োজনকে প্রয়োজনের মুখোশ পরিয়ে খরচ বাড়িয়ে যেতে পারলেই প্রশংসা লাভ করা যায়। যাকে standard of living বলা হয়, সেটা আর কিছুই নয়, এই পরিদৃশ্যমান ব্যয়বাহুল্য। যে খরচ করতে পারছে না সে রাগে ফুলছে এবং হিংসে করে মরছে; কখন সে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে পারবে তারই জন্য অধীর প্রতীক্ষা করছে।

এই ব্যয় বাহুল্য শুধু ব্যক্তিক জীবনের লক্ষ্য নয়। সমাজেও পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক অনুষ্ঠান যথা বিবাহ, শ্রাদ্ধ, পূজাপার্বণিক অনুষ্ঠান যথা পাড়ায় পাড়ায় বারোয়ারী দুর্গাপূজা : এগুলি সবই জমিদারী ব্যয়প্রবৃত্তির প্রকৃষ্ট উদাহরণ! রাষ্ট্রিকজীবন সমাজজীবনেরই প্রতিফলন। তাই সরকারী আচার ব্যবহারেও যে জমিদারী ব্যয়শীলতা দেখতে পাবো সে আর এমন কি বিচিত্র। সরকারী প্রতিষ্ঠানের বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতি এবং ব্যয়রীতি "খরচ করো" নীতির মনোজ্ঞ রূপায়ণ। সেখানে বছর শেষে টাকা খরচ করার কেমন ধূম প'ড়ে যায় তা অনেকেরই জানা। প্রয়োজনীয় ব'লে যে সেই খরচা করা হচ্ছে তা নয়। যদি হ'ত বছরের প্রথম দিকে খরচ করার স্পৃহা দেখা দিত। আসল কথা, বাজেটে যে-টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সেটা ব্যয়িত না হ'লে তামাদি হয়ে যাবে, এটাই হ'ল বর্ষশেষের ব্যয়স্ফীতির কারণ। য়্যাপ্‌ল্‌বী কমিটির রিপোর্ট আলোচনা কালে পণ্ডিত নেহেরু বলেছিলেন যে, আমাদের দেশে audit of expenditure না হয়ে audit of achievement হওয়া উচিত। কিন্তু expenditure যেখানে achievement এর প্রমাণ, সেখানে achievement এর আলাদা audit কি? আমরা গর্ব ক'রে ব'লে থাকি এত-কোটি টাকার একটি উদ্যোগ-পরিকল্পনা। খরচের অংক দিয়ে পরিকল্পনার আভিজাত্য নির্ণীত হয়। হবেই বা না কেন? কাগজে যখন বিজ্ঞাপন দেখি কোটি-কোটি টাকা খরচে নির্মিত ছায়াচিত্রের শুভমুক্তি ঘটল, আমরা দুর্দমনীয় উৎসাহে দলে দলে তাই দেখতে ছুটি ডবল দামের টিকিট তিন ডবল দাম নিয়ে কিনে। আমাদের উৎসাহোন্মত্ত ভিড় সামলাতে লালবাজার হিমসিম খেয়ে যায়। জমিদারী মেজাজে আমরা শুধু খরচাই করি তা নয়, ব্যয়ধর্মিতাকে যথার্থ মর্যাদা দিয়ে থাকি।

আমাদের দেশের মস্ত বড়ো এক সমস্যা হ'ল দুর্নীতি। এ সম্বন্ধে চিন্তিত নয়, এমন দেশবাসী সংখ্যায় কম। এমন কি, দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিটিও চিন্তিত। যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তবে দেখা যাবে যে দুর্নীতির জন্যও আমাদের সামন্ততান্ত্রিক চিত্তবৃত্তি বহুলাংশে দায়ী। সামন্ততান্ত্রিক চিত্তবৃত্তির একটা লক্ষণ দেখেছি—খরচ করার নেশা। আর-একটা লক্ষণ হ'ল, উপরি-পাওয়ার প্রথা। নজরানা প্রথার সঙ্গে সকলেই পরিচিত। প্রথাটির উপর ঐতিহ্যের পুণ্যস্পর্শ আছে। ওটা সম্মানের প্রতীক। যে উর্ধ্বতন শক্তি আমাকে রক্ষণ বা ভক্ষণ করতে পারে সেই শক্তির কাছে সশ্রদ্ধ নতি স্বীকারের চাক্ষুষ অভিব্যক্তি হ'ল নজরানা। নজরানা নানা রকমের। দেবতা থেকে আরম্ভ ক'রে দারোগা পর্যন্ত সকলেই নজরানার এক্তিয়ারে পড়ে। আবার বিবাহাদি ধরণের সামাজিক অনুষ্ঠানে তত্ত্ব পাঠানোর রীতিও নজরানার অন্তর্গত। যদি না পাঠানো হয়, বা, মোটা জায়গায় মিহি তত্ত্ব যায়, তবে সম্মানহানির কারণ ঘটে এবং সবে-গ'ড়ে ওঠা আত্মীয়তার তার ছিঁড়ে যায়।

নজরানার সঙ্গে বখশিস প্রথাটিও বিচার্য। নজরানা যেমন উর্ধ্বতন শক্তির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত, বখশিস তেমনি অধস্তন সেবায়েতের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হয়। যে আপনার কোনোরকম সেবায় (অর্থাৎ কাজে) লাগল বা তুষ্টিবিধানে সাহায্য করল তাকে আপনি বখশিস দিয়ে থাকেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ অধস্তন ব্যক্তি রাজাকে যে উপঢৌকন দেয়, সেটা নজরানা। খুশী হওয়ার চিহ্নস্বরূপ রাজা অধস্তনকে যে পুরস্কার দেয়, সেটা হ'ল বখশিষ। দুটোই উপরি-পাওনা। শুধু উপর নীচ ভেদে তার শ্রেণীবিভাগ—একটা নজরানা, একটা বখশিষ। কতগুলো উপরি

পাওনা সমাজ-স্বীকৃত, কতগুলো নয়। উপরি-পাওনা, সমাজ-স্বীকৃত হ'লে নীতি-সম্মত, অস্বীকৃত হ'লে দুর্নীতিবোধক। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, দেওয়ালী বা নববর্ষ উপলক্ষে কর্তাস্থানীয় ব্যক্তিদের বাড়ীতে যদি ফলঝুড়ি ইত্যাদি ভেট (তত্ত্ব) পাঠানো হয় তবে সেটা সংগত। পয়লা জানুয়ারী ক্যালেণ্ডার ডায়রী এবং ঐ ধরণের নানা মনোহারী টুকিটাকি যদি আপনাকে উপহার দিয়ে যাওয়া না হয়, তবে আপনি অসম্মানিত বোধ করবেন। এই জাতীয় উপঢৌকন যে কত জনপ্রিয় তা সকলেরই জানা। এগুলি সম্মানসূচক। একজন দারোগাকে আপনি যদি ক্যালেণ্ডার-ডায়রী-কলম ইত্যাদি দেন সেটায় দোষ নেই। কিন্তু যদি সে একটা মুরগী গ্রহণ করে সেটা দুর্নীতি। ধনতান্ত্রিক সভ্য জগতে Tips প্রথা প্রচলিত এবং জনপ্রিয়। হোটেলে সেলুনে টিপস্ (বখশিষ) না দিয়ে চ'লে যান তবে আপনাকে কোনো জঙ্গুলে জীব ব'লে ধ'রে নেওয়া হবে। কিন্তু কোনো এক প্রতিষ্ঠানের পিওন টিওনকে যদি টিপস্ দেওয়া হয়, সেটা বেআইনী। উপরি পাওনার এই আইনী-বেআইনী। শ্রেণীবিভাগ সাধারণবুদ্ধির কাছে একটু গোলমেলে বলে প্রতিভাত হয়। একই জিনিস, ক্ষেত্রবিশেষে আইনী, আবার ক্ষেত্রান্তরে বেআইনী!

দর্শন যাই বলুক না কেন, মানুষ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বস্তুধর্মী। অর্থশাস্ত্রে বস্তু বা commodity বলতে বোঝায় সেই জিনিস যার মূল্য আছে। বস্তুত্বের ধর্ম হ'ল ক্রেতব্যতা। একটা মূল্যের বিনিময়ে বস্তুকে কেনা চলে। মানুষের মূল্য আছে। সে ক্রেতব্য। অবশ্য তাকে বস্তু ব'লে কোনো দার্শনিক সম্মানহানি ঘটানো হচ্ছে না; শুধু একটা অর্থনৈতিক তথ্যের পরিবেশন করা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, বস্তু মানুষের ক্রেতব্যতায় বিশ্বাস না করলে আমাদের বাজার ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা অচল হয়ে যাবে। সমাজের ক্রমবিকাশে মানুষ-বাজারের বিবর্তন ঘটেছে। একদিন ছিল যখন পুরো মানুষটাকে হাটে বাজারে কেনা চলত। রাজা হরিশ্চন্দ্রকেই কিনে নিয়েছিল এক শ্মশানবাসী ডোম! এই মানুষ কেনা-বেচা দাসপ্রথা নামে ইতিহাসে পরিচিত। আজকাল এই প্রথার অবসান ঘটেছে। কিন্তু তাই ব'লে মানুষের ক্রেতব্যতা লোপ পায়নি। ধনতান্ত্রিক "ব্যক্তি স্বাধীনতার" যুগে গোটা মানুষটাকে আর কিনতে পারা যায় না; কেবলমাত্র তার শ্রমশক্তি বা সুখোৎপাদক শক্তির কেনা বেচা চলে। এই কেনাবেচায় যে-নামে মূল্যের আদান-প্রদান ঘটে তা হ'ল—বেতন, দক্ষিণা, পারিশ্রমিক ইত্যাদি। বস্তুক্ষেত্রে যেমন দামী জিনিসটার কদর বেশী, মানুষের বেলাতেও দামী মানুষটার সম্মান অধিকতর। যে হাজার টাকা মাইনে পায়, তার সম্মান একশো-ওয়ালার চেয়ে বেশী। যে ডাক্তার চৌষট্টি টাকা দক্ষিণা নেয় তার কদর আট-টাকা-ওয়ালার আটগুণ। যে কলাবতীর (বা call-girl) পারিশ্রমিক ঘণ্টায় একশো টাকা তার আদর দশমুদ্রাবতীর তুলনায় নিশ্চয়ই দশগুণ বেশী।

দামটা যে সব সময়েই টাকা পয়সাতেই সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়। টাকার পরিবর্তে নানাবিধ সুখসুবিধার মাধ্যমেও দাম ধার্য করা হয়। তাকে বলা হয় fringe benefits। অর্থাৎ দামের গায়ে ঝালরের জলুস। সাদা কথায়, উপরি। যেমন, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে কর্তাস্থানীয় ব্যক্তিদের মূল্য নির্ধারণের সময় মাইনে ছাড়া যেগুলি বিচার্য তা হ'ল—বিনেপয়সার গাড়ী বাড়ী আসবাবপত্র টেলিফোন লাঞ্চ ইত্যাদি সুখ সুবিধা। এই সুখসুবিধাগুলির আকর্ষণ দ্বিবিধ। প্রথমত, এর জেল্লা

সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমরা কারুর সম্বন্ধে সপ্রশংস উক্তি করতে হ'লে ব'লে থাকি : "অমুক একজন জাঁদরেল অফিসার। কোম্পানী থেকে গাড়ী বাড়ী চাকর বাকর সব ফ্রী পায়।" দ্বিতীয়ত, এই ধরণের সুখসুবিধার সুবিধা এই যে, আয়কর বিভাগের দৃষ্টি অনেকটা এড়ানো যায়। সুখসুবিধাগুলিকে টাকার অংকে পরিবর্তিত ক'রে দাম ধার্য করা চলে বটে, কিন্তু তাহ'লে আয়কর বিভাগ পশ্চাদ্ধাবন করতে পারে। সুখসুবিধার মাধ্যমে যে দাম পাওয়া যায় সেটা উপরি পাওনার অন্তর্গত। কেন না, fringe benefits সরকারী ভাবে মাইনের অংশ হিসেবে পরিগণিত হয় না এবং বেসরকারী ভাবে আয়কর কমানোর প্রশস্ত পথ হিসেবে গৃহীত হয়।

দামের দাড়ি পাল্লায় যখন সামাজিক সম্মানের ওজন করা হয়, তখন প্রত্যেকেই কামনা করে তার দামটা বেশী হোক। রোজগারের বাজারে যদি ইচ্ছেমতো দাম পাওয়া না যায়, তবে স্বভাবতই মানুষ ঘাটতি পূরণে সচেষ্ট হয়। আমি কমদামী লোক এটা ভাবতে কারই বা ভালো লাগে! ঘাটতি পূরণের অর্থ হ'ল বাড়তি দাম পাওয়া। মূল্য স্ফীতিকরণের একাধিক পথ আছে ; যথা :

(১) অবসর সময়েও শ্রমশক্তিকে বিক্রয় করা। যেমন পার্ট টাইম কাজ করা, ছেলে পড়ানো ইত্যাদি। এটা শ্রমসাপেক্ষ এবং এর জন্য সুযোগও সীমিত। তাছাড়া, অত্যধিক পরিশ্রম স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়।

(২) বেসরকারীভাবে ছোটখাটো সুখসুবিধা ভোগ করা। যেমন, বাড়ীর ছেলে মেয়ের জন্য অফিস থেকে কাগজটা পেন্সিলটা এনে দেওয়া, অফিস গাড়ীটাকে ব্যক্তিগত কাজে লাগানো। যারা কোম্পানীর কাছ থেকে বেতনেতর সুখসুবিধা পায় না, তারা বেসরকারী ভাবে ঐ জাতীয় সুখসুবিধার সুযোগ নেয়।

(৩) অপরকে বাড়তি সাহায্য দিয়ে তার দাম বাবদ উপরি আদায় করা। যেমন, একজনের বিল পাশ হ'তে দেরি হচ্ছে। কাজটা তাড়াতাড়ি করিয়ে দিয়ে কিছু 'service charge' গ্রহণ করা। যে গ্রহণ করছে তার যুক্তি : প্রত্যেক কাজের দাম আছে। আমি একটা কাজ করে দিলাম। উপরিটা তারই দাম।

এখন প্রশ্ন ওঠে : যে-সমাজ দর্শনে নজরানা-বখশিস service charge ইত্যাদি প্রথা ন্যায় সংগত, যেখানে আয়ের সঙ্গে আয়কর-এড়ানো সুখসুবিধা প্রশংসার্হ, যেখানে মানুষের শ্রেয়বোধ তার ক্রেতব্যতায় রূপান্তরিত, যেখানে সৃজনশীল কর্মপ্রতিভা বস্তুভূত বাজারেমাল—সেখানে দুটো বেসরকারী সুখসুবিধা ভোগ কিংবা service charge এর উপরিপাওনা কেন দুর্নীতির অন্তর্গতহবে ?

আর এক ধরণের উপরি-প্রথার জনপ্রিয়তা আজকাল ক্রমশই বাড়ছে। এটা হ'ল, entertainment। অর্থাৎ প্রমোদব্যবস্থা। আগেকার দিনে জমিদারের জন্য প্রমোদব্যবস্থার বন্দোবস্ত করে অনেকেই অনেকরকম সুখসুবিধা লুটেছে। ধনিকতন্ত্রে সেই প্রথা নূতন পোষাকে চালু হয়েছে। আমি যদি আপনার কাছ থেকে অর্থ নিয়ে কোনো কাজ ক'রে দি, তবে সেটা দুর্নীতি। কিন্তু আপনি যদি আমাকে entertain করেন অর্থাৎ খানাপিনা করান এবং তৎপরিবর্তে কাজ হাসিল ক'রে নেন, তবে সেটা অসংগত নয়। আজকাল সব প্রতিষ্ঠানেই entertainment allowance বা প্রমোদভাতা দেওয়া হয়ে থাকে উপরওয়ালাদের। এই প্রমোদভাতার উদ্দেশ্য হ'ল,

কাজ হাসিল করার জন্য খানাপিনা করানো, 'দেখভাল' করা। যে সব প্রতিষ্ঠানে প্রমোদভাতার বন্দোবস্ত নেই, সে সব জায়গায় প্রমোদব্যবস্থার খরচা বাবদ আলাদা অংক ধ'রে রাখা থাকে। এমনো হ'তে পারে, আমি আপনার খানাপিনা আতিথেয়তা উপভোগ করলাম বটে কিন্তু আপনার হয়ে কাজটা না ক'রে এমন একজনের জন্য ক'রে দিলাম যে হয়তো আমাকে entertain করে নি। সে ক্ষেত্রে আমার সততা খুবই উচ্চ প্রশংসনীয়। আপনি হয়তো আমাকে অসৎ ভাবতে পারেন, কারণ আপনার আতিথেয়তা গ্রহণ ক'রেও কাজটা ক'রে দিলাম না। আপনার এই চিন্তাধারা স্পষ্টতই প্রচলিত লেনদেন প্রথার দ্বারা প্রভাবিত। এই প্রথা বলে, কেউ যদি আগাম নিয়ে জিনিস না দেয় সে অসৎ।

মানুষের ক্রেতব্যতা সম্বন্ধে ভারতীয় ব্যবসায়ের কোনো কোনো মহলে বেশ কৌতূহলকর মনোভাব দেখা যায়। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। একজন ভারতীয় ব্যবসায়ী একদা শ্রীমতী জিনকিনের কাছে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন : "I tell you, every man has his price. For some it is power, for others it is fear of poverty, for others it is helping a relation abroad with foreign exchange...Look at me. I have given money and I have bought every man I have wanted to buy. Sometimes it took longer to find his price, that was all." (৭) দামের কত রকম ফের হ'তে পারে তারই একটা স্বচ্ছ ছবি পাওয়া যায় ব্যবসায়ীটির উক্তিতে এবং সেই কারণে উক্তিটি মূল্যবান। শ্রীমতী জিনকিনের কাছে অবশ্য এটা একটা দম্ভোক্তি ব'লে মনে হয়েছে, তবে তেমন মনে করার বিশেষ সার্থকতা নেই। বাজার-ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ দামে কাটে, দামে নড়ে। এটা সাদা মাঠা তথ্য।

এখন প্রশ্ন, কোন দামটাকে জাতে তুলব, আর কোনটাকেই বা অচ্ছুৎ বলব? সহজ বুদ্ধি বলে, নজরানা থেকে আরম্ভ ক'রে বখশিস আমোদ প্রমোদ সুখসুবিধাভোগ—জনসেবীর কাছে সবগুলোই দুর্নীতির পরিচায়ক। উপরি পাওনা এক-রূপে হবে দেবী, অন্য-রূপে পতিতা, এটা অযৌক্তিক। কিন্তু এই অযৌক্তিক ব্যাপারটাকে আমরা সম্ভব ক'রে তুলেছি, এবং স্বীকার ক'রে নিয়েছি। এর কারণ, দুর্নীতি আমাদের কাছে একটা দ্ব্যর্থবোধক শব্দ। শুধু দুর্নীতি কেন? নীতিবোধটাই এখন একটা দ্ব্যর্থবোধক ধারণা। ছেলে যদি মিছে কথা বলে, বাবা চ'টে যায়। কিন্তু বাবা নিজেই যখন মিথ্যে ওজর দিয়ে অফিস কামাই করে, সেটা দোষনীয় নয়। এই দ্ব্যর্থবোধকতার জন্যই আমাদের সমাজে দেখা দিয়েছে, যাকে H. D. Lasswell-এর ভাষায় চলে, crisis of conscience। বিবেকের এই সংকটের মাঝে প'ড়ে আমরা দিশহারা, শ্রেয়বোধের নিশানা ফেলেছি হারিয়ে।

প্রকৃতপক্ষে, দ্ব্যর্থবোধক দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের প্রত্যেকটি ধারণাকে প্রত্যেকটি প্রচেষ্টাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। জীবন দর্শন ব'লে আমাদের যদি কিছু আজো থাকে, তবে সেই জীবনদর্শনই দ্ব্যর্থবোধকতার দোষে দুষ্ট, অন্তর্বৈষম্যে কণ্টকাকীর্ণ। ফলে, আমাদের ভিতরে-বাহিরে ভাগাভাগি হয়ে গেছে। ভাষণে বিশ্বাসে কর্মে কোনো সামঞ্জস্য নেই। আমরা চাই এক জিনিস, বলি আর-এক, করি অন্য কিছু। যেমন, লক্ষ্য আমাদের অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা, করি ভিক্ষে, চলি

জমিদারে চালে। যুক্তি? জাকজমকের চমক যদি ম্লান হয়, বিদেশীরা আমাদের পুছবে না। আর টুরিস্টরাই বা বলবে কি? একদিন দেউলিয়া জমিদারের কাছ থেকেও ঠাঁট-বজায়ের স্বপক্ষে ঠিক এমনি যুক্তি শোনা যেত।

ভারতীয় জীবনে এটাই হ'ল ট্র্যাজেডি। খণ্ডীভূত জীবনযাত্রার অভিশাপ নিয়ে অখণ্ড জীবনযাত্রার ভান ক'রে চলেছি। এই ভান বিলাসিতায় আবিল হয়ে উঠেছে আমাদের দৃষ্টিকোণ। জানি না, কোন্ দিকে চলব, কোথায় যাবো। অগত্যা, যাতেই আমরা হাত দিচ্ছি সেটাই মাঝপথে থমকে দাঁড়াচ্ছে। আমরা শিল্পযুগের দিকে ছুটেছি মনকে বেঁধে রেখেছি সামন্ততান্ত্রিক খুঁটিতে। মুখে সমসমাজের বুলি, রক্তে জমিদারী নেশা। ভারতবাসী আমার ভাই ব'লে সভামঞ্চে অভিনয় করি, বাড়ীতে বলি উড়ে-মেড়ো-খোট্টা-বাংগালী। 'ইংরেজ হটাও' রবে মুখর, কিন্তু ছেলেমেয়েরা যদি সাহেবী স্কুলে পড়বার সুযোগ না পায় Daddy-Mummy-Tata বলতে না শেখে, তবে মুখ আমাদের চূর্ণ হয়ে যায়। 'নমো বিজ্ঞান' ব'লে ত্রিসন্ধ্যা জপ করি, কিন্তু গ্রহণান্তর গঙ্গাস্নান ক'রে বাসনকোসন ধুয়ে অপবিত্রতা দূর করি। আরাম হারাম হ্যায়—এই আমাদের শ্লোগান কিন্তু দেহমন খুঁজে ফেরে এয়ারকণ্ডিশান আর ফ্রীজের শীতল বিলাস। 'Service before Self' বাণী ঝোলে সরকারী এলাকায়, কিন্তু কাজের বেলায় 'Self before service'। আত্মনির্ভরতার গুণ গাই, কিন্তু পছন্দ করি অপরের ঘাড়ে কাজের দায়িত্ব চাপাতে। গুরুবাদী মন প্রত্যাদেশের আশায় উন্মুখ হয়ে থাকে, অথচ, intellectual freedomএর দাবিতে পঞ্চমুখ। মানুষকে অমৃতের পুত্র ব'লে হাঁক দিই, কিন্তু বাড়ীতে মেথরের জন্য ছোঁয়া-বাঁচানো বন্দোবস্ত।

এই যে ভানের ভড়ং, এই যে আত্মপ্রবঞ্চনা—এটাই হ'ল দেশের প্রকৃত সমস্যা, অন্য সমস্ত সমস্যার উৎস। এর উপর মোহমুদ্গর না পড়লে আমাদের মুক্তি নেই। রাষ্ট্রশক্তি আমাদের করায়ত্ত হয়েছে বটে, কিন্তু আত্মশক্তির উদ্বোধন হয় নি আজো। ভানবিলাসিতার ঘোর কাটিয়ে আমাদের মণীষা যেদিন সক্রিয় হয়ে উঠবে জাগরণের রূঢ়তায় সত্যের দৃঢ়তায় একমাত্র সেই দিনই আমরা স্বাধীনতার যথার্থ স্বাদ পাবো, লাভ করব আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার। একমাত্র সেইদিনই আমরা আমাদের জীবনলক্ষ্যকে সুস্পষ্ট সুবোধ্য সুঠাম রূপ দিতে পারব। অন্যথায়, আমরা কেবল আত্মপ্রবঞ্চনার ঘূর্ণীপাকে ঘুর খেয়ে খেয়ে মরব আর ভাবব উন্নতির ঘোরানোসিঁড়ি বেয়ে রামরাজ্যে আরোহণ করছি।

(১) Taya Zinkin : Challenges in India, P. 214. (২) Statesman dated 20. 3. 67 (৩) Taya Zinkin : Challenges in India, P. 70 (৪) J. K. Galbraith : Economics V. the Quality of Life (Encounter, January 1965) (৫) R. H. Towney : The Acquisitive Society. P. 39. (৬) Edward J. Fielden's R. K. Sirkar Memorial Lecture, 1967, (Hindusthan standard, Calcutta, dated 17. 3. 76) (৭) Taya Zinkin : Challenges in India, P. 67, 70

পীঠিরাজ্য কোথায় অবস্থিত ছিল?

সরিৎশেখর মজুমদার

কুমরদেবীর সারনাথ অনুশাসনের ৩-৬ শ্লোকে (E. I., IX Pages 319-28) পীঠিপতির পরিচয় আছে এইরূপ :

"বীরো বল্লভরাজ নামবিদিতো মান্যঃ স ভূমোভূজাম জেতা সোতপৃথুপীঠিকাপতিরতি প্রোদ-প্রত্যাপোদয়ঃ॥ ছিক্কোরবংশকুমুদোদয়পূর্ণচন্দ্রঃ শ্রীদেবরক্ষিত ইতি প্রথিতঃ পৃথিব্যাম্। পীঠিপতি-র্গজপতেরপি রাজ্য-লক্ষ্মীম্ লক্ষ্ম্যা জিগায় জগদেকোমনোহরশ্রীঃ॥ তস্মাদাস পয়োনিধেরিব বিধুর্লাবণ্যলক্ষ্মী বিধুরনেত্রানন্দশমুদ্রবর্ধনবিধুঃ কীর্তির্দ্যুতিশ্রীবিধুঃ।"

উপরিউক্ত শ্লোক হইতে আমরা জানিতে পারি :

(১) বল্লভরাজ নামে এক পীঠিকাপতি ছিলেন।

(২) পীঠিপতি শ্রীদেবরক্ষিত ছিলেন ছিক্কোর-বংশ জাত।

(৩) 'তস্মাদাস' শব্দটিতে বল্লভরাজ ও দেবরক্ষিতের সম্পর্ক সূচিত হইতেছে।

ঐ একই অনুশাসনের দ্বিতীয়ভাগে বলা হইয়াছে, "গৌড়রাজ রামপালের মাতুল অঙ্গাধিপতি মহন দেবরক্ষিতকে পরাজিত করেন। এইরূপে তিনি রামপালকে সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। অবশেষে মহন দেবরক্ষিতের সহিত তাঁহার কন্যা শঙ্করদেবীর বিবাহ দেন।" এই সূত্রে স্মরণ রাখা দরকার, যে-কুমরদেবীর আদেশে উপরি উক্ত সারনাথ অনুশাসন লিখিত হয়, তিনি শ্রীদেবরক্ষিত ও শঙ্করদেবীর কন্যা। গহড়-ভাল-নৃপতি গোবিন্দচন্দ্রের সহিত কুমরদেবীর বিবাহ হয়।

শ্রীদেবরক্ষিত যে একজন উল্লেখযোগ্য শক্তিমান সামন্ত ছিলেন তাহা নিম্নলিখিত বিশ্লেষণী প্রমাণ করে :

(১) বরেন্দ্রী কৈবর্তশক্তির করতলগত হয়। সেই বরেন্দ্রী উদ্ধার রামপালের পক্ষে কঠিন ছিল। রামপালের প্রধান ভরসা মাতুল মহনদেব, যিনি অঙ্গরাজ্যের অধিপতি। আবার মহন-দেবের ভরসা বিভিন্ন সামন্তবর্গ। সেই সামন্তবর্গের মধ্যে দেবরক্ষিত এমন একজন শক্তিশালী পুরুষ যে তাহাকে জয় করিতে না পারিলে পালবংশের সমূহ বিপদ। অতএব, দেবরক্ষিতের বিদ্রোহকে দমন করার প্রয়োজন বোধ করিলেন মহন।

(২) মহন দেবরক্ষিতকে পরাজিত করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। স্বীয় কন্যা শঙ্করদেবীর সহিত দেবরক্ষিতের বিবাহ দিলেন। ইহা এক কূটনৈতিক সম্বন্ধ-স্থাপন ব্যতীত আর কিছু নয়।

(৩) দেবরক্ষিতের কন্যা কুমরদেবীর বিবাহ হইল গহরভাল নৃপতি গোবিন্দচন্দ্রের সহিত। তৎকালীন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গোবিন্দচন্দ্র একজন প্রথম পর্য্যায়ের শক্তিমান নৃপতি। এমন শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠিত নৃপতির সহিত কুমরদেবীর বিবাহ দেবরক্ষিতের মর্যাদার ইঙ্গিতবহ।

মহনের হস্তে দেবরক্ষিতের পরাজয়ের কথা রামচরিতেও আছে। সন্ধ্যাকরনন্দী বিরচিত

'রামচরিত' রামপালের বরেন্দ্রী-উদ্ধার-কীর্তির ইতিহাস, ইহা সকলেই জানেন। ইহার ২য় পরিচ্ছেদের অষ্টম শ্লোকের ব্যাখ্যাটি এইরূপ :

"...পীঠিপতির্দেবরক্ষিতোনাম যেন তেন মথনেন মথননাম্না
মহন ইতি প্রসিদ্ধাভিধানেন রাষ্ট্রকূটকুলতিলকেন..."

অর্থাৎ, পীঠিপতিদেবরক্ষিতের গর্বচূর্ণ করিয়া যে রাষ্ট্রকূটতিলক মহন বা মথন বহুতর করিতুরগধন আহরণ করিয়াছিলেন, ইত্যাদি।

রামচরিত কিন্তু দেবরক্ষিতকে শুধু 'পীঠিপতি' বলিলেন না, 'মগধাধিপতিও' বলিলেন। পীঠিরাজ্যের অবস্থিতি নির্ধারণে জটিলতা সেইখানেই। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অষ্টম শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে :

"...তথাহি মহনেন বিন্ধ্যমাণিক্যং করেণুরাজমারূহ্যসমরসীমন্যুমুল্লাসিতশল্যশতকোটিপাটিতোদ্ভটসুভটং শঙ্কটমরট্টমন্দোৎকটকরিঘটা ঘোটকপটলঃ স পীঠিপতির্মগধাধিপোনিদ্দুর্হে।..."

অর্থাৎ, বিষ্ণু যেমন বরাহ অবতারে সাগরোর্মিবলীকৃত বসুমতীর উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন সমরাহঙ্কারে উল্লসিত নাগরাজ বিন্ধ্যমাণিক্যে আরোহণপূর্বক রাষ্ট্রকূটসৈন্যদ্বারা মহনও তেমনি শতকোটিশল্যে পীঠিপতির উৎকট করিঘটা ঘোটকপটল বিদীর্ণ করিয়া মগধের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন।

মহনের সার্থক প্রচেষ্টায় বরেন্দ্রী অভিযানে যে-সকল সামন্ত রামপালের সহিত মিলিত হন রামচরিতের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৫ম শ্লোকে তাহার একটি তালিকা আছে। যথা :—

বন্দ্যগুণসিংহ বিক্রম শূর শিখরভাস্কর প্রতাপৈস্তৈঃ।
স মহাবলৈরূপেতো জেতুং জগতীমলম্ভূষ্ণুঃ ॥ ৫ ॥

উপরের শ্লোকে ব্যবহৃত 'বন্দ্য' শব্দটির এইরূপ টীকা দেওয়া হইয়াছে : বন্দ্যইতি কান্যকুব্জ-রাজ বাজিনীগণ্ঠনভুজঙ্গো ভীমযশোহভিধাতোমগধাধিপতিঃ, পীঠিপতি। অর্থাৎ এই শ্লোকে রামপালের পক্ষাবলম্বী এমন একজন 'মগধাধিপতি পীঠিপতি'র নাম পাইলাম যিনি দেবরক্ষিত নন। শুধু তাই নয়, এই ভীমযশকেও একাধারে পীঠিপতি ও মগধাধিপতি বলা হইল। এবং সামন্তদের তালিকায় সম্মানসূচক 'বন্দ্য' আখ্যা দিয়া সর্বাগ্রে তাঁহার নাম করা হইল। অথচ, এই ভীমযশ দেবরক্ষিতের পুত্র বা আত্মীয় এমন কোন উল্লেখ রামচরিতে বা কুমরদেবীর সারনাথ অনুশাসনেও নাই। তবে কি দেবরক্ষিত তখন দমিত, অগ্রাহ্যশক্তি? এ-প্রসঙ্গ অবশ্য এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়।

কুমরদেবী তাঁহার পিতৃকুলকে মগধাধিপতি বলিলেন না; রামচরিত তাহাদের একাধারে 'মগধাধিপতি ও পীঠিপতি' বলিলেন, ইহা মনে রাখা দরকার। ভীমযশের কোন উত্তরাধিকারীর নাম আমরা কোথাও পাই না। পীঠিরাজ্যের আর এক উল্লেখ আমরা পাই জানিবাগ অনুশাসনে (I. A. XLVIII, 43-48 J. B. O. R. S. Vol. IV, 265-260)। বুদ্ধসেনের পুত্র জয়সেনের আদেশে এই অনুশাসন খোদিত হয়। জয়সেনকে 'পীঠিপতি' ও 'আচার্য' বলা হইয়াছে। অনুশাসনের উদ্দেশ্য, সপ্তঘট্টান্বিত কোট্টধলা নামক গ্রামটি বুদ্ধগয়ার মহাবিহারের জন্য নিঃসর্ত দান।

এখন প্রশ্ন এই, পীঠিরাজ্য কোথায় অবস্থিত ছিল ? ডাঃ ষ্টেন কোনোর মতে দক্ষিণ ভারতে পিষ্ঠপুরমই অতীতের পীঠি। এই অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। পালরাজ্য দক্ষিণ ভারতে প্রসারিত হয় নাই। দক্ষিণ ভারতের সামন্তকে বরেন্দ্রী-অভিযানের উদ্দেশ্যে স্বপক্ষে আনিবার প্রয়াস মোটেই যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

জানিবাগ অনুশাসন সম্পর্কে আলোচনাকালে (J. B. O. R. S. Vol., IV, 265-280) শ্রী কে. পি. জয়সওয়াল অভিমত প্রকাশ করেন, উক্ত অনুশাসনে উল্লিখিত জয়সেন সেন বংশের সগোত্রোৎপন্ন এবং ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে সেন-সাম্রাজ্য ভাঙিয়া যাওয়ায় স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আরও বলেন, সেন রাজাদের কালে পীঠি বলিতে মিথিলা ব্যতীত সমগ্র বিহারকে বুঝাইত। এবং সেইজন্যই রামচরিতে পীঠিপতিকে মগধাধিপতিও বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন থাকিয়া যায়, কুমরদেবী তাঁহার পিতার পরিচয়দানকালে পিতা দেবরক্ষিতকে শুধু পীঠিপতি বলিলেন কেন ? মগধাধিপতি বলিলেন না কেন ? জানিবাগ অনুশাসনে জয়সেন নিজেকে শুধু পীঠিপতি বলিলেন কেন ?

শ্রীননীগোপাল মজুমদারের মতে, পীঠি বলিতে বুদ্ধগয়া ও তাহার পারিপার্শিক অঞ্চল বুঝাইত কারণ জানিবাগ অনুশাসন আবিষ্কৃত হয় ঐ স্থানে। (I. A. XLVIII, Page 44) শ্রী এইচ. পাণ্ডে মহাশয়ের ধারণা বুদ্ধগয়ার হীরক সিংহাসনের রক্ষককে 'পীঠিপতি' বলা হইত ; পীঠি কোন দেশ নহে। উপরি উক্ত দুটি অভিমতই যুক্তিভিত্তিক নহে। গয়া সব সময়ই মগধের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পীঠি বলিতে যদি গয়াকে বুঝায়, তাহা হইলে 'মগধাধিপতি'কে আলাদা করিয়া 'পীঠিপতি' বলিবার প্রয়োজন কোথায় ? জানিবাগ অনুশাসনের আবিষ্কার হয় বুদ্ধগয়ার নিকটে ; অতএব পীঠি ও বুদ্ধগয়া-অঞ্চল এক, এই যুক্তি অত্যন্ত দুর্বল। দেবরক্ষিত যেমন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন, জয়সেনও সেইরূপ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হিসাবে বুদ্ধ-গয়াতীর্থে গিয়া ভূমিদান করিয়া থাকিবেন এবং জানিবাগ অনুশাসন তাহারই দলিলস্বরূপ। কোট্ঠলগ্রাম তাঁহার পীঠিরাজ্যভুক্ত একটি গ্রাম।

শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বাংলার ইতিহাস (প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৮৬) গ্রন্থে এবং একটি প্রবন্ধে (M. A. S. B., Vol V, Page 89) এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, পীঠি মগধ সীমান্তবর্তী কোনো রাজ্য অথবা কান্যকুব্জ এবং গৌড়ের মাঝামাঝি কোন রাজ্য।

পীঠি প্রকৃতপক্ষে কোথায় অবস্থিত ছিল ? লেখকের অভিমত, ইহা রামপাল-মাতুল মদন দেবের অঙ্গ ও বরেন্দ্রীর মাঝামাঝি একটি অঞ্চলরাজ্য। পূর্ব রেলওয়ের আধুনিক দুই রেলষ্টেশন কহল গাঁ হইতে সকরিগলি জংসন ইহার সম্ভাব্য সীমানা। এই অভিমতের ভিত্তি এইরূপ :

(১) কহল গাঁ (ইংরেজীতে যাহা পূর্বে Colgong লেখা হইত) মুসলমান আমলে 'কহল গ্রাম নামে পরিচিত ছিল (Jauhar Mss, 28) এই 'কহলগ্রাম' পুরাতনকালের 'কোট্ঠলগ্রামের অপভ্রংশ হওয়া স্বাভাবিক।

(২) কহলগাঁয়ের পূর্ববর্তী রেলওয়ে ষ্টেশনের নাম পীরপৈতী। 'পীর' শব্দটি মুসলমান আমলের সংযোজন। এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে, হিন্দুদের উল্লেখযোগ্য স্থানের নামের পূর্বে

মুসলমানেরা 'পীর' শব্দটি জুড়িয়া দিয়াছে। ইহার আদি নাম ছিল পৈতী। পৈতী পীঠির অপভ্রংশ হওয়া সম্ভব। রেণেলের ম্যাপে পৈতী একটি সমৃদ্ধ নগর।

(৩) গঙ্গাতীরে অবস্থিত পৈতীর একটি ঘাট 'পত্থলঘট্টা নামে সুপরিচিত। ঘট্টা শব্দের অর্থ ঘাট; এবং জানিবাগ অনুশাসনে উল্লিখিত 'সপ্তঘট্টা'র সহিত ইহার যোগ থাকা স্বাভাবিক। ঐতিহাসিক শ্রী এন্. এল. দে মহাশয় (J. A. S. B., New Series, Vol V, P. 7) উক্ত পত্থলঘট্টার গুরুত্ব বর্ণনাকালে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, অধুনালুপ্ত বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় সম্ভবতঃ ঐখানেই অবস্থিত ছিল। এখনও ঐ স্থানের মাহাত্ম্য স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে কীর্তিত হয়। জানিবাগ অনুশাসনের কর্তা পীঠিপতি জয়সেনের নামের পূর্বে 'আচার্য' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ বৌদ্ধ জয়সেন স্থানীয় বিক্রমশীলা বিহারের সহিত যুক্ত ছিলেন।

(৪) পীরপৈতীর প্রায় ষোল মাইল উত্তর পূর্বে সাহিবগঞ্জের কাছাকাছি একটি গড় আছে। নাম সকৃরুগড়। ইহার চার-পাঁচ মাইল পূর্বে সকরিগলি জংসন। এই অঞ্চলে অনেকগুলি হিন্দুযুগের প্রস্তরমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সাহিবগঞ্জ রেলওয়ে স্কুল প্রাঙ্গণে কিছু কিছু রক্ষিত আছে। লেখকের প্রচেষ্টায় একটি তারামূর্তি পাটনা মিউজিয়মে পাঠানো হয়।

সকৃরুগড় ও সকরিগলি নাম দুইটির ভিতর ছিক্কোরগড় ও শঙ্করগলি নাম দুইটি লুকানো আছে মনে হয়। শ্রীদেবরক্ষিত ছিলেন 'ছিক্কোরবংশকুমুদোদয়'। একদা সকরুগড়ে ছিক্কোরদের গড় ছিল মনে হয়। দেবরক্ষিতের মহিষীর নাম ছিল শঙ্করদেবী। পূর্বেই ব্যক্ত হইয়াছে। শঙ্কর-দেবী ছিলেন মহনদেবের কন্যা এবং দেবরক্ষিতকে পরাজিত করিয়া কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে মহনদেব দেবরক্ষিতের হস্তে কন্যা শঙ্করদেবীকে সমর্পণ করেন। এই শঙ্করদেবীর নামেই শঙ্করগলির নামকরণ হইয়া থাকিবে, এবং তাহার বর্তমানে অপভ্রষ্টরূপ সকরিগলি। 'গলি' শব্দটি লক্ষণীয়। এই অঞ্চলে দুইটি সংকীর্ণ গিরিপথ ছিল। একটি তেলিয়াগড়ী অপরটি শঙ্করগলি। ডঃ কানুনগো তেলিয়াগড়ী হইতে সকরিগলি পর্যন্ত বিস্তৃত গলি-এলাকার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন তাহার বিখ্যাত "শের শাহ" গ্রন্থে। পরবর্তী এক প্রবন্ধে তেলিয়াগড়ী সম্পর্কে লেখক বিশদভাবে আলোচনা করিবেন।

উপরে আলোচিত বিষয়ের ভিত্তিতে লেখকের সিদ্ধান্ত এই যে বর্তমান পীরপৈতী অঞ্চলই অতীতের পীঠিরাজ্য।

বাংলার মন্দির

হিতেশরঞ্জন সান্যাল

চালা রীতিঃ চারচালা

দোচালা ও জোড়বাংলা মন্দিরের আলোচনা সীমাবদ্ধ ছিল সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্তের মধ্যে, বাংলাদেশের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া ইহাদের সাক্ষাত মিলিলেও চালা রীতির উপরিউক্ত রূপ দুইটির চর্চ্চা কিন্তু অত্যন্ত সীমিতভাবেই হইয়াছে। চালা রীতির ব্যাপকতা ও জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য দোচালা বা জোড়বাংলার মাধ্যমে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়—ইহার জন্য তাকাইতে হইবে চারচালা ও আটচালা মন্দিরের দিকে। ইহাদের মধ্যে আবার আটচালার প্রাধান্যই বেশী—বিস্তারও তাহার বাংলাদেশের প্রায় সর্ব্বত্র। চারচালার নিদর্শন বাংলাদেশের বহু ক্ষেত্রে দেখা গেলেও এ রীতির চর্চ্চা নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলা এবং সন্নিহিত অঞ্চলের বাহিরে খুব একটা বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। বাংলাদেশের এই খণ্ডের মধ্যেই দেখিতেছি এই রীতি লইয়া যাহা কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা।

দোচালা মন্দির নির্ম্মাণে স্থপতি বাসগৃহের গৃহীত রূপ হইতে খুব একটা সরিয়া আসিতে পারেন নাই। বাসগৃহের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য প্রায় সবই অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মন্দির নির্মাণ করিতে হইয়াছিল। বোধকরি, দোচালা দেহের মুলীভূত বৈশিষ্ট্যই ইহার কারণ। মন্দিরদেহে আকৃতির বিস্তার হয় তাহার আচ্ছাদনকে অবলম্বন করিয়া। দোচালা দেহের আয়ত আসনে প্রস্থ দৈর্ঘ্যের প্রায় অর্দ্ধেক—আচ্ছাদনটিও গঠিত হয় দুইটি অংশে, এরূপ ক্ষেত্রে আচ্ছাদনে উচ্চতার সীমা নির্দ্দেশ মন্দিরের নিম্নাংশের গঠনের মধ্যেই—আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিলে, আসনের রেখা বন্ধনের মধ্যেই নির্দ্ধারিত হইয়া যায়। আচ্ছাদনের উচ্চতা প্রস্থের বিস্তার অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে ও খড়ের দোচালা গৃহ ও ইটের দোচালা মন্দিরে আকৃতিগত বৈষম্য ঘটিতে পারে নাই। দোচালা মন্দিরের রূপকল্পনা সীমাবদ্ধতার মধ্যেই বিকাশ লাভ করিয়াছে।

চারচালা মন্দিরের ক্ষেত্রে এইরূপ কোন সীমার বন্ধন নাই। চারচালা কক্ষের আসন আয়ত বা বর্গাকার যে কোন প্রকারের হইতে পারে। তবে সাধারণতঃ বর্গাকার আসনই দৃষ্টিগোচর। আয়ত হইলেও দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের মধ্যে বৈষম্য সাধারণতঃ খুব কমই। একমাত্র মুর্শিদাবাদ জেলার সাদপুর গ্রামের মন্দিরে দেখিতেছি দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা চারফুটেরও অধিক।

আসন অবলম্বন করিয়া লম্বমান দেওয়াল, চালা আচ্ছাদনের প্রয়োজনে উর্দ্ধাংশ আয়ত আঁখি পল্লবের মত বাঁকান। আচ্ছাদন রচিত হয় অনুরূপ আকৃতির চারিটি চালা দিয়া। দেওয়ালের উপর হইতে চালাগুলি পরস্পরের দিকে ঝুঁকিয়া ক্রমহ্রস্বায়মান আকৃতিতে উপরের দিকে উঠিয়া যায়। চারিটি চালার সমাপ্তি ঘটে গর্ভগৃহের কেন্দ্রস্থলের উপরে পরস্পরের সহিত মিলনে। এই মিলন কেন্দ্রই আচ্ছাদনের শীর্ষ বিন্দু, চূড়াভাগের অবস্থান ক্ষেত্র।

চারচালা আচ্ছাদনের বর্ণনা হইতে বুঝা যাইবে মূলগত বৈশিষ্ট্যের প্রশ্নে শিখর মন্দিরের

সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ একটা সাদৃশ্য রহিয়াছে। শিখর মন্দিরের মত চার চালা মন্দিরেও উচ্চতার সম্ভাবনা প্রচুর—বাধা বলিয়া কিছু নাই। এই সম্ভাবনাই চারচালা আচ্ছাদনের এই স্বাধীনতাকে অবলম্বন করিয়াই চারচালা আচ্ছাদনের রূপকল্পনার বিকাশ ও তাহার পরিণতি।

নদীয়া জেলার চাকদহের নিকটবর্তী পালপাড়া গ্রামের কালী মন্দিরটি চারচালা মন্দিরের অন্যতম আদি নিদর্শন। পূর্ব্বতন বিবরণী পাঠে জানা যায় মন্দিরগাত্রে নাকি নির্মাণকল্পজ্ঞাপক একটি লিপি ছিল। লিপিটির কোন সন্ধান এখন আর পাওয়া যায় না। নির্ম্মাণকাল সম্পর্কে লিপিটির সাক্ষ্যও কেহ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে নাই। তবে মন্দির গাত্রে, বিশেষ করিয়া মুখভাগে পোড়ামাটির অলঙ্কার বিন্যাস ও শৈলীর মধ্যে নির্ম্মাণকাল সম্পর্কে একটা ইঙ্গিত স্পষ্ট হইয়া উঠে। দেখিয়া মনে হয় সপ্তদশ শতকে—সম্ভবতঃ পালপাড়ার মন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে।

সুউচ্চ ভিত্তি অধিষ্ঠানের উপর বর্গাকার মন্দিরটিতে দেওয়ালের উচ্চতার পরিমাপ আসনের দৈর্ঘ্য সীমার ঠিক সমান। বাসগৃহে দেওয়াল সাধারণতঃ আসনের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা হ্রস্ব করিয়াই গঠিত হয়। পালপাড়া মন্দিরের দেওয়াল আরোপিত উচ্চতায় মন্দির দেহের স্বাতন্ত্র সম্ভাবনার ইঙ্গিত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

আচ্ছাদনটি কিন্তু বাসগৃহের একান্ত অনুরূপ করিয়া গড়া। চালাগুলি অত্যন্ত নীচুভাবে বক্ররেখা রচনা করিয়া অগ্রসরমান। চারচালা আচ্ছাদনে চালাগুলি ভিতরের দিকে অনেকটা ঝুঁকিয়া দ্রুততার সহিত ভিতরের দিকে অগ্রসর হয়। অগ্রগতির পথে চালার প্রসার হ্রাস পাইতে থাকে সমানুপাতিক দ্রুততার সহিত। কেন্দ্রের দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক থাকে বলিয়া আচ্ছাদনের উচ্চতা দেওয়ালের অপেক্ষা অনেক কম—প্রায় এক তৃতীয়াংশের মত। পালপাড়ার আচ্ছাদন রূপরেখা ইহারই অনুবর্তী। অর্দ্ধাবৃত্তাকার চারিটি খিলানের উপর গম্বুজ বসাইয়া মন্দিরটির অন্তরা বিন্যাস। দেওয়ালের কোণ হইতে চালাগুলি উঠিতেছে গম্বুজের গতিপথ বাহিয়া। বাহিরের দিকে আচ্ছাদনে চালার রূপরেখা অব্যাহত কিন্তু অবস্থান গম্বুজের প্রত্যক্ষ প্রভাব অতিক্রম করিবার কোন প্রয়াস দৃষ্টিগোচর নহে। শুধুমাত্র অন্ত্যক্ষেত্রে—চালাগুলির ত্রিভুজাকার অগ্রভাগ যখন পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া আচ্ছাদনের শীর্ষ বিন্দু রচনা করিতেছে সেখানে আচ্ছাদন গম্বুজরেখার উপরে একটু উচ্চ ও তীক্ষ্ণ। গম্বুজের প্রতি একান্ত নির্ভরতার ফলে আচ্ছাননের অগ্রগতি হইয়াছে অত্যন্ত নীচুভাবে, ভিতরের দিকে ঝোঁকও হইয়াছে অতিরিক্ত। আচ্ছাদনের রূপরেখা রচনায় স্থপতি বাসগৃহের আদর্শ ছাড়িয়া অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

চারচালা আচ্ছাদনের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা উপলব্ধির প্রাথমিক পরিচয় রহিয়াছে গোকর্ণ গ্রামের (মুর্শিদাবাদ জেলা) নৃসিংহদেবের আবাসগৃহে। দেহ গঠনের দিক দিয়া অবশ্য মন্দিরটির সর্ব্বাঙ্গ অপরিণতির লক্ষণ সুপরিস্ফুট। একটি অত্যুচ্চ ভিত্তি অধিষ্ঠানের উপর বর্গাকার মন্দিরটির অবস্থান। অত্যধিক ঘনত্বে দেওয়াল গুরুভার, উচ্চতাতেও তাহা আসনের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা অনেক কম।

দেওয়ালের উপর হইতে আচ্ছাদন দ্রুততার সহিত উপরের দিকে উঠিয়া যাইতেছে। উচ্চতাতে যদিও দেওয়াল অপেক্ষা হ্রস্বতর আচ্ছাদনটি কিন্তু পালপাড়ার মত নীচুভাবে রচিত

নহে। প্রশস্ত চালাটি ক্রমহ্রস্বায়মান আকৃতিতে উপরের দিকে উঠিতেছে একটু খাড়াভাবে, বলিষ্ঠ বেগের সহিত। কার্ণিসের বক্ররেখার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চালার দেহ বাঁকান, অন্তরায় অম্বুজের আকৃতিও অর্দ্ধবৃত্তাকার কিন্তু চালার কল্পনা নীচু বক্ররেখাকে ভিত্তি করিয়া নহে, চালা গুলির গতিপথ তাই খানিকটা সোজা চালের প্রবাহ বাহিয়া। নদীয়া জেলার মন্দিরটিতে দেওয়ালের কোণ হইতে গম্বুজের শীর্ষ পর্য্যন্ত সাবলীল বক্ররেখা কল্পনা করিয়া আচ্ছাদনটির রচনা। মুর্শিদাবাদের মন্দিরটিতে আচ্ছাদনের বহিরেখা দেওয়ালের কোণ হইতে একটু খাড়াভাবে উঠিয়া শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করিতেছে, আচ্ছাদনের আকৃতিও তাই একটু খাড়া।

দেওয়ালের শীর্ষ হইতে যখন আচ্ছাদন গড়িয়া তোলা হইতেছিল দেওয়ালের ঘনত্বের সবটুকু জুড়িয়াই ছিল তাহার প্রারম্ভ। তাহার উপর শেষ হইতে হইল উচ্চতার সংক্ষিপ্তসীমার মধ্যে। আচ্ছাদনের আকৃতি তাই নিম্নাংশের মত স্থূল ও গুরুভার। অতি উচ্চ ভিত্তি অধিষ্ঠানের কথা তো আগেই বলিয়া আসিয়াছি। মন্দিরদেহের মোট উচ্চতার প্রায় এক তৃতীয়াংশের সমান ইহার উচ্চতা। ইহার উপরে গুরুভার মন্দিরটির খর্ব্বদেহ আরও বেশী খর্ব্ব বলিয়া মনে হয়।

মন্দিরদেহ বর্ণনায় এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহাতে রূপকল্পনা ও গঠনকর্মে অনভিজ্ঞতার দ্বিধা ও সঙ্কোচই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। কিন্তু দ্বিধা সঙ্কোচ সত্বেও চারচালা আচ্ছাদনের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা বন্ধন অতিক্রম করিয়া ক্রমশ যে রূপলাভ করিতেছে এই ঘটনাটাই প্রধান হইয়া দেখা দেয়। খর্ব্ব আচ্ছাদনে ও দেওয়ালের অতি ঘনত্বে প্রচণ্ড প্রাণশক্তি যেন ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে। বস্তুতঃ চারচালা মন্দিরদেহ গঠনের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়াই গোকর্ণের নৃসিংহ মন্দির। এই সমস্যার সমাধান ও সম্ভাবনার উপলব্ধিই ভবিষ্যৎ চারচালা মন্দিরের রূপকল্পনার ভিত্তি।

দ্বারপথের উপর উৎকীর্ণ শিলালিপির সাক্ষ্য অনুসারে গোকর্ণের নৃসিংহ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে। পরবর্তীকালে একাধিকবার জীর্ণ সংস্কার হইয়াছে বুঝা যায়, সংযোজনও দু'একক্ষেত্রে হইয়াছে। তত্রাচ মন্দিরটির আদিরূপ যে আজও অপরিবর্তিত এরূপ বিশ্বাস করিবার প্রমাণ বিদ্যমান। নির্ম্মাণকাল সম্পর্কে শিলালেখ যে সাক্ষ্য দিতেছে তাহার সমর্থন মিলিয়ে মন্দিরদেহের বিশেষ করিয়া মুখভাগের অলঙ্করণে, অভ্যন্তরে গর্ভগৃহের বেদী ও অন্তরার আটটি খিলানের পারস্পরিক সংযোগস্থলের নীচে সন্নিবিষ্ট অলঙ্কার সজ্জায় ও মন্দিরদেহ গঠনে বিকাশোন্মুখ রূপকল্পনার মধ্যে।

দেওয়াল ও আচ্ছাদনের আকৃতি ও বিন্যাস সম্পর্কে পালপাড়া ও গোকর্ণের উপলব্ধি একত্র সংহত হইয়া দেখা দিল বীরভূম জেলার ঘুরিষা গ্রামের ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত রঘুনাথ (অধুনা শিব) মন্দিরের গাত্রে। চতুরস্র মন্দিরগৃহে দেওয়াল আচ্ছাদনের সমান উচ্চতা অর্জ্জন করিতে পারে নাই বটে কিন্তু বৈষম্যের পরিমাণ অনেক কম। মন্দিরদেহে দেওয়ালে ও আচ্ছাদনে—ভারসঞ্চয়ের অবকাশও বিশেষ ঘটে নাই।

উচ্চতা অর্জ্জনের প্রয়াস অবশ্য দেওয়ালেই সীমাবদ্ধ। আকৃতির দিক দিক দিয়া আচ্ছাদনটি গোকর্ণ মন্দিরের সমগোত্রীয়। দেওয়াল হইতে হ্রস্ব আচ্ছাদনের চালাগুলিতে উর্দ্ধগতির বেগ অত্যন্ত দ্রুত, অবস্থানও তাহাদের সোজা চালের উপর, চালার দেহে বক্ররেখার বন্ধন শিথিল।

সাম্প্রতিক সংস্কারের কল্পে মন্দিরটির রূপরেখা কিছুটা ব্যহত হইয়াছে সত্য কিন্তু আদিরূপের বিশেষ পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে এরূপ তো মনে হইতেছেনা।

আসন, দেওয়াল ও আচ্ছাদনের আনুপাতিক সম্পর্ক নির্দ্ধারণের প্রচেষ্টায় সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে ও অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকের মন্দিরগুলিতে ভাবকল্পনা ক্রমশ সংহত হইয়া উঠিতেছে। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে নদীয়ারাজ রাঘব রায় দিগনগর গ্রামে রাঘবেশ্বর শিবের উদ্দেশ্যে যে মন্দিরটি উৎসর্গ করেন তাহার চতুরস্র আসনের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা দেওয়ালের উচ্চতা কম, কিন্তু আচ্ছাদনের উচ্চতা দেওয়ালের ঠিক সমান।

আচ্ছাদনের নবলব্ধ উচ্চতাই রাঘবেশ্বর মন্দিরকে চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে। চালাগুলি পূর্ব্বের মত ভিতরের দিকে অতটা ঝুঁকিতেছে না—দেওয়ালের সমান উচ্চতা অর্জ্জনের জন্য পূর্ব্বের তুলনায় আরও অনেকটা খাড়া ভাবে উর্দ্ধগামী। ভিতরে অন্তরা বিন্যাস চারিটি অর্দ্ধবৃত্তাকার খিলানের উপর গম্বুজ বসাইয়া, গম্বুজ হইতে আচ্ছাদনের শীর্ষ বিন্দুতে পৌছিবার বিস্তৃততর দায়িত্বে স্থপতি আচ্ছাদনকে বক্ররেখায় বাঁধিয়া দিতে পারেন নাই, চালার অবস্থানে ঢাল হইয়াছে সোজা। চালার দেহের উপর বক্ররেখা তাই বহিরবঙ্গের বৈচিত্র-বন্ধনও তাহার অনেক শিথিল।

আচ্ছাদনের আকৃতি গঠনে সোজা ঢালের প্রাধান্যের ফলে, পার্শ্বে চালাগুলির সংযোগস্থলে, ফুটিয়া উঠিয়াছে কাঠিন্যের প্রখরতা। কার্ণিস বাহিয়া বক্ররেখার প্রবাহে যে ইঙ্গিত পরিস্ফুট, আচ্ছাদনের রূপকল্পনায় তাহা উপেক্ষিত—দিগনগরের রাঘবেশ্বর মন্দিরে চারচালা আচ্ছাদনের সমগ্রভাবে উপলব্ধি করিতে গিয়া স্থপতি এ বৈষম্য রোধ করিতে পারেন নাই। দেখিয়া মনে হয় দেওয়াল ও আচ্ছাদনের সমানুপাতিক সম্পর্ক গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্য নিয়াই মন্দিরটির সৃষ্টি। আসনও দেওয়ালের মধ্যে সুসমঞ্জস সম্পর্কের অভাবে মন্দির দেহের আকৃতি তাই খর্ব্ব আর বক্র রেখার শিথিল বন্ধনে আচ্ছাদনের ধার বাহিয়া কাঠিন্যের প্রখরতা।

দেওয়ালে আসনের দৈর্ঘ্যসীমা অর্জ্জন করিবার জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হয় নাই। রাঘবেশ্বর মন্দিরের সামান্য দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় সমসাময়িককালে নির্ম্মিত একটি পরিত্যক্ত ভগ্ন শিব মন্দির ও মুর্শিদাবাদ জেলার বড়নগর গ্রামের রামনাথেশ্বর মন্দির উত্তরণের সাক্ষ্যস্বরূপ দণ্ডায়মান, দিগনগরের কালকবলিত দেবালয়টির অতি ভগ্ন দশা। ভিত্তিভূমি হইতে দেওয়ালের নিম্নাংশ ক্ষয়ীভূত আচ্ছাদনের ক্ষয় শুরু হইয়াছে উপর হইতে সমগ্র দেহই তাহার ক্ষতবিক্ষত। তত্রাচ, দেহের বিভিন্ন অঙ্গের দিকে চাহিলে বুঝা যায় চতুরস্র আসনের দৈর্ঘ্য ও দেওয়ালের উচ্চতার সীমা অনুরূপ। ভগ্ন আচ্ছাদনের কল্পিত রেখার উর্দ্ধসীমাও দেওয়ালের সমান হইবে মনে হইতেছে। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত বড়নগরের রামনাথেশ্বরের মন্দিরে অঙ্গবিন্যাস সমানুপাতিক। আচ্ছাদন রাঘবেশ্বর মন্দিরের মতই সোজা চালের উপর, গতিভঙ্গ দ্রুত, বক্ররেখার বন্ধনেও শিথিল।

দিগনগরের ভগ্ন মন্দিরটির আর একটি বৈশিষ্ট্য তাহার ইষৎ স্থূল দেহভার, সামঞ্জস্যপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সামান্য স্থূলতার ভার অনাবশ্যক হইয়া উঠে নাই। দেহভারের মধ্যে সংহত শক্তির নিয়ন্ত্রিত বেগ মন্দিরদেহকে স্থির গাম্ভীর্য্যে মণ্ডিত করিয়া দিয়াছে।

দিগনগর-বড়নগরের রূপকল্পনা অষ্টাদশ শতকে নদীয়া-মুর্শিদাবাদ—বীরভূম অঞ্চলে স্থপতির

মনোহরণ করিয়া নিয়াছিল। অঙ্গবিন্যাসের এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া যে অসংখ্য মন্দির রচিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলির সাক্ষাত মিলিবে নদীয়া জেলার শান্তিপুর সহরের সুবিখ্যাত জলেশ্বর শিব মন্দিরে, বীরভূম জেলায় গণপুর গ্রামের কালীতলার মন্দির-সংস্থানে, মল্লারপুর গ্রামের মল্লেশ্বর মন্দির-সংস্থানে, উচকারণ গ্রামের পঞ্চশিব মন্দিরে, ও নানুর গ্রামে। বিশালাক্ষী মন্দিরের নিকটবর্তী শিবালয়দ্বয়ে। রামনগর গ্রামের রামেশ্বর মন্দিরে ও তাহার নিকটবর্তী দ্বিতীয় শিবমন্দিরে; মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী-রূপপুরের রুদ্রদেব মন্দির সংস্থানে ও কান্দী-বাঘ ডাঙ্গার কালীশ্বর মন্দির সংস্থানের অপ্রধান শিবালয়গুলিতে।

শান্তিপুর সহরের জলেশ্বর শিবের প্রশস্ত আসন ও সম-উচ্চতায় অধিষ্ঠিত উপর্যুপরি দেওয়াল ও আচ্ছাদন সম্বলিত স্থির গম্ভীর মন্দিরটি দিগনগরের দ্বিতীয় মন্দিরের মার্জ্জিত ও উন্নত সংস্করণ। সুউচ্চ আচ্ছাদনটির উর্দ্ধগতিতে দ্রুততার কোন অবকাশ নাই। চালাগুলি প্রথমাবধিই ধীর বক্ররেখায় আবদ্ধ। গতিবেগও তাহাদের মৃদু এবং সংযত। ভিত্তিভূমি হইতে চূড়া পর্য্যন্ত সমগ্র মন্দিরদেহে সংহত কল্পনা সুনির্দিষ্ট ভারসাম্যে ও ললিত গম্ভীর রূপের মধ্যে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।

জলেশ্বর মন্দির ভিন্ন এই শ্রেণীর অন্য দেবালয়গুলি আকারে বৃহৎ নহে উচ্চতাও কম। পরিমিত ও আনুপাতিক সামঞ্জস্যপূর্ণ অঙ্গ বিন্যাসে সর্বোচ্চ মন্দিরদেহে কোথাও ভার সঞ্চয়ের অবকাশ ছিল না। আচ্ছাদনের আকৃতিতে ইহাদের মধ্যে বিভিন্নতা ঘটিয়াছে। কোথাও বা চালাগুলি অতি সামান্য বক্ররেখায় বদ্ধ হইয়া প্রায় সোজা ঢালের সহিত উঠিয়াছে, কোথাও বা আবার আচ্ছাদনের উর্দ্ধগমন ধীর বক্ররেখার কমনীয় গতিভঙ্গ অবলম্বন করিয়া। কয়েকক্ষেত্রে আচ্ছাদন রচনা হইয়াছে সম্পূর্ণ অন্যভাবে। মল্লারপুর গ্রামের মল্লেশ্বর মন্দির সংস্থানের কয়েকটি মন্দিরে ও বীরভূম সদর সহর সিউড়ীর নিকটবর্তী করিধ্যা গ্রামের কয়েকটি মন্দিরে চালা বাঁকিয়াছে অর্দ্ধবৃত্তের গতিপথ অবলম্বন করিয়া। আচ্ছাদনের আকৃতি সুস্পষ্টরূপে বহির্বর্তুল—অনেকটা গম্বুজের মত।

সর্বতোগ্রাহ্য রূপ কল্পনার মধ্যে থাকিয়া আচ্ছাদনের আকৃতি রচনায় উচকারণ গ্রামের পঞ্চশিব মন্দিরে স্থপতি সৌন্দর্য্যবোধের যে পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন আলোচ্যশ্রেণীর অন্য কোন দৃষ্টান্তে তাহার তুলনা মেলা ভার। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে নির্মিত মন্দিরশ্রেণী প্রায় অক্ষত অবস্থায় বিদ্যমান। প্রলম্ব নিম্নাংশের উপর দীর্ঘায়ত আচ্ছাদনের লঘুভার চালা চারিটি প্রথমাবধিই মৃদু বক্ররেখার ধীর গতি বাহিয়া উঠিয়া চলিয়াছে! শেষ অবধি কোথাও ছন্দোভঙ্গ ঘটে নাই। বক্ররেখার মৃদুগতি তাহার স্বাভাবিক পরিণতির মধ্যেই বিকশিত, স্থপতির ইচ্ছা বা প্রয়োজনের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য নিয়ন্ত্রিত নহে। সাবলীল কমনীয় বক্ররেখায় বিধৃত আচ্ছাদনের স্বচ্ছন্দ গতিভঙ্গ স্বল্পোচ্চ মন্দিরগুলির দীর্ঘায়ত কৃশদেহে আনিয়া দিয়াছে সজীব প্রাণসম্পদ ও তাহার অপরূপ লাবণ্যশ্রী।

এতক্ষণ যে মন্দিরগুলির কথা বলিতেছিলাম তাহাদেরই সমসাময়িককালে ঐ একই দেশখণ্ডে চারচালা মন্দির দেহের একটি স্বতন্ত্র রূপকল্পনা গড়িয়া উঠিতেছিল। এই ধারার একটি প্রাচীনতম

নিদর্শনের ভগ্নাবশেষ শান্তিপুর সহরের নিকটবর্তী বাঘ আঁচড়া গ্রামের শিবালয়টি। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে চাঁদ রায় মন্দিরটি নির্মাণ করিয়াছিলেন। স্থপয়িতার নাম অনুসারে চাঁদ রায়ের মন্দির বলিয়া ইহার পরিচয়। চতুরস্র মন্দিরটির দেওয়াল আসনের দৈর্ঘ্য সীমা অতিক্রম করিয়া আরও খানিকটা উচ্চ। আচ্ছাদনটি সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ। যেটুকু বাঁচিয়া গিয়াছে তাহাদের আচ্ছাদনের প্রকৃত উচ্চতা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে না, তবে একটা কল্পিত বহিরেখা টানিলে দেখা যাইবে দেওয়াল হইতে উচ্চতা তাহার কমই। বীরভূমের প্রান্তবর্তী সাঁওতাল পরগণা জেলার মলুটি গ্রামের মৌলিখ্যা দেবীর মন্দির প্রাঙ্গনস্থ ভৈরব মন্দিরের অঙ্গবিন্যাসে রূপকল্পনার এই ধারাটি সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত। মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছিল ১৭:৯ খৃষ্টাব্দে। বর্তমানে চূড়াভাগ ছাড়া মন্দিরটির অন্য সব অঙ্গই বিদ্যমান। এখানে দেখিতেছি আচ্ছাদন দেওয়াল অপেক্ষা সামান্য ছোট তবে অনুমানে বোধ হইতেছে চূড়াসহ আচ্ছাদন দেওয়ালের সমান করিয়াই গঠিত হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতকে অঙ্গবিন্যাসের এই পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছিল মুর্শিদাবাদ জেলার যুগসরা গ্রামের যজ্ঞেশ্বর মন্দির সংস্থানে, বীরভূম জেলার গণপুর গ্রামে কালীতলার পশ্চিম পার্শ্ববর্তী পঞ্চশিব মন্দিরে, সজিনা গ্রামের লক্ষ্মী জনার্দন মন্দির সংস্থানে, মেদিনীপুর জেলার দরিয়াপুর গ্রামের জয়চণ্ডী মন্দিরে ও মলুটি গ্রামের কতকগুলি মন্দিরে। এই পদ্ধতিরই একটি রূপভেদে আসন অপেক্ষা দেওয়াল বড় কিন্তু চূড়াসহ আচ্ছাদন আসনের সমান। বীরভূম জেলার সজিনা গ্রামের উপরিউক্ত সংস্থানের একটি মন্দিরে, জুবুটিয়া গ্রামের জপেশ্বর মন্দির সংস্থানে, দুবরাজপুর গ্রামে নায়েক পরিবার নির্মিত উনবিংশ শতকীয় একটি মন্দিরে, বর্দ্ধমান জেলার দাঁইহাট-বউসিন গ্রাম অঞ্চলের মহাদেব মন্দিরে ও মলুটি গ্রামের একশ্রেণীর মন্দিরে এই রূপভেদের দৃষ্টান্ত মিলিবে।

চাঁদরায় মন্দিরের ধারায় বীরভূম-মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে অসংখ্য মন্দির নির্মিত হইয়াছে বটে কিন্তু এই ধারার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা হইয়াছিল মলুটি গ্রামে। শুধু এই বিশিষ্ট ধারার প্রশ্নে নহে, চারচালা মন্দির নির্মাণের ইতিহাসে মলুটির মন্দির নির্মাণ প্রচেষ্টা একটি সম্পূর্ণ নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। মলুটির ইতিবৃত্ত তাই একটু বিস্তারিত করিয়া বলা প্রয়োজন।

মলুটির চারচালা মন্দিরের প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত বোধ হয় ১৭১৯ খৃষ্টাব্দের মৌলিখ্যা দেবীর ভৈরবের মন্দিরটি। ইহার অঙ্গবিন্যাসের কথা আর তুলিব না, একটু আগেই বলিয়া আসিয়াছি। বাঁকান আচ্ছাদনে চালার আকৃতি ও তাহার উপর বক্ররেখার গতিভঙ্গ শান্তিপুরের জলেশ্বর মন্দিরের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। অঙ্গবিন্যাসে পার্থক্য থাকিলেও আচ্ছাদনের রূপরেখায় সমগোত্রীয়তার ফলে পরিণাম প্রভাব হইয়া উঠিয়াছে একান্ত অনুরূপ।

ভৈরব মন্দিরের পরবর্তী কালে মলুটি গ্রামে অসংখ্য দেবালয় নির্মিত হইয়াছিল। অধিকাংশেরই গঠন চারচালা রীতি অনুসারে এবং ভাবকল্পনার পরিণত রূপকে অবলম্বন করিয়া। মন্দিরগুলির আসন চতুরস্র। বাহিরে আসনের ধার ঘিরিয়া প্রত্যেকদিকে দুইটি করিয়া বৃথাস্তম্ভ দেওয়াল বাহিয়া আচ্ছাদনের পাদমূল পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। দীর্ঘায়ত এবং লঘুভার দেহে আসনের দৈর্ঘ্যসীমা অতিক্রম করিয়া দেওয়ালের উচ্চতার বিস্তার। ইহার উপরে আচ্ছাদন।

আচ্ছাদনের রূপরেখা অনুসারে মলুটির পরিণত পর্য্যায়ের চারচালা মন্দিরগুলিকে দুইটি পৃথক

শ্রেণীতে ভাগ করিয়া ফেলা সম্ভব। একশ্রেণীর মন্দিরে আচ্ছাদন আসন অপেক্ষা কিছুটা হ্রস্ব কিন্তু চূড়া যোগ করিলে পার্থক্য থাকে না। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশেষত্ব দেখা যায় চূড়াসহ আচ্ছাদন ও দেওয়ালের অনুরূপ উচ্চতার মধ্যে। এ রূপভেদ যে মলুটির নিজস্ব নহে,—চারচালা আকৃতির স্বাভাবিক পরিণতির একটি পর্য্যায়, এ ইঙ্গিত তো একটু আগেই দিয়া আসিয়াছি। প্রথম শ্রেণী আচ্ছাদনে চালার অবস্থান খানিকটা সোজা ঢালের উপর, অগ্রগতিও কেন্দ্রের দিকে বেশ কিছুটা ঝুঁকিয়া। চালার অগ্রগতিতে দ্রুততা সত্ত্বেও বক্ররেখার বন্ধন কিন্তু দিগনগরের রাঘবেশ্বর মন্দিরের মত অতটা শিথিল নহে। অপেক্ষাকৃত সোজা ঢালের উপরেই আচ্ছাদনের বহিরেখা বাঁকান তবে সংক্ষিপ্ত উচ্চতার মধ্যে বক্ররেখার গতি হইয়া উঠিয়াছে দ্রুত।

দ্বিতীয় শ্রেণীর আচ্ছাদনেই রূপকল্পনা পরিপূর্ণ সংহত আকার লাভ করিয়াছে। আচ্ছাদনের দীর্ঘায়ত দেহে চালাগুলি প্রথমাবধিই কমনীয় বক্ররেখা রচনা করিয়া ধীরে ক্রমশ ভিতরের দিকে ঝুঁকিয়া উর্দ্ধ গতিপথে শীর্ষ বিন্দুর দিকে আগাইয়া যাইতেছে। প্রথম শ্রেণীর আচ্ছাদনে বক্ররেখা সত্ত্বেও সংক্ষিপ্ত আয়তনের মধ্যে অনেকটা সোজা ঢালের উপর গঠন বলিয়া তাহার খর্বতার মধ্যে কাঠিন্যের অবশেষ থাকিয়াই যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর আচ্ছাচ্ছনে অস্বাচ্ছন্দ্যের আর কোন অবকাশ নাই। দীর্ঘায়ত নিম্নাংশের উপর কমনীয় বক্ররেখায় বিধৃত সুউচ্চ লঘুভার আচ্ছাদন চারচালা রূপকল্পনায় চূড়ান্ত উৎকর্ষের পরিচায়ক।

মলুটির পরিণত পর্য্যায়ে আচ্ছাদনে রূপবৈচিত্র সৃষ্টির পদ্ধতিটিও অভিনব। চালা মন্দিরের আচ্ছাদন থাকে সাধারণতঃ টানা পলস্তারায় আবৃত। গাত্রেও তাহার বক্রতা ভিন্ন অন্যকোন বৈচিত্র থাকে না। মলুটির ভৈরব মন্দিরের আচ্ছাদন এই প্রকারের। পরবর্ত্তীকালে মলুটির স্থপতিরা চিরাচরিত পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া আচ্ছাদনের গাত্র অনাবৃত রাখিয়া দিতেন। কার্টনি ছাড়িয়া অনাবৃত ইটের সারি উপর্য্যুপরি উঠিয়া গিয়াছে দেখা যায়। প্রতিটি চালার উপরে আবার শিখর মন্দিরের মত পগপ্রবাহের সারি। অর্থাৎ, সমগ্র চালাটিকে পাঁচটি, সাতটি বা নয়টি লম্বমান অংশে ভাগ করিয়া ফেলা। লম্বমান অংশগুলি দুইদিক হইতে উপর্য্যুপরি ভাবে স্তরে স্তরে উঠিয়া গিয়াছে, ঠিক মধ্যস্থলে রহিয়াছে কেন্দ্রীয় অংশটি শিখর মন্দিরের রাহাপগ। অংশগুলির বিন্যাস পগপ্রবাহের মত হইলেও লঘুভার মন্দিরদেহে ঘনত্ব ইহাদের খুবই কম। নিরাবরণ আচ্ছাদনের উপরে আনুভূমিক ও লম্বমান স্তরভাগ আলোছায়ার সুস্পষ্ট বৈপরীত্য সৃষ্টি করিয়া মন্দিরদেহে রূপময় করিয়া তুলে—বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর কমনীয় বক্ররেখায় বিধৃত লঘুভার দীর্ঘায়ত আচ্ছাদনে নিরাবরণ দেহের প্রতিটি রেখায় সৃজনশীল কল্পনার ঐশ্বর্য্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে।

মলুটির রূপকল্পনা চারচালা মন্দিরের চূড়ান্ত উৎকর্ষের সৃষ্টি হইলেও গ্রাম সীমার বাহিরে কিন্তু তাহার প্রভাব বিস্তার লাভ করে নাই বলিলেই হয়। মলুটির অদূরবর্ত্তী গণপুর গ্রামে কালী মন্দিরের পশ্চিমে পঞ্চশিব মন্দিরের মধ্য স্থলবর্ত্তী মন্দিরটির আচ্ছাদন মলুটির দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুকরণে নির্মিত। মলুটির বাহিরে মলুটি পদ্ধতির ইহাই একমাত্র নিদর্শন।

মলুটির বাহিরে আসনের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা উচ্চতর দেওয়ালের উপর আচ্ছাদনের রূপভেদ ঘটিবার একটি প্রধান কারণ গম্বুজের প্রভাব। মেদিনীপুর জেলার দরিয়াপুর গ্রামের জয়চণ্ডী মন্দিরে

আচ্ছাদনের মোট উচ্চতা দেওয়াল অপেক্ষা সামান্য কম হইলেও চালাগুলি গম্বুজের মত গোলাকৃতিতে গঠিত ; শীর্ষ বিন্দুতে পৌঁছিবার জন্য অন্যান্যক্ষেত্রে সামান্য একটু উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। বীরভূম জেলার সজিনা গ্রামের লক্ষ্মী জনার্দন মন্দির সংস্থানে ও জুবুটিয়া গ্রামের জপেশ্বর মন্দিরে গম্বুজের আকৃতির প্রতি প্রবণতা সত্ত্বেও আচ্ছাদন দরিয়াপুর মন্দিরের তুলনায় দীর্ঘায়ত করিয়া গড়া। দুবরাজপুর গ্রামের নায়েক পরিবার কর্তৃক নির্মিত চারচালা শিব মন্দিরটিতেও আচ্ছাদন এই রূপ রেখায় বিধৃত। উনবিংশ শতকীয় মন্দিরটিতে অবশ্য অঙ্গবিন্যাস পৃথকভাবে পরিকল্পিত। ইহার দেওয়াল আসন অপেক্ষা উচ্চ কিন্তু আচ্ছাদনের উচ্চতা আসনের দৈর্ঘ্যসীমার অনেক কম।

মহামহোপাধ্যায় রামাবতার শর্মা

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

বিহার রাজ্যের সারণ জেলার ছাপরা সহরে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চ রামাবতার শর্মা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা দেবনারায়ণ পাণ্ডে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ভাগবত ও রামায়ণ ব্যাখ্যা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। বাল্যকালে পিতা দেবনারায়ণ ও ছাপরা সরকারী বিদ্যালয়ের সংস্কৃত শিক্ষক পণ্ডিত রামদৌর ওঝার নিকট শিক্ষালাভ করিয়া বারবৎসর বয়সেই রামাবতার ভট্টোজি দীক্ষিতের দুরূহ ব্যাকরণ গ্রন্থ "সিদ্ধান্ত-কৌমুদী" আয়ত্ত করেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে রামাবতার বিহারের বাঁকীপুর কেন্দ্র হইতে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্যের প্রথম পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী বৃত্তি লাভ করেন। অধিকতর সংস্কৃত শিক্ষা লাভের আশায় ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে রামাবতার কাশীর কুইন্স কলেজে প্রবিষ্ট হন ও দেশবিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় গঙ্গাধর শাস্ত্রীর নিকট সংস্কৃত শিক্ষা গ্রহণ করিতে থাকেন। অল্পদিনের মধ্যেই কুশাগ্রবুদ্ধি রামাবতার গঙ্গাধরের বিশেষ প্রিয় পাত্রে পরিণত হন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি কুইন্স কলেজ হইতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া দুরূহ "সাহিত্যাচার্য" উপাধি লাভ করেন। রামাবতার যখন বারাণসী পড়িতে আসেন তখন তাঁহার ইংরাজী জ্ঞান অতি অল্প ছিল। কুইন্স কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ ভেনিসের প্রেরণায় তিনি ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিয়া ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী রূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইতিপূর্বে তিনি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় সংস্কৃত পরিষদের "কাব্যতীর্থ" পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এণ্ট্রান্স্ পাশের পর রামাবতারের পিতৃ-বিয়োগ হয়। তিনি পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। বিশাল পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব স্কন্ধে আসিয়া পড়ায় রামাবতার ছাপরা স্কুলে সংস্কৃত শিক্ষকের পদে কার্য আরম্ভ করেন। শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাশীর "সাহিত্যাচার্য" ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর জন্য অধ্যয়ন করিতে থাকেন। ইতিমধ্যেই একজন কৃতবিদ্য সংস্কৃত পণ্ডিতরূপে বিশেষতঃ বিহার ও কাশীর পণ্ডিতদের মধ্যে তাঁহার নাম ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে রামাবতার প্রথম শ্রেণীতে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের "ফার্ষ্ট আর্টস" (এফ, এ,) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃত অনার্স সহ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ছাপরা স্কুলের শিক্ষক অবস্থাতেই প্রাইভেট পরীক্ষার্থীরূপে রামাবতার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত এম, এ, পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে রামাবতার কাশী সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি পাটনা কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। দুই বৎসর পর কলেজ কর্তৃপক্ষের সহিত মতভেদ হওয়ায় আত্ম-সম্মান রক্ষার্থে রামাবতার পদত্যাগ করেন। এই সময় তিনি সুহৃদ্বর্গকে বুঝাইতেছেন যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আত্মসম্মান ক্ষুণ্ন করিয়া চাকুরী করেন নাই, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের পক্ষে কিরূপে আত্মমর্যাদা রক্ষা করা উচিত তাহার আদর্শ তিনি বিদ্যাসাগরের

মধ্যেই পাইয়াছেন! চাকুরীহীন অবস্থায় তিনি পিতার মত ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়া কোনরূপে জীবিকা নির্বাহ করেন। এই সময়ে রামাবতারকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় "শ্রীগোপাল বসু মল্লিক,' বক্তৃতা দিতে আহ্বান করেন। বসুমল্লিক বক্তারূপে রামাবতারের বেদান্ত বিষয়ক বক্তৃতাবলী বেদান্ত দর্শনের গবেষণা রূপে বিশেষ আদৃত হয়। এই বক্তৃতামালা কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হয় (১)। "শ্রীগোপাল বসুমল্লিক" অধ্যাপক হওয়ার সৌভাগ্য বিশিষ্ট পণ্ডিতেরাই অর্জন করেন।

পাটনা সরকারী কলেজের কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে রামাবতারের ন্যায় কৃতী ও নিপুণ অধ্যাপক সন্ধানে ব্যর্থ হইয়া পুনরায় তাঁহাকে কলেজে যথাযোগ্য মর্যাদাসহকারে পুনর্নিযুক্ত করেন। জীবনান্ত পর্যন্ত রামাবতার অতঃপর এই কলেজের সহিত যুক্ত ছিলেন। মধ্যে তিন বৎসরের জন্য (১৯১৯-২২) বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মহামনা পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয়ের নির্বন্ধাতিশয্যে তিনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য-বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদে কার্য করেন। পণ্ডিত মদনমোহনের অনুরোধে বিহার সরকার রামাবতারকে তিন বৎসরের জন্য কাশীতে অধ্যাপনার অনুমতি দেন। তিন বৎসর পর বিহারের সরকারী শিক্ষা বিভাগ রামাবতারের ন্যায় মহাপণ্ডিত অধ্যাপককে আর বাহিরে রাখিতে সম্মত হন নাই। এই জন্য তাঁহাকে কাশী ত্যাগ করিয়া পুনরায় পাটনা কলেজে প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপকের পদে যোগদান করিতে হয়। শৈশব হইতে সংস্কৃত অধ্যয়নে অভ্যস্ত রামাবতার সংস্কৃতের সকল বিভাগেই এমন কি আয়ুর্বেদ ও জ্যোতিষেও প্রগাঢ় জ্ঞান অর্জন করেন। সমসাময়িক কালে এই জন্য তিনি পণ্ডিত সমাজে সর্বশাস্ত্রবিশারদরূপে খ্যাতি-লাভ করেন। সংস্কৃত ভাষায় তিনি অনেকগুলি মৌলিক নাট, খণ্ডকবিতা, কাব্য ও প্রবন্ধ রচনা করেন। বারাণসীতে অবস্থান কালে তিনি "মিত্র-গোষ্ঠী" নামে একটি সংস্কৃত পত্রিকা সম্পাদন ও পরিচালনা করেন (১৯০৪-৬)। সংস্কৃতকে "মৃতভাষা" জ্ঞান করিয়া সংস্কৃত চর্চায় দেশবাসির অনীহা তাঁহার বিশেষ ক্ষোভের বিষয় ছিল। এই জন্য তিনি সরকারী শিক্ষা-নীতির সমালোচনা করিতেও পশ্চাপদ হন নাই। ভারতবর্ষের জাতীয় সংহতির জন্য সংস্কৃতভাষার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি "মিত্রগোষ্ঠী" পত্রিকায় ও অন্যান্য স্থানে প্রচার করিতেন। "মিত্রগোষ্ঠী" পত্রিকায় রামাবতার "পরমার্থ দর্শন" আখ্যায় কতকগুলি ধারাবাহিক প্রবন্ধ সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশ করেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে এই নামে তিনি একটি সম্পূর্ণ পুস্তক প্রকাশ করেন (২)। প্রকাশের পর বিষয়বস্তু ও চিন্তা-শীলতার ভূয়িষ্ঠ নিদর্শন রূপে এই পুস্তকটি হিন্দু ষড়্দর্শনের পর আর একটি দর্শন বা সপ্তম দর্শনরূপে অভিহিত হয়। নানাবিধ দার্শনিক আলোচনা ও যুক্তিতর্ক দ্বারা রামাবতার এই গ্রন্থে ইহাই প্রতিপন্ন করেন যে মানুষ নিজের চেষ্টায় নিজেকে ঈশ্বরত্বে উপনীত করিতে পারে, প্রার্থনা প্রভৃতি দ্বারা তাহার ঈশ্বরের দাসত্ব করিবার কোন প্রয়োজন নাই। প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের বিরোধী চিন্তার জন্য অনেকে রামাবতারকে ঈশ্বর বিরোধী নাস্তিকরূপে গণ্য করেন। সে যাহাই হউক— ভারতের দার্শনিক চিন্তায় "পরমার্থ-দর্শন" একটি উল্লেখযোগ্য দুঃসাহসী পদক্ষেপ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। বর্তমান শতকের সংস্কৃতজ্ঞদের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে শাস্ত্র-বিরোধী বৈপ্লবিক চিন্তাধারা প্রচার দ্বারা রামাবতার খ্যাতি ও অখ্যাতি সমানভাবেই অর্জন করেন।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে রামাবতারের আর একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ "ভারতীয়মিতিবৃত্তম" প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে সুপ্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষের ইতিহাস সংস্কৃত পদ্যাকারে বিবৃত হইয়াছে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির "বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা" (২১৭ সংখ্যক) গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হইয়া "সদুক্তি—কর্ণামৃত" গ্রন্থটি রামাবতার কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হয় (৪)। গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ্ বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাস তাঁহার সময়ে প্রচলিত বিভিন্ন কাব্য হইতে উৎকৃষ্ট শ্লোকগুলি নির্বাচিত করিয়া এইগুলি "সদুক্তি কর্ণামৃত" নামে সঙ্কলন করেন। ইতিপূর্বে বাঙালীর কীর্তি এই অপূর্ব সঙ্কলন গ্রন্থটি মুদ্রাঙ্কিত হয় নাই। এই ঐতিহাসিক সুভাষিত সঙ্কলন সম্পাদন করিতে রামাবতারের ন্যায় সর্বশাস্ত্র বিশারদ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সহযোগিতা এশিয়াটিক সোসাইটির কর্ণধারগণ অপরিহার্য বোধ করিয়া তাঁহাকেই এই দুরূহ কার্যের ভারার্পণ করেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে রামাবতার পালিভাষায় লিখিত অশোকের অনুশাসনগুলি টিকা, টিপ্পনী, ইংরাজী ও সংস্কৃত অনুবাদ সহ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। ইতিপূর্বে অশোক অনুশাসনের যে অংশগুলি দুর্বোধ্য ছিল, সংস্কৃত অনুবাদ দ্বারা তাহাদের মর্ম সুগম করিয়া দিয়া রামাবতার ঐতিহাসিকদের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা অর্জন করেন (৫)।

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার অবসরে ১৯১১ খৃষ্টাব্দ হইতে জীবনের শেষ অবস্থা পর্যন্ত রামাবতার বর্ণানুক্রমে একটি সংস্কৃত শ্লোকবদ্ধ বিশ্বকোষ "বাঙ্ময় মহার্ণব" রচনার কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেন। "বাঙ্ময় মহার্ণবের" "ম" পর্যন্ত রচনার পর রামাবতার অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় এই পুস্তকটি পরিকল্পিত সম্পূর্ণ রূপ গ্রহণ করিতে পারে নাই। তবে যে দুই তৃতীয়াংশ ভাগ সম্পূর্ণ হইয়াছে, তাহা অভিনব। বিহার রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগ এই বিশ্বকোষটি প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন বলিয়া জানা যায়। কেশব নামে এক প্রাচীন পণ্ডিত-রচিত কল্পদ্রু কোষঃ নামে একটি প্রাচীন কোষগ্রন্থও রামাবতারের সম্পাদনায় সংস্কৃত ভাষায় কোষগ্রন্থ সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ ভূমিকা সহ প্রকাশিত হয় (৬)।

রামাবতারের অপ্রকাশিত সংস্কৃত রচনাগুলি সম্প্রতি দ্বারভাঙ্গাস্থিত মিথিলা রিসার্চ ইনষ্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত হইতেছে। এই রচনাবলীর প্রথম খণ্ডটি ইতিমধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে, আরও কয়েকটি খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার কথা আছে (৭)।

রামাবতার হিন্দী ভাষায়ও একজন সুলেখক ছিলেন। সরস্বতী প্রভৃতি বহু হিন্দী সাময়িক পত্রে তাঁহার অসংখ্য রচনা প্রকাশিত হয়। বিহার রাষ্ট্রভাষা পরিষদ হইতে রামাবতারের হিন্দী রচনা সঙ্কলনের একটি খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে (৮)। হিন্দী ভাষায় রামাবতার ইউরোপীয় দর্শন সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ রচনা করেন, কাশী নাগরী প্রচারিণী সভা কর্তৃক প্রকাশিত এই গ্রন্থটি হিন্দী ভাষীদের নিকট বিশেষ আদৃত হয় (৯)। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে রামাবতার জব্বলপুরে অনুষ্ঠিত অখিল ভারতীয় হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির পদে বৃত হইয়াছিলেন।

সংস্কৃতজ্ঞ ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইলেও রামাবতার সামাজিক সুবিচার ও সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি অখিল ভারতীয় সমাজ সুধার সম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সহিত ও রামাবতারের যোগাযোগ ছিল। ঐতিহাসিক গবেষণাতেও রামাবতারের বিশেষ উৎসাহ ছিল। বিহার ওড়িশা রিসার্চ সোসাইটি সংগঠনে রামাবতার সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও ব্যবহারজীবী কাশীপ্রসাদ জয়শোয়ালের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। এই সোসাইটির জন্য তিনি বহু সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া দেন। এই সোসাইটির পত্রিকায় তাঁহার লিখিত গবেষণা মূলক প্রবন্ধগুলির মধ্যে "সংস্কৃত অভিধান" ও "সংস্কৃত ভাষার সুভাষিত সংগ্রহ" বিষয়ক প্রবন্ধ দুইটির নাম উল্লেখযোগ্য (J. B. O. R. S—1923, 1929)। কাশীপ্রসাদ জয়শোয়াল একজন তথ্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিক ও ধীমান আইনজীবী ছিলেন, উচ্ছ্বাস প্রবণতা তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। রামাবতারের অনন্য সাধারণ পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন যে পণ্ডিতজীর সান্নিধ্যে আসিলে মনে হয় যেন এই ব্যক্তি একাধারে কপিল, কণাদ, শঙ্কর, কালিদাস, শ্রীহর্ষ ও জগন্নাথ। রামাবতারের মধ্যে প্রাচীন ভারতের দার্শনিক ও কবিকুলের গুণাবলীর বিস্ময়কর সমাবেশ দেখিয়াই জয়শোয়াল রামাবতারের দেহান্তের পর উপরিউক্ত মন্তব্য করেন। পরিণত বয়স পর্যন্ত রামাবতারের অদম্য পাঠস্পৃহা ছিল। নিজের চেষ্টায় তিনি জার্মান, ল্যাটিন ও ফরাসী ভাষা আয়ত্ত করেন, বৈদেশিক পণ্ডিতেরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে এই সব ভাষায় তাঁহার দক্ষতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। জীবদ্দশায় রামাবতার পাটনা শহরের অন্যতম দ্রষ্টব্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা ও হৃদ্য ব্যবহার বিদগ্ধজনকে বিশেষ আকৃষ্ট করিত।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের প্রথমে ভারত-সরকার রামাবতারকে "মহামহোপাধ্যায়" উপাধিতে ভূষিত করেন। বয়োজ্যেষ্ঠ ও উপযুক্ত পণ্ডিতদের এই উপাধিতে ভূষিত না করিলে তিনি এই উপাধি গ্রহণ করিবেন না, গভর্ণমেণ্টকে ইতিপূর্বে এই সঙ্কল্প জ্ঞাপন করাতে এই উপাধি তিনি বহু বিলম্বে প্রাপ্ত হন। দীর্ঘকাল সরকারী শিক্ষা বিভাগের ক্ষমতা সম্পন্ন কর্মচারী রূপে রামাবতার বিহার প্রদেশে শিক্ষা ব্যবস্থা বিশেষতঃ সংস্কৃত শিক্ষার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। শিক্ষাবিদ্‌রূপে তিনি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মাতৃভাষায় শিক্ষা দানের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। জ্ঞান সাধনায় ছাত্রদিগকে উৎসাহ দান তাঁহার বৈশিষ্ট্য ছিল। বহু ছাত্রকে তিনি নানাভাবে সাহায্য করিতেন। নিপুণ অধ্যাপনা ও গবেষণায় উৎসাহ প্রদান করতঃ তিনি বিহার প্রদেশে অনেকগুলি কৃতী পণ্ডিতের সৃষ্টি করেন। তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে পাটনা কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক ডঃ তারাপদ চৌধুরীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি বৈদিক গবেষণাদ্বারা দেশে বিদেশে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। সম্প্রতি ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছে।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল পাটনায় রামাবতার শর্মা পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার তিনটি পুত্র ও চারিটি কন্যা বিদ্যমান ছিল। মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব পর্যন্ত তিনি যথারীতি পাটনা কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপনায় রত ছিলেন। গুরুতররূপে পীড়িত হইয়া পড়ায় আত্মীয়-বন্ধুদের অনুরোধে তিনি বাধ্য হইয়া কিছু দিনের ছুটি লইয়াছিলন। রামাবতারের মৃত্যুতে তাঁহার অসংখ্য অনুরাগী ভক্ত শিষ্যদের মধ্যে একজন লিখিয়াছিলেন—

রামাবতারের মৃত্যুতে স্বয়ং সরস্বতী মূর্ছিতা হইয়াছেন—

"ভারতস্য না ভা ভাতি বিহারো হারবর্জিতঃ
রামাবতারে স্বর্যাতে মূর্চ্ছিতৈব সরস্বতী।"

(১) Vedantism—Calcutta university, 1909

( ) পরমার্থ 1913

(৩) ভারতীয়মিতিবৃত্তম্ 1913

(৪) সদুক্তি কর্ণামৃতম্—Asiatie Society, Calcutta, 1912,

(৫) প্রিয়দর্শী প্রশস্তয়ঃ Muradpur (Eng & Sansk, Ts), 19:5

(৬) কল্পদ্রু কোষঃ (Gaikwad Oriental Series), Baroda, 1928-32

(৭) প্রকীর্ণা প্রবন্ধাঃ—(১) ভারত-গীতিকা (২) মুদ্গার দূতম্ (৩) ঘোর নৈষধম্ (৪) সাহিত্য-রত্নাবলী (৫) কলা-কৌমুদী (৬) ভাষাতত্ত্বম্ (৭) সরস্বত্যষ্টকম্ (৮) অভিনব ভারতম (৯) প্রাচীন কবি বিষয়কানি পদ্যানি—মিথিলা বিদ্যাপীঠ, দ্বারভাঙ্গা, ১৯৫৬

(৮) শ্রীরামাবতার শর্মা নিবন্ধাবলী—বিহার রাষ্ট্রভাষা পরিষদ্, পাটনা, ১৯৫৪

(৯) ইউরোপীয় দর্শন (হিন্দী)—১৯১৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৫২

বঙ্কিম উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা

অশোক কুণ্ডু

[বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্র ও চরিনামের আলোচনা বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়েছে। প্রত্যেকটি নামের প্রথম উপস্থিতি প্রথম বন্ধনীর মধ্যে নির্দেশিত হয়েছে। বোঝার সুবিধার জন্য প্রথম কয়েকটিতে বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া আছে, পরেরগুলিতে সংক্ষেপ করা হয়েছে।]

কুমুদিনী (ইন্দিরা: ৬ষ্ঠ পরিঃ) ॥

রাঁধুনী থাকাকালীন ইন্দিরার ছদ্মনাম। (দ্রঃ ইন্দিরা)

কুন্দনন্দিনী (বিষ: ২য় পরিঃ) ॥

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে কুন্দনন্দিনী চরিত্র গীতি কবিতার মূর্ছনা এনে দিয়েছে। এই শান্ত-স্নিগ্ধ দুঃখী চরিত্রটি উপন্যাস মধ্যে বেশির ভাগই নিষ্ক্রিয় থেকে গেছে। অথচ তাকে কেন্দ্র করেই কাহিনীর জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই অনাঘ্রাত কুন্দ কুসুমটি গ্রামের নির্জনপ্রান্তে বৃদ্ধপিতায় সান্নিধ্যে একাকিনী বেড়ে উঠেছিল। উঠেছিল বলেই বোধহয় তার চরিত্র ও ব্যবহার এত শান্ত। তাছাড়া একে একে বহু প্রিয়জনের মৃত্যুও তাকে বেদনা বিদ্ধ করে তুলেছে। তার আচার-আচরণের মধ্যেও বিষণ্ণতার ছাপ পড়েছে।

নগেন্দ্রকে কুন্দ প্রথমে উপকারী দেবতা রূপেই দেখেছিল। তখন তার যা বয়স তাতে প্রেম জাগ্রত হওয়ার কোন সুযোগ হয়ত ছিল না। তারপর তারাচরণের সংগে তার বিয়ে হয়ে গেল। কুন্দনন্দিনী তারাচরণের সংগে ঘর করেছিল তিনবছর। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কখনো কুন্দনন্দিনীকে তারাচরণের এতটুকু স্মৃতিচারণ করতে দেখা যায় নি। তবে কি—বিবাহের পূর্ব থেকেই কুন্দ মনে মনে হৃদয়েশ্বর করে ফেলেছিল? এক জায়গায় অবশ্য বংকিম বলেছেন—"বিবাহের অগ্রে (নগেন্দ্রের সংগে), বাল্যকালাবোধ কুন্দ নগেন্দ্রকে ভালবাসিয়াছিল—কাহাকে বলে নাই, কেহ জানিতে পারে নাই। নগেন্দ্রকে পাইবার কোন বাসনা করে নাই—আশাও করে নাই, আপনার নৈরাশ্য আপনি সহ্য করিত।" (৪২ পরিঃ)।

কুন্দ অকৃতজ্ঞ নয়। সূর্যমুখীর সর্বনাশ সে করতে চায় না। তাই তার হৃদয় বিদীর্ণ হলেও কমলমণির সংগে সে কোলকাতা চলে যেতে স্বীকৃত হয়েছে। তারপর বাগানে নগেন্দ্রের স্পর্শে কুন্দর জীবন সফল হলেও সে নগেন্দ্রের বিবাহ প্রস্তাবে কোনক্রমে 'না' বলেছে। নগেন্দ্রের সংগে বিয়ে হবার ব্যাপারে কুন্দ অপেক্ষা সূর্যমুখীর সক্রিয়তাই অধিক।

কুন্দনন্দিনী সরলা হলেও, দুঃখের অভিঘাতে তার জীবনের অনেক শিক্ষা হয়েছে। বিবাহের পরই সে বুঝেছে—এ বিবাহ সুখের হবে না। সূর্যমুখীর গৃহত্যাগের পর তার প্রতি

নগেন্দ্রের অবহেলা অনেক বেড়েছে। অবশেষে নগেন্দ্রও গৃহত্যাগ করল। কিন্তু ঝি-চাকরদের অবহেলা সহ্য করেও কুন্দ স্বামীগৃহ আঁকড়ে পড়ে রইল। স্বামীর প্রতি তার এতই অনুরাগ যে, স্বামী তাকে চিঠি না লিখলেও, নায়েবকে দেওয়া চিঠি এনে নিজের কাছে রেখে দিত।

নগেন্দ্র-সূর্যমুখী ফিরে এলে দত্ত বাড়ীর আনন্দ মুখরতার অন্তরালে নিঃশব্দে বিষপানে কুন্দনন্দিনী মৃত্যুবরণ করল। মৃত্যুকালে কুন্দ মুখরা হয়ে উঠেছিল। স্বামীর প্রতি অকুণ্ঠ ভালবাসা নিয়ে সে প্রাণত্যাগ করেছে।

কুন্দ চরিত্র পরিকল্পনায় দু'টি অলৌকিক স্বপ্নকে কাজে লাগানো হয়েছে। কুন্দের মাতার প্রথম আবির্ভাব ও দু'টি মূর্তি দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে দূরে থাকার উপদেশ দানের কিছু পরেই যখন আমরা দেখি সে দু'জন নগেন্দ্রনাথ ও হীরা, তখন আমরা কুন্দের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে শংকিত হয়ে উঠি। দ্বিতীয়বার কুন্দের মাতার আহ্বানে কুন্দর মৃত্যুবরণে অক্ষমতা তার জীবনের চরম পরিণতির ফলটিকেই স্পষ্ট করে তুলেছে।

কুন্দের প্রথমবার বিবাহ ও বৈধব্য ঘটানর কি কোন প্রয়োজন ছিল? এই তিন বছরের কালক্ষেপণে বংকিমের কি উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে? মনে হয় এর দ্বারা তিনটি কাজ হয়েছে। প্রথমতঃ কুন্দনন্দিনীর তিনবছর বয়স বেড়েছে, দ্বিতীয়তঃ—এই সময়েই তার সংগে দেবেন্দ্রের পরিচয় হয়েছে। তৃতীয়তঃ—এর ফলে বিধবা বিবাহের ফলাফল দেখান সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এর কোনটিই তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুঘটনা আর একটি বিতর্কিত বিষয়। অনেকে বলেন এই মৃত্যুতে নীতির জয় হয়েছে বটে, কিন্তু আর্টের মাহাত্ম্য খর্ব হয়েছে। এই অভিযোগ সর্বাংশে সত্য বলে মানা যায় না। উপন্যাসের পরিকল্পনা এমন ভাবেই করা হয়েছিল যে কুন্দর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সূর্যমুখী শেষপর্যন্ত কুন্দর সাথে একত্রেই ঘর করবে ঠিক করেছিলেন, কিন্তু প্রথমেই তাঁর পক্ষে মানিয়ে নেওয়া সম্ভব ছিল না। নগেন্দ্রের হৃদয়েও কুন্দ অপেক্ষা সূর্যমুখীর গুরুত্ব ছিল অধিক। ঘটনাচক্রে কুন্দের প্রতি সকলের উপেক্ষা তাকে মৃত্যুর দিকেই এগিয়ে দিয়েছে। সবশেষে কুন্দনন্দিনী মৃত্যুবরণ করে যেভাবে নগেন্দ্র-সূর্যমুখী কমলমণি এবং পাঠকগণের হৃদয় দখল করতে সমর্থ হয়েছে, এমন আর কিছুতেই সম্ভব ছিল না।

নাট্যবিচারক

সেদিন এক আধুনিক নট-নাট্যকারের পূর্বযুগের এক নাট্যাচার্য সম্বন্ধীয় আলোচনা পড়ছিলাম। লেখক তাঁর রচনায় কোন একজনের পূর্বসূরীদের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব দণ্ডার্হ এমন কথাও বলেছেন কিন্তু তাঁদের প্রতি অবজ্ঞা সম্ভবতঃ লেখকের মতে প্রশংসার্হ, অন্ততঃ তিনি নির্ভেজাল অবজ্ঞাই প্রকাশ করেছেন। প্রসঙ্গতঃ নাট্যাচার্যের নাট্যরচনার তুলনায় কে নাকি তাঁকে সেকসপীয়ারের চেয়ে মহত্তর বলেছেন বলে ব্যঙ্গ করেছেন, জানিয়েছেন তিনি সেকসপীয়ারের চেয়ে মহত্তর তো দূর অস্ত, মহৎ নন।

আমাদের রাষ্ট্র বাক্‌স্বাধীনতা স্বীকার করে, কাজেই লেখকের মতামত প্রকাশের অধিকার মেনে নিয়েও তাঁর বক্তব্যের যৌক্তিকতা স্বীকার করতে পারছি না। কোন নাট্যকার মহৎ সৃষ্টি করেছেন কিনা, তা সমালোচকের তূলাদণ্ডে নির্ণিত হয় না, তা যদি হ'ত তাহলে স্বয়ং সেকসপীয়ারও বাতিল হয়ে যেতেন। কিন্তু জন গণেশের কৃপাদৃষ্টি পেয়েছিলেন বলেই তৎকালীন সমালোচকদের নাট্য বিষয়ক ত্রুটির সমালোচনা হারিয়ে গিয়েছিল।

যে নাট্যকারকে নাট্যশালার তাগিদে লিখতে হয় তাঁর পক্ষে সব ক'টি নাটককে সমস্তরের করা সম্ভবপর নয়, স্বয়ং সেকসপীয়ারও তা পারেন নি। তাঁর রোমিও জুলিয়েত, কিংলিয়ার, হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, জুলিয়াস সিজার, মার্চেণ্ট অফ ভেনিস ইত্যাদি আমাদের চেতনাকে এমনই আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে আমরা টাইটাস এণ্ড্রোনিকাস, সাইমন অফ এথেন্স বা মেজার পর মেজারের কথা ভুলে যাই। অথচ নাটকগুলির নাম আর লেখকের নাম বদলে যদি উপস্থিত করা হয় তো সবাই সেগুলি বাতিল করতে চাইবে।

আধুনিক নাট্য সমালোচকরা রবীন্দ্রনাথের নাটকের অজস্র প্রশংসা করে থাকেন অথচ যে মানদণ্ডের প্রয়োগে অন্যান্য নাট্যকারদের সৃষ্টি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বিবেচিত হয়ে থাকে সেই মানদণ্ড প্রয়োগ করলে তাঁর সবক'টি নাটক কি উৎরাবে। অধিকন্তু জন গণেশের রায় সর্বদাই রবীন্দ্রনাট্যের বিপক্ষে গিয়েছে বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। এমন কি বহুরূপীর বহু আলোচিত রক্তকরবী বাংলা নাট্যশালার কেন্দ্রস্থলে দর্শক বিমুখীনতার সম্মুখীন হয়েছিল, এ তথ্য ঐতিহাসিক সত্য। তাহলে সমালোচকরা কি বলবেন ?

প্রথম যে কথা শোনা যাবে তা সাধারণতঃ বুদ্ধিজীবীদের জনসাধারণ সম্বন্ধে সাধারণ মন্তব্য, ও সব বস্তু বোঝবার বুদ্ধি, এলেম বা রুচি কিছুই জনসাধারণের জন্মায় নি। কাজেই উচ্চকোটির বস্তু আমাদের মত অসাধারণ মানুষরাই বুঝতে বা উপভোগ করতে পারে।

(কথাটা আজকের গণ জাগরণের দিনেও কেউ ভাবতে পারেন এমন কথা সুধী পাঠকরা হয়ত

বিশ্বাস করতে পারবেন না কিন্তু সমালোচকদের চিন্তাধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের একথা আত্মবিশ্লেষণ করেই বলতে পারি।)

কিন্তু আসল প্রশ্নের কি কোন সুরাহা হয় তাতে? প্রশ্ন হ'ল, মহৎ সৃষ্টির বিচার করবে কে? জনসাধারণ না বিদগ্ধ সমালোচক?

সাহিত্যিকরা প্রায় সকলেই জনসাধারণের রায় শিরোধার্য করার কথা বলেছেন, গোল্ডস্মিথও ভবিষ্যতে কালের উপর ঠেকই দিয়ে বসেছেন। আর একটা সহজ কারণ হ'ল, জন সাধারনের নেক নজরে পড়লে লক্ষ্মী-সরস্বতীর দ্বন্দ্বের আংশিক সমাধান ঘটে। কিন্তু এহো বাহ্য! জন সাধারণের ভাল না লাগলে কোন সৃষ্টি কাল জয়ী হতে পারে না। আর যা নিজের কালের গণ্ডী পেরোতে পারল না তাকে মহৎ সৃষ্টি কি করে বলি?

তাহলে বিকৃত রুচিই হ'ক আর বুদ্ধি হীনই হ'ক জন গণেশের রায়কে চূড়ান্ত বলে মানা ছাড়া গত্যন্তর নেই, আর সে রায় নিশ্চিন্ত ভাবে বিগত নাট্যাচার্যের পক্ষেই গিয়েছে। আর আজকের দিনের আমাদের মত সমালোচকম্মন্য নাম করার রাজপথ হিসাবে অনেক ক্ষেত্রে সেই সব পূর্বসূরীদের গায়ে কাদা ছেটানোর কাজ নেওয়ায় কাদাটা তাঁর গায়ে সামান্যই থাকছে কিন্তু যারা ছেটাচ্ছে তাদের চেনা মুখ চিত্র বিচিত্র হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

অবশ্য তাঁদের একটা দোষ দেওয়া যায়। ক্ষমতা সত্বেও তাঁরা নিজস্ব সৃষ্টির দিকে ঝোঁকেন নি, সাহেবলোককে দেখাতে গিয়েছিলেন তাদের চৌহদ্দিতে ভেতো বাঙালী কমতি যায় না। সেদিনকার পুরো সাহেব ইয়ং বেঙ্গল নিজেদের হীনতা দূর করার জন্য এতটাই ব্যগ্র হয়েছিলেন যে বিদেশী ধারাটাকে কাজে লাগাতে ইতস্ততঃ করেন নি। সেদিন তাঁরা ভাবতে পারেন নি তাঁদেরই ভবিষ্যত বংশধররা বহিরঙ্গটাকেই প্রধান বলে মেনে নিয়ে একেবারে পুরোপুরি নকল নবীশ বনে যাবে এবং অতীতকে লম্বা ঝাড়ু দিয়ে বঙ্গোপসাগরে ঝেড়ে ফেলবে। জানলে হয়ত ভিন্ন পথ ধরতেন। না জানার অপরাধের শাস্তি তাই তাঁদের প্রাপ্য আর তা পাচ্ছেন ও।

রবি মিত্র

পিতৃস্মৃতি ॥ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জিজ্ঞাসা। ১ ও ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯ : মূল্য-১৬ টাকা।

পুরানো স্মৃতিমাত্রই রোমান্টিক। পিছনে ফেলে আসা অতীত আর বর্তমানে, কল্পনা আর বাস্তবের দূরত্ব। এবং পৃথিবীতে বাস্তব চিরদিনই কল্পনার চেয়ে নীরস। বর্তমান শতাব্দীতে যে বহু লোক আত্মকথা রচনা করছেন আর অন্যতম প্রধান কারণ হলো এই যে কবিত্বশক্তি না থাকা সত্ত্বে তাঁদের অনেকেরই কল্পনা আছে, দূরাগত জীবনকাহিনীর রসাস্বাদনের রোমান্টিক মন আছে। সেই মন, যা ছন্দোবদ্ধ কাব্যকলা রচনায় কুশলী নয় অথচ প্রগাঢ় অনুভূতির তীব্র অনুভবে যা একান্ত স্পর্শ প্রবণ, তা নিজেকে প্রকাশ করার পথ খোঁজে স্মৃতিমন্থনের সার্থকতায়।

রথীন্দ্রনাথের একটি কবি মন ছিল—যদিও কাব্যরচনার বিশেষ প্রবণতা ছিল না। নানাবিধ ললিতকলায় তাঁর আশ্চর্য অধিকার ছিল। বহু সুন্দর বস্তু দেখার প্রচুর সুযোগ তাঁর জুটেছিল, তার মধ্যে যেটি সবচেয়ে সুন্দর সেটিকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জানবার ও বোঝবার অবকাশ তিনি পেয়েছিলেন। সেটি হলো পিতা রবীন্দ্রনাথের জীবন। সেই জীবনের প্রায় চল্লিশটি বছর পরিণত মন ও রুচি নিয়ে রথীন্দ্রনাথ দেখতে পেয়েছিলেন। প্রতিভার পথ অত্যন্ত জটিল ও দুরূহ। তার আচরণ সাধারণের বুদ্ধিগম্য নয় সর্বদা। তবু নিকট সম্পর্ক, এবং সহজাত প্রীতির বন্ধন সেই মহৎ ব্যক্তিত্বের বহু আপাতঃ জটিল আচরণের অর্থ রথীন্দ্রনাথের কাছে স্পষ্ট হতে সহায়তা করেছে। একদিকে নিজের কবি মন, অন্যদিকে পিতৃসত্তার নিবিড় নৈকট্যে মনের কোষাগারে অনেক ধন রত্ন সঞ্চিত হয়েছিল। তারপর জীবনপ্রান্তে এসে বন্ধুজনের উপরোধ অনুরোধে পিতৃস্মৃতিমূলক ইংরাজী গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন On the Edges of time নাম দিয়ে। তাতে নিজের জীবনের সেই কথাগুলিই লিখেছিলেন যা প্রধানত পিতা রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিকে অবলম্বন করেই আবর্তিত। তারপর ঐ একই বিষয় নিয়ে বাংলায় গ্রন্থ রচনার চেষ্টা করলেন। চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের সম্পাদিত বসুধারায় তা প্রকাশিত হল। কিন্তু শেষ হবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। যে অংশ বাকী ছিল শ্রীক্ষিতীশ রায় তার অনুবাদ করে দিয়েছেন। তা ছাড়া বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত আরও দু-একটি রচনা 'পিতৃস্মৃতি'তে সংকলিত হয়েছে। এ সমস্ত তথ্যই প্রকাশকের নিবেদনে সংযোজিত।

'পিতৃস্মৃতি' নাম দিয়ে যে খণ্ডটি হাতে এসে পড়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখেছেন দেশিকোত্তম লেনার্ড কে, এলমহার্ষ্ট। ভূমিকাটি আকারে ছোট কিন্তু তার বক্তব্যের বিপুলতা সেই সংক্ষিপ্ততার মধ্যেও অনুভব করা যাচ্ছে। তিনি নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন—"রথীদাকে আমরা যারা জানবার সুযোগ পেয়েছি তারা দেখেছি, নিজের অভিলাষ-আকাঙ্ক্ষাকে একধারে সরিয়ে রেখে তিনি তাঁর কবি পিতার নব নব পরিকল্পনাকে রূপ দিতে ব্যস্ত।"

রথীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্যজীবনের যে সব কাহিনী ধরে দিয়েছেন তার মূল কথা নিজেকে তুলে

ধরা নয়, রবীন্দ্রনাথকেই ক্রমে ক্রমে তাঁর কাহিনীর কেন্দ্র বিন্দুতে স্থাপন করা। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব আচার আচরণের খুঁটিনাটি বৈচিত্র, তাঁর বন্ধু সংসর্গ, তাঁর পারিবারিক সম্পর্কের ছোট ছোট ছবি রথীন্দ্রনাথ এঁকেছেন। সে ছবিগুলি এত সহজ, এত জীবন্ত যে মনে হয় যেন পাঠককেও তিনি সেই পুরানো কালের পরিবেশে নিয়ে গিয়েছেন। এই সব কাহিনী রচনার মধ্যে তাঁর ভাষার সংযম ও সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রচনার কৌশল লক্ষ্য করবার মত। একটি মাত্র উদাহরণ দিয়ে কথাটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করি—

"খাওয়া দাওয়ার অনিয়ম ও তার উপর অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমের ফলে সেবার এত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে তেতলার ঘরে উঠতে সিঁড়িতেই অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এই ঘটনার পর খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে তাঁর আর স্বাধীনতা রইল না। মায়ের ব্যবস্থাই তাঁকে মেনে চলতে হতো।" লেখার উৎসাহে খাওয়া দাওয়া ভুলে থাকার ব্যাপারেও কবিপত্নী প্রথমে নিজেকে স্বামীর উপরে খাটাবার চেষ্টা করেন নি। কিন্তু যেদিন সিঁড়িতে কবি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন সেদিন অনেকটা স্বাধীনতা স্ত্রীর হাতে তুলে দিতে হল। একটি সংক্ষিপ্ত পংক্তিতে সুমিত বাক্য ব্যবহারে পারস্পরিক নির্ভরতা এবং কবির স্ত্রীর হাতে আত্ম সমর্পণ করতে বাধ্য হওয়ার ছবিটি যথার্থ শিল্পকর্ম হয়ে ফুটেছে। এই জাতীয় স্মৃতিকথা রচনার অন্যান্য লেখকেরা অধিকাংশই ফেনায়িত বাক্ বাহুল্যে যে তারল্যের সৃষ্টি করেছেন রথীন্দ্রনাথের রচনায় তাঁর চিহ্নমাত্র নেই। ভাষার সংযম এবং সংহত ভাবাবেগে রচনাটি নিটোল রূপ পরিগ্রহ করেছে।

রথীন্দ্রনাথের 'পিতৃস্মৃতি'র সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ হলো বিদেশ যাত্রার অংশগুলি। এই অধ্যায়গুলির নাম ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জী, প্যারিসের দিনপঞ্জী, ইয়োরোপের অন্যত্র, ইতালি ভ্রমণ, ইয়োরোপের সীমান্ত। এরই সঙ্গে আছে একটি সুইস কৃষকের কাহিনী।

ঘরে বসে পারিবারিক পট ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথকে স্মৃতি থেকে ধরে রাখতে রথীন্দ্রনাথের যে কৃতিত্ব তার চেয়ে ভ্রাম্যমাণ সচলচিত্ত কবিকে ধরে রাখার কৃতিত্ব কম নয়। অবশ্য এই কথা এই প্রসঙ্গে অবশ্য স্মরণীয় যে কবিচিত্ত সর্বদাই সচল, কোন অবস্থাতেই তা নিজের চতুর্দিকের গণ্ডীকে শেষ সীমানা বলে মানছে না। গণ্ডী ভাঙবার সাধনাই কবি জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা। মনোজগতে যেমন বহির্জগতেও তেমনি রবীন্দ্রনাথ নানা দেশে নিজের ব্যাপ্তি ও বিস্তার খুঁজেছেন। রথীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় সেই সব ভ্রমণের বহু সংবাদ তুলে ধরেছেন যা অন্যত্র সুলভ নয়। ক্রোচের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলাপ আলোচনার সংবাদটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের গভীরতা অনুধাবন করতে হলে যেমন উপনিষদ, বৈষ্ণব কবিতা, ইংরাজী রোমান্টিক সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধে ধারণা থাকা চাই তেমনি বিভিন্ন দেশ সম্বন্ধে তাঁর উৎসুক মনের আগ্রহও ভাল করে বোঝা চাই। কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা কত মানুষের ভাবনার স্রোত একটি কবি মনের উৎসকে সমৃদ্ধ করেছে। রথীন্দ্রনাথ কবির সেই সংগ্রহ উৎসুক মনের বহু অজানা চিত্র আমাদের ধরে দিয়েছেন। তাঁর সে চিত্রগুলি কেবলমাত্র ভ্রমণের চিত্র নয়। ভারতবর্ষের একটি শ্রেষ্ঠ ভাবনাক্ষম মনের বিচরণ কাহিনী তার সঙ্গে বিধৃত।

তারই মধ্যে যেটুকু নাটকীয় উপাদান তা রথীনন্দ্রনাথ পরিবেশন করতে ভোলেন নি, যেমন কবির সঙ্গে ভোর পাঁচটায় ফর্মিকিকে এড়িয়ে ক্রোচের আবির্ভাব, সরকারি তত্ত্বাবধায়ককে এড়িয়ে ভেনিসের জলপথে রবীন্দ্রনাথের গোপন গণ্ডোলা বিহার, রুমানিয়ার ঘাটে একটি মাত্র হতভম্ব মানুষের রবীন্দ্রঅভ্যর্থনা। কবির বিদেশ যাত্রার বর্ণনার গাম্ভীর্য নষ্ট না করে এই নাটকীয় ঘটনাগুলি সংযোজন করার ফলে রচনার মাধুর্য অনেক বেড়েছে।

পিতৃস্মৃতির সঙ্গে রথীন্দ্রনাথের ডায়ারী সংযোজিত হয়েছে, আর হয়েছে তিনটি রচনা যা ইতিপূর্বেই অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছে। সবগুলি একত্র পাওয়ায় রথীন্দ্রনাথের পিতৃস্মৃতি সম্পর্কীয় যাবতীয় রচনাই গ্রন্থভুক্ত করা হল। ডায়ারি অংশে লেখাগুলি রবীন্দ্রনাথের মুখের কথারই অনুলিপি, কিছু কিছু রথীন্দ্রনাথের নিজস্ব কথা।

পিতৃস্মৃতি মুগ্ধ হয়ে পড়বার মত বই—বিষয়বস্তুর গৌরবেও বটে রচনাগুণেও বটে। পড়তে পড়তে মন গভীর আনন্দ অনুভব করে আর সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুব্ধ হয় যে আরও কিছু কেন রথীন্দ্রনাথ দিয়ে গেলেন না।

সর্বশেষে এ কথা স্বীকার করতে হয় যে আজকাল গ্রন্থের বহিরঙ্গসজ্জার দিনেও পিতৃস্মৃতির মত সুমুদ্রিত, সুচিত্রিত এবং সুগ্রথিত গ্রন্থ বেশি দেখা যায় না। লেখকের রচনায় যে শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে প্রকাশকও তাঁর কর্মে সেই শ্রদ্ধার নিদর্শন রাখতে পেরেছেন। আজও বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের ঘরে শুধু পড়ার আনন্দে ষোল টাকা দামের বই কেনার দৃষ্টান্ত অল্প। তবে একথা স্বভাবতঃই মনে হয় যে এই জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ হতে থাকলে সাধারণ মানুষেও হয়তো ঐ মূল্যে কিনে পড়বে।

সোমেন্দ্রনাথ বসু

আনন্দে
উৎসবে...
প্রাত্যহিক প্রয়োজনে..
সবার মনোরঞ্জনে...
পরিশীলসরমনীয়
কেশতৈল
কেশরঞ্জন

সমকালীন

পঞ্চদশ বর্ষ ॥ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪

গরমে চলুন
হালকা পায়ে
পা গলিয়ে খানিক এদিক-ওদিক চলুন, নিমেষেই
বুঝবেন বাটার স্যান্ডাল আর চপ্পল এদের বৈশিষ্ট্য কী।
কী আরাম এদের পায়ে দিয়ে! কী মসৃণ চামড়া!
এমন হাওয়া-খেলানো নকশা, নির্মাণশৈলী আর
মৌসুমী নকশার সমাবেশ দুর্লভ বলা যেতে পারে।
স্টাইলের বহুমুখী বৈচিত্র্য এদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য।
আজই এসে দেখে যান বাটার দোকানে স্যান্ডাল ও
চপ্পলের নতুন মনোজ্ঞ ফ্যাশান।
Bata
শ্যামল ৭.৯৫
অলোক ৯.৯৫
প্রীতীশ ৭.৯৫
এয়ারকুল ১৬.৯৫
এয়ারলাইট ১৮.৯৫

সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান
SADHANA
Mritusanjibani
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট
মৃতসঞ্জীবনী
সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা
কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্ব্বেদ-আচার্য্য, ৩৬, গোয়ালপাড়া রোড, কলিকাতা-৩৭
অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এম,সি,এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

পঞ্চদশ বর্ষ ২য় সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ তেরশ' চুয়াত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

নিয়মাবলী

সমকালীন

প্র ব ন্ধে র মা সি ক প ত্রি কা

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখে) বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক ছয় টাকা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীনে' প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদি নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়। **গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না**—'সমকালীন' প্রবন্ধের পত্রিকা।

'সমকালীন'এর গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে, রসিক সমালোচকদের দ্বারা **শিল্প, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান** ও **সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ** ও **কাব্য গ্রন্থের** বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দুখানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোন ২৩-৫১৫৫

রমেশচন্দ্র ও ভারতের অর্থনীতি

মুরারি ঘোষ

বিলেতের পার্লামেন্টে একটা ডিবেট থেকে আরম্ভ করা যেতে পারে। ভারতবন্ধু উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ হাউস অব কমন্সে একটা বিতর্কের সূচনা করলেন। তখনো বিশ শতকের শুরু হয়নি—উনিশ শতকের শেষ কয়েকটা মাস বাকী। দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া আর প্লেগের মহামারী ভারতের গ্রামে শহরে হানা দিয়েছে। এরই কয়েক মাস যেতে না যেতে নতুন শতকের (১৯০০) সূচনা মুখে এপ্রিলের এক সন্ধ্যায় পার্লামেণ্ট সদস্যদের চমকে দিয়ে ওয়েডারবার্ণ বলতে সুরু করলেন।

In view of the grievous sufferings which are again afflicting the people of India and the extreme impoverishment of large masses of the population, a searching enquiry should be instituted in order to ascertain the causes which impair the cultivators' power to resist the attacks of famine and plague, and to suggest the best preventive measures against future famines.

এমনিতেই ওয়েডারবার্ণ ভারতবন্ধু হিসেবে এদেশে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। বিলেতে অখ্যাতি। দশবছর আগে ওয়েডারবার্ণ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে (1889) সভাপতিত্ব করেছিলেন। ওয়েডারবার্ণের বক্তব্য কিন্তু এড়িয়ে যাওয়ার উপায় ছিল না। পার্লামেণ্টে এপ্রিলের সেই সন্ধ্যায় তীব্র বিতর্কের ঝড় বয়ে গেল। অনেকেই মুখ খুলেছিলেন পক্ষে, বিপক্ষে।

ওয়েডারবার্ণ ভারতের দুর্ভিক্ষের কথা বললেন। অনিষ্টকর ভূমিকরের কথা বললেন। চাষীদের দুরবস্থার ফিরিস্তি দিলেন সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে। শেষ পর্যন্ত উঠলেন ভারত সচিব লর্ড জর্জ হ্যামিলটন।

হ্যামিলটন সাহেবের বুঝে নিতে ভুল হয়নি সেদিনকার বিতর্কের সূচনাকারী মাননীয় সদস্যের বিক্ষোভের মূল কোথায়। বললেন,...the member for Flint had reproduced several of the arguments and figures which a well known Bengal gentleman, Mr. Romesh Dutt, recently used in a speech delivered by him as President of the National Congress.

কয়েক মাস আগে লক্ষ্ণৌতে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন (1899) হয়ে গেছে। সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্ত। সেদিনের ঐতিহাসিক ভাষণে রমেশচন্দ্র ভারতের কৃষিজীবনের নিরুপায় দুর্দশার কাহিনী যে রকম ওজস্বী ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন তার তুলনা ছিল না। তাঁর বক্তব্যে·যুক্তির ধার, তথ্যের যাথার্থ এবং তেজস্বীতা অস্বীকার করার মত সামর্থও কারুর ছিল না। বৃটিশ সাম্রাজ্যের কর্ণধারদের টনক নড়িয়ে দেবার মত সেই বক্তৃতা।

রমেশচন্দ্র এরও ঠিক বছর দুই আগে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। কার্যত্যাগের সময় তখনও হয়নি। তবু মাতৃভূমির সেবায় অবশিষ্ট জীবন উৎসর্গের দুরাকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল হয়ে উঠেছিলেন। ভারত-শাসনে উচ্চপদে থেকে ইংরেজ রাজত্বের শোচনীয় গলদগুলো মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন।

তখন জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। প্রায় ১০ বছর কেটে গেছে তারপর। ভারতের জন মানসে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় একটা অভূতপূর্ব সাড়া স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কোনো অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী মানুষের দৃষ্টি থেকে তা এড়িয়ে যেতে পারে না। উনিশ শতকের শেষার্দ্ধের সেই সময়টুকু বাঙালী মনীষার পক্ষে এক চরম উন্মাদনার কাল। চিকাগোর ধর্ম মহাসম্মেলনে বিবেকানন্দ, রয়াল সোসাইটীতে জগদীশচন্দ্র, ভারতের নগরে বন্দরে জনসভায় সুরেন্দ্রনাথের অভ্যুত্থান আর ভারতীয় জাতীয়তার সুস্পষ্ট প্রকাশের শুভলগ্ন।

অসাধারণ তীক্ষ্ণধী রমেশচন্দ্র অনুশাসনের বন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়ে এলেন। তাঁর য়ুরোপীয় সহকর্মীরা বৃথাই তাঁকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেছিল। বন্ধন ছিন্ন রমেশ দত্ত লণ্ডনের সভায় সমাবেশে ভারতে বৃটিশ দুঃশাসনের কলংকময় কাহিনী—জনজীবনের অশেষ দুর্গতির ইতিহাস বিবৃত করে চললেন। রমেশচন্দ্রের হাতে ছিল সহজ মারণাস্ত্র। সরকারী নথীপত্রের সাক্ষ্য আর প্রচুর সংখ্যাতত্ত্ব।

কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হবার ক'মাস বাদে (Nov 1899) ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে কোলকাতায় এক বিরাট জনসভায় W. C. Bonnerjea রমেশচন্দ্রকে স্বাগত জানিয়ে সম্মানপত্র দিয়ে বললেন :

The way in which you have employed your time since your retirment, has fully justified the wisdom of the step. You have within a short time done much, through the press and the platform, to inform the enlighten public opinion in England or some of the most momentous questions of Indian administration.

রমেশচন্দ্র দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। তাঁকে দমিয়ে রাখার মত বাঁধন ইংরেজ সরকারের হাতে

ছিল না। পার্লামেন্টের মুখ বন্ধ করে দেবার মত অমোঘ অস্ত্র সাজিয়ে নিয়েছেন। ভারতের জাগ্রত জনজীবনের নেতৃত্বের অধিকার বরণ করে নিলেন।

সেদিনের পার্লামেণ্ট ওয়েডারবার্ণের বক্তব্য উপেক্ষা করতে পারেনি। পরের দিন কাগজে কাগজে পার্লামেণ্টের রিপোর্ট বেরুল। রমেশচন্দ্রের সাজানো যুক্তিতে তথ্যের সমাবেশে হতচকিত পার্লামেণ্ট। ভারত সচিবের সংকুচিত বিবৃতি……

……he saw that Mr. Dutt had made definite statements of facts in order to show that the land assessments in certain parts of India were to high…… ।

কংগ্রেসের জনসভায় সেইবক্তৃতার পর রমেশচন্দ্র কিন্তু নিশ্চুপ থাকেন নি। ভারতে ক্রমাগত দুর্ভিক্ষ ও দুর্গতির জন্যে দায়ী আপাতত শাসন সংক্রান্ত গলদগুলো দূর করার জন্যে স্থির প্রতিজ্ঞ হলেন। জাতীয় কংগ্রেসের সভা সেরে কলকাতায় চলে এসে লর্ড কার্জনের সঙ্গে দেখা করলেন। দুটো বিষয় নিয়ে মোকাবিলা। কৃষি জীবন থেকে ভূমি কর কমাতে হবে, আর ভারতের শাসন পরিষদে (এক্সিকিউটিভ কাউন্‌সিলে) ভারতের মানুষকে স্থান দিতে হবে। শাসন পরিচালনায় ক্ষমতার ভাগ দিতে হবে ভারতবাসীকে।

অমন দুর্দ্ধর্ষ কার্জন রমেশ দত্তকে এড়িয়ে যেতে পারলেন না। বিনা, প্রতিবাদে শুনে গেলেন। রমেশ দত্তের অপ্রতিরোধ্য যুক্তি আর তথ্যনিষ্ঠ বক্তব্য শুনে বললেন, তিনি অনুসন্ধান করবেন, বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করবেন। তবে চোখ কপালে তুললেন শাসন পরিষদে ভারতীয় নিয়োগ সম্পর্কে বক্তব্য শুনে। কিছু কথার পিঠে কথা চাপালেন কিন্তু ঠেকে গেলেন যুক্তিনির্ভর বক্তব্যের মুখে। শেষ পর্যন্ত অটোক্র্যাট শাসকের শেষ অস্ত্র যা তাই প্রয়োগ করলেন। আলোচনায় সমাপ্তি টেনে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, After all, is not the rule of one man the best form of rule for India.

রমেশচন্দ্র ফিরে গেলেন লণ্ডনে। বৃটিশ মিউজিয়াম আর সরকারী নথীপত্রের ভাণ্ডার সেখানে। সরকারের চাকরী যখন ছেড়েছেন তখন তিনি জনতার মুখপাত্র। লর্ড কার্জন কিংবা বৃটিশ পার্লামেণ্টের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবেন—কোথায় তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন। প্রতিজ্ঞায় দৃপ্ত রমেশচন্দ্রের প্রথম যৌবনের কথা মনে আসে। উনিশ বছরে পা দিয়ে যিনি একদিন চুপি চুপি কাউকে না জানিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে বিলেতগামী জাহাজে উঠে পড়েছিলেন। সংগী ছিলেন আরেক দুর্দ্ধর্ষ তরুণ—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। উচ্চশিক্ষার দুরাকাঙ্ক্ষায় অজ্ঞাত ভবিষ্যতের পথে পা বাড়াতে সামান্য দ্বিধা সেদিন ছিল না। প্রৌঢ় জীবনের মধ্যাহ্নে আরেক দৃপ্ত প্রতিজ্ঞার সম্মুখীন হলেন রমেশচন্দ্র। সাম্রাজ্য শাসকের নিস্ফল অহমিকার সমুচিত জবাব তিনি দেবেন।

আরো তথ্য সমৃদ্ধ করে প্রকাশ করলেন Open Letters to Lord Curzon.

পায়োনিয়র পত্রিকায় মন্তব্য বেরুল :

Mr. Dutt has set in motion an interesting and instructive controversy. It is not everyone who can induce a Lientenant Governor to take up a challenge publicly thrown down.

কিন্তু এও শেষ নয় সুরু মাত্র। প্রস্তাবনা কি মুখবন্ধ। আরো শাণিত অস্ত্র রয়েছে রমেশ চন্দ্রের তূণীরে।

ইতিমধ্যে পার্লামেণ্টে ওয়েভারবার্ণ বিতর্কের সূত্রপাত করলেন। রমেশ দত্তের যুক্তির ভারে বৃটিশ পার্লামেণ্ট যখন সচকিত, রমেশচন্দ্র তখন বিলেতগামী জাহাজে। সমুদ্রে। বিলেতের মাটিতে পা দিয়ে দেখলেন তাঁর অস্ত্র প্রয়োগের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া। স্বদেশে চিঠি মারফৎ ভাইকে জানালেন :

The whole official world in England and India is overwhelmed by my charge against the India Government about over-assessments of land. I hear the India office here is quite upset and in looking up figures and documents. I will give them no rest, but will prove the change to the hilt. I am going to bring out a popular and readable book on the subject, including my letters to Curzon and a lot of valuable documents and proofs. That book will be in the hands of every Englishmen and every Indian who wihses to study the Indian land question.

সেই বই বেরুল—Famines in India। পার্লামেণ্টের আলোচনার দুমাস বাদেই।

ক্রপটকিন রাশিয়া থেকে সাধুবাদ জানালেন সে বই পড়ে। এমন কি লর্ড কার্জনও মন্তব্য করলেন...... a reasonable and well informed statement of the View.

ক্রপটকিন তাঁর দেশের কৃষক সমাজের দুরবস্থার ইতিবৃত্ত টেনে রমেশ দত্তের রচনাকে স্বাগত জানালেন। বিশ্বজুড়ে কৃষক সমাজের সংগ্রাম ও মুক্তির কথা বললেন। কিন্তু লর্ড কার্জন ? রমেশ দত্ত জানতেন কার্জনের পিঠ চাপড়ানোর শেষ কোনখানে ! নিজের ক্ষমতার উপর আস্থা রেখে তাই ঘোষণা করে রেখেছিলেন : I will not give them rest, but will prove the change to the hilt.

সেই দৃপ্ত প্রতিজ্ঞার শ্রেষ্ঠ ফসল Economic History of British India। দুখণ্ডের বই। দু বছর ব্যবধানে দুটি খণ্ড বেরোয়।

ভারতের দুর্দশাগ্রস্থ কৃষিজীবন ও ভূমি ব্যবস্থা, ধ্বংসোন্মুখ শিল্প-বাণিজ্য, দুর্ভিক্ষ, অসহ্যকর পীড়ন, অপশাসন—সব মিলিয়ে একটা নিরঙ্কুশ অবক্ষয়ের কাহিনী সমৃদ্ধ আর্থিক দুরাবস্থার ইতিবৃত্ত।

প্রথম খণ্ডে পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে ভিক্টোরিয়ার শাসনভার গ্রহণ পর্যন্ত আর্থিক ইতিহাস। দ্বিতীয় খণ্ডে পরবর্তী কালের কাহিনী—বিশ শতকের শুরু পর্যন্ত।

অর্থনীতির ইতিহাসে এ পর্যন্ত আমরা য়ুরোপের কহিনীই পড়ি। সেটাই নাকি বিশ্ব অর্থনীতির ইতিহাস। সে ইতিহাসের আলোয় আমাদের আর্থিক জগতের কোনো চেহারাই ধরা পড়ে না। অথচ আমাদের আর্থিক জগতের ভিন্ন তথ্য ও তত্ত্ব। ভারতেতিহাস প্রসংগে রমেশচন্দ্র সে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

সাম্প্রতিক সমস্ত অনুন্নত দেশের আর্থিক প্রচেষ্টার মধ্যে রমেশ দত্তের বিভিন্ন তাত্ত্বিক অনুজ্ঞা খুঁজে পাওয়া যাবে। কলোনীয়াল অর্থনীতি শাস্ত্রের অন্যতম প্রথম তাত্ত্বিক রমেশচন্দ্র।

প্রাণী চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ সামন্ত

যেমন নদী সম্বন্ধে, গাছপালা ও ফুল সম্বন্ধে তেমনি পশুপাখি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা তাঁর দীর্ঘ জীবনের নানা পরিস্থিতিতে ফিরে ফিরে এসেছে। প্রকৃতির অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে প্রাণীজগতের বেশ একটু স্বাতন্ত্র আছে। নদী নিত্য স্পর্শ করে এবং চলে যায়, গাছপালা মানুষের দৃষ্টির সামনে উপস্থিত থেকেও নীরব। তাই কবির কৌতুহল, নদীর চলাকে—গাছের কথা না বলাকে কেন্দ্র করে সর্বদাই আবিষ্ট থাকে। অন্যদিকে, কোকিল ডাকতে পারে, কুকুর আমাদের পাশে এসে বসতে পারে, ভ্রমর তার গুনগুনানি দিয়ে ভরিয়ে দিতে পারে আমাদের নিঃসঙ্গ দুপুর। অর্থাৎ বাহ্যিক জীবনেই প্রাণীদের সম্বন্ধে আমাদের মনের কাজ অনেকাংশে মিটে যায়, কল্পনার আকাশ সেখানে কম তাই কাব্যের অধিকারও সেখানে বিশেষ প্রসারিত নয়। আমাদের কল্পনা বা ঔৎসুক্য তাদের ঘিরে সর্বদা নাড়া খাবার, উজ্জীবিত হবার প্রয়োজন মনে করে না। শুধু কাব্যেই নয়, সমগ্র সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ নদী সাগর গাছপালা ফুল সূর্য সম্বন্ধে কত কথাই না বলেছেন! প্রাণীদের সম্বন্ধেও বলেছেন, তবে তুলনায় বেশ কম।

রবীন্দ্রনাথ কাব্যের প্রয়োজনে প্রাণী উপাদান সঞ্চয় করেই ক্ষান্ত হননি। প্রাণী সম্বন্ধে তাঁর মনের সরব চিন্তা, তাঁর কাব্যেকবিতায় যেমন প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি তাঁর চিঠিপত্র বা প্রবন্ধাবলী থেকেও প্রভূত সাহায্য পাওয়া যাবে। বিবর্তনবাদী প্রাণীবিদ বৈজ্ঞানিকদের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন—জগতের শ্রেষ্ঠতম জীব মানুষ। পুরুষ জাতির তুলনায় নারীদের বোধগত সূক্ষ্মতা ও স্বভাবগত চারুতার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলছেন—'সভ্যতা ক্রমেই এমন সুকুমার সূক্ষ্মতার দিকে যাচ্ছে যে, এই মোটা জন্তুগুলো ভারী ফাঁপরে পড়বে। পৃথিবীর আদিম অবস্থাতেই ম্যামথ ম্যাস্টডন প্রভৃতি বিপুলাকায় প্রাণীর আবির্ভাব ছিল—তাদের জোরই বা কত…চামড়াই বা কী শক্ত—তারা তো সব উচ্ছন্ন গেল। এখন কচি চামড়া সাড়ে তিন হাত মনুষ্য পৃথিবীর রাজা। কিন্তু আমাদের সময় প্রায় হয়ে এসেছে—এখন আরও কচির আবশ্যক।'(১) অবশ্য বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে কবি তৃপ্ত হতে পারেন না। 'দুইইচ্ছা' প্রবন্ধে মানুষ ও পশুর ইচ্ছাধর্মের আলোচনাকালে বলেছেন—জন্তুদের তুলনায় মানুষ ভিন্নধর্মীই শুধু নয়, সে উন্নতধর্মী। তিনি য়িহুদি পুরাণের গল্প স্মরণ করেছেন—'স্বর্গোদ্যানের প্রত্যেক জীবজন্তুই সেই সম্ভোগের সীমার মধ্যেই বদ্ধ রহিল; কেবল মানুষই বলিল, যাহা পাওয়া গেছে তাহার চেয়ে আরো পাওয়া চাই।' (২) এই আরো পাওয়ার পথে মানুষ দুঃখকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত হল। সে বললো, ভূমৈব সুখম্। সে সুখ দুঃখেরই নামান্তর। বৃহৎ ও মহতের জন্য উত্তরোত্তর দুঃখ স্বীকার করার ইচ্ছাতেই প্রাণীরাজ্যে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। এই শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সচেতন রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র লিখেছেন—'প্রাণীজগতে মানুষের যে যোগ্যতা, সে তার দেহের প্রাচুর্য নিয়ে নয়। মানুষের চামড়া নরম, তার গায়ের জোর অল্প, তার ইন্দ্রিয়শক্তিও পশুদের চেয়ে কম বই বেশি নয়। কিন্তু, সে এমন একটি বল পেয়েছে যা

চোখে দেখা যায় না, যা জায়গা জোড়েনা, যা কোন স্থানের উপর ভর না করেও সমস্ত জগতে আপন অধিকার বিস্তার করেছে। মানুষের মধ্যে দেহপরিধি দৃশ্যজগত থেকে সরে গিয়ে অদৃশ্যের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে। বাইবেলে আছে, যে নম্র সেই পৃথিবীকে অধিকার করবে : তার মানেই হচ্ছে, নম্রতার শক্তি বাইরে নয়, ভিতরে—সে যত কম আঘাত দেয় ততই সে জয়ী হয়। সে রণক্ষেত্রে লড়াই করে না ; অদৃশ্যলোকে বিশ্বশক্তির সঙ্গে সন্ধি করে সে জয়ী হয়।' (৩)

রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রাণী সম্বন্ধে নানা চিন্তায় সব চেয়ে বড় হয়ে প্রকাশ পেয়েছে পশুপ্রীতি—প্রাণীদের প্রতি মমতা। বালক বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ 'প্রাণিবৃত্তান্ত' গ্রন্থ পাঠ করেছেন। (৪) যে কোন প্রকার ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রাণী সম্বন্ধেও তিনি বালকবয়স থেকে কতখানি সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ তাঁর নিজের উক্তিতেই শোনা গেছে। রবীন্দ্রনাথের 'খোকা' অর্থাৎ বালক রবীন্দ্রনাথ একদিন একটা পিঁপড়ে মারতে যাচ্ছিল দেখে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলা ব্যথিত হয়ে নিষেধ করে। কবি বলছেন, 'দেখে আমার ভারী আশ্চর্য বোধ হল—আমার ছেলেবেলায় ঠিক ঐরকম ভাব ছিল, কীট পতঙ্গকেও কষ্ট দেওয়া আমি সহ্য করতে পারতুম না। কিন্তু বড় হয়ে তার চেয়ে কত কঠিন হয়ে গেছি।...আমি ছেলেবেলায় জীবের কষ্ট সম্বন্ধে যে রকম অতি সচেতন ছিলুম সে রকম ভাব এখনও থাকলে পৃথিবীতে পদক্ষেপ করা দায় হয়ে উঠত।' (৫) কিন্তু বড় হয়ে রবীন্দ্রনাথ সত্যই কঠিন প্রাণ হয়ে যাননি। প্রাণীদের প্রতি মমতা বিসর্জন দেননি। ছিন্নপত্রাবলী গ্রন্থেই এর বহু প্রমাণ মেলে। এবিষয়ে ১০২ ও ১১৭ সংখ্যক পত্র দুটি স্মরণ্য। গোরুদের উপর পীড়ন ও অত্যাচারের দৃশ্যে কবি ব্যথিত হয়ে বলছেন—'এই গোরুগুলির চোখের দৃষ্টি কেমন বিষন্ন শান্ত সুগম্ভীর স্নেহময়—মাঝের থেকে মানুষের কর্মের বোঝা এই বড়ো বড়ো জন্তুগুলোর ঘাড়ের উপর কেন পড়ল ?' (১০২ নং পত্র)। মানুষ তার আপন প্রয়োজনে একটি প্রাণবান, মুক্ত এবং সুন্দর প্রাণী ঘোড়াকে ভারবাহী করে তুলতে কী নিষ্ঠুর ছলনা অবলম্বন করেছিল তারই ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ বর্ণনা আছে লিপিকা গ্রন্থের 'ঘোড়া' নামক কথিকাটিতে। এই কথিকা সম্বন্ধে কোন কোন পণ্ডিত বলেছেন—'ঘোড়া সেই অযুযুৎসু, হৃতমুক্তি, নির্যাতিত মানুষদের প্রতীক'। (৬) তবু বলা যায়, দ্বিতীয় যে কোন রূপকার্থকে অতিক্রম করে এই কথিকায় স্ফুটতর হয়ে উঠেছে কবির প্রাণীপ্রীতি। ছিন্নপত্রাবলীর ১১৭ সংখ্যক পত্রটির সাথে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পশুপ্রীতি' নামক প্রবন্ধটি স্মরণ্য। এই প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথেরও মনোভাব ও নির্দেশ মুদ্রিত রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তখন পতিসরে বোটে। এই সময় একটি ঘটনা ঘটে, যার বিবরণ কবির একটি পত্র জুড়ে আছে—'কাল (পত্রতারিখ ২২শে মার্চ ১৮৯৯) আমি বোটে বসে জানালার বাইরে নদীর দিকে চেয়ে আছি এমন সময় হঠাৎ দেখি—একটা কী পাখি সাঁতরে তাড়াতাড়ি ওপারের দিকে যাচ্ছে আর তার পিছনে মহা ধর ধর মার মার রব উঠেছে। শেষকালে দেখি একটি মুরগি তার আসন্ন মৃত্যুকালে আমার বাবুর্চিখানার নৌকো থেকে হঠাৎ কিরকম ছাড়া পেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে পেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল, ঠিক যেই তীরের কাছে গিয়ে পৌচেছে অমনি যমদূত মানুষ ক্যাঁক করে তার গলা টিপে ধরে আবার নৌকো করে ফিরিয়ে নিয়ে এল। আমি ফটিককে ডেকে বললুম, আমার জন্যে আজ মাংস হবে না। এমন সময় ডাকে বলুর (বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর) 'পশুপ্রীতি'

লেখাটা এসে পৌঁছল, আমি পেয়ে কিছু আশ্চর্য হলুম। আমার তো আর মাংস খেতে রুচি হয় না। আমরা যে কী অন্যায় এবং কী নিষ্ঠুর কাজ করি তা ভেবে দেখিনে বলে মাংস গলাধঃকরণ করতে পারি। পৃথিবীতে অনেক কাজ আছে যার দূষণীয়তা মানুষের স্বহস্তে গড়া—যার ভালোমন্দ অভ্যাসপ্রথা—দেশাচার লোকাচার সমাজনিয়মের উপর নির্ভর করে, কিন্তু নিষ্ঠুরতা সেরকম নয়। এটা একেবারে আদিম দোষ···আমার বোধ হয় সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম সর্বজীবে দয়া। প্রেম হচ্ছে সমস্ত ধর্মের মূল ভিত্তি। জগতে আমা হতে যেন দুঃখের সৃজন না হয়ে সুখের বিস্তার হতে থাকে। আমি যেন সকল প্রাণীর সুখ দুঃখ বেদনা বুঝে নিজের স্বার্থের জন্য কাউকে আঘাত না করি—এই যথার্থ ধর্ম, এই যথার্থ ঈশ্বর চরিত্রের আদর্শে আপনাকে গঠিত করা। সেদিন একটা ইংরিজি কাগজে পড়লুম, পঞ্চাশ হাজার পৌনড মাংস ইংলণ্ড থেকে আফ্রিকার কোন এক সেনানিবাসে পাঠানো হয়েছিল। মাংসটা খারাপ হওয়াতে তারা ফিরে পাঠিয়ে দেয়, তার পরে সেই মাংস পোর্টস্‌মাউথে পাঁচছশ টাকায় নিলেম হয়ে যায়। ভেবে দেখ দেখি জীবের জীবনের কী ভয়ানক অপব্যয় এবং কী অল্প মূল্যে! আমরা যখন একটা খানা দিই তখন কত প্রাণী কেবলমাত্র ডিশ-পূরণের জন্য আত্মবিসর্জন দেয়; হয়তো কেবল ফিরে ফিরে যায়, কেউ নেয় না। যতক্ষণ আমরা অচেতনভাবে থাকি এবং অচেতনভাবে হিংসা করি ততক্ষণ আমাদের কেউ দোষ দিতে পারে না। কিন্তু যখন মনে দয়া উদ্রেক হয় তখন যদি সেই দয়াটাকে গলা টিপে মেরে দশজনের সঙ্গে মিশে হিংস্রভাবে কাজ করে যাই, তা হলেই যথার্থ আপনার সমস্ত সাধুপ্রকৃতিকে অপমান করা হয়। আমি তো মনে করেছি আরও একবার নিরামিষ খাওয়া ধরে দেখব।' (৭) দীর্ঘ পত্রটি উদ্ধৃত করার কারণ রবীন্দ্রনাথের মানসিকতা এখানে স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়েছে। এই বক্তব্যের সঙ্গেই কবি স্মরণ করেছেন দুটি গ্রন্থ, একটি Amiel's Journal, অন্যটি বাণভট্টের কাদম্বরী। আমিয়েলের গ্রন্থ থেকে পশুদের প্রতি মানুষের নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে লেখকের আলোচনার যে অংশটি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেন্দ্রনাথের পশুপ্রীতি প্রবন্ধে 'নোট বসিয়ে দিয়েছেন' সে অংশটির মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে। উক্তিটি সম্বন্ধে বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধে মন্তব্য আছে—'ইহার মধ্যে একটি সার কথা আছে। জন্তুদের প্রতি অবিচার, ক্রমে যে মানুষ পর্য্যন্ত উঠে, ইহা একটি চিন্তনীয় বিষয়।" (৮) আমিয়েল বলেছেন—'Small animals, small children, young lives—they are all the same as far as the need of protection and of gentleness is concerned.' তিনি মানুষের নিষ্ঠুরতার কথাও স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করেছেন—'Our race is by far the most destructive, the most hurtful, and the most formidable, of all the species of the planet.' মানুষ ও পশু একে অপরের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করবে এই তাঁর কামনা—In a word, the animal has claims on man and the man has duties to the animal—এবং পোষণ করেছেন এক মহান আশা—A day will come, however, when our standard will be higher, our hnmanity more exacting, than it is to day···the time will come when man will be humane even for the wolf—homo lupo homo. (৯) এই উক্তিগুলি রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তকেই প্রকারান্তরে প্রকাশ করেছে। 'দি ম্যান হাজ ডিউটিজ টু দি

এনিম্যাল'—এবং রবীন্দ্রনাথও সে দায়িত্ব স্বীকার করেছিলেন। ছোট ছোট প্রাণীদের ছোট শিশুর মতো সহানুভূতি, সেবা, স্নেহ দিয়ে রক্ষা করার দায়িত্ব জমিদার রবীন্দ্রনাথ পালন করেছিলেন। তিনি জমিদারী অঞ্চলে পাখি শিকার নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। এ আদেশ লঙ্ঘন করে চখা শিকার করার ফলে জনৈক পাবনাবাসীর কি শিক্ষা হয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথ কতখানি ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন সে ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে 'পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ' নামক গ্রন্থে। (১০) বনবানী কাব্যের 'চামেলিবিতান' কবিতাটি রচনাকালেও রবীন্দ্রনাথ, ছলনার ফাঁদ পেতে ময়ূরশিকারকারী বিদেশীদের ধিক্কার দিয়েছেন। 'শুনেছিলুম আমাদের প্রদেশে কোনো এক নদীগর্ভজাত দ্বীপ ময়ূরের আশ্রয়। ময়ূর হিন্দুর অবধ্য। মৃগয়াবিলাসী ইংরেজ এই দ্বীপের নিষেধকে উপেক্ষা করতে পারেনি অথচ গুলি করে ময়ূর মারবার প্রবল আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব হওয়াতে পার্শ্ববর্তী দ্বীপে খাদ্যের প্রলোভন বিস্তার করে ভুলিয়ে নিয়ে এসে ময়ূর মারত। বাল্মীকির শাপকে এ যুগের কবি পুনরায় প্রচার না করে থাকতে পারল না। মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বং অগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।' (১১) বানভট্টের কাদম্বরী কাহিনী আরম্ভ হয়েছে শুকমুখে ব্যাধগণের পাখি শিকারের বর্ণনার দ্বারা। রবীন্দ্রনাথ সে প্রসঙ্গ স্মরণ করে বলছেন—'পাখিরাও যে কতটা আমাদেরই মতো—একটা জায়গা আছে যেখানে তাতে আমাতে প্রভেদ নেই—পাখির সন্তান বাৎসল্য প্রাণের মমতা ঠিক আমাদেরই মতো—এইটে বাণভট্ট আপন করুণ কল্পনাশক্তির দ্বারা অনুভব ও প্রকাশ করেছেন—সেই touch of nature makes the whole world kin!' (১২) আরো বিস্তারিত অর্থে এই পশুপ্রীতি, এই প্রাণিসংরক্ষণ মানসিকতারই প্রকাশ রাজর্ষি (১৮৮৭) উপন্যাসে, বিসর্জন (১৮৯০) নাটকে। সরলা বালিকা হাসির আতঙ্কিত প্রশ্ন 'এত রক্ত কেন' এবং অপর্ণার উচ্চকণ্ঠ ঘোষণা—'কে তোমার বিশ্বমাতা! মোর—শিশু চিনবে না তারে। মা-হারা শাবক—জানে না সে আপন মায়েরে। আমি যদি—বেলা করে আসি, খায় না সে তৃণ দল,—ডেকে ডেকে চায় পথ পানে—কোলে করে | নিয়ে তারে, ভিক্ষা-অন্ন কয় জনে ভাগ | করে খাই। আমি তার মাতা'—গোবিন্দমাণিক্যের সংস্কারান্ধ মনে যে প্রশ্ন তুলেছে সেই একই প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ আজীবন আলোড়িত হয়েছেন। রাজর্ষি-বিসর্জনের কাহিনীতে ইতিহাসের মুকুরে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের হৃদয় প্রতিফলিত হয়েছে। সামান্য একটি ছাগমাতা ও শিশুকে রবীন্দ্রনাথ কী চোখে দেখেন—তার প্রমাণ পাই ছিন্নপত্রাবলীর ১৮৭ সংখ্যক পত্রে—'কাল রাস্তার ধারে একটা ছাগমাতা গম্ভীর অলস স্নিগ্ধভাবে ঘাসের উপরে বসে ছিল এবং তার ছানাটা তার গায়ের উপরে ঘেঁষে পরম গভীর আরামে পড়ে ছিল—সেটা দেখে আমার মনে যে একটা সুগভীর রসপরিপূর্ণ প্রীতি এবং বিস্ময়ের সঞ্চার হল আমি সেইটেকেই আমার ধর্মালোচনা বলি। এই সমস্ত ছবিতে চোখ পড়বা মাত্রই সমস্ত জগতের ভিতরকার আনন্দ এবং প্রেমকে আমি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎভাবে আমার অন্তরে অনুভব করি।' পত্রটির রচনা তারিখ ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫। একটি সামান্য প্রাণীদর্শনে এই যে মানসমুক্তি, সেই মানসিকতাই কি উক্ত গ্রন্থ দুইটির মধ্যে ক্রিয়াশীল নয়?

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত উপলব্ধি ও মমত্বের সঙ্গে একই স্রোতে মিলিত হয়েছিল বুদ্ধভাবনা ও বুদ্ধনির্দেশ। বুদ্ধদেবের নির্বাণতত্ত্ব নয়, 'মেত্তিভাবনা'র (মৈত্রীভাবনা) দ্বারাই তিনি বিশেষ

আকৃষ্ট হয়েছিলেন। 'পানং ন হানে : প্রাণীকে হত্যা করবে না'—এই শীলটি কবি হৃদয়কে গ্রহণ করেছিলেন। বৌদ্ধজাতকের মধ্যেও দেখতে পাই, পাপফল বিচার করে পশুবধ সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা আছে। (১৩) বুদ্ধদেব কামনা করেছিলেন—'সবে সত্তা সুখিতা হোন্তু—সকল প্রাণী সুখী হোক'। এই শুভেচ্ছার অকৃত্রিমতা প্রকাশ পেয়েছে আরো একটি প্রার্থনায়—

যে কেচি পাণভূতত্থি
তসা বা থাবরা বা অনবসেসা।
দীঘা বা যে মহন্তা বা
মজ্ঝিমা রস্সকা অণুকথুলা।
দিট্‌ঠা বা যে চ অদিট্‌ঠা
যে চ দূরে বসন্তি অবিদূরে।
ভূতা বা সম্ভবেসী বা
সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা।

যে কোন প্রাণী আছে, কী সবল কী দুর্বল, কী দীর্ঘ কী প্রকাণ্ড, কী মধ্যম কী হ্রস্ব, কী সূক্ষ্ম কী স্থূল, কী দৃষ্ট কী অদৃষ্ট, যারা দূরে বাস করছে বা যারা নিকটে, যারা জন্মেছে বা যারা জন্মাবে, অনবশেষে সকলেই সুখী-আত্মা হোক'। (১৪) বুদ্ধদেব সম্বন্ধে যখনই রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করেছেন, প্রায় তখনই আর একটি নির্দেশ বার বার স্মরণ করেছেন—'মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরকখে এবমিপ সর্ব্বভূতেসু মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং। মা যেমন একটিমাত্র পুত্রকে নিজের আয়ু দিয়ে রক্ষা করেন সমস্ত প্রাণীতে সেই প্রকার অপরিমিত মানস রক্ষা করবে'। (১৫) এতখানি ভালোবাসা উজার করে যে ধর্ম তুচ্ছতম প্রাণীদেরও আপন করে নিয়েছে, সেই ধর্ম প্রাণীপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথকে উদ্বুদ্ধ করবে তাতে আর আশ্চর্য কী! জীবনের শেষ পর্বে, জাভা ভ্রমণকালে বান্দুং সহরে একটি মন্দিরকারুকলা দর্শন করতে করতে কবিগুরু মৈত্রীপথিক বুদ্ধের এই প্রাণীপ্রেমের দিকটি পুনরায় স্মরণ করেছেন। বোরোবুদুরের স্থাপত্যকলা কবির ভালো লাগেনি। কিন্তু ভিত্তিগাত্রে খোদিত বুদ্ধজাতক-কাহিনী অবলম্বিত ধারাবাহিক মূর্তিগুলি দেখে তিনি আনন্দিত। একটি পত্রে লিখছেন—'মনে আছে, ছেলেবেলায় দেখেছিলুম, দড়িতে বাঁধা ধোপার বাড়ির গাধার কাছে এসে একটি গাভী স্নিগ্ধ চক্ষে তার গা চেটে দিচ্ছে; দেখে আমার বড়ো বিস্ময় লেগেছিল। বুদ্ধই-যে তাঁর কোন এক জন্মে সেই গাভী হতে পারেন, একথা বলতে জাতককথা-লেখকের একটুও বাধত না। (১৬) কেননা, গাভীর শেষ গিয়ে পৌঁচেছে মুক্তির মধ্যে। জাতক কথায় অসংখ্য সামান্যের মধ্যে দিয়েই চরম অসামান্যকে স্বীকার করেছে।...ধর্মেরই প্রকাশ চেষ্টার আলোতে সমস্ত প্রাণীর ইতিহাস বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে মহামান্বিত।' (১৭) লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথ বাইরে থেকে বুদ্ধবাণীগুলি স্মরণ ও ব্যাখ্যা করেই ক্ষান্ত হননি, নিজের জীবনের উপলব্ধির সঙ্গেও সেগুলিকে মিলিয়ে নিয়েছেন এবং সত্যকে যথাযথ অনুশীলন করতে চেয়েছেন।

অন্যদিকে বৌদ্ধধর্মের উদারতা হিন্দুধর্মের মধ্যে অনুপস্থিত বলে রবীন্দ্রনাথ বেদনা বোধ করেছেন। ধর্মের নামে, শাস্ত্রের নির্দেশে দেবদেবীকে পশুমাংস উৎসর্গ বা দেবদেবীর

সামনে প্রাণীহত্যার নির্দেশ হিন্দুশাস্ত্রে আছে। কালিকাপুরাণের ৫৬ অধ্যায়ে দেবীপূজায় বলির বিধান লিপিবদ্ধ হয়েছে। পক্ষী, কচ্ছপ, গ্রাহ (হাঙর) মৎস্য, নয় প্রকার মৃগ, মহিষ, অজ, আবিক (মেষ), গো, ছাগ, রুরু, শূকর, খড়্গ, কৃষ্ণসার, গোধিকা, শরভ, সিংহ, শার্দ্দুল, মনুষ্য এবং স্বীয় গাত্রের রুধির, এই সব দ্রব্য চণ্ডিকা ও ভৈরবাদির বলিরূপে কীর্ত্তিত হয়েছে। (১৮) আবার বলির মধ্যে নরবলিই ছিল সর্বোৎকৃষ্ট। কিভাবে পশু হত্যা করতে হয়, কোন অস্ত্র কি ভাবে নির্মিত হবে, কোন দেবী কোন কোন রক্তে খুশী হন, কোন বলিদানের ফলশ্রুতি কোন স্বর্গ বা সুখ এ বিষয়ে বিস্তৃত নির্দেশ আছে। বলি অর্থে হিংস্র হত্যা কেমন করে অবধারিত হল তাও চিন্তনীয়। বলির সংজ্ঞা হিসাবে শাস্ত্রকার বলেছেন—'দেবতাদিগকে নানাপ্রকার যে উপহার দ্বারা পূজা করা হয় অর্থাৎ দেবগণ যে সকল পূজোপহারে প্রীত হন, তাহাকে বলি কহে।' বলির আভিধানিক অর্থ উৎসর্গ, উপহার বা দান। বেদের মধ্যে অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞে মাংস রুধির উৎসর্গের যে বিধি আছে অর্বাচীন কালের পণ্ডিতেরা তা বারবার স্মরণ করেন। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান, বেদ এত প্রাচীন এবং তার পরে ভারতের সমাজ ও ধর্মবোধ এত বেশি পরিবর্তিত হয়েছে যে বেদের স্মরণে আত্মরক্ষা সম্ভব নয়। বেদের মধ্যে মানব মানবীর সম্বন্ধ, সমাজ নিয়ন্ত্রিতবিধি সম্বন্ধে এমন সব নির্দেশ আছে যা নিছক আদিম ও পাশব বলে বর্তমানে পরিগণিত হয়েছে। অবশ্য পশুহত্যার মধ্যে ধর্মের নামে হলেও, পাপবোধ যে কাজ করেনি তাও নয়। বলির হত্যাদোষ নিবারণের জন্য মন্ত্র পাঠ করার বিধি আছে। সে মন্ত্রের তাৎপর্য হচ্ছে—'সয়ম্ভু স্বয়ং যজ্ঞের জন্য পশুসকলের সৃষ্টি করেছেন, এই নিমিত্ত যজ্ঞার্থে পশুবধ করছি, অতএব এ বধ অবধ স্বরূপ, এ বলিতে পশু হনন জনিত পাতক হবে না' ইত্যাদি। তাছাড়া শাস্ত্রানির্দেশানুসারেই বলি উভয়তঃ পাপ ও পুণ্যজনক। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে লিখিত আছে—

উৎসর্গকর্ত্তা দাতা চ ছেত্তা পোষ্টা চ রক্ষকঃ।
অগ্রপশ্চান্নিরোদ্ধা চ সপ্তৈতে বধভাগিনঃ ॥ (১৯)

এই বচন অনুসারে বলিদান পাপ। ছাগ বলি সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে বিধান আছে তা নিতান্তই হাস্যকর। শাস্ত্র বলেছেন—'ছাগপশুর বয়স তিন বৎসরের কম হওয়া নিষিদ্ধ, এই রকম ছাগপশু বলি দিলে আত্মা, পুত্র ও ধনক্ষয় হয়ে থাকে'। (২০) এই সব নির্দেশ-প্রতিনির্দেশের জটিলতায় না হারিয়ে গিয়েও আমরা হিন্দু শাস্ত্রের ও আচারকর্মের স্বরূপটা সহজেই উপলব্ধি করি। সে উপলব্ধি মমতামর্য নয়। রবীন্দ্রনাথের জেহাদ এই নির্মমতার বিরুদ্ধে।

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, আচারের নামে, দেবদেবীর নামে, ধর্মের অজুহাতে মানুষ তার লোভকেই—নৃশংসতাকেই প্রশ্রয় দিয়েছে। সে তার রিপুকে বলি দেয়নি বা নিধন করেনি, রিপুকে উদ্‌বেজিত করেছে—ইন্ধন জোগান দিয়েছে রিপুর লেলিহান আত্মপ্রকাশে। এখানে শাস্ত্রসম্মত অন্ধ আদিম আচারের জয়গান থাকতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিকতার স্পর্শমাত্র এখানে নেই। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা স্মরণ করা যেতে পারে। কবি তখন শান্তিনিকেতনে। পূজাবকাশে (আশ্বিন ১৯৩৫) বিদ্যালয় বন্ধ। 'পূজাবকাশের পূর্বে রাজস্থান জয়পুরনিবাসী রামচন্দ্র শর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ যুবক মন্দিরে জীববলি বন্ধ করিবার জন্য কালীঘাটের (কলিকাতা)

কালীমন্দিরে অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করেন। কিন্তু কোনো দিক হইতে কোনো সহানুভূতি পাইলেন না। রবীন্দ্রনাথ যুবকের অনশন-পণের কথা জানিতে পারিয়া তাঁহার উদ্দেশে আশীর্বাদপূর্ণ এক কবিতা লিখিয়া পাঠাইয়া দেন।' (২১) কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রমানসটি আর একবার সম্পূর্ণ ধরা পড়েছে। এখানে কবিতাটির কিছু অংশ তুলে দিই—

প্রাণঘাতকের খড়্গে করিতে ধিক্কার
হে মহাত্মা, প্রাণ দিতে চাও আপনার,
তোমারে জানাই নমস্কার।
হিংসারে ভক্তির বেশে দেবালয়ে আনে
রক্তাক্ত করিতে পূজা সংকোচ না মানে।
সঁপিয়া পবিত্র প্রাণ, অপবিত্রতার
স্খালন করিবে তুমি সঙ্কল্প তোমার
তোমারে জানাই নমস্কার। (২২)

রবীন্দ্রনাথের এই বাণীদানের বিরুদ্ধে হিন্দুসমাজে প্রতিক্রিয়া হয়। তাঁরা তাঁকে হিন্দু আচার ও শাস্ত্রের বিরোধীরূপে অভিযুক্ত করেন। কবিগুরু কিন্তু আপন বক্তব্যকেন্দ্র থেকে বিচলিত হননি। নিজের মতের পক্ষে তিনি শাস্ত্র অন্বেষণ করে বলির বিরুদ্ধে শ্লোক বা সূক্ত সঞ্চয় করলেন না। তিনি সরাসরি আবেদন জানালেন হৃদয়ের কাছে। শাস্ত্রে বিধি আছে বলেই, হৃদয়কে উপেক্ষা করে, তা মানতে হবে কেন তা তিনি বুঝতে পারেন না। শাস্ত্র নয়, যুক্তি নয়, আচার-সংস্কার নয়—সর্বজনের অন্তরের বিশুদ্ধ মমতার কাছেই কবি করুণতম আবেদন চিরদিন রেখেছেন। এই সময় জীববলি প্রসঙ্গে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষকে কবিগুরু একটি পত্রও লেখেন। এই পত্রটির মধ্যে, অন্য আর একজনকে লিখিত কবির একটি পত্রের প্রতিলিপি ছিল। ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ সালের এই পত্রটিতে তিনি বলেছেন—"শক্তিপূজায় এক সময়ে নরবলি প্রচলন ছিল (২৩) এখনও গোপনে কখনও ঘটে থাকে। এই প্রথা এখন রহিত হয়েছে। পশু হত্যাও রহিত হবে এই আশা করা যায়।…ঠগীরা দস্যুবৃত্তি ও নরহত্যাকে তাদের ধর্মের অঙ্গ করেছিল। নিজের লুব্ধ ও হিংস্র প্রবৃত্তিকে দেবদেবীর প্রতি আরোপ করে তাকে পুণ্য শ্রেণীতে ভুক্ত করাকে দেবনিন্দা বলব।… রামচন্দ্র শর্মা আপনার প্রাণ দিয়ে নিরপরাধ পশুর প্রাণঘাতক ধর্মলোভী স্বজাতির কলঙ্ক ক্ষালন করতে বসেছেন এই জন্যে আমি তাঁকে নমস্কার করি।' (২৪) শাশ্বত বিধিবিধান বা প্রথাসিদ্ধ পাশবতার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যই এ লড়াই নয়। এখানেও রবীন্দ্রহৃদয়ের মমতার ধারাটি ফল্গুপ্রবাহিত। একটি সামান্য প্রাণীকে মৃত্যু-মুখ থেকে রক্ষা করতে পারলে তাঁর যে কী গভীর আনন্দ হয় তার একটি উদাহরণ পাই অন্যত্র—'৩রা জ্যৈষ্ঠ সকালে আমাদের জাহাজ ছাড়ল। ঠিক এই ছাড়বার সময় একটি বিড়াল জলের মধ্যে পড়ে গেল। তখন সমস্ত ব্যস্ততা ঘুচে গিয়ে, ওই বিড়ালকে বাঁচানোই প্রধান কাজ হয়ে উঠল। নানা উপায়ে নানা কৌশলে তাকে জল থেকে উঠিয়ে তবে জাহাজ ছাড়লে। এতে জাহাজ ছাড়ার নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেল। এইটিতে আমাকে বড় আনন্দ দিয়েছে।' (২৫) এই ঘটনাটি লেখার সময় কবি তোসামারু জাহাজে চীন

সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছেন ১৩২৩ সালে। তার অনেকদিন আগের আর একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করেও রবীন্দ্রনাথের করুণাময় মানসিকতার প্রকাশ এর থেকেও তীব্র ভাবে ঘটেছিল। তখন কবি থাকেন শিলাইদহে নদীবক্ষে ভাসমান বোটে। নদীতে ভাসমান মৃত পাখিদের শব দেখে তিনি কতখানি বেদনাবোধ করেন, এবং সেই বেদনানুভবের আলোক আপন অন্তরের সত্যরূপ কী ভাবে বিচার করেন তার পরিচয় আছে একটি পত্রে। 'আজকাল প্রায়ই দেখতে পাই ছোটো ছোটো মৃত পাখি স্রোতে ভেসে আসছে…এই ভাসমান মৃত পাখিগুলিকে দেখলে হঠাৎ মনের মধ্যে ভারি একটা আঘাত লাগে। বুঝতে পারি আমরা যে প্রাণকে সব চেয়ে ভালবাসি প্রকৃতির কাছে তার মূল্য যৎসামান্য। আমি দেখেছি আমি যখন মফস্বলে থাকি তখন পশুপক্ষী জীবজন্তু আমার ভারি নিকটবর্তী হয়ে আসে—আপনাকে তাদের চেয়ে খুব বেশী স্বতন্ত্র কিংবা উচুদরের মনে হয় না। একটি বৃহৎ সর্বগ্রাসী রহস্যময় প্রকৃতির কাছে আমার সঙ্গে অন্য জীবের প্রভেদ অকিঞ্চিৎকর সামান্য বলে উপলব্ধি হয়। এই পাখিগুলি যে অবহেলায় মরেছে এবং অবহেলায় ভেসে চলেছে সে আমার মৃত্যুর চেয়ে কম শোচনীয় বলে মনে হয় না। শহরে মনুষ্যসমাজ এত জটিল এবং মনুষ্যকীর্তি এত জাজ্বল্যমান যে, মানুষ সেখানে অত্যন্ত প্রধান হয়ে ওঠে, সে সেখানে নিষ্ঠুরভাবে আপনার সুখদুঃখের কাছে অন্য কোন প্রাণীর সুখদুঃখ গণনার মধ্যেই আনে না। য়ুরোপেও মানুষ এত জটিল এবং এত প্রধান যে তারা জন্তুদের বড় বেশি জন্তু মনে করে। ভারতবর্ষীয়েরা জন্মক্রমে মানুষ থেকে জন্তু এবং জন্তু থেকে মানুষ হওয়া কিছুই মনে করে না। কীটপতঙ্গ পর্যন্ত প্রাণী মাত্রেরই একটা সমশ্রেণীতা আছে, সেটা তারা খুব অনুভব করে—এর জন্যে আমাদের শাস্ত্রে সর্বভূতে দয়াটা একটা অসম্ভব আতিশয্য বলে পরিত্যক্ত হয়নি। মফস্বলের উদার প্রকৃতির মাঝখানে এলে, তার সঙ্গে দেহে দেহে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ হলে আমার সেই ভারতবর্ষীয় স্বভাবটি জাগ্রত হয়ে ওঠে—আমি জীবজন্তুর সুখদুঃখের মধ্যে প্রবেশ করতে পারি। **সামান্য ক্ষুধা নিবারণের জন্য পাখির মাংস খেতে গেলে, আমার নিজের শাবকদের কথা মনে পড়ে।** একটি পাখির সুকোমল পালকে আবৃত স্পন্দমান ক্ষুদ্র বক্ষটুকুর মধ্যে জীবনের আনন্দ যে কত প্রবল তা আর আমি অচেতন ভাবে ভুলে থাকতে পারি নে।' (২৬)

পশুপাখিদের প্রতি এই প্রীতিবৃত্তিটি বালক বালিকাদের মধ্যে গড়ে তুলবার জন্য তিনি শান্তিনিকেতনের শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে একটি পরিকল্পনাও যোগ করেছিলেন। তিনি বলেছেন— 'আশ্রমের গাছপালা পশুপাখিকে সেবা করাও একটা বড় সাধনা…স্থানে স্থানে কাঠবিড়ালি, পাখি প্রভৃতির জন্যে তারা (ছাত্ররা) পানীয় ও নিজের খাদ্যের অংশ রেখে দেবার ব্যবস্থা করে দেয়— এটাও চাই' এই মমতাচর্চা সম্বন্ধে তিনি অন্যত্র বলেছেন—'আপনি যদি সংগত ও সুবিধাজনক মনে করেন তবে গোশালায় গাভীগুলির তত্ত্বাবধানের ভার ছাত্রদের প্রতি কিয়ৎপরিমাণে অর্পণ করিতে পারেন। দুইটি হরিণ আছে, ছাত্রগণ যদি তাহাদিগকে স্বহস্তে আহারাদি দিয়া পোষ মানাইতে পারে তবে ভালো হয়। আমার ইচ্ছা কয়েকটি পাখি মাছ ও ছোট জন্তু আশ্রমে রাখিয়া ছাত্রদের প্রতি তাহাদের পালনের ভার দেওয়া হয়। পাখি খাঁচায় না রাখিয়া প্রত্যহ আহারাদি দিয়া ধৈর্যের সহিত মুক্ত পাখিদিগকে বশ করানোই ভালো। শান্তিনিকেতনে কতকগুলি পায়রা

আশ্রয় লইয়াছে, চেষ্টা করিলে ছাত্ররা তাহাদিগকে ও কাঠবিড়ালিদিগকে বশ করাইতে পারে।(২৭) শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের দ্বারা এই মমতার চর্চা ব্যর্থ হয়নি। যে কেউ শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর ইতিহাস পড়েছেন তিনিই সে-খবর জানেন।

প্রাণিকুলে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব, প্রাণী-সংরক্ষণ, পশুপ্রীতি বিষয়গুলিই নয়, অন্য কয়েকটি মানসিক দিকও দৃষ্টিগোচর হয়। যে প্রাণযাত্রার স্বতঃস্পন্দন তিনি মানুষের মধ্যে দেখেছেন, দেখেছেন তরুলতার মধ্যে, সেই প্রাণের নিরন্তর প্রকাশ ও বেগ পশু-পাখি-কীট-পতঙ্গের মধ্যেও তিনি লক্ষ্য করেছেন। লক্ষ্য করেছেন কখনো কবির মতো, কখনো বা দার্শনিকের মতো। কখনো বা বা বৈজ্ঞানিকের মতো। ভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি বলছেন—'পশুপাখিদেরও প্রাণের ঐশ্বর্য আছে। সে তাদের প্রাণশক্তিরই বিশেষ বিশেষ বিকাশ। পাখি উড়তে পারে, এ তার একটি সম্পদ। মাঝে মাঝে এই সম্পদকে সে উপলব্ধি করতে চায়, মাঝে মাঝে সে ওড়ে, কোনো প্রয়োজনে নয়, ওড়বার জন্যে; সে তার পক্ষচালনা দিয়ে আকাশে এই কথা ঘোষণা করে যে, 'আমি পেয়েছি'। এই তার উৎসব। বুনো ঘোড়া খোলা মাঠে এক এক সময় খুব করে দৌড়ে নেয়—কোনো কারণ নেই। সে নিজেকে বলে, আমার গতিবেগ আমার সম্পদ; 'আমি পেয়েছি'। এই উৎসাহ ঘোষণা করেই তার উৎসব। ময়ূর এক-এক বার আপন মনে তার পুচ্ছ বিস্তার করে, আপন পুচ্ছশোভার প্রাচুর্য গৌরব সে আপনারই কাছে প্রকাশ করে; আপন অস্তিত্বের ঐশ্বর্যকে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়ে সে অনুভব করে যে, জীবলোকে তার একটি বিশেষ সম্মান আছে।' (২৮) এক প্রাণ-জননীর সন্তান প্রাণীরা তাঁর কাছে প্রাণপ্রতীকরূপে প্রতিভাত হয়েছে। তাঁর শেষ জীবনের কাব্যে প্রাণীকে প্রতীকরূপে দেখার উদাহরণ সুপ্রচুর।

আর প্রকাশ পেয়েছে ক্ষুদ্র পিপীলিকা, কূজনরত, নীড়াশ্রয়ী পাখি, সহজদৃষ্ট কীটপতঙ্গের জীবনধারার নানা খুটিনাটি সম্বন্ধে নিরঞ্জন নিরন্তর ঔৎসুক্য। তাদের মন, প্রেমপদ্ধতি, পরিবার প্রতিপালন, প্রকৃতির সঙ্গে আত্মরক্ষা ও সহযোগিতার সম্বন্ধ, মৃত্যুভীতি প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁর জানার ইচ্ছাও কখনো লক্ষণীয় ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সকাল থেকে কোকিলের একটানা উদগ্রীব ডাক শুনে কবি নানা কল্পনা ও চিন্তা করতে করতে এই বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে—'বাস্তবিক ঐ ডানাওয়ালা ছোট ছোট নিরীহ জীবগুলি, অতি কোমল গ্রীবাটুকু বুকটুকু এবং পাঁচমিশালি রং নিয়ে গাছের ছায়ায় বসে আপন আপন ঘরকন্না করছে—ওদের আসল বৃত্তান্ত কিছুই জানি নে।' (২৯) রবীন্দ্রকাব্যধারাতেও এই ঔৎসুক্যচিহ্ন অনুপস্থিত নয়। পুনশ্চ কাব্যের 'কীটের সংসার' কবিতাটি এই একই উপলক্ষে লেখা। 'সমস্ত সৃষ্টির কেন্দ্রে আছে' যে পিঁপড়া মাকড়সা প্রভৃতি কীটপতঙ্গেরা তাদের সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না বলে পুনরায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তাই ক্ষোভে আগ্রহে মিলিত কবির উক্তি—

আমি মানুষ
　　মনে জানি সমস্ত জগতে আমার প্রবেশ,
　　　　গ্রহনক্ষত্রে ধূমকেতুতে
　　　　আমার বাধা যায় খুলে খুলে।

কিন্তু ঐ মাকড়সার জগৎ বন্ধ রইল চিরকাল
আমার কাছে,
ঐ পিঁপড়ের অন্তরের যবনিকা
পড়ে রইল চিরদিন আমার সামনে,
আমার সুখে দুঃখে ক্ষুব্ধ
সংসারের ধারেই।

জীবজগতের ক্ষুদ্রতুচ্ছতমদের জীবন সম্বন্ধে জানার ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, বহুমানবের ইচ্ছার প্রকাশ তাঁর এই কবিতার মধ্য দিয়ে ঘটেছে। বর্তমান বৈজ্ঞানিকেরা দীর্ঘদিন একাগ্র গবেষণা চালিয়ে বহু তথ্যও উদ্ঘাটন করেছেন।

সব কিছুর আগে বা সব কিছুর পরেও রবীন্দ্রনাথ কবি—সৌন্দর্যপ্রিয় রোমান্টিক কবিচূড়ামণি। পাখিদের ওড়ার ছন্দ, পালকের বর্ণবাহার, স্বরে মাধুর্য তাঁর সৌন্দর্যসম্ভোগের চিরন্তন উৎস। গৃহপরিবেশে পালিত পশুদের, সহায়ক জন্তুদের, 'বন্যেরা বনে সুন্দর' প্রাণীদের খেলা-চলা বিশ্রামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হতে তিনি সদা তৎপর। কখনো দেখি, প্রাণীদের সৌন্দর্যের দ্বারা তিনি যেমন আপন চিন্তাকে কল্পনাকে বোধকে সুন্দর করেছেন, তেমনি আপন অনুভূতি ও সৃষ্টিশীলতা দিয়ে কোন পাখি বা পতঙ্গকে স্বাভাবিকের চেয়ে সুন্দরতর করে তুলেছেন। এই দিক থেকে সব চেয়ে সৌভাগ্যবান বলাকা, কোকিল, হরিণ, নীলকণ্ঠ, মৌমাছি ও প্রজাপতি।

১। ৪৫ নং পত্র। ছিন্নপত্রাবলী।

২। দুই ইচ্ছা। পথের সঞ্চয়।

৩। ১১ অধ্যায়। জাপানযাত্রী।

৪। নানা বিদ্যার আয়োজন। জীবনস্মৃতি।

৫। ৪৯ নং পত্র। ছিন্নপত্রাবলী।

৬। ১৪২ পৃঃ, রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতা। ধীরানন্দ ঠাকুর।

৭। প্রথম জীবনে লিখিত 'দয়ালু মাংসাশী' নামক রচনায় মাংসাহারের পক্ষে ছদ্ম সমর্থনে মাংসভোজীদের তীব্র ব্যঙ্গ করেছিলেন। (দয়ালু মাংসাশী। বিবিধ প্রসঙ্গ)।

৮। পশুপ্রীতি, ৩০৬ পৃঃ প্রবন্ধ সংগ্রহ, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৩৬৯, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা।

৯। তদেব।

১০। চখা-শিকার। পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ। শচীন্দ্রনাথ অধিকারী।

১১। বর্তমানে রবীন্দ্রনাথের অসহায় বেদনা নানাবিধ প্রাণিসংরক্ষণ প্রচেষ্টার মধ্যে কার্যকরী হচ্ছে। এ যুগ প্রাণি-নিবাসের যুগ। স্বয়ং জওয়াহরলাল নেহেরু বলছেন—'আমাদের দেখবার জন্যে, কিংবা সঙ্গে খেলবার জন্যে এই চমৎকার পশুপাখিগুলি যদি না থাকে, তাহলে জীবনটা বড় নিরানন্দ আর বর্ণহীন হয়ে পড়বে। তাই, আমাদের বন্য প্রাণী এখনও যা রয়েছে তাদের বাঁচাবার জন্যে যতগুলো সম্ভব ততগুলো প্রাণিনিবাস (sanctuary) স্থাপনে উৎসাহ দেওয়া দরকার।'

(নয়াদিল্লী, ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪। ভূমিকা : ভারতের বন্য প্রাণী। ই, পি, জি)

১২। ১১৭ নং পত্র ছিন্নপত্রাবলী।

১৩। যথা 'মৃতকভক্ত জাতক'। ৪৫ পৃঃ জাতক, ১ খণ্ড। ঈশানচন্দ্র ঘোষ (অনু)।

১৪। ব্রহ্মবিহার, 'বুদ্ধদেব' গ্রন্থ। ৪৭৬ পৃঃ, ১১ খ, র, রচনাবলী, জ, শ, সং।

১৫। তদেব।

১৬। বিড়াল জাতক, শৃগাল জাতক, বিরোচন জাতক, কাক জাতক, সুবর্ণহংস জাতক, কপোত জাতক, দর্দক জাতক প্রভৃতি আখ্যানগুলি তার প্রমাণ। এখানে দেখি বোধিসত্ত্ব ভিন্ন ভিন্ন জন্মে কপোত, হস্তি, হংস বা কাকরূপে জন্মলাভ করেছেন।

১৭। ১৯, জাভাযাত্রীর পত্র।

১৮। বলি। বিশ্বকোষ। নগেন্দ্রনাথ বসু।

১৯। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড, ৬১ অধ্যায়।

২০। তিথিতত্ত্ব।

২১। ৩৫ পৃঃ, রবীন্দ্র জীবনী ৪ খণ্ড। ১৩৭১। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

২২। ১২০ পৃঃ প্রবাসী। কার্তিক ১৩৪২।

২৩। সত্যই ছিল। 'দুর্গোৎসবতত্ত্বে' নরবলির বিধান আছে। পিতৃমাতৃহীন, যুবক, বিবাহিত, দীক্ষিত, ব্যাধিশূন্য, পরদারবিহীন, অজারিক ও বিশুদ্ধ চরিত্র—এই সব গুণসম্পন্ন নরই বলির উপযুক্ত ছিল। তাছাড়া তান্ত্রিকদের দ্বারা ৭-১৯ শতাব্দী পর্যন্ত এই নৃশংস পূজাপদ্ধতি কেবল বাংলা নয়, সমগ্র হিন্দুস্থানে ব্যাপ্ত হয়েছিল।

২৪। ১২১ পৃঃ প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪২।

২৫। ৯ অধ্যায়। জাপান যাত্রী।

২৬। ১৪১ নং পত্র। ছিন্নপত্রাবলী।

২৭। কুঞ্জলাল ঘোষকে লিখিত পত্র। প্রথম কার্যপ্রণালী, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম।

২৮। ৬ অধ্যায়, ভারতপথিক রামমোহন রায়।

২৯। ৫২ নং পত্র। ছিন্নপত্রাবলী।

রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনস্টাইন, বন্ধুত্ব-ইতিহাস

অশ্রুকুমার সিকদার

রবীন্দ্রনাথের বিলাতযাত্রা

১৯১২ সালের ১৬ই জুন সন্ধ্যায় কবি সদলে লণ্ডনে পদার্পণ করেন। টমাস কুক কোম্পানি ব্লুমস্‌বেরি হোটেলে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করে এবং তাঁরা টিউবট্রেনে করে গন্তব্যস্থানে যান। টিউবট্রেনে চড়ার এই সম্পূর্ন নূতন অভিজ্ঞতায় কী কাণ্ড ঘটলো তা রথীন্দ্রনাথ On the Edges of Time-এ চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন। যে থলির মধ্যে ইংরেজি গীতাঞ্জলি ও গার্ডনারের পাণ্ডুলিপি ছিল তা ট্রেনে ফেলে তিনি চলে গেলেন এবং পরদিন রোটেনস্টাইনের বাড়ি যাবার সময় রবীন্দ্রনাথ পাণ্ডুলিপি চাইলে সেই গুরুতর ভ্রম ধরা পড়লো। তিনি লিখছেন—

With my heart in my mouth I hastented to Left Luggage office. One can imagine my relief, when at last I discovered the lost property there. Since then I often wondered what shape the course of events might have taken if the manuscript of Gitanjali had been lost through my negligence. হুটন গ্রন্থাগার সংগ্রহে রোটেনস্টাইনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের যে প্রথম চিঠিটি রক্ষিত আছে তার তারিখ ৭ই জুন ১৯১২, তার ঠিকানা ও Villas on the Heath, Vale of Heath, Ham (P) stead—সেই ক্ষুদ্র চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন,

I send you some more of my poems rendered into English. They are far too simple to bear the strain of translation but I know you will understand them through their faded meanings. চিঠির তারিখ স্পষ্টই ভুল, ৭ই জুন নয়, ১৭ই জুন হতে পারে বরং। (১) কারণ পত্রপাঠে বোঝা যায় ইতিমধ্যে কবির সঙ্গে রোটেনস্টাইনের দেখা হয়েছে এবং রোটেনস্টাইনের হাতে ইতিমধ্যেই কবি কিছু অনুবাদ অর্পণ করেছেন। ১৬ই জুন লণ্ডনে পদার্পণ করে মনে হয় ১৭ই তিনি পাণ্ডুলিপি দিয়ে আসেন এবং ১৭ই সন্ধ্যায় পুনর্বার পূর্বোক্ত চিঠির সঙ্গে আরো পাণ্ডুলিপি পাঠান।

হয় ১৬ই জুন অথবা তার পরের দিন রবীন্দ্রনাথ দুই বন্ধু প্রমথলাল সেন ও ব্রজেন্দ্রলাল শীল সমভিব্যহারে রোটেনস্টাইনের বাড়ি যান। রোটেনস্টাইন এঁদের অনুরোধ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে বিলাতে আসার জন্য লিখতে। তারপর যেদিন তিনি শুনলেন রবীন্দ্রনাথ লণ্ডনে আসছেন সেদিন থেকে প্রতি মুহূর্তে তিনি তাঁর জন্য অপেক্ষা করে রইলেন। দুই বন্ধুর মধ্যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুই প্রতিনিধির মধ্যে, সাক্ষাৎ হলো। রবীন্দ্রনাথের রচনার নমুনা তিনি দেখতে চাইলে শিলাইদহে রোগশয্যায় ও সমুদ্রযাত্রাকালে কৃত অনুবাদের খাতাটি তিনি তুলে দিলেন। এই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনেক পরে রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিং থেকে লিখেছেন (২৬ জুন, ১৯৩১)—

Of all the facts in my life the fact of my meeting you in London in 1912 was most amazing in its consequences in the opening up of a prospect for me so utterly different from my former environment. Your discovery of a few meagre pages of my manuscript brought me out of my seclusion into the heart of a large world and turned me into a migratory being that has its two homes in the two opposite shores of the sea.

যেদিন অনুবাদগুলি পেলেন সেদিন সন্ধ্যায় রোটেনষ্টাইন সেগুলি পড়ে ফেললেন ; তাঁর মনে হলো, তিনি আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছেন, Here was poetry of a new order, which seemed to me on a level with that of the great mystics.

এই সময়ের ঘটনাবলী সম্বন্ধে উত্তরকালে স্মৃতি রোমন্থন করতে যেয়ে রবীন্দ্রনাথ আর একটি চিঠিতে লিখেছেন (২৬ নবেম্বর ১৯৩২)

I am sure you remember with what reluctant hesitation I gave up to your hand my manuscript of Gitanjali feeling sure that my English was of that amorphous kind for whose syntax a school-boy could be reprimanded. The next day you came rushing to me with assurance which I dared not take seriously and to prove to me the competence of your literary judgment you made three copies of those translation and sent them to stopferd Brooke, Bradley and Yeats.

ব্র্যাডলের উক্তি রোটেনষ্টাইন আত্মজীবনীতে উদ্ধৃত করেছেন—

It looks as though we have at last a great poet among us again.

স্টপফোর্ড ব্রুকের মন্তব্য রবীন্দ্রজীবনী দ্বিতীয় খণ্ডে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

I have read them with more than admiration, with gratituds for their spiritual help, and for the joy they bring and comfirm and for the love of beauty which they deepen and for more than I can tell.

ইয়েটস প্রথমে রোটেনষ্টাইনের চিঠির জবাব দেন নি—পরে তিনি রোটেনষ্টাইনের তুল্য উৎসাহ বোধ করেন এবং পল্লীবাস থেকে লণ্ডনে চলে আসেন তাঁর মুগ্ধতা জানানোর জন্য। ইয়েটস্ কত দূর পর্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন তার, প্রমাণ তিনি ইংরেজি গীতাঞ্জলির সুপরিচিত ভূমিকায় দিয়েছেন।

I have carried the manuscript of these translation about me for days, reading it in railway trains or on the top of the omnibuses and in restaurants, and I have often had to close it lest some stranger would see how much it moved me. (২)

সেই ঐতিহাসিক সন্ধ্যা

কয়েকদিন পরে ৩০শে জুন তারিখে রোটেনষ্টাইনের বাড়িতে গৃহকর্তা ও ইয়েটসের উদ্যোগে

তর্জমাগুলি পাঠের ব্যবস্থা হল। সভায় এঁরা দুজন ছাড়া ছিলেন এভেলিন আণ্ডারহিল, আরনেস্ট রীস, চার্লস ট্রেভেলিয়ান, এজরা পাউণ্ড, এলিস মেনেল, হেনরি নেভিনসন। পরবর্তীকালের অনুগত সহচর চার্লি এণ্ড্রুজও সেদিন ঘটনাচক্রে উপস্থিত ছিলেন—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই প্রথম তাঁর সাক্ষাতে যোগাযোগ। এণ্ড্রুজের জীবনীতে সেই তথ্য পাওয়া যায়। Congress of the Empire-এ যোগদানের জন্য তিনি ১৯১২ সালে বিলাতে গিয়েছিলেন। নেভিনসন, যিনি ইতিপূর্বে দিল্লিতে এণ্ড্রুজের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন তিনি বললেন—

"Would you like to meet Rabindranath Tagore? William Rothenstein the artist has invited me to go over to his house in Hampsted on sunday evening. Tagore is to be there, and william Yeats, the Irish poet is to read some English translation of his work. Why not come along too?"

এণ্ড্রুজকে বেশি বলার প্রয়োজন ছিল না, তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাতেরই একটি সুযোগ খুঁজছিলেন। The sunday evening in Hampstead was one of the landmarks of his life.

সাহিত্যিক-শিল্পীদের কেন্দ্রভূমি হ্যামস্টেড পল্লীতে রোটেনষ্টাইনের বাড়িতে সেই ঐতিহাসিক সন্ধ্যায় সুধীজন সমাবেশে ইয়েটস্ গীতাঞ্জলির কবিতাগুলি তাঁর 'musical, ecstatic voice'-এ পড়ে শোনালেন। এই পাঠের পূর্বে কী ঘটেছিল, এবং পরে কী ঘটলো তার বিবরণ পাই 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে যেখানে সেই অতীতের সুখস্মৃতি রোমন্থন লিপিবদ্ধ হয়েছে।

'রোটেনষ্টাইনের বাড়িতে ইয়েটস্ যেদিন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে সভার আয়োজন করলে 'গীতাঞ্জলি' শোনাবার জন্যে, সে যে কি সংকোচ বোধ করেছিলুম বলতে পারিনে। বার বার বলেছি কাজটা ভালো হবে না। ইয়েটস্ শুনল না কিছুতে। অদম্য সে। করলো আয়োজন, বড় বড় সব লোকেরা এলেন, হলো 'গীতাঞ্জলি' পড়া। কারো মুখে একটি কথা নেই—চুপ করে, শুনে চুপচাপ সব বিদায় নিয়ে চলে গেল—না কোন সমালোচনা, না প্রশংসা, না উৎসাহসূচক একটি কথা। লজ্জায় সংকোচে আমার তো মনে হতে লাগল ধরণী দ্বিধা হও। কেন ইয়েটস্-এর পাল্লায় পড়ে করতে গেলুম এ কাজ! আমার আবার ইংরেজি লেখা, কোনদিন শিখেছি যে লিখবো? এই সব মনে হয়, আর অনুতাপ অনুশোচনায় মাথা তুলতে পারি নে। তারপর দিন থেকে আসতে লাগলো চিঠি—উচ্ছ্বসিত চিঠি—চিঠির স্রোত; প্রত্যেকের কাছ থেকে চিঠি এল একেবারে অপ্রত্যাশিত রকমের।' Painful silence'-এর পর যে চিঠিগুলি এল তার মধ্যে একটি মে সিনক্লেয়ারের, রবীন্দ্রনাথ সেটি স্মৃতিকথায় উদ্ধৃত করেছেন—

It was impossible for me to say anything to you about your poems last night, because they are of a kind not easily spoken about. May I say now that as long as I live, even if I were never to hear them again, I shall never forget the impression that they made. It is not only that they have an absolute beauty, a perfetion as poetry but that they have present for me foever the divine thing

that I can only find by flashes and with an agonizing uncertainty. I don't know whether it is possible to see through another's eyes, I am afraid it is not ; but I am sure that it is possible to believe through another's certainty.

There is nothing to compare with what you have done except the poems of St. John of the Cross : 'The Dark Night of the soul' and you surpass him and all Christian poets of Mysticism that I know by that sense of the Absolute, that metaphysical insight. It, to my mind, Christian mysticism almost completely lacks. It deals too much in sensual imagery, it is not sufficiently austere and subtle—it has not really seen through the illusion of the world. And therefore its passion is not and cannot be entirely pure.

At least so it has always seemed to me, and that is why fiinding this imperfection in it, it sends me away still unsatisfied.

Now it is satisfaction—this flawless satisfaction—you gave me last night. You have put into English which is absolutely transparent in its perfection things it is despaired of ever seeing written in English at all or in any western language.

সেই ঐতিহাসিক সন্ধ্যার অনুভূতির কথা এণ্ডরুজ তাঁর what I owe to Christ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতার নবীন আসবে তিনি মত্ত হয়েছিলেন—

I walked back along the side of Hampstead Heath with H. W. Nevinson but spoke very little. I wanted to be alone and think in silence the wonder and glory of it all.

চ্যাপম্যানকৃত হোমারের অনুবাদ পড়ে কীটসের যা মনে হয়েছিল এই প্রসঙ্গে সেই কথা এণ্ডরুজের মনে পড়ে গিয়েছিল।

Then felt I like some watcher of the skies when a new planet swims into his ken.

(১) রবীন্দ্রনাথই আবার ভুল তারিখের জন্য শ্রীযুক্তা রোটেনষ্টাইনকে ছদ্ম তিরস্কার করেছেন (১১ই মে ১৯১৩)—"You are as delightfully impossible in your chronology as a poet could wish. The dates that you have given me in your letter don't quite fit in with those of the almanach...you have asked me to come on 16th Thursday, also on the following Tue[s]day 2'st. You must explain to me whether I should follow your days or your dates..."

(২) সমসাময়িককালে লণ্ডন থেকে ইন্দিরা দেবীকে লেখা ৬ মে ১৯১৩-র চিঠিটি উল্লেখযোগ্য

(চিঠিপত্র ৫)—"গীতাঞ্জলির ইংরেজি তর্জমার কথা লিখেছিস। ওটা যে কেমন করে লিখলুম এবং কেমন করে লোকের এত ভাল লেগে গেল, সে কথা আমি আজ পর্যন্ত ভেবেই পেলুম না। আমি যে ইংরেজি লিখতে পারি নে এ কথাটা এমনি সাদা যে এ সম্বন্ধে লজ্জা করবার মতো অভিমানটুকুও আমার কোনদিন ছিল না।...রোটেনষ্টাইন আমার কবিযশের আভাস, পূর্বেই আর একজন ভারতবর্ষীয়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। তিনি যখন কথাপ্রসঙ্গে আমার কবিতার নমুনা পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, আমি কুণ্ঠিত মনে তাঁর হাতে আমার খাতাটি সমর্পণ করলুম। তিনি যে অভিমত প্রকাশ করলেন সেটা আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না। তখন তিনি কবি য়েটস্-এর কাছে আমার খাতা পাঠিয়ে দিলেন—তারপরে কি হল সে ইতিহাস তোদের জানা আছে।"

বাংলার মন্দির

হিতেশরঞ্জন সান্যাল

আটচালা

চারচালা পরিণতি লাভ করিয়াছে আসিয়া আটচালায়। দোচালা হইতে যেমন চারচালা, চারচালা হইতে তেমনি আটচালা ভাবকল্পনার ক্রমবিকাশের পথে বিস্তৃতির পরিণতির ফল। বাসগৃহে আটচালার সংখ্যা সীমিত। বাংলাদেশের পশ্চিম অঞ্চলের কঠিন মৃত্তিকা ভিন্ন দ্বিতল আটচালা নির্মাণ করা যায় না। উপরন্তু ব্যয় বাহুল্যের প্রশ্ন তো আছেই। এই সব কারণেই বোধ করি আটচালা বাসগৃহের সংখ্যা সর্বদা সীমিত থাকিয়া গিয়াছে। বাসগৃহের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকিলেও আটচালা আচ্ছাদনের রূপরেখা কিন্তু বাংলাদেশের মন্দির স্থপতিদের চিত্তজয় করিয়া নিয়াছিল। জনপ্রিয়তা ইহার সর্ব্বাধিক—চালারীতির মধ্যে তো বটেই—প্রচলিত অন্যান্য রীতির তুলনাতেও ওই একই কথা।

চালা রীতির চর্চ্চায় বাসগৃহ হইতে মন্দিরের আকৃতি ক্রমশ দূরে সরিয়া গিয়া চালা মন্দিরের বিশিষ্ট রূপে প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে। আগেই বলিয়াছি নির্মাণের উপকরণ ও নির্মাণ কৌশল হইতে পার্থক্যের সূচনা আর ভাবককল্পনার ক্রমবিকাশের পথে ঘটিয়াছে সেই রূপের বিকাশ। বাসগৃহ নির্মাণ করিতে হইলে দ্বিতল ভিন্ন আটচালা হয় না—চারচালা প্রথম তলের উপর আর একটি চারচালা কক্ষ, আটচালা দেহ এই দুই অংশে বিভক্ত। দ্বিতলের কক্ষটি স্থাপন করিবার জন্য প্রথমতলের আচ্ছাদন পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। কিছুটা উঠিবার পরই ইহার আচ্ছাদন হইয়া উঠে সমতল। দ্বিতলের আচ্ছাদনটি একটি পূর্ণাঙ্গ চারচালা—উভয়ের একত্র সংযোগে আটচালায় উদ্ভব। বহিরেখা দেখিতে অনুরূপ হইলেও আটচালা মন্দির কিন্তু মূলগতভাবে ভিন্ন। আটচালা মন্দিরদেহ একটি মাত্র তলেই সম্পূর্ণ—ইহারই দ্বিধাবিভক্ত আচ্ছাদনে আটচালা আচ্ছাদনের সংহতি। গর্ভগৃহের লম্বমান দেওয়ালের উপর আচ্ছাদনের প্রথম অংশটি চারচালার আকৃতিতে বেশ খানিকটা উঠিয়া যাইবার পর সমতল পাটাতন রচনা করিয়া শেষ হয়। ইহার উপরে থাকে দ্বিতীয় অংশটি—ক্ষুদ্রাকৃতি একটি পূর্ণাঙ্গ চারচালা।

আটচালা মন্দির দেহের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যটি বুঝাইবার জন্যই প্রথমে আচ্ছাদনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছি। কিন্তু স্থাপত্য কর্মের আলোচনায় আসন হইতে উপরের দিকে উঠিয়া যাওয়াটাই হইল প্রথা। এইবার সেই প্রথাগত আলোচনায় আসিতেছি। আটচালা মন্দিরের আচ্ছাদন সাধারণতঃ বর্গাকার অথবা আয়ত সংস্থিত। আসনের ক্ষেত্র অবলম্বন করিয়া দেওয়াল ও তাহার উপরে আচ্ছাদন বাসগৃহে দেওয়াল শেষ হয় আনুভূমিক সরল রেখা রচনা করিয়া। আচ্ছাদনের অন্ত্যঅংশ দেওয়াল ছাড়াইয়া খানিকটা আগাইয়া থাকে। দেওয়ালের উর্দ্ধাংশকে বৃষ্টির ছাঁট হইতে রক্ষা করিবার জন্যই আচ্ছাদন বিন্যাসের এই পদ্ধতি। ইটের মন্দিরে তো এ সমস্যা নাই। আচ্ছাদনের ওই বর্দ্ধিতাংশটুকু তাই সেখানে অনুপস্থিত। দেওয়ালের উন্মুক্ত শীর্ষ দেওয়াল গাত্রের

সমতল উপর্যুপরি বক্ররেখায় রচিত কার্নিস স্পর্শ করিবার জন্য ধনুকাকৃতিতে বাঁকিয়া যায়। ইহার উপরে উঠিবে দ্বিধাবিভক্ত আচ্ছাদন।

এতাবৎ যতগুলি আটচালা মন্দিরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে প্রাচীনতমটির অবস্থান বাংলাদেশে নহে, উড়িষ্যায়। ময়ূরভঞ্জ জেলার বারিপাদা সহরের নিকটবর্ত্তী হরিপুর গড়ের আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে নির্মিত রসিক রায় মন্দিরটি আটচালা রীতির নিদর্শন। ইহার পরেই উল্লেখ করিতে হয় ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে নির্মিত বর্দ্ধমান জেলার বাঘনাপাড়া গ্রামের কৃষ্ণবলরাম মন্দির, হাওড়া জেলার মেল্লক গ্রামের ১৬৫১ খৃষ্টাব্দের মদনগোপাল মন্দির ও ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে গঠিত হুগলী জেলার হরিপাল রায়পাড়ার রাধামাধব মন্দিরের।

হরিপুরগড়ের রসিক রায় মন্দিরটির দেহ কালপ্রভাবে জীর্ণ—স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—বিশেষ করিয়া মুখভাগে। সেখানে দেওয়াল গিয়াছে ভাঙ্গিয়া। আচ্ছাদনের অংশটিও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ। সুপ্রাচীন মন্দিরটির ভগ্নদেহের যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাহা হইতে বুঝা যায় আয়ত আসনের উপর মন্দিরদেহ গুরুভার। বক্র অগ্রভাগে দেওয়ালের সর্বাধিক উচ্চতা আসনের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা অনেক কম। তার আচ্ছাদনটি কিন্তু দেওয়ালের সমান উচ্চতায় অধিষ্ঠিত। দ্বিধাবিভক্ত আচ্ছাদনের মোট উচ্চতার অধিকাংশ জুড়িয়া নিম্নাংশের অবস্থান—উপরের হ্রস্বায়ত চারচালাটি নিম্নাংশের প্রায় অর্দ্ধেক বাঘনাপাড়ার কৃষ্ণ-বলরাম মন্দিরে আসনের রূপ এবং আসন ও দেওয়ালের সম্পর্ক পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তরই অনুরূপ। বিস্তৃত দেহে ভারও সঞ্চিত হইয়াছে যথেষ্ট। মন্দিরটির আচ্ছাদন কিন্তু উচ্চতায় দেওয়াল অপেক্ষা হ্রস্বতর অথচ আসনের সবটুকু জুড়িয়াই তো ইহার বিস্তার, আসনের অনুপাতে হ্রস্বায়ত দেওয়ালের উপর আচ্ছাদনের এই খর্বতা যেন একটু বেশী করিয়াই চোখে পড়ে। এতৎসত্বেও কিন্তু আচ্ছাদনের রচনায় ভাবকল্পনার সংহতি লক্ষ্য করিবার মত। উর্দ্ধাংশ ও নিম্নাংশের উচ্চতায় কোন পার্থক্য রাখা হয় নাই; নিম্নাংশের গতিবেগ উত্তরভাগে উঠিয়া পূর্ণ মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে—অসাম্যের বাধায় স্তব্ধ হইয়া যায় নাই।

আটচালা মন্দিরের আদিরূপের পরিচয় আমাদের সম্মুখে উপস্থিত নাই, কিন্তু হরিপুরগড় ও বাঘনাপাড়ার মন্দিরদ্বয়ের দিকে চাহিলে তাহার একটা আভাষ বোধ করি ফুটিয়া উঠে। মন্দির দেহের বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্পর্ক যে কি হইতে পারে তাহার সুনির্দিষ্ট কোন পরিচয় স্থপতির অজ্ঞাত ছিল বলিয়াই দেহ গঠনে সামঞ্জস্যের অভাব আর সমগ্র মন্দিরদেহ ব্যাপ্ত করিয়া অপর্য্যাপ্ত ভারের সঞ্চয়।

মেল্লক গ্রামের মদনগোপাল মন্দির (১৬৫১ খৃ:) ও হরিপাল গ্রামের রাধাগোবিন্দ মন্দিরে (১৬৫৪ খৃ:) সংহত ভাবকল্পনার ক্রমবিকাশের গুরুত্বপূর্ণ পর্য্যায়ের সৃষ্টি। আয়ত আসনের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা দেওয়ালের উচ্চতা কম বটে কিন্তু দেওয়াল ও আচ্ছাদন অনুরূপ উচ্চতায় অধিষ্ঠিত। আচ্ছাদনের উভয় অংশের আনুপাতিক সম্পর্ক নির্ণয়ে নিম্নভাগ ও উত্তর ভাগের উচ্চতা হইয়াছে সমান। আচ্ছাদনে পরিকল্পনায় আর একটি প্রমাণ হইল বিস্তারিত দৈর্ঘ্যের মধ্যে চালার বক্ররেখায় নিয়ন্ত্রিত মৃদু গতিবেগ। হরিপালের রাধাগোবিন্দ মন্দিরের অঙ্গবিন্যাস মেল্লক মন্দিরেরই সমগোত্রীয় তবে আসনের দৈর্ঘ্য ও দেওয়ালের উচ্চতার মধ্যে পার্থক্য অনেক কমিয়া আসিয়াছে। দীর্ঘায়ত
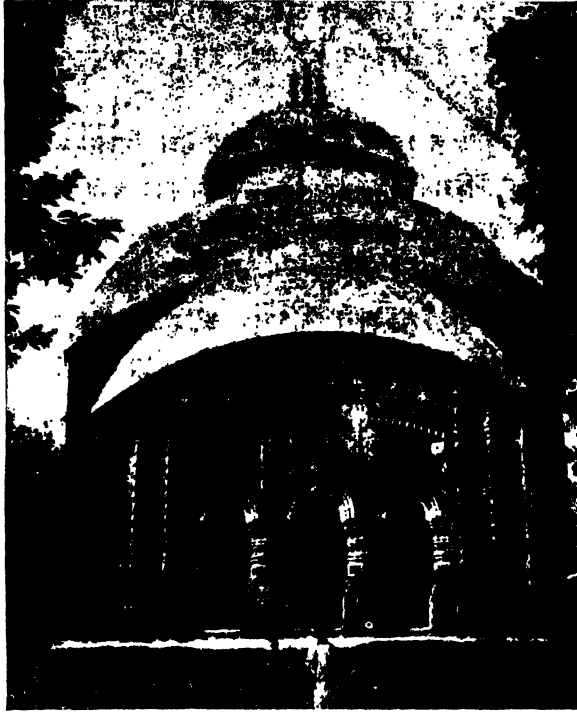
রাধাগোবিন্দ মন্দির, আঁটপুর

দেহে পূর্ববর্তী মন্দিরগুলির মত গুরুভার সঞ্চয়ের অবকাশ আর নাই। দীর্ঘদিনের ক্রমাগত চর্চায় জড়তামুক্ত ভাবকল্পনার নিঃসঙ্কোচ বিকাশের সঙ্গে হরিপালের ললিতগম্ভীর মন্দিরদেহে দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে।

এতক্ষণ যে আলোচনা করিলাম তাহা কালানুক্রমিক। প্রাচীনতম মন্দিরগুলিতে ভাবকল্পনা বিকাশের ধারাটি যতদূর সম্ভব ধরিয়া দিবার জন্যই এই কালানুক্রমিক আলোচনার অবতারণা করিয়াছিলাম। কিন্তু আটচালা মন্দিরের দেহ গঠনে ভাবকল্পনার যে রূপভেদ পরিলক্ষিত হয় তাহার সুনির্দিষ্ট কালানুক্রমিক কোন গতি নাই। মন্দিরদেহের অঙ্গবিন্যাসে ও আচ্ছাদনের রূপরেখা রচনায় ভাবকল্পনার বহুতর প্রকাশ একই সঙ্গে সারা দেশ জুড়িয়া চলিয়াছে। এই ব্যাপক আবর্তনের মধ্যে যেমন ঘটিয়াছে বিচিত্র উদ্ভাবন ও নবতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা তেমনি দেখিতেছি প্রাচীনতম মন্দিরদেহের বৈশিষ্ট্যগুলির পুনরাবির্ভাব।

সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ হইতে বাংলাদেশে অসংখ্য আটচালা মন্দির নির্মিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে অঙ্গবিন্যাসের সর্বতোগ্রাহ্য কোন পরিমাপ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। বস্তুতঃ রূপভেদ এত ব্যাপক যে তাহাদের মধ্যে অঙ্গবিন্যাসের যতগুলি রূপভেদ দৃষ্টিগোচর আসন দৈর্ঘ্যের সমান উচ্চতা বিশিষ্ট দেওয়াল ও সমোচ্চ আচ্ছাদন সম্বলিত মন্দিরদেহ নির্মাণের প্রবণতাটাই অধিক। হরিপালের রাধাগোবিন্দ মন্দিরে যে সম্ভাবনা পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল, কিছুটা পরবর্তীকালে

ভাবকল্পনার ক্রমবিকাশের পথে রূপলাভ করিয়া তাহাই হইয়া উঠিল বহু ব্যাপক। চারচালা মন্দিরের ক্ষেত্রেও দীর্ঘায়ত মন্দিরদেহের সীমাবন্ধনও এই একই রূপ। সেখানেও এই রূপটির জনপ্রিয়তাই সর্বাধিক।

কতকগুলি মন্দিরে স্থপতি আরও একটু বেশী আগাইয়া গিয়াছেন। দেওয়াল আসনের দৈর্ঘ্যসীমা পশ্চাতে ফেলিয়া উঠিয়া গিয়াছে। এই শ্রেণীর মন্দিরে অবশ্য আচ্ছাদনের উচ্চতা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন প্রথা অনুপস্থিত। মন্দির হইতে মন্দিরে আচ্ছাদনের উচ্চতায় দেখিতেছি প্রকারভেদ ঘটিতেছে। বর্ধমান জেলার বৈদ্যপুর গ্রামের কুণ্ডুপুকুরের তীরবর্তী চতুঃশিবমন্দিরে দেওয়াল ও আচ্ছাদন পরস্পরের সমান উচ্চ। চতুরস্র আসনের উপর মন্দিরের কৃশ দেহ দীর্ঘছন্দের সহজ সাবলীলতায় বিকশিত। কিন্তু বাঁকুড়া জেলার হাটকৃষ্ণনগর গ্রামে কুণ্ডুবাড়ীর দামোদর মন্দির ও ময়রা পাড়ার দামোদর মন্দিরে আচ্ছাদন দেওয়াল এমন কি আসন হইতেও হ্রস্ব। সুদীর্ঘ দেওয়ালের উপর খর্ব আচ্ছাদনের অসঙ্গতি স্থপতির দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে।

আর এক শ্রেণীর মন্দিরে দেখিতেছি প্রাচীনতম মন্দিরগুলির মত আসনের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা দেওয়াল অনেক হ্রস্ব। ইহাদেরও আচ্ছাদন সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট পরিমাপ নাই। হাওড়া জেলার খড়িয়প গ্রামের খড়গেশ্বর শিব মন্দির (১৬৮১ খৃঃ), রাউতারা গ্রামের ঘোষপাড়াস্থ সীতারাম মন্দির (১৭০০ খৃ) চব্বিশ পরগণা জেলার মন্দির বাজার গ্রামের কেশবেশ্বর মন্দির (১৭৪৮ খৃঃ) হুগলী জেলার বালী-দেওয়ানগঞ্জ গ্রামের দামোদর মন্দির (১৮২২ খৃ), শ্রীরামপুর সহরের বল্লভপুরস্থিত রাধাবল্লভ মন্দির (১৭৬৪ খৃঃ), গুপ্তিপাড়া গ্রমের বৃন্দাবনচন্দ্র মন্দির (১৮১০ খৃঃ), গোবিন্দপুর গ্রামের শ্রীধর মন্দির (১৭২২ খৃঃ) দেওয়াল ও আচ্ছাদন সমান উচ্চতায় অধিষ্ঠিত। অন্যদিকে রহিয়াছে হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়া গ্রামের কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির (অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি) আঁটপুর গ্রামের রাধাগোবিন্দ মন্দির (১৭৪৬ খৃঃ), চব্বিশ পরগনা জেলার কাঁচরাপাড়া গ্রামের কৃষ্ণরায় মন্দির (১৭৮৫ খৃঃ) চব্বিশ পরগনা জেলার হালিশহর-খাসবাটীর শিব মন্দিরদ্বয় ও বাঁকুড়া জেলার সিমলাপাল রাজবাটীর শিব মন্দিরটি—ইহাদের ক্ষেত্রে আসনের দৈর্ঘ্য হইতে দেওয়াল হইতে আচ্ছাদন উচ্চতায় হ্রস্বতর। নদীয়া জেলার শান্তিপুর সহরের শ্যামচাঁদ মন্দিরে ১৭২৬ খৃঃ ঠিক বিপরীত ঘটনা ঘটিয়াছে। মন্দিরটিতে আচ্ছাদন দেওয়াল হইতে উচ্চতর এবং আসনের দৈর্ঘ্যের সমান। বস্তুতঃ আসনের বিস্তারের মধ্যে মন্দিরদেহ গঠনে যতখানি উচ্চতা অর্জনের সম্ভাবনা নিহিত ছিল এই শ্রেণীর মন্দিরগুলিতে তাহা প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে উপেক্ষিত। আসন হইতে হ্রস্বতর দেওয়ালের অসঙ্গতি হয়তো ক্ষেত্র বিশেষে সাধারণ দৃষ্টি এড়াইয়া যায় কিন্তু দেওয়াল হইতে হ্রস্বতর আচ্ছাদন রচনার প্রতিটি নিদর্শন পরিমাণবোধের একান্ত অভাবে অত্যন্ত দৃষ্টিকটু হইয়া

অঙ্গবিন্যাসের এই বিস্তৃত পটভূমিকার উপর হইয়াছে আচ্ছাদনের রূপরেখা লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা। অবশ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিধি সঙ্কীর্ণ। চারচালা আচ্ছাদনের প্রকৃতির মধ্যে সম্ভাবনা ছিল প্রচুর। সেই সম্ভাবনা উপলব্ধির পথেই নদীয়া-মুর্শিদাবাদ-বীরভূম-মালুটি অঞ্চলে চারচালা আচ্ছাদন লইয়া বলিষ্ঠ কল্পনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল বিচিত্র রূপভেদের মধ্য দিয়া। আটচালা

মন্দিরে ভাবকল্পনার ক্রমবিকাশ বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা আচ্ছাদনের মূলগত বৈশিষ্ট্যের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। প্রথমাবধিই আটচালা মন্দিরের রূপরেখায় নির্দিষ্টতার বন্ধন, রূপভেদ যাহা ঘটিয়াছে তাহা ওই বন্ধনের মধ্যেই—অতিক্রম করিয়া নূতনতর রূপানুসন্ধানের কোন প্রচেষ্টা ঘটে নাই। ফলে পরিমাণবোধ ও অনুপাতের প্রয়োজনে উচ্চতা নির্ধারণ ছাড়া রূপভেদের প্রধান অবলম্বন হইয়াছে চালা দেহের বক্ররেখা। ইহাকেই বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত করিয়া রূপভেদের সৃষ্টি। এ প্রচেষ্টা কখনও বা আঞ্চলিক কখনও বা স্থপতির ইচ্ছা ও কল্পনা অনুসারে বহু বিস্তৃত অঞ্চলের মধ্যে অকস্মাৎ আসিয়া দেখা দেয়।

আটচালা আচ্ছাদনের রূপভেদ লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিবার আগে আটচালার প্রকৃতি ও তাহার মূলীভূত সমস্যা সম্বন্ধে কিছু বলিয়া লওয়া প্রয়োজন। আটচালা আচ্ছাদনের উভয় অংশে চালার উপর বক্ররেখার গতিবেগে ঘনিষ্ঠ সমগোত্রীয়তা থাকিলেও তাহার গতিভঙ্গ দুইটি অংশে সাধারণতঃ ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে। নিম্নভাগের চালায় বক্ররেখার যে গতিভঙ্গ আচ্ছাদনের শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করিবার সম্ভাবনা তাহার থাকে না; তাহার স্বাভাবিক গতিপথও উর্দ্ধাংশের প্রান্ত বাহিয়া নহে। উর্দ্ধাংশের সংক্ষিপ্ত আয়তনে চলার গতিভঙ্গ নিম্নাংশ হইতে পৃথক। অর্থাৎ আচ্ছাদনের পাদমূল হইতে শীর্ষবিন্দু পর্য্যন্ত বর্হিরেখা নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহের সহিত বিস্তৃত নহে দুইটি ভিন্নায়ত অংশের স্বতন্ত্র রূপের উপর তাহার নির্ভর। পীড় মন্দিরের আচ্ছাদনও একাধিক স্বতন্ত্র অংশে বিভক্ত। কিন্তু নিয়ম অনুসারে আচ্ছাদনের সাধারণ প্রবাহমান বহিরেখার মধ্যেই অংশগুলি বিধৃত বহিরেখার গতি অংশগুলির পরিমাপ ও বিস্তার অনুসারে নহে—বহিরেখার পূর্বকল্পিত গতিপথের মধ্যেই অংশগুলির বিন্যাস।

আটচালা মন্দিরে উত্তরভাগ আচ্ছাদনের অর্দ্ধাংশ জুড়িয়া থাকে। তাই নিম্নাংশের সহিত উত্তরভাগ যোগে অখণ্ড কল্পনা রূপ লাভ করিবে ইহাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু আটচালা মন্দিরগুলি দেখিয়া মনে হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থপতি প্রবাহমান বহিরেখার নিরবচ্ছিন্নতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। এই কারণেই নিম্নাংশের চালাগুলিকে স্বাভাবিক গতিতে সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হইয়া যাইতেছে এই ভাবে গড়িয়া তোলা হয়। আর উর্দ্ধাংশের চালাগুলিও স্বয়ংসম্পূর্ণ। নিম্নাংশ ও উত্তরভাগ কোনটিরই চালাগুলিকে সাধারণতঃ পরস্পরের প্রতি প্রসারিত করিয়া গড়িয়া তোলা হয় না। আচ্ছাদন রচনায় এই খণ্ডিত কল্পনাই বোধ করি আটচালা দেহের প্রধানতম সমস্যাসূত্র। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ সমস্যা অবহেলিত থাকিয়া গিয়াছে—সমাধানের প্রচেষ্টা করা হয় নাই। এতৎসত্বেও অধিকাংশ আটচালা আচ্ছাদন যে দৃষ্টিকটু হইয়া উঠে নাই তাহার কারণ বোধ করি উভয় অংশে চালা-দেহে বক্ররেখার গতিবেগে মূলগত সমগোত্রীয়তা এবং সাধারণ বহিরেখা হইতে আচ্ছাদনের দ্বিধাবিভক্ত প্রকৃত বহিরেখার অনতিদূরত্ব। হরিপুরগড়ের মন্দির হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত আটচালা আচ্ছাদন নির্মাণে এই খণ্ডিত কল্পনারই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যাইবে।

হরিপুরগড়ের রসিক রায় মন্দিরের জীর্ণ আচ্ছাদনের বিদ্যমান অংশে নিম্নভাগ মোট উচ্চতার অধিকাংশ ক্ষেত্রে জুড়িয়া উঠিয়া আসিয়াছে। উত্তরভাগ তাই হ্রস্বায়ত। মিলিতভাবে ইহারা

বিধ্বস্ত দেওয়ালের সমান উচ্চতা অর্জন করিয়া নিয়াছে। বাঘনাপাড়ার কৃষ্ণবলরাম মন্দিরের আচ্ছাদন দেওয়ালের অনুপাতে অনেক সংক্ষিপ্ত. অথচ বিস্তার তাহার আসনের বিস্তৃতির সবটুকু জুড়িয়াই। লম্বমান দেওয়ালের উপর প্রশস্ত আচ্ছাদনের খর্ব আকৃতির মধ্যেও কিন্তু আচ্ছাদনের উভয় অংশ উচ্চতায় পরস্পরের সমান উচ্চতায় অধিষ্ঠিত, বক্ররেখার গতিভঙ্গের প্রকৃতিও সম্পূর্ণ সমগোত্রীয়। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে গঠন বলিয়া চালাগুলি প্রথমাবধিই ভিতরের দিকে বিশেষভাবে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে। বাঁকান কার্ণিসের বক্ররেখার ইঙ্গিত আচ্ছাদনের দেহ গঠনে দেখিতেছি প্রায় অবহেলিত।

বাঘনাপাড়ার কৃষ্ণ-বলরাম মন্দিরে যাহা অর্জিত হয় নাই মেল্লকের মদনগোপাল মন্দির ও হরিপালের রাধাগোবিন্দ মন্দিরে তাহারই প্রকাশ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার। দেওয়ালের শীর্ষ বাহিয়া বক্ররেখা কার্নিসে ও আটচালা আচ্ছাদনের চালা দেহে বক্ররেখার গতিভঙ্গ মৃদু—আয়ত আঁখি পল্লবের মত। দেওয়ালের সমান উচ্চতায় অধিষ্ঠিত দীর্ঘায়ত আচ্ছাদনে কমনীয় বক্ররেখার প্রবাহ যে রূপসৃষ্টির প্রধানতম অবলম্বন—মন্দির দুইটির বিশেষ করিয়া ভারবর্জিত রাধাগোবিন্দ মন্দিরের দিকে চাহিয়া দেখিলে সংশয়ের অবকাশ থাকে না। আটচালা আচ্ছাদন নির্মাণ ইহাই চূড়ান্ত উৎকর্ষের সাক্ষ্য এবং সাধারণভাবে সর্বত্র অনুসৃত। ইহার মধ্যেও যে রূপভেদ ঘটে নাই এমন নহে তবে সীমা অতিক্রম করিবার প্রচেষ্টা যে নাই একথা বোধ করি দ্বিধা না রাখিয়াই বলা চলে।

আটচালা আচ্ছাদনে আয়ত আঁখিপল্লবের গতিপথ সাধারণ নিয়ম বটে কিন্তু ব্যতিক্রমও ব্যাপক। বিষ্ণুপুরের দৃষ্টান্ত দিয়াই শুরু করি। মন্দির-নগরী বিষ্ণুপুরে মন্দির দেহের রূপ নিয়া যে বিস্তৃত পরীক্ষা-নিরীক্ষা হইয়াছিল তাহার কথা তো আগেই বলিয়া আসিয়াছি। একরত্ন মন্দির বিষ্ণুপুরের বৈশিষ্ট্য হইলেও চালা মন্দির নিয়াও স্থপতিরা সেখানে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরের সুবিখ্যাত জোড়বাংলাটির আলোচনার সময় তাহার কিছুটা পরিচয় দিয়া আসিয়াছি। আটচালা আচ্ছাদনের গৃহীত রূপ লইয়া তাঁহারা ক্ষান্ত থাকেন নাই, তাহার মধ্যেও রূপভেদ আনিয়াছেন। বিষ্ণুপুরে চতুরস্র আসনের উপর দেওয়ালের উচ্চতা আসনের সমান। উর্দ্ধবিস্তারের আচ্ছাদন দেওয়ালের উচ্চতার অনুরূপ। কিন্তু আচ্ছাদনের অংশ দুইটি উচ্চতায় সমান নহে—উত্তরভাগ কিছুটা ছোট। অনেকটা হরিপুর গড়ের রসিক রায় মন্দিরের মত। চালাগুলির ঢাল কিছুটা খাড়া। মোট উচ্চতার অর্দ্ধেকের বেশী অংশ অতিক্রম করিয়া নিম্নভাগ যেখানে সমতল পাটাতনে শেষ হইয়াছে সেখানে উর্দ্ধাংশ তাহার প্রায় সবটুকু জুড়িয়া বিদ্যমান—চারিপাশে ছাড়া হইয়াছে সামান্যই। উর্দ্ধাংশের দেওয়ালের উচ্চতা অত্যল্প সামান্য একটু উঠিবার পরেই শুরু হইয়াছে চারচালা আচ্ছাদন, উর্দ্ধাংশের আকৃতি রচনার এই পদ্ধতি পীড় আচ্ছাদনের অঙ্গ বিন্যাসের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

আচ্ছাদনের উভয় অংশে চালার গতিভঙ্গের দিকে চাহিলে দেখা যাইবে নিম্নাংশে চালাগুলির উর্দ্ধভাগে সমাপ্তির কোন ইঙ্গিত নাই—উত্তরভাগের চালাগুলিও স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। গতিভঙ্গে উভয়ে উভয়ের দিকে প্রসারিত। উভয়ের অতিসন্নিকটতায় অখণ্ড ভাবকল্পনা প্রবহমান বহিরেখার

বন্ধনের মধ্যে রূপলাভ করিয়াছে। উর্দ্ধাংশের স্বল্পোচ্চ দেওয়াল সেখানে বাধা সৃষ্টি করে নাই। বস্তুত, আটচালা আচ্ছাদনের মূলীভূত সমস্যাগুলি উত্তরণের প্রচেষ্টা হইতেই বিষ্ণুপুরের বিশিষ্ট ভাবকল্পনার জন্ম।

বিষ্ণুপুরের বাহিরে দেহ বিন্যাস ও আচ্ছাদনের রূপরেখা রচনায় ভাবকল্পনার এই রূপভেদ দেখা যাইতেছে বিষ্ণুপুর অঞ্চলের দক্ষিণস্থিত মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা গ্রামের রাধামাধব মন্দিরে (১৬৮৫ খৃঃ) চন্দ্রকোণা সহরের রঘুনাথ মন্দির প্রাঙ্গণস্থিত লালজী মন্দিরে (আনুমানিক অষ্টাদশ শতকের শেষ অথবা উনবিংশ শতকের প্রারম্ভ সময়) ও বাঁকুড়া জেলার সিমলাপাল রাজবাটীর গৃহদেবতার আবাসগৃহে। বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়র সহরের নিকটবর্তী হাটকৃষ্ণনগর গ্রামে কুণ্ডুবাড়ীর দামোদর ও ময়রাপাড়ার দামোদর মন্দিরে (আনুমানিক অষ্টাদশ শতকের শেষ বা উনবিংশ শতকের প্রারম্ভ সময়) আচ্ছাদনে বিষ্ণুপুর রীতির প্রভাব সুস্পষ্ট, তবে, চালার আকৃতি অনেক বেশী বাঁকান, প্রায় গম্বুজের মত বহির্বর্তুল। অঙ্গবিন্যাসেও ইহাদের স্বাতন্ত্র রহিয়াছে—দেওয়াল আসনের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা অনেক বেশী উচ্চ এবং দেওয়াল অপেক্ষা আচ্ছাদন হ্রস্ব।

আটচালা আচ্ছাদনের চালাগুলিকে যতদূর সম্ভব গম্বুজের বহিঃবর্তুল রূপরেখায় বাঁকাইয়া দেওয়া হইয়াছে এইরূপ প্রচেষ্টার নিদর্শন মিলিবে মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পূর্ব অংশে চন্দ্রকোণা ক্ষীরপাই-দাসপুর অঞ্চলের কতগুলি মন্দিরে। চন্দ্রকোণা সহরের গাছশীতলা মোড়ের দক্ষিণস্থিত শান্তিনাথ শিব মন্দিরে, ক্ষীরপাই সহরের শীতলানন্দ শিব মন্দিরে (১৮৪০ খৃঃ) কদমকুণ্ডু পল্লীর খড়গেশ্বর শিব মন্দিরে, গঙ্গাদাসপুর গ্রামের উমাপতি মন্দিরে, বীরসিংহ গ্রামের কালীবুড়ী মন্দিরে ও সুপুরবাজার গ্রামের ব্রহ্মচারী শিব মন্দিরে চালা আচ্ছাদন একেবারে গম্বুজের মত গোল হইয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। ইহাদের কার্ণিসও অর্দ্ধবৃত্তের মত করিয়া বাঁকান। প্রায় একই রূপের পুনরাবৃত্তি হইয়াছে হুগলী জেলার আঁটপুর গ্রামের রামেশ্বর মন্দিরে (১৭৬৯ খৃঃ) ও শ্রীরামপুর সহরের রাধাবল্লভজীউর সুবিখ্যাত মন্দিরায়তনে। হাট-কৃষ্ণনগর গ্রামের মন্দিরগুলির কথা তো একটু আগেই বলিয়া আসিয়াছি।

চালার আকৃতি নির্ণয়ে চন্দ্রকোণা-ক্ষীরপাই অঞ্চলে যে ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত রূপ পরিলক্ষিত হয় আর এক শ্রেণীর মন্দিরে। হুগলী জেলার বোরাগড় গ্রামের ১৬৭৯ খৃঃ নির্মিত গোপাল মন্দিরে চালাগুলি উঠিয়াছে খানিকটা খাড়া ঢালের সহিত। বর্ধমান জেলার জৌগ্রামের অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত রাধাকান্ত মন্দিরে ওই একই রূপের পুনরাবৃত্তি দৃষ্টিগোচর। চব্বিশ পরগণা জেলার মন্দির বাজার গ্রামের কেশবেশ্বর মন্দিরে (১৭৪৮ খৃঃ) ও কলিকাতার কুমারটুলী পল্লীর বনমালী সরকার স্ট্রীটের অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত শিব মন্দিরের চালাগুলিতে ঢাল অত্যন্ত খাড়া। আচ্ছাদনের দেহে কমনীয় বক্ররেখার স্থান অধিকার করিয়াছে সোজা ঢালের কাঠিন্য। প্রতিটি কোণ বাহিয়া অনমনীয় রেখা সমগ্র আচ্ছাদনটিকে কঠিন রেখার বন্ধনে বাঁধিয়া দিয়াছে।

বিষ্ণুপুরের স্থপতিরা আটচালা আচ্ছাদনের অখণ্ড রূপরেখা রচনায় নিম্নাংশকে যতটুকু প্রাধান্য দিয়াছিলেন তাহার তুলনায় অনেক বেশী প্রাধান্য লাভ করিয়াছে বীরভূম জেলার সুবিখ্যাত

তারা পীঠের তারা মন্দিরে (১৮১৮ খৃঃ) আটচালা আচ্ছাদনের নিম্নাংশ বস্তুত নিম্নাংশের অবস্থান এখানে আচ্ছাদনের মোট উচ্চতার তিন চতুর্থাংশ জুড়িয়া। চালাগুলি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ভিতরের দিকে ঝুঁকিয়া অগ্রসরমান। তাই নিম্নাংশের শীর্ষস্থ পাটাতনটি অত্যন্ত স্বল্প আয়তনের। উত্তর-ভাগের আকারও তাই অতিশয় হ্রস্বায়ত। দেখিয়া মনে হয়, আচ্ছাদনটির রচনা—অখণ্ড আকৃতির কথা চিন্তা করিয়া। তবে অখণ্ডতার এ কল্পনা সম্ভবতঃ আটচালা আচ্ছাদনের মূলীভূত সমস্যা সমাধানের প্রয়াস হইতে সম্ভূত নহে, বীরভূম অঞ্চলের বহুল প্রচলিত চারচালা আকৃতির অনুকরণের ফল। এই কারণেই বোধ করি নিম্নাংশ আচ্ছাদনের মোট উচ্চতার প্রায় সবটুকুই অধিকার করিয়া বিদ্যমান—উত্তরভাগের সংযোজন শুধুমাত্র নিয়মরক্ষার প্রয়োজন। তারা মন্দিরের রূপরেখার অনুকৃতি সামান্যই হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলার দরিয়াপুর গ্রামের শিব মন্দির ও হাওড়া জেলায় বেলুড় ও বালী ষ্টেশনের মধ্যবর্তী স্থানে রেল লাইনের পশ্চিমদিকে একটি পরিত্যক্ত মন্দির আচ্ছাদন রচনায় অনুরূপ বিন্যাসের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিতেছে। হাওড়া জেলার বাগনান অঞ্চলে কয়েকটি আধুনিক মন্দিরে এইরূপের পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়।

কতকগুলি মন্দিরের আচ্ছাদনে আবার উর্দ্ধাংশের উচ্চতাই বেশী। নিম্নাংশ তাহার সাধারণ সীমা আচ্ছাদনের মোট উচ্চতার অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত পৌছিবার পূর্বেই সমতল পাটাতনে শেষ হইয়া গেল। ইহার উপরে প্রশান্ত ও দীর্ঘায়ত উত্তরভাগে অবশিষ্ট অংশটুকু অধিকার করিয়া বিরাজমান। এইরূপ বিন্যাসের উদাহরণ হইল দোহাজারী গ্রামের জোড়া শিব মন্দির। মন্দিরদ্বয়ে আসনের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা দেওয়ালের উচ্চতা অনেক বেশী—কিন্তু আচ্ছাদন ও দেওয়াল পরস্পরের সমান। অঙ্গবিন্যাসের গুণে মন্দিরদেহ হইয়া উঠিয়াছে দীর্ঘায়ত—ইহার উপর আচ্ছাদনের উত্তরভাগের বহুল বিস্তার। কৃশকায় মন্দিরদেহ পরিমাণবোধের একান্ত অভাবে দৃষ্টিকটু হইয়া উঠিয়াছে।

বঙ্কিম উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা

অশোক কুণ্ডু

[বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্র ও চরিনামের আলোচনা বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়েছে। প্রত্যেকটি নামের প্রথম উপস্থিতি প্রথম বন্ধনীর মধ্যে নির্দেশিত হয়েছে। বোঝার সুবিধার জন্য প্রথম কয়েকটিতে বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া আছে, পরেরগুলিতে সংক্ষেপ করা হয়েছে।]

কুল্‌সম (চন্দ্রঃ ২।১)॥

কুল্‌সম দলনী বেগমের পরিচারিকা। সাধারণ পরিচারিকার মতই অর্থের প্রতি সে আসক্তি দেখিয়েছে। গুরগণ খাঁর কাছে পত্র দিয়ে যাবার সময় তাই সে দলনীকে বলে—"আমি দাসী। পত্র দাও—আর কিছু নগদ দাও।"

কিন্তু অন্তরের দিক থেকে কুল্‌সম দলনীর সখীত্বের স্তরে উন্নীত হয়েছে। দলনীর ভাগ্য-বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে কুলসমের কাছেও নবাব-হারেমের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। তবুও পরিচারিকা হিসাবে তার অন্য উপায় ছিল। কিন্তু সে দলনীর সঙ্গেই চন্দ্রশেখরের আশ্রয় গ্রহণ করেছে, এবং সেখান থেকে ইংরেজের নৌকায় উঠেছে। যদিও সে নবাবের ভয়ে দলনীর সঙ্গ ছাড়তে চায়নি, তবুও দলনীর প্রতি কিছুটা মায়াও ছিল। অবশেষে কুল্‌সম দলনীকে ত্যাগ করে গেলে, দলনীর জীবনে সর্বনাশ ঘটল।

কিন্তু দলনীর মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে, এককালের নবাব-ভয়ে ভীতা কুল্‌সমই দৃপ্তা হয়ে উঠেছে। নবাবের মুখের উপর তাকে 'মুর্খ' বলেছে। তখনই এই নারী হয়ে উঠেছে একটি চরিত্র, তার আগে ছিল দলনীর ছায়ামাত্র।

কৃষ্ণকমল চক্রবর্তী (চন্দ্রঃ ২।৪)॥

সুন্দরী ও রূপসীর পিতা। তার সম্বন্ধে বলা হয়েছে তিনি সুন্দরীর অত্যন্ত বশীভূত। তাই সহজেই রূপসীর শ্বশুরালয়ে, অর্থাৎ চন্দ্রশেখরের গৃহে যেতে সম্মতি দিলেন।

কৃষ্ণকান্ত রায় (কৃঃ উঃ ১।১)॥

হরিদ্রাগ্রামের জমিদার। অহিফেনসেবনে সর্বদাই নিমীলিতলোচন কৃষ্ণকান্ত রায় রসিকও বটেন। বঙ্কিমের কমলাকান্তের সঙ্গে যেন তাঁর খানিকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। কৃষ্ণকান্ত সৎ লোক। তিনি ভ্রাতার সম্পত্তি, তার মৃত্যুর সুযোগেও, ফাঁকি দেননি। গোবিন্দলালকে তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য উইল করে দিয়েছেন। তবে গোবিন্দলালের প্রতি তাঁর স্নেহ-দৌর্বল্যের অন্ত ছিল না। আগেকার দিনের একান্নবর্তী পরিবারের কর্তা যেমন হয়ে থাকেন, কৃষ্ণকান্তও তেমনি। এইসব লোকের সততা ও স্বার্থত্যাগের জন্যই একান্নবর্তী পরিবার টিকে ছিল। অসৎচরিত্র, নিজপুত্র হরলালের প্রতি

কৃষ্ণকান্তের কঠোর ব্যবহার তাঁর প্রতি পাঠকের শ্রদ্ধাই জাগিয়ে তোলে। রোহিনীকে পুলিশে না দিয়ে নিজে শাস্তি দেবার সঙ্কল্পে কৃষ্ণকান্তের সেকালের দৃঢ়চিত্ত জমিদারের মনোবৃত্তিই প্রকাশিত। বৃদ্ধ বয়সে তাঁর একটু বাৎসল্যরসই প্রবল। রোহিনীকে চোরের দায় থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য গোবিন্দলালের চেষ্টাকে বুড়া কৃষ্ণকান্ত যেভাবে সরল আদিরসাত্মক রসিকতার দ্বারা ব্যাখ্যা করেছে, তাতে তাঁর রসিক মনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষ্ণকান্তের ভ্রমরের প্রতিও যথেষ্ট স্নেহ ছিল। তাই গোবিন্দলালের হাবভাবে সন্দেহ প্রকাশ করে তিনি মৃত্যুকালে ভ্রমরকে সম্পত্তির অধিকার দিয়ে যান। এই ঘটনাই ভ্রমর-গোবিন্দলালের বিচ্ছেদকে অবশ্যসম্ভাবী করে তুলেছে। উইল সংক্রান্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই কৃষ্ণকান্তের উপন্যাসে উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী ছিল।

কৃষ্ণকান্তের গৃহিণী (কৃঃ উঃ ১।১)

কৃষ্ণকান্তের গৃহিণীর ভাগে ৵০ বিষয়ের উইল ছাড়া উপন্যাসে আর কিছু জোটে নি।

কৃষ্ণগোবিন্দ দাস (দেঃ চৌঃ ১।৯) ॥

প্রফুল্ল বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে যে বৃদ্ধের মৃত্যুকালে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলো, তার নাম কৃষ্ণগোবিন্দ দাস। 'কৃষ্ণগোবিন্দ কায়স্থের সন্তান'। অনেক বয়সে এক সুন্দরী বৈষ্ণবীর হাতে পড়ে তার ভবঘুরে জীবন সুরু হল। শেষ পর্যন্ত বৈষ্ণবীর সৌন্দর্য লুকোবার জন্য তাকে বৈকুণ্ঠ-পুরের জঙ্গলে গিয়ে বাস করতে হয়। তবুও বৈষ্ণবী থাকলো না। মৃত্যুকালে বুড়োকে ফেলে পালালো। বুড়ো মৃত্যুকালে তার উদ্ধার করা গুপ্তধন প্রফুল্লকে দান করে যায়। প্রফুল্লের অর্থ-প্রাপ্তির প্রয়োজনে উপন্যাসে এই বৃদ্ধের উপস্থিতি।

কৃষ্ণগোবিন্দের বৈষ্ণবী (দেবীঃ ১।৯) ॥

উপন্যাসে প্রত্যক্ষ উপস্থিতি নেই। বৈষ্ণবীর স্বভাবচরিত্র মোটেই ভাল ছিল না।

কৃষ্ণদাস বসু ও কৃষ্ণদাস বসুর স্ত্রী (ইন্দিরা ৪র্থ পরিঃ) ॥

এই কৃষ্ণদাস বসু ও তাঁর পরিবারের সঙ্গেই ইন্দিরা কোলকাতা যাত্রা করেছিল।

কৃষ্ণমোহন দত্ত (ইন্দিরা ১৮শ পরিঃ) ॥

ইন্দিরার খুড়া। ইনি বিবাহকালে ইন্দিরাকে সম্প্রাদান করেছিল। উপন্যাসে প্রত্যক্ষ উপস্থিতি নেই।

কেশব (মৃণাঃ ৪।৩) ॥

মনোরমার পিতার নাম। উপন্যাসে উল্লেখমাত্র আছে।

খস্রু (কপা: ৩।১, রাজ: ৮।৮) ॥

সেলিম বা জাহাঙ্গীরের প্রধানা মহিষী যিনি রাজা মানসিংহের ভগিনী, খস্রু তাঁর পুত্র। আকবরের মৃত্যুর পর তাঁকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাবার চেষ্টা হয়, কিন্তু আকবরের চেষ্টায় তা' ব্যর্থ হয়। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে এই ব্যর্থতার কথা সংক্ষেপে উল্লেখ আছে। ইতিহাসও এই ঘটনার সমর্থন করে "...Khan-i-Azam, Raja Man Singh and some other nobles of the court, plotted to secure the succession for Salim's son, Khusrau." (An Advanced History of India.) 'রাজসিংহ' উপন্যাসে খস্রু কর্তৃক রাজপুতদের ক্ষতির কথা উল্লিখিত হয়েছে।

খাজা আয়াস (কপা: ৩।৩) ॥

"আকবর শাহের কোষাধ্যক্ষ (আকতিমাদ-উদ্দৌলা)"। তিনি মেহের উন্নিসার পিতা। ইতিহাস বলে পরে মেহেরউন্নিসার পিতার নাম হয়েছিল—ইতিমাদ-উদ্দৌলা (I'timad-ud-daulah)।

খাঁ আজিম (দুর্গে: ১।৩) ॥

"মুসলমানদিগের প্রধান খাঁ আজিম, তিনি প্রধান রাজমন্ত্রী, তিনি খস্রুর শ্বশুর।" (কপা:) 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে আকবরের আদেশে তাঁর উড়িষ্যা এবং বঙ্গদেশে পাঠানবিদ্রোহ দমনের ব্যর্থতার কথা এবং 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে জামাতা খস্রুর সিংহাসন লাভের ব্যাপারে সাহায্য করার কথা উল্লিখিত হয়েছে।

খাজা ইসা (দুর্গে : ২।১৭) কতলু খাঁর একজন কর্মচারী।

খাঁ জাঁহা খাঁ (দুর্গে) ॥

"৯৮৬ অব্দে দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধি খাঁ জাঁহা খাঁ পাঠানদিগের দ্বিতীয়বার পরাজিত করিয়া উৎকল দেশ নিজ প্রভুর দণ্ডাধীন করিলেন।" (দুর্গে)।

খিজির শেখ (রাজ: ১।৫) ॥

তসবিরওয়ালী বুড়ীর পুত্র। দিল্লীতে তার দোকান আছে। তার বিবির নাম ফতেমা। সে মায়ের কাছ থেকে সুকৌশলে রূপনগরের রাজকন্যা চঞ্চলকুমারী কর্তৃক ঔরঙ্গজেবের চিত্রদলনের কাহিনীটি জেনে নিয়ে অর্থলোভে এই সংবাদ নবাবের কাছে বিক্রী করবার ব্যবস্থা করেছিল। উপন্যাসের স্বল্প পরিসরেই সে বেশ চতুরতার পরিচয় দেয়।

ক্ষীরোদা বা ক্ষীরি (কৃ: উ: ১।১৪) ॥

কৃষ্ণকান্তের গৃহের একজন দাসী। উপন্যাসে তার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। ভ্রমরের কথা

শুনে সে রোহিণীকে মরতে বলেছিল। আবার ভ্রমরের কাছ থেকে চড় খেয়ে সে পাড়ার সকলের কাছে গোবিন্দলাল রোহিণী বৃত্তান্ত রং ফলিয়ে বলেছিল। অবশ্য ভ্রমরের সর্বনাশ সাধন যে তার উদ্দেশ্য ছিল তা নয়। গ্রাম্য কলহপ্রিয় সাধারণ দাসীচরিত্র এই ক্ষীরি।

গঙ্গাধর স্বামী (সীতাঃ ১।১৩) ॥

ললিতগিরির পদতলে হস্তিগুম্ফা নামে এক গুহায় "পরম যোগী মহাত্মা গঙ্গাধর স্বামী বাস করতেন।" সন্ন্যাসিনী জয়ন্তী শ্রীর হস্তরেখা গণনার জন্য এঁর কাছে নিয়ে যায়। ইনি গণনা ক'রে তাদের কর্ত্তব্য নির্ধারণ ক'রে দেন।

গঙ্গারাম দাস (সীতাঃ ১।১) ॥

গঙ্গারাম শ্রীর ভাই। গঙ্গারাম ও ফকিরের কলহকে কেন্দ্র করেই 'সীতারাম' উপন্যাসের স্থরু। শুধু তাই নয় গঙ্গারামই উপন্যাসের গতি বারবার পরিবর্তিত করেছে।

উপন্যাসের প্রথমে গঙ্গারামকে যথেষ্ট ধৈর্যশীল ও শান্ত নিরীহ লোক বলেই মনে হয়। ফকিরের সংগে বিবাদে তার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কাজীর বিচারের প্রহসন দেখে গঙ্গারাম শাহ সাহেবের মুখে লাথি মেরে নির্ভীকতার ভাব প্রকাশ করেছে। সীতারাম কর্তৃক উদ্ধারের সময় গঙ্গারাম বলেছে—সীতারামের প্রাণের বিনিময়ে সে প্রাণলাভ করতে চায় না। আবার সুযোগ বুঝে তার আকস্মিক পলায়নের পিছনে কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছিল কিনা তাও সঠিক নির্ধারণ করা যায় না। তবে গঙ্গারামের আসল পরিচয় এখানেও পাওয়া যাবে না।

সীতারাম রাজ্য স্থাপন করলে গঙ্গারাম তাঁর অন্যতম সহায় ছিল। বংকিম গঙ্গারামের যে গুণ বর্ণনা করেছেন, তা হ'ল তার ক্ষিপ্রকারিতা। তার এই ক্ষিপ্রকারিতার পরিচয় কিন্তু উপন্যাসে কোথাও নেই। যাইহোক, "গঙ্গারাম সীতারামের একান্ত অনুগত ও কার্যকারী হইয়া মহম্মদপুরে বাস করিতেছিল।"

সীতারামের অনুপস্থিতিতে গঙ্গারাম বেশ ভালভাবেই কাজ চালাচ্ছিল। কিন্তু গোলমাল বাধাল রমা। রমার সঙ্গে গোপন সাক্ষাতে তার রূপরাশি গঙ্গারামের বাসনাবহ্নি জাগিয়ে তুলল।" "একে ভালবাসা বলে না…। এ একটা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট চিত্তবৃত্তি—যাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে, তার সর্বনাশ করিয়া ছাড়ে।"

রমার প্রতি গঙ্গারামের আসক্তির জন্য তাকে হয়ত তত দোষ দেওয়া যায় না, কিন্তু সভামধ্যে গঙ্গারাম যখন রমাকে অপযশ দেবার চেষ্টা করতে থাকে তখন তার ঘৃণ্য প্রবৃত্তিগুলি চোখে পড়ে। জয়ন্তীর ত্রিশূল স্পর্শে যেভাবে গঙ্গারাম অপরাধ স্বীকার করেছে তাতে তার চরিত্রের কোন পরিবর্তন অপেক্ষা, ভয়ের ভাবই প্রকাশিত। তাই কারাগারের মধ্যেও সে রমার সর্বনাশ সাধনের কথা চিন্তা করেছে। কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে "ছদ্মবেশে ছলনা দ্বারা তাহাকে (রমাকে) লাভ করিবার জন্যই মুসলমান সেনার গোলন্দাজ হইয়া আসিয়াছিল।"

গঙ্গারামের জীবনের একমাত্র প্রশংসনীয় গুণ হল ভগ্নী শ্রীর প্রতি ভালবাসা। এই ভালবাসার

জন্য তাকে মৃত্যুবরণ করতে হল। শ্রী যখন তার কামানের সামনে বুক পেতে দিল তখন সে আর তোপ দাগতে পারল না। তখন সীতারামের হাতে তার মাথা কাটা গেল।

গঙ্গারামের মা (সীতাঃ ১।১)॥

উপন্যাসে গঙ্গারামের মার মৃত্যুকালের উল্লেখমাত্র আছে।

গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ (দুর্গেঃ ১।৫)॥

সংস্কৃত নাটকের বিদূষক চরিত্র ও যাত্রার ভাঁড় চরিত্র বঙ্কিমের মনে বোধহয় গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের চরিত্র রচনার প্রেরণা জাগিয়েছিল। এই চরিত্রটি উপন্যাসে মাত্র দু'টি কাজে লেগেছে—একবার বিমলার সঙ্গে শৈলেশ্বরের মন্দিরে যাবার জন্য, আর একবার জগৎসিংহকে তিলোত্তমা সম্বন্ধে ভুল সংবাদ দিয়ে জগৎসিংহের মনে সন্দেহ সৃষ্টি ক'রে উপন্যাসের জটিলতা বৃদ্ধি করার জন্য। তারপর উপন্যাসের মধ্যে এই বোকারামটিকে নিয়ে ভাঁড়ামীর উপকরণ গড়ে তোলা হয়েছে। তাই বঙ্কিম তার রূপ এঁকেছেন,—'দিগ্‌গজ মহাশয় দৈর্ঘে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাত হইবেন, প্রস্থে বড় জোর আধ হাত তিন আঙ্গুল। পা দুইখানি কাঁকল হইতে মাটি পর্যন্ত মাপিলে চৌদ্দপুয়া চারিহাত হইবেক; প্রস্থে রলা কাষ্ঠর পরিমাণ। বর্ণ দোয়াতের কালি; বোধ হয়, অগ্নি কাষ্ঠ ভ্রমে পা দুখানি ভক্ষণ করিতে বসিয়াছিলেন, কিছুমাত্র রস না পাইয়া অর্দ্ধেক অঙ্গার করিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন। দিগ্‌গজ মহাশয় অধিক দৈর্ঘবশতঃ একটু একটু কুঁজো, অবয়বের মধ্যে নাসিকা প্রবল, শরীরের মাংসাভাব সেইখানেই সংশোধন হইয়াছে। মাথাটি বেহারা-কামান, কামান চুলগুলি যাহা আছে তাহা ছোট ছোট, আবার হাত দিলে সূচ ফুটে। আর্ক-ফলার ঘটাটা জাঁকাল রকম। এই রূপবর্ণনার মধ্যে যেমন বাহুল্য আছে, তেমনি চরিত্রটিকে নিয়েও বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। বঙ্কিম প্রথম দিকের রচনায় যে আদিরসকে ত্যাগ করতে পারেননি এটি তার উজ্জ্বলতম নিদর্শন।

গণেশ জ্যোতিষী (রাজঃ ২।১)॥

এই জ্যোতিষীর নিকট দরিয়া জোর করে মবারকের ভাগ্যগণনা করিয়েছিল।

গণেশবাবু (বিষঃ ১০ম পরিঃ)॥

ইনি একজন জমিদার। ইনি দেবেন্দ্রের শ্বশুর। উপন্যাসে নামোল্লেখ মাত্র আছে।

গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট (চন্দ্রঃ ২।৫)॥

একজন পদস্থ ইংরেজ কর্মচারী। ইনি ভ্যান্সিটার্ট নামেও খ্যাত। ১৭৬০ খ্রীঃ ক্লাইভ স্বদেশে গমন করলে ইনি বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। মীরকাশেম ইংরাজদের উপযুক্ত অর্থ দিতে না পারায় তিনি তাঁর জামাতা মীর কাশেমকে নবাব নিযুক্ত করেন। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে এ সম্পর্কে এঁর নামোল্লেখ আছে।

গয়াদীন পাঁড়ে (সীতাঃ ৩।২২) ॥

সীতারামের একজন বিশ্বস্ত সিপাহী।

গলষ্টন (চন্দ্রঃ ২।৭) ॥

অমিয়টের সহচর ইংরেজ। অমিয়টের আদেশ সে কার্যে পরিণত করেছে। মাঝে মাঝে অমিয়টকে পরামর্শ দানও করেছে। শেষপর্যন্ত অমিয়টের সঙ্গেই বীরত্ব প্রদর্শন ক'রে মৃত্যু বরণ করেছে।

গিরিজায়া (মৃণাঃ ১।৩) ॥

গিরিজায়া বৈষ্ণবী ভিখারিণী। এই চরিত্রটি 'মৃণালিনী' উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা জীবন্ত চরিত্র। সে কেবল গান গেয়ে গেয়েই বেড়ায় না, পরোপকারেও তার প্রবৃত্তি আছে। গানের সাহায্যেই সে হেমচন্দ্রের মৃণালিনীকে খুঁজে বের করেছে। আবার মৃণালিনীকে হেমচন্দ্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। গিরিজায়া মৃণালিনীকে যথার্থই ভালবেসেছিল। তাই তার জন্যে হেমচন্দ্রের কাছে অপমান সহ্য করেও আবার দূতগিরি করেছে।

গিরিজায়া সুচতুরা রমণী। কিন্তু মহিলাসুলভ বোকামী যে করেনি তা নয়। তার বোঝবার দোষই মৃণালিনী হেমচন্দ্রের সম্পর্ক অনেকটা বিষময় হয়ে উঠেছিল। রসিকতা করা এবং গান গাওয়া গিরিজায়ার স্বভাব। তাই গুরুতর বিষয়েও সে গান এবং রসিকতা করে। কিন্তু তার সে সময়ের সমস্ত কথাগুলিই বঙ্কিম অর্থবোধক করে তুলেছে।

হেমচন্দ্র গিরিজায়াকে বেত্রাঘাত করতে উদ্যত হলে গিরিজায়া তাকে যেভাবে কথা শুনিয়েছে তাতে এই চরিত্রটির দৃঢ়তায় চমকিত হতে হয়। পাপিষ্ঠ ব্যোমকেশের হাত থেকে মৃণালিনীকে রক্ষা করার সময়েও গিরিজায়া সাহসের পরিচয় দিয়েছে।

দিগ্বিজয়ের প্রতি গিরিজায়ার প্রেমনিবেদনের ধরণটি একটু নূতন ধরণের। অবশ্য শেষপর্যন্ত উভয়ের পরিণয়ে গিরিজায়া চরিত্রের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

গুড্‌ল্যাড্‌ সাহেব (দেবীঃ ১।৮) ॥

'গুড্‌ল্যাড্‌ সাহেব রংপুরের প্রথম কালেক্টর। ফৌজদারী তাঁহারই জিম্বা। তিনি দলে দলে সিপাহী ডাকাত ধরিতে পাঠাইতে লাগিলেন। সিপাহীরা কিছুই করিতে পারিল না।'—উপন্যাসে এইটুকুই তাঁর ভূমিকা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটক

ভাষা শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে হলে নাটকের অভিনয় দেখা একান্ত প্রয়োজন, বিজ্ঞজনে এমন কথা বলে থাকেন। পৃথিবীর সব দেশেই তাই স্নাতকোত্তর ভাষা শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ নাট্যাভিনয় বলে গণ্য করা হচ্ছে। মার্কিন মুল্লুকের নাট্যপ্রীতির খুব বেশী মূল্য কোন বিশেষজ্ঞই দেন না বটে কিন্তু সেখানকার অন্যতম প্রমুখ বিশ্ববিদ্যালয় ইয়েলের থিয়েটার ওয়ার্কশপের বয়স ৫০ পেরিয়ে গেছে অর্থাৎ সে দেশেও নাট্যাভিনয় নাটক বোঝা এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে ভাষা শিক্ষার জন্য অতি প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়।

সে তুলনায় এদেশের কথা বলা বাহুল্য মাত্র। স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে আন্তর্বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এবিষয়ে কিছুটা প্রচেষ্টা সুরু হয়েছিল কিন্তু তাকে পূর্ণতা দিতে হলে স্থানীয় যে প্রচেষ্টা হওয়া প্রয়োজন ছিল তার কোন আভাস না থাকায় যোগফল শূন্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অন্য রাজ্যের কথা, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকায় বলা সম্ভব নয় তবে নগর কলকাতার কথা সবিশেষ বলতে পারি। যেখানে অলিতে-গলিতে নিত্য নাট্য মহোৎসব, সেখানকার কলেজগুলি কোনমতে বার্ষিক একটি অভিনয় করে দায় সারে। যেখানে কেবলমাত্র ছাত্র বা ছাত্রী পড়ে সেখানকার অবস্থা একরকম কিন্তু সেখানে ছাত্র-ছাত্রী একসঙ্গে পড়ে সেখানে এক বিচিত্র অবস্থা। ছাত্র-ছাত্রী একসঙ্গে পড়তে পারে, অবসর সময়ে একসঙ্গে চায়ের দোকান বা কফিখানায় আড্ডা দিতে পারে, একসঙ্গে সিনেমা-থিয়েটার দেখতে যেতে পারে, প্রেম করতে পারে কিন্তু এক সঙ্গে অভিনয় করলেই সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের চরিত্রদোষ হয়ে যাবে।

বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পর্যন্ত এ রীতি বলবৎ থাকায় এক হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। সেখানকার ছাত্ররা নাট্যাভিনয় কালে স্ত্রী ভূমিকা বর্জিত নাটক খোঁজেন আর না হয় ছেলেদের গোঁফ কামিয়ে মেয়ে সাজতে হয়। যাঁরা এ ধরণের ধ্যাষ্টামো করতে রাজী নন তাঁরা হয় নাট্যাভিনয়কে পুরোপুরি বাদ দেন আর না হয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চত্বরের বাইরে এসে ছাত্র-ছাত্রীদের যৌথ প্রতিষ্ঠা উপস্থাপন করেন। অর্থাৎ নলচে আড়াল দিয়ে সব কিছু করা চলতে পারে। কিন্তু তাতে যে সম্ভাবনাকে দূরে সরানোর জন্য কর্তৃপক্ষ ব্যগ্র সেই সম্ভাবনার মুকুলই অঙ্কুরিত হয়।

(কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাই আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় নাট্য প্রতিযোগিতার আসরে বিশেষ কলকে পায় না এ তথ্য আজ তত্ত্বে পরিণত হতে চলেছে।)

ফলে বিশেরতঃ ভাষা শিক্ষা যে অসম্পূর্ণ থাকে তার প্রমাণ বার বার পাওয়া যায়। বাংলা ভাষায় স্নাতকোত্তর শিক্ষা সম্পূর্ণ করে কোন বিজ্ঞজন যখন বলেন, পূর্বতন নাট্যকারদের প্রচেষ্টা অর্থহীন প্রলাপ মাত্র, তখন শুধু তাঁর মস্তিষ্কের স্বাভাবিকত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ প্রকাশ করাই যথেষ্ট নয়;

(কারণ তিনি যা শিখেছেন তারই ধারণা উপস্থিত করেছেন) অধিকন্তু এই অসম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

অর্থাৎ এতক্ষণে আমার বক্তব্যের মোদ্দাকথায় পৌছলাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম অংশ হিসাবে কিছু নাটক পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা আছে কিন্তু সে শুধু নাটকটির রচনাকাল নাট্যকারের রচনা বৈশিষ্ট্য, চরিত্র বিচার আর কিছুটা পাঠের মধ্যেই নিবদ্ধ। প্রতিটি শিক্ষক নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের মত সুপাঠক হবেন এটা প্রত্যাশা করা যায় না তবে হলে ছাত্ররা উপকৃত হত। (অন্ততঃ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে সব স্নাতকোত্তর ছাত্র নাট্যাচার্যের নাটক পাঠ শুনেছিলেন, নব্য বাংলা নাট্য পরিষদে তাঁরা এবিষয়ে তাঁদের ইতিবাচক মতামত শুনিয়েছেন আমাদের।)

কিন্তু যা হবার সম্ভাবনা কম তা নিয়ে অকারণ মাথা না ঘামিয়ে বিকল্প পন্থার অনুসন্ধান বাঞ্ছনীয় নয় কি? বিশেষজ্ঞরা অবশ্য বিকল্প পন্থাকে শ্রেষ্ঠপন্থা বলে মত প্রকাশ করে থাকেন।

বিকল্প পন্থায় নির্দিষ্ট নাটকগুলিকে অভিনয় করার ব্যবস্থা করা দরকার। এই অভিনয়ও দু'ভাবে করা যেতে পারে। প্রথম, পেশাদার অভিনেতাদের দ্বারা নাটকটির মঞ্চায়ন; দ্বিতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা নাটকটির অভিনয় করানো, দু'টি ব্যবস্থাই একসঙ্গে চালালে ফল ভালই হবে।

এটা কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়। পরে ছাত্র-ছাত্রীদের নাট্য রচনা, অভিনয়, মঞ্চ পরিকল্পনা, পরিকল্পনা ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগে আত্মনিয়োগ করতে হবে। যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দীর মধ্যে এসব ব্যবস্থা করা হবে সুতরাং উপযুক্ত শিক্ষকের সহায়তা পাওয়া যাবে। এতে নাটক বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষাটা অনেক বেশী পূর্ণাঙ্গ হবে। ফলে পরে নিজস্ব রীতি বা ভঙ্গী সৃষ্টি করা অপেক্ষা কৃত সহজসাধ্য হবে।

এ ব্যবস্থার আর একটা সুবিধা হবে। একদল প্রকৃত নাট্যামোদী সমালোচক সৃষ্টি হবে এবং তাঁরা বাংলা নাট্যশালার বিদেশীমুখীনতা কিছু পরিমাণে দূর করে খাঁটি বাংলা নাট্যশালা সৃষ্টির কাজ ত্বরান্বিত করতে পারবে।

বিশিষ্ট নাট্যরসিকদের এ বিষয়ে মনোনিবেশ করাবার অভিপ্রায়েই এ প্রবন্ধের অবতারণা: আশা করছি বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলায়তনের মধ্যে জীবনের দখিনা বাতাস ঢোকাবার ব্যবস্থায় অগ্রণী হয়ে তাঁরা জাতির দর্পণ নাটককে উজ্জ্বলতর আভায় মণ্ডিত হতে সহায়তা করবেন। সে উদ্যমের সূত্রপাত হলেই লেখকের চেষ্টা সার্থক বিবেচনা করব।

রবি মিত্র

কাব্যবাণী ॥ ভবতোষ দত্ত। জিজ্ঞাসা। ১ ও ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। মূল্য ১০ টাকা

বর্তমানে আধুনিক কবিতা যেমন ব্যাপকহারে রচিত হচ্ছে, আধুনিক কবি ও কবিতার আলোচনা সেভাবে দ্রুততালে এগিয়ে চলতে পারছে না। তার কারণ, আমাদের দেশে কাব্যালোচনা প্রধানতঃ পাঠ্যপুস্তককেন্দ্রিক। উচ্চতর শ্রেণীতে যে সমস্ত কাব্য বা কবিদের সম্বন্ধে পড়ানো হয়, তাদের সম্বন্ধে আলোচনাই অধিক। সাধারণ লোকও খুব কমই এইজাতীয় আলোচনার বই কিনে পড়েন। স্কুল-কলেজের গ্রন্থাগারে এবং পাঠ্যতালিকাকেন্দ্রিক সন্ধানী ছাত্রদের কাছেই এই জাতীয় গ্রন্থের আদর। সেক্ষেত্রে বলা চলে রবীন্দ্রনাথে এসেই আধুনিক কাব্যের পাঠ্যতালিকা থমকে দাঁড়িয়েছে। তাই সাময়িক পত্র-পত্রিকার কিছুটা স্থান ছাড়া আধুনিক কবি ও কবিতার আলোচনা গ্রন্থকারে বড় বেশি দৃষ্টিপথে পড়ে না। রবীন্দ্রপরবর্তী আধুনিক কবিদের ক্ষেত্রে একথা যেমন সহজ-গ্রাহ্য সত্য, উনবিংশ শতাব্দীর কবিদের ক্ষেত্রে এই উপেক্ষা তেমনি বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা।

বিহারীলালের প্রতি অনুসন্ধিৎসা মূলতঃ রবীন্দ্রকেন্দ্রিক। রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের ভাবশিষ্য, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেকে বিহারীলাল পাঠে আগ্রহ প্রকাশ করেন। মাইকেল তাঁর প্রতিভার প্রচণ্ডতায় স্বতঃই ভাস্বর এবং মহাকাব্যের ধারায় তিনিই অনন্য আদর্শ বলে আজও সমাদৃত। তারপর—রঙ্গলাল, ঈশ্বরগুপ্ত, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র—সখ করে কেউ পড়েন বলে মনে হয় না। তবুও এঁদের ভাগ্য কিছুটা প্রসন্ন। কারণ অনেকেই এঁদের নাম শুনেছেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে এমন কয়েকজন কবি আছেন, যাঁরা গীতিকবিতার ধারাটিকে বিভিন্নভাবে পুষ্ট করেছিলেন, অথচ তাঁরা শিক্ষিত পাঠকেরও নাগালের বাইরে চলে গেছেন। বিহারীলালের ধারা যে শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথেই এসে পুষ্টিলাভ করেনি, আরও কয়েকজন কবি যে রবীন্দ্রচিন্তার পরিপুষ্টির সহায়ক—একথা জানার প্রয়োজন আছে। পা চাত্য দেশে কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে অনেকের মনেই একটি বিস্মিত ধারণা আছে যে—বাংলাসাহিত্য কি পূর্বাপর সম্পর্কহীন একক রবীন্দ্রনাথ মাত্র! তা' নইলে তার পূর্ববর্তী সাহিত্যই বা কি, পরবর্তী ধারাই বা কি? আমাদেরও তেমনি উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যধারার সঙ্গে বহুলাংশে অপরিচয়ের ফলে মনে হয়, বিহারীলালের পরেই কি রবীন্দ্রনাথ? বিহারীলালে যা ছিল অস্পষ্ট সৌন্দর্যব্যাকুলতা, রবীন্দ্রনাথে কি তাই সুস্পষ্ট সৌন্দর্য সাধনায় রূপলাভ করল! শুধু তাই নয়, উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকজন কবির কাব্যে বর্তমানের আধুনিকতার বা প্রচলিত প্রাচীন কার্যধারার ব্যতিক্রমের নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের কাব্যবাণী স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত।

এই অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের আলোচনার প্রশংসিত প্রয়াস বর্তমান 'কাব্যবাণী' গ্রন্থটি। এই সম্পর্কে এ পর্যন্ত একটিমাত্র গ্রন্থই চোখে পড়েছে, সেটি হল—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'উনবিংশ

শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য।' এই গ্রন্থটিতে যে সমস্ত কবিদের আলোচনা বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয়েছিল, বর্তমানে আলোচ্য গ্রন্থটিতে তা লেখককেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে।

গ্রন্থটির দু'টি খণ্ড। লেখক বলেছেন—'এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি বাংলাকাব্যের গতিপ্রকৃতির তত্ত্ব বা সূত্র রচনার চেষ্টাতেই লিখিত।' এই খণ্ডের মোট দু'টি পরিচ্ছেদে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্যের মূল ধারাগুলির কথা বলা হয়েছে। 'নবযুগের কবি' অধ্যায়টিতে লেখক বলতে চেয়েছেন উনবিংশ শতাব্দীতে নবরীতির কাব্যের যে আবির্ভাব ঘটল তার মূলকারণ ব্যক্তিত্বের জাগরণ। প্রাচীন বাংলাসাহিত্য ছিল গোষ্ঠিকেন্দ্রিক, তাই সেখানে কবির ব্যক্তিহৃদয়ের প্রকাশ সম্ভাবনা ছিল সীমিত কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার ফলে যে নবজাগরণ দেখা দিল, তাতে ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হল। সেই ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বসংকুল পটভূমিতে দাঁড়িয়ে মাইকেল লিখলেন 'মেঘনাদবধ কাব্য'। মেঘনাদবধের রাবণ বিদ্রোহ করল প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে। এই বিদ্রোহ, ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ। 'উনবিংশ শতকের গীতিকবিতায় কবিচেতনার এই ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যবোধ থাকলেও তখনও সে নগ্ন বিদ্রোহিতায় রূপ নেয়নি।' 'কিন্তু এই কবিচেতনাকেই পরে দেখি বিদ্রোহী হয়ে উঠতে। বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীতে বাংলাকাব্যে একটা স্পষ্ট বিদ্রোহের ধ্বনি শুনতে পাওয়া গেল।'

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাকাব্যের মোটামুটি তিনটি ধারা প্রচলিত ছিল। একটি হল—মহাকাব্য বা আখ্যায়িকামূলক কাব্যের ধারা, অন্যদুটি হল গীতিকবিতার ধারারই দু'টি স্বতন্ত্র রূপ—একটি ঈশ্বরগুপ্ত প্রবর্তিত বস্তুকেন্দ্রিক কবিতার ধারা, অন্যটি বিহারীলাল প্রবর্তিত আত্মকেন্দ্রিক গীতিকবিতার ধারা। মহাকাব্যের ধারার সার্থক প্রতিভূ মাইকেল মধুসূদন দত্ত। সেই ধারায় রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রও পদার্পণ করেছেন। কিন্তু এই ধারা কালক্রমে লুপ্ত হয়ে গেল কেন? 'মহাকাব্যের বিলয়' অধ্যায়ে লেখক তার কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছেন। হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' ও নবীনচন্দ্রের 'ত্রয়ী' কাব্যের থেকে তিনি প্রকাশ করেছেন যে এ ধরণের চরিত্র সৃষ্টি ও বর্ণনাভঙ্গী মহাকাব্যের উপযোগী নয়। অর্থাৎ মহাকাব্যধারার লুপ্তির অন্যতম কারণ মধুসূদনের মত উপযুক্ত প্রতিভার অভাব এবং এইসব কবিদের আখ্যায়িকারস পরিবেশন অপেক্ষা গীতিরস পরিবেশনের প্রবণতা। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি কারণের কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। বাংলাদেশে আখ্যায়িকাকাব্যের উদ্ভব হয়েছিল মূলতঃ যুগপ্রয়োজনে। তখন দেশপ্রেমের উন্মাদনার যুগ। তাই অধিকাংশ আখ্যায়িকাকাব্যই দেশপ্রেমমূলক। রঙ্গলাল 'পদ্মিনী উপখ্যানে দেশপ্রেমের মহিমা কীর্তন করলেন, মধুসূদন 'মেঘনাদবধ কাব্যে' রাবণ ও ইন্দ্রজিৎকে দেশপ্রেমিকরূপে চিত্রিত করলেন, হেমচন্দ্রের বৃত্র স্বাধীনতার শত্রুরূপে চিহ্নিত হল এবং নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণ অখণ্ড ভারতরাজ্য স্থাপনে উৎসুক। কালক্রমে এই দেশপ্রেমের উন্মাদনা শিথিল হয়ে যখন চিন্তাগ্রাহ্য রূপলাভ করল, তখন আর কাহিনীর প্রয়োজন হল না। ইতি মধ্যে আবার আখ্যায়িকাকাব্যের ভারটি গ্রহণ করল উপন্যাস। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস', বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', রমেশচন্দ্র দত্তের 'জীবনপ্রভাত', ও 'জীবনসন্ধ্যা'' আখ্যায়িকাকাব্যের দেশপ্রেমের ধারাটির সার্থক উত্তরাধিকারী। তাই আর 'মহাকাব্যের বিলয়'-এর বাধা রইল না।

ঈশ্বরগুপ্ত প্রবর্তিত গীতিকবিতার ধারার একটু নূতনত্ব আছে—'নিত্যনৈমিত্তিকের ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা, এ সকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে, ইহা প্রভাকরই প্রথম দেখায়। (বঙ্কিমচন্দ্র) ঈশ্বরগুপ্ত প্রবর্তিত এই ধারা হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের মধ্যেও যেমন কিছু-কিছু আছে, তেমনি পরবর্তীকালেও একেবারে দুর্লভদৃষ্ট নয়। কিন্তু—'কাব্যে বিষবস্তুর গুরুত্ব আসলে কিছুই নয়, আসল গুরুত্ব হচ্ছে কবিমানসের—বিহারীলালের কাব্য পড়েই তা প্রথম জানা গেল।'

উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যের এই ত্রিধারার যে পরিচয় লেখক দিয়েছেন তাতে আলোচনার ক্রম একটু শিথিল হয়ে গেছে। তার কারণ লেখক প্রবন্ধগুলি স্বতন্ত্রভাবে রচনা করেছিলেন সাময়িক পত্রিকার প্রয়োজনে। গ্রন্থে প্রকাশের সময় প্রবন্ধগুলির নামকরণে পরিবর্তন ঘটানোতে আপাতঃদৃষ্টিতে ক্রমপর্যায় বা লেখকের উদ্দেশ্যটি ধরা পড়ে। সাময়িকপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির সঙ্গে গ্রন্থটি মিলিয়ে পড়বার সুযোগ হয়নি, কিন্তু সাধারণভাবে মনে হয়েছে—লেখক প্রতিটি প্রবন্ধে আরো কিছু বক্তব্য যোগ করলে আলোচনাতেও ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারতেন।

এবার দ্বিতীয় খণ্ডের কথা। দ্বিতীয়খণ্ডে মোট বারোজন কবির সম্বন্ধে আলোচনা আছে। এঁরা হলেন—বলদেব পালিত, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, কামিনী রায়, রজনীকান্ত সেন, প্রমথ চৌধুরী, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্তরঞ্জন দাশ, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার। এইসব কবিদের আলোচনা কোন সূত্র ধরে করা হয়েছে এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে জাগতে পারে। আলোচিত কবিদের প্রত্যেকেরই উনবিংশ শতাব্দীতে জন্ম। কিন্তু এদিক থেকেও তালিকা সম্পূর্ণ নয়। যদি মনে করি উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর অপেক্ষাকৃত অপরিচিত কবিদের সঙ্গে পরিচয় করানোই লেখকের উদ্দেশ্য, তাহলে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত নিঃসন্দেহে বাদ যেতেন। লেখক অবশ্য বলেছেন—'এই গ্রন্থের অপূর্ণতা সম্বন্ধে আমি নিজেই যথেষ্ট অবহিত। এই বই পড়তে গিয়ে অনালোচিত অন্যান্য আরো দু-একজনের কথা পাঠকের মনে আসতে পারে। সেকালের গোবিন্দচন্দ্র দাস এবং একালের ভারতীযুগের রবীন্দ্রানুগামী যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কথা আমার নিজেরই মনে হয়েছে। দ্বিতীয়জনের কথা মনে হয়েছে বিশেষ করে এই জন্যে যে, রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবাদের অনুসরণ করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে যে কাব্যধারা গড়ে উঠেছিল তার অন্যতম সার্থক প্রতিনিধি তাঁকেই ধরা যায়। নির্বাচনের দায়িত্ব যখন আমার তার ত্রুটিজনিত অপরাধও তেমনি আমার।'

এখানে উল্লিখিত দু'জনের নামের সঙ্গে, আরো দু'জনের আলোচনা আমার কাছে একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে—একজন হলেন ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যজন হলেন অক্ষয়কুমার বড়াল। শেষোক্তজনের গুরুত্ব যে কত বেশি একথা লেখক গ্রন্থ মধ্যেই এক স্থানে ব্যক্ত করে ফেলেছেন—'বিহারীলালের কাব্যে যে মানসীর প্রতিষ্ঠা হল, তারই ইঙ্গিত গ্রহণ করে নিয়েছিলেন অক্ষয়কুমার বড়াল এবং রবীন্দ্রনাথ। দুজনেরই কাব্যে মানসী পূজার দুই রূপ প্রকাশ পেল। অক্ষয় বড়াল বহিঃপ্রকৃতির রূপরস দিয়ে এই মানসীকে না গড়ে, আত্মকেন্দ্রিক কল্পনা দিয়ে অবাস্তব আদর্শ সৌন্দর্য গড়ে নিলেন—বাস্তবের সঙ্গে সে মিলল না বলে কবির অতৃপ্তির সীমা

নেই। রবীন্দ্রনাথও প্রথম দিকে এই অতৃপ্তির জ্বালায় জ্বলেছিলেন, কিন্তু 'মানসী'র যুগ থেকেই জীবন ও সৌন্দর্যকে মিলিয়ে বাংলা সাহিত্যে নূতন কাব্যধারা গড়ে তুললেন।'

আশা করি পরবর্তী সংস্করণে এঁদের সম্বন্ধে আলোচনা করে লেখক গ্রন্থটির পূর্ণাঙ্গতা দান করবেন।

বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারে পরিচ্ছন্ন অঙ্গসজ্জার এই বইটির দশ টাকা মূল্য সম্বন্ধে কিছু বলবার নেই। কিন্তু 'জিজ্ঞাসা'র মত খ্যাতিমান প্রকাশনীর পুস্তকে এত মুদ্রণপ্রমাদ সত্যই বেদনা দায়ক। গ্রন্থের যত্রতত্র যেভাবে অসংখ্য অস্পষ্ট ছাপা, শূন্যস্থান ও টিকিমুণ্ডহীন অক্ষর চোখে পড়েছে তার জন্য মুদ্রারাক্ষসকে না কাকে দোষ দেব ভেবে পাচ্ছি না। এইজাতীয় গলদ চোখে পড়েছে—৩৪, ৫৪, ৫৫, ৫৮, ৬৩, ৬৫, ও আরো অন্যান্য পাতায়। উনবিংশ বানানে 'উ', কখনো 'ঊ',।

যাই হোক, শ্রীযুক্ত ভবতোষ দত্তের অন্যান্য গ্রন্থের মত এই গ্রন্থটিও প্রচলিত ও গতানুগতিক ধারার বহির্ভূত। বাংলাকাব্যের উপেক্ষিত কয়েকজনের কবিকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করে তিনি সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বিষয়বস্তুর নূতনত্বের জন্য গ্রন্থটি সমাদৃত হবে আশা রাখি।

অশোক কুণ্ডু

আনন্দে উৎসবে
প্রাত্যহিক প্রয়োজনে..
সবার মনোরঞ্জনে...
কেশতৈল
কেশরঞ্জন

সমকালীন

পঞ্চদশ বর্ষ ॥ আষাঢ় ১৩৭৪

Get that Hamam complexion. Fresh. Glowing. Radiant. Hamam's rich, fragrant lather gently refreshes your skin as it cleanses. Use Hamam daily. It always keeps its shape—and lasts and lasts...
FRESH & GLOWING
HAMĀM
the family soap
हमाम
the longer-lasting toilet soap
A TATA PRODUCT
CMTH-4 A

সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান
Mritusanjibani
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট
মৃতসঞ্জীবনী
সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা
কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্ব্বেদ-আচার্য্য, ৩৬, গোয়ালপাড়া রোড, কলিকাতা-৩৭
অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এম,সি,এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

LET UCO BANK

পঞ্চদশ বর্ষ ৩য় সংখ্যা

আষাঢ় তেরশ' চুয়াত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

পত্রসাহিত্য ঃ দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ

নবেন্দু সেন

বাংলা পত্র রচনার ইতিহাস ষোড়শ শতকেই শুরু। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দের সেই পুরাতন চিঠিটি 'আষাঢ়-সছল-ঘন-দিবসে' লিখিত হলেও পণ্ডিত ব্যক্তি সকলেই জানেন এ চিঠি নিতান্ত বৈষয়িক কাজ কর্মের কথায় ভরা হৃদয়ের কবঙ্কোত্তাপ বর্জিত একান্ত অরস পত্র মাত্র। অহম রাজার এ পত্র পত্র, পত্র-সাহিত্য নয়। পত্রসাহিত্য একপ্রকার আত্মোদ্বোধন। অন্যের কাছে নিজের। ভাবে আর ভাষায়। তোমায় আর আমায়। নিখিল বিশ্বের সংগে অহং'র এই আত্ম-উদ্বোধনে একটি দেওয়া আর নেওয়ার সম্পর্ক বিজড়িত থাকে।

'যাহা নীল তাহা দশজনের কাছে নীল বলিয়া প্রচার করা কঠিন নহে; কিন্তু যাহা আমার কাছে সুখ, বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয়, তাহা দশজনের কাছে সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয় বলিয়া প্রতীত করা দুরূহ। সে অবস্থায় নিজের ভাবকে কেবলমাত্র প্রকাশ করিয়াই খালাস পাওয়া যায় না; নিজের ভাবকে এমন করিয়া প্রকাশ করিতে হয় যাহাতে পরের কাছেও তাহা যথার্থ বলিয়া অনুভূত হইতে পারে।' (১)

চিঠি, ডাইরী, আত্মজীবনী প্রভৃতি ব্যক্তিগত রচনা এই কারণেই সাহিত্যধর্মী রচনারূপে স্বল্পই সার্থকতা লাভ করে। একজন আত্মজীবনী লেখক বলেছিলেন, 'autobiographical narrative, remains a sketchy, personal and incomplete account of the past, verging on the present, but cautiously avoiding contact with it'২ এই 'detachment' ব্যক্তিগত রচনার অপরিহার্য গুণ। লেখক ও লেখার বস্তুত পার্থক্য সৃষ্টি করে তৃতীয়পক্ষের দৃষ্টিতে তার বিস্ময় ও আস্বাদন করার কাজ কঠিন। শৈথিল্যে 'আমার জীবন' (১৯০৮-১৯১৩) এবং অতিরিক্ত

সংযমে 'ছিন্নপত্র'র (১৯১২) মত রচনা সৃষ্টি হয়। নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন' আর যাই হোক আত্মজীবনী-সাহিত্য নয়। 'ছিন্নপত্র' অতি উচ্চাঙ্গের পত্রসাহিত্য হয়েও অনেক ব্যক্তিগত ঘটনা ও চিন্তাধারা অপ্রকাশিত রাখায় সর্বজনমনের একটি সাহিত্য নির্মাল্যর আনন্দ পূর্ণভাবে যেন ধরে দিতে পারেনি। যার ফলে 'ছিন্নপত্রাবলী' (১৯৬১) প্রকাশিত হয়েছে। পত্রসাহিত্যের এই সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে বলতে হয় উনবিংশ শতকের পূর্বে বাংলার সার্থক পত্রসাহিত্য সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু প্রচলিত ধারণানুযায়ী রবীন্দ্রনাথ এই পত্রসাহিত্যের স্রষ্টা নন। দেবেন্দ্রনাথ। পিতার বহু বিষয়েই পুত্রের যে উত্তরাধিকার জন্মেছিল পত্রসাহিত্য তার মধ্যে অন্যতম একটি বিষয়।

উনবিংশ শতকের মধুসূদন দত্তের কথা ছেড়ে দিলে সার্থক পত্রসাহিত্য রচয়িতা হিসাবে দেবেন্দ্রনাথের নামই সর্বাগ্রে বিচার্য। মধুসূদনের চিঠিও সাহিত্য-গুণান্বিত কিন্তু সেগুলির ভাষা ইংরেজী। বাংলাভাষায় সাহিত্যধর্মী পত্র রচনা বক্ষ্যমান প্রবন্ধের বিষয়। সেদিক থেকে রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্রভৃতির নামের পূর্বে পত্রসাহিত্য'র স্বভাব ও বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে মহর্ষির কথাই আলোচ্য। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলীর যে যে সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে তাতে মহর্ষি রচিত মোট ১৩৬ খানি পত্র স্থান পেয়েছে। বাকী ১০ খানি চিঠির মধ্যে কেশবচন্দ্র সেন, ম্যাক্সমুলার, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লিখিত মহর্ষির পত্র আছে। মহর্ষির নিজের লিখিত চিঠিগুলি পড়লেই দেখা যায় যে, পত্র সাহিত্য হিসাবে এগুলি কত সার্থক, কত সুন্দর। একটি উদাহরণ গ্রহণ করা যাক।

সিমলা,
১ শ্রাবণ, ১৭৮০

'...সম্প্রতি এখানে বর্ষাকাল বিরাজমান, পর্বত হইতে বাষ্প সকল অনবরত নির্গত হইয়া সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এক একবার আমারদিগের দৃষ্টি হইতে সমুদয় জগৎ বাষ্প মধ্যে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে, বৃষ্টি হইয়া পুনর্বার তাহা প্রকাশ পাইতেছে। এখানে মেঘের সঞ্চার হইলেই বিলক্ষণ শীতের প্রভাব হয়। অদূরেই নিবিড় বনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম, যেহেতু সেপথ বনের মধ্যে দিয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে সেই বনকে ভেদ করিয়া রৌদ্রের কিরণ ভগ্ন হইয়া পথে পড়িয়াছে, স্থানে স্থানে অতি প্রাচীন জীর্ণ শরীর বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল মূল হইতে উৎপাটিত হইয়া, কোন কোন বৃক্ষ বা সমূলে কিয়দ্দুর পর্য্যন্ত ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণত রহিয়াছে। কত তরুণ বয়স্ক বৃক্ষও দাবানলে দগ্ধ হইয়া অসময়ে দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে।

প্রতি পর্বতই মহোচ্চতার অভিমানে স্তব্ধ হইয়া পশ্চাতে হেলিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছে, কাহাকেও শঙ্কা নেই।' (২)

আর একটি পত্রে লিখছেন—

'তুষার জটাভার সহস্র সহস্র মস্তক আকাশ-অভিমুখে উন্নত করিয়া এখানকার এই হিমালয় পর্বত গম্ভীর স্বরে বলিতেছে—We rear our mighty fronts towards Heaven ;

Where foot of mortal never trod ;

For we alone of nature works
Are choosen children of our God.

এই পর্বতের উপর আজকাল মেঘ বাতাস, বিদ্যুৎ বজ্র মুহুর্মুহু আনন্দে খেলা করিতেছে। সে খেলা দেখে কে ? দিন দুই প্রহরেই দেখিতে দেখিতে কোমল সন্ধ্যার ছায়ার ন্যায় মেঘের ছায়া পর্বতের উপরে পড়িল। আবার পরক্ষণেই সেই মেঘকে ভেদ করিয়া সূর্য্যের কিরণ হাসিতে হাসিতে ছড়াইয়া পড়িল।" (৩)

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এ চিঠিগুলি কোনক্রমেই 'ঘটনার ডাক পিয়নগিরি' করেনি। ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের প্রাত্যহিকতার উর্ধে একটা সার্বজনীন ভালোলাগার আমেজে পূর্ণ। ব্যক্তিগত সীমাতিক্রান্ত প্রকৃতি সম্ভোগে আনন্দিত, বিমুগ্ধ একটি প্রাণের তৃপ্তিতে ভরা ; অথচ এক গম্ভীর দার্শনিক চিন্তাও মুক্তি পেয়েছে যেন। ভাষার সঙ্গীতে, রূপক-কল্পনায়, শব্দ নির্বাচনে, বাক্যবিন্যাসে সর্বত্র একটি পরিণত শিল্পীর ছাপ লক্ষিত হয়। ভাষার এই সৌন্দর্যে ভাবের প্রকাশ স্পষ্টতর হয়েছে। ছায়ার কোলে আলোর খেলা আর আলোর বুকে ছায়ার মায়া যেন একাকার হয়ে এক সর্বমনের আস্বাদনের নির্য্যাস সৃষ্টি করেছে। অবশ্যই স্বীকার করা কর্তব্য, এ রূপ আস্বাদনীয় পত্র-সাহিত্য দেবেন্দ্র-পূর্ব বাংলা ভাষায় মোটেই সহজলভ্য বিষয় নয়। দেবেন্দ্র পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে বিরল নয়, কিন্তু তাঁরই পুত্রের শিল্প মানসিকতায় তা বহু বিস্তৃত, মহা ঐশ্বর্যশালী।

রবীন্দ্র পত্র-সাহিত্য দেবেন্দ্র-পত্রসাহিত্যের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম স্থির, নিশ্চয় কারণ তাঁর পিতার মানসিকতা। বহু ভাবনায় চিন্তাতেই রবীন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথের সার্থক সন্তান ছিলেন। এবিষয়ে একটি গুরুত্বপুর্ণ, ছোট মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। মন্তব্যটিতে লেখা হয়েছে, "In literature as in life Debendranath was a nobleman and the worthy father of a great son." (৪)

রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গদ্য রচনা বলে যে 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধাবলীর উল্লেখ করা হয় তার সঙ্গেও যেমন তেমনি তাঁর স্বাদু গদ্য 'ছিন্নপত্রে'র সঙ্গেও দেবেন্দ্রনাথের গদ্য রচনার এক আশ্চর্য মিল লক্ষিত হয়। চন্দননগর থেকে দেবেন্দ্রনাথ ১৮৫৫'র এক পত্রে লিখেছেন,..."আমি কখনো আপনি হই নাই, এ শরীর ও মনোরূপ কৌশল আমার কৃত নহে।...আমার যৌবনকে আমি ধারণ করিয়া রাখিতে পারিনা। এই সকল আলোচনা করিয়া আমার মনেতে এমন প্রত্যয় উপস্থিত হইতেছে যে আমার কারণ ও নিয়ন্তা একজন পূর্ণ পুরুষ আছেন।...একজন পরিপূর্ণ স্বতন্ত্র পুরুষ আছেন।" (৫)

প্রায় অর্দ্ধশত বৎসর পরে (১৯০৯) রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতন প্রবন্ধমালাতে লিখছেন,

"তোমার সেই অনাদিকালের সঙ্গ আমার এই দেহটির মধ্যে সঞ্চিত আছে। অনাদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত অনন্ত সৃষ্টির মাঝখান দিয়ে একটি বিশেষ রেখাপাত হয়ে এসেছে সেটি হচ্ছে এই আমির রেখা—সেই রেখাপথে তোমার সংগে আমি বরাবর চলে এসেছি। সেই তুমি আমার অনাদি পথের চালক, অনন্ত পথের অদ্বিতীয় বন্ধু তোমাকে আমার সেই একলা বন্ধুরূপে আমার জীবনের মধ্যে উপলব্ধি করবো।" (৬)

উনবিংশ শতকের এক দীপ্ত মধ্যাহ্নে ব'সে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি পত্রের মধ্যে যে, ঈশ্বর ও আপন মানবাত্মার সম্পর্কের কথা প্রকাশ করেছেন, সেই একই চিন্তা পদ্ধতিতে একই চিন্ত্যনীয়কে বিংশশতকের প্রভাতে দাঁড়িয়ে, পুত্র রবীন্দ্রনাথও স্মরণ করেছেন। অনুভূতির মূল এক। পিতা, পুত্র উভয়েই জীবাত্মার সঙ্গে ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ সংযোগ অনুভব করেছেন, আপন আত্মায়, পরমেশ্বরের ব্যাপক ক্ষমতার রহস্য অনুভব করেছেন। 'আমি' ঈশ্বরের সৃষ্টি,—এই প্রত্যয়ে উভয়ই প্রত্যয়ী। কিন্তু একটু বেশী নিবিড় রবীন্দ্রনাথ। ভাষার বিশ্লেষণে এইরূপই মনে হয়। "সময়, পরিবেশ, আদর্শ, ধ্যান ও ধ্যেয়'র প্রদর্শিত পথ সবই রবীন্দ্রনাথের সামনে ছিল। ভাষার সম্পদকে রবীন্দ্রনাথও নিজের প্রতিভার অগ্নিস্পর্শে মনঘন, আত্মিক, নিবিড় করে নিতে পেরেছিলেন। অনিবার্যভাবে তাই উপলব্ধির প্রকাশেও পিতা পুত্রের স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়েছে। এ স্বাতন্ত্র্য যতটা ভাষাশৈলীজাত, রীতির ; ততটা চেতনা প্রসূত অধ্যাত্মবোধের নয়।

পিতা, পুত্রের এই সাযুজ্যবোধ ভাষার ক্ষেত্রেও অবশ্য বড় একটা স্বাতন্ত্র্যে নিতান্ত দূরের নয়। পত্র রচনার ভাষা দেখলেই এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে। কিছু খণ্ড উদাহরণ নিলেও এ প্রসঙ্গের ধারণা স্পষ্ট হয়। যথা : দেবেন্দ্রনাথের পত্রে—

(ক) "আবার আমি ঘটনাস্রোতে এই কুমারখালি অঞ্চলে আসিয়া পড়িয়াছি। আমার আর ভ্রমণের শেষ নেই। মাঠ, দক্ষিণে মাঠ, লোকালয় মাত্র নাই, নির্জনের একশেষ, গ্রাম ও বসতি তাহার বহুদূরে। এইক্ষণে প্রাতঃকাল, চতুর্দিকে পক্ষীর কলরব মাত্র শুনা যাইতেছে। পদ্মা নদী হইতে স্নিগ্ধ বায়ু বহিতেছে, এবং শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত ক্ষেত্রে অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে।" (৭)

(খ) "সম্মুখে গঙ্গা নদী স্রোতবহাঃ, চতুর্দিকে বৃক্ষশ্রেণীর ছায়া, অন্তরীক্ষে সুমন্দ বায়ুর হিল্লোল, মধ্যে ইষ্টকালয় রূপ আশ্রয়, ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিবার স্থান বটে।" (৮)

(গ) হিমালয়ে যেমন আমার মস্তিষ্ক দমিয়া গিয়াছিল, এখানে সেইরূপ গলিয়া যাইতেছে।" (৯)

'ছিন্নপত্রে'ও এরূপ অভিব্যক্তির অভাব নেই। বিশেষ করে উদাহরণ ' ক'র মত (পদ্মা-প্রীতি রবীন্দ্রচেতনার যে কী নিবিড় বস্তুউপলব্ধি তা রবীন্দ্রজিজ্ঞাসু ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। রবীন্দ্র সাহিত্যের সেই পদ্মা তথা নদী চেতনার সংগে রবীন্দ্রনাথের পিতার এই নিসর্গ শোভা সম্ভোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বিষয় সম্ভবত নয়। দেখার এই অভ্যাস উভয়েরই ছিল। পিতার অভ্যাস পুত্রে বর্তে ছিল এরূপ সিদ্ধান্তেও তাই আসা যায়। প্রমাণ রবীন্দ্র-পত্রের উদাহরণগুলি। যথা :—

(ক) "আমার ঠিক বাকস-phobia হয়েছে , বাকস দেখলে আমার দাঁতে দাঁতে লাগে। যখন চার দিক চেয়ে দেখি বাকস, কেবলি বাকস, ছোটো বড়ো, মাঝারি, হাল্কা এবং ভারী, কাঠের এবং টিনের এবং পশু চর্মের, এবং কাপড়ের—নীচে একটা, উপরে একটা, পাশে একটা, পিছনে একটা—তখন আমার ডাকাডাকি, হাকাহাকি এবং ছোটাছুটি করবার স্বাভাবিক শক্তি একেবারে চলে যায়,...।" (১০)

(খ) "নদীর মাঝখানে বসে আছি, দিন রাত্রি হু হু করে বাতাস দিচ্ছে, দুই দিকের দুই পার, পৃথিবীর দুটি আরম্ভরেখার মতো বোধ হচ্ছে—ওখানে জীবনের মাত্র আভাস দেখা দিয়েছে,

জীবন সুতীব্রভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি, যারা জল তুলছে, স্নান করছে, নৌকো বাচ্ছে, গরু চরাচ্ছে, মেঠো পথ দিয়ে আসছে, যাচ্ছে, তারা যেন যথেষ্ট জীবন্ত নয়।" (১২)

(গ) "এই নিস্তরঙ্গ পদ্মাতীরের নিস্তব্ধ বালুচরের উপরকার নির্জন মধ্যাহ্নটি আমার অনন্ত অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যতের মধ্যে কী কোথাও একটি ক্ষুদ্র সোনালি রেখার চিহ্ন রেখে দেবে।" (১৩)

(ঘ) "ব্যাপার দেখে আমার চক্ষু স্থির—'ডাক লোকজন, নিয়ে আয় নায়েব, ডেকে আন খাজাঞ্চি, জোগাড় কর কুলি, আন ঝাঁটা, আন জল, মই লাগা দড়ি খোল…নে না, একটা করে জিনিষ নে না, একটা একটা করে জিনিষ নে, না, ওরে ভাঙলে রে সব ভাঙলে—ঝন্‌ঝন্ ঝনাৎ, তিনটে কেজ ভেঙে চুরমার—খুঁটে খুঁটে তোল।" (১৪)

ভাব ও ভাষার দিক থেকেও উভয়ের পত্রগুলির মিল কত গভীর তা লক্ষ্য করার মত। ক-সংখ্যক উদ্ধৃতিটিতে পিতা ও পুত্র উভয়েই ঘটমান বর্তমান কালের বর্ণনা ভঙ্গী গ্রহণ করেছেন। দেখার দৃষ্টিও কত নিকট। দেবেন্দ্রনাথ দেখছেন, "লোকালয় মাত্র নাই, নির্জনের একশেষ, গ্রাম ও বসতি তাহার বহুদূরে।" এবং "শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত ক্ষেত্র অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে।" রবীন্দ্রনাথও দেখেছেন, "জল তুলছে, স্নান করছে, নৌকো যাচ্ছে, গরু চরাচ্ছে, মেঠোপথ দিয়ে আসছে, যাচ্ছে।" দেবেন্দ্রনাথ অনুভবে প্রত্যক্ষ করছেন, "পম্পানদী হইতে স্নিগ্ধ বায়ু বহিতেছে।" রবীন্দ্রনাথও উপলব্ধিতে দেখছেন, "দিন রাত্রি হুহু করে বাতাস দিচ্ছে।" তিনিও "নদীর মাঝখানে" বসে আছেন।

তবু একটু পার্থক্য আছে। একজনের বাক্যের ক্রিয়াপদ গুলি সাধু ভাষায় রচিত, অন্যজনের চলিত। তাছাড়া পুত্রের আত্মমগ্ন ভাবটা পিতার আত্মমগ্ন ভাবের চেয়ে আরো একটু নিবিড় যেন। সব দেখার পরও তাই রবীন্দ্রনাথের অনুভব, "তারা যেন যথেষ্ট জীবন্ত নয়।" অবশ্য দেবেন্দ্রনাথের জগৎ চিন্তাতেও এমনিতর দর্শনের পরিচয় আছে। একটি অতি সরল, সাধারণ, ক্ষুদ্র বাক্যের মধ্যেও অনায়াসে তাই তিনিও বলেছেন, "…আমার আর ভ্রমণের শেষ নেই।" চলাচল বিশ্ব নিখিলের অনন্ত সত্য,—সম্ভবত এই দার্শনিক উপলব্ধি মহর্ষি এখান থেকেই উপলব্ধি করতে শুরু করেন। যার সমর্থন তাঁর 'আত্মজীবনীতে' এবং অন্যান্য ধর্মমূলক গ্রন্থেও আছে। রবীন্দ্রনাথের গতিবাদ বিশ্বাস তাহলে দেবেন্দ্র-চেতনাতেও ছিল। পত্রে তার সে প্রকাশও দেখা গেল।

খ-সংখ্যক উদাহরণ দুটিতেও ঐক্য আছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে উভয়েই সমভাবে বিমুগ্ধ। জগৎ ও জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে ঈশ্বর ও প্রকৃতি'র ভাবনা উভয়ের মানসিকতারই পরিচায়ক। রবীন্দ্রনাথের জিজ্ঞাসা এসেছে, তাঁর জীবনপথের সীমাহীন অখণ্ডতায়, প্রাকৃতিক নিস্তব্ধ সৌন্দর্যে কোন পদসঞ্চারে কোন চরম চিহ্ন আঁকা রইবে কিনা, আর দেবেন্দ্রনাথ তাঁর ঈশ্বর বা ব্রহ্ম বিশ্বাসের গভীরতায় প্রাকৃতিক সেই, স্নিগ্ধ, নির্জন পরিবেশটিকেই অধ্যাত্ম চেতনার জায়গা ব'লে নির্দেশ করেছেন। প্রকৃতির পট ভূমিকায় উভয়ের মানসিকতার পরিবর্তন বোধটিই এক্ষেত্রে লক্ষ্য করার।

হাস্যরস সৃষ্টিতেও পিতা পুত্র একই মেজাজের মানুষ। রবীন্দ্র-পত্রের খ-সংখ্যক উদাহরণটির

সংগে দেবেন্দ্র-পত্রের 'গ' সংখ্যক উদাহরণটির তুলনা করলেই বোঝা যায়। জীবন ও জগৎ, মানব ও ঈশ্বর, লঘু হাস্য পরিহাসও গুরু গম্ভীর দর্শন চিন্তা সব দিকেই উভয়ের মানসিকতার একটা মিল বড় লক্ষ্য হয়। চিঠির মধ্যে ব্যক্তি চিন্তা, উপলব্ধিকে কী ভাবে সর্বজন মনের আনন্দের কারণ ও আস্বাদনের বিষয় করে তোলা যায় তার সার্থক উদাহরণ স্থল হিসাবে উভয়ের পত্রসাহিত্য গুলির উল্লেখ করা যায়।

বাংলা পত্র সাহিত্যের ধারায় সে জন্যেই বলা চলে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কেবল পথিকৃৎ নন, পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের কর্ণধার পুত্র, রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়স্থলও। পত্রসাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ পত্রসাহিত্যিক দেবেন্দ্রনাথের যোগ্য সন্তানই ছিলেন।

---

(১) রবীন্দ্ররচনাবলী (৮ খণ্ড) বিশ্বভারতী সংস্করণ : ১৯৫৩, 'সাহিত্য', ৩৪৯।

(২) Jawharlal Nehru, An autobiography, preface XIII, 1936.

(৩) 'দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী', সম্পাদিত, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী (তারিখ বিহীন), ৫০ সংখ্যক পত্র।

(৪) পত্রাবলী, পূর্বে উল্লিখিত, ১৮৫৪'য় লিখিত ১৩৪ সংখ্যক পত্র।

(৫) Das, S. K. Early Bengli prose : Carey to Vidyasagar, 1966, 207.

(৬) পত্রাবলী (১৮৫৫)।

(৭) শান্তিনিকেতন (১৯০৯—১৬) রায় (১৩) বিঃসং ১৯৫৩, ৫১৪—১৫।

(৮) পত্রাবলী, ৫ (১৮৫২), ৫।

(৯) তদেব, ৮ (১৮৫৩), ৮।

(১০) তদেব, ২১ (১৮৫৯), ২৭।

(১১) ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা : ৯ (১৮৮৭)।

(১২) ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৪৪ (১৮৯২)।

(১৩) তদেব, ১৩৮, (১৮৯৫)।

(১৪) তদেব, ১২ (১৮৯০)।

বাংলার মন্দির

হিতেশরঞ্জন সান্যাল

চালা রীতি : ব্যতিক্রান্ত রূপ

চারচালার উপর আর একটি চারচালা যোজনা করিয়া যেমন আটচালার সৃষ্টি—ক্রমাগত বিস্তারের পথে আটচালার উপর চারচালার আর একটি স্তর আরোপ করিয়া হইয়াছিল বারোচালা আচ্ছাদনের রূপকল্পনা। হুগলী জেলার ইলছোবা গ্রামের দক্ষিণ পাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয়গণের গৃহপ্রাঙ্গণস্থ একটি শিব মন্দিরের আচ্ছাদন রচিত হইয়াছে তিনটি স্তরের বারোচালায়। পর পর দুইটি সমতল শীর্ষ চারচালা—সর্বোপরি একটি ক্ষুদ্রায়তন চারচালা। কলিকাতা বেলগাছিয়া অঞ্চলের ওলাইচণ্ডী মন্দিরে চালা আচ্ছাদনেরও এইরূপ তিনটি স্তর। তবে তাহার সর্বোচ্চ স্তরটির দেহ অন্তবর্তুল আর তাহার পাদদেশে চারিদিক ঘিরিয়া বহির্বর্তুল ছাজা।

দৃষ্টান্তের সংখ্যা দেখিয়াই বুঝা যাইতেছে বারোচালা মন্দিরের চর্চা বাংলা দেশে অতিশয় সীমাবদ্ধ ভাবেই হইয়াছে। কিন্তু বিন্যাস আকৃতি দেখিয়া মনেহয় উপর্যুপরি স্তরে আবদ্ধ বারোচালা চালা আচ্ছাদনের বিবর্তনধারার স্বাভাবিক ফলশ্রুতি। রূপ ভেদের সম্ভাবনার ইঙ্গিতও ইহাতে যথেষ্ট। সংবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে বারোচালার চর্চা চালা মন্দিরের ক্ষেত্রে নবতর ঐশ্বর্য সৃষ্টি করিতে পারিত' সন্দেহ নাই।

দোচালা হইতে বারোচালা পর্যন্ত স্বাভাবিক গতিপথ বাহিয়া চালা আচ্ছাদনের যে বিবর্তন এতাবৎ তাহারই পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু ইহার ধারে ধারে ব্যতিক্রমের যেটুকু রূপভেদ তাহার কথা না বলিলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। চালা মন্দিরের আলোচনা শেষ করিবার পূর্বে ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্তগুলি তাই তুলিয়া ধরা প্রয়োজন।

চারচালা আচ্ছাদনের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে নদীয়া জেলায়—নবদ্বীপ সহরের পোড়ামাতলার সুবিখ্যাত পোড়ামাতা মন্দির, কৃষ্ণনগর সহরের ও শিবনিবাস গ্রামের ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে নির্মিত রামসীতা মন্দির ও কৃষ্ণনগর সহরের আনন্দময়ী কালীমন্দিরে চারচালার ব্যতিক্রান্ত রূপের সাক্ষাৎ মিলিবে।

মন্দিরগুলির আসন বর্গাকার। মূল আসনের মধ্যে বিধৃত চতুরস্র ক্ষেত্রের মধ্যে সমরূপের একটি ক্ষুদ্রতর কক্ষ—ইহাই গর্ভগৃহ। গর্ভগৃহকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া দালান। গর্ভগৃহের সংক্ষিপ্ত ক্ষেত্রটুকু আবদ্ধ করিয়া তাহার দেওয়াল শূন্যগর্ভ স্তম্ভের আকৃতিতে উপরের দিকে অগ্রসরমান। ইহাকে ঘিরিয়া দালানের দেওয়াল খানিকটা উঠিয়া সমতল আচ্ছাদনে শেষ হইয়া গিয়াছে। গর্ভগৃহের স্তম্ভাকৃতি দেওয়াল কিন্তু এইখানেই শেষ হইয়া যায় নাই। দালানের আচ্ছাদন অতিক্রম করিয়া অনেকটা উঠিয়া যাইবার পর তবে তাহার আচ্ছাদনের প্রারম্ভ। মূলগত বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া আচ্ছাদনটি চারচালা। কিন্তু তাহার পাদমূল বাহিয়া কার্নিসের গতি সরল রেখায় পর্যবসিত আর চালাগুলিও এত নীচু ও চাপা ভাবে গড়া যে রূপগত পরিচিতি অস্ফুট থাকিয়া গিয়াছে।

শুধুমাত্র চারচালা আচ্ছাদনে নহে—মন্দিরের আকৃতি রচনায় স্বাতন্ত্র সম্ভাবনা সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যেই হয়ত এই নূতন বিন্যাস পদ্ধতির উদ্ভব। কিন্তু মন্দিরের দেহবিন্যাস ও আচ্ছাদনের রূপভেদ কোন ক্ষেত্রেই নদীয়ার এই মন্দিরগুলিতে সৃষ্টিশীলতার পরিচয় নাই।

আটচালা আচ্ছাদনে ব্যতিক্রান্ত রূপের মধ্যে বিকাশের সম্ভাবনা ছিল। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম শুরু হইয়াছে একেবারে মূল হইতে—আসনের আকৃতি পরিবর্তিত করিয়া। চতুরস্র বা আয়ত আসনের উপর দ্বিধাবিভক্ত আচ্ছাদন রচনা সাধারণ নিয়ম। কিন্তু কিছু কিছু মন্দিরে আসনের আকৃতি হইয়াছে অষ্টকোণাকৃতি তাহার উপর দেওয়াল উঠিয়াছে আট ভাগে।

আসন ও দেওয়ালের অনুসারে আচ্ছাদনে চালার সংখ্যাও আট। চারচালা আচ্ছাদন গঠনের পদ্ধতিতে ইহাদের নির্মাণ। আটদিক হইতে বাঁকান চালাগুলি ক্রমহ্রস্বায়মান আকৃতিতে ভিতরের দিকে সামান্য ঝুঁকিয়া চূড়াভাগের পাদদেশে শীর্ষবিন্দুর দিকে অগ্রসরমান।

আটচালার এই রূপের দৃষ্টান্তস্বরূপ নদীয়া জেলার শিবনিবাস গ্রামের রাজরাজেশ্বর মন্দিরের কথা উল্লেখ করা যায়। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের উদ্যোগে মন্দিরটির নির্মাণ। ভিত্তি অধিষ্ঠানসহ প্রায় একশত ফিট উচ্চ মন্দিরটির ভিত্তি অধিষ্ঠানও অষ্টকোণাকৃতি। আটদিকের প্রত্যেকটি দেওয়াল আবার রথকাসনের উপর অধিষ্ঠিত। ইহাদের তিনটিকে ভেদ করিয়া প্রবেশদ্বার। দ্বারপথগুলির শীর্ষদেশ রচিত হইয়াছে তীক্ষাগ্র শীষ-খিলানে। অবশিষ্ট পাঁচ দিকে চকনামা বা ঈষৎ উদ্গত বৃথাস্তম্ভের বন্ধনীর মধ্যে নিম্নায়ত আবদ্ধ দ্বার। সুউচ্চ দেওয়ালের ঊর্ধ্বাংশের বৈচিত্র্যায়নের উপাদানও চকনামা বৃথাস্তম্ভের মধ্যে নিম্নায়ত আবদ্ধ দ্বার।

প্রায় একশত ফুট উচ্চ মন্দিরটির দেওয়াল ও আচ্ছাদনের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য গড়িয়া উঠে নাই। আসনের প্রসার ছাড়াইয়া দেওয়াল আরও অনেকটা উচ্চতা অর্জন করিয়া নিয়াছে কিন্তু আচ্ছাদনের ঊর্ধবিস্তার আসনের দৈর্ঘ্যসীমার মধ্যেই আবদ্ধ। স্বল্প পরিসরের মধ্যে শেষ হইয়াছে বলিয়া চালাগুলির গতি দ্রুত—ভিতরের দিকে ঝোঁকও একটু বেশী। যেরূপ দ্রুততার সহিত চালাগুলির প্রসার কমিয়া আসিয়াছে তাহাতে নিম্নাংশের সহিত আচ্ছাদনের আনুপাতিক সম্পর্কে সঙ্গতির সম্ভাবনা থাকিতে পারে না।

অষ্টকোণাকৃতি আটচালা রূপে সম্ভাবনার ইঙ্গিত থাকিলেও এ রূপের চর্চা অতিশয় সীমিত। বর্ধমান জেলার বাঘনাপাড়া গ্রামের যমুনা পুষ্করিণীর তীরবর্তী একটি ভগ্ন মন্দির, হুগলী জেলার ইলছোবা গ্রামের উত্তরপাড়ার বারোয়ারীতলার একটি শিবমন্দির ও নদীয়া জেলার সিমুরালি ও ও পালপাড়া ষ্টেশনের মধ্যমর্তী রেল লাইনের পশ্চিম দিকে একটি ভগ্ন মন্দির—শিব নিবাসের বাহিরে এই কয়েকটি মাত্র নিদর্শনের সাক্ষাৎ এতাবৎ মিলিয়াছে।

নাটোরের রাজপরিবারের গঙ্গাবাস বড়নগরে (মুর্শিদাবাদ জেলা) কয়েকটি অষ্টকোণাকৃতি আটচালা নির্মাণে রূপভেদ লক্ষ্য করা যায়। আনুমানিক ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে নির্মিত ভবানীশ্বর মন্দিরের অষ্টকোণাকৃতি আসনের ঠিক মধ্যস্থলে গর্ভগৃহ। গর্ভগৃহের চারিপাশ ঘিরিয়া প্রদক্ষিণপথ বা দালান। দালানের আটটি দেওয়াল ভেদ করিয়া সমসংখ্যক প্রবেশদ্বার ; ইহাদেরই একটির সমান্তরালে গর্ভগৃহে প্রবেশের একমাত্র দ্বারপথ।

মন্দিরটির অষ্টকোণাকৃতি আচ্ছাদন দুইটি অংশে বিভক্ত। দালানের দেওয়ালের উপর হইতে নিম্নভাগের আটটি বাঁকান চালা—আচ্ছাদনের দ্বিতীয় অংশের পাদমূলে গিয়া শেষ হইয়াছে। ঊর্ধ্বাংশটির গঠন অধোমুখস্থিত প্রস্ফুটিত পদ্মের আকারে। পদ্মের দলগুলি চালার মত করিয়া বাঁকাইয়া দেওয়া। তাহাদের অন্ত্যক্ষেত্রও চালা আচ্ছাদনের মত বাঁকান। দলগুলির উপরে পত্থের যে অংশ তাহাও আট ভাগে রচিত।
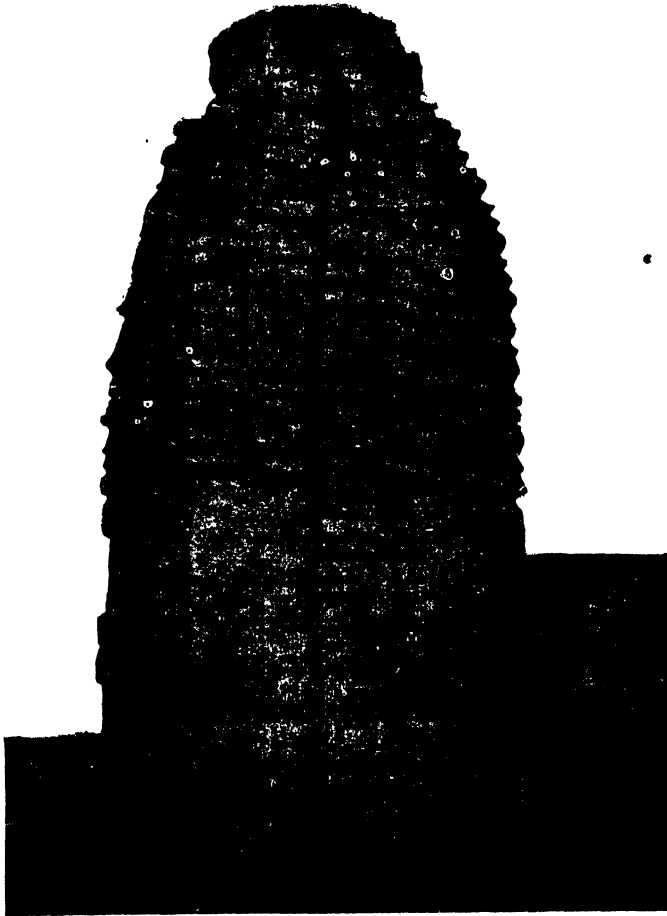
শিখররীতির সিদ্ধেশ্বর মন্দির। বরাকর, বর্ধমান

ভবানীশ্বরের আবাসগৃহের আকৃতি দেওয়াল ও আচ্ছাদনের অসঙ্গত আনুপাতিক সম্পর্কের ফলে বিসদৃশ। সুউচ্চ লম্বমান দেওয়ালের উপর তাহার প্রায় অর্ধেক উচ্চতাবিশিষ্ট আচ্ছাদন সুসমঞ্জস দেহ গঠনের সর্বপ্রধান বাধা। আচ্ছাদনটির কল্পনাও কৃত্রিম—তাহার দুইটি অংশের মধ্যে কোন ভাবগত বন্ধন নাই। ঊর্ধ্বাংশকে নিম্নভাগের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র।

আচ্ছাদন রচনার এই রূপকল্পনা বড়নগরের বাহিরে বিস্তারলাভ করে নাই। বড়নগরের ভবানীশ্বর মন্দিরের পশ্চিমে গোপাল মন্দিরের দ্বারদেশের দুই পার্শ্বে দুইটি শিবালয় ও পূর্বে ভাগীরথীর তীরভূমির উপর একটি শিবমন্দিরে আচ্ছাদন ভবানীশ্বরে দৃষ্ট রূপভেদের দৃষ্টান্তস্বরূপ দণ্ডায়মান। তবে এই মন্দিরগুলি আকারে ক্ষুদ্রতর—ভিতরেও গর্ভগৃহই একমাত্র কক্ষ—তাহাকে ঘিরিয়া দালান রচিত হয় নাই।

অষ্টকোণাকৃতি আটচালার স্বাভাবিক বিস্তারের ফলে সৃষ্ট হইয়াছে ষোল চালা আচ্ছাদন। চারচালা হইতে যে পদ্ধতিতে আটচালার উদ্ভব—অষ্টকোণাকৃতি আটচালা হইতে ষোল চালার সৃষ্টিও হইয়াছে একই উপায়ে। দ্বিধাবিভক্ত আচ্ছাদনের নিম্নভাগস্থ আটটি চালার উপর ক্ষুদ্রকায় আটচালা কক্ষের সংযোজনে ষোল চালার বিন্যাস হুগলী জেলার রাজবলহাট গ্রামের রাজবল্লভী দেবীর মন্দিরপ্রাঙ্গণস্থিত একটি শিব মন্দির দৃষ্টিগোচর, এই ধরণে ষোলচালার নিদর্শন এতাবত আর আবিষ্কৃত হয় নাই।

বংগালী ছত্রী

বাঁকান কার্ণিসের উপর ধীরে বক্ররেখায় বিধৃত চালা আচ্ছাদন বাংলার বাহিরে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে স্থপতিদের মনোহরণ করিয়াছিল, বক্ররেখ এই আচ্ছাদনের পরিচয় সেখানে বংগালী ছত্রী নামে। বংগালী ছত্রীর ব্যবহার হইয়াছে প্রধানতঃ অলঙ্করণের প্রয়োজনে অথবা প্রাসাদশীর্ষ কিংবা অপ্রধান কক্ষের আচ্ছাদন রচনায়—মন্দির বা মসজিদের প্রধান আচ্ছদনরূপে নহে।

বংগালী ছত্রী নামে মোঘল ও রাজপুত স্থপতিরা যাহা সৃষ্টি করিয়াছিলেন বাংলার দোচালা ও চারচালা আচ্ছাদনের রূপভেদ হইতে তাহার জন্ম। ইহাদের মধ্যে আবার দোচালার রূপরেখার প্রতি তাঁহাদের আকর্ষণই সমধিক। বংগালী-ছত্রীর চারচালা রূপেও দেখিতেছি দোচালার প্রভাব। জয়পুরের রাজপ্রসাদশীর্ষে, সুবিখ্যাত হাওয়া মহলের গবাক্ষ কক্ষের আচ্ছাদন রচনায়, বিকানীরের লালগড় প্রাসাদের শীর্ষচূড়ায়, দীগ সহরের সুরয মহল প্রাসাদের অপ্রধান কক্ষগুলির আচ্ছাদনে বংগালী ছত্রীতে বাংলার দোচালা আচ্ছাদনের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য প্রায় সবটুকুই বিদ্যমান। মন্দির রচনার নিম্নাংশের সহিত আচ্ছাদনের আনুপাতিক সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রয়োজনে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আচ্ছাদনের পূর্ণ বিকশিত যে রূপটি জন্মলাভ করিয়াছিল—রাজপুত ও মোঘল স্থাপত্য কর্মে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশ ব্যবহার করিবার সময় সেই রূপটিই হইয়াছে আদর্শ।

জয়পুরের হাওয়া মহলের প্রাসাদ গাত্র সংলগ্ন ত্রিধা বিভক্ত গবাক্ষ-কক্ষগুলির প্রতিটি অংশের আচ্ছাদন উপর্যুপরি স্থাপিত তিনটি চালার সমবায়ে রচিত। সংখ্যার দিক দিয়া দেখিতে গেলে, এগুলি বারো চালার পর্যায় ভুক্ত। কিন্তু চালাগুলির আকৃতি সুপরিণত দোচালারই অনুরূপ। তিনটি অংশে বিভক্ত কক্ষগুলির ত্রিধাবিভক্ত আচ্ছাদনের সবটুকু আবৃত করিয়া যে চালাটির অবস্থান তাহারও সৃষ্টি দোচালা আচ্ছাদনের রূপরেখা অনুসারে। জয়পুরে রাজপ্রাসাদের চালাশীর্ষটির রচনা উপর্যুপরি চারিটি স্তরে সজ্জিত দোচালায়।
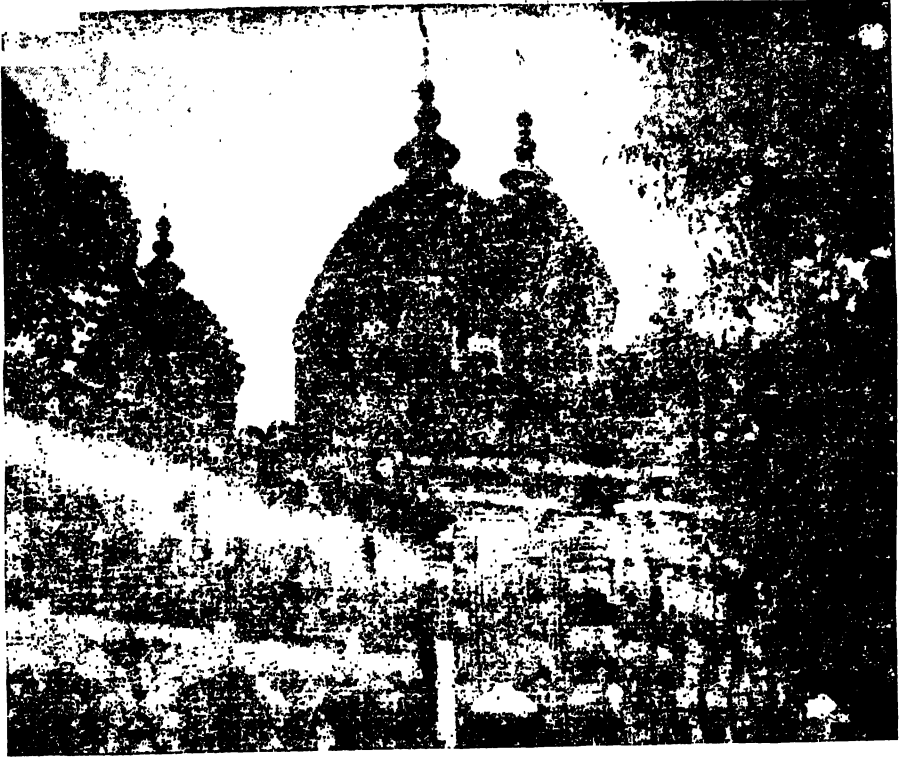
পঞ্চরত্ন রীতির মদনগোপাল মন্দির। বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া

দীগের সুরজ মহল প্রাসাদের দুইটি অপ্রধান কক্ষ দোচালা আচ্ছাদনে আবৃত। কক্ষদুইটির মধ্যে একটিতে আচ্ছাদন দোচালার সুপরিচিত রূপের অনুকৃতি। অপরটির আয়ত আসনে প্রস্থ দৈর্ঘ্যের প্রায় অর্ধেক, তবে বাংলাদেশের প্রচলিত দোচালা কক্ষের মত ইহার পার্শ্বের দেওয়ালগুলির শীর্ষদেশ ত্রিভুজাকারে গঠিত নহে—সম্মুখ ও পশ্চাতের মত বাঁকান। আচ্ছাদনের পার্শ্বদুইটিও তাই বক্র রেখায় শেষ হইয়াছে। আচ্ছাদনে চালাগুলির ঊর্ধ বিস্তারও স্বাভাবিক দোচালার উচ্চতা অর্জন করিতে পারে নাই—একটু চাপা ভাবেই গড়িয়া তোলা। আচ্ছাদনের চালায় তাই বক্ররেখার গতিভঙ্গ সাধারণ অপেক্ষা অনেক বেশী মন্থর। বিকানীরের লালগড় প্রাসাদের শীর্ষকক্ষের আচ্ছাদনেও চালার ঊর্ধ গতি অনুরূপভাবে সীমিত। তবে, উভয় ক্ষেত্রেই কার্ণিস বাহিয়া বক্ররেখা পরিণত দোচালারই অনুরূপ।

রাজপুত স্থাপত্যে চারচালা বংগালী ছত্রী প্রকৃতপক্ষে দোচলা ও চারচালার সংমিশ্রণে কল্পিত। আলোয়ার সহরে সগর হ্রদ তীরবর্তী রাজপ্রাসাদের দুইটি অপ্রধান কক্ষের আচ্ছাদনে চারচালা বংগালী ছত্রী দৃষ্টিগোচর। আয়তাকার কক্ষগুলির আসন অনেকটা একবাংলা কক্ষের মত। চারিটি চালার অস্তিত্ব সত্ত্বেও আচ্ছাদনের রূপকল্পনা দোচালার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। সম্মুখ ও পশ্চাতের চালাদুইটি তো দোচালার মত করিয়াই গঠিত। আচ্ছাদনের শীর্ষ বাহিয়া

উদ্গত রেখার বন্ধনীটিও দোচালা আচ্ছাদনেরই স্মৃতি অবশেষ।

এখানেও আচ্ছাদনের উর্ধ্বগতি সীমিত—বেশ খানিকটা চাপাভাবে গঠিত চালার দেহে বক্ররেখার গতি অত্যন্ত মন্থর। তবে কার্ণিসের বক্ররেখা অত্যন্ত দ্রুতবেগে বাহিয়া আসিয়াছে। কার্ণিসের কোণগুলিও অত্যন্ত তীক্ষ্ণ-দেওয়াল বাহিয়া নামিয়াও আসিয়াছে অনেকটা।

দোচালার প্রভাবমুক্ত চারচালা বংগালী ছত্রীর একটি বিশিষ্ট উদাহরণ হইল দিল্লীর লালকেল্লার দেওয়ান-ই-আমের সিংহাসন কক্ষের আচ্ছাদনটি। দোচালার প্রভাব ভিন্ন আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যে ইহা আলোয়ারের দৃষ্টান্তগুলিরই অনুরূপ—তেমনি চাপা দেহ ও পাদমূলে তীক্ষ্ণাগ্রকোণের দ্রুত অধোগতি। মহারাষ্ট্রের বীর সহরের খান্দোবা মন্দিরায়তনের চারিকোণে সংস্থিত ছত্রী চারিটির আচ্ছাদন রচনা এইরূপ চারচালা বংগালী ছত্রীতে। তবে পাদমূলে কোণগুলি তীক্ষ্ণাগ্র নহে—বাংলার চারচালার মত স্বাভাবিক। আলোয়ারের উল্লিখিত প্রাসাদের দ্বারপথ সংলগ্ন ক্ষুদ্রায়তন কক্ষগুলির আচ্ছাদন কিন্তু মূল আদর্শের আরও নিকটবর্তী। বাংলার ঈষৎ দীর্ঘায়ত চারচালা আচ্ছাদনের একান্ত অনুরূপ করিয়া ইহাদের গঠন। অমৃতসর সহরের সুবিখ্যাত স্বর্ণমন্দিরের প্রধান গম্বুজটির দেহে বৈচিত্র্যায়নের অন্যতম উপাদান হিসাবে যে বক্ররেখার উপস্থিতি দেখিতেছি তাহার আকৃতি ও গতিভঙ্গ বাংলার চারচালা আচ্ছাদনের রেখা প্রবাহের সমগোত্রীয়। তবে ইহার গতিপথ নিরবচ্ছিন্ন নহে—ভঙ্গীকাটা।

বঙ্গালী ছত্রীর ব্যবহার হইয়াছে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের সর্বত্র জুড়িয়া। আলোচনায় তো কয়েকটি সুপরিচিত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছি মাত্র। প্রাসাদ, দুর্গ, তীর্থমন্দির হইতে অতি সাধারণ গ্রাম্য মসজিদে বংগালী ছত্রীর উপস্থিতি ইহার ব্যাপক জনপ্রিয়তার নিদর্শন, কিন্তু সর্বত্রই ইহার ব্যবহার অপ্রধান কক্ষের আচ্ছাদন রচনায় অথবা অলঙ্করণের প্রয়োজনে। দেখিয়া মনে হয় চালা আচ্ছাদনের কার্যকারিতা অপেক্ষা তাহার রূপময়তাই উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের স্থপতিদের সমধিক আকৃষ্ট করিয়াছিল। বাংলাদেশে চালারূপের চর্চা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে কিন্তু বঙ্গালী ছত্রী চর্চ্চার ধারাটি এখনও প্রবহমান। তাহারই ঢেউ আবার বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিয়াছে। উত্তর পশ্চিম ভারত হইতে আগতদের বাসগৃহে। দেবালয়ে ইহার নিদর্শন মিলিবে।

রমেশচন্দ্র ও ভারতের অর্থনীতি

মুরারি ঘোষ

ভারতের বর্হির্বাণিজ্য : লুণ্ঠন

দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতার স্বরূপ উদ্ঘাটন করে রমেশ দত্ত শুরু করেছিলেন। কেননা, উনিশ শতকের শেষ পঁচিশ বছরে একাধিক দুর্ভিক্ষে ভারতের দেড় কোটি মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। দারিদ্রে অপশাসনে এই অবক্ষয়ের তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। ভারত ইতিহাসের আর কোন যুগেই পাওয়া যায় না এই লোকক্ষয়। বৃটিশ বাণিজ্য থেকেই এই সর্বনাশের মসৃণ পিচ্ছিল পথ তৈরী হয়েছে। ভারতের বহির্বাণিজ্যের আলোচনা থেকেই আমরা শুরু করতে পারি আমাদের ভয়াবহ অবনতির কাহিনী। বহির্বাণিজ্য থেকেই বৃটিশ যুগের শুরু।

ইতিহাসে দেখতে পাচ্ছি সপ্তদশ শতকের শুরু থেকে আরম্ভ হচ্ছে ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারত-বাণিজ্য। তারপর দেড়শো বছর কেটে গেছে। ইতিমধ্যে অনেক রক্তপাত, বিশ্বাসঘাতকতা কাঁচাটাকার হাতফেরতা, উপহার, উপঢৌকন, লুটপাট—এ সবের মধ্যে বিস্তৃত অভাবনীয় পারদর্শিতার কৃপায় এ দেশে বৃটিশ বাণিজ্যের বিস্তার। অকস্মাৎ সেই বাণিজ্যের চেহারা পাল্টে গেল ১৭৫৭ থেকে।

পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে ইংরেজ কোম্পানীর বাণিজ্যের রূপ বদলেছে। এতদিন বাণিজ্যের জন্যে দেশ থেকে সম্পদ (Bullion) এনে তার বিনিময়ে হিন্দুস্থানের পণ্য কিনতে হোত। এবার দেশের শাসন ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ অধিকার এল। কোম্পানীর তহবিল ফুলে ফেঁপে উঠলো রাজস্বে। দেশ থেকে সোনা এনে বাণিজ্য পণ্য ক্রয়ের প্রয়োজন রইলো না—মাছের তেলেই শুরু হল মাছ ভাজা।

এদেশে রাজস্ব যা আদায় হোত তা থেকেই কোম্পানীর বাণিজ্যের মূলধন আসতে লাগলো। আর শাসন ক্ষমতা হাতে আসায় দেশের শিল্প বাণিজ্য আর আর্থিক জগতের ওপর একচেটে ক্ষমতার সম্প্রসারণ ঘটলো। এই ক্ষমতার সমস্ত সুযোগ নিয়েছে কোম্পানী। এ দেশের টাকাই কোম্পানীর বাণিজ্যে নিযুক্ত হল। কোম্পানীর ঘরের টাকা আর বের করতে হল না। ঘরের সম্পদ রইলো ঘরে। পাওনা রাজস্বের মোটা অংশ দিয়ে পণ্য কিনে স্বদেশে আর য়ুরোপের বাজারে কোম্পানীর বাণিজ্য ফলাও হ'য়ে উঠলো। লাভের অংশ কিন্তু ভারতের ঘরে উঠলো না। ভারতের বহির্বাণিজ্য প্রায় সম্পূর্ণই ইংরেজদের হাতে চলে এল। নাম মাত্র ডাচ, ফরাসী আর ড্যানিশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল অবশ্য। তারা তখনো কিছু কিছু স্বদেশের সম্পদ এ দেশে আমদানী করতো—বিনিময়ে নিয়ে যেত এদের পণ্য।

এদিকে ইংরেজ কোম্পানীর ষোলো আনা সুবিধে—স্বদেশের সম্পদ না এনে এদেশ থেকেই লুট করা টাকায় বাণিজ্য বিস্তৃত করার সুযোগ কলোনীয়াল বাণিজ্যের এই পঙ্গু চেহারা থেকেই

রমেশ দত্ত সুরু করেছেন ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের ঐতিহাসিক অবনতির কাহিনী।

১৮১৩ সালে পার্লামেন্টে আইন পাশ করে ঠিক হল কোম্পানীর শাসন আর বাণিজ্যের হিসেব দুভাগে ভাগ করে দিতে হবে। শাসন সংক্রান্ত আয় ব্যয় আর বাণিজ্যগত আয় ব্যয়। রাজস্ব দুভাগে ভাগ হয়ে এক ভাগ যাবে শাসন সংক্রান্ত ব্যয়ে। তার মধ্যে থাকবে ভারতে সৈন্য পোষার খরচ, শাসন ও বাণিজ্য ব্যাপারে আপিস চালানোর খরচ, কর্মচারীদের মাইনে ইত্যাদি, আর বাণিজ্য চালাতে গিয়ে কোম্পানীর যত দেনা হয়েছে (এই দেনার আবার নামকরণ হয়েছে Indian Debt) তার সুদ মেটানো।

রাজস্বের দ্বিতীয় অংশ বাণিজ্যে লাগানো হবে তার লাভ থেকে দেওয়া হবে অংশীদারদের লভ্যাংশ আর পরিশোধ করা হবে Indian Debt.

হোমচার্জ নাম দিয়ে কোম্পানী বিলেতের অফিসের জন্যে যা খরচ করতো—সে খরচ ক্রমশই বাড়তে থাকে। এবং দেখা গেল ১৮১৩ থেকে ১৮২৮ পর্যন্ত কোম্পানী হোমচার্জের দরুণ যা খরচ করেছে প্রতি বছরেই বারো লাখ টাকার মত তাতে ডেফিসিট পড়ে। সেটা দেনার আকারে ক্রমশই বেড়ে চলে—এরই নামকরণ করা হল Indian Debt—'ভারতীয় দেনা'। ভারতবাসীদের দায় হল এই দেনা পরিশোধ করা—যেন ভারতের জন্যই কোম্পানী এই দেনা করতে বাধ্য হয়েছে।

ভারতের ভাণ্ডার সেই গৌরীসেনের ভাণ্ডার। কোম্পানীর মাথা ব্যথা তাই কম। পার্লামেন্টে আইন হল—খরচ যাই হোক বাণিজ্যের লাভ থেকেই কোম্পানীকে এই দেনা পরিশোধ করতে হবে। অংশীদারদের লভ্যাংশ দিয়ে যা বাঁচবে তা দিয়ে শোধ করা হবে এই দেনা। লাভের এই ভাবেই 'ভারতের কাজে' খরচ হয়েছে। ইংরেজের ট্যাঁক থেকে তাদের করা দেনা পরিশোধ না হয়ে ভারতীয় চাষীর, তাঁতীর রক্ত জল করা পরিশ্রমের অর্থে তথা কথিত ভারতীয় দেনা মেটানোর চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু এত কোরেও দেনা মেটে না—এ কেবল ফুটো কলসি ভরার চেষ্টা। বছর বছর বেড়েই চললো দেনার বহর। ১৮১৩ সালে যা ছিল ৩ কোটি পাউণ্ড, দেনা মেটাতে মেটাতে ১৫ বছর বাদে তা দাঁড়ালো পৌনে পাঁচ কোটিতে। দেনা বাড়ে চক্রবৃদ্ধি হারে।

গৌরীসেনের টাকা বাণিজ্যের নামে আরো কী ভাবে বেহাত হয়েছে তার বিস্তৃত হিসেব ভারতের বহির্বাণিজ্যেই পাওয়া যাবে। সংখ্যা তত্ত্বের হিসেবে দেখা যাবে ভারতীয় বাণিজ্যে ছিল রপ্তানীর ভাগ বেশি, অথচ রপ্তানী বাড়লেও ভারতীয় শিল্পের ভারতীয় কৃষি জীবনের দ্রুতগতি সর্বনাশ ত্বরান্বিত হয়েছে। অথচ বহির্বাণিজ্যের যে তত্ত্ব তখনকার অর্থনীতিবিদেরা চালু করেছিলেন তার সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনা ঘটে গেল ভারতবর্ষে। কেন তা ঘটলো ইংলণ্ডের আর্থিক ইতিহাসের সংগে মিলিয়ে তা দেখতে হবে। রমেশ দত্তের আর্থিক চিন্তার বিশ্লেষণ সেই পথেই সহজ বোধ্য।

বাণিজ্যবাদ ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ঃ

ইংরেজ বণিকেরা যখন সাত সাগর পার হয়ে দেশে দেশে বাণিজ্যের তরী ভাসিয়ে দিল—তখন

তাদের সমর্থনে তাত্ত্বিকেরা এগিয়ে এলেন। জন্ম হল অর্থনীতির নতুন তত্ত্বের—বাণিজ্যবাদ (Mercantilism)।

বাণিজ্যবাদের সেরা তাত্ত্বিক টমাস মুন। টমাস মুন ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর। কোম্পানীর বাণিজ্যের সমর্থনেই তাঁর প্রথম কলম ধরা। তখন ইংলণ্ড থেকে স্বর্ণ সম্পদ নিয়ে যেতে হত ভারত-বাণিজ্যে। প্রথম দিকে ভারত-বাণিজ্যে ইংলণ্ড থেকে যা যেত তা ছিল মূলত টয়লেট কিংবা বিলাস দ্রব্য। যত পণ্য চালান যেত শ্বেত দ্বীপ থেকে তার চেয়ে ঢের বেশি পণ্য জাহাজ বোঝাই হয়ে আসতো ইংলণ্ডের বাজারে। উদ্বৃত্ত মালের জন্যে ঘর থেকে বার করতে হোত সোনা—বহির্বাণিজ্যের যে রীতি।

এ নিয়ে বিলেতের সমাজে কম হৈ চৈ হয়নি। এত সোনা কেন দেশ থেকে বেরিয়ে যাবে?

কোম্পানীর ডিরেক্টর মুন হিসেব কষে দেখিয়ে দিলেন (১) ভারতে যে বারতি সোনা খরচ করে আনতে হয় তার বিনিময়ে যে পণ্য আসে তার দরুণ য়ুরোপের বাজার থেকে আরো ঢের বেশি সোনা সংগৃহীত হয় ছ মাসের মধ্যেই। য়ুরোপের হাটে হাটে ভারতের পণ্য বেচে ইংলণ্ড বছরে বছরে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করে চলেছে।

এর পরেও মুন লিখলেন আরেকটা বই। বহির্বাণিজ্যে জাতীয় সম্পদ বাড়ানোর কী রাস্তা —তার তত্ত্বগত দিক উদ্ঘাটন করলেন—এ বই বাণিজ্যবাদের মাস্টারপ্রীস—England's treasure by Foreign Trade.

মুন লিখলেন : The ordinery means therefore to inerease our wealth and treasure is by Foreign Trade, where in we must ever observe this rule to sell more to strangers yearly than we consume of theirs in value.

মুনের কথায়, যেমন করে হোক স্বদেশে নয় স্বদেশের বাইরে বিক্রির পরিমাণ বাড়াতে হবে—তা দেশের পণ্য হতে পারে, অন্যথায় বিদেশের পণ্য কিনে বেশি দামে ভিন্ন দেশের হাটে বেচে দিতে হবে—এর ফলেই বিদেশের সম্পদ ঘরে উঠবে—এখনকার অর্থনৈতিক পরিভাষায় যা 'একস্‌পোর্ট সারপ্লাস'।

ইংলণ্ডে তখন জাতীয় সম্পদ বাড়ানোর যুগ। শিল্পবিপ্লবের আগে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সূচনা যুগে বাণিজ্যবাদ তত্ত্বের প্রয়োজন ছিল। সচেতন বাণিজ্য চেষ্টার মধ্যে জাতীয় উৎপাদনও ধীরে ধীরে বৃদ্ধির প্রেরণা পায়। জাতীয় সম্পদ ও পুঁজি বৃদ্ধি পেলে পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টায় সক্রিয়তা আসে।

বাণিজ্যবাদের প্রেরণায় আর বাড়তি লাভের চমকানীতে রপ্তানীর পরিমাণ ক্রমশই উর্দ্ধমুখী হয়ে ওঠে—তখনই চেষ্টা হয় দেশের মাটিতে বাড়তি পণ্য উৎপাদনের। বিদেশ থেকে পণ্য না এনে নতুন নতুন পথে বাড়তি পণ্য উৎপাদনের যে চেষ্টা চলে তাতে শিল্প সম্প্রসারণ ও শিল্প বিপ্লব সম্পূর্ণ হবার পথে এগিয়ে চলে। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সূচনামুখে সমস্ত উন্নতশীল দেশের একই ইতিহাস।

অবশ্য এতটা এগিয়ে এসে দূরদৃষ্টি দিয়ে চিন্তা করার সুযোগ মুনের ছিল না। মুন চেয়েছিল

জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি হোক—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যের প্রসার হোক—পৃথিবীর সাতসাগরে ইংরেজ বাণিজ্যতরী বিস্তৃত বাজারের সন্ধানে পাড়ি দিক।

বহির্বাণিজ্যের একটাই মূল মন্ত্র জপতে হবে : to sell more to strangers yearly than we consume theirs value.

কিন্তু ভারতের দিকে তাকালে পাব ভিন্ন ছবি। ইংরেজ, ফরাসী, ডাচ, ড্যানিশ সব দেশ থেকেই বাণিজ্যের তরী ভারতের বন্দরে এসেছে। তবু সব দেশের পণ্য মিলিয়ে ভারত থেকে রপ্তানীর পরিমাণই বেশি। এর মধ্যে ইংরেজদের অংশই উল্লেখযোগ্য।

বাণিজ্যবাদ ও ভারতবর্ষ :

ইংরেজ কোম্পানী তাদের জাতীয় পণ্য যেমন এদেশে আমদানী করেছে তার চেয়ে বেশী নিয়ে গেছে জাহাজ বোঝাই করে—বাড়তি পণ্যের জন্যে তারা এতাবৎকাল (পলাশীর যুদ্ধের আগে পর্যন্ত) সোনা এনেছে। কিন্তু এনেছে ঐ পর্যন্তই! এ দেশের ভোগে তা লাগে নি। উল্টোমুখে সেই স্বর্ণ সম্পদের পুঁজি ছাড়াও দেশের বাড়তি সম্পদও টান মেরে নিয়ে গেছে। নিয়েছে লুট করে বাণিজ্যের নামেই। সেই লুটের বিস্তৃত ইতিহাস রমেশ দত্ত উদ্‌ঘাটন করেছেন।

ভারত-বাণিজ্যে রপ্তানী বাড়লেও ভারতের সম্পদ বাড়েনি। উপরন্তু শিল্পোৎপাদন দ্রুতগতি সর্বনাশের পথে নেমে এসে আর্থিক উন্নতির পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। কলোনীয়াল বাণিজ্যের এই রিক্ত লাঞ্ছিত ভয়াবহ রূপের চিত্রই পাই রমেশ দত্তের কলমে।

মুনের বাণিজ্যবাদ তত্ত্বের যুক্তিসম্মত প্রয়োগ ঘটেছে ইংরেজের জাতীয় বাণিজ্যে। টমাস মুনের পর অ্যাডাম স্মিথ। বাণিজ্যবাদের যুগোপোযোগী যে টুকু ঘাটতি ছিল আধুনিক অর্থনীতির জনক অ্যাডাম স্মিথের বাণিজ্যতত্ত্বে তাও দোষমুক্ত হল। নতুন তাত্ত্বিক হাতিয়ারে সমৃদ্ধ ইংলণ্ডের উদীয়মান শিল্প জগৎ বহির্বাণিজ্যের চরিত্র বদলে দিতে পেরেছিল। এমন কি কাগজে কলমে ভারতবাণিজ্যে বাড়তি রপ্তানীর ছবি থাকলেও সে যুগেও সর্বনাশের পিচ্ছিল পথ আরো পিচ্ছিলতর হয়েছিল।

মুনের বাণিজ্যবাদ কিংবা অ্যাডাম স্মিথের নতুন বাণিজ্যতত্ত্বের সংগে মিলিয়ে যে দুই তত্ত্বের উদ্ভাবনা তার মধ্যে যে সব তত্ত্বগত ফাঁক ছিল—সেই ফাঁকের মধ্য দিয়েই ভারতের আর্থিক দুর্গতি ত্বরান্বিত হয়েছে। বাণিজ্যবাদ যেমন য়ুরোপের সম্পদ বৃদ্ধির প্রেরণা দিয়েছে তেমনি অপরিসীম ক্ষতি করেছে ভারতের, এশিয়ার। স্মিথের আর্থিক তত্ত্ব য়ুরোপীয় শিল্প বিকাশের সহায়ক ছিল কিন্তু ভারত-শিল্পের সংহারক।

এই অর্থনীতির ইতিহাস আমরা যখন পড়ি, স্বদেশের ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে তা পড়ি না—অথচ রমেশ দত্ত অর্থনীতির বহুমান্য তত্ত্বের সর্বনাশা ফাঁকটুকুর চেহারা তুলে ধরেছেন। সে ছবি আমরা ধীরে ধীরে ব্যক্ত করবো।

একটা গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দায়িত্ব সুসম্পূর্ণ করেছে বাণিজ্যবাদ। বাণিজ্যবাদের যুগ ত্বরিত পুঁজি সঞ্চয়ের (Accumulation of Capital) যুগ। নতুনতর উৎপাদন ব্যবস্থার সূচনার মুখে যে সঞ্চিত পুঁজির প্রয়োজন ছিল সেই পুঁজির উৎস মুখ খুলে দিয়েছে—সম্প্রসারিত বহির্বাণিজ্যের তাত্ত্বিক সমর্থন জুগিয়ে নতুন শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থার (টোটাল ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজেসান) দিকে সমাজের মুখ ফিরিয়েছে। ফলে বাণিজ্য পুঁজির (Merchant Capital) প্রেরণায় শিল্প পুঁজির (Finance Capital) আবির্ভাব ঘটলো—কিন্তু ভারতে য়ুরোপীয় বাণিজ্যবাদ সম্পূর্ণ বিপরীত ভূমিকায় অবতীর্ণ হল। এখানে ধ্বংস পেয়েছে সঞ্চিত পুঁজির সম্ভাবনা ও প্রচলিত শিল্পোৎপাদন। নতুনতর উৎপাদনের সম্ভাবনাটুকুও নষ্ট হয়েছে।

বাণিজ্যবাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা ঃ

দুটি ঐতিহাসিক স্তরে য়ুরোপীয় বাণিজ্যবাদ বিকাশ লাভ করেছে। প্রথম স্তর ছিল যে কোন রকমে দেশের সম্পদ বাড়াতে হবে (…a some what revenue raising, gold accumulating pro ess…)। য়ুরোপের আর্থিক চিন্তায় ১৭০০ সাল অব্দি এ যুগের প্রভাব ছিল বেশি।

প্রথমে পথ দেখিয়েছে পর্তুগীজ আর স্প্যানিশ দস্যুরা। পঞ্চদশ শতক থেকে শুরু হয়েছিল তাদের দুঃসাহসিক অভিযান। মেক্সিকো, পেরুর স্বর্ণ সম্পদ লুণ্ঠিত হয়ে স্পেনের ভাণ্ডারে জমা হয়েছে। একে একে আবিষ্কৃত হয়েছে মধ্য আমেরিকা, চিলি, আর্জেন্টিনা, ক্যালিফোর্নিয়া, ফ্লোরিডা—সব জায়গায় পাওয়া যায় অশেষ লুণ্ঠনের ইতিহাস। পর্তুগীজ দখলে এসেছে উত্ত আমেরিকার কলোনীগুলো। এসব দেশের স্বর্ণ সম্পদ নির্বিচারে লুণ্ঠিত।

তবে বাণিজ্যের ভূমিকা মুখ্য করে দেখেছে ইংরেজরাই। বড় বড় কোম্পানী (২) গড়ে দেশান্তরের হাটে পণ্য বেচে ঘরে জমা করেছে সম্পদ। এদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী ভূমিকা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর। ১৬০০ সন থেকে শুরু করে ১৮৩৩ পর্যন্ত তার বাণিজ্য অভিযান আর ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৮ পর্যন্ত করেছে দেশ শাসন।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে বাণিজ্যবাদের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছে। এবং শেষ পর্যায়ে হয়েছে নতুন শিল্পযুগের উদ্বোধন ইংলণ্ডে—অপরিমেয় বাণিজ্যজাত পুঁজি থেকে আর ক্রমবর্ধমান বহির্বাণিজ্যের তাগিদে ব্যপক শিল্পায়ন ও শিল্প বিপ্লব।

শিল্প বিপ্লবের তাগিদেই অন্য দেশের শিল্পজাত পণ্যের আমদানী কমিয়ে দেওয়ার জন্যে চাপ এসে পড়লো ইংলণ্ডের বহির্বাণিজ্যের ওপর। কিছু কিছু বিদেশী পণ্যের আমদানী কমিয়ে না দিলে ইংলণ্ডের শিল্প প্রসার রুদ্ধ হয়ে যাবে। ইংলণ্ডের কার্পাস বস্ত্র ও পশমী বস্ত্রের উৎপাদন বেড়ে গেছে অনেক। সুতরাং রপ্তানী যোগ্য পণ্য জাহাজ বোঝাই করে বিদেশের বাজারে পাঠাতে হয়। অতএব নতুন শিল্পোৎপাদনের তাগিদে বাণিজ্যবাদের অবাধ স্বাধীনতার ওপর সরকারী হস্তক্ষেপ এসে পড়তে বাধ্য।

কিছু কিছু আমদানী যোগ্য পণ্যের ওপর বর্ধিত হারে শুল্ক চাপানো হল। না হলে তাদের আমদানী কমানো যাবে না। আমদানী কমানোর কারণে সরকারী আইন শিল্প যুগের সমর্থনে (protection of established industry policy) হাতিয়ার হয়ে আবির্ভূত হল। এই আর্থিক ব্যবস্থাকেই অ্যাডাম স্মিথ স্বাগত জানিয়েই প্রথম বলেছিলেন…opening new era of economic science (wealth of Nation)। এবং এখানেই বাণিজ্যবাদের সমাপ্তির শুরু।

[২] জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির বৈপ্লবিক সূচনা এল ইংলণ্ডে। আর নতুন বাণিজ্যনীতির ফলাফল ভারতের শিল্প বাণিজ্যের দ্রুত সর্বনাশ ডেকে আনলো। রমেশচন্দ্র বিস্তৃত করেছেন এই ইতিহাস।

১। A Discourse of trade from England into East Indies (1621)—Thomas Mun.

			প্রতিষ্ঠাকাল
২। দি মার্চেন্ট অব স্টেপ্	…	…	১৫০০ খৃষ্টাব্দ
দি মার্চেন্ট অ্যাডভেঞ্চার্স	…	…	১৫০৫ ,,
দি মাস্কোভি কোম্পানী	…	…	১৫৫৩ ,,
দি ইস্টল্যাণ্ড কোম্পানী	…	…	১৫৬৮ ,,
দি লেভান্ট কোম্পানী	…	…	১৫৮১ ,,
দি গিনি কোম্পানী	…	…	১৮৮৫ ,,
দি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী	…	…	১৬০০ ,,

রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনস্টাইন, বন্ধুত্ব-ইতিহাস

অশ্রুকুমার সিকদার

বন্ধুর মাধ্যমে ভাবুকসমাজের সঙ্গে পরিচয়

এর পরে শুরু হয় ভোজসভায় বা চায়ে নিমন্ত্রণ, নানা সভায় সম্বর্ধনা, নানা মনীষীর সঙ্গে পরিচয়; ইংল্যাণ্ডের ভাবুক সমাজ বহুভাবে সিংহসম্মানে কবিকে সম্মানিত করতে আরম্ভ করলো। নিজে চিত্রী হলেও রোটেনষ্টাইনের বন্ধুবর্গের মধ্যে কেউ ছিলেন সাহিত্যিক, কেউ চিত্রী, সাংবাদিক, স্থপতি বা রাজনীতিবিদ।

Father had simply to mention such names as Yeats, Masefield, H. G. Wells, Stopford Brooke, Hudson, Nevinson, Evetyn Underhill, and in a few days he would find himself sitting with them over the lunch or tea-table.

এঁদের নিয়েই 'ইংল্যাণ্ডের ভাবুকসমাজ' এবং সামান্য পরিচয়েই 'একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়া আমি বারম্বার বিস্মিত হইয়াছি, সেটা ইঁহাদের মনের ক্ষিপ্রহস্ততা। মন ইলেকট্রিকের আলোর তারের মত সর্বদা যেন প্রস্তুত হইয়াই আছে, বোতামটি টিপিবামাত্র তখনই জ্বলিয়া ওঠে। একদিন বারট্রাণ্ড রাসেল নিজ পরিচয় দিয়ে উপস্থিত হন এবং বলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করার জন্যই তিনি কেম্ব্রিজ থেকে এসেছেন এবং then without any further attempt at conversation abruptly asked him, 'Tagore, what is Beauty?' The question came so suddenly that Father kept silent for a minute and then explained his ideas on aesthetics which he later developed in 'what is Art' in his book Creative Unity. (On the Edges of Time).

রাসেল যেমন সহসা এসেছিলেন, ব্যাখ্যা শোনার পর তেমনি সহসা চলে গেলেন। জুনের শেষে রবীন্দ্রনাথ কেম্ব্রিজের অধ্যাপক লোয়েস ডিকিনসনের আমন্ত্রণে তাঁর বাসায় দুদিনের জন্য যান, ইনি সেই লোয়েস ডিকিনসন যাঁর 'জন চীনাম্যানের পত্র' বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন। (১) 'পথের সঞ্চয়ে' রবীন্দ্রনাথ কেম্ব্রিজে রাসেল ও ডিকিনসনের সঙ্গে তাঁর আলোচনার কথা লিখেছেন। 'রাসেল সাহেবের মন প্রখর আলোকে দীপ্যমান। সেই চিন্তার আলোকের সঙ্গে সঙ্গে অপর্যাপ্ত হাস্যরশ্মি মিলিত হইয়া আছে, সেইটি আমার কাছে সব চেয়ে সরস লাগিল। রাত্রে আহারের পর আমরা কলেজের বাগানে গিয়া বসিতাম, সেখানে একদিন রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত প্রাচীন গুরুসভার গভীর নীরবতার মধ্যে এই দুই অধ্যাপক বন্ধুর আলাপ আমি শুনিতেছিলাম।...নিস্তব্ধ রাত্রে দুই বন্ধুর কণ্ঠের কথাবার্তায় আমি মানুষের মনের মধ্যে সমস্ত বিশ্বের সেই আনন্দ সেই ঐশ্বর্য অনুভব করিতেছিলাম।'

ডিকিনসন সেই রাত্রির বর্ণনা নিজেও দিয়েছেন (Aronson-এর Tagore through western Eyes-এ উদ্ধৃত)।

It was a June evening, in a Cambridge garden Mr. Bertrand Russell and myself sit there alone with Tagore. He sings to us some of his poems, the beautiful voice and the strange mode floating away on the gathering darkness. Then Russell begins to talk, coruscating like lightning in the dusk. Tagore falls into silence. But after wards he said, it had been wonderful to hear Russell talk. He had passed into a higher state of consciousness' and heard it, as it were, from a distance.

মে সিনক্লেয়ার, যিনি St. John of the cross-এর তুলনাতেও গীতাঞ্জলিকে উৎকৃষ্টতর বলেছিলেন, তিনি অন্য একদিন লিলি ইয়েটসের সঙ্গে রোটেনষ্টাইনের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের কবিতাপাঠ কালে উপস্থিত ছিলেন। তিনি Sesame Club-এ রবীন্দ্রনাথের সম্মানে এক ভোজ দেন। রবীন্দ্রনাথের সেদিন আসন পড়ে বারনার্ড শ'-র পাশে। সেদিনের ভোজসভার বিবরণে রথীন্দ্রনাথ লিখছেন,

Conversation flowed around the table with sparkling brilliance, but to the surprise of every body shaw hardly opened his mouth. Father had never kept so silent any where before.

রথীন্দ্রনাথের উক্তি অনুযায়ী শ'র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী সাক্ষাৎ হয় Queen's Hall এ বেহালা বাদক হেইকেজের বাদ্যশেষে—ভিড়ের মধ্যে থেকে সহসা শ' এগিয়ে এসে রবীন্দ্রাথের হাত ধরে বলেন 'Do you remember me ? I am Bernard shaw' এবং বলেই পুনরায় ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে যান। শ'-র, সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের প্রথম আলাপ রোটেনষ্টাইনের বাড়িতে। কিন্তু তখন রোটেনষ্টাইন স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন না। স্ত্রীর মুখে রোটেষ্টাইন শোনেন, শ' নাকি জনান্তিকে ভারতীয়দের বহু বিবাহ প্রথার প্রতি ইঙ্গিত করে সরসভাবে মন্তব্য করেছিলেন, এই শ্মশ্রুধারীর না জানি কয়টি স্ত্রী! রবীন্দ্রনাথ যখন ১৯৩০-৩১ সালে বিলাতে তখন ৮ই জানুয়ারি তারিখে হাইড পার্ক হোটেলে শ'র সঙ্গে তাঁর আবার সাক্ষাৎ হয় এবং দুজনে দীর্ঘ সময় ব্যাপী আলোচনা হয়।

পূর্বপরিচিতদের মধ্যে আসতেন হ্যাভেল ও কুমারস্বামী। নতুন পরিচয় হল বৈজ্ঞানিক অলিভার লজের সঙ্গে, যাঁর এখন উৎসাহ শুধু প্রেততত্ত্বে এবং পরলোকে। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় লেখক হাডসনের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিতে বিলম্ব করলেন না রোটেনষ্টাইন, কারণ তিনি নিজেও হাডসনের ভক্ত ছিলেন। আরনেষ্ট রীসের সঙ্গেও পরিচয়ের মাধ্যম রোটেনষ্টাইন। Everyman's series-এর সম্পাদক রীস মাঝে মাঝে অফিসফেরৎ শ্মশ্রুসমেত মুখে প্রশান্ত হাসি নিয়ে সোজাসুজি রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে ঢুকে পড়তেন। কোনো কোনো দিন আবার তাঁর গোলডার্স গ্রীনের বাড়িতে এ পক্ষের নিমন্ত্রণ থাকতো এবং বাগানে শরবতে চুমুক দিতে দিতে তাঁর পিয়ানোবাদ্য শোনা হত। রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা থেকে উদ্ধৃত করছি—

Very often the whole family would gather round Father, and ask him to

sing Gitanjali songs. They were welsh and even after their long residence in London they had lost none of their racial characteristics. Music in the blood of the celtic race, and there fore it was not surprising that they could appreciate Father's songs, though the music was foreign.

রোটেনষ্টাইনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি তারিখহীন চিঠি, সম্ভবত ১৯২২ সালে লেখা, থেকে জানা যায় পরবর্তীকালে তিনি রীম্‌কে শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। রীম্ সম্ভবত ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু তাঁর স্ত্রী অসুস্থতার অজুহাতে আপত্তি করেন। তখন রবীন্দ্রনাথ স্টার্জ মূরকে আমন্ত্রণ জানান, কিন্তু স্টার্জ মূরও জানান চার বছরের মধ্যে তাঁর আসা অসম্ভব।

রোটেনষ্টাইন যখন ষ্টুডিয়োর খ্যাতনামাদের ছবি আঁকতেন তখন অনেক সময় রবীন্দ্রনাথ সেখানে বসে তাঁদের সঙ্গে আলাপ করতেন। এইভাবে তখনকার দিনের রোমান্টিক বীর 'Seven Pillars of Wisdom' গ্রন্থের রচিয়তা টি. ই. লরেন্স বা আরবের লরেন্সের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। নূতন দিল্লির স্থপতি হিসাবে তখন ল্যুটেনস নিযুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি হিন্দুশিল্পী সম্বন্ধে বেশি উৎসাহী ছিলেন না বলে, তাঁকে ওয়াকিবহাল করার মানসে রোটেনষ্টাইন নিজ গৃহে এনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। কিন্তু সর্বক্ষণ সরস মন্তব্য করায় ব্যস্ত থাকায় রবীন্দ্রনাথের ধারণা হয় নূতন দিল্লির যোগ্য স্থপতি ল্যুটেনস্ নন। তাঁর সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হন হ্যাভেল এবং রোটেনষ্টাইন। রোটেনষ্টাইনের আর এক বন্ধু ফক্স্-ষ্ট্র্যাংওয়েজের প্রস্তাব করেন রবীন্দ্রনাথকে যেন অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজ থেকে সম্মানসূচক ডিগ্রি দেওয়া হয়। কার্জনের পরামর্শ চাওয়া হলে তিনি জানান রবীন্দ্রনাথের চেয়ে ভারতবর্ষে যোগ্যতর ব্যক্তি আছেন। দীর্ঘকাল পরে আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ড লেখার সময় রোটেনষ্টাইন মন্তব্য করেছেন—

I wondered who they were; and I regretted that England had left it to a foreign country to make the first emphatic acknowledgement of his contribution to literature.

ইণ্ডিয়া সোসাইটির গৃহে রোটেনষ্টাইন রবীন্দ্রনাথের 'Chitra' পাঠের ব্যবস্থা কালে, অন্যান্যদের মধ্যে সভায় উপস্থিত ছিলেন ইয়েটস্ এবং সস্ত্রীক গ্রার্ণভিল বার্কার। সভা হয় ১৫ই মে ১৯১৩-র পূর্বে কোনো তারিখে, কারণ ঐ তারিখে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে পাঠের খবর দিয়েছেন। West Minister Gazatte-এ এই পাঠের বিবরণ প্রকাশিত হয় (চিঠিপত্র—৪-এ উদ্ধৃত।)

Before a large and deeply interested gatharing that included many Anglo-Indians and many well-known men of letters Mr. Tagore bend over his reading desk—a tall, slim figure dressed in tight fitting garments of black...The reading was received with enthusiasm by the auidence; and the poet, a quite almost a shy man—was overwhelmed with compliments by the many admirers who crowded

round him before he could escape from the room.

দেহে মনে প্রাণে যাঁকে 'এমন অজস্র বলিয়া বোধ হয়' সেই ইয়েটসের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ের মাধ্যম রোটেনষ্টাইন। এলম্যান 'The Identity of Yeats' গ্রন্থে লিখেছেন,

From about 1912 through 1915, Yeats felt his blood stirred, as he said, by Rabindranath Tagore.

তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে বা সেই সম্বন্ধে প্রশস্তি করেই ক্ষান্ত হলেন না, তিনি 'Gitanjali'-র ভূমিকা লেখার দায়িত্ব নিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি কুল পার্ক থেকে ১৯১২-র ৭ই সেপ্টেম্বর রোটেনষ্টাইনকে লিখলেন,

In the first little chapter I have given what Indians have said to me about Tagore—their praise of him and their description of his life. What I am anxious about—some fact may be given wrongly, and yet I don't want anything crossed out by Tagore's modesty...My essay is an impression, I give no facts except those in the quoted conversation.

উপরন্তু তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বসে সামান্য দুই-একটি শব্দের পরিবর্তনে কবিতাগুলির ভাষান্তরকর্ম সার্থকতর করে তুলতে সাহায্য করলেন। রবীন্দ্রনাথের সেই সহযোগিতার স্মৃতি রোমন্থন করেছেন রোটেনষ্টাইনকে লেখা ১৯৩২ সালের ২৬ নভেম্বরের দীর্ঘ চিঠিতে—

Then came those delightful days when I worked with Yeats and I am sure the magic of his pen helped my Engligh to attain some quality of permanence. It was not at all necessary for my own reputation that I should find my place in the history of your literature. It was an accident for which you were also responsible and possibly most of all was Yeats.

যে তিনজনের কাছে 'Gitanjali'-র টাইপ করা নকল রোটেনষ্টাইন পাঠিয়েছিলেন তাঁর মধ্যে অন্যতম ছিলেন স্টপফোর্ড ব্রুক। পরে ব্রুকের সঙ্গে সাক্ষাতে রবীন্দ্রনাথ অভিলাষী হলে, ব্রুক রোটেনষ্টাইনকে বলেন, 'কবিকে আনিবে, কিন্তু তাহাকে বলিও যে আমি মহাত্মা নহি' (রবীন্দ্রজীবনী ২)।' তাঁর সঙ্গে আলাপের বিবরণ রবীন্দ্রনাথ 'পথের সঞ্চয়ের' 'স্টপফোর্ড ব্রুক' নিবন্ধে দিয়েছেন। কবির তাঁর প্রধানত খ্রীষ্টানধর্ম ও জন্মান্তরবাদ নিয়ে আলোচনা হয়। নিজের বাড়িতে ডিনারের নিমন্ত্রণ করে এইচ. জি. ওয়েলেসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় করিয়ে দেন রোটেনষ্টাইন। স্টার্জ মুর, যাঁকে রবীন্দ্রনাথ 'The Crescent Moon' উৎসর্গ করেন, তাঁর সঙ্গেও সেখানে রবীন্দ্রনাথের আলাপ। তরুণ মার্কিন কবি এজরা পাউণ্ড ভক্তের মত রোটেনষ্টাইনের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের কাছে উপস্থিত হতেন। তাঁরই উৎসাহে শিকাগোর 'Poetry' পত্রিকায় প্রথম রবীন্দ্রনাথের কবিতা ছাপানো হয়। ছাপানোর প্রস্তাব দিয়ে তিনি সম্পাদিকা হ্যারিয়েট মনরোকে ১৯১২-র ২৪শে সেপ্টেম্বর লেখেন—

Also I'll try to get some of the poems of the very great Bengali poet,

Rabindranath Tagore. They are going to be the sensation of the winter...

১৩১৩-র মার্চ সংখ্যা 'Fortnightly Review'-এ তিনি 'Gitanjali'-র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।" (২) রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা', 'মালিনী' ও 'ডাকঘরের' ইংরেজি তর্জমা—'Chitra' (৩) 'Malini' ও 'Post Office'—সম্পূর্ণ হলে রোটেনষ্টাইন সেগুলি উদীয়মান কবি ও নাট্যকার ট্রেভেলিয়ানকে দেখতে দেন। ট্রেভেলিয়ান বলেন 'এই লেখাগুলির মধ্যে তিনি গ্রীক সাহিত্যের রস পান।

একদিকে এইভাবে ইংল্যাণ্ডের মনীষীসমাজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় সুরু হল রোটেনষ্টাইনের মাধ্যমে, অন্যদিকে তাঁকে সম্বর্ধিত করার জন্য সভাসমিতির নানা আয়োজন হল—এই সমস্ত আয়োজনের প্রায় প্রত্যেকটির পিছনে রোটেনষ্টাইনের অদৃশ্য হস্ত বর্তমান। বিলাতের উদারপন্থীদের প্রধান সাপ্তাহিক মুখপত্র Nation পত্রিকার পক্ষ থেকে একদিন রবীন্দ্রনাথকে মধ্যাহ্ন-ভোজে নিমন্ত্রণ করা হলো। ১৯১২-র ১০ জুলাই তারিখে কেদারনাথ দাশগুপ্তের উদ্যোগে এমার্সন ক্লাবে Union of Esst and West সমিতি রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্ধিত করে। ও Villas on the Health থেকে 'Summer 1912'—এ লেখা একটি চিঠিতে দেখি রবীন্দ্রনাথ রোটেনষ্টাইনকে জানাচ্ছেন তাঁর দেশবাসী Indian Union Society-তে তাঁকে অভিনন্দিত করবেন। Union of East and West বাঙালীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সমিতি—সেই কারণে ও কিছুটা নাম সাদৃশ্যের ফলে মনে হয় এই দুইটি সম্ভবত একই প্রতিষ্ঠান। ১২ই জুলাই হলো Trocadero Restaurant-এ নির্বাচিত সুধীমণ্ডলী সমাবেশে India Society প্রদত্ত সম্বর্ধনা। এই সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ডক্টর ও শ্রীমতী হেরিংহাম, রোজার ফ্রাই, হ্যাভেল, রোটেনষ্টাইন প্রমুখ ভারতশিল্পের অনুরাগীবৃন্দ। India Society-র অনুষ্ঠান সম্বন্ধে রথীন্দ্রনাথ প্রাগুক্ত পুস্তকে লিখেছেন—

After Yeats had given a reading from Gitanjali—this time before a larger and representative gathering—there were many after-dinner speeches by leaders of different literary groups. While replying to the toasts Father recited a few unpublished poems, and at the end when Father sang in Bengali the national song Vande Mataram everybody rose and remained standing.

৩০শে জুলাই Royal Albert Hall Theatre-এ আর একটি অনুষ্ঠান হলো। রবীন্দ্রনাথের 'দালিয়া' গল্পকে ইংরেজীতে ভাষান্তরিত করেন কেদারনাথ দাশগুপ্ত এবং তার নাট্যরূপ দেন জর্জ ক্যালডেরন—সেই 'Maharani of Arakan'-এর অভিনয়। অভিনয়ের পূর্বে প্রথমে ভারতীয় গায়কগণ গান করেন, রোটেনষ্টাইন কবিপ্রশস্তিসূচক বক্তৃতা করেন এবং ফ্লোরেন্স ফার, যিনি ইয়েটসের সঙ্গে কবিতাপাঠ বিষয়ে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা করেছিলেন, তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ করেন।

ইংল্যাণ্ডের পল্লীগ্রাম ॥

নবপ্রাপ্ত সহচর চার্লি এনড্রুজ বোঝালেন ইংল্যাণ্ডের গ্রাম না দেখলে ইংল্যাণ্ডের পূর্ণ পরিচয়

পাওয়া যায় না। তাই স্টাফোর্ডশায়ারের অন্তঃপাতী বাটারটন গ্রামে তিনি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে গেলেন বন্ধু উট্রামের বাড়িতে। পাদ্রী উট্রাম সিপাহী বিদ্রোহকালের বিখ্যাত ইংরেজ সেনাপতি উট্রামের পুত্র। 'পথের সঞ্চয়ের' 'ইংল্যাণ্ডের পল্লীগ্রাম ও পাদ্রী' প্রবন্ধে নূতন অভিজ্ঞতার চমৎকার বর্ণনা আছে। বাটারটনের পল্লীনিসর্গ চমৎকার, সেখানে 'মঙ্গলব্রতে-নিয়ত-উৎসর্গ-করা' উট্রাম সাহেব আছেন, কিন্তু কবির মন রোটেনষ্টাইনের গৃহকোণের প্রতি ধাবিত। তিনি Butterton Vicarage থেকে বন্ধুকে ৫ই আগষ্ট ১৯১২ তারিখে লিখেছেন—

The weather here is not an ideal summer weather but the country round is beautiful and our host and hostess are nice people. So I have nothing to complain of. But I have made a discovery since I came here that I had grown fond of Hampstead without being aware of it. The reason of it was that while there I could easily go to a place which was dear to me and it gave me a purpose in my daily life in London. You must have a central attraction if you want to save yourself from the distraction of having nothing particular to look forward to. It is realy this definite attraction that makes everything else attractive. I miss here that nucleous of love that made each of my London days so complete. I am sure that the best thing I could carry back home from my travels would be the memory of those happy days in your dear neighbourhood.

দুজনের সম্পর্ক ক্রমেই কত নিকট হয়ে উঠেছিল এই চিঠি থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। পরের দিন লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ রোটেনষ্টাইনকে অনুরোধ করছেন গ্লস্টার স্টেশনে উপস্থিত থাকার জন্য 'to guide us to the train that goes to Stroud.' বাটারটন থেকে কবি গেলেন রোটেনষ্টাইন পরিবারের সঙ্গে বাস করার জন্য গ্লস্টারশায়ারের অন্তঃপাতী চ্যালফোর্ড গ্রামে।

It happened that the summer (1912) was one of the rainiest on record. 'A traveller always meets with exceptional condition', said Tagore, when I apologised for the cold and rain, and the absence of the sun. When kept indoors, he busied himself with translations of more poems and plays (Men and Memories II).

গ্রামাঞ্চলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে স্ট্রাউডের নিকট এক পুরানো খামারবাড়ি দেখে তাঁদের ভালো লাগে এবং প্রধানত শিল্পীজায়া এলিসের আগ্রহাতিশয্যে সেই Iles Farm রোটেনষ্টাইন ক্রয় করেন। সংস্কারের পর এইটিই তাঁদের স্থায়ী নিবাস হয়, এই বাড়ির নাম Far Okridge। মার্কিনদেশ থেকে ফিরে রবীন্দ্রনাথ এখানে কয়েক দিন যাপন করেন। অনেক পরে শান্তিনিকেতন থেকে লিখিত এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ রোটেনষ্টাইন-পরিবারের সঙ্গে একত্রে গ্রামে বাসের স্মৃতি রোমন্থন করেছেন (চিঠির তারিখ জুন ২৫, ১৯৩৯—হটন গ্রন্থাগার সংগ্রহের সর্বশেষ তারিখের চিঠি)—

I thank you for your letter which recalls back to my mind that never-to-be forgotten memories of my stay in your village, where practically for the first time I had my real contact with the English country. It is now a quarter of a century that stands athwart my mind and yet I can atmost see today the undulating down and the luscious green of the meadows. Sometimes I have so irresistibly felt like visiting the place once again before I take my farewell but Europe today is a powder magazine and I wonder if it has a place for a more poet like me.

১. পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ডিকিনসনের একটি বইয়ের সমালোচনা করে রোটেনস্টাইনকে লেখেন (১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯১৫)—Loues Dickinson's Essay on the Civilization of Indian, China and Japan has made me feel sad. Not only he is entirely out of sympathy with India but has tried to make out that there is something in herent in Englishman which makes him incapable of appreciating India—and to him India by her very nature will be a source of eternal irritation. Of all the countries in the world India is the East to him—that is to say an abstraction... I only hope Dickinson is not right and that it was heat and hurry and dyspepsia that blotted out the human India from his sight leading him into the blank of a monotonous mist of classification.

২. এই প্রসঙ্গে 'সাম্প্রতিক' গ্রন্থের 'এজরা পাউণ্ড' প্রবন্ধ থেকে অমিয় চক্রবর্তীর বিবরণ উদ্ধৃত করছি—"পাউণ্ড ডেকে নিয়ে জানলার ধারে বসালেন এবং সব আলোচনার পূর্ব্বেই রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সঙ্গে তখন ছিলেন, স্বর্গীয় কালীমোহন ঘোষ, তাঁদের লণ্ডনে প্রথমে চেনার উৎসুক বর্ণনা দিলেন। রবীন্দ্রনাথই তাঁর কাছে ভারতবর্ষ, বলতে-বলতে তাঁর চোখে জল এল, বললেন জীবনে এসে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে একদিন বাংলা গান শুনেছি।...গীতিকাব্য যে কোথায় পৌছতে পারে তার পরিচয় রবীন্দ্রনাথের রচনা, তার তুলনা নেই ; সুর বাদ দিয়েও ছন্দে, মিলের ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে, গঠনের সৌকর্যে এবং ভাষার ভাবে-ইঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ গীতিকবিতার সম্রাট-শিল্পী। আরো বললেন, বাংলা কবিতার প্রত্যেক আলাদা বাংলা কথা উনি রবীন্দ্রনাথের কাছে বুঝে নিতেন, ছন্দের কূট আলোচনা করতেন, এমনি করে তাঁর খুব স্পষ্ট ধারণা হয়। সর্ব্বাতীত কারুসৃষ্টির জগৎশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ।"

৩. 'চিত্রাঙ্গদা' কেন 'Chitra' হল তার কারণ রোটেনস্টাইনকে এক চিঠিতে (৭ নবেম্বর ১৯১৩) রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করেছেন—"The name of the heroine in Mahabharata is chitrangada but as you have no soft dental *d* in your alphabet and as your readers are sure to put accent in the wrong place making it sound very unmusical I have ventured to cut it short retaining the first portion of it which I am sure was the only portion used by her parents if she did have any name and parents to boot."

বঙ্কিম উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা

অশোক কুণ্ডু

[বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্র ও চরিনামের আলোচনা বর্ণানুক্রমে সাজানো রয়েছে। প্রত্যেকটি নামের প্রথম উপস্থিতি প্রথম বন্ধনীর মধ্যে নির্দেশিত হয়েছে। বোঝার সুবিধার জন্য প্রথম কয়েকটিতে বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া আছে, পরেরগুলিতে সংক্ষেপ করা হয়েছে।]

গুরগণ খাঁ (চন্দ্রঃ ১।১) ॥

'তিনি জাতিতে আরমানি; ইস্পাহান তাঁহার জন্মস্থান; কথিত আছে যে, তিনি পূর্বে বস্ত্রবিক্রেতা ছিলেন। কিন্তু অসাধারণ গুণবিশিষ্ট এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। রাজকার্যে নিযুক্ত হইয়া তিনি অল্পকাল মধ্যে প্রধান সেনাতির পদ প্রাপ্ত হইলেন। কেবল তাহাই নহে, সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হইয়া, তিনি নূতন গোলন্দাজ সেনার সৃষ্টি করেন। ইউরোপীয় প্রথানুসারে তাহাদিগকে সুশিক্ষিত এবং সুসজ্জিত করিলেন, কামান বন্দুক যাহা প্রস্তুত করাইলেন, তাহা ইউরোপ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইতে লাগিল; তাঁহার গোলন্দাজ সেনা সর্বপ্রকারে ইংরেজের গোলন্দাজদিগের তুল্য হইয়া উঠিল। মীরকাশেমের এমত ভরসা ছিলো যে, তিনি গুরগণ খাঁর সহায়তায় ইংরেজদিগকে পরাভূত করিতে পারিবেন। গুরগণ খাঁর আধিপত্যও এতদনুরূপ হইয়া উঠিল; তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত মীরকাশেম কোন কর্ম করিতেন না; তাঁহার পরামর্শের বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিলে মীরকাশেম তাহা শুনিতেন না। ফলতঃ গুরগণ খাঁ একটি ক্ষুদ্র নবাব হইয়া উঠিলেন। মুসলমান কার্যাধ্যক্ষেরা সুতরাং বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।' (চন্দ্র : ২।২)

সংক্ষেপে বঙ্কিমচন্দ্র গুরগণ খাঁ সম্বন্ধে এই যে পরিচয় দান করেছেন, তার সঙ্গে ইতিহাসের কোথাও অমিল নেই। ইতিহাসে আছে—"...an Armenian called Qhadja-gurghin,... was put at the head of the artillery, with orders to new-model it after the European fashion ;...To raise his character, he was henceforward called Gurghin-qhan, and distinguished by many favours, and he soon became a principal man in the Navvab's service." (Syed Gholam Hossein Khan's Seir Mutaqherin, Translated by M. Raymond under the pseudonym : Nota-Manus. Reprinted by D. C. Kerr, vol II, Sec X, P. 389)

মীরকাশেমের উপর গুরগণের ছিল অসামান্য প্রতিপত্তি। তাই সয়ের মুতাক্ষরীণ-এ আছে—"Navvab seem to have sold himself to him totally." গুরগণের প্রাধান্যে অন্যান্য মুসলমান রাজকর্মচারীদের বিরক্ত হওয়ার কথাও ঐ গ্রন্থে আছে।

গুরগণ খাঁর জীবনের একমাত্র আশা বাংলা তথা ভারতবর্ষের সিংহাসনে আরোহণ করা। মীরকাশেমের প্রধান সেনাপতি তিনি হয়েছেন বটে, কিন্তু তা'ও তাঁর স্বার্থসিদ্ধির জন্য। তাঁর আশা—"আমি বাঙ্গালার অধিপতি হইতে চাহি—মীরকাশেমকে গ্রাহ্য করি না—যে দিন মনে

করিব, সেই দিন উহাকে মস্‌নদ হইতে টানিয়া ফেলিয়া দিব।" ইতিহাসেও গুরগণ খাঁর এরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষী গর্বিত চরিত্র অংকিত আছে।—"Gurghin-qhan...was both extremely imprudent, and extremely proud, and detested in his heart every man of birth or understanding..." (Seir Mutaqherin P. 455)

গুরগণ খাঁর হৃদয়ে কোন মায়া-মমতা বা সদগুণ নাই। নিজ ভগ্নীকেও তিনি স্বার্থসিদ্ধির উপায়রূপে ব্যবহার করেছেন। এমন কি দলনী যখন মীরকাশেমের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেছেন তখন তিনি তাঁর নবাবহারেমে প্রবেশের পথ রুদ্ধ করে মরণের পথে ঠেলে দিয়েছিলেন। এরজন্য কখনো তাঁকে অনুশোচনা করতে দেখা যায়নি।

গুরগণ খাঁর কূটবুদ্ধি অসীম। তিনি অর্থের জন্য জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের সংগে দোস্তি করেছেন এবং পরবর্তীকালে সাহায্য পাবার আশায় নবাবশত্রু অমিয়টকে মিথ্যা কথা বলে নবাবের রোষ থেকে রক্ষা করেছেন।

ফষ্টর যেমন শৈবালিনীর জীবনের সর্বনাশে ইন্ধন জুগিয়েছে, তেমনি গুরগণ খাঁও মীরকাশেমের জীবনে সর্বনাশ ডেকে এনেছেন। মীরকাশেম-দলনী কাহিনীর সহায়তায় যতটুকু প্রয়োজন, বঙ্কিম ততটুকুও গুরগণকে এনেছেন। তাই শেষপর্যন্ত গুরগণ খাঁ-র কী হ'ল তা জানা যায় না।

গোপাল বসু (রজনী : ১।৪) ॥

গোপালের সংগে রজনীর বিয়ে ঠিক করে লবঙ্গলতা। 'গোপালের বয়স ত্রিশ বৎসর—একটি বিবাহ আছে, কিন্তু সন্তানাদি হয় নাই। গৃহধর্মার্থে তাহার গৃহিণী আছে—সন্তানার্থে অন্ধ পত্নীতে তাহার আপত্তি নাই।' অবশ্য শেষ পর্যন্ত এঁর সংগে রজনীর বিয়ে হতে পারেনি।

গোবরার মা (দেবী : ১।১৩) ॥

প্রফুল্লর 'হাটে ঘাটে' যাবারজন্য ভবানী পাঠক গোবরার মাকে নিযুক্ত করে। গোবরার মার— 'বয়স তিয়াত্তর বছর, কালো আর কালা। যদি একেবারে কাণে না শুনিত, ক্ষতি ছিল না, কোন মতে ইসারা ইংগিতে চলিত ; কিন্তু এ তা নয়। কোন কোন কথা কখন কখন শুনিতে পায়, কখন কোন কথা শুনিতে পায় না। এরকম হইলে বড় গণ্ডগোল বাধে।' এই গণ্ডগোলের কিছু পরিচয় দিয়ে বঙ্কিম হাস্যরসের অবতারণা ক'রেছেন।

গোবিন্দকান্ত দত্ত (রজনী : ২।২) ॥

ইনি কাশীবাসী। কাশীতেই কথোপকথন কালে তিনি অমরনাথকে রজনীর জীবনসংক্রান্ত অনেক তথ্য পরিবেশন করেন। তার ফলেই অমরনাথ রজনীর খোঁজ করেন।

গোবিন্দলাল (কৃ: উ: ১।১) ॥

'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের নায়ক গোবিন্দ লাল হরিদ্রা গ্রামের জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায়ের

আদরের ভ্রাতুষ্পুত্র—নয়নের মণি। গোবিন্দলাল শিক্ষিত, সচ্চরিত্র, সুন্দর, সর্ব গুণান্বিত। গৃহে তাঁর মমতাময়ী পত্নী ভ্রমর। এই সব পাওয়ার মধ্যেও গোবিন্দলালের অতৃপ্তির আগুন, এই সুখের মধ্যেও দুঃখের ঘটনার বীজের অংকুরই গোবিন্দলালকে স্মরণীয় করে তুলেছে।

উপন্যাসের প্রথমে দেখা যায় গোবিন্দলাল বারুণী পুষ্করিণী-তীরের ফুলবাগান নিয়েই সন্তুষ্ট। ভ্রমরকালো স্ত্রী ভ্রমরের সংগে কৃত্রিম কলহের মধ্য দিয়ে স্ত্রীর প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রকাশিত হ'য়েছে। কিন্তু বারুণী পুষ্করিণীতীরে রোহিনীর সংগে সাক্ষাত-ই তাঁর জীবনে বিপর্যয়ের সূচনা ক'রল। প্রথম দর্শনে রোহিনীর দুঃখের প্রতি সহানুভূতিই তিনি দেখিয়েছিলেন। তারপর কৃষ্ণকান্তের হাতে ধৃতা রোহিনীকে দয়া প্রদর্শন করতে গিয়ে গোবিন্দলাল আরো জড়িয়ে পড়েছেন। স্ত্রীলোকের ছলনার কাছে গোবিন্দলালের মত সরল স্বভাব পুরুষ বালকমাত্র। রোহিনীকে গোবিন্দলাল দেশত্যাগের পরামর্শ দিলে, রোহিনী গোবিন্দলালের কাছে তার প্রতি অনুরাগের কথা জানায়।

তখন থেকেই গোবিন্দলালের মনে কিছুটা আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা যায়। তাই তাই তাঁর সংগে রোহিনীর যাতে আর সাক্ষাৎ না হয় তার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত। ভ্রমরের কাছে গোবিন্দলালের কিছু অপ্রাপনীয় ছিল কিনা তা' স্পষ্ট করে জানা যায় না, কিন্তু বেশ বোঝা যায় ভ্রমরের কালো রূপের জন্যই হোক বা অন্য যে কোন কারণেই হোক, রোহিনীর রূপের প্রতি তাঁর মোহ জন্মায়। কিন্তু ঘটনার গতি গোবিন্দলালের চিত্তবিপর্যয়কে আরো ত্বরান্বিত করেছে। ভ্রমরের বাক্যে রোহিনীর বারুণী পুষ্করিনীতে নিমজ্জন, গোবিন্দলালের উদ্ধার ও 'ফুল্লরক্তকুসুমকান্তি অধরযুগলে ফুল্লরক্তকুসুমকান্তি অধরযুগল স্থাপিত করিয়া—রোহিনীর মুখে ফুৎকার' দান প্রভৃতি গোবিন্দলালকে আরো দুর্বল করে ফেলেছে।

কিন্তু তখনো গোবিন্দলাল আদর্শবাদের সংগে লড়াই ক'রে যাচ্ছেন।—'তখন গোবিন্দলাল সেই বিজন কক্ষ মধ্যে সহসা ভূপতিত হইয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মাটিতে মুখ লুকাইয়া, দরবিগলিত লোচনে ডাকিতে লাগিলেন, 'হা নাথ! নাথ! তুমি আমায় এ বিপদে রক্ষা কর!—তুমি বল না দিলে কাহার বলে আমি এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইব?—আমি মরিব—ভ্রমর মরিবে। তুমি এই চিত্তে বিরাজ করিও—আমি তোমার বলে আত্মজয় করিব।' (১।১৭)

কিন্তু এই ঘটনা ভ্রমরের কাছে গোপন ক'রে গোবিন্দলাল একটি বড় ভুল করে বসলেন। তার উপর জমিদারী কার্য দেখার নাম করে দূরে পলায়নও তাঁর অপরিণামদর্শিতার পরিচয় দেয়। তারপর আর গোবিন্দলালের কোন হাত ছিল না ঘটনার উপর। লোকের রটনা, রোহিনীর ছলনা, ভ্রমরের অভিমান ও বাপের বাড়ী যাত্রা ইত্যাদি ঘটনা ভ্রমর ও গোবিন্দলালের মধ্যে ক্রমাগত ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। গোবিন্দলাল ভ্রমরের কাছেই ফিরে আসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ভ্রমরের ব্যবহার তাঁকে ক্ষুব্ধ করে তুলল। তারপর কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুকালে ভ্রমরকে সম্পত্তি দানের ঘটনা গোবিন্দলালের জীবনকে আমূল পরিবর্তিত করে দিল।

এর পর থেকে গোবিন্দলাল রোহিণীর পিছনে ছুটে চলেছেন মদমত্ত মাতঙ্গের মত।

নেশা ভাঙলো যেদিন রোহিণী আবার আঘাত দিলেন গোবিন্দলালকে। গোবিন্দলাল হত্যা করলেন রোহিণীকে। উত্তেজনার মাথায় গোবিন্দলাল হঠাৎ রোহিণীকে গুলি করে হত্যা করলেও, অন্তরে অসন্তোষ বহুদিন থেকেই সঞ্চিত হচ্ছিল। এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে তা' হঠাৎ বহিঃ-প্রকাশ লাভ করল মাত্র।

ভ্রমর ও রোহিণী—এই দুই নারীর টানাপোড়েনে গোবিন্দলালের জীবন বিপর্যস্ত। ভ্রমরের মৃত্যুর পর বঙ্কিমচন্দ্র বিস্তারিতভাবে গোবিন্দলালের জীবনে এই দুই নারীর প্রভাবের স্বরূপ নির্ধারণ করেছেন।—'গোবিন্দলাল দুইজন স্ত্রীলোককে ভালবাসিয়া ছিলেন—ভ্রমরকে আর রোহিণীকে।…রোহিণীর রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন—যৌবনের অতৃপ্ত রূপতৃষ্ণা শান্ত করিতে পারেন নাই। ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়া রোহিণীকে গ্রহণ করিলেন। রোহিণীকে গ্রহণ করিয়াই জানিয়া-ছিলেন যে, রোহিণী, ভ্রমর নহে—এ রূপতৃষ্ণা এ স্নেহ নহে—এ ভোগ, এ সুখ নহে—এ মন্দারঘর্ষণপীড়িত বাসুকিনিশ্বাসনির্গত হলাহল, এ ধন্বন্তরিভাণ্ডনিঃসৃত সুধা নহে। বুঝিতে পারিলেন যে, এ হৃদয়সাগর, মন্থনের উপর মন্থন করিয়া যে হলাহল তুলিয়াছি, তাহা অপরিহার্য, অবশ্য পান করিতে হইবে—নীলকণ্ঠের ন্যায় গোবিন্দলাল সে বিষ পান করিলেন। নীলকণ্ঠের কণ্ঠস্থ বিষের মত, সে বিষ তাঁহার কণ্ঠে লাগিয়া রহিল। সে বিষ জীর্ণ হইবার নহে—সে বিষ উদ্গীর্ণ করিবার নহে। কিন্তু তখন সেই পূর্বপরিজ্ঞাতস্বাদ বিশুদ্ধ ভ্রমরপ্রণয়সুধা—স্বর্গীয় গন্ধযুক্ত, চিত্তপুষ্টিকর, সর্বরোগের ঔষধস্বরূপ, দিবারাত্রি স্মৃতিপথে জাগিতে লাগিল। যখন প্রাসাদপুরে গোবিন্দলাল রোহিণীর সঙ্গীতস্রোতে ভাসমান, তখনই ভ্রমর তাঁহার চিত্তে প্রবলপ্রতাপযুক্তা অধীশ্বরী—ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তখন ভ্রমর অপ্রাপনীয়া রোহিণী অত্যাজ্য,—তবু ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তাই রোহিণী অতশীঘ্র মরিল। যদি কেহ সেকথা না বুঝিয়া থাকেন, তবে বৃথায় এ আখ্যায়িকা লিখিলাম।' (২।১৫)

গোবিন্দলালের জীবনে দু'টি জিনিষ তাঁর সর্বনাশের সহায়তা করেছে। একটি দয়া, অপরটি অভিমান। রোহিণীর প্রতি দয়াই ক্রমে ভালবাসায় পর্যবসিত হয়েছে। আবার ভ্রমরের ব্যবহারে অভিমানাহত হয়েই তিনি নিজের সর্বনাশের পথ প্রস্তুত করেছেন।

গোবিন্দলালের পরিণামটি অতি নাটকীয় বলে মনে হয়। এই উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে, উন্মত্তাবস্থায় বারুণীপুষ্করিণীতে নিমজ্জনের দ্বারা গোবিন্দলালের পাপের শাস্তি দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু, ১৮৯২ খ্রীঃ চতুর্থ সংস্করণ থেকে গোবিন্দলাল সন্ন্যাসী হয়ে ভ্রমরের স্মৃতি ভোলার চেষ্টা করেছেন। শেষপর্যন্ত তিনি ঈশ্বরের পায়ে সমস্ত কামনা-বাসনা সমর্পণ করে শান্তি পেয়েছেন। প্রথমটির অপেক্ষা শেষোক্ত পরিণামটি অনেকটা শিল্পসম্মত হলেও, ভ্রমরের মৃত্যুশয্যায় গোবিন্দলালের হাহাকারের মধ্য দিয়ে কাহিনীর সমাপ্তি হলেই বোধ হয় সর্বাঙ্গসুন্দর হত।

গোবিন্দলালের মাতা (কৃঃ উঃ ১।৩০) ॥

'পতিহীনা কিছু আত্মপরায়ণা' এই মহিলার উপস্থিতি নিতান্তই গৌণ। কিন্তু বঙ্কিম তাঁকে কিছুটা দায়ী করেছেন ভ্রমর ও গোবিন্দলালের বিচ্ছেদের জন্য। তিনি যদি পাকা গৃহিণী হতেন

তাহলে হয়ত এ অঘটন ঘটত না। কিন্তু তিনি পুত্রবধুর বিষয়-সম্পত্তি পাওয়াতে সংসার ভাসিয়ে দিয়ে কাশীতে গেলেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

গোবর্দ্ধন (আনন্দ : ২।১) ॥

সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণের পর শান্তিকে—'গোবর্দ্ধন নামে একজন পরিচারক—সেও ক্ষুদ্রদরের সন্তান—প্রদীপ হাতে করিয়া ঘর দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিল। কোনটাই শান্তির পছন্দ হইল না।...উপন্যাসে এইটুকু মাত্র তার উপস্থিতি।

গৌরীঠাকুরাণী (আনন্দ : ৩।৪) ॥

'আনন্দমঠে'ও গুরুগম্ভীর পরিবেশে গৌরীঠাকুরাণীর রসবতী চরিত্রটি লঘুরসের অবতারণা করেছে। বঙ্কিম সামান্য কলমের আঁচড়েই এই চরিত্রটি সৃষ্টি ক'রেছেন। ভবানন্দকে দেখে তার স্থূল দেহে খাটো আঁচলখানি মাথা পর্যন্ত আনবার প্রয়াস, ভবানন্দের সাঙ্গা করার প্রস্তাবে তার আনন্দ—পাঠকের রঙ্গরস উপভোগের উৎস।

চঞ্চলকুমারী (রাজ : ১।১) ॥

চঞ্চলকুমারী চঞ্চলমতী রাজকুমারী। উপন্যাসে রূপনগর নামে এক ক্ষুদ্ররাজ্যের রাজকন্যারূপে তাকে অভিহিত করা হয়েছে। টডের 'the Annals and Antiquities of Rajasthan' গ্রন্থে রূপনগরের এক রাজকুমারের কাহিনী বর্ণিত আছে। (দ্রঃ The Annals and Antiquities of Rafasthan, James Tod—Published by S. K. Lahiri & Co, 1894. vol I, P. 351-52)। কিন্তু যদুনাথ সরকারের মতে 'রাজসিংহ' উপন্যাসের রাজকুমারী চঞ্চলকুমারী আসলে কিসনগড়ের রাজকুমারী চারুমতী। ঔরংজেব চারুমতীকে বিয়ে করতে চাইলে রাজকন্যা কুলপুরোহিতকে দিয়ে রাজসিংহের কাছে বিবাহ প্রস্তাব পাঠান। রাজসিংহের সংগে চারুমতীর বিয়ে হলেও, এ নিয়ে ঔরংজেবের সংগে কোন সংঘর্ষ হয়নি। (দ্রঃ সাহিত্যপরিষৎ গ্রন্থাবলী—বঙ্কিম শতবার্ষিকী সংস্করণে আচার্য যদুনাথ সরকার লিখিত ভূমিকা।৵৹)।

কিন্তু চারুমতীই হোন, বা রূপনগরের রাজকুমারীই হোন, বঙ্কিম যাকে 'রাজসিংহ' উপন্যাসে চঞ্চলকুমারীরূপে গড়ে তুললেন তাকে ইতিহাসে কোথাও পাওয়া যাবে না।

উপন্যাসে চঞ্চলকুমারীর আবির্ভাব একটি অতিনাটকীয় আচরণের মাধ্যমে। ঔরংজেবের চিত্রদলনের মধ্যে যতই উত্তেজনার খোরাক থাক, এর পেছনে এক অপরিণত বুদ্ধি বালিকার, অহেতুক উত্তেজনা ও অসংগত রসিকতার মনোবৃত্তিই প্রকাশিত। অবশ্য এর দ্বারা বঙ্কিমের একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। মুঘল রাজত্বের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ, রাজপুত জাতির মধ্যে এত প্রবল আকার ধারণ করেছিল যে তার ঢেউ রাজপুত অন্তঃপুরেও এসে প্রতিশোধের বাসনা জাগিয়ে তুলেছিল। তার প্রকাশ চঞ্চলকুমারীর চিত্রদলনে।

উপন্যাসের মধ্যে মুঘল-রাজপুত সংঘর্ষের যে ভয়াবহ বহ্নি জ্বলে উঠল তার মূলে রয়েছে

চঞ্চলকুমারীর ওই ভ্রান্তি। নাটকের দিক থেকে হলে একে বলা যেত Tragedy of Error। এই ঘটনার জন্য চঞ্চলকুমারীকে যে মূল্য দিতে হয়েছে তা তাঁর জীবনের Tragedy-র চেয়ে কিছু কম নয়।

চঞ্চলকুমারী রাজকুমারী রাজসিংহের চিত্রদর্শনে যেভাবে তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়েছেন, তাকে কিছুটা অস্বাভাবিক বলে মনে হওয়া অন্যায় নয়। বঙ্কিম নিজেও এ নিয়ে গণ্ডগোলের মধ্যে পড়েছিলেন।—'চঞ্চলকুমারীর কি হইয়াছে, তা তো বলিতে পারি না। শুধু ছবি দেখিয়া কি হয়, তা তো জানি না। অনুরাগ ত মানুষে মানুষে—ছবিতে মানুষে হইতে পারে কি? পারে, যদি তুমি ছবিছাড়াটুকু, আপনি ধ্যান করিয়া লইতে পার। পারে, যদি আগে হইতে মনে মনে তুমি কিছু গড়িয়া রাখিয়া থাক, তার পর ছবিখানাকে (বা স্বপ্নটাকে) সেই মনগড়া জিনিসের ছবি বা স্বপ্ন মনে কর। চঞ্চলকুমারীর কি তাই কিছু হইয়াছিল? তা আঠারো বছরের মেয়ের মন আমি কেমন করিয়া বুঝিব বা বুঝাইব?' (১।৩)

রাজসিংহের প্রতি আত্মনিবেদনে চঞ্চলকুমারী সর্বদাই সংযত থেকেছেন। রাজসিংহের প্রতি চঞ্চলকুমারীর ভালবাসা, ব্রত—বীরপূজা বলেই মনে হয়। চঞ্চল প্রথম দিকে বালিকাসুলভ চপলতা দেখালেও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ক্রমশঃ তিনি গম্ভীর হয়েছেন। তা' না হলে বোধ হয় প্রৌঢ় রাজসিংহের সহধর্মিণীরূপে তাঁকে সহ্য করা যেত না।

চঞ্চলকুমারীর দৃঢ় মনোবলও লক্ষ্য করার বিষয়। রাজসিংহের নিকট থেকে কোন সংবাদ না পেয়ে যখন তাঁকে মোগলবাহিনীর সংগে পাঠাবার আয়োজন চলছে তখনো তিনি দৃঢ়তার সংগে আত্মহত্যার সংকল্পে অটল থেকেছেন। আবার রাজসিংহ মবারকের মুখোমুখি সংগ্রামে চঞ্চলকুমারীর আবির্ভাব তাঁর সাহসিকতার পরিচয় দেয়। বঙ্কিম সে সময় তাঁকে ভৈরবীমূর্তিতে রূপান্তরিত করেছেন। তাঁর জন্যই যে বিরাট রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম সুরু হয়েছে, তা স্বচক্ষে দেখে তাঁর নারী-হৃদয় কেমন করে নিশ্চল থাকবে! তাই চঞ্চল সর্বপ্রথম মরবার অধিকার চেয়েছেন। মবারক চঞ্চলকুমারীকে ছেড়ে দিলে, তিনি মুবারকের বিপদের কথাও চিন্তা করেছেন। কিন্তু রাজসিংহের প্রাসাদে নিঃসংগতা কাটাবার জন্য যখন চঞ্চল সদ্যবিবাহিত স্বামী মানিকলালকে ছেড়ে নির্মলকুমারীকে নিজের কাছে থাকতে বাধ্য করেছেন, তখন একটু স্বার্থপরতার ভাব, বা নারীসুলভ দয়ামায়ার অভাব, দেখা যায়। উদিপুরীকে দিয়ে তামাক সাজানর ঘটনায় চঞ্চলকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, তিনি উপযুক্ত ব্যবহারই করেছেন। অথচ জেব-উন্নিসার প্রতি তার কি সৌজন্যসূচক আচরণ!

রাজসিংহের অন্তঃপুরে থেকেও যেভাবে চঞ্চল পিতৃআদেশের অপেক্ষায় দীর্ঘদিন ব্রহ্মচারী-জীবন যাপন করেছেন, তাতে তাঁকে শ্রদ্ধা করা চলে। কিন্তু বাইরে রণোন্মাদনার মধ্যে চঞ্চল-কুমারীর নিঃসংগ বেদনার অশ্রুসিক্ত প্রতীক্ষার দিনগুলো উপন্যাসে অনুক্তই থেকে গেল।

গ্রামীণ সংস্কৃতি ও নাটক

দীর্ঘদিন ধরে নাট্যালোচনা প্রসংগে একটা সর্বজনগ্রাহ্য নাট্যরীতি প্রতিষ্ঠার আভাস দিতে চেষ্টা করেছি কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই তার ঝোঁকটা ছিল নাগরিক। এবার ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনার পর গ্রামীণ (তথা অর্দ্ধনাগরিক) পরিবেশে নাট্যরীতি প্রসংগে কিছু আলোচনা করতে চাই।

প্রথমতঃ গ্রামীণ সংস্কৃতিতে নাগরিক দোলাচলতা তথা দোটানার সংকট আরো প্রকট। নগরে যে সব বস্তু অনেকটা যাদুঘরের বস্তু, গ্রামাঞ্চলে আজো তা নিত্য তথা প্রত্যক্ষ সত্য। গ্রামে হরিকথা, কথকতা, রামায়ণ পাঠ এখনো প্রায়ই হয়ে থাকে ও গ্রামের সাধারণ মানুষ তা থেকে আজো আনন্দ পায়। গ্রামে অন্য প্রমোদ মাধ্যম হিসাবে যাত্রা সর্বাধিক জনপ্রিয়। মাত্র ক'দিন আগে এক গ্রাম্য পরিবেশে যাত্রার আসরে দূরদূরান্ত থেকে শ্রোতা দর্শকরা পালাগান শুনে সারারাত কাটিয়ে পরের দিন ঢুলতে ঢুলতে নিত্যকার কাজ সেরেছে। অবশ্য যাত্রার আধুনিক রূপ অর্থাৎ স্ত্রী ভূমিকায় নটীর আবির্ভাব কিছুটা স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু স্থানীয় দলগুলির অভিনীত যাত্রায় আজো সেই সনাতন প্রথানুযায়ী পুরুষেই স্ত্রী ভূমিকা রূপায়িত করে থাকে।

এরই পাশাপাশি আধুনিকতম চলচ্চিত্রের প্রভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকট। আজকেই গ্রামবাংলায় মাঝি গান গেয়ে দাঁড়টানে, বাউল নেচে গান গায়, চাষা ধান কাটে গানের তালে, রাখাল গরু চরায় কিন্তু একমাত্র বাউল ছাড়া বাকীরা সকলেই নির্ভেজাল সিনেমা সংগীত গেয়ে থাকে। বাউল এখনো তার প্রথাসম্মত গানের মায়া কাটাতে পারে নি কিন্তু তাতেও আধুনিকতার প্রলেপ লাগতে সুরু করেছে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে বাক্স থিয়েটারের কথা চিন্তা করে দেখলে দেখা যায়, অতি সামান্য কিছু জন ছাড়া নাটকের ভক্ত নেই বললে অত্যুক্তি হবে না। এই সামান্য কিছুর সংখ্যা একযুগ আগেকার বিচারে অনেক কমে এসেছে। গ্রামের রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক পরিবর্তন এবিষয়ে কতটা দায়ী তা বিচার সাপেক্ষ হলেও, কিছুটা দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না।

সম্ভবতঃ একই কারণে অঞ্চল থেকে অঞ্চলে নাট্যামোদীর সংখ্যার তারতম্য ঘটে থাকে। নগর কলকাতার উপকণ্ঠবর্তী গ্রাম তথা সহরে নাটকের চাহিদা অপেক্ষাকৃত বেশী বলেই প্রমাণিত হয়েছে। সে তুলনায় যে অঞ্চল আরো কিছু দূরবর্তী, সেখানে নাটক অভিনয় অনেক কম বলে মনে হত। অবশ্য এর কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই, স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী কোথাও ব্যতিক্রম ঘটতেও দেখা যায়।

এই নাট্যামোদীদের একটা অংশের নাট্যভাবনা আবার বিশেষ মতবাদ প্রভাবিত। ফলে

নাট্যরসোত্তীর্ণ রচনার চেয়ে বক্তব্যমূলক নাটকের দিকেই তাদের প্রবণতা বেশী। বাকীদের মধ্যে কিশোরদেরই সংখ্যাধিক্য, ফলে স্ত্রীভূমিকা বর্জিত নাটকের প্রাধান্যও সর্বাধিক।

গ্রামাঞ্চলে স্ত্রীভূমিকায় অভিনয় করতে ইচ্ছুক মেয়ে পাওয়া কঠিন। মেয়েদের মধ্যে নাটক ভাল না লাগা এর কারণ নয়, কারণ সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে। ছেলেদের সঙ্গে যে সব মেয়ে বেশী মেশে গ্রামাঞ্চলে আজো তারা 'নষ্ট' বলেই গণ্য হয়ে থাকে। এমন অবস্থায় স্ত্রী ভূমিকা রূপায়নের উপযোগী মেয়ে পাওয়া প্রায় অসম্ভব হওয়ায় নাটক বাছাই কিছুটা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। ইদানীং কলকাতা ও তার আশপাশে সৌখীন নাটুকে দলে অভিনয়ের জন্য যে পেশাদারী অভিনেত্রী দল গড়ে উঠেছে তাদের কাউকে কাউকে নিয়ে এসে অভিনয়ের চেষ্টা করতে দেখা গেছে কিন্তু নানা অসুবিধার জন্য স্বাভাবিক ভাবেই তার সংখ্যা নগণ্য হতে বাধ্য।

অর্থাৎ গ্রামীণ সংস্কৃতির রূপান্তরে নাটকের অবদান অনুল্লেখ্য বললে ভুল হবেনা। ফলে, যেমন নাটক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে জনগণ। নাটকের সুদূরপ্রসারী প্রভাবের জায়গায় জনগণ সস্তা চটুল চলচ্চিত্রের প্রভাবে পড়ছে। অনেক ক্ষেত্রেই এগুলি স্বদেশী ঐতিহ্যানুসারী নয় ফলে সামাজিক বাঁধন আলগা হচ্ছে অথচ তার স্থান অধিকার করতে নতুন কোন বন্ধন গড়ে উঠছে না।

নাটকের ক্ষতি অবশ্য আরো মারাত্মক। দেশের মাটির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের কোন সুযোগই পাচ্ছে না নাটক। ফলে 'না ঘরকা না ঘাটকা' অবস্থা চিরস্থায়ী হতে চলেছে। আজকের দিনে বাংলা নাটকের বিদেশী অনুকরণের গোড়ার কথা এই গ্রামীণ পরিবেশ সম্বন্ধে অনবধানতা, অধিকন্তু তা জানবার বিষয়ে অনীহা। নাটক তাই ক্রমান্বয়ে মৌসুমী ফুলের পর্যায়ে গিয়ে পৌছচ্ছে, মাটির সঙ্গে যোগাযোগ তার ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

আশু অবস্থার পরিবর্ত্তন সম্ভব এমন মনে হয় না। তবে, নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের ভাষায় 'নাটককে যাত্রাইজড' করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর একটা স্বর্ণ সুযোগ এই পরিস্থিতি এনে দিচ্ছে আমাদের সামনে। কিন্তু কে সে সুযোগ গ্রহণ করবে। রবীন্দ্র জন্মোৎসবে যে দেশের অভিনয় শিল্পীরা এক হতে পারেন না সে দেশে এ ধরণের প্রচেষ্টা করার লোকাভাব সম্বন্ধে দ্বিমতের অবকাশ কোথায়?

তাহলে কি সাত মণ তেলও পুড়বে না রাধাও নাচবে না? অবস্থা দেখেও তাই মনে হয়। নাটক নিয়ে যা কিছু হৈ চৈ সবটাই নগর কলকাতা বা তার উপকণ্ঠেই সীমাবদ্ধ থাকবে, এই বোধ নাট্যামোদীদের মনের কথা। তাঁরা চান, দেশের সব জায়গার জলাশয় শুকিয়ে যাক আর কলকাতার নলের অপরিস্রুত জল দিয়েই সারা দেশের তৃষ্ণা মেটাবার ব্যবস্থা পাকা করার আপ্রাণ চেষ্টা চলছে, যদিও এটা সবাইকার জানা যে, কলকাতার জলে কলকাতারই তৃষ্ণা মেটে না। তাছাড়া সে জল যে বীজাণুশূণ্য নয় এ তত্ত্বও সর্বজনবিদিত। কিন্তু সে কথা নিয়ে মাথা ঘামায় কে, যারা জেগে ঘুমোয় তাদের জাগায় কে?

রবি মিত্র

সাহিত্য ও পরিভাষা

বাংলা ভাষায় "প্রতিশব্দ" তৈরী হচ্ছে অনেকদিন ধরে। প্রতিশব্দ বললেই কিন্তু আমার কাছে মনে হয় অনুবাদের কথা—যেন ধার করা কিছু একটা। অথচ সত্যি কথা বলতে গেলে আজকের যা সমস্যা তার পিছনে রয়েছে বিংশ শতাব্দীর ঘটমান ইতিহাসের ধারা এবং সে ধারার উৎস বোধহয় অবিসংবাদীরূপেই পাশ্চাত্ত্য দেশে মিলবে। অর্থাৎ যে বিষয় নিয়ে আলোচনা আমরা করি বা করতে চাই, যা আমাদের সমস্যা, সবেরই উৎপত্তি ঐ পাশ্চাত্ত্য জগতেই। সেখানে ইতিহাসের যে পরিচ্ছেদের সুরু তার বিকাশ দেখছি আমাদের দেশে। এ পর্য্যন্ত আমার ব্যক্তিগত ভাবে আপত্তি নেই, ঐ বিষয়ের বা ঐ সমস্যাগুলির আলোচনা করতে ওদেশে ব্যবহৃত কথা বা ভাষা ব্যবহার পদ্ধতির অনুসরণ বা অনুবাদেও ততটা আপত্তি নেই। কিন্তু তাই বলে আমার দৃষ্টিভঙ্গীতে ও দেশের লেখকদের অনুসারী হওয়া আমার কাছে স্বতঃসিদ্ধ নয়। আধুনিক রাজনীতি বা অর্থনীতি পাশ্চাত্য দেশে প্রথম আলোচিত হয়েছে। তা হোক। কিন্তু সে দেশের বিশেষ সমস্যাগুলিকে নিয়ে সে দেশের লেখকেরা বা চিন্তাশীল মানুষেরা যে ভাবে পর্যবেক্ষণ বা বিশ্লেষণ বা অনুশীলন করেছেন তার আক্ষরিক অনুবাদ বা অনুকরণ আমি চাইনা। সমস্যাগুলি তো আমাদের—একান্তভাবেই আমাদের—আমরা আমাদের মতন পথে তার আলোচনা করব, ভাষাও সেইভাবে গড়ে উঠবে, প্রতিশব্দের বদলে নূতন ব্যবহার চালু হবে। তা না হলে একটি মারাত্মক বিপদের সম্ভাবনা আছে—ভাষার অনুবাদ করতে গিয়ে বিদেশীদের চিন্তাপদ্ধতিরও অনুসরণ করতে থাকব। অর্থাৎ বিশেষভাবে আমাদের যে সমস্যাগুলি তাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে অন্ধই থেকে যাব। চিন্তাশীল নেতৃস্থানীয়দের দৃষ্টিভঙ্গীও অবাস্তব ও ধার করা বস্তু হবে।

বিদেশী সাহিত্য মানে আমাদের কাছে প্রধানত ইংরাজী সাহিত্য। ইংরাজি ভাষায় Science ও Technology দুটি কথা বহুল প্রচলিত। দুটিকে যথাক্রমে বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যা বলে হয়ত নির্দ্দেশ করা যায়। কিন্তু Tecnocrat-এর সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করব কি উপায়ে? Technocrat বা Technocracy কথাগুলি ইংরাজি সাহিত্যের পাঠকদের কাছে মোটেই অপরিচিত নয়। Autocracy, Bureaucracy ইত্যাদির শব্দের সোপান পেরিয়ে Techn$_o$cracy-তে যখন পৌছোই তখন তার অর্থ আমাদের কাছে বেশ স্পষ্ট। Autocracy মানে স্বৈরতন্ত্র, Bureaucracy মানে আমলাতন্ত্র—এ পর্য্যন্ত আমরা বোধহয় বেশ বুঝি, কিন্তু Technocracy বলতে আমাদের ভাষায় কোনও প্রতিশব্দ কি কিছু আছে? বলাবাহুল্য এ দেশের জল হাওয়ায় এখনও Technology-র বা প্রয়োগবিদ্যার যাঁরা নেতৃস্থানীয় তাঁদের তেমন কোনও সার্ব্বভৌম আধিপত্য বোধহয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যখন হবে তখন হয়ত সার্থক কোনও প্রতিশব্দ বা সমার্থবোধক শব্দও চালু হয়ে যাবে।

—এখনও হয়নি কারণ Technology বা আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ বা উৎপাদন পদ্ধতি এখনও এদেশে শৈশবের অবস্থা অতিক্রম করতে পারেনি।

অর্থাৎ কৃষি প্রধান এই প্রাচীন সভ্যতা সম্পন্ন দেশটিতে এখনও জড় বিজ্ঞান বা আধুনিক যন্ত্রপ্রধান উৎপাদন শিল্প তুলনামূলকভাবে নূতন ও অপ্রধান। বস্তুতপক্ষে অর্থনীতিক ক্ষেত্রে এখনও বাণিজ্যরত গোষ্ঠীগুলি যন্ত্রশিল্পরত গোষ্ঠীগুলির তুলনায় বেশী প্রসার লাভ করেছে ও বেশী সামাজিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে রয়েছে। ফলে পাশ্চাত্য দেশগুলি বা জাপান প্রমুখ অগ্রসর দেশগুলির তুলনায় Technocracy এখনও আমাদের দেশে অপ্রধান। কিন্তু যদি এইখানেই আমাদের বক্তব্য ফুরিয়ে যায় তাহলে আমরা পূর্বোল্লিখিত ভুলটিই করব—আমাদের দেশেও Technocracy-র অনুরূপ একটি সমস্যা রয়েছে এবং ক্রমশই বাড়তির দিকে। অর্থাৎ যন্ত্রশিল্প কুশলীদের রাজত্ব এখনও তেমন জোরদার না হলেও আধুনিক বিজ্ঞান আশ্রিত ও তদনুসারী প্রয়োগ পদ্ধতির প্রচারক আর একটি শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটেছে আমাদের দেশে এবং তার দরুণ আমাদের বিশেষভাবে সচেতন ও চিন্তান্বিত হবার সময় এসেছে। এঁরা জড়বিজ্ঞানের প্রচারক ততটা নন যতটা অন্যান্য সমাজ-বিজ্ঞানের প্রচারক। জড়বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদির ক্ষেত্রেও পাশ্চাত্য জগতে আমূল পরিবর্তন এসেছে। জড়বিজ্ঞানের প্রভাবেই বোধহয়, এইসব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তথাকথিত যাথার্থ্যের দাবীতে পরিসংখ্যানের সাহায্যে খুব ঘোরতর নৈর্ব্যক্তিক ভাবে ও Abstract level-এ তত্ত্ব প্রচারের যুগ এসেছে।

ভারতবর্ষ যেমন ভাবে চোখ বুঁজে বিদেশীয় যন্ত্রপ্রধান শিল্প, বড় বড় বাঁধ ও multipurpose project ইত্যাদিকে আমদানী করেছে এবং এই নূতন ধর্মের পুরোহিতদের উচ্চস্থান দিয়েছে, অনুরূপ ভাবেই চেষ্টা চলেছে সমাজ বিজ্ঞানের এই আধুনিক ধারাকে বিদেশ থেকে ধার করে এদেশে স্থান দেওয়ার জন্য। যন্ত্র-প্রধান বা capital intensive শিল্প এ দেশের শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত করতে বেশী উপযোগী হবে না, শ্রমপ্রধান বা labour-intensive পদ্ধতিই অনুসরণ করা দরকার, এ বিষয়ে বহু আলোচনা হয়েছে—সে বিতর্কের মধ্যে এখন যেতে চাইছি না। কিন্তু পাশ্চাত্য অর্থে Technocracy এ দেশে আমদানী না হলেও অর্থনীতি, পরিসংখ্যান বিজ্ঞান ইত্যাদির যে পাশ্চাত্য অনুযায়ী ধারা আজকে এ দেশে তার থেকে উৎপন্ন সমস্যাগুলির সঙ্গে ঐ Technocracy-জনিত সমস্যাগুলিরই তুলনা করা চলে। বলা বাহুল্য যে বৃহত্তর সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী যাঁরা তাঁদের কাছে technocracy যেমন অবাঞ্ছিত, technocracy-র এই দ্বিতীয় রূপটিও তাঁদের কাছে তেমনই অবাঞ্ছিত। আমার নিজের কাছে তো নিশ্চয়ই। আমাদের সমাজে এই ব্যাপারটি নিয়ে সচেতনতা নেই কারণ সাহিত্যে এখনও এর আলোচনা হয়নি এবং সাহিত্যে এ নিয়ে আলোচনা হচ্ছেনা তার হয়ত একটা কারণ যে বিদেশী তথা ইংরাজী সাহিত্যে এই সমস্যার বিশদ আলোচনা আমাদের চোখে পড়েনি এবং এই ব্যাপারটির কোনও সাধারণ প্রচলিত নামকরণ হয়নি বিদেশী সাহিত্যে!

কথাগুলি অতিরঞ্জিত বা বিদ্রূপাত্মক মনে হতে পারে। কিন্তু কথাগুলি বোধহয় অসত্য নয়। Technocracy-র অনুরূপ যে একটি ব্যাপার ঘটছে তার কিছুটা প্রমাণ সহজেই পাওয়া

যেতে পারে আমাদের সমসাময়িক সাহিত্যে। সাহিত্য বলতে অবশ্য শুধু সর্বজনীন গল্প-কবিতার কথা বলছি না, প্রবন্ধ, সংবাদপত্র ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে অপেক্ষাকৃত উচ্চশিক্ষিত ও sophisticated পাঠক সমাজের কাছে যে সব তত্ত্ব পৌঁছোয় তার প্রকৃতি যদি একটু বিশ্লেষণ করে দেখি তাহলে সহজেই বোঝা যাবে দেশের ও সমাজের সাধারণ ও মৌলিক উন্নতির কথা নিয়ে আলোচনার রীতিই আজকে খুব abstract, নৈর্ব্যক্তিক ও পরিসংখ্যানগত। মানুষ নিয়ে চিন্তা এই সাহিত্যে হয় না— আদর্শবাদের আলোচনা পর্য্যন্ত আজকে রক্ত মাংসে গড়া ব্যক্তি-আশ্রয়ী নয়। হয় সংখ্যা নিয়ে, পরিমাণ নিয়ে। Model বা সমাজের আঙ্কিক চিত্র একদা মুষ্টিমেয় চিন্তাশীলের গবেষণার উপকরণ স্বরূপ ছিল। তারপরে তার প্রসার হল অর্থনীতির জগতে খানিকটা পদার্থ বিজ্ঞানের অনুসরণে। ক্রমশঃ তার সঙ্কীর্ণ উপযোগীতার ক্ষেত্র ছাড়িয়ে, model-এর প্রচার হল সহজে সরলভাবে আর্থনীতিক ও রাজনীতিক কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে। আজকে দেখা যাচ্ছে শুধু অর্থনীতির ছাত্ররাই বিজ্ঞজন সুলভ প্রবন্ধ লিখবার জন্যে নয়, সাধারণ সচেতন মানুষরাও কথা বলেন ও চিন্তা করেন model-এর সাহায্যে। কিন্তু মানুষ নামক জীবটি তো জড় পদার্থ নয়, তার মন আছে, ইচ্ছা-অনিচ্ছা আছে, এমন কি যুক্তি নিরপেক্ষ irrational প্রবণতাও অনেক আছে। তার সমষ্টিগত প্রকৃতিকে বুঝবার প্রথম প্রয়াসে model ব্যবহার উচিৎ বা সুবিধাজনক হতে পারে—কিন্তু তার কর্মপদ্ধতিকে কি model-এর আঁটো সাঁটো গঠন দিয়ে পরিচালিত করা যায়?

মানুষের প্রকৃতিকে বেশী সহজ করতে গেলে বা সস্তার সামান্যিকরণের মধ্যে ফেলতে গেলে যা ভুল হওয়া স্বাভাবিক তাই হচ্ছে। অর্থাৎ সাহিত্য দ্বারা চিন্তাপদ্ধতি প্রভাবান্বিত হচ্ছে এবং চিন্তাপদ্ধতি অবাস্তব আকাশ কুসুম চয়নের মতন model তৈরী করেই সব সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজছে।—এই ভয়াবহ গোলক ধাঁধার চেহারা আরও স্পষ্ট হয়, যদি জানা যায় যে এই model-আশ্রিত চিন্তাধারার যা সমালোচনা হচ্ছে তাও পাল্টা model দিয়েই! অর্থাৎ সাহিতের ক্ষেত্রেও এক দারুণ বিভেদের সৃষ্টি হয়েছে: গল্প বা কবিতা বা ব্যক্তিগত প্রবন্ধাবলিতে স্নেহ-প্রেম-দয়া-মায়া'র মতন প্রচলিত মূল্য বোধগুলি আছে, তার ভাষা বা রচনা পদ্ধতিতে যতই experiment চলুক না কেন মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করার একটা তাগিদ আছে, চোখ ধাঁধাঁনো সমষ্টির মধ্যে থেকে ব্যক্তির খুঁজে বার করবার একটা প্রয়াস আছে—তা সে ক্ষেত্র বিশেষে সফল বা অসফলই হোক। কিন্তু এই তথাকথিত technical সাহিত্যে ব্যক্তির বা ব্যক্তিগত মূল্যমানের স্থান নেই। এর চিন্তাপদ্ধতি তো ব্যক্তি নিরপেক্ষ বটেই, ভাষাও এমন যে মানুষের ব্যবহারিক জগত থেকে বহু দূরে কোনও এক abstract স্তরে পাঠকেরা চলে যান যেখানে সব সামাজিক সমস্যার চোলাই করা বিশুদ্ধ আরক নিয়ে কাজ চলে, যেখানে কোনও সমাধানের পথ খোঁজা মানে বাস্তবিক কোনও সমাধানের পথ পাওয়া নয়। আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি technical jargon শুনতে ও ব্যবহার করতে, আসল ব্যবহারিক অর্থ তলিয়ে না বুঝেও তার থেকে তৃপ্তি পেতে ও মানুষের জীবনের একান্ত সমস্যাগুলির এই বিষময় প্রকৃতপক্ষে অর্থহীন ব্যবচ্ছেদে আশ্বস্ত বোধ করতে। এই ধারার বাহকদের সামাজিক প্রকৃতি সম্বন্ধে একটু ধারণা করে নিয়ে আলোচনা শেষে করতে চাই, কারণ আমাদের এখানে মূল দৃষ্টিভঙ্গী সাহিত্যিকের, সমাজতাত্ত্বিকের নয়।

এই ধারার যাঁরা বাহক তাঁরা ঐ বিদেশীয় technocrat-দের সমগোত্রীয়। বিভিন্ন কারিগরি বিদ্যা, স্থাপত্য, যন্ত্র পরিচালনা ইত্যাদিতে যাঁরা কুশলী তাঁরা অবশ্যই আজকে সমাজের শীর্ষ সন্নিকটে বাস করছেন, বিদেশে শেখা প্রয়োগবিদ্যার নির্বিচার ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে দেশের অমঙ্গলও করছেন। কিন্তু অর্থনীতি বা অনুরূপ অ-জড়-বিজ্ঞানগুলির যাঁরা নায়ক তাঁদের কৃত অমঙ্গল আরও বেশী ব্যপ্ত। কারণ সাধারণ মানুষের সাধারণ চিন্তাকে স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ ভাবে সামাজিক সমস্যাগুলির মুখোমুখী হওয়ার পরিবর্তে এই ভুয়ো specialisation-এর হুজুগ তুলে পরিসংখ্যানগত নির্ভরশীলতার সোপান অতিক্রম করে এমন এক অলীক আশার পথে নিয়ে চলেছেন যেখানে সাধারণ ব্যবহারিক বুদ্ধি স্থগিত থাকে, স্বাভাবিক পরিণাম চিন্তা স্থান পায় না। কিন্তু জনসাধারণ না হয় এ মিথ্যা ভেদ করতে অক্ষম, সাধারণ শিক্ষিত মানুষেরাও না হয় technical jargon-এর গোলকধাঁধায় পথ ভ্রান্ত হলেন, কিন্তু যে বিশিষ্ট চিন্তবিদেরা স্বয়ং ভারতবর্ষে এই বিশেষ ধারাটির প্রবর্তক তাঁরা কেন এই সর্বনাশা পথে নামলেন এবং তাঁরা কি এর পরিণাম সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ? তাঁদের মতন ক্ষুরধার বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষদের বেলায় অতটা দৃষ্টিহীনতা আমরা আশা করতে পারি না। ধরে নিতেই হবে যে তাঁদের এই কাজ সজ্ঞানে কৃত, অজ্ঞানে নয়। বস্তুতপক্ষে সমাজের সম্পদ স্বার্থপর শ্রেণীগত পথে নিয়োজিত করার প্রয়াসে, অর্থাৎ পরিচালন ক্ষমতা ও জাগতিক যুগ সুবিধার জন্যই তাঁদের এই প্রয়াস। রাষ্ট্রনীতিক নেতাদের হয় তাঁরা ভুল বুঝিয়ে যাচ্ছেন অথবা তাঁদের সঙ্গে নীতিহীন ভাবে হাত মেলাচ্ছেন। দেশের সমস্যাগুলির প্রকৃত সমাধান তাঁদের কাম্য নয়। তাঁরা চাইছেন technical ভাষা, specialisation, abstraction ইত্যাদির ধূম্রজালে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে এবং তাঁরা সে উদ্দেশ্যে সফলতাও লাভ করেছেন সন্দেহ নেই।

সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা এটা নয়। সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আমি বলব যে সাধারণ কথায় আমরা ফিরে আসি, পরিভাষা বা প্রতিশব্দের সঙ্গে সঙ্গে ধার করা চিন্তাও যেন আমরা ত্যাগ করি, আমাদের সাহিত্য কর্মে যেন এই বিশ্বাস প্রকাশ পায় যে জীবনই সাহিত্যের ভিত্তি, ব্যবহারিক সমস্যার সমাধান technical jargon বা model তৈরী এমন কি নিছক চিন্তার জগতেই হবে না। চিন্তা হোক সহজ, সাহিত্য তার প্রতিবিম্ব স্বরূপ সরল হোক।

মিহির সেন

ভিসা অফিসের সামনে ॥ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উচ্চারণ। ২।১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা-১২। দু'টাকা।

উত্তর তিরিশের বাংলার কবিদের মধ্যে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্ভবত অন্যতম কবি যাঁর মানসে চিরায়ত কাব্য ভাবনার পাশাপাশি সমকালের প্রতিবেদনও সমুপস্থিত। সময়ের বেদনা, যদিও কবি জানেন তা সময়েরই শুশ্রূষা সাপেক্ষ, তথাপি সে বেদনায় কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে আমরা আন্তরিকভাবে বিচলিত হতে, দেখি। সময়কে, মানুষকে, আবহাওয়ার দোলাচলে পর্যুদস্ত তার মনুষ্যত্বকে সমাজের শরিক হিসেবে কবি উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছেন। রাজনীতির আবর্তে জীবনের অবমাননায় তাঁর কণ্ঠস্বরে প্রতিবাদ; অসহায় ভাইয়ের দুর্যোগে তাঁর উচ্চারিত প্রেম অকপট। কবিধর্মের সততায় তাঁর অধিকাংশ সময়-চিহ্নিত কবিতা হৃদয়ের উত্তাপে উজ্জ্বল। কবির সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ 'ভিসা অফিসের সামনে' পাঠ করে আমার উপর্যুক্ত কথাগুলিই বারংবার মনে হয়েছে। বিশেষত কবি যখন বলেন:

> 'ভীষণ অপ্রেম যেন মধ্যখানে থেকে থেকে থেকে
> তোর আমার দুই বুকের সামান্য হাওয়ার ফাঁকটুকু
> বিষ ক'রে, হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে ইতরের মত
> আমাদের কাছ থেকে জীবন ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।' (সহোদর)

'ভিসা অফিসের সামনে'র প্রায় সমস্ত কবিতা-মানুষ এবং মনুষ্যত্বের নামে কবির একান্ত অনুভব থেকে রচিত—যে মনুষ্যত্ব আমাদের হৃদয়ে যা কিছু বিপরীত অনুভবকে অগ্রাহ্য করে এখনো আমাদের প্রেমের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত করে পরন্তু ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা, ভ্রাতৃ-বিরোধ, ভয়াবহ যুদ্ধের মোকাবিলায় আমাদের জাগ্রত প্রহরী করে তোলে। জাতি, ধর্ম, দেশ নির্বিশেষে মানুষ আজো যে আর একজনের সহোদর, কবি সে বিশ্বাস এখনো করেন। কবির বেদনায় তবু কণ্ঠস্বর কেঁপে ওঠে: 'কী জন্য তুমি ও আমি মানুষের মুখে আর তাকাতে পারছি না?
> সীমান্ত গান্ধীর নাম, রবীন্দ্রনাথের নাম উচ্চারণ করতে পারছি না?
> কার পাপে?...অথচ নির্জন ঘরে মানুষের নামগুলি ভোলাও যাবে না॥ (মানুষের নামে)

কিংবা, 'ক্রমেই বন্ধ হ'য়ে আসছে মহাদেবের দুয়ার; আজ মানুষের
> নিঃশ্বাসেও অন্নজানের অভাব; তার সন্তানেরা
> অবহেলায় নিহত সহোদরের শবদেহ
> বইতে বইতে এখন ক্লান্ত, ঘুমুতে চায়। (মহাদেবের দুয়ার)

'ভিসা অফিসের সামনে' মূল কবিতায়, এবং পরন্ত গ্রন্থের দু'টি পৃথক পর্ব (ভিসা অফিসের সামনে বিশল্যকরণী বৃক্ষের জন্য) জুড়ে দেশ বিভাগ জনিত মনুষ্যসৃষ্ট বেদনা অন্ধকার কবির স্পর্শ কাতর ভাষ্যে আত্মার শরিক, রক্তের শরিক হয়ে প্রকাশিত। তবুও কবির বিশ্বাস, 'দুই দেশের মানুষের হৃদপিণ্ডের মধ্যখানটাও একই ভাবে দুই ভাগে ভিন্ন হ'য়ে যায় নি। অবশ্যই মাঝে মধ্যে আমাদের হৃদ্‌পিণ্ডের প্রতিও হত্যাকারীর ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, আমাদের রক্তেমাখা সুচেতনা তখন পথের ধুলায় হাহাকার করতে থাকে। কিন্তু ঠিক এভাবে আমাদের ভালোবাসাকে, মনুষ্যত্বকে হত্যা করা পৃথিবীর এই দেশের এবং ঐ দেশের কয়েকজন দাঙ্গাবাজ, যুদ্ধোন্মাদ অমানুষের পক্ষে কোনো দিনই সম্ভব হবে না। সমস্ত হত্যাকাণ্ড, মাৎলামো, অসম্মানকে অতিক্রম করে আমরা দুই বাংলার এবং বৃহত্তর অর্থে সমস্ত পৃথিবীর নিরপরাধ মানুষ আজো বেঁচে আছি, চিরদিন বেঁচে থাকবো, মানুষের মতোই বেঁচে থাকবো।

এক অকৃত্রিম প্রেমের প্রেরণায় 'ভিসা অফিসের সামনে'র কবিতাবলী উদ্‌ভাসিত। দুই বাংলার মানুষের জন্য, মনুষ্যত্বের প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ এই অনুভবের অনুষঙ্গে পাঠক কবির বেদনার অংশভাগ নিতে পারবেন বলেই আমার মনে হয়। 'রূপসী বাংলা,' 'এই অন্ধকার', 'একটি 'বেহুলা', 'একটি আত্মার শপথ', 'ভুবনেশ্বরী যখন', 'একটি অসমাপ্ত কবিতা', 'দুই গান্ধী', 'মানুষের নামে', 'বিশল্যকরণী বৃক্ষেয় জন্য' 'এশিয়া' ইত্যাদি কবিতাবলী স্মরণীয়। পরিশেষে, এমন একটি সম্ভাবনাময় কাব্যগ্রন্থে যত্রতত্র ছাপাখানার অমনোযোগিতা পাঠকের কাব্যের আত্মার সান্নিধ্য লাভের একাগ্রতাকে ছিন্ন করে।

ইন্দ্রনীল সেন

আমি অমল আঁধারে। মনুজেশ মিত্র। সাহিত্য। কলিকাতা। দুটাকা পঞ্চাশ পয়সা।

কবিতা বিচারে আমি সম্ভবতঃ ততখানি উগ্র নেই, যে সাহিত্য আলোচনার চলিত সবকটি প্রথা বা নর্মস্ আমি কাঁচের পিরিচের মতো অবহেলায় ছুড়ে ফেলে দেব। সোজা কথায় কোনো আওয়াজী উত্তেজনা আমাকে কবিতা-পাঠের ঐতিহ্য-বিচ্যুত বা বিচলিত করে না। দীর্ঘকালের কবিতা পাঠ বা রচনার মাধ্যমে আমি সেই স্থিত সৌন্দর্যকেই খুঁজতে চেয়েছি যা নিসর্গ ও মানুষের অন্তর ও বাহিরের গূঢ় সত্যগুলিকেই বিপন্ন বোধ বা সমবেদনা দিয়ে স্ফুরিত করে তোলে। আলোচ্য গ্রন্থের কবি বাংলা কবিতায় এখনো সুপরিচিত নন। কিন্তু তাঁর কবিতায় সেই সত্য ও সততা অনুসন্ধানের আবেগ আছে বলেই নানা ত্রুটি সত্বেও কাব্যগ্রন্থটি আমাকে কিছু পরিমাণে আকর্ষণ করেছে।

শ্রীমনুজেশ মিত্র কাব্যভাবনার দিক থেকে কোন নির্দিষ্ট বিষয় বা প্রকরণে স্থির বিশ্বাসী না হলেও মূলতঃ মগ্ন চৈতন্যলোকের অধিবাসী। কবি-চরিত্রে তিনি মোটামুটি অনুত্তেজ, ছন্দ-প্রকরণে

মুখ্যত স্বরবৃত্ত ও ধ্বনি প্রধান ছন্দে অনুরাগী। তাঁর কবিতায় একশ্রেণীর নিরুত্তর্প শীতলতা আছে, যা একালের তরুণতম কবিরা প্রায়শঃই পরিহার করছেন। স্পষ্টতঃই তিনি ভাবনার ক্ষেত্রে যতখানি বহিরাশ্রয়ী, তদপেক্ষা ঢের বেশী অন্তর্মুখী। বিতর্কিত শব্দ ব্যবহারে তাঁর ঝোঁক নেই, যে কোন গভীর বক্তব্যকেও সহজ ও সরল করে বলার প্রবণতা 'আমি অমল আঁধারে'-র সর্বত্র। এ কালের ব্যথা বা যন্ত্রণাবোধের পীনদ্ধ চীৎকার তিনি সতর্কভাবে পরিহার করেছেন। ফলে তাঁর বেদনাবোধের ভিতর যতখানি না তীব্রতা আছে, তার চেয়ে অধিক সন্ধ্যার বিলীন আলোর বিষাদী মাধুর্য পরিস্ফুট। এই কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতা, ক্ষমা করো, সব কিছু গভীর ইন্দ্রিয়ে, নির্বেদ, কুয়াশার বিশাল শরীর ও সায়াহ্ন—কবিতাগুলি পাঠ করলে পাঠকের কাছে আমার বক্তব্য স্পষ্ট অবয়ব নিয়ে দাঁড়াবে, মনে হয়। মনুজেশ মিত্র যেন সরাসরি প্রশ্ন রেখেছেন, যে কবি সময়ের অন্তর্দান গ্রহণে সমর্থ তাঁকে তাৎক্ষণিক ঘটনার স্বেচ্ছাচার কতখানি সাম্য-বিচ্যুত করতে পারে? ফলে তিনি যখন লেখেন—'আমাকে বিমুক্ত করো। সমর্পণে নির্বাণের স্বাদ/জ্বলুক তোমার মুখ সূর্য হয়ে শিল্পের বাহিরে' অথবা 'ঝরবে ফুল ঝরবে আর সঘন চুল/আকাশ লুট করবে কোন তস্করই/ একটু তাই গন্ধ ছুঁই সুনির্ভুল/এখন রাত, এখন রাত মঞ্জরী'—তখন মনে হয় মগ্ন অনুভবের শান্ত জলাশয়ে তিনি তাঁর এজন্মের চাওয়া-পাওয়ার ইচ্ছাকে নিহিত রাখতে চান।

কিন্তু মনুজেশ মিত্র কবিতা-রচনার ক্ষেত্রে তরুণ শিক্ষার্থী বলেই তাঁর প্রতি আমার কয়েকটি সসংকোচ-প্রশ্ন আছে। অন্যান্য কবিদের মতো তিনিও নিশ্চয়ই পয়ার ছন্দের শোষণ শক্তি সম্পর্কে অবহিত। তবু এই শোষণ শক্তিকে কতোখানি আয়ত্ত করা সংগত, এ নিয়ে তাঁকে আমি আর একটু চিন্তিত হতে অনুরোধ করি। দ্বিতীয়তঃ কোনো কোনো কবিতায় তিনি টানা মাত্রাবৃত্তিক পয়ারের মধ্যে মধ্যে গদ্য রীতিতে লেখা ছন্দের ব্যবহার করেছেন। আমার মনে হয়, এটি কোন সার্থক ছন্দ নিরীক্ষার লক্ষণ নয়; বরং পাঠকের মনযোগ ও ধৈর্য এতে বারবার বিঘ্নিত হয় ও কবিতার তন্নিষ্ঠ স্বরগ্রাম বিচলিত হয়ে ওঠে। তৃতীয়তঃ শব্দ ব্যবহারে তাঁকে আরো নতুনত্ব ও বৈচিত্রে প্রয়াসী হতে হবে এবং শব্দভাণ্ডারকে ধনী করতে হবে। চতুর্থতঃ পর্ব বিভাগ ঠিক রাখার জন্য অনাবশ্যকভাবে তিনি প্রত্যয় ব্যবহারের কথা ভাবেন। এতে কবিতার আঙ্গিকগত দুর্বলতাই প্রকট হয়ে ওঠে। শেষতঃ কবিতার অন্ত মিল হিসেবে ক্রিয়াপদের পৌনঃপুনিক ব্যবহার একালে অচল হয়ে এসেছে, এটাও মনুজেশ মিত্রের স্মরণে থাকা উচিত।

কাব্যগ্রন্থটির পরিবেশন শোভন। শ্রীমলয়শঙ্কর দাশগুপ্তের প্রচ্ছদ-পরিকল্পনাটি একথায় অভিজাত। তরুণ কবিদের অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করে একালে 'সাহিত্য' যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছেন, আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটি সেই প্রবাহেই একটি সম্ভাবনাময় সংযোজন।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

MARINA

Regd No. C-315 Phone : 23-5155 July

পঞ্চদশ বর্ষ ॥ শ্রাবণ ১৩৭৪

সমকালীন

সবেমাত্র বেরিয়েছে
ক্রীমটি সত্যিই ভাল!

চোখের দেখার উপরে
ক্রেতাদের পছন্দ নির্ভর করে
আপনার জিনিস তাড়াতাড়ি বিক্রি করার পরিকল্পনা করছেন? জিনিসটিকে চোখে পড়ার মত করে তুলুন—রোটাস প্যাকেজিং কাগজে মুড়ে জিনিসগুলিকে আরো আকর্ষণীয়, গ্রহণীয় এবং একান্ত বৈশিষ্টময় করে তুলুন। ভাল মোড়ক, কাগজের বাক্স ও কার্টনের জন্য প্রস্তুতকারকগণ সব-সময়েই রোটাস প্যাকেজিং কাগজ ও বোর্ড পছন্দ করেন কেননা এগুলি উৎকৃষ্ট। উজ্জ্বলরং, ব্র্যাণ্ড নাম ও বিক্রির বিষয়বস্তু এদের উপরে ছাপা হলে চোখে পড়বেই।
রোটাস প্যাকেজিং কাগজ বহুদিন টেঁকে, চমৎকার দেখতে এবং আপনার জিনিসকে ধুলো ময়লা ও আর্দ্রতার হাত থেকে রক্ষা করে। এতে আপনার জিনিসের সদ্য তৈরী ঝকঝকে চেহারা বজায় থাকে।
ROHTAS
রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড
ডালমিয়া নগর (বিহার)
ম্যানেজিং এজেন্টস: সাহু জৈন লিমিটেড ১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা-১
IPC-RI. 382.BEN

পঞ্চদশ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

শ্রাবণ তেরশ' চুয়াত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

অবিভক্ত বঙ্গের ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার অন্তর্ভুক্ত নয়নন্দ গ্রামে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী নলিনীকান্তের জন্ম হয়। নলিনীকান্তের পিতার নাম ছিল রোহিনীকান্ত। এই পরিবার বারেন্দ্রশ্রেণীভুক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিদ্যাবত্তার জন্য ইহারা 'ভট্টশালী' উপাধিতে আখ্যাত ছিলেন।

নলিনীকান্তের বয়স যখন মাত্র চারি বৎসর তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। নলিনীকান্তের খুল্লতাত অক্ষয়চন্দ্র এই পিতৃহীন বালকের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার রক্ষণাধীনে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে নলিনীকান্ত বৃত্তি পাইয়া বিক্রমপুরে পানাম হাইস্কুল হইতে প্রথম বিভাগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ঢাকা কলেজের ছাত্ররূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকত্ব লাভ করেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি ইতিহাস বিষয় লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, উপাধি পান। দুর্ভাগ্যের বিষয় নলিনীকান্ত এম, এ, পরীক্ষায় আশানুরূপ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই, তিনি তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন মাত্র। নলিনীকান্তের অভিভাবক পিতৃব্য একজন শিক্ষক ছিলেন। পিতৃব্যের ব্যয়ভার লাঘবের জন্য গৃহশিক্ষকতা ও সাহিত্য বিষয়ক নানা খুচরা কাজ করিয়া নলিনীকান্তকে পাঠ্য জীবন অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। এইজন্যই শেষ পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই।

পাঠ্যজীবন অন্তে নলিনীকান্ত কিছুকাল বালুরঘাট ও ইছাপুর নামক স্থানদ্বয়ের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন ও পরে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ইতিহাসের 'লেকচারার' নিযুক্ত হন।

বাল্যকাল হইতেই নলিনীকান্ত সাহিত্য-সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত হইবার পূর্ব হইতেই তিনি বাঙ্গলা দেশের ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রচুর অধ্যয়ন ও অনুসন্ধানে লিপ্ত হন ও নানা পত্র পত্রিকায় গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি লিখিয়া প্রকাশ করেন। এই সূত্রে তিনি বহু বিদ্বজ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, ইঁহাদের মধ্যে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় অন্যতম। ইতিপূর্বে পূর্ববঙ্গের কিছু প্রত্নসম্পদ সংগৃহীত হইয়া ঢাকার পুরাতন সেক্রেটেরিয়েট ভবনে রক্ষিত হইয়াছিল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে এই প্রত্ন দ্রব্যগুলি লইয়া সরকারী উদ্যোগে ঢাকায় একটি প্রত্নসংগ্রহশালা বা মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়। সার আশুতোষের চেষ্টায় নলিনীকান্ত এই মিউজিয়মের অধ্যক্ষের (curator) পদ লাভ করেন। এই মিউজিয়মের সংগ্রহ অতি অল্প ছিল, ইহার কোন নিয়মিত আয়ও ছিল না। নলিনীকান্তের মাসিক বেতন ধার্য হয় মাত্র দুই শত টাকা। ইতিহাস-প্রেমিক নলিনীকান্ত ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৭ অর্থাৎ জীবনান্ত কাল পর্যন্ত বিপুল উদ্যম, অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা সহকারে এই সংগ্রহশালার সংরক্ষণ ও পরিপুষ্টির জন্য আত্ম নিয়োগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি মিউজিয়মের অধ্যক্ষরূপে মাত্র ২৬০ টাকা বেতন পাইতেন। মধ্যজীবনে ভারতের অন্যতম প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকরূপে তাঁহার খ্যাতি পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, অতি সহজেই তিনি উচ্চতর বেতনে অন্যত্র চাকুরী গ্রহণ করিতে পারিতেন। এই প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া নলিনীকান্ত আজীবন সেবা দ্বারা ঢাকা মিউজিয়মকে অবিভক্ত ভারতের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগ্রহশালায় পরিণত করেন। বাঙ্গলা দেশ ও জাতির কীর্তি চিহ্নগুলি উদ্ধার ও সংরক্ষণ মানসেই তিনি ঢাকা মিউজিয়মের অধ্যক্ষতা ত্যাগ করিতে চান নাই। ঢাকা মিউজিয়মের কার্য সূত্রে তিনি বাংলার বিশেষত পূর্ব বাঙ্গলার বহু স্থান পর্যটন করিয়া বহু পাণ্ডুলিপি, তাম্রশাসন, শিলালেখ, মুদ্রা, প্রস্তর ও ধাতু মূর্তি প্রভৃতি আবিষ্কার ও সংগ্রহ দ্বারা ঢাকা মিউজিয়মকে সমৃদ্ধিশালী করেন। প্রত্নবস্তু উদ্ধার কল্পে নানা স্থানে উৎখননের কার্যেও তিনি আত্মনিয়োগ করেন। নলিনীকান্তের সেবার ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বেই ঢাকা মিউজিয়ম পূর্বভারতের একটি বিশিষ্ট গবেষণা কেন্দ্রে পরিণত হয়; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরেও ইহা এই মর্যাদা চ্যুত হয় নাই।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে নলিনীকান্ত বাঙ্গলার স্বাধীন সুলতানগণের মুদ্রা ও কাল নির্ণয় বিষয়ে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গ্রীফিথ পুরস্কার' লাভ করেন। ইতিপূর্বে বাঙ্গালার প্রাক্-মুঘল মুসলমান শাসনকালীন সময়ের ধারাবাহিক নির্ভরযোগ্য ইতিহাস রচনায় কোন ঐতিহাসিকই অগ্রসর হন নাই। নলিনীকান্তের এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটি এই যুগের বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অজ্ঞাত অধ্যায় উন্মোচিত করে। এই মহামূল্য গবেষণাটি পুস্তকাকারে কেমব্রিজ হইতে প্রকাশিত হইয়া সর্বত্র সমাদৃত হয় (১)। এতদ্ব্যতীত নলিনীকান্ত ঢাকা মিউজিয়মে রক্ষিত প্রাচীন মুদ্রার বিস্তৃত বিবরণের দুইখণ্ড সঙ্কলনও প্রকাশ করেন (২-৩)। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় গুপ্ত যুগের মুদ্রা সম্বন্ধে তাঁহার একটি তথ্যবহুল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় (৪)। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে মুদ্রাতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ নলিনীকান্ত ভারতের মুদ্রাতত্ত্ব সমিতির সভ্য নির্বাচিত হন (Numismatic Society of India)। তিনি এই সমিতির মুখপত্র (Journal)টির অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। বিভিন্ন ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাময়িক পত্রেও নলিনীকান্ত মুদ্রা সম্পর্কে

অনেকগুলি রচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

মুদ্রাতত্ত্বের ন্যায় মূর্তিতত্ত্বেও নলিনীকান্ত প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ভারতের মূর্তিতত্ত্ব লইয়া পূর্বে যাঁহারা আলোচনা করিতেন তাঁহারা বহুদিন পর্যন্ত আবিষ্কৃত মূর্তিগুলির প্রসঙ্গ সমসাময়িক রাজনৈতিক ইতিহাসের পারম্পর্য রক্ষার্থে ব্যবহার করিতেন। মূর্তিতত্ত্বের আলোচনায় নন্দনতত্ত্ব ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উন্মোচন প্রায়ই উপেক্ষিত হইত। ফরাসী ভারতবিদ ফুঁশেই (A. Foucher) ভারতীয় মূর্তিতত্ত্বের ক্ষেত্রে নন্দনতত্ত্ব ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপস্থাপনায় গুরুত্ব অর্পণ করেন। ফুঁশে বৌদ্ধযুগের মূর্তি বিশেষতঃ গান্ধার শিল্প আলোচনাতেই মনোনিবেশ করেন। ভারতীয় পণ্ডিত গোপীনাথ রাও হিন্দুমূর্তিকলা সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া যশস্বী হন, কিন্তু তাঁহার আলোচনা প্রধানতঃ দক্ষিণভারতীয় মূর্তিগুলির মধ্যেই সীমিত। বাঙ্গলার মূর্তি নির্মাণকলা এক বিশেষ ধারায় পরিপুষ্ট হয়। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রভৃতি পণ্ডিতেরা পাল ও সেন রাজগণের সমকালীন মূর্তিতত্ত্বের প্রাথমিক আলোচনায় পদক্ষেপ করিলেও ইঁহারা এই বিষয়ে গভীর ও ব্যাপক আলোচনার অবকাশ পান নাই। পূর্বাচার্যদের প্রাথমিক আলোচনার সূত্র অবলম্বন করিয়া নলিনীকান্ত বাঙ্গালার মূর্তিশিল্পের ব্যাপক ও গভীর আলোচনায় আত্মনিবেশ করেন ও এ বিষয়ে অতি উল্লেখনীয় সাফল্য লাভ করেন। এই সময়ের মধ্যে নলিনীকান্ত বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থান হইতে বহু দেব দেবীর মূর্তি আবিষ্কার করেন, অন্যান্য ব্যক্তিদের দ্বারাও বহু মূর্তি সংগৃহীত হইয়াছিল। বাঙ্গলা বিশেষত পূর্ববাঙ্গলায় প্রাপ্ত বিশেষ বিশেষ মূর্তি সম্বন্ধে নলিনীকান্তের গবেষণাগুলি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে নলিনীকান্ত রচিত ঢাকা মিউজিয়মে রক্ষিত বৌদ্ধ ও পৌরাণিক হিন্দু দেব দেবী মূর্তিগুলির পরিচয়াত্মক একটি পুস্তক প্রকাশিত হয় (৫)। এই পুস্তকে নলিনীকান্ত ঢাকা মিউজিয়ম বহির্ভূত অন্যান্য দেব-দেবী মূর্তি সম্বন্ধেও বিশদ ও বিস্তৃত আলোচনা করেন। ভট্টশালীর এই পুস্তকটি ভারতীয় মূর্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি প্রামাণ্য পুস্তকরূপে দেশে ও বিদেশে প্রচুর সমাদৃত হয়। এই পুস্তকটি হইতে খৃষ্টিয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙ্গলা দেশের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক রূপ-রেখার পরিচয় পরিস্ফুট হয়। ভট্টশালী তাঁহার গ্রন্থে প্রাচীন বাঙ্গলার বিষ্ণু, সূর্য. নটরাজ, শিব উমা প্রভৃতি পৌরাণিক দেব দেবীর সহিত চন্দ্রদ্বীপের ভগবতী তারা, সমতটের জয়তুঙ্গ লোকনাথ, হরিকেলের শীল লোকনাথ প্রভৃতির পরিচয় দান প্রসঙ্গে ইহাই প্রমাণ করেন যে বাঙ্গলা দেশে এক সময় তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রচুর প্রভাব ছিল।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধহীন-যান সম্প্রদায়ের বহু প্রাচীন পুঁথি বাঙ্গলা দেশ হইতে উদ্ধার করিয়া বাঙ্গলাদেশে তান্ত্রিক বৌদ্ধমতবাদ যে বহুল ভাবে অনুসৃত ছিল এই তথ্য প্রচার করেন। নলিনীকান্ত 'পাথুরে প্রমাণ' উপস্থাপিত করিয়া হরপ্রসাদের ধারণার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করেন। নলিনীকান্ত বৌদ্ধতন্ত্রগ্রন্থাদিতে বর্ণিত বৌদ্ধদেবদেবী মূর্তিগুলি ভূগর্ভ অথবা শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য হইতে বহু কষ্টে উদ্ধার করিয়া সংরক্ষণ করেন ও লোকসমাজে ইহাদের পরিচয় প্রদান করেন। নলিনীকান্তের অনলস সাধনায় বাঙ্গলা বিশেষত পূর্ববাঙ্গলার সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস অন্ততঃ সার্দ্ধসহস্র বৎসরের প্রাচীন ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়।

শিলালিপি, তাম্রশাসন প্রভৃতি পাঠোদ্ধারে নলিনীকান্ত অসাধারণ নৈপুণ্য অর্জন করেন। তিনি স্বয়ং বহু তাম্রশাসনাদি উদ্ধার করিয়া তাহার 'পাঠ' স্থির করেন। অপরের আবিষ্কৃত লেখমালারও তিনি পাঠোদ্ধার করেন। ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত Epigraphica Indica ও অন্যান্য সাময়িক পত্রে এ সম্বন্ধে তাঁহার অনেকগুলি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। পাদটিকায় ইহাদের কয়েকটির উল্লেখ করা হইল (৬)।

শিলালিপি অথবা তাম্রশাসনে উল্লিখিত অধুনা বিস্মৃত ও উপেক্ষিত এককালীন সমৃদ্ধ পূর্ববাঙ্গলার জনপদগুলির অবস্থিতি নলিনীকান্ত দুরধিগম্য অঞ্চলে পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া নির্দ্ধারণ করেন।

ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া, ঢাকা জেলার সাভার, রামপাল, বজ্রযোগিনী, কুমিল্লার লালমাই প্রভৃতি স্থানগুলির অতীত গৌরব উদ্ঘাটনের কৃতিত্ব প্রধানত নলিনীকান্তের প্রাপ্য। লেখমালা ও মূর্তি প্রভৃতি প্রত্নদ্রব্যের সহায়তায় নলিনীকান্ত ৫ম শতাব্দী হইতে পালরাজগণের অভ্যুদয়ের পূর্ববর্তী কালীন ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র, সমাচারদেব প্রভৃতি পরাক্রান্ত স্বাধীন বঙ্গরাজগণের সন্ধান সুধী সমাজের গোচরীভূত করেন। তিনি ত্রিপুরার খড়্গ রাজবংশ এবং বর্ম ও চন্দ্র রাজবংশের কাল নির্ণয় করিয়া তাঁহাদের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করেন। রাজা দনুজমর্দন দেব ও মহেন্দ্রদেব সম্বন্ধেও তিনি বহু নতুন তথ্য পরিবেশন করেন (৭-১১)। মোগল শাসনের বিরুদ্ধে বাঙ্গলার বারভূঞাদের বিদ্রোহ ও শৌর্যবীর্য সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটি রচনা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়, এইগুলি হইতে বহু অজ্ঞাত তথ্য জানা যায় (১২)।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয় নলিনীকান্তকে তাঁহার প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধের ভিত্তিতে পি, এইচ, ডি উপাধি দান করেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া নলিনীকান্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির জন্য প্রাপ্ত নিবন্ধের পরীক্ষকের কার্য করেন। ঢাকা মিউজিয়মের কার্যের অবসর সময়ে নলিনীকান্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলা সাহিত্য, ইতিহাস ও লিপিতত্ত্ব বিষয়ে অধ্যাপনা করিতেন। তৃতীয় শ্রেণীর এম, এ নলিনীকান্ত নিজের প্রতিভা, কর্মদক্ষতা ও অধ্যবসায় দ্বারা এইভাবে কলিকাতা ও ঢাকা—দেশের এই দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হইতে সর্বোচ্চ সম্মান স্বীয় অদম্য অধ্যবসায় ও প্রতিভাবলে অর্জন করেন। পরীক্ষায় ভাল ফল না দেখাইতে পারিয়া যাঁহারা জীবনে হতাশ ও নিস্ফলের দল বৃদ্ধি করেন, নলিনীকান্ত সেই ডিগ্রী সর্বস্বের দলে ছিলেন না। পরীক্ষায় ফল ভাল না করিতে পারিলে যে জীবন ব্যর্থ হইয়া যায় না, প্রকৃত পাণ্ডিত্য যে ডিগ্রী নির্ভর নহে, নলিনীকান্তের জীবন হইতে এই শিক্ষা পাওয়া যায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে নলিনীকান্ত তালপত্র ও কাগজে লিখিত বহু প্রাচীন সংস্কৃত ও বাঙ্গলা পুঁথি সংগ্রহ করিয়া দেন। প্রাচীন বঙ্গাক্ষর সম্বন্ধে তিনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন, এই জ্ঞানের সাহায্যে প্রাপ্ত পুঁথির দুর্বোধ্য অংশগুলির পাঠোদ্ধারে তিনি সুদক্ষ ছিলেন। নলিনীকান্ত কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ড টিকা সহ সম্পাদনা করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশ করেন (১৩)। কৃত্তিবাসী রামায়ণের বাকী অংশ তিনি সম্পাদন করিলেও ইহা তিনি প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই, এই পাণ্ডুলিপি ঢাকা মিউজিয়মে রক্ষিত আছে, আশা করা

যাইতে পারে যে কোন যোগ্য ব্যক্তির সাহায্যে ইহা কোন কালে প্রকাশিত হইবে। 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' নামে একটি প্রাচীন পুঁথিও তিনি সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন (১৪)। কৃত্তিবাস ও নাথ সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার অনেকগুলি নিবন্ধ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। চণ্ডীদাসের পদাবলী বিষয়েও তিনি বিশেষ বিশেষজ্ঞরূপে গণিত হইতেন। মৌলিক গল্প, কবিতা ও নাটক রচনাতেও নলিনীকান্ত সিদ্ধ হস্ত ছিলেন (১৫)। তাঁহার রচিত দুইটি ছোট গল্প জার্মান ভাষায় অনূদিত হইয়া একটি বাঙ্গলা গল্প সংগ্রহে স্থান পায়।

Dr. Reinhardt Wagner's Bengalische Erzaehlungen in urschrift und umschirft (Bengali Stories in Original script and transliteration.)

নলিনীকান্তের রসবোধ এত পরিণত ছিল যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'বড়দিদি' পাঠ করিয়া ১৯১৮ বঙ্গাব্দে 'ভারত-মহিলা' নামক সাময়িক পত্রে ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি লেখককে বঙ্গসাহিত্য গগনে প্রথম শ্রেণীর জ্যোতিষ্করূপে অভিনন্দিত করেন। ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে এই সময়ে শরৎচন্দ্র বাঙ্গলার পাঠক সমাজে প্রায় অপরিচিতই ছিলেন।

ঢাকা সাহিত্য পরিষদ ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত নলিনীকান্তের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় তাঁহার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে নলিনীকান্ত ইতিহাস শাখার সভাপতি পদে বৃত হন। এই সূত্রে প্রদত্ত তাঁহার অভিভাষণের কিয়দংশ প্রবাসীতে প্রকাশিত হয় (বাঙ্গলা দেশে ইতিহাস চর্চা, প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪৪)।

Dacca Review, Journal of the Asiatic Society (Bengal & London), Statesman, Modern Review, Hindustan Standard, Rupam, Indian Antiquary, Epigraphica Indica, Bengal Past & Present, Indian Historical Quaterly, Islamic Culture, Journal of the Indian Society of Oriental Art, প্রবাসী, ভারতমহিলা, ঢাকা রিভিউ ও সম্মেলন, নারায়ণ, মানসী ও মর্ম্মবাণী, ভারতবর্ষ, বিচিত্রা, পঞ্চপুষ্প, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, শনিবারের চিঠি, উদয়ন, উদ্বোধন, মাসিক বসুমতী, সোনার বাঙলা, আনন্দবাজার পত্রিকা প্রভৃতি ইংরাজী ও বাঙ্গলা সাময়িক পত্রে নলিনীকান্ত রচিত প্রায় দুইশতটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহার মধ্যে প্রায় ৫০টি ইংরাজী নিবন্ধ গবেষণামূলক। নলিনীকান্ত অনেকগুলি ছাত্র পাঠ্য পুস্তকও রচনা করেন।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী আকস্মিকভাবে ঢাকা মিউজিয়ম ভবনেই নলিনীকান্তের মৃত্যু হয়। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া ঢাকা মিউজিয়মের সেবা ও বিদ্যাচর্চায় রত ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন পুত্র ও ছয়টি কন্যা রাখিয়া মারা যান।

অত্যন্ত সুখের বিষয় যে নলিনীকান্তের মৃত্যুর প্রায় কুড়ি বৎসর পর ঢাকা মিউজিয়মের পক্ষ হইতে নলিনীকান্তের স্মৃত্যর্থে পাক-ভারত উপমহাদেশের সুধীবৃন্দ লিখিত ভারত-বিদ্যা সংক্রান্ত প্রবন্ধ সমন্বিত একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

Nalinikanta Bhattasali Commemoration Volume—Essays on Archaeology,

art, history, literature and philosophy of the Orient dedicated in memory of Dr. Nalinikanta Bhattasali—Ed. by A. B. M. Habibullah, Professor of Islamic History & Culture, Dacca University, Dacca Musuem, 1966.

এই পুস্তকের মধ্যে নলিনীকান্তের ফটো, সম্পাদক সঙ্কলিত সংক্ষিপ্ত জীবনী ও যথাসম্ভব সম্পূর্ণ রচনা তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। পূর্ব বাঙ্গলাবাসী মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের বাংলা ভাষা ও বাঙ্গলা দেশ প্রীতি ঐতিহ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। যুক্তবাঙ্গলার ইতিহাস সাধক ও স্বদেশ বৎসল নলিনীকান্তের স্মৃতির প্রতি তাঁহাদের এই শ্রদ্ধার্ঘ উভয় বাঙ্গলার সাংস্কৃতিক ও মানসিক ঐক্য দৃঢ়ীভূত করিতে সাহায্য করিবে সন্দেহ নাই। পূর্ববাঙ্গলার বাঙ্গলাভাষী ভ্রাতৃবৃন্দের অনলস সেবায় ঢাকা বিশ্ববিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মিউজিয়ম প্রভৃতি বঙ্গস স্মৃতি চর্চার কেন্দ্রগুলিতে নলিনীকান্তের সাধনার ধারা অব্যাহত থাকিলে তাহা আমাদের পক্ষে পরম পরিতৃপ্তির বিষয় হইবে।

১। Coins and Chronology of the Early Sultans of Bengal, Cambridge, 1922.

২। Catalogue of Coins of Syed A. S. M. Taifoor Collection in the Dacca Musuem, Dacca 1936.

৩। Catalogue of Coins of Hakim Habiburr Rahaman Khan collection in Dacca Musuem, Dacca, 1936.

৪। Attribution of the Imitation Gupta Coins—J. A. S. B. 1925.

৫। Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Musuem, Dacca, 1929.

৬। (a) Newly discovered Belaba Copper plate, Dacca Review, July, 1912. (b) A note on the Barkamta Natheswara Image inscription J. A. S B, January 1915 (c) Some image inscription in West Bengal, Dacca Review. Sammelan, 1918. (d) The new Kedarpur plate of Srichandra Dev, Dacca Review O Sammelan, 1919. (f) Kedarpur plate of Srichandra Deva, Epigrphica Indica, Vol 17. (g) Some image inscription from East Bengal, E. I, Vol 17. (h) Gugrahati Copper Plate inscription of Samachar Deva, E. I, Vol 28 (i) The New Nalanda Stone inscription of Yasovarman Deva, Modern Review, 1931. (j) Two inscriptions of Gopala III of Bengal. Indian Historical Quarterly, 1941. (k) Badaganga Rock inscription, E. I, Vol 27. (l) Two inscriptions of Gobinda chanda E. I, 27. (m) Two grants of the Varmans of Vanga E. I, vol 30. etc. etc...

৭। রাজা দনুজমর্দন ও মহেন্দ্রদেব, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩২৫।

৮। শ্রীচন্দ্রদেবের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন, প্রতিভা, আশ্বিন, ১৩২৬।

৯। দনুজমর্দন ও রাজা গণেশ, পঞ্চপুষ্প, ১৩৩৮।

১০। হরিবর্মদেবের সামন্তসার তাম্রশাসন, ভারতবর্ষ মাঘ, ১৩৩৪

১১। রাজা গোবিন্দচন্দ্রের দ্বিতীয় শিলালিপি, ভারতবর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৪৮ ইত্যাদি ইত্যাদি।

১২। Bengal chiefs' struggle for independence in the reigns of Akbar and Jahangir, Bengal Past & Present vols 35, 36 & 38 (1928, 29) ; বঙ্গীয় ভৌমিকগণের স্বাধীনতা সমর—বিচিত্রা, আষাঢ় ১৩৩৫, বঙ্গীয় ভৌমিকগণের সহিত মোঘলের সংঘর্ষ, ভারতবর্ষ আষাঢ়, ভাদ্র, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ ১৩৩৬।

১৩। মহাকবি কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ, আদিকাণ্ড, Dacca University, 1939.

১৪। আবদুস সুকুর মোহাম্মদ বিরচিত 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস'—ঢাকা সাহিত্য পরিষদ্, ১৩৩২।

১৫। বীরবিক্রম (নাটক) ঢাকা, ১৯১৫, হাসি ও অশ্রু (গল্প সংগ্রহ) ঢাকা, ১৯১৬; মুর্খ শতক (কবিতা), ঢাকা ১৯৪৩।

বাংলা ছোট গল্পে প্লটের অনুসরণ

সুচেতা ভট্টাচার্য

এই দশকের গল্পের বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে সমকালীন সমালোচকরা প্রায়ই আবৃত্তি করে থাকেন : সাম্প্রতিক গল্পে প্লটের অনুসরণ নেই।

যাঁরা সাম্প্রতিক কালের গল্পের সঙ্গে কিছুমাত্র পরিচিত তাঁরা এটা নিশ্চয় লক্ষ্য করবেন, এই সব গল্পে 'প্লট' বস্তুটি নেই। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, এটা কি সমকালীন গল্পের একটা বৈশিষ্ট্য নাকি অন্যতম সাধারণ লক্ষণ মাত্র?

আমার ধারণা এর কোনওটিই যথার্থ উত্তর নয়। গল্পে প্লটের অনুসরণ একটা স্বাভাবিক ফলশ্রুতি অথবা ভবিষ্যৎ পরিণতি মাত্র। বাংলা ছোট গল্পে যে একদিন প্লট বস্তুটি অন্তর্হিত হবেই এ-কথার নীরব ঘোষণা হয়েছিলো তার জন্মলগ্নেই। ছোটগল্পের যদি কোনও সংজ্ঞা গ্রহণ করা যায়, তবে আমরা এই পরিণতি সেই সংজ্ঞার মধ্যেই দেখতে পাবো।

ছোটগল্প অপেক্ষাকৃত আধুনিক মনের ফসল এটা বোধ হয় সর্ববাদীসম্মত মত। ইতিহাসের অনুসরণ এবং সত্যের আশ্রয় নিলে দেখা যাবে আমাদের দেশে যখন ছোটগল্প এসেছে রবীন্দ্রনাথের হাতে, যে ছোটগল্প ইতিপূর্বে আমেরিকা, ফ্রান্স, এবং রাশিয়ায় এসেছিলো, ইংলণ্ডের সাহিত্যে ও জিনিষ তখনও আসেনি। অবশ্য গল্প ছিল। গল্প আমাদের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আগে ছিল, পরেও ছিল। গল্প আদিকাল থেকেই বিশ্ব সাহিত্যে ছিল এবং আছে। কিন্তু যে গল্পের সূচনা বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের হাতে, তা অভিনব এবং অ-পূর্ব। এই গল্পের যে মূলসূত্র এবং আসল কথা তার মধ্যে প্লটের অনুসরণ থাকতে পারে না।

ছোটগল্পের অজস্র সংজ্ঞা তৈরী হলেও এইটেই আসল কথা—গল্পের শেষ থেকেই গল্পের শুরু এবং এর ওয়ান ক্লাইম্যাকস্। এই এক কেন্দ্রিকতা সমস্ত গল্পের মধ্যে স্থির থাকে। গল্প তার থেকে চ্যুত হয় না। বলা চলে একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন উপস্থিত করে ছোট গল্প। এর ওপর আরো একটি কথা, ছোটগল্প লেখকের ব্যক্তিত্ব প্রকাশক। ছোটগল্প এজন্য একান্তভাবে সাবজেক্টিভ।

অবশ্য সাহিত্যের এই সব সংজ্ঞা এক হিসেবে অর্থহীন। কিন্তু সমালোচকের এইজাতীয় কিছু সুবিধে না থাকলে চলে না। গল্পকে ছোট গল্প থেকে দূরে রাখতে হলেই একটা ডেফিনেশন তৈরী করে নিতে হবে। কিন্তু সাহিত্যরসিক যিনি, তিনি সর্বসংস্কারমুক্ত একটি মন নিয়ে সাহিত্যকে সংজ্ঞা থেকে দূরে রেখে তার রস গ্রহণ করবেন। তিনি জানেন, সাহিত্যের ডেফিনেশন সৃষ্টিশীল সাহিত্যিকের হাতে প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়। আজকের সত্য আগামী কালে আর সত্য থাকে না। তবুও সমালোচকের পক্ষে একটি দুর্গ তৈরী করে আমরা বক্তব্যের পথে অগ্রসর হলাম।

ছোটগল্পকে আমরা যখন সাবজেক্টিভ বলেছি, তখনই বুঝতে হবে প্লটের সঙ্গে তার বিরোধ

কোথায়? যে-সাহিত্য ব্যক্তিপ্রকাশক, যেখানে আত্মচিন্তা এবং আত্মানুসন্ধান বড় কথা সেখানে প্লট আসতেই পারে না। একজন ইংরেজ সমালোচক প্লট প্রসঙ্গে বলেছেন: প্লট জিনিষটা একবার তৈরী হলেই পুরোনো হয়ে যায়। তার কাজ একবারেরই। দ্বিতীয়বার তাকে কাজে লাগানো চলে না। অথচ থীম এক হয়ে বহু হতে পারে। একই থীম নিয়ে বহু গল্প রচিত হতে পারে এবং কোনওবারই তা পুরোনো হয়ে যায় না।

প্লট এবং থীমের এই পার্থক্য যদি সত্য হয় তবে সৃষ্টিশীল লেখক প্লটকে আহ্বান করতে পারেন না। যে-কথা একবার বললেই শেষ হয়ে যায় তাকে নিয়ে স্রষ্টার কাজ-কারবার অচল হয়ে পড়ে।

আমরা দেখেছি রবীন্দ্রনাথ প্লটের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি, করতে পারেন না, যেহেতু তাঁর ছোট গল্প হচ্ছে—'শেষ হয়ে হইল না শেষ।'

বাংলা গল্পে প্লটের অনুসরণ রবীন্দ্রনাথ থেকেই চলে গেছে বলা চলে। যে-মন কাব্যধর্মী, সে-মন স্বভাবতই আত্মসন্ধানী বা ব্যক্তিসন্ধানী। বিশেষতঃ উনিশ শতকের মন—যে-মন মানবতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ, সে-মন এক অর্থে ব্যক্তিসন্ধানীও বটে। রবীন্দ্রনাথের মন শুধু কাব্যধর্মী নয়, গীতিকাব্যধর্মী, এবং এ কথা তো বহু ব্যবহৃত যে গীতিকবিতা কবি-আত্মা-প্রকাশক ভাববস্তু। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পে সেই প্লট একেবারেই নেই। প্লটের সঙ্গে তাঁর যে বিরোধ তা বোধ করি দ্বিতীয় বার উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। 'পোষ্টমাষ্টার' 'গিন্নি,' 'ক্ষুধিত পাষাণ' ইত্যাদি বহু পঠিত গল্পগুলিতে যে কোনও প্লটের অনুসরণ নেই, সামান্য বিষয়ে অবহিত সাধারণ পাঠক-মাত্রই তা বুঝবেন॥ 'গিন্নি' গল্পে শিশুমনস্তত্বই মূল কথা এবং 'ক্ষুধিত পাষাণ' একটি রোমান্টিক জগতের রেখা টেনে দিয়ে যায়। 'পোষ্টমাষ্টারে' মানুষের চিরন্তন প্রবৃত্তি এবং কিছুটা দার্শনিকতা। এখানে প্লট কোথায়?

আমরা প্লটকে আর একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যায় যদি নিয়ে আসি, তাহলে বলবো: প্লট একটি কাহিনী। একটি নিটোল, কল্পিত ঘটনাময় কাহিনী যার পেছনে লেখকের চিন্তাশক্তি এবং কিছুটা গাণিতিক বুদ্ধি অস্বীকার করা চলে না। আমরা মনে করি প্লট হচ্ছে বানিয়ে তোলা কাহিনী বা ঘটনা, যার সঙ্গে জীবনের প্রতিপদে অসঙ্গতি। আমাদের জীবনে গল্পের প্লটের মতো ঘটনা কখনো ঘটে না। তাই প্লট জীবন থেকে বহু দূরে সরে যায়।

ডিটেকটিভ বা রহস্য গল্পে এই প্লট রক্ষা অবশ্য পালনীয় শর্ত। সেখানে বুদ্ধির নানা অলি-গলি, ঘোরানো-প্যাঁচানো জটিল পথে কাহিনী অগ্রসর হয়, সেইসঙ্গে কিছু রুদ্ধশ্বাস পাঠক-মনও।

দুঃখের বিষয়, এই শ্রেণীর সাহিত্যকে আমরা প্রথম শ্রেণীর সুস্থ সজীব সাহিত্য বলে অভিনন্দিত করতে পারি না এবং সত্যিকার রসিক-পাঠকের জন্য এ সাহিত্য নয়। সত্যিকার সাহিত্যিকের জন্যও এ সাহিত্য নয়—বলা বাহুল্য।

অবশ্য ঐতিহাসিক উপন্যাস বা গল্পে প্লট থাকে। কেন না ইতিহাসের গতিময় ঘটনাই সেখানে প্রধান। তবে এই প্লট ও পূর্বোক্ত ডিটেক্‌টিভ গল্পের প্লট থেকে স্বতন্ত্র।

প্লটের এই বানিয়ে তোলা অবিশ্বাস্যতার জন্যই সত্যিকার রিয়ালিষ্টিক গল্পে বা উপন্যাসে এই

প্লট অনুসৃত হতে পারে না। যদি অনুসৃত হয় তবে সে সাহিত্য শেষ পর্যন্ত রিয়ালিটির দাবি রক্ষা করে না।

রবীন্দ্রনাথের কোনও কোনও গল্পে পাঠক যে কাহিনী দেখতে পায়, সে কাহিনী বলা বাহুল্য, 'বানিয়ে তোলা' প্লট থেকে বহু দূরে। তাঁর উপন্যাসেও আমরা প্লটের অনুসরণ দেখিনি। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', 'চতুরঙ্গ', 'যোগাযোগে'র মতো উপন্যাসে প্লট একেবারেই নেই। 'নৌকা ডুবি'তে কিছুটা আছে বলে, নৌকাডুবি স্বাভাবিক ও সুস্থ কাহিনী নয়, এবং ত্রুটি রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থ সাহিত্য ফসলের প্রমাণ রাখে।

শরৎচন্দ্র বলেছিলেন : তিনি গল্প কখনো ভাবেন না। লিখতে লিখতেই তাঁর গল্প তৈরী হয়ে যায়।

এই কথা থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, শরৎচন্দ্রও প্লটের অনুসরণ চান নি। অথচ তাঁর গল্পে বা উপন্যাসে মোটামুটি যে একটি কাহিনী এসে দাঁড়ালো তা একটা স্বাভাবিক যুগপ্রভাব ছাড়া আর কিছুই নয়। জনপ্রিয় লেখক কিছুটা সাধারণের দিকে তাকিয়ে থাকতে বাধ্য হন।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস 'পথের পাঁচালি' বা 'অপরাজিত'—বিশেষ করে 'পথের পাঁচালি'তে প্লট একথা বলা অসঙ্গত নয়। তাঁর ছোট গল্প, যেগুলি আমাদের বিচারে সার্থক যেমন 'পুঁই মাচা', 'দ্রবময়ীর কাশীবাস' ইত্যাদিতে প্লট একান্তভাবেই উপেক্ষিত। যদি কাহিনী এসে থাকে তবে তা প্লট নয় এবং লেখকের সচেতন মানস সঞ্জাত নয় তা কখনোই।

রবীন্দ্রনাথের পর প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের গল্পে অবশ্য আমরা প্লটের অনুসরণ বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করেছি। কিন্তু মনে রাখা দরকার তাঁর গল্প গল্পই, ছোট গল্প কখনোই নয়। সেখানে বহু ইনসিডেণ্ট এসে অনেক ক্ষেত্রেই গল্পের ওয়ান ক্লাইম্যাক্স্ নষ্ট করে দিয়েছে, যদিও বহু ইনসিডেণ্ট থেকেও ওয়ান ক্লাইম্যাক্স্ হতে পারে। প্রভাত মুখোপাধ্যায় সহজ আনন্দে এবং সহজ আনন্দ বিতরণের উদ্দেশ্যে আমাদের নেহাতই গল্প শুনিয়েছেন। সে-গল্পে পুরোপুরি প্লট আছে। বানিয়ে তোলা অসম্ভব কাহিনী, অথচ আমরা হাসি, আনন্দ পাই, ক্ষণিকের জন্য পৃথিবীর বাস্তব জটিলতা ভুলে যাই। এর চমৎকার উদাহরণ তাঁর 'বলবান জামাতার' গল্প। গল্পটি যে অবিশ্বাস্য এবং অসম্ভব বুদ্ধিমান পাঠককে তা মনে করিয়ে দিতে হয় না।

আজকের বাংলা ছোট গল্প যে কবিতার কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে একথা কেউ কেউ মনে করেন। আমি বলবো আজকের বাংলা ছোট গল্পই কবিতার কাছে আসেনি, ছোট গল্প তার জন্মকালেই কবিতার নৈকট্য স্বীকার করেছে। কবি-স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ একে কবিতার পাশে স্থান দিয়েছিলেন বহুদিন আগেই। শুধু কবিতা নয়, একে গানের সমগোত্র করে তুলে ছিলেন। 'লিপিকা'তে একাধারে গল্প কবিতা এবং গল্প গান হয়ে উঠেছে। সর্বত্র সুরের সঞ্চরণ। অথচ তা গল্প—ছোট গল্পেরই ছায়া। 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটি পাঠক একটু স্মরণ করতে পারেন। সমগ্র গল্পতে একটা সঙ্গীতময়তা—একটা মিউজিক্যাল হারমনি! কোনও বোদ্ধা সমালোচকের কথায়—এ যেন সেই মালকোশ রাগ, যার সুন্দর এবং সুনিয়মিত অনুসরণে স্বর্গের প্রেতাত্মা নেমে আসতে পারে।

কবিতা যেদিন থেকে লিরিক পর্যায়ে এলো, সেদিন থেকেই তার কাজ আত্মোপলব্ধি ও আত্মানুসন্ধান। অর্থাৎ কবিআত্মার বিভিন্ন অভিব্যক্তির প্রকাশ করে কবিতা। এক হিসেবে আজকের সব কবিতাই লিরিক। ছোট গল্পও এই ব্যক্তিসত্তার সন্ধান করে চলে। একটি একক ব্যক্তিত্বকে অন্বেষণ করতে চায়। সুতরাং ছোট গল্পকে স্বাভাবিক ভাবেই কবিতার কাছাকাছি আসতে হবে। এটা নতুন কথা নয়।

যুগে যুগে শিল্পীর হাতে গল্পের রূপ রীতি বদলায়। আজকের গল্প কাহিনী বা জীবন সম্পর্কিত কতগুলি ধারণা নিয়ে স্থির থাকতে চায় না। কেন না সে পারে না। সাহিত্য বস্তুটা থেমে থাকার জন্য নয়। গতি তার সত্য এবং গতি তার কাম্য। ছোট গল্প তাই জীবনের কোনও ক্ষুদ্র খণ্ডাংশ নিয়ে নয় আর, আজ সে একটি মুহূর্তকে রূপ দিতে চেষ্টা করছে। একটি বিশেষ মুহূর্ত, তার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্যেই ধরে রাখতে চায় সেই ব্যক্তিসত্তাকে। আজকের জটিল জীবনে মানুষ জটিলতর। তার একটি মুহূর্তই অনেকখানি এবং যথেষ্ট মূল্যবান। সেই একটি মুহূর্তই এখন গল্পের অবলম্বন। কবিতার মতো গল্পও এখন ওই 'মুহূর্তের' মধ্যেই আত্মানুসন্ধান করে চলেছে।

সুতরাং জীবনের কোন ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের মধ্যে এতদিনের বাংলা ছোট গল্পের যে নামমাত্র কাহিনীটুকু অবশিষ্ট ছিল, একটা আলতো তুলির প্রলেপের মতো, বর্তমানের এই 'মুহূর্তে'র মধ্যে সেই টানটুকুও মুছে গেলো।

আজ উচ্চকণ্ঠে অনেকেই বলতে পারেন বাংলা গল্পে প্লটের অনুসরণ-না-করা এই দশকের বৈশিষ্ট্য (প্রায় সব দশকেই একথা বলা হয়, কিছুকাল যাবত)। কিন্তু ধারণাটি কতখানি ভ্রান্ত আমরা তারই অনুসন্ধান করে দেখলাম।

রমেশচন্দ্র ও ভারতের অর্থনীতি

মুরারি ঘোষ

ভারতের বহির্বাণিজ্য : দুর্ভিক্ষ

কোম্পানীর বাণিজ্যের আদিযুগে ভারতে রপ্তানী হোত, টয়লেটস্, পশমী দ্রব্য, সীসা, তামা, লোহা, টিন আর হার্ডওয়ার গুডস্। ভারত থেকে যেত ক্যালিকো, শাল, বাফতা, মসলিন, সিল্ক, বাফতা, কার্পাস বস্ত্র। ইংলণ্ডের বাজারে ভারতীয় বস্ত্রের জনপ্রিয়তা ছিল অপরিসীম। কিন্তু এ ব্যবস্থা বেশিদিন চলতে পারে না। রমেশ দত্ত বলছেন :

British Weavers had begun to be jealous of the Bengal Weavers whose silk fabrics were imported into England and a deliberate endeavor was now made to use the political power obtained by the Company to discourage the manufactures of Bengal in order to promote the manufactures of England (Dutt the Economic History of India unddr early British rule—Publication Division P. ৩২)।

ভারতীয় বস্ত্র আমদানীর বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ হল। বিদেশের শিল্প পণ্য যত সস্তাই হোক তার আমদানী জাতীয় শিল্প প্রসারের পক্ষে ক্ষতিকর। বাজারে সস্তা পণ্যের আমদানী হলে জাতীয় শিল্প অসম প্রতিযোগিতার সামনে পড়বে। জাতীয় উৎপাদনের প্রসার ব্যহত হবে। পরন্তু, বিদেশ থেকে যার আমদানী কাম্য তা হল শিল্পের জন্য সস্তায় কাঁচা মাল,—কারখানাজাত পণ্যদ্রব্য নয়। এই হল মোটামুটি উন্নয়নশীল দেশের বাণিজ্যিক চেহারা।

এই কারণেই আঠারো শতকের গোড়ায় ইংলণ্ডের বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রে নানাভাবে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে শুরু হয়েছিল। ম্যাঞ্চেষ্টারে, ল্যাংকাশায়ারে। বিশেষ করে রেশমী বস্ত্র উৎপাদনের কেন্দ্রগুলিতে। এই বিক্ষোভ ভারতীয় বস্ত্র আমদানীর বিরুদ্ধে।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য তখন তুংগী। কোম্পানীর সরকারী বাণিজ্য ছাড়াও কর্মচারীরা সুবিধেমত ভারতীয় পণ্য নিয়ে বাণিজ্য করতো। তাদের আমদানী করা মালে বিলেতের বাজার ছেয়ে যেত। ভারতীয় বস্ত্রের সংগে সহজ প্রতিযোগিতায় বিলেতের পণ্য স্বদেশের বাজারে পাত্তা পেত না। ভারতীয় পণ্যের শিল্প সৌকর্য কিংবা মুল্যমান বিলিতি ক্রেতার কাছে খুবই লোভনীয়। স্বাভাবিক প্রতিযোগিতায় এক এক সময়ে বিলিতি পণ্যের দুরবস্থা চরমে উঠতো। পণ্যের বিক্রী হত না, কারখানা বন্ধ হয়ে যেত—শ্রমিক মালিক দুপক্ষেরই ক্ষোভ জমা হত ভারতীয় বস্ত্রের উপর—পণ্যের ওপর। এর জন্যে বৃটিশ পার্লামেন্টকে বিভিন্ন সময়ে স্বদেশের বাজারে ভারতীয় বস্ত্রের আমদানীর বিরুদ্ধেও আইন তৈরী করতে হয়েছে।

বোধহয় প্রথম আইন বিধিবদ্ধ হয় ১৭০১ সালে (১)। এই আইনে শাস্তি দানের বিভীষিকা থাকা সত্বেও ভারতীয়পণ্যের চোরাআমদানী বন্ধ হয়নি। কোম্পানী সরকারীভাবে ভারত থেকে যত বস্ত্র, সিল্কজাত পণ্য নিয়ে যেত তা বিক্রী করার দায় ছিল য়ুরোপের অন্য দেশের হাটে। ইংলণ্ডে নয়।

অ্যাডম স্মিথ ও ভারত বাণিজ্য ঃ

যথা সময়ে অ্যাডম স্মিথ এলেন বিক্ষুব্ধ শিল্প মালিকদের প্রতিভূ হয়ে। স্মিথ আধুনিক য়ুরোপীয় অর্থনীতির জনক। অবাধ বাণিজ্যের (Free trade) স্বপক্ষে তাঁর কলম সোচ্চার। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের বিরুদ্ধে আর সমস্ত ইংরেজ বণিকেরই সহজ বাণিজ্য আবিষ্কারের জন্য তাঁর লেখনী মুখর হয়ে উঠেছিল (২)।

বাণিজ্যবাদ তত্ত্বের বিরুদ্ধে তাঁর মূল আক্রমণ। বাণিজ্যবাদের অর্থনৈতিক দায়িত্ব ফুরিয়েছে। বাণিজ্য পুঁজির অগ্রগতি শেষ হয়ে শিল্প পুঁজির আবির্ভাব হয়েছে। শুধু আবির্ভাব নয়, শিল্প পুঁজি ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই বাণিজ্যপুঁজির বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে।

শিল্পের ভবিষ্যৎ এক নতুন বাণিজ্যিক তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠলো। সেই তত্ত্ব যোগালেন অ্যাডম স্মিথ। স্মিথ পরিষ্কার বললেন চাষ আবাদের মধ্যেই কলোনীগুলোর আর্থিক মুক্তি। কৃষির বাইরে শিল্পোৎপাদনে কলোনীয়াল দেশগুলোর যোগ্যতা কম বরংচ য়ুরোপীয় শিল্পের মস্ত বাজার হবে এই নতুন কলোনীয়াল দেশগুলো। তস্য বিনিময়ে এই সব দেশই য়ুরোপের শিল্পে যোগাবে কাঁচা মাল আর খাদ্য।

স্মিথের ফর্মুলায়, বিশ্বের আর্থিক ব্যবস্থা বিভক্ত থাকবে। শ্রম বিভাজনের তত্ত্ব খাড়া করে স্মিথ বোঝাতে চাইলেন সুলভ শ্রমের দামে ভারত প্রমুখ কলোনীগুলোয় শিল্পের কাঁচামাল, যথা কার্পাশ, রেশম আর খাদ্য পণ্যের উৎপাদন হোক। য়ুরোপে হবে শিল্পের প্রসার। এতে যেমন য়ুরোপের সম্পদ বৃদ্ধি হবে, হবে ভারতেরও।

বৃটিশ পণ্যের বাজারের খোঁজে স্মিথ যথেষ্ট দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। স্মিথ এমনো পর্যন্ত বলেছিলেন য়ুরোপ আমেরিকা জুড়ে বৃটিশ পণ্যের যা কাটতি হবে—সমগ্র ভারতবর্ষের বাজার একাই তার সমকক্ষ।

এই তত্ত্বের সামাজিক প্রতিধ্বনি পাওয়া গেল বৃটিশ পার্লামেণ্টে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে নতুন চার্টার দেওয়ার সময়ে। ১৮১৩ সালে হাউস অব লর্ডসে বসলো সিলেক্ট কমিটি। কমিটির কাজ হল বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের মতামত নিয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য সম্পর্কে নতুন করে নিয়ম কানুন তৈরী করা। বিভিন্ন প্রশ্ন রাখা হয়েছিল বিশেষজ্ঞদের সামনে। মূল প্রশ্ন ছিল, নতুন ও বর্ধিত শিল্পোৎপাদনের তাগিদে বৃটিশ আমদানী রপ্তানীর উপর কী হারে শুল্ক চাপালে বৃটিশ শিল্পের অগ্রগতি ব্যাহত হবে না এবং বৃটিশ শিল্প পণ্যের অনুকূল রপ্তানীর সুযোগ আসবে।

সিলেক্ট কমিটির সামনে অনেকেই মতামত উপস্থিত করেছিলেন। ইংলণ্ডে ভারতীয় কাপড়ের আমদানীর প্রশ্নে প্রায় সকলেই চড়া হারে শুল্ক দাবী করেছিল। তবে ভারতীয় পণ্যের শিল্প সৌকর্য সম্পর্কে কেউ কেউ প্রশংসার কমতি করেন নি। কেউ কেউ আবার ভারতে বৃটিশ পণ্যের বাজার সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছিল। কেননা ভারতে প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থায় কিংবা কারিগরী নৈপুণ্যে শিল্প পণ্যের চাহিদা দেশের উৎপাদন থেকেই মিটে যায়—এর জন্যে বিদেশ থেকে পণ্য আমদানীর সুযোগ কম ওদেশে।

কিন্তু এসব বললে অ্যাডাম স্মিথের তত্ত্বই মিথ্যে হয়ে যাবে। আসলে জেনে রাখতে হবে,

শিল্প উৎপাদনের যোগ্যতা ভারত-প্রমুখ দেশের নেই—যদিও বা ভারতে উৎপাদিত পণ্যের চালান আসে ইংলণ্ডের ভূমিতে, সেই চালান রাখতে হবে। ভারতে বৃটিশ পণ্য চালান দিয়ে ভারতের শিল্প ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করতে হবে। নতুন যুগের অর্থনীতির চাহিদা অনুযায়ী সাজাতে হবে আর্থিক ব্যবস্থা।

ইংলণ্ডের শিল্পজগৎ, বাণিজ্যনীতি আর তত্ত্বগত আর্থিক চিন্তার এই পটভূমিকায় রমেশ দত্তের চিন্তা প্রসারিত হয়েছে।

ভারত বাণিজ্যের ঘরের খবর :

১৮১২, ১৮২৪ সালে ইংলণ্ডের উপকূলে ভারতের শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানী বেআইনী ঘোষিত হয়েছিল। * মসলিন, ক্যালিকো, আর কার্পাস বস্ত্রের উপর শুল্ক ধার্য করা হল শতকরা ২৭। আর সংগে সংগেই এদেশে আমদানী শুরু হল বৃটিশজাত বস্ত্রের। ক্রমে ক্রমে এই আমদানী রপ্তানী কী চেহারা নিয়েছিল সংখ্যাতত্ত্বের উদ্ধৃতি দিয়ে রমেশচন্দ্র এর নগ্ন চেহারা তুলে ধরেছেন।

১৮১৩ সালে কলকাতা বন্দর থেকে লণ্ডনে রপ্তানী হয়েছিল ২০ লক্ষ স্টার্লিং মূল্যের কাপড় —আর সতেরো বছর এর উল্টোটাই দেখি। ১৮৩০ সালে কলকাতা বন্দরে এসে নামলো ২০ লক্ষ স্টার্লিংএর কাপড়—লণ্ডন থেকে। এ দেশে আমদানী হওয়ার জন্যে বৃটিশ পণ্যকে শুল্ক দিতে হত মূল্যের শতকরা আড়াই টাকা তখন ভারতীয়পণ্যের বিলেতে আমদানীর শুল্ক শতকরা সাতাশ। ইংরেজ বণিকের অবাধ বাণিজ্যের (Free trade) স্বরূপ চিনে নিতে আমার ভুল হবার নয়।

১৮০২ সালে কোলকাতা থেকে কার্পাস বস্ত্রের মোট রপ্তানী ছিল ১৪৮১৭ বেল—সেই রপ্তানী কমতে কমতে ১৮২৯ সালে দাঁড়ালো ৪৩৩ বেল।

ইংলণ্ড কেন? বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমাদের শিল্প পণ্যের রপ্তানীর সংখ্যাতত্ত্ব নিম্নমুখী হয়ে গেল। ১৮০১ সালে মার্কিন দেশে রপ্তানী হয়েছিল ১৩,৬৩৩ বেল কাপড়, সে জায়গায় ১৮২৯ সালে ২৫৮ বেল। ১৮০০ সালে ডেনমার্কে রপ্তানী হয় ১৪৫৭ বেল, ১৮২০ সালে ১৫০ বেল।

খুব সুখের চিত্র নয় এই সব এবং এই অবনতির গতি ভীষণভাবে পিচ্ছিল। আমাদের শিল্পজগতের উপর প্রত্যক্ষ আঘাত। শুল্কের ভারে অসম প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরী করে আমাদের বাড়তি শিল্প পণ্যের বাজার নষ্ট করে দেওয়া হল। এই সংকটের মধ্যে দিয়েই শুরু হল বৃটিশ জাত বস্ত্রের আমদানী। ১৮১৩ থেকে শুরু হয়েছিল এই আমদানী।

নীচে দেওয়া হল রমেশচন্দ্র উদ্ধৃত সংখ্যাতত্ত্ব—

বৎসর	ভারতে আমদানীকৃত বস্ত্রখণ্ড	মূল্য / স্টার্লিংয়ে
১৮১৩	৩৩৮১	
১৮২৩	৭,৩১৬	৬৪,৪৪৯
১৮২৯	১১,৮৫৮	১৯৭,২৯০

পরিমাণ আর মূল্যের দিক থেকে ঊর্ধ্বমুখী আমদানীর এই ছবি আমাদের শিল্পোৎপাদনের অনিবার্য ধ্বংসের ইংগিত দিচ্ছে। শিল্প পণ্যের রপ্তানী কমেছে, আমদানী বেড়েছে। এরই

পাশাপাশি রয়েছে ভারত থেকে শিল্পের কাঁচামাল রপ্তানীর চিত্র।

স্মিথের বাণিজ্যিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা অনুযায়ী শিল্পোৎপাদনের ক্ষমতা যখন আমাদের দেশে তখন এদেশ থেকে বহুল রপ্তানীযোগ্য পণ্য কী কী? নিশ্চয়ই তুলো, সিল্ক, নীল। এ দেশ থেকে যা রপ্তানী হবে বিলেতের পণ্য উৎপাদনের তাগিদে। অগত্যা তুলো, সিল্ক বর্ধিত হারে জাতীয় শিল্পোৎপাদনে নিয়োজিত না হয়ে বিলেতের শিল্পকৃতি সমৃদ্ধ করছে।

রমেশচন্দ্রের তুলে ধরা সংখ্যাতত্ত্বের সামান্য অংশ দিয়ে পরিষ্কার বোঝানো যাবে ভারতীয় রপ্তানীর চেহারা (৩)—

		১৮০০	১৮২৬
তুলো	...	৫০৬ বেল	১৫,১০১ বেল
রেশম	...	২১৩ বেল	৬,৮৫৬ বেল
নীল	...	১২,৮১১ বেল	৩০,৭৬১ বেল

২৬ বছরে তুলোর রপ্তানী বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে শতকরা ৩০০। রেশমের শতকরা ৩০০০ পরিমাণ। অথচ এই পরিমাণ শিল্প উপাদান জাতীয় উৎপাদনের প্রয়োজনে নিয়োজিত না হয়ে আমাদের শিল্পোৎপাদন ও জাতীয় সম্পদ অপ্রত্যাশিত ভাবেই সঙ্কুচিত করে দিয়েছে। বছরে বছরে প্রয়োজনীয় পণ্যের স্থলভ সরবরাহ থেকে বঞ্চিত হয়েছে আমাদের শিল্প।

এই প্রসংগে রমেশচন্দ্র ঐতিহাসিক জেমস্ মিলের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। জেমস্ মিলকে কেউ ভারত হিতৈষী কি ভারত বন্ধু বলবে না। অর্থনীতিবিদ, সমাজতাত্ত্বিক জন স্টুয়ার্ট মিলের পিতা জেমস মিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মস্ত চাকুরে ছিলেন। বিলেতে কোম্পানীর হেড অফিসে (লীডেন হল স্ট্রীটে) জেমস মিল ছিলেন—Examinar of Indian Correspondences। ভারত-শাসন সংক্রান্ত কোম্পানীর সমস্ত নির্দেশ নীতি মুসাবিদা করতেন জেমস মিল। সেই সুবাদে ভারতের ইতিহাস রাজনীতির প্রকৃতি, ভারতের সামাজিক আর্থিক অবস্থা—সব কিছু ব্যাপারেই তাঁকে ওয়াকিবহাল থাকতে হোত। বলাবাহুল্য ভারত-ইতিহাস রচনায় কোম্পানীর মস্ত অফিসার জেমস মিলের স্বাভাবিক ঝোঁক কোন দিকে সহজেই আন্দাজ করা যায়। যতখানি পারা যায় সাম্রাজ্যবাদী চিন্তার যুক্তি বিন্যাস সাজানো ইতিহাসে ভারতের বহির্বাণিজ্য সম্পর্কে তাঁর যে উক্তি রয়ে গেছে তা কিন্তু বৃটিশ বণিক-বৃত্তির সমর্থনে যায় নি—

It was stated in evidence, that the cotton and silk goods of India up to this period could be sold for a profit in the British market, at a price from fifty to sixty percent lower than those fabricated in England. It consequently became neccssary to protect the latter by duties of seventy and eighty percent on their value or by positive prohibition. Had this not been the case, had not such prohibitory and decrees existed—the Mills Paisley and of Manchesther would have been stopped in their outset and could scearcely have been again set in motion, even by the powers of steam. They were created by the sacrifice of the

Indian manufacture.

ভারতীয় রপ্তানীর উপর ভয়াবহ শুল্ক চাপিয়ে আইন করে ভারতীয় শিল্পের সর্বনাশ ডেকে আনা হল। মিল স্বীকার করেছেন, ভারতীয় শিল্পকৃতি বিধ্বস্ত করেই বিলেতের শিল্পায়ন নইলে সম্ভব ছিল না এই অতুল সম্পদ, শিল্প বিভব গড়ে তোলার।

মিলের বক্তব্য কেন্দ্র করে আমাদের এই উক্তি অতিশয়োক্তি নয়। মতান্ধতাও নয়। সাম্প্রতিক একাধিক গবেষণায় জেমস মিল কিংবা রমেশচন্দ্রের অনুমান ইতিহাস-স্বীকৃত সত্যের মর্যাদা পাচ্ছে। ভারতীয় শিল্প পণ্যের আমদানীর উপর ধ্বংসাত্মক শুল্ক বসিয়ে (৪) বিলেতে শিল্প উদ্যোগের যে সম্ভাবনা বিস্তৃত করে তোলা হল তার কয়েক বছর পর থেকেই শিল্পোন্নয়নের বৈপ্লবিক পরিবেশ ধাপে ধাপে গড়ে উঠেছে ইংলণ্ডে। ১৭২০ সালের ব্যাপক শুল্ক আইনের বারো বছর বাদে 'জন কে'-র আবিষ্কার তাঁত যন্ত্রের ফ্লাই শাটল। তিরিশ বছরের মধ্যেই হারগ্রীভস্, আর্করাইট, ক্রম্পটনের শিল্পকৃতি ইংলণ্ডের বিশাল শিল্পোদ্যোগের সূচনা।

ভারতীয় শিল্পের ওপর মৃত্যু পরোয়ানা জারী করে বিলেতের শিল্পজাতদ্রব্য ভারতের বাজার দখল করে বসলো। এরপর ধীরে ধীরে বৃটিশ শিল্পজাত পণ্যের রপ্তানী বেড়েছে। ১৮১৯ সালে ভারতে বৃটিশ বস্ত্র রপ্তানীর মূল্য ছিল প্রায় ২০ লক্ষ পাউণ্ড, সিপাই বিদ্রোহের বছর তা দাঁড়ালো ৫০ লক্ষ পাউণ্ড।

এতকাল ভারত থেকে যা রপ্তানী হোত—ইংরেজ শিল্প বণিকের স্বার্থে ভারতের সেই রপ্তানী ক্ষমতা নষ্ট করে দেওয়া হোল। উল্টোপথে বিক্রেতা থেকে ক্রেতায় পরিণত করে সেই শিল্পজাত পণ্যই ভারতকে কিনতে বাধ্য করা হল।

বিদেশের কাপড়, সিল্কজাত দ্রব্য, পশমী বস্ত্র, যন্ত্রপাতির বদলে ভারত বর্ধিত হারে দিয়ে চললো, তুলো, কাঁচা পশম, রেশম, নীল, চা, চিনি, পাট, চাল গম। আমদানীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভারত থেকে খাদ্য পণ্যের রপ্তানীও বেড়ে চললো। বছরের পর বছর এই প্রাথমিক কৃষিজ দ্রব্যের বিনিময়ে ভারত তার শিল্প সম্পদ হারিয়েছে—আর চিরতরে হারিয়েছে সম্পদ বৃদ্ধির সম্ভাবনাও।

শিল্পে প্রয়োজনীয় কাঁচা মালের অনটনে যেমন শিল্পকৃতি ব্যাহত হয়েছে তেমনি এক ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে ক্রমাগত খাদ্যশস্য রপ্তানীর ফলেও।

ক্রমাগত খাদ্যশস্য রপ্তানীর মারাত্মক দিক আছে। এ সম্পর্কে রমেশচন্দ্র যে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন আধুনিক অর্থনীতির বিচারে বিশেষ করে সাম্প্রতিক কালের অনুন্নত দেশের আর্থিক উন্নতির তত্ত্বে তার বিশিষ্ট স্থান রয়েছে।

খাদ্যশস্য রপ্তানী ও দুর্ভিক্ষ :

পরিস্থিতির চাপে আমরা রপ্তানী করেছি খাদ্যপণ্য। দুদিক দিয়ে আমাদের সর্বনাশ ডেকে এনেছে খাদ্যশস্যের বাধ্যতামূলক রপ্তানী। প্রথমত উনিশ শতক জুড়ে দুর্ভিক্ষের প্রাবল্য চেষ্টা ঐ রপ্তানীর আশুফল। দ্বিতীয়তঃ এর দূর প্রসারী ফল হল দেশের প্রাথমিক মূলধন সঞ্চয়ে মারাত্মক আঘাত।

রমেশ দত্তের উদ্ধৃত তথ্য থেকে পাই, ১৮৫৯ থেকে ১৮৭৭ পর্যন্ত ১৯ বছরে খাদ্যপণ্যের রপ্তানী

বেড়েছে ৩০ লক্ষ থেকে ৮০ লক্ষ। (৫) এই রপ্তানী যোগ্য পণ্যের সবটুকু না হলেও কিছু অংশ বাড়তি পণ্য—বাকী অংশ যোগাড় হতে চাষীদের রক্ত জল করা শ্রমের মূল্যে।

অত্যধিক ভূমিকা যোগাতে গিয়ে কৃষিজ উৎপাদনের অনেকখানি বিক্রী করে দিতে হত চাষীদের। অনেক ক্ষেত্রেই সম্বৎসরের সঞ্চয় ভেঙে ভূমিকর আদায় হোত। আর মুস্কিল দেখা দিত অনাবৃষ্টির বছরে বা বন্যার সময়ে। কর যোগাতে গিয়ে তখন যথাসর্বস্ব বেচেও খাদ্য জোগাড় করা যেত না। বাড়তি পণ্যের সঞ্চয় ও দেশের কোথাও থাকতো না যা দুর্ভিক্ষ রোধের প্রয়োজনে যা লাগতে পারে। (৬) বিলেতের শিল্প শ্রমিকের খাদ্য জুগিয়ে অসহনীয় খাদ্যাভাবে দুর্ভিক্ষে লাখে লাখে মরছে ভারতের মানুষ। ১৮৭৫ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত মাত্র পঁচিশ বছরে ভারতের স্থানে স্থানে ছটা দুর্ভিক্ষে দেড় কোটি মানুষ খাদ্যাভাবে মারা গেছে। দুর্ভিক্ষ এলাকায় বিক্রীযোগ্য কিছু কিছু পণ্য এসে পড়লেও কেনার মত আর্থিক সংগতি চাষীদের থাকতো না।

কেবল করভারের চাপে খাদ্যশস্য বিক্রীকরার পর দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি হওয়ার মত করুণদশা পৃথিবীর আর কোথাও হয়নি। খাদ্যশস্যের অনটন যেমন লাখে লাখে ভারতের মানুষকে হত্যা করেছে তেমনি নির্মূল করেছে ভবিষ্যৎ আর্থিক উন্নয়নের সম্ভাবনাও।

ক্রমাগত খাদ্যে অনটন কী ভাবে একটা দেশের ভবিষ্যৎ আর্থিক উন্নয়নের প্রাথমিক মূলধন সঞ্চয়ে বাধা দেয় একটা সাধারণ আলোচনায় তা পরিষ্কার হবে।

এ পর্যন্ত সমস্ত উন্নতিশীল দেশেই দেখা গেছে যে, উন্নতির সূচনায় দেশে খাদ্যের প্রাচুর্য থাকা দরকার। সুলভ খাদ্য এবং বাড়তি খাদ্যের ভাণ্ডার কৃষি জীবনের বাইরে অন্যান্য জীবিকার মানুষদের অন্ন জোগায়। সেই সঞ্চয়টুকু না থাকলে কৃষি জীবন ছেড়ে অন্য জীবিকায় মানুষ আসতে পারে না।

খাদ্য উৎপাদন মানুষের প্রাথমিক জীবিকা। এই প্রাথমিক জীবিকার সঞ্চয় যখন ফুরিয়ে আসে মানুষ তখন অন্য জীবিকা ছেড়ে কৃষিজীবনে এসে ভীড় করে। এই দুর্দশা ঘটেছে ভারতের মানুষের জীবনে। একদা ক্রম-উন্নতিশীল শিল্প বাণিজ্য থেকে উৎখাত হয়ে এই জীবিকার মানুষেরা কৃষি জীবনে এসে ভীড় বাড়িয়েছে। শিল্প ও বাণিজ্য থেকে বাড়তি সম্পদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা যেমন কমে আসে তেমনি কৃষি জীবনের ওপর মাত্রাধিক চাপ পড়ায় প্রাথমিক পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতেও ব্যাঘাত ঘটে।

প্রাথমিক পণ্যের বাড়তি সঞ্চয়ের এই সম্ভাবনা না থাকায় কোন ক্রমেই সম্পদ ও মূলধন বৃদ্ধির সামান্য সুযোগ ও আসেনি দেশে। প্রাথমিক পণ্য থেকে যে মূলধন সঞ্চিত হবার কথা তাতে চিরকালের জন্যে ব্যাঘাত ঘটে গেল। ফলে, প্রথাগত শিল্প সম্প্রসারণের যে উদ্যোগ ধীরে ধীরে আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে গড়ে উঠতে পারতো দুশো বছরেও উন্নয়নের সেই স্তরে দেশ পৌছতে পারে নি। আমাদের শিল্প সম্প্রসারণ বৃটিশ মূলধনের হাত ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে।

কৃষি জীবন থেকে প্রাথমিক সঞ্চয়ে এই উদ্যোগ সাম্প্রতিক উন্নয়নমূলক অর্থনীতির অন্যতম স্বীকৃত তত্ত্ব। ষাট বছর আগেও অন্তত রমেশ দত্তের আলোচনায় এর গুরুত্ব ধরা পড়েছিল: In Indian state virtually interfers with the accumulation of wealth from the soil,

intercepts the incomes and gains of the tillers and generally adds to its land revenue demand at each recurring settlement, leaving the cultivators permanently poor. (Preface : Dutt—Book I)

যখন ভারতের মানুষ একটার পর একটা দুর্ভিক্ষে লাখে লাখে উজাড় হয়ে চলেছে তখনো কিন্তু খাদ্য শস্যে ঘাটতির দেশ হয়েও বিলেতের মানুষ অন্ন কষ্ট পায়নি। বৃটিশ বণিকের নায়েব গোমস্তা ভারতের গ্রামে গঞ্জে হাটে ছড়িয়ে পড়ে সংগ্রহ করে আনতো চাল গম। দুর্ভিক্ষের বছরেও এই সংগ্রহের কমতি ছিল না। ১৮৭৬-৭৭ সালে বিরাট দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি সময়ে ভারত থেকে খাদ্যশস্য যা রপ্তানী হয়েছিল আগের বছরগুলোর তুলনায়ও তা ছিল বেশি।

অথচ এমন হবার উপায় ছিল না বিলেতে। সেখানে বরাবর চালু ছিল খাদ্যশস্য আইন (Corn Laws)। বিলেতের খাদ্যশস্য আইন বাতিল করার ব্যাপারে রমেশচন্দ্র অতি সংগত প্রশ্ন তুলেছেন। (৭)

এই আইনের বলে ইংলণ্ড থেকে কোনক্রমেই খাদ্যশস্য দেশের বাইরে রপ্তানী হতে পারতো না। বিভিন্ন জীবিকার মানুষদের জন্যে খাদ্য সরবরাহ বরাবরের মত নিশ্চিত ছিল। শিল্পের সম্প্রসারণ বেড়ে যেতে বিভিন্ন অকৃষি জীবিকায় মানুষ জন যখন ভীড় করতে থাকে তখন আবার দাবী উঠলো আরো সস্তায় খাদ্য পণ্যের সরবরাহ চাই।

খাদ্যশস্য আইনেও কিন্তু এতদিন বিদেশ থেকে খাদ্যের চালান নিয়ে আসা বেআইনী ছিল কিংবা দরকার মত আমদানীর ওপর চড়া হারে শুল্ক বসানো হোত। ব্যারণ-লর্ড-জমিদার গোষ্ঠীর প্রভাব যতদিন পার্লামেণ্টে বজায় ছিল ততদিন তাদের স্বার্থে খাদ্যের আমদানীর ওপর এই নিয়ন্ত্রণ কেননা খাদ্যপণ্যের বাজার দর চড়া রেখে যথেষ্ট মুনাফার সুযোগ তারাই নিত। (৮) বাইরে থেকে খাদ্যের আমদানী বাড়লে তাদের মুনাফায় টান পড়তে পারে।

কিন্তু এ ব্যবস্থা বেশি দিন চলতে পারে না। খাদ্যের দাম বেশি থাকলে শ্রমিকের মজুরীও বেশি হতে বাধ্য। শ্রমের মূল্য সুলভ না হলে শিল্প সম্প্রসারণ সম্ভব হয় না। শ্রমিক ও শিল্পের স্বচ্ছলতা আসে না। তাই, নতুন শিল্প মালিক, শিল্প শ্রমিক আর বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মিলিত জোর আন্দোলনে খাদ্যশস্য আইনের এই রীতির বিরুদ্ধে জোর বিক্ষোভ শুরু হল। এমন কি নেতা কবডেন আর হাসকিসনের দাপটে পড়ে আন্দোলন প্রায় বিপ্লবের রূপ নিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত এই আইন বাতিল করে দিতে হয় ১৮৪৯ সালে। আইন উঠে যাওয়ার পর থেকেই ব্যাপক হারে শুরু হল ভারত থেকে খাদ্য সংগ্রহ।

সুলভ খাদ্যের সংগ্রহ থেকে যে প্রাথমিক মূলধন সঞ্চয় হয় তা থেকে ভারতবর্ষ বরাবরের জন্য বঞ্চিত হয়ে চললো।

(১) ...all wrought silks, Bengals and stuffs mixed with silk or herba, of the manufacture of Persia, China and East Indies and also all Calicoes, painted,

dyed or stained there should be locked up in ware houses...

(Valakrishna—Commercial relation between England and India)

(২) Such exclusive companies......are nuissances in every respeet, always more or less inconvenient to the countries in which they are established and destructive to those which have the misfortune to fall under their government. (Wealth of Nations—Book IV, Chapter II, Vol II, পাতা ১৪০)

(৩) বক্তব্য সুপ্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে রমেশচন্দ্র প্রচুর তথ্যের সমাবেশ করেছেন। অকাট্য তথ্য বর্তমান প্রবন্ধে তার সবখানি তুলে ধরার যৌক্তিকতা কতখানি তা পাঠকেই আন্দাজ করে নেবেন—তবু যতটুকুন উদ্ধৃতি দিলে আমাদের বলার কথা পরিষ্কার হতে পারে এখানে সেটুকু মাত্র তুলে ধরছি। পাঠক আরো ওয়াকিবহাল হওয়ার জন্য আরো খানিক তথ্যের উদ্ধৃতি দিলাম।

(৪) Dr. Lilian Knowles : Industrial and Commercial Revoulations পা—৪৩

P. J. Thomas : Mercantilism and the East India Trade পা—১১৪

(৫) ২য়, খণ্ড, পাতা ৩৪৮

(৬) Cultivators pay their revenue or their rents by selling a large portion of the produce of their fields, keeping an in sufficient stock for their own consumption. Exporting merchants have their agents all over the country to buy what the cultivators compelled to sell.........It this happened that, even on the eve of great famines. In 1876-77 when Indian was on the brink of one of the severest famines, she exported larger quantity of food grains. (২য় খণ্ড, পা—৩৪৯)

(৭) The leaders of the agitation against the Corn Laws, who rightly and successfully fought against the land lords of England for a measure which would bring cheap bread to the workman and labourer, said little and knew little of the policy which took the bread out of the mouths of millions of weavers and artisans in India (The Economic History of India under Early British Rule—Pub. Div. PP 215)

(৮) The Parliament of 1814 dominated by landowners, prohibited the import of corn unless the price exceeded 80/- a quarter. This law was revised in 1822 and in 1828. Thus for the landed interest had its own way : Encyclopaedia of Social Science : Corn Laws.

বাংলার মন্দির

হিতেশরঞ্জন সান্যাল

রত্ন রীতি : একরত্ন

চালা রীতির পরে আসিতেছে রত্নরীতির কথা। বর্তমানে আলোচনার প্রারম্ভে রীতি পরিচয়ের সময় রত্ন মন্দিরের বৈশিষ্ট্যগুলির বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছিলাম। রত্ন মন্দির লইয়া আলোচনা শুরু করিবার আগে সংক্ষেপে একবার সেই কথাগুলিই বলিয়া লই। অধিকাংশ মন্দিরের দৃষ্টান্ত হইতে বলা যায় রত্ন রীতি মিশ্র কল্পনার ফলশ্রুতি। বাংলার নিজস্ব চালা রীতিতে গঠিত নিম্নাংশের সহিত সর্বভারতীয় ঐতিহ্যের অঙ্গস্বরূপ প্রাপ্ত শিখর রীতির মিলন মিশ্রণে ইহার রচনা। চালা রীতি হইতে আসিয়াছে দেওয়ালের উর্দ্ধভাগের বক্র আকৃতি, বাঁকান কার্নিস ও ঈষৎ বক্ররেখায় বিধৃত কূর্মপৃষ্ঠাকৃতি আচ্ছাদন। ইহার উপর রত্ন নামক উর্দ্ধাংশটির গঠন শিখর রীতির অনুসরণে। এই সাধারণ পদ্ধতির ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে চালা রীতির রত্ন নির্মাণে। চালা রত্নের দৃষ্টান্ত অবশ্য অতি অল্প সংখ্যায় সীমাবদ্ধ।

রত্ন মন্দিরের নির্মাণকৌশলের অভিনবত্ব লক্ষ্য করিবার মত। অন্যান্য রীতির মত ইহার উর্দ্ধাংশ নিম্নাংশের স্বাভাবিক পরিণতির ফল নহে; পরস্পরের মধ্যে দৈহিক কোন বন্ধনও নাই। ঈষৎ বক্র নীচু আচ্ছাদনে নিম্নাংশ স্বয়ং সম্পূর্ণ। তাহার উপর উর্দ্ধাংশটি গঠিত হয় পৃথকভাবে। ভাবকল্পনার এই মূলগত কৃত্রিমতাই রত্নমন্দিরের সর্বপ্রধান দুর্বলতা। এই দুর্বলতা অতিক্রম করিয়া সামঞ্জস্যপূর্ণ, সংহত দেহ গঠনের প্রায়শই রত্ন রীতির বিবর্তনের মূল অনুপ্রেরণা। ইহার ক্রমবিকাশের ধারা অনুসন্ধান করিতে হইবে এই পথেই।

কবে, কোথায় এবং কিভাবে রত্ন মন্দিরের ভাবকল্পনা উদ্ভূত হইয়াছিল সে তথ্য আজ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। রত্নরীতির বিভিন্ন রূপভেদের মধ্যে কোনটিকে নিয়া চর্চা শুরু হইয়াছিল। তাহাও অনুমানের বিষয়। তাই সামগ্রিকভাবে রত্নরীতির আলোচনা না করিয়া উর্দ্ধাংশে রত্নের সংখ্যা অনুযায়ী যে স্বাভাবিক বিভাগ রহিয়াছে তাহাকে অবলম্বন করাই বোধ করি যুক্তিসঙ্গত। এই বিভাগ অনুসারে একটিমাত্র রত্ন সম্বলিত এক রত্ন মন্দিরই প্রথমে আসিয়া পড়ে। তাহাকে লইয়াই শুরু করা যাক।

এক রত্ন মন্দিরের দৃষ্টান্ত অত্যন্ত অল্প সংখ্যায় সীমাবদ্ধ। ইহার চর্চাও বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া হয় নাই। অল্প কয়েকটি স্থানেই আবদ্ধ থাকিয়াছে। বর্তমানে একরথ মন্দিরের সাক্ষাৎ মিলিবে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর শহরে, পাত্রশায়ের শহরে, সাহারজোড়া গ্রামে এবং হুগলি জেলার বাঁশবেড়িয়া শহরে, গুপ্তিপাড়া ও খানাকুল-কৃষ্ণসার গ্রাম দুটিতে।

উপরে যতগুলি কেন্দ্রের নাম করিলাম তাহাদের মধ্যে বিষ্ণুপুরের গুরুত্বই সর্বাধিক। শ্রুত-কীর্তি মল্লরাজ বংশের নিরবচ্ছিন্ন পৃষ্ঠপোষকতায় একরত্ন রীতির চর্চা বিষ্ণুপুর নগরীকে কেন্দ্র করিয়া সমধিক পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। এখন পর্যন্ত যতটুকু জানা গিয়াছে তাহাতে মনে হয়
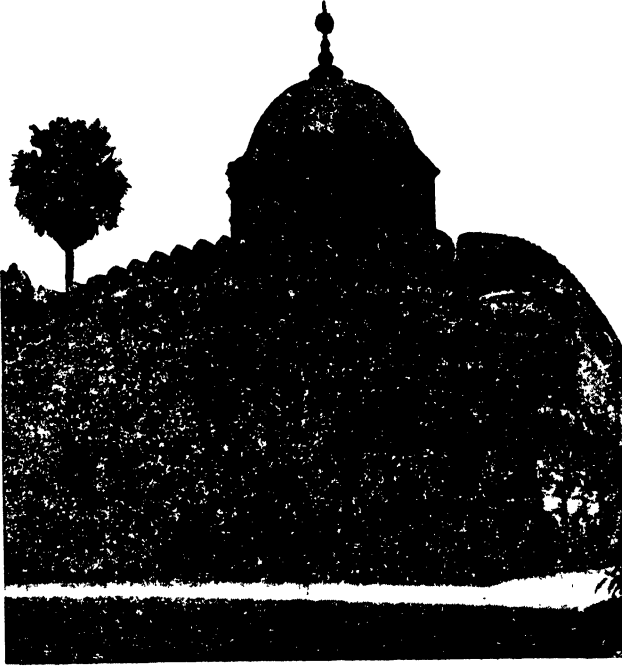
একরত্ন রীতির মদনমোহন মন্দির—বিষ্ণুপুর ॥ বাঁকুড়া

বিষ্ণুপুরে মন্দির চর্চার সূত্রপাত হইয়াছিল সম্ভবতঃ রাজা হাম্বিরের অর্থাৎ ষোড়শ শতকের শেষদিকে, ইহার পর হইতে মন্দির নির্মাণের ধারা পুরুষানুক্রমে বহিয়া চলিয়াছিল রাজা চৈতন্য সিংহের সময় পর্যন্ত। তাঁহারই রাজত্বকালে মল্লরাজকুলের শেষ দেবালয় রাধাশ্যাম মন্দির নির্মিত হয় ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে। এই সুদীর্ঘ সময় ধরিয়া বিষ্ণুপুরে যতগুলি মন্দির নির্মিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে একরত্নের সংখ্যাই সর্বাধিক। নির্দিষ্ট সময় ও অঞ্চলের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার ফলে বিষ্ণুপুরে একরত্ন মন্দিরের ক্রমবিকাশের ধারাটি অত্যন্ত স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বর্তমানে বিষ্ণুপুরের প্রাচীনতম একরত্ন মন্দিরের নিদর্শন হইল কালাচাঁদ মন্দির। ৯৬২ মল্লাব্দে (১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে) রাজা রঘুনাথ সিংহের আনুকূল্যে মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছিল। স্বল্পোচ্চ ভিত্তি অধিষ্ঠানের উপর চতুরস্র দেবালয়ের অবস্থান। আসন অবলম্বন করিয়া দেওয়াল কিছুদূর পর্যন্ত উঠিয়া গিয়া যেখানে বক্র আকারে শেষ হইয়াছে সেখানে তাহার উচ্চতা আসনের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা অনেক কম—প্রায় অর্দ্ধেক। দেওয়ালের উপরে চালারূপের স্মৃতিতে রচিত নীচু আচ্ছাদন আর তাহার ঠিক কেন্দ্রস্থল অর্থাৎ গর্ভগৃহের উপরে শিখর রীতিতে নির্মিত রত্নটির অবস্থান।

চালার অনুকরণে রচিত হইলেও আচ্ছাদনটি কিন্তু সর্বাঙ্গীণ বহির্বর্তুল নহে। চালা আচ্ছাদনের বহিঃবর্তুল চালাগুলি দুই দিক হইতে বাঁকিয়া আসিয়া যেখানে মিলিত হয় সেই মিলন-

কেন্দ্রের আকারও বহির্বর্তুল। বর্তমান নিদর্শনে দেখিতেছি আচ্ছাদনের প্রতিটি অংশ উচ্চতর মধ্যস্থল হইতে ক্রমশ ঢালু হইয়া মিলন কেন্দ্রের দিকে আগাইয়া যাইতেছে। ফলে দুইটি অংশের মিলনকেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে অন্তর্বর্তুল, দেখিতে অনেকটা জোড়বাংলার দুইটি আচ্ছাদনের মিলনকেন্দ্রের মত।

গর্ভগৃহের উপরে, আচ্ছাদনের কেন্দ্রস্থলবর্তী সুউচ্চ শিখর-রত্ন নিম্নাংশের তুলনায় অনেক বড়। অষ্টকোণাকৃতি বেদীর উপর অবস্থিত রত্নটির আসন সপ্তরথ কিন্তু বাড় তিন ভাগে বিভক্ত, অর্থাৎ দেওয়ালের মধ্যদেশ ও উর্দ্ধপ্রান্ত বহিয়া যথাক্রমে বান্ধনা ও বড়ণ্ড রেখার বন্ধন। বড়ণ্ডের উপর হইতে উঠিয়াছে রত্নের বক্ররেখ আচ্ছাদন—শিখর মন্দিরের গণ্ডীভাগ। প্রথমাবধিই গণ্ডীটি বাঁকিয়া গিয়াছে, তবে অন্তর্মুখী ঝোঁক নিয়ন্ত্রণে রাখিবার অর্থাৎ একটু খাড়া ভাবে গঠন করিবার প্রয়াস দৃষ্টিগোচর। উচ্চাবচ পগপ্রবাহের উপর দিয়া আনুভূমিক রেখার প্রবাহ রেখাগুলি গণ্ডীগাত্র প্রায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। গণ্ডীর শীর্ষে বেকী, আমলক, খুপুরি, কলস, ধ্বজ প্রভৃতি চূড়াভাগের উপকরণ।

শিখর-রত্নের আকৃতি দেখিলে বুঝা যায় শিখর মন্দিরের বিশুদ্ধ রূপ সম্বন্ধে স্থপতির ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট। সমসাময়িক কালে বাংলাদেশে শিখর মন্দিরের বিকৃতি যে পর্যায়ে পৌছিয়াছিল তাহার সহিত বর্তমান রত্ন-শিখরটির বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। বিষ্ণুপুরের পরবর্তী শিখর-রত্নগুলির অঙ্গবিন্যাস কালাচাঁদেরই অনুরূপ। তবে গণ্ডীর বহিরেখা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে ; খাড়াভাবের পরিবর্তে গম্বুজের অর্ধবৃত্তাকার গতিপথে গণ্ডীকে বাঁকাইয়া তুলিবার প্রচেষ্টাই সমধিক।

কালাচাঁদ মন্দিরের দেহ সংগঠনে শিখর-রত্নের সুস্পষ্ট প্রাধান্য সহজেই চোখে পড়ে। নিম্নাংশের আচ্ছাদনের একটি অংশমাত্র আশ্রয় করিয়া গঠিত রত্নটির প্রসার ও উচ্চতা কোনটিই নিম্নাংশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া করা হয় নাই। নিম্নাংশের দেহে উচ্চতার যেটুকু সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে শিখর-রত্ন তাহা অতিক্রম করিয়া অনেকটাই বেশী বিস্তৃত। একরত্ন দেহে রত্নের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে এইটুকুই যথেষ্ট। রত্নের প্রাধান্য সংবদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে গণ্ডীর বহিরেখা। গণ্ডীর খাড়া আকৃতির প্রতি প্রবণতা ও নিম্নাংশের বক্ররেখায় বিধৃত দেওয়ালশীর্ষ, কার্ণিস ও আচ্ছাদনের গতি প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিপরীতমুখী রেখা প্রবাহের ধারা সহজেই শিল্পীর আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। উভয় অংশের মধ্যে ভাবগত বন্ধনও তাই অত্যন্ত শিথিল। দেখিলে মনে হয় দুইটি অংশের গঠন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে নিম্নাংশের উপর উর্দ্ধাংশকে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র। সুষ্ঠু আনুপাতিক সম্পর্কের অভাবে উদ্ভূত অসামঞ্জস্য রত্ন রীতির অন্তর্নিহিত কৃত্রিমতা অত্যন্ত স্পষ্টরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

কালাচাঁদ মন্দিরের অসংগত রূপ বোধ করি স্থপতিদের চোখে পড়িয়াছিল। তাই ৯৬৪ মল্লাব্দে (১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে) রাজা বীরসিংহের আনুকূল্যে লালজীর আবাসগৃহ নির্মাণ করিতে গিয়া রত্নের আকৃতি সংক্ষিপ্ত করিয়া তোলা হইয়াছিল। সংকোচন হইয়াছে প্রায় সর্বপ্রকারে। গর্ভগৃহের উপরে অষ্টকোণকৃতি বেদীটির সবদিকেই বেশ খানিকটা ছাড়িয়া দিয়া রত্নটির আসন সংস্থান। স্বাভাবিক ভাবেই রত্নের উচ্চতা অনেক কমিয়া গিয়াছে। উপরন্তু রত্নের আচ্ছাদন শিখর রীতি

অনুসারে না করিয়া চালার মত বক্র রেখায় রচিত। রত্নদেহের সংস্কার প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে পূর্ববর্তী কালাচাঁদ মন্দিরে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হইয়াছে তাহারই ভিত্তিতে। নিম্নাংশ ও রত্নের মধ্যে সুষ্ঠু আনুপাতিক সম্পর্ক নির্ধারণের উদ্দেশ্যে রত্নদেহের আয়তন ও উচ্চতা হ্রাস করা হইয়াছে আর উভয় অংশের মধ্যে ভাবগত সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনে আচ্ছাদনে চালারূপের অবতারণা। তবে রত্নদেহের অতিরিক্ত সঙ্কোচনের ফলে সুষ্ঠু আনুপাতিক সম্পর্ক এখানেও অলব্ধ থাকিয়া গেল, ভাবগত সম্পর্কও পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারিল না।

লালজীর পরবর্তী একরত্ন মন্দিরের নিদর্শন মিলিবে বর্তমানে ভগ্নদশাপন্ন মুরলীমোহন মন্দিরে। ৯৭১ মল্লাব্দে (১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে) রাজা বীরসিংহের মহিষী চুড়ামণি কর্তৃক নির্মিত দেবগৃহটির অঙ্গবিন্যাস ও গঠন প্রকরণ উভয় দিক হইতেই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কালাচাঁদ মন্দিরে নিম্নাংশের দেওয়ালে প্রত্যেক দিকেই ছিল তিনটি করিয়া ভংগী কাটা খিলানশীর্ষ প্রবেশ পথ ; গর্ভগৃহের চতুঃপার্শ্ববর্তী দালানে চারিদিক হইতেই প্রবেশ করা যায়। লালজীর আবাসগৃহে দালানে প্রবেশ করিবার জন্য তিন দিকে সমসংখ্যক দ্বারপথের সমাবেশ রহিয়াছে—অবশিষ্ট দিকটি টানা দেওয়ালে আবদ্ধ। একাধিক দেওয়ালে প্রবেশ পথ থাকা সত্ত্বেও গর্ভগৃহ বেষ্টনকারী দালানগুলি আবৃত কক্ষরূপেই গণ্য। বিষ্ণুপুরের অধিকাংশ একরত্ন মন্দিরে দালানের মর্যাদা ইহাই। মুরলীমোহন মন্দিরে এই পদ্ধতির ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। দালানের প্রত্যেকটি বহির্দেওয়ালের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একটি টানা খিলান। ইহাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে দেওয়ালের প্রান্তস্থিত দুইটি বৃথাস্তম্ভ ও মধ্যবর্তী ক্ষেত্রে সমান দূরত্বে স্থাপিত দুইটি পূর্ণস্তম্ভ। দালানের আচ্ছাদনও অন্যান্য একরত্ন মন্দির হইতে পৃথক। বক্ররেখ কার্ণিসের উপর হইতে আচ্ছাদন সাধারণ চালার মত উর্দ্ধমুখে অগ্রসরমান। অল্প একটু উঠিবার পর আটচালা আচ্ছাদনের নিম্নভাগের মত ভিতরের দিকে ঢুকিয়া গিয়া রত্নের পাদদেশ গিয়া শেষ হইয়াছে।

গর্ভগৃহের উপরস্থ শিখররত্নের অবস্থান অষ্টকোণাকৃতি ভিত্তি অধিষ্ঠানের প্রায় সবটুকু জুড়িয়া। চারিপাশের পরিত্যক্ত অংশ সামান্যই। বাড় খণ্ড পূর্বের মতই। তবে গণ্ডীর আকার সংক্ষিপ্ত করিয়া গড়া। বাড়খণ্ডের সম্ভাবনা উপেক্ষা করিয়া গণ্ডী অর্দ্ধবৃত্তের গতিপথে প্রথমাবধি বাঁকিয়া গিয়াছে। আকৃতিটি দেখিতে হইয়াছে ঠিক গম্বুজের মত। গণ্ডীর দেহ আচ্ছন্ন করিয়া আনুভূমিক রেখার বন্ধনী আর উপরে রহিয়াছে আমলক, কলস প্রভৃতি রচিত চূড়াভাগ, প্রসঙ্গতঃ বলিয়া রাখি বিষ্ণুপুরের পরবর্তী একরত্ন মন্দিরে গণ্ডীর আকৃতি রচনায় এই রূপটিকেই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছিল।

মন্দিরটির চূড়া সহ সমগ্র দেহের উচ্চতা আসন দৈর্ঘ্যের সমান। এই মোট উচ্চতার অর্দ্ধেকের অনেক কম অংশ জুড়িয়া দেওয়ালের অবস্থান। অবশিষ্ট অংশ অধিকার করিয়াছে দালানের আচ্ছাদনের চালা ও রত্ন শিখা। উপর্যুপরি এই তিনটি খণ্ডের মধ্যে আবার রত্নের উচ্চতাই সর্বাধিক।

পরিমাপের দিক দিয়া দেখিলে রত্নের উচ্চতা সর্বাধিক বটে, কিন্তু মন্দির দেহের পরিণাম প্রভাবে শিখর-রত্ন প্রাধান্য বিস্তার করিতে পারে নাই। নিম্নাংশের আচ্ছাদন বিস্তারের মাত্র একটি

অংশ জুড়িয়া ইহার অবস্থান, তাই সুষ্ঠু আনুপাতিক সম্পর্কের প্রয়োজনে রত্নের ভূমিকা গৌণ হইবে ইহাই স্বাভাবিক। যে নিম্নাংশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিখররত্নের ভূমিকা নির্দ্ধারিত হইবে বর্তমান মন্দিরে তাহার উচ্চতা আসনদৈর্ঘের অর্দ্ধেকেরও কম। একরত্ন ভাবকল্পনায় নিম্নাংশের উচ্চতা এই সীমা ছাড়াইয়া গেলে অসংগতি সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা প্রবল হইয়া উঠে কারণ, উর্দ্ধাংশের প্রসার গর্ভগৃহের বিস্তারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাই নিম্নাংশ যদি উল্লিখিত সীমা অতিক্রম করিয়া যায় তবে তাহার উচ্চতা প্রকাশের বাহন সংক্ষিপ্ত আয়তনে আবদ্ধ রত্নশিখরে সর্বাধিক উচ্চতা সত্বেও নিম্নাংশের ইংগিত অনুপলব্ধ থাকিয়া যাইবে। এরূপ ক্ষেত্রে তো মন্দিরদেহের ভারসাম্য ব্যহত হইতে বাধ্য। কালাচাঁদ ও লালজী মন্দির দেখিলে বুঝা যায় স্থপতি এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন কিন্তু এই পরিপ্রেক্ষিতে রত্নের ভূমিকা নির্দ্ধারণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। মুরলীমোহন মন্দিরে শিখররত্নের প্রকৃত মূল্যায়নের সূত্র উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা লক্ষ্যণীয়ভাবে বিদ্যমান। মনে হইতেছে স্থপতি কিছুটা সাফল্যও অর্জন করিয়াছেন। নিম্নাংশের উচ্চতা সম্ভাবনার ইংগিত বহন করিয়া এককভাবে সর্বাধিক উচ্চতা সত্বেও শিখররত্নের ভূমিকা অপ্রধান। নিম্নাংশের উপর মন্দিরদেহের উচ্চতা অর্জনের মধ্যমরূপেই তাহার নির্মাণ ও প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু স্থপতি এখনও সঙ্কোচ কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। নিম্নাংশ ও শিখররত্নের তাই মধ্যবর্তী অংগের সংযোজন।

ত্রিশ বৎসর পরে ১০০০ মল্লাব্দে (১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে) দুর্জন সিংহের রাজত্বকালে নির্মিত মল্লরাজধানীর অধিষ্ঠাতৃ দেবতা মদনমোহনের মন্দিরে দেখিতেছি বিপরীতমুখী পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবতারণা। মন্দিরটির মোট উচ্চতা আসনের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা কম। ইহার মধ্যে আবার দেওয়ালের উচ্চতাই সর্বাধিক—প্রায় তিনচতুর্থাংশ জুড়িয়া। অবশিষ্ট অংশটুকু মাত্র শিখররত্নের অধিকারে। একরত্ন মন্দিরের সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনা করিলে অঙ্গবিন্যাসের এই পদ্ধতি যে অবৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচায়ক তাহা বুঝিতে অসুবিধা হয় না। একে তো সুউচ্চ দেওয়াল রূপবৈকল্যের সম্ভাবনা প্রকট করিয়া তুলিয়াছে, তাহার উপর ক্ষুদ্রায়তন শিখর-রত্ন সংযোজনের ফলে মন্দিরদেহ হইয়া উঠিয়াছে ছন্দহীন ও বিকৃত।

মুরলীমোহন ও মদনমোহনের পরবর্তীকালে বিষ্ণুপুরে মল্লরাজকুলের অর্থানুকুল্যে নির্মিত একরত্ন মন্দিরগুলিকে দুইটি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলা যায়। মুরলীমোহন মন্দিরে ভাবকল্পনা যে রূপের মাধ্যমে বিকাশ লাভ করিতেছে প্রথম শ্রেণীর মন্দিরগুলি তাহারই সমুন্নতির নিদর্শন। আর এক শ্রেণীর বিকাশ ঘটিয়াছে মদনমোহন মন্দিরের আকৃতি অবলম্বন করিয়া।

প্রথম শ্রেণীর সাক্ষাৎ মিলিবে কৃষ্ণসিংহ কর্তৃক নির্মিত রাধাগোবিন্দ মন্দিরে (১০৩৫ মল্লাব্দ অর্থাৎ ১৭২৯ খৃষ্টাব্দ,) ১০৩২ মল্লাব্দে (১৭২৬ খৃষ্টাব্দে) নির্মিত জোড় মন্দির সংস্থানে তিনটি মন্দিরে; এবং আনুমানিক অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের নন্দলাল মন্দিরে ও পাটপুরে অবস্থিত মন্দিরটিতে। মন্দিরগুলিতে আসনের দৈর্ঘ্য ও দেওয়ালের উচ্চতার পারস্পরিক সম্পর্ক মুরলী-মোহনের আবাসগৃহের অনুরূপ। তবে, দেওয়ালের উপরে আচ্ছাদনের লম্বমান গতির পুনরাবৃত্তি আর কোথাও ঘটে নাই; আনুপূর্বিক বক্ররেখা রচনা করিয়াই আচ্ছাদন শেষ হইয়া গিয়াছে। নিম্নাংশ ও শিখররত্নের মধ্যবর্তী অংশটির অনুপস্থিতিতে উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক পূর্বেরমত সম্পূর্ণ

প্রত্যক্ষ। উর্দ্ধবিস্তারে শিখররত্ন দেওয়ালের উচ্চতা অপেক্ষা অনেকটা বেশী উঠিয়া গিয়াছে। চূড়াসহ মন্দিরদেহের উচ্চতা আসন দৈর্ঘ্য অপেক্ষা অধিক। অর্থাৎ মুরলীমোহন মন্দিরে উভয়ের আনুপাতিক সম্পর্ক যাহা ছিল বর্তমান দৃষ্টান্তগুলিতে রত্নশিখরের অধিকতর উচ্চতায় তাহা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। রত্নের গণ্ডী রচনায় পরিবর্তনটিও লক্ষ্য করিবার মত। গম্বুজের প্রভাব সত্ত্বেও ইহার উর্দ্ধভাগ অর্দ্ধবৃত্তের গতিপথ পরিত্যাগ করিয়া ঈষৎ দীর্ঘায়ত রেখায় বিধৃত। স্থানকে বিশিষ্ট ও আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে কিন্তু পরিণাম প্রভাবের উপর শিখররত্ন প্রাধান্য বিস্তার করিতে পারে নাই। নিম্নাংশের গঠনের মধ্যে উর্দ্ধবিস্তারের যে টুকু সম্ভাবনা ছিল তাহার সবটুকু লইয়াই রত্নশিখরের উচ্চতা। অপর পক্ষে, সুবিস্তৃত নিম্নাংশ যে পরিপূর্ণ প্রাধান্য সহ বিরাজমান তাহাও নহে। নিম্নাংশের বিস্তার ও শিখররত্নের উচ্চতা উভয়ের মিলনে মন্দিরদেহ হইয়াছে পূর্ণাঙ্গ—একটি অখণ্ড রূপের উদ্ভব। একটু ঘুরাইয়া বলা যায় একরত্ন মন্দিরদেহে রূপময়তার ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করিতে হইলে যে harmonious balance এর প্রয়োজন, এই মন্দিরগুলির অঙ্গবিন্যাসে উভয় অংশের আপনাপন মর্যাদার পূর্ণ স্বকৃতিতে দেখিতেছি তাহারই অবতারণা। একরত্ন মন্দিরের ভাবকল্পনায় যে কৃত্রিমতার কথা বার বার বলিয়া আসিয়াছি তাহা লুপ্ত হয় নাই সত্য কিন্তু দেহ সংগঠনের harmonious balance তাহার উপরে রূপময়তার আবরণ টানিয়া দিয়াছে। শিখররত্নের গণ্ডীদেহে নিম্নাভিমুখী বক্ররেখার কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিম্নাংশের বক্ররেখার সহিত তাহার সমধর্মীতা উভয় অংশকে ভাবগততাবে পরস্পরের নিকটবর্তী করিয়া তুলিয়াছে একথা বোধকরি দ্বিধা না রাখিয়াই বলা যায়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ মদনমোহন মন্দিরের অনুবর্তী মন্দিরের সংখ্যা মাত্র দুইটি, কৃষ্ণসিংহের মহিষী চূড়ামণি ১০৪৩ মল্লাব্দে (১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে) নির্মিত রাধামাধব ও চৈতন্য সিংহের আনুকুল্যে নির্মিত রাধাশ্যাম মন্দির নির্মাণকাল ১০৬৪ মল্লাব্দ অর্থাৎ (১৭৫৮ খৃষ্টাব্দ)। মন্দির দুইটিতে মোট উচ্চতা সমুন্নত নিদর্শনগুলির মত আসন দৈর্ঘ্যের পরিমাণ ছাড়াইয়া গিয়াছে বটে তবে রত্নদেহের উর্দ্ধবিস্তার দেওয়ালের তুলনায় কম। মদনমোহন মন্দিরের অসংগতির অন্যতম কারণ ছিল ইহাই। রাধাগোবিন্দ মন্দিরে দেওয়ালের উচ্চতা আসন-দৈর্ঘ্যের সমান কিন্তু রাধাশ্যাম মন্দিরে দেওয়াল আসন-দৈর্ঘ্যের সমান। মন্দিরদেহের সামগ্রিক উচ্চতার বাকি অংশ অধিকার করিয়া রহিয়াছে চূড়া সহ শিখর-রত্ন। হ্রস্বায়ত রত্ন উভয়ক্ষেত্রেই সামঞ্জস্যের অন্তরায় রূপে দেখা দিয়াছে।

বিষ্ণুপুরের বাহিরে শিখররত্ন সম্বলিত একরত্ন মন্দিরের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। তাহাদের মধ্যে একটি বাঁকুড়া জিলার পাত্রসায়র সহরে কালঞ্জয়-শিব মন্দিরটি রাজা চৈতন্য সিংহের কীর্তি বলিয়া খ্যাত। অপর দুইটি হইল বাঁকুড়া জিলার সাহারজোড়া গ্রামের নন্দলাল মন্দির ও হুগলী জিলার খানাকুল-কৃষ্ণনগর গ্রামের গোপীনাথ মন্দির (১৮১২ খৃঃ)। মন্দির ত্রয়ের মধ্যে সাহারজোড়া গ্রামের নন্দদুলাল মন্দিরটীই (১৮২০ খৃষ্টাব্দ) বিষ্ণুপুর একরত্নের প্রত্যক্ষ অনুকরণে নির্মিত; তবে ভাবকল্পনায় ও অঙ্গবিন্যাসে বিষ্ণুপুরে অর্জিত সাফল্যের কোন স্পর্শ ইহাতে নাই। নিম্নাংশে দেওয়ালের উচ্চতা ও আসনের দৈর্ঘ্য ঠিক সমান। ইহার উপরে রত্ন-শিখর যথাসম্ভব উচ্চ হইলেও নিম্নাংশ অপেক্ষা হ্রস্ব; নিম্নাংশের সুউচ্চ দেওয়ালের উপস্থিতির ফলে রত্নদেহের উচ্চতা স্বভাবতই

বাড়িয়া গিয়াছে কিন্তু রত্নের মাধ্যমে মন্দির দেহের উচ্চতার সম্ভাবনা উপলব্ধ হইতে পারে নাই।

পাত্রসায়রের কালঞ্জয় শিব মন্দির ও খানাকুল কৃষ্ণনগরস্থ গোপীনাথ মন্দিরে বিস্তৃত আয়তনের উপর অধিষ্ঠিত সুউচ্চ শিখর-রত্ন দর্শকের দৃষ্টি প্রথমেই আকর্ষণ করিয়া নেয়। পাত্রসায়রে দেখিতেছি আসনক্ষেত্রের অধিকাংশই গর্ভগৃহের অধিকারে। ফলে, স্বাভাবিক ভাবেই রত্নের প্রসার গিয়াছে বাড়িয়া। উচ্চতার বিস্তার হইয়াছে প্রসারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই। গোপীনাথ মন্দিরে গর্ভগৃহ অতটা স্থান না জুড়িলেও নিম্নাংশের সম্পূর্ণ সমতল আচ্ছাদনের উপর সুউচ্চ শিখর সহজেই প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে। উপরন্তু শিখর-রত্নের সম্মুখবর্তী জগমোহনটি তাহার স্বাতন্ত্র্য আরও স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। শিখর-রত্নের এই অনাবশ্যক গুরুত্ব একরত্ন ভাবকল্পনায় সামঞ্জস্যপূর্ণ দেহ গঠনের সর্বপ্রধান অন্তরায়।

শিখর-রীতির পরিবর্তে রত্নের চালা আচ্ছাদনে যে রূপভেদ সৃষ্টি হয় তাহাকে লইয়া সৃজনশীল চর্চার সম্ভাবনা প্রচুর। কিন্তু বাস্তবে দেখিতেছি মাত্র তিনটি মন্দিরেই চালা-রত্নের চর্চা শেষ হইয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটি মন্দিরে, খানাকুল-কৃষ্ণনগর গ্রামের বাসগৃহে রত্নের আবরণ চারচালায়। অপর দুইটীতে অষ্টকোণাকৃতি রত্নের উপর আটচালা আচ্ছাদন। এই মন্দিরদুইটি হইল বাঁশবেড়িয়া সহরের অনন্তবাসুদেব মন্দির ও গুপ্তিপাড়া গ্রামের বৃন্দাবনচন্দ্র মঠের অন্তর্ভুক্ত রামচন্দ্র মন্দির।

আনুমানিক সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে যাদবেন্দু চৌধুরী কর্তৃক নির্মিত বলিয়া কথিত রাধাবল্লভ মন্দিরের নিম্নাংশে লম্বমান দেওয়ালের ঊর্দ্ধবিস্তার আসন দৈর্ঘের অর্ধেক পরিমাণ। উপরে রত্নের উচ্চতা দেওয়ালের তুলনায় অনেক কম। রত্নটিকে কল্পনাই করা হইয়াছে খর্বভাবে। ইহার দেওয়ালের উচ্চতা আসন দৈর্ঘের আর আচ্ছাদনটি দেওয়ালের সমান উচ্চতায় অধিষ্টিত। রত্নটির অঙ্গবিন্যাস দেখিয়া বুঝা যাইতেছে চারচালা কক্ষ হিসাবে ইহা অসার্থক পরিকল্পনার ফলশ্রুতি। একরত্ন মন্দিরের ঊর্দ্ধাংশ রূপেও ইহার ভূমিকা অস্বস্তিকর। আসনের বিস্তার ও দেহের গুরুভারে চালা রত্নটির স্বাতন্ত্র সুস্পষ্ট অথচ নিম্নাংশের ইঙ্গিত পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার মত উচ্চতা তাহার নাই।

অনন্তবাসুদেব মন্দিরটি বাঁশবেড়িয়ারাজের কীর্তি। নির্মাণকাল ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দ। বর্গাকার আসনের উপর অধিষ্ঠিত নিম্নাংশ উচ্চতার আসন দৈর্ঘের অর্দ্ধেকের অনেকবেশী—প্রায় দুই তৃতীয়াংশ নিম্নাংশের আকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে রত্নের উচ্চতা যতটা হওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই; নিম্নাং হইতে রত্ন কিছুটা হ্রস্ব করিয়া গড়া। অঙ্গবিন্যাসের এই পদ্ধতি দেখিয়াছিলাম বিষ্ণুপুরের মদনমোহ মন্দির ও তাহার সমগোত্রীয় মন্দিরগুলিতে।

দেহ গঠনের অসঙ্গতি সত্বেও খানাকুল কৃষ্ণনগর ও বাঁশবেড়িয়ার মন্দিরদ্বার নিম্নাংশ ঊর্দ্ধাংশের মধ্যে যে সুস্পষ্ট ভাবগত বন্ধন বিদ্যমান তাহার কারণ সম্ভবতঃ চালা রত্নের উপস্থিতের একরত্ন মন্দিরে নিম্নাংশে চালা মন্দিরের অনুকরণে গঠিত। দেওয়াল, কার্ণিস, আচ্ছাদন সব চালা মন্দিরের নিম্নাভিমুখী কমনীয় বক্ররেখার বন্ধনে বিবৃত। শিখর রীতির সংগঠন ও বহিরে খ গতিভঙ্গে ভাবকল্পনার চরিত্র ভিন্নরূপ। শিখররত্ন সংযোজনে তাই নিম্নাংশ ও ঊর্দ্ধাংশের মে

বৈপরীত্য অনিবার্য্য হইয়া উঠে। একরত্ন মন্দিরের কৃত্রিম ভাবকল্পনায় এ বৈপরীত্য অখণ্ডরূপ সৃষ্টির সমস্যা আরও কঠিন করিয়া তোলে। চালা-রত্ন সম্বলিত একরত্ন দেহে তো এরূপ সমস্যার কোন প্রশ্ন উঠে না। রত্নের দেহে ও নিম্নাংশে রেখা প্রবাহের অভিন্ন চরিত্র কৃত্রিম ভাবকল্পনাকে সংহতির পথে আগাইয়া দেয়। রাধাবল্লভ মন্দির ও অনন্ত বাসুদেব মন্দিরে উভয় অংশের মধ্যে সমধর্মিতার বন্ধন দেহ গঠনের অসঙ্গতি অনেকাংশে আবৃত করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে।

গুপ্তিপাড়ার রামচন্দ্র মন্দিরে (নির্ম্মাণকাল আনুমানিক অষ্টাদশ শতকের মধ্যকাল) নিম্নাংশের গঠন বিষ্ণুপুরের সমুন্নত নিদর্শনগুলির মতই নিম্নাংশের সহিত রত্নের সম্পর্ক এখানে পৃথকভাবে কল্পিত। পার্থক্য সৃষ্টি হইয়াছে রত্নদেহ সঙ্কোচনের মাধ্যমে। আচ্ছাদনের উপর যেটুকু স্থান লইয়া রত্নের অবস্থান তাহা বিষ্ণুপুরের লালজী মন্দির ভিন্ন অন্য সমস্ত মন্দিরের তুলনায় সংক্ষিপ্ত। উচ্চতাও ইহার দেওয়াল অপেক্ষা কম। রত্নদেহের সঙ্কোচন ইতিপূর্ব্বেও হইয়াছে কিন্তু নিম্নাংশের সবিশেষ উচ্চতা অথবা রত্নদেহের অসঙ্গতি কিংবা নিম্নাংশের সহিত সামঞ্জস্যহীনতায় সঙ্কোচনের ফল হইয়াছে বিপরীত। বর্তমান নিদর্শনে কিন্তু রত্নদেহের সঙ্কোচনে মন্দিরের সামগ্রিক রূপকল্পনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া করা।

মন্দিরটির রূপকল্পনায় নিম্নাংশের প্রাধান্য অনস্বীকার্য্য। বস্তুত মন্দিরদেহের সবটুকু আকর্ষণ কেন্দ্রীভূত হইয়াছে নিম্নাংশের মধ্যে। রত্ন এখানে নিম্নাংশের অলঙ্কার স্বরূপ। ইহাতেই তাহার সার্থকতা। একরত্ন মন্দিরে রত্নের স্থান যে কি সে কথা তো আলোচনা প্রসঙ্গে অনেকবার বলিয়াছি। রত্নের মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিয়া মন্দিরদেহের উভয় অংশের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টির প্রয়াস ছিল বিষ্ণুপুর স্থপতিদের লক্ষ্যকেন্দ্র। রামচন্দ্র মন্দিরে কিন্তু ভাবকল্পনার অগ্রগতি অন্যপথে। রত্নের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের নীতি পরিহার করিয়া নিম্নাংশকে লইয়াই অখণ্ড দেহের কল্পনা। তাহার অন্তর্নিহিত রূপসম্ভাবনাকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্যেই রত্নের উদ্ভব। রূপায়ণের এই পরিপ্রেক্ষিতে রামচন্দ্র মন্দিরের অঙ্গবিন্যাস। রত্নদেহের সঙ্কোচন এ ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে।

গুপ্তিপাড়ার রামচন্দ্র মন্দিরে একরত্ন ভাবকল্পনার এক সম্পূর্ণ নূতন সম্ভাবনা পরিদৃশ্যমান। প্রচলিত ঐতিহ্য অনুসারে একরত্ন দেহে উভয় অংশের মর্য্যাদা সমান। এই নীতি উপেক্ষা করিয়া কোন একটি অংশ প্রাধান্য অর্জন করিয়া নিলে বিপর্য্যয় যে অনিবার্য্য হইয়া উঠে আলোচনা প্রসঙ্গে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। রামচন্দ্র মন্দিরের স্থপতি উভয় অংশের সমমর্য্যাদার নীতি পরিহার করিয়া নিম্নাংশকে করিয়া তুলিয়াছেন রূপকল্পনার একমাত্র কেন্দ্রস্থল। ঊর্দ্ধাংশে রত্নটির দৈহিক গঠন পৃথকভাবে হইলেও ভাবগতভাবে ইহা নিম্নাংশের স্বাভাবিক পরিণতির ফল। রত্ন গঠনে সূক্ষ্ম পরিমাণবোধ ও তাহার চালা আচ্ছাদনের রেখা প্রবাহে ভাবগত বন্ধন হইয়া উঠিয়াছে দৃঢ়বদ্ধ। সুদীর্ঘকালব্যাপী চর্চ্চায় বিষ্ণুপুরের স্থপতিবৃন্দ একরত্ন দেহে ভারসাম্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন কিন্তু অন্তর্নিহিত কৃত্রিমতা লোপ করিয়া দিতে পারেন নাই। রামচন্দ্র মন্দিরের স্থপতি একরত্ন দেহে মৌলিক কোন পরিবর্তন না করিয়া নির্দিষ্ট ভাবকল্পনার মধ্যেই উভয় অংশের একঙ্গীকরণে সমর্থ হইয়াছিলেন ইহাই বোধকরি তাঁহার কৃতিত্বের শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনস্টাইন, বন্ধুত্ব-ইতিহাস

অশ্রুকুমার সিকদার

গীতাঞ্জলি ও তৎপরবর্তী গ্রন্থপ্রকাশ

ইতিমধ্যে রোটেনষ্টাইনের প্রস্তাব অনুসারে India Society Gitanjali' প্রকাশের ব্যবস্থা করে—'that beautiful edition which very soon afterwards fetched high prices at Christies.' মাত্র ৭৫০ কপি ছাপানো হয় এবং নবেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। ইয়েটসের ভূমিকাসহ সেই গ্রন্থ রাজকবি ব্রিজেস পেলে যে চিঠি লেখেন তার অংশ বিশেষ হোন্ লিখিত ইয়েটস্-জীবনীতে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

Binyon brought us Tagore's poems with your lovely preface. What a delight it was ! Oh, most blessed one ! There is no one but you who could have write so. He told me it was coming out in a cheap edition…

ম্যাকমিলান কোম্পানি এই 'cheap edition' প্রকাশ করে। এই ব্যবস্থার কৃতিত্ব প্রায় পুরোপুরি রোটেনষ্টাইনের। দ্বিধাগ্রস্ত ম্যাকমিলান কোম্পানিকে তিনিই এই কাজে সম্মত করান—

I wrote to MacMillan, with a view to his publishing a popular edition of Gitanjali, as well as other translations which Tagore had made ; MacMillans finally published all Tagore's books to his profit, and their own (Men and Memories II).

জর্জ ম্যাকমিলান এই প্রস্তাব সম্বন্ধে যে চিঠি লেখেন সেটিও হুটন গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। কোম্পানির কাগজে টাইপ করা ২৬শে নবেম্বর ১৯১২ তারিখের সেই চিঠিটি এই—

Dear Mr. Rothenstein,

We have now received a report from our reader on the poems and other writings of the Bengali poet, Rabindra Nath Tagore, and I am glad to tell you that he shares the favourable opinion of the poems already expressed by other able critics. He thinks, however, that it would be well to proceed by stages in bringing his work before the English public. As you yourself pointed out to me, some of the material which you left here after the printed volume is not as good as the rest and there would be need of careful selection. What our adviser suggests is that we should in the first instance bring out the India Society's volume in a more popular form and at a lower price, e. g. 4/6 or 5/- net and see how that takes. If it went off well it could be followed by another volume of verse carefully edited and possibly also a volume of dramatic dialogues. The

collection of essays and short stories, which seem to be badly translated, he thinks might at any rate for the present be set aside.

We shall be glad to carry out this suggestion and to publish the volume in question at our own risk giving the author half of any profiits that may be realised. We should of course do our best to work the book in the Indian market as well as here and in America.

I am,

Yours very truly

George A. MacMillan

'Gitanjali'র সমাদরে উৎসাহিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ এই সময় তর্জমার কাজে প্রায় সম্পূর্ণ সময় দিতে শুরু করেছেন। কন্যা মীরা দেবীকে তিনি ১০ই আশ্বিন ১৯১৯ তারিখে লিখছেন (চিঠিপত্র ৪)

চিত্রাঙ্গদা মালিনী এবং ডাকঘর তর্জমা করেছি সেইগুলি ছাপাবার জন্যে আমার বন্ধু রোটেনষ্টাইন খুব উৎসাহ করচেন। তাছাড়া 'শিশু' থেকে এবং অন্যান্য বই থেকেও অনেকগুলি তর্জমা করেছি। সব শুদ্ধ কম জমেনি।

এক বৎসরের মধ্যে 'Gardener' প্রকাশিত হল। 'শিশু'র তর্জমাগুলি সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হলো 'The Crescent Moon'। এই সম্পর্কে ১৯১২ সালের ২১শে আগষ্ট তারিখে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিটি (শারদীয় দেশ, ১৩৭৩) উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

আমি 'শিশু'র গোটাকতক কবিতা তর্জমা করেছি। সেগুলি এঁদের খুব ভালো লেগেছে। Rothenstein-এর ইচ্ছা অবন কিংবা নন্দলাল যদি গোটা তিনচার ছবি করে দিতে পারেন তাহলে একটা ছোট বই করে ছাপতে দেন। অবনের হাত থেকে চটপট ছবি বের করা শক্ত অতএব নন্দলাল যদি শীঘ্র গোটা কয়েক ছবি করে পাঠাতে পারেন ভালো হয়। অক্টোবরের মধ্যে আমাদের পাওয়া চাই। Reproduction খুবই ভালো হবে।

অবশেষে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পাঁচটি, অবনীন্দ্রনাথের দুটি ও নন্দলালের একটি ছবিতে অলঙ্কৃত হয়ে পুস্তকটি প্রকাশিত হয়। 'শিশু'র কবিতা তর্জমার ব্যাপারে রোটেনষ্টাইনের পুত্রকন্যার পরোক্ষ দান আছে বলে আমি অনুমান করি। 'পথের সঞ্চয়ের' 'বন্ধু' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

ইহার দুটি ছোটো ছেলে ও ছোটো মেয়ের মধ্যে বাল্যবয়সের চিরানন্দময় নবীনতার উচ্ছ্বাস দেখিতে আমার ভারী ভালো লাগে।

বাটারটন থেকে ১৯১২-য় ৫ই আগষ্ট তিনি বন্ধুকে লিখেছেন—

I hope you are enjoying your holiday and shaking off your fatigue. I am sure that the dear children are having a jolly time of it in the country. When last evening the people of this house went to church leaving Pratima and myself alone in the drawing room to have a good long talk in Bengali after a long time

the first objects of our conversation were your children.

এই বালকবালিকাদের তিনি গভীরভাবে ভালোবেসেছিলেন এবং নিজের কবিতার সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটানোর জন্যই হয়তো তিনি এতো সত্বর 'শিশুর' তর্জমায় হাত দিয়েছিলেন। (১)

রবীন্দ্রজীবনী ২-তে উদ্ধৃত একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—কাল রাত্রে ইয়েটসের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ডাকঘরের তর্জমা তাঁর খুব ভালো লেগেছে। ওটা তিনি তাঁর আইরিশ থিয়েটারে অভিনয় করবার জন্য উৎসুক হয়েছেন।…'রাজা' তর্জমা…কাল রাত্রে Yeatsকে দিয়েছি, আমার বিশ্বাস, এইটেই আমার সকল লেখার চেয়ে এঁদের ভালো লাগবে।

রবীন্দ্রনাথ আর্বানা থেকে ১৯১২-র ১৪ই ডিসেম্বর মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে (শারদীয় দেশ ১৩৭৩) রোটেনষ্টাইনের যে পত্রাংশ উদ্ধৃত করেন তা থেকেও ইয়েটসের মত জানা যায়—

Yeats thinks The Post Office a master piece and would like the Dublin Theatre people to produce it. He is taking the matter over with the Irish Theatre people.

'ডাকঘরে'র তর্জমা করেন দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। অ্যাবি থিয়েটারে 'Post Office'-এর প্রযোজনা করছেন ইয়েটস এবং সেই অভিনয়ের বিবরণ ১৯১৩ সালের ১৯শে মে-র ডেইলি এক্সপ্রেস্ কাগজে প্রকাশিত হয় (চিঠিপত্র ৪)। ইয়েটস-ভগ্নী কুয়ালা প্রেস থেকে এই নাটকের শোভন সংস্করণ প্রকাশ করলেন এবং ভূমিকার শেষ কয়ছত্রে ইয়েটস্ লিখলেন—

On the stage the little play shows that it is very perfectly constructed, and conveys to the right audience an emotion of gentleness and peace.

'Post Office' সম্বন্ধে এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ রোটেনষ্টাইনকে লিখলেন (১৭ জুন ১৯১৩)—

I do want the message embodied in this particular play to reach your people. This play has come out of my innermost experience, almost unconsciously almost inspite of myself, Therefore it has its message for me as much for others and I have an almost impersonal love for it.

একই বৎসরে 'রাজা'র অনুবাদ 'The King of the Dark chamber' প্রকাশিত হলো এই তর্জমা করেছিলেন ক্ষিতীশচন্দ্র সেন। কিন্তু অনুবাদক হিসাবে তাঁর নাম কোথাও ছাপা হ নি দেখে রবীন্দ্রনাথ বিব্রত বোধ করেন এবং এবং অনুবাদের আরো সংস্কারের ইচ্ছা ছিল বলে তি সহসা গ্রন্থপ্রকাশে খুব খুশি হতে পারেন নি। এ বিষয়ে তিনি রোটেনস্টাইনকে শান্তিনিকেত থেকে লেখেন—(৮ই জুলাই ১৯১৪)—

I was rather surprised to receive from Mac Millans copies of The King the Dark Chamber. I had no idea that they were going to bring it out so soo and I was not prepared for it. The manuscript that you had with you was th first draft and in the later ones the translation have undergone such a vast de

of alterations that it is quite a different thing now. So I was rather put out at the sudden appearance of the book with all its crudities, but it cannot be helped. But the worst of it is that I am not the translator—it was an Indian student. Kshitish Chandra Sen, who translated it for me. I have cabled to Mac Millans to make correct announcement—please see that it is done properly. It places me in a very awkward situation with Mr. Sen.

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের প্রতি যে অবিচার করা হয় নি, রবীন্দ্রনাথের এই নির্দেশের পরেও ক্ষিতীশচন্দ্র সেনের প্রতি কেন সেই অবিচার করা হলো তার কারণ বোঝা যায় না। আজো 'The King of the Dark Chamber'-এ অনুবাদক হিসাবে ক্ষিতীশচন্দ্র সেনের নাম মুদ্রিত হয় না।

একের পর এক বই প্রকাশিত হচ্ছে এবং সেই বইয়ের কোথায় কোন সমালোচনা বেরুচ্ছে তার খবর বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো রোটেনস্টাইন রবীন্দ্রনাথের পরিবর্তনমান ঠিকানায় পাঠিয়ে চলেছেন। Times Literary suppliment 'Gitanjali'-র সমালোচনা করে লিখলো—

...in reading these poems one feels, not that they are the curiosities of an alien mind, but that they are prophetic of the poetry that might be written in England if our poets could attain to the same harmony of emotion and idea...As we read his pieces we seem to be reading the Psalms of our own time.

সেই কথা রবীন্দ্রনাথকে জানালে তিনি ইলিনয় রাজ্যের আর্বানা থেকে রোটেনষ্টাইনকে লিখলেন (১৯ নবেম্বর ১৯১২)—

I am glad to learn from your letter that my book has been favourably criticised at the Times Literary Supplement. I hope the paper hae been forwarded to me and I shall see it in a day or two. My happiness is all the more great because I know such appreciations will bring joy to your heart. In fact, I feel that the success of my book is your own success. But for your assurance. I never could have dreamt that my translations were worth anything and upto the last moment I was fearful that you should be mistaken in your estimation of them and all the pains you have taken over them should be thrown away. I am extremely glad that your choice has been vindicated and you will have the right to take pride in your friend, supported by the best judges in your literature.

আবার Atheneum পত্রের সমালোচনা পেয়ে একই ঠিকানা থেকে লিখলেন (১৫ই ডিসেম্বর ১৯১২)—

I have read the review of my book that appeared in the Antheneum. Do you know, that is the kind of critism I expected all along. It is not hostile, you

can even call it appreciative, but you feel that the reviewer is at a loss how to estimate these poems. He has not got a standard by which to judge these productions quite strange to him. He sees but beauty in them but they arouse no real emotion in him, so he imagines them as cold—he thinks they have no red life blood in them. He cannot believe they are quiet and simple, not because there is lack of enthusiasm in them but because they are absolutely real. I can assure you they are not literary productions at all, they are life productions.

Nation পত্রে সমালোচনার জন্য শ্রীযুক্তা মুরকে ধন্যবাদ দেবার জন্য তিনি রোটেনষ্টাইনকে যে চিঠি লিখলেন (৩০শে ডিসেম্বর ১৯১২), তাতে তিনি বললেন তাঁর কবিতা শুধু সাহিত্য মাত্র নয়—

They are revelations of my true self to me. The literary man was a mere amanuensis—very often knowing nothing of the true meaning of what he was writing. (২)

'Gardener'-এর বিরূপ সমালোচনা পড়ে বোলপুর থেকে বন্ধুকে লিখলেন (৭ নবেম্বর ১৯১২)—

I find that the Gardener is not having very warm reception from your critics but as I have had in Gitanjali much more than my deserts could be I can afford to climb down a great deal this time to reach my normal level which is the safest resting place for a man.

যে কোনো রচনা ইংরেজিতে প্রকাশ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কাছে রোটেনষ্টাইনের মতের মূল্য ছিল সর্বাধিক—এই চিত্রীর মনীষা এবং সাহিত্যবোধে তাঁর এতোটাই আস্থা জন্মিয়েছিল। তখনো অজ্ঞাতপরিচয় তিনি, মার্কিনদেশে বন্ধুমণ্ডলীর কাছে সেই প্রবন্ধগুলি পাঠ করছেন যেগুলি পরে 'Sadhana' নামে প্রকাশিত হয়। আর্বানা থেকে (২৩শে ডিসেম্বর ১৯১২) বন্ধুকে জানালেন—

I have been reading some papers to a circle of friends here.১৫ They have been quite enthusiastically received. They ask me to publish these to the leading magazines here. But I must submit them to your judgement first before I should think about their publication.

এই বক্তৃতাবলীর বিষয়বস্তু যে তিনি ইতিপূর্বেই বোলপুরের ছাত্রদের সামনে বাংলায় বলেছিলেন সে কথাও পরে তিনি বন্ধুকে জানান। বোলপুর থেকে আশ্রমের আর্থিক দায়দায়িত্ব ও দুরবস্থার কথা জানতে পেরে বিব্রত কবি যখন মার্কিনদেশে উৎকৃষ্টতর আর্থিক ব্যবস্থার বিনিময়ে গ্রন্থপ্রকাশে উৎসাহী তখনো তিনি রোটেনষ্টাইনের পরামর্শের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। ১৯১৩ সালের ১৬ই জানুয়ারি তিনি লিখছেন,

If publishers could be had in America for my children's poems or some of

my plays offering better terms that I could expect from English publishers should I close with them. Dr. Lewis of Chicago told my son that publishers here are much more liberal and prompt with their cash than are on your side. Of course I shall go by your advice and won't do anything rash.

রচেস্টারে Congress of Religious Liberals-এর সামনে প্রদত্ত 'Race Conflict', হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এমার্সন হলে প্রদত্ত 'Problem of Evil' বক্তৃতার প্রতিলিপি কবি রোটেনষ্টাইনকে পাঠাচ্ছেন তাঁর মতামতের জন্য এবং লিখেছেন রচনা দুটি যথাক্রমে তিনি হিবার্ট জার্নাল ও মডার্ন রিভিয়ুতে প্রকাশ করতে চান। 'Sadhana' বক্তৃতাবলী পাঠানোর পর রোটেন-ষ্টাইনের চিঠি পেয়ে মনে বল পাচ্ছেন এবং উত্তরে লিখছেন (৯মে ১৯১৩)—

But your letter has given me assurance that these have not been written in vain.

Nation পত্রে কয়েকটি তর্জমা পাঠানোর জন্য তিনি রোটেনষ্টাইনের মত চাইছেন এবং লিখছেন এনড্রুজ যে গল্পগুলি অনুবাদ করেছেন সেগুলিও সম্পূর্ণ হলে তাঁর অনুমোদনের জন্য পাঠাবেন (বোলপুর ২৩ জুলাই ১৯১৪)।

নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হবার পরেও রবীন্দ্রনাথের 'Fruit Gathering' এবং 'Lover's Gift' যখন প্রকাশিত হতে চলেছে তখনো রোটেনষ্টাইনের রুচি ও সাহিত্যবোধের উপর অবিচল আস্থায় তিনি নির্ভরশীল। ১৯১৫-র ২০ আগস্ট তিনি রোটেনষ্টাইনকে লিখলেন—

I have got ready two of my Mss of poems. One, of the type of the Gitanjali, I have named "Fruit Gathering" and the other of that of the Gardener, "Lover's Gift". I shall send typed copies to you next mail for your opinion.

রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ পেয়ে ম্যাকমিলান কোম্পানি রোটেনষ্টাইনকে লিখলো (১০ মার্চ ১৯১৬)—

At the request of Sir Rabindranath Tagore we are sending you typewritten copies of his new volumes entitled Fruit Gathering and Lover's Gift. Perhaps he has written to you on the subject, and, if he has asked you to suggest any alterations in the language we shall be greatly obliged if you will go through the poems and let us have your suggestions as soon as possible. (৪)

একটি চিঠিতে (১৮ সেপ্টেম্বর ১৯১৯) রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই রোটেনষ্টাইনকে জানিয়েছেন—

Yonr appreciation of my book I value more than all the favourable criticism I read in the papers. For your insight reaches not merely the literary worth of a writing but its humanity.

(১) এই ভালোবাসার বহু প্রমাণ পত্রাবলীতে। কন্যা রাচেলের বিষয়ে লিখছেন (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৫), রাচেলকে ডাক টিকিট পাঠাচ্ছেন (১লা জানুয়ারি ১৯১৭)। 'Intricacies

of aerial navigation' সম্বন্ধে জন (বর্তমানে সার জন, খ্যাতনামা শিল্পসমালোচক) যে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছে তাতে তাঁর আনন্দের কথা রোটেনস্টাইনকে জানাচ্ছেন (এপ্রিল ২১, ১৯১৪)। ১৯১৭-র ২৬ অক্টোবর লিখছেন—"Give my love to dear children and tell them not to grow too frst before I come to see them. Becomse that will be unfair to me who can only' grow older without growing at all" সম্প্রতি প্রকাশিত আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ড "Summer's Lease'-এ জন রোটেনষ্টাইন উল্লেখযোগ্য শৈশবস্মৃতির মধ্যে পল্লীনিবাসে ইয়েটসের 'Solemn, incantatosy voice'-এ 'Gitanjali' থেকে পাঠের কথা উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—'One of the most lovable people I have been privileged to know.' রাচেলের চিঠি পেয়ে রোটেনষ্টাইনকে ২রা জানুয়ারি ১৯১৮ তারিখে লিখছেন—"Her letters sent me longing to sail away and have longling chatter with your children." মাত্র কয়েকদিন পরে ২৫শে জানুয়ারি রোটেনষ্টাইনে সন্তানদের লিখলেন—"How sweet of you, my children, not to have forgotten me, surrounded as you are by young thing that clamour for your attention···when you send me your love and write such dear letters it makes me feel ridiculously young···My Calcutta house just now is like a ripe pea-pod full to point of bursting. I have about forty boys brought down from my Bolpur School. They are everywheie, turning everything into playthings. We are busy getting up a play with their help...I wish you could come and take part." পুত্রকন্যার ফোটো পেয়ে মন্তব্য করছেন ১৯১৮-র ৭ই অক্টোবরের চিঠিতে, ১৯১৯-এর ৬ই ডিসেম্বরের চিঠিতে, ১৯১৯-এর ৬ ডিসেম্বরের চিঠির সঙ্গে রাচেলকে উপহার পাঠাচ্ছেন 'old Japanesa paper money of historical value'।

(২) এই সময় 'চিত্রা' জীবনদেবতাতত্ত্ব নিয়ে প্রকাশিত হতে চলেছে। কিছুদিন আগে জীবনদেবতাবাদের ব্যাখ্যা সম্বলিত 'আত্মপরিচয়ের' প্রথম প্রবন্ধটি (১৩১১) প্রকাশিত হয়েছে। ষ্টপফোর্ড ব্রুকের প্রশস্তিপত্রে অভিভূত হয়ে তিনি এই বিষয়ে রোটেনষ্টাইনকে আবার (৬ জানুয়ারি ১৯১৩) লিখেছিলেন—It makes me aware that these writings have not come from that person who tries to appropriate to himself all the praise and the remunerations of authorship. It was a different personality whi h sang these songs. He is the •lord of the mansion who asked his friends to a feast and it is the servant who gets tips from the guests."

(৩) পাদ্রী Vale (রবীন্দ্রনাথের ১৯১২-র ২রা ডিসেম্বরের চিঠির বানান অনুযায়ী) বা Vail-এর উদ্যোগে ইউনিটেরিয়ানদের সমিতি Unity Club-এ রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি রবিবারে পর পর বক্তৃতা দেন।

(৪) ম্যাকমিলানরা যে ভাষা সংস্কারের জন্য ইয়েটসেরও শরণ নিয়েছিল তার প্রমাণ লেডি গ্রেগরিকে লেখা ইয়েটসের পত্রাংশ (১০ এপ্রিল ১৯১৬)—"I find myself overwhelmed with work—introduction to book of Japanese (plays) for my sisters—two books of verse by Tagore to revise for MacMillan who has no notion of the job it is···"

বঙ্কিম উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা

অশোক কুণ্ডু

চঞ্চলা (ইন্দিরা : ২১ পরিঃ) ॥

ইন্দিরার স্বামীর সঙ্গে ইনি রসিকতা করতে এসেছিলেন।

চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার (সীতা ১।৩) ॥

সীতারামের গুরুদেব। তিনি কেবল পণ্ডিতই নন, শাসনকার্যেও দক্ষ। চন্দ্রচূড় সীতারামকে শুধু পরামর্শই দান করেননি। তাঁর বিপদে তিনি দৃঢ়হস্তে রাজ্যের হাল ধরেছিলেন। তোরাব খাঁর সঙ্গে সীতারামের রাজ্যের দর কষাকষির ছলে কালক্ষেপ করার নীতিতে তাঁর কূটনীতিজ্ঞানের পরিচয় মেলে।

সীতারামের চিত্তবিভ্রমের সময় চন্দ্রচূড় অনেক চেষ্টা করেছিলেন রাজাকে ফেরাবার। কিন্তু অত্যাচারের মাত্রা যখন সীমা ছাড়িয়ে গেছে, তখন একদিন কাউকে কিছু না বলে তিনি তীর্থযাত্রা করেছেন। আর মহম্মদপুরে ফেরেন নি।

চন্দ্রশেখর শর্ম্মা (চন্দ্রঃ উপক্রমণিকা, ৩য় পরিঃ) ॥

বঙ্কিমচন্দ্র আলোচ্য উপন্যাসটির নাম যদি "চন্দ্রশেখর" না রাখতেন, তাহলে চন্দ্রশেখর চরিত্রটির গুরুত্ব নিয়ে সমস্যায় পড়তে হ'ত না। কিন্তু চন্দ্রশেখর চরিত্রের উপর বঙ্কিমের যে যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল, তা গ্রন্থটির নামকরণ থেকেই বোঝা যায়। অথচ উপন্যাস মধ্যে চন্দ্রশেখর নিতান্ত সাধারণভাবেই বিদ্যমান। শৈবালিনীকে বিবাহ, শৈবালিনীকে হারান এবং শৈবলিনীর প্রত্যাগমনের মধ্যে যেন সমান মনোভাব চন্দ্রশেখরের। আসলে চন্দ্রশেখর বঙ্কিমের আদর্শবাদেরই প্রতিচ্ছবি। তাই তাঁর এত গুরুত্ব।

চন্দ্রশেখর জীবনের দীর্ঘকাল অধ্যয়ন ক'রে কাটিয়েছেন। ৩২ বৎসর তাই তিনি সংসার বিমুখ ছিলেন। কিন্তু শৈবলিনী হঠাৎ তাঁর জীবনে এসে পড়লে। শৈবলিনীকে তিনি বিবাহ করলেন বটে, কিন্তু অধ্যয়নেই মেতে থাকলেন।

চন্দ্রশেখর একটু উদাসী ধরণের, কিন্তু একেবারে যে মানবচরিত্র সম্বন্ধে অজ্ঞ তা নন। তাই মাঝে মাঝে শৈবলিনীর জন্য তাঁর মনে জাগে বেদনাবোধ।—"হায়! কেন আমি ইহাকে বিবাহ করিয়াছি। এ কুসুম রাজমুকুটে শোভা পাইত—শাস্ত্রানুশীলনে ব্যস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কুটীরে এ রত্ন আনলাম কেন? আনিয়া আমি সুখী হইয়াছি, সন্দেহ নাই। কিন্তু শৈবলিনীর তাহাতে কি সুখ? আমার যে বয়স, তাহাতে আমার প্রতি শৈবলিনীর অনুরাগ অসম্ভব—অথবা আমার প্রণয়ে তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা নিবারণের সম্ভাবনা নাই। বিশেষ, আমি ত সর্বদা আমার গ্রন্থ লইয়া বিব্রত; আমি শৈবলিনীর সুখ কখন ভাবি? আমার গ্রন্থগুলি তুলিয়া পাড়িয়া,

এমন নবযুবতীর কি সুখ? আমি নিতান্ত আত্মসুখপরায়ণ—সেই জন্যই ইহাকে বিবাহ করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছিল। এ ক্ষণে আমি কি করিব? এই ক্লেশসঞ্চিত পুস্তকরাশি জলে ফেলিয়া দিয়া আসিয়া রমণীমুখপদ্ম কি এ জন্মের সারভূত করিব? ছি, ছি, তাহা পারিব না। তবে কি এই নিরপরাধিনী শৈবলিনী আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে? এই সুকুমার কুসুমকে কি অতৃপ্ত যৌবন-তাপে দগ্ধ করিবার জন্যই বৃন্তচ্যুত করিয়াছিলাম?" (১।২)

চন্দ্রশেখরের মধ্যে যদি এই আত্মানুসন্ধানটুকু না থাকতো, তাহ'লে তিনি আদর্শের পুতুল হয়ে যেতেন, পাঠকমনে মানবতার আবেদন জাগাতে পারতেন না।

চন্দ্রশেখর কেবলমাত্র পণ্ডিত নন, হস্তরেখাবিশারদও। রাজদরবারে তাঁর প্রভাবপ্রতিপত্তিও আছে। মীরকাশেমের ভাগ্যগণনার জন্য যখন তিনি বাড়ী ছেড়েছিলেন, সেই অবসরে শৈবলিনীকে ফষ্টর হরণ ক'রে চন্দ্রশেখরের সর্বনাশসাধন করল। গৃহিণীহীন গৃহে ফিরে চন্দ্রশেখর চারিদিক অন্ধকার দেখলেন। শৈবলিনীকে যে তিনি কতখানি ভালবাসতেন তা' অনুভব করতে পারলেন। তাই সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে, প্রাণাপেক্ষা প্রিয় গ্রন্থরাজিকে ভস্মীভূত করে বেরিয়ে পড়লেন পথে।

তারপর চন্দ্রশেখরকে দেখি রামানন্দস্বামীর শিষ্যরূপে উপদেশ গ্রহণ করতে। এবং বিভিন্ন কার্যে সহায়তা করতে। শৈবলিনীকে মৃত্যুর হাত থেকে রামানন্দস্বামী ও চন্দ্রশেখর রক্ষা করলেন, কিন্তু চিত্তশুদ্ধির জন্য নানাপ্রকার ক্রিয়াকলাপ আরোপ করতে লাগলেন। অনশনক্লিষ্টা, নরকভয়ে ভীতা শৈবলিনীর সামনে যে চন্দ্রশেখরকে আমরা দেখি তিনি নিরাসক্ত ব্রহ্মচারীমাত্র। কিন্তু ব্রহ্মচারীর হৃদয়েও স্ত্রীর প্রতি প্রেম প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান। তাই শৈবলিনীর মধ্যে উন্মত্ততার লক্ষণ দেখা গেলে চন্দ্রশেখর গুরুদেবকে সকাতরে প্রশ্ন করলেন—"গুরুদেব। একি করিলে? এ কি করিলে?"

তারপর রামানন্দ স্বামীর যোগভ্যাদ প্রয়োগ করে চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর কাছ থেকে জেনেছেন যে সে ইংরাজ কর্তৃক অপহৃতা হলেও অশুচি হয়নি। সমাজশাসক বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে এই প্রমাণের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের মহিমা এর জন্য কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। বিশেষ করে চন্দ্রশেখরের শৈবলিনীর প্রতি প্রেমের যে গভীরতা দেখান সম্ভব ছিল, তা ব্যর্থ হয়েছে।

চন্দ্রশেখর আবার শৈবলিনী সম্বন্ধে প্রতাপকে বলেছেন—"এক্ষণে জানিলাম যে, ইনি নিষ্পাপ। যদি লোকরঞ্জনার্থ কোন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তবে তাহা করিব। করিয়া ইঁহাকে গৃহে লইব। কিন্তু সুখ আর আমার কপালে হইবে না।"

শৈবলিনীর পবিত্রতার ব্যাপারটায় এতটা বাড়াবাড়ি না করলে চন্দ্রশেখর চরিত্রটি প্রেমের উদারতায় মহান হয়ে উঠতে পারতো। সুখ হবে না জেনেও চন্দ্রশেখরের শৈবলিনীকে গ্রহণ, রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' গল্পের চরম Tragic পরিণতি এনে দিতে পারত।

চম্পমলতা (রজনীঃ ১।৫) ॥

দ্রঃ চাঁপা (রজনী ১।৫)।

চাঁদ শাহ (সীতা : ১।৯) ॥

মুসলমান ফকিরদের মধ্যে যে ভাল লোকও ছিলেন এটা প্রমাণ করার জন্যই, 'সীতারাম' উপন্যাসের অন্য একজন অত্যাচারী ফকিরের বিপরীত চিত্ররূপে, বঙ্কিম এই চাঁদশাহ ফকিরের অবতারণা করেছেন। এই ফকির হিন্দু-মুসলমানের প্রতি সমদর্শী। বিশেষভাবে সীতারামের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রবল। গঙ্গারামের বিশ্বাসঘাতকতা বৃত্তান্ত তিনি সভায় বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই নিরীহ ভালমানুষটিও শেষপর্যন্ত সীতারামের উচ্ছৃঙ্খলতায় মর্মাহত হয়ে তাঁর রাজ্য ত্যাগ করেছেন এই বিশ্বাস নিয়ে—"যে দেশে হিন্দু আছে, সে দেশে আর থাকিব না। এই কথা সীতারাম শিখাইয়াছে।"

চাঁপা (বিষ : ৪র্থ পরিঃ) ॥

কুন্দের এক প্রতিবাসিনীর কন্যা। কুন্দের বাবার মৃত্যুর পর কুন্দকে সঙ্গ দেবার জন্য এক প্রতিবাসিনী কুন্দের সমবয়সী নিজ কন্যা চাঁপাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল। চাঁপার কাছেই কুন্দ ব্যক্ত করেছে—মার সঙ্গে তার দর্শনের অলৌকিক বৃত্তান্ত। মা'র প্রদর্শিত দু'জন ব্যক্তির একজন যে নগেন্দ্র—একথাও চাঁপার সামনেই কুন্দ প্রকাশ করেছে। শেষোক্ত ঘটনাটি সংঘটনের জন্যই বোধহয় চাঁপা-চরিত্রের অবতারণা।

চাঁপা, চম্পকলতা (রজনী : ১।৫) ॥

গোপাল বসুর বিবাহিত পত্নী। চাঁপা বড় শক্ত মেয়ে। রজনী তার সপত্নী হবে শুনে, তার বাড়ী গিয়ে বিয়ে ভাঙবার সব ব্যবস্থা করেছে।

চিকিৎসক বা মহাপুরুষ (আনন্দ : ৪।৭) ॥

চিকিৎসক বা মহাপুরুষের অলৌকিক চরিত্রটি বঙ্কিমের আদর্শের প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। উপন্যাসের শেষদিকে দু'বার ইনি উপস্থিত হয়েছেন। প্রথমে চিকিৎসকবেশে তিনি মৃত জীবানন্দকে উদ্ধার ক'রে শান্তির হাতে সমর্পণ করেছেন। কিন্তু শান্তিকে কোন উপদেশ তিনি দেননি। অকস্মাৎ অন্তর্হিত হয়েছেন। শান্তির নির্ধারিত পথ সঠিক পথ বলেই বোধহয় বঙ্কিমের আর কিছু বলার ছিল না।

কিন্তু মহাপুরুষরূপে সত্যানন্দকে ইনি কিছু উপদেশ দিয়েছেন। সত্যানন্দের কর্মোদ্যমকে স্তিমিত ক'রে ভাগ্যের বিধানকে ইনি মেনে নিয়েছেন। আসলে বঙ্কিম ইতিহাসের বিধানকে অমান্য করে কাহিনীকে অবাস্তব করতে চাননি। তাই ইংরেজ রাজত্বই কায়েম থাকল। তবে ইংরাজের প্রতি বঙ্কিমের যে মনোভাব তা অনুরক্ত ভক্তের নয়, জাতিগঠনকারী মহামানবের। তাই আমাদের দেশে বহির্বিষয়ক জ্ঞানের জন্য যে ইংরাজরাজত্বের প্রয়োজন আছে একথা তিনি মহাপুরুষের মুখ দিয়ে ব্যক্ত করেছেন।

স্তিমিত

বঙ্কিম-সাহিত্যে 'স্তিমিত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে নির্বাণোন্মুখ এই অর্থে। কিন্তু চিরায়ত আভিধানিক উল্লেখ কিংবা প্রথাসিদ্ধ সাহিত্যিক প্রয়োগ প্রকৃতপক্ষে এ অর্থবহন করে না। স্তিমিত প্রদীপ হল নিষ্পন্দ প্রদীপ, নিষ্প্রভ আলো নয়। অনুরূপ ভাবে স্তিমিত লোচনের অর্থ অনিমেষ নেত্র, অর্ধনিমীলিত চোখ নয়। স্তিমিত গতি যথার্থই স্থির বেগ, কিন্তু মন্দ বেগ নয়।

এ ধরণের কিছু সংখ্যক শব্দ আছে যাদের ধ্বনিসৌষম্য ও শ্রুতিমধুরতা স্বাভাবিকভাবেই লেখকদের অতিমাত্রায় আকৃষ্ট করে থাকে। কিন্তু সামান্য অনবধান হলেই স্খলনের আশঙ্কা আসে। যেমন আধুনিক বাংলা সাহিত্যিকেরা মেঘে ঢাকা আকাশে স্তিমিত জ্যোৎস্নার দেখা পেয়ে থাকেন, কুসুমিত তরু শাখায় স্তিমিত কোরক তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আর যাত্রীবাহী গ্রাম্যশকট চিরাভ্যস্ত স্তিমিত গতিতে অগ্রসর হয়। সাহিত্য অভিধান হলে হয়তো ত্রুটি মার্জনা করা যেতো, শুদ্ধিপত্রে মুদ্রিত করা চলতো 'পূর্বমস্য চঞ্চলার্থো ভ্রমাল্লিখিত'। এ ধরণের ভ্রম সংশোধিত হয়েছিল শব্দ কল্পদ্রুমে, যার মূল গ্রন্থাংশে অমরকোষ বা উইলসনের অভিধানের অনুরূপ স্তিমিত শব্দের অর্থ তরল বা চঞ্চল বলে উল্লিখিত হয়েছিল।

কিন্তু বক্ষ্যমান অর্থ যে স্পষ্টই ভ্রান্তিবিলাস, সংস্কৃত প্রয়োগে তার প্রমাণ নিতান্ত অপ্রচুর নয়। সেখানে শব্দটির প্রামাণিক অর্থ আর্দ্র, ধীর বা অচঞ্চল। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে নিষ্প্রভ শব্দটিরও অর্থবহ।

রঘুবংশের ষোড়শ সর্গের চতুর্থ শ্লোকে আমরা পাই অর্ধরাত্রে অযোধ্যানগরীতে রাজপ্রাসাদের 'স্তিমিত প্রদীপ শয্যাগৃহে' অধিদেবতার প্রবেশ দৃশ্য। কিন্তু যেহেতু মল্লিনাথ স্তিমিত শব্দের ব্যাখ্যা করেন নি সেহেতু এ অংশে অর্থসংগতি অস্পষ্ট: রাজগৃহের নিশীথ প্রদীপটি নিষ্পন্দ বা নিষ্প্রভ ছিল তা বিবেচনাধীন। কিন্তু রঘুবংশের উনবিংশ সর্গে কবির অভিপ্রেত অর্থ কিছু ধূসর নয়। বায়ুহীন শয়নকক্ষে 'স্তিমিত দীপে'র পাঠোদ্ধার মল্লিনাথ করেছেন 'নিশ্চল'। এই অর্থ গ্রহণ করলে বর্ণনার সামঞ্জস্য রক্ষা সম্ভব হতে পারে।

কালিদাসের ধ্যানস্তিমিতলোচন, নিবাতপদ্মস্তিমিত চক্ষু, বিস্ময়স্তিমিত নেত্র, সংযমস্তিমিত মন, স্তিমিতপ্রবাহা সরিৎ, স্তিমিত জব পুষ্পক—সবই স্তিমিত শব্দের নিষ্কম্প অর্থ প্রকাশ করে থাকে। অনুরূপভাবে মহাভারতের স্তিমিত সেনাদল, স্তিমিত সভাসদবর্গ, ভাগবতের স্তিমিতোদ অর্ণব, ভারবির স্তিমিত সমাধি, ভবভূতির স্তিমিত মহোদধি কিংবা কলহণের নিবাতস্তিমিত দীপ—এ সমস্তও এই অর্থ সমর্থন করে।

আবার রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে রাবণের ভয়ে ভীত গোদাবরী নদী স্তিমিত গতি অবলম্বন

করেছিল : স্তিমিতং গন্তুমারেভে ভয়াদ্‌ গোদাবরী নদী। গোদাবরী নিঃশব্দে প্রবাহিত হয়ে চলল, আদিকবি এই অর্থেই বোধহয় পদটি ব্যবহার করেছেন। কালিদাসের সাহায্যে একেবারে স্বতঃসিদ্ধতায় উপনীত হওয়া সম্ভব।

কিঞ্চিৎ প্রকাশ স্তিমিতোগ্রতারৈঃ—কুমারসম্ভব ৩।৪৭; নাসাগ্রনিবদ্ধদৃষ্টি মহাদেব নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপের মতো ধ্যাননিমগ্ন। তাঁর পক্ষপঙক্তি নিষ্পন্দ, ভ্রূযুগল নির্বিকার, কিঞ্চিত প্রকাশিত তারা স্তিমিত। এ ক্ষেত্রে স্তিমিত শব্দের অর্থ নিষ্পন্দ হওয়া সংগত।

অর্পিত স্তিমিতদীপ দৃষ্টয়ো গর্ভবেশ্মসু নিবাতকুক্ষিষুঃ রঘুবংশম ১৯।৪২; প্রমোদ বিলাসী রাজা অগ্নিবনের বিহারগৃহের নিবাত কুক্ষিতে স্তিমিত দীপ রক্ষিত থাকে। বায়ুহীন গৃহকোণ—সুতরাং এ ক্ষেত্রে অচঞ্চল অর্থই স্বাভাবিক।

রথেনানুদ্‌ঘাতস্তিমিতগতিনাতীর্ণজলধিঃ পুরা সপ্তদ্বীপাং জয়তি বসুধামপ্রতিরথ : শকুন্তলা ৭।৩৩, ভরত উত্তরকালে উদ্‌ঘাতহীন স্তিমিতগতি রথে সমুদ্র পার হয়ে সপ্তদ্বীপা বিশ্বজয় করুন : মারীচ ঋষির আশীর্বাদ। বসুধা বিজয়কালে রথের বেগ নিষ্কম্প হওয়ারই কথা। অতএব স্তিমিত শব্দের পূর্বোল্লিখিত অর্থই সুসংগত। অর্ধস্ফুট, নিষ্প্রভ বা মন্থর এ সমস্ত ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত নয়।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে এক প্রকার শৃঙ্গারদৃষ্টির পারিভাষিক নাম স্তিমিত। স্বগোচরান্ন চাল্যেত যৎ তৎ স্তিমিতমুচ্যতে : প্রিয়জনে নিবদ্ধ অবিচল দৃষ্টিকে স্তিমিতদৃষ্টি বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। মালতীমাধবে এই অর্থেই স্তিমিতবিকসিত শব্দটি ব্যবহার করেছেন ভবভূতি—প্রচলিত মুকুলিত অর্থে নয়।

অশোক ভট্টাচার্য

[প্রেসের অসাবধানতাবশতঃ আষাঢ় সংখ্যা 'সমকালীনে'র আলোচনায় লেখক মিহির সিংহর স্থলে মিহির সেন ছাপা হয়েছে। এজন্য আমরা দুঃখিত। —সম্পাদক]

রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয় ॥ ক্ষুদিরাম দাস। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি প্রাইভেট লিঃ। দাম বারো টাকা।

একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র কাব্যের সম্পূর্ণাঙ্গ আলোচনা যে দু-একটি গ্রন্থে আছে তাদের মধ্যে রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ডঃ দাস সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে তাঁর নিপুণ দক্ষতাকে কাজে লাগিয়েছেন আশ্চর্য রসবোধের সঙ্গে। ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর অনুশীলনগত যোগ রবীন্দ্রভাবনার পটভূমি চিহ্নিত করতে সাহায্য করেছে। কিন্তু তিনি রবীন্দ্র সমালোচনার সেই ধারার প্রবক্তা যে ধারায় কোন প্রভাবকেই চূড়ান্ত বলে ধরে নেয় না। কবির স্বকীয়তাই এই জাতীয় সমালোচকদের কাছে একমাত্র বিচার্য বস্তু। ডঃ দাস বার বার চেষ্টা করেছেন তথাকথিত বিভিন্ন প্রভাবের জাল থেকে রবীন্দ্র প্রতিভার নিজস্বতা ও স্বকীয়তার প্রতি পাঠকদের দৃষ্টিকে বিমুক্ত করতে। উপনিষদ ও বৈষ্ণবতা রবীন্দ্রভাবাদর্শকে যে নানাদিক থেকে প্রভাবিত করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূর্বনির্দিষ্ট সংস্কারকে মূল্যাতিরিক্ত মর্যাদা দেওয়া হয়। তাই ডঃ দাস বলছেন "কবি প্রতিভার স্বরূপ অনুধাবন করাই কবিকে যথার্থ দেখা এবং সেইভাবে দেখতে গিয়ে কবিকে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে বিচার করলে চলবে না, পূর্বনির্দিষ্ট কোন সংস্কারের মলিন দর্পণে দেখলেও চলবে না এবং তাঁর চলতি পথের কোন একটা বিশেষত্বকে সমগ্র করে দেখলে খণ্ডিত দেখা হবে।…সহজভাবে কবির কাব্য-স্বরূপের অভ্যন্তরে প্রবেশলাভের প্রয়াস না করে মনঃকল্পিত তত্ত্ব আরোপ করে দেখলে কবির উপর নিষ্ঠুর অবিচার করা হবে।" পৃঃ ৭১

সম্পূর্ণ রবীন্দ্র কাব্যধারাকে রস ও রূপের বিচারে আলোচনার বিষয়ীভূত করা হয়েছে এমন গ্রন্থ বাংলায় বেশি নেই। যে দু-একখানি আছে এই গ্রন্থ সেগুলির অন্যতম। বিশাল কবিচিত্তের বহুমুখী প্রবণতা, অনুশীলনজাত নিপুণ শিক্ষা, ভাব ও ভাবনাগত রূপ বিবর্তন—এ সমস্তই যথার্থ গাম্ভীর্য সহকারে আলোচিত হয়েছে; এবং মনোযোগী পাঠক এর গভীরতায় অবগাহন করার সৌভাগ্যলাভ করেছে।

এই প্রসঙ্গে উৎসাহী পাঠকদের জানা প্রয়োজন যে এই গ্রন্থ মোটামুটি ভাবলোকের বিস্তার ও বৈচিত্র্য সন্ধান করেছে; নানা স্থানে কাব্যের রূপের আলোচনায় প্রয়াস আছে কিন্তু প্রধানতঃ কবিচিত্তের ভাববস্তুরই আলোচনা। লেখকের আর একটি সদ্যপ্রকাশিত গ্রন্থ 'চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণী'তে লেখক রবীন্দ্র কাব্যরীতির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন, তা এই গ্রন্থের পরিপূরক।

বর্তমান সংস্করণ এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ। কিন্তু উল্লেখপত্রে আছে 'নূতন প্রথম সংস্করণ।' পূর্ববর্তী সংস্করণগুলির উল্লেখ গোপন করে নূতন সংস্করণ বলার কি তাৎপর্য আমরা তা উপলব্ধি করতে পারিনি। তৃতীয় সংস্করণ বলে ঘোষণা করাই বোধহয় সবদিক থেকে শোভন হতো।

সোমেন্দ্রনাথ বসু

Regd No. C-315 Phone : 23-5155 August '67 (0'50) Central Regd. No. R.N.2502/57 SAMAKALIN

সমকালীন

পঞ্চদশ বর্ষ ॥ ভাদ্র ১৩৭৪

নিয়মাবলী

সমকালীন

প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখে) বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক ছয় টাকা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীনে' প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদি নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়। **গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না**—'সমকালীন' প্রবন্ধের পত্রিকা।

'সমকালীন'এর গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে, রসিক সমালোচকদের দ্বারা **শিল্প, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান** ও **সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ** ও **কাব্য গ্রন্থের** বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দুখানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩
এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোন ২৩-৫১৫৫

পঞ্চদশ বর্ষ ৫ম সংখ্যা

ভাদ্র তেরশ' চুয়াত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

বাংলা সাহিত্যে অবাঙালীর দান

মানব বন্দ্যোপাধ্যায়

ইতিহাস ও সাহিত্য ওতপ্রোত সংপৃক্ত। ইতিহাসের তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য সাহিত্যে প্রতিফলিত হওয়াই স্বাভাবিক। অবশ্য ইতিহাসের আদিপর্বে দেশের সামাজিক জীবনের সামগ্রিক চিত্র সাহিত্যে রূপ পরিগ্রহ করেনি। দেব-দেবীর কাহিনী আর রাজ-রাজড়ার জীবনযাত্রাই সে যুগে স্থান পেয়েছে সাহিত্যের পৃষ্ঠায়। কিন্তু ইতিহাস রচনায় যেমন সমাজের সকল স্তরের মানুষের ভূমিকা অবশ্য স্বীকার্য তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সকল শ্রেণীর মানুষের উপস্থিতি অপরিহার্য।

আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে বাংলা সাহিত্য অন্যতম প্রাচীন সমৃদ্ধ সাহিত্য। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত এর গতি অব্যাহত ধারায় প্রবাহিত। আজকের বাংলা সাহিত্যের মত অন্য কোন ভারতীয় সাহিত্য এত উন্নত ও প্রবহমান নয়। নানা জাতি নানা সম্প্রদায়ের সম্মেলন হয়েছে এই বাংলা দেশে। নানা অবাঙালী বাংলা দেশে এসেছেন। ঘর বেঁধেছেন। অঙ্গাঙ্গীভাবে বাঙালী সমাজ জীবনের সঙ্গে মিশে গেছেন। এঁদের যেমন বাংলার প্রত্যেক শাখার সঙ্গে সাজুয্য ঘটেছে তেমনি সাহিত্যের বেলাতেও এঁরা সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে গেছেন। বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে এইসব অবাঙালীর দান অকিঞ্চিৎকর নয়। অনেক অবাঙালী আবার নিজেদের দেশে বসেও বাংলা সাহিত্যের সেবা করেছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সামগ্রিকতা বিচার করার সময় এইসব অবাঙালীর কথাও সাহিত্যের ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে। তবে বাংলা সাহিত্যে এইসব অবাঙালীর দান সম্বন্ধে যে কোন আলোচনা হয়নি, তা নয়। কিন্তু এই সমস্ত আলোচনা সুসংবদ্ধরূপে এবং ঐতিহাসিক তাৎপর্যের পরিপ্রেক্ষিতে কেউ করেছেন বলে জানা যায় না। বর্তমান প্রবন্ধে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সেই

চেষ্টাই করা হবে।

প্রাচীনকালের বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমা সম্বন্ধে যথেষ্ট মতানৈক্য রয়েছে। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী প্রাক-স্বাধীনতা যুগের বাংলা দেশের সীমানা গ্রাহ্য হিসেবে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

সপ্তম—অষ্টম শতাব্দী

সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে প্রকৃত পক্ষে বাংলা সাহিত্যের কোন নিদর্শন মেলে না। সে যুগে প্রাকৃত-পৈঙ্গলে কিছু কিছু কবিতা লেখা হয়েছিল। কিন্তু সব কবিতাই যে বাংলা দেশের লোক ও বাঙালী লিখেছিলেন এমন কোন প্রমাণ নেই। ডক্টর সুকুমার সেন লিখেছেন: "কিন্তু প্রাকৃত-পৈঙ্গলে বীর রসাত্মক কবিতার অভাব নাই। এইসব কবিতার অধিকাংশ যে বাঙালী লেখকের লেখা এমন কথা অবশ্য বলা চলে না।"১ ডক্টর সেন কাশীর রাজমন্ত্রী বিদ্যাধরের রচিত একটি কবিতার উল্লেখ করেছেন। কবিতাটিতে কাশীশ্বর রাজার বিজয় অভিযানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। বিদ্যাধর কাশীরাজের মন্ত্রী হিসেবে উল্লিখিত হওয়ায় স্পষ্ট বোঝা যায় যে তিনি বাংলার অধিবাসী বা বাঙালী ছিলেন না। অথচ তদানীন্তন যুগে বাংলা দেশে প্রচলিত ভাষা প্রাকৃত-পৈঙ্গলে তিনি কবিতা রচনা করেছিলেন। বাংলা ভাষার উৎপত্তি সে যুগে সম্পূর্ণ হয়নি। সেটা অপভ্রংশের যুগ। সে যুগের অপভ্রংশ বাংলা ও অবহট্‌ঠ্ কবিতার তালিকা পরীক্ষা করে দেখলে কিছু কিছু অবাঙালী কবির সন্ধান যে পাওয়া যাবে তা অনায়াসে বলা যায়।

দশম—চতুর্দশ শতাব্দী

চর্য্যাপদের যুগ থেকে বাংলা সাহিত্যের পত্তন হয়েছে বলে ধরা হয়। তবে চর্য্যাগুলির সঠিক কাল নির্ণয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে চর্য্যাপদগুলির রচনাকাল।২ চর্য্যাপদগুলির তিব্বতি অনুবাদও পাওয়া গেছে। তিব্বতে স্বীকৃত ৮৪ জন মহাসিদ্ধার উল্লেখ আছে। এঁদের বেশীর ভাগই বাংলা দেশের বাইরের লোক বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ বর্তমান। কারণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্মেষ যুগে প্রান্তীয় বাংলা দেশের পাশাপাশি দেশগুলো থেকেও যে বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যরা আগমন করেছিলেন এবং সন্ধ্যাভাষায় নিজেদের চিন্তা লিপিবদ্ধ করেছিলেন তা সঠিক বলেই মনে হয়। তা ছাড়া চর্য্যাপদ রচয়িতাগণের নামের তালিকা থেকে অনেককেই অবাঙালী বলে অনুমান করা অবান্তর হবে না। তিব্বতে স্বীকৃত ৮৪ জন মহাসিদ্ধার নামের তালিকায় উল্লেখিত নাম সকল থেকে বোঝা যায় যে তাঁরা অনেকেই অবাঙালী ছিলেন। (যেমন—আর্যদেব বা কাণের, কাণেরী, হেরুক, বিরূপা বা বিরূপাক্ষ হঠযোগী প্রদীপিকায়, মহী বা মহীধর, তন্ত্রিপাদ প্রভৃতি)

চর্য্যাপদগুলো যে যুগে রচিত হয়েছিল সে যুগকে বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত যুগ বলে অভিহিত করা অনভিপ্রেত হবে না। তাই বলা যেতে পারে চর্য্যাপদগুলোর সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারা অবশ্যম্ভাবী রূপেই জড়িত।

ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে কোন উল্লেখযোগ্য রচনার কথা জানা যায় না। তবে ১৩৫০ খৃঃ

শমসু-দ্-দান ইলিয়াস শাহ বাংলায় স্বাধীন সুলতান রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করলে দেশে জ্ঞানচর্চা ও সাহিত্য সৃষ্টির পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

পঞ্চদশ—সপ্তদশ শতাব্দী

পঞ্চদশ শতাব্দীর সাধক কবি কবীর হিন্দীসাহিত্যের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কবি। কবীরের কবিতা প্রধানত পশ্চিমা হিন্দীতে হলেও তাঁর মাতৃভাষা ও ভোজপুরীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।৩ শুধু ভোজপুরীর প্রভাবই নয় কবীরের দোঁহাকে ভোজপুরীতেই লেখা বলা যেতে পারে। কবীর ভোজপুরী ও বিদ্যাপতি মৈথিলী ভাষায় তাঁদের পদ রচনা করেছিলেন।৪ আবার বাংলা মৈথিলী ও ভোজপুরী তিনটিরই মূল মাগধী প্রাকৃত বলে বাঙালীর কবীরের পদ বুঝতে কিছু অসুবিধে হয় না।

কবীর ও বিদ্যাপতির প্রভাব বাংলার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জীবনে উল্লেখযোগ্য ঋণ হিসেবে স্বীকৃত। এঁদের দুজনের সঙ্গে সঙ্গে মৈথিলী পদকর্তা গোবিন্দদাস ওঝার নামও উল্লেখ করতে হয়। এঁদের তিনজনের কথা বাংলা দেশ কোন দিনও ভুলতে পারবে না। এঁদের সঙ্গে বাঙালীর নাড়ীর সম্পর্ক স্থাপন হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে এঁদের পরিচয় অপরিহার্য।

পাঠান সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রধানত এ যুগে সাহিত্য রচিত হয়েছিল। সুলতানেরা বিদেশী হলেও জ্ঞানচর্চা ও সাহিত্য সৃষ্টির পথ খুলে দিয়েছিলেন। এ যুগে বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশের স্থল ছিল গৌড়ের রাজ দরবার। বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে অন্য দেশের প্রভাব অতি প্রাচীন কাল থেকেই পরিলক্ষিত হয়।৫ "বাংলা দেশে রাধাকৃষ্ণের প্রেম কাহিনী বহুকাল থেকে প্রচলিত থাকলেও এই কাহিনীকে অবলম্বন করে তত সহজে ভক্তিধর্মের বিকাশ হয়নি যত সহজে হয়েছিল অবলোকিতেশ্বর লোকনাথকে আশ্রয় করে। বৌদ্ধভক্তিবাদও চৈতন্য প্রবর্তিত ভক্তিবাদের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। বাংলার বাউল ও সহজিয়া মতকেও প্রভাবিত করেছিল বৌদ্ধভক্তিবাদ।"

বৈষ্ণব গীতি কবিতায় সুফী ভাবভঙ্গীর বর্ণনার আভাস ও বৈষ্ণব ভক্তিবাদে বৌদ্ধ মহাযান মতের প্রভাবও দেখা যায়। শেখ ফরীদু-দ-দীন শক্কর-গঞ্জ (মৃত্যু—১২৬৬) এই সুফী ভাবের পাঞ্জাবী সাধক ছিলেন। সাধক কবি আনন্দঘনও কিছু প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এঁর মৃত্যুকাল—১৭৩৯।

প্রাদেশিক লৌকিক আখ্যায়িকা কাব্যের দ্বারা বাংলা সাহিত্য প্রভাবিত। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী অন্য প্রদেশাগত। এই কাহিনীর প্রথম কবি কবিরাজ শ্রীধর সুলতান নুসরৎ শাহের পুত্র যুবরাজ ফীরুজ শাহের অনুগত ছিলেন। দ্বিতীয় কবি শা-বিরিদ খান নিজেই মুসলমান ছিলেন। গুণরাজ খানের (মালাধর বসু—শ্রীকৃষ্ণবিজয়) পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সুলতান রুকনুদ-দীন বারবক শাহ (১৪৫৯—১৪৭৪)।

কবি৬ আলাওলের 'মুল্লুকে ফতেহাবাদ' জামালপুরে কবির আদি নিবাস ছিল। তাঁর পিতা নবাব কুতুবের অমাত্য ছিলেন। মগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় আলাওলের কাব্য রচনা। মগধ

ঠাকুর ছিলেন আরাকান রাজ থাঙ্গা মিনতানের মন্ত্রী। থাঙ্গা মিনতানের রাজ্যকাল ১৬৪৭-৫২ খৃঃ। কবির৭ লোব্-চাদ্রাসী সমাপ্ত হয় ১৬৫৯ খৃঃ এবং কবির বদিউ-জ-জমাল ও হস্তপয়কর কয়েক বৎসর পর রচিত। কবি আলাওল মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদ্মাবতী' (১৫৪০খৃঃ) অবলম্বনে তাঁর শ্রেষ্ঠকাব্য 'পদ্মাবতী' রচনা করেন।

এ সময়কার আর একজন অবাঙালীর লেখা কাব্য গণপতি বিরচিত 'মাধবানল কামকন্দলা'।

পৌরাণিক ও লৌকিক পাঁচালী কাব্য

মাধব কন্দলী ও শঙ্করদেব রামায়ণের অংশ রচনা করেছিলেন। মাধব কন্দলী ছয় কাণ্ড ও শঙ্করদেব উত্তরকাণ্ড লিখেছিলেন। এঁরা বাংলা দেশের উত্তর পূর্ব কথ্য উপভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন। এই উপভাষা থেকে আসামী ভাষা হয়েছে। কাজেই মাধব কন্দলী ও শঙ্করদেব আসামী হিসেবে পরিগণিত হলেও তাঁরা বাংলারই প্রাচীন কবি।

সত্যরাম ৮ কবি অন্য একজন বঙ্গ-মৈথিল কবি ছিলেন। এর লেখা মহাভারত ও তার পর্ব রচনায় কিছু অনুবাদ পাওয়া গেছে। উৎকল কবি ৯ সারণ কবি কাশীদাসের পূর্ববর্তী বলে অনুমান করা হয়। তিনি মহাভারতের আদি, সভা ও বিরাট পর্ব অনুবাদ করেছিলেন।

শুক্লধ্বজের আগ্রহে (১৪৯৪-১৫৭৫) কবি অনিরুদ্ধ-রামসরস্বতী মহাভারত পাঁচালী রচনা করেন। কবি ছিলেন ব্রাহ্মণ। পিতার নাম ভীমসেন। কবির নিবাস কামরূপের অন্তর্গত পাটচৌরা (মতান্তরে চমরিয়া) গ্রাম। অনিরুদ্ধের পুত্র গোপীনাথ আত্মচরিতে লিখেছেন :

পাটচৌরা নামে আছে এক গ্রাম
সেই গ্রামেশ্বর ভীমসেন দ্বিজবর
তাঁহার সন্ততি রামসরস্বতী পাঠক শুক্লধ্বজর।

মৃগলুব্ধের বিখ্যাত কবি রামরাজা। জাতিতে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মগ ছিলেন। 'রাজা' উপাধি চট্টগ্রামবাসী মগদেরই ব্যবহৃত উপাধি। কোন কোন পণ্ডিতের মতে রামরাজা সম্ভবতঃ চট্টগ্রামবাসী বড়ুয়া উপাধিধারী মগ ছিলেন। রামবাজার লিঙ্গপ্রচারের কাহিনী ছাড়া অন্য অপর অংশে রতিদেব ও রামরাজার রচনায় আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়। রতিদেব ১৬৩৭ খৃঃ ২৭শে কার্তিক কাব্য রচনা আরম্ভ করেন।

আরাকান রাজসভা ও নেপাল রাজ দরবারে বাংলা সাহিত্যের পোষকতা

যোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল প্রধানত আরাকানে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ়ে। সেই সময় আরাকান স্বাধীন রাজ্য ছিল। আরাকান রাজের মন্ত্রী ও কবি আলাওলের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে নেপাল রাজদরবারেও চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের চর্চা অব্যাহত ছিল। এ সময়কার রচনা ধর্মগুপ্তের 'রামাঙ্ক নাটিকা'। 'রামাঙ্ক নাটিকা' সংস্কৃত নাটকের মত সংস্কৃতে-প্রাকৃতে লেখা। তবে শেষে লৌকিক ভাষায় (অর্থাৎ বাংলায়) চার অঙ্কের কথ্যবস্তু দেওয়া আছে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে নেপাল রাজ যক্ষমল্লদেবের মৃত্যুর পর তাঁর রাজ্য পুত্রেরা ভাগ করে নেন। উত্তর নেপালের রাজধানী হয় কাঠমণ্ডু (কাষ্ঠমণ্ড)। দক্ষিণ নেপাল বা মোরঙ্গ দেশের রাজধানী হল ভাতগাঁও (ভক্তগ্রাম বা ভক্তপুর)। আর একটি রাজ্য স্থাপিত হয় ললিতা-পুর (পাটন)। এই তিন রাজারই সময়ে ও আনুকূল্যে সাহিত্য রচিত হয়েছিল।

ভাতগাঁও এর ত্রৈলোক্য মল্লদেবের রাজত্বকালে (অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ও সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্ভ) একটি কৃষ্ণলীলা নাটকের ভনিতায় বাংলা ও মৈথিলে গান লেখা হয়।

ত্রৈলোক্য মল্লদেবের পুত্র জগজ্জ্যোতি মল্লদেবের নামে পাওয়া যায় হরগৌরী নাটক। নাটকে ভাষাগান আছে পঞ্চান্ন।

জগজ্জ্যোতিমল্লের পুত্র জগৎপ্রকাশমল্লের নামেও নাটক পাওয়া যায়। এঁর নামাঙ্কিত নাটকেও ভাষাগান রয়েছে বলে মনে হয়। জগৎপ্রকাশমল্লের পুত্র জিতামিত্র মল্লদেব 'মদালসাহরণ' ও 'গোপীচন্দ্র' নাটক রচনা করেন।

ললিতাপুরের সিদ্ধিনরসিংহদেবের নামও সাহিত্যের ইতিহাসে পাওয়া যাচ্ছে। কাঠমণ্ডুর রাজা কবীন্দ্র প্রতাপমল্লদেবের নামে রচনা আছে। রণজিত মল্লদেব হলেন শেষ মল্লরাজা। অনেক নাটকে এঁর ভনিতা পাওয়া গেছে। এই সকল নাটকে কিছু কিছু লৌকিক ভাষাগান থাকা স্বাভাবিক।

বৈষ্ণব সাহিত্যে অবাঙালীর দান

ষোড়শ শতাব্দীর অন্যতম বৈষ্ণব কবি দৈবকীনন্দন সিংহ। ভনিতায় কবিশেখর, শেখর রায়, শেখর প্রভৃতি দেখা যায়। সিংহ পদবী দেখে মনে হয় এর পূর্বপুরুষ বাঙালী ছিলেন না। এঁর জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে ইনি আত্মপরিচয়ের এক জায়গায় লিখেছেন :

সিংহ বংশে জন্ম নাম দৈবকীনন্দন বাপ চতুর্ভুজ নাম মা হীরাবতী
শ্রীকবিশেখর রায় বলে সর্বজন কৃষ্ণ যার প্রাণধন কুলশীল জাতি।

লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহও বাংলা সাহিত্য রচনায় পোষকতা করেছিলেন।

গৌড় দরবারে রূপগোস্বামীর সমসাময়িক কেশব ছত্রীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ছত্রী পদবী দেখে অনুমান করা যায় ইনি মূলত বাঙালী ছিলেন না।

বৈষ্ণব সাহিত্য ও বৈষ্ণব পদাবলীর পদকর্তাদের মধ্যে অনেকেই যে অবাঙালী ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নাই। সে যুগে বৈষ্ণব মহাজনরা তাঁদের জাতিগত পদবীর কথা প্রায়ই উহ্য রাখতেন। ফলে অনেকের সত্যকারের পদবী ও কুল পরিচয় রহস্যের অন্তরালে রয়ে গেছে।

'ভুবনমঙ্গল' রচয়িতা চূড়ামণি দাসের বংশ পরিচয় জানা যায় না। সম্ভবত তিনি উড়িষ্যার লোক ছিলেন।

বাংলা সাহিত্যের একটি সাধক পণ্ডিতপ্রবর দীনেশচন্দ্র সেন যে সমস্ত পদকর্তার নাম লিপি-বদ্ধ করেছেন তাঁদের অনেকেই বাঙালী ছিলেন না। যেমন—১। রতিদেব ২। শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর পণ্ডিত (১৪০৭—১৪৩৯ খৃঃ) ৩। কমরালী ৪। চম্পতি ঠাকুর, রাধামোহন ঠাকুর

পদামৃত সমুদ্রের টিকায় লিখেছেন—চম্পতির্নাম দাক্ষিণাত্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যভক্ত সমাজঃ কশ্চিৎ আসীৎ স এব গীতকর্তা। ভক্তিরত্নাকরে এর দুটি পদ উদ্ধৃত হয়েছে। ইনি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পর হরিচরণ আখ্যা গ্রহণ করেন। ৫। মাধো ইনি নীলাচলের লোক। ইনি শ্যামানন্দ-শিষ্য রসিকানন্দের শিষ্য ছিলেন। রসিকানন্দ নীলাচলের অচ্যুতানন্দের পুত্র শ্যামানন্দের শিষ্য (জন্ম—১৫৯০)। ৬। নীলাচলবাসী শিখিমাহিতীর ভগিনী প্রসিদ্ধ ৩।।০ রসিকভক্তের অর্দ্ধজন মাধবীর পদ্ও পাওয়া গেছে। ৭। আকবর এবং আকবর সাহ আলি ৮। ফকির হবির ৯। ফতন ১০। সালবেগ ১১। শেখভিক প্রভৃতি। (খোঁজ করলে আরো অনেক অবাঙালী পদকর্তার নাম পাওয়া যাবে।১০

অষ্টাদশ—উনবিংশ শতাব্দী

আর্যা হচ্ছে প্রাকৃত কবিতার সবচেয়ে বিশিষ্ট ছন্দের নাম। লক্ষ্মণ শর্মার 'চিঠার আর্য্যা' অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা বলে ধরা যায়। জঙ্গনামা ও আমীর হামজা বাংলায় মহাভারতের মত বড় বই।

রাঢ়-উড়িষ্যার প্রান্ত নিবাসী আবদুল মজিদের 'রঙ্গবাহার' অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা। কবি নিজেকে উড়িষ্যার অধিবাসী বলে পরিচয় দিয়েছেন। আত্মপরিচয়ে কবির গুরু পূর্বতন কবি সৈয়দ হামজার কথা উল্লেখ করে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলছেন :—

তার দেশ বাঙ্গালাতে মোর ঘর উড়িষ্যাতে
বালেশ্বর কটক জেলায়।১১

বিদেশীদের মধ্যে বাংলা গদ্য রচনার চেষ্টা করেছিলেন প্রথমে পর্তুগীজ ধর্মযাজকেরা। পর্তুগীজরা প্রথমে ভারতে আসেন ১৪৭৯ খৃঃ। ধর্মপ্রচারের জন্যে পর্তুগীজ যাজকদের দ্বারা লেখা বাংলা গদ্যের কথা ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখ থাকলেও তার কোন প্রত্যক্ষ নিদর্শন পাওয়া যায়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পর্তুগীজদের চেষ্টায় তিনখানি বাংলা বই লেখা হয়েছিল। এর মধ্যে মানো-এল-দ্য-আস্সম্প সাম লিখিত দু'খানা বই—১। পর্তুগীজ ভাষায় লেখা বাংলা গদ্যের ব্যাকরণ ও শব্দকোষ—Vocabulasio em Idioma Bungalla e Portuguez রচনা কাল ১৭৩৪ খৃঃ। ২। মানোএল-এর "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ"—রচনার তারিখ ১৭৩৫ খৃঃ। ডক্টর সুনীতি চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে এই বইতে (অর্থাৎ কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে) আড়াইশ বছরের আগেকার পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষাকে সাধু ভাষার কাঠামোয় উপস্থিত করার চেষ্টা দেখা গেছে। ৩। দোম্ এন্তোনিও রচিত ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ। দোম্ এন্তোনিও এদেশীয়ও জমিদার পুত্র ছিলেন। অতি শৈশবে পর্তুগীজ দস্যু কর্তৃক অপহৃত হয়ে পর্তুগীজ পাদ্রীর দ্বারা প্রতিপালিত হন। এই তিনখানা বই-ই পর্তুগালের লিসবন শহর থেকে ১৭৪৩ খৃঃ ছাপা হয়। তিনটি বইয়েরই এক পাতায় বাংলায় অন্য পাতায় পর্তুগীজ অনুবাদ ছাপা হয়েছে। এ তিনটি বইকে ইংরেজি রোমান লিপিতে বাংলা বই বলা যায়।

এন. বি. হালহেড—A Grammar of the Bengali Language—এই বই ছাপার জন্যই প্রথম বাংলা হরফের উদ্ভব হয়। মূল বই ইংরেজিতে লেখা উদাহরণে বাংলা শব্দ ব্যবহৃত। ইষ্ট

ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী স্যর চার্লস উইলকিনসন ছেনি কেটে মুদ্রণ যোগ্য বাংলা হরফ তৈরী করলেন। হালহেডও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী ছিলেন। বাংলা শেখার জন্যে শব্দকোষ ও সহজ প্রবেশও (Tutor) লেখা হয়েছিল এ যুগে।

হালহেড সংগৃহীত ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে'র পুঁথি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। পুঁথিটির লেখার সময় ১১৮৩ সালে (১৭৭৬ খৃঃ)। ১২

কেরী—মার্শম্যান—ওয়ার্ড তথা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ যুগ

ঋষি রাজনারায়ণ বসু উইলিয়ম কেরী ও অন্যান্য কয়েকজন ইংরেজের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে লিখেছেন :

হেয়ার : কশ্চিন্ পামারাশ্চ কেরী-মার্শমানস্তথা
পঞ্চগোরা স্মরেন্নিত্যম মহাপাতক নাশনম।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হল ১৮০০ খৃঃ। কেরীকলেজে যোগ দিলেন ৪ঠা মে, ১৮০১ খৃঃ। বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে আদি যুগে কেরী হেয়ার মার্শম্যান ওয়ার্ডের ইতিহাস জানা অপরিহার্য। বাংলা গদ্যের গোড়া পত্তন হয়েছিল কেরী এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের তত্ত্বাবধানে। আজকের বাংলাগদ্যের রূপ দেখে কল্পনাও করা যাবে না এর উন্মেষকালে কয়েকজন ইংরেজ পণ্ডিত একে জীবনীশক্তি দান করেছিলেন। মিশনারী ধর্মপ্রচারকদের সহায়তা ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে বাংলা গদ্য এত তাড়াতাড়ি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেত কিনা সন্দেহ। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস উনবিংশ শতাব্দী যা দিয়েছে পূর্ববর্তী কোন শতাব্দী দিতে পারেনি। আর এই উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস যে নব জাগরণের (রেনেসাঁসের যুগ বলে অভিহিত করা হয়।) সূচনা হয় তার প্রথম উদ্গাতা হিসেবে উইলিয়ম কেরীর নাম উল্লেখ করলে অত্যুক্তি হবে না। স্বয়ং কবিগুরু লিখছেন কেরী সম্বন্ধে : কেরী দেশীয় ভাষা সমূহের প্রতি অনুরাগের পুনরুদ্দীপ্তকারীদের অগ্রগণ্য। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ বাংলা গদ্যের জন্মস্থান। বাইবেলকে বাদ দিলে কেরীর নিজের লেখা 'কথপোকথন'ই বাংলায় প্রথম গদ্য সাহিত্য। এর পরেই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্যে বাংলা ব্যাকরণ আত্মপ্রকাশ করে। পঞ্চাশ হাজার শব্দ নিয়ে একটি বাংলা ইংরেজি অভিধান প্রকাশিত হয় ১৮৩৫ সালে। বিশেষজ্ঞদের মতে এই ব্যাকরণ আর অভিধানই বাংলার প্রথম বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ ও অভিধান। কেরীর আর কিছু লেখা অপ্রকাশিত থেকে গেছে। রচনা হিসেবে চারটে বই সামান্যই কিন্তু ডক্টর কেরী বাংলা বিদ্যাশিক্ষার জন্যে যে প্রেরণা দান করেছেন তার মূল্য শুধুমাত্র তাঁর রচনা এবং শিক্ষা বিস্তারে তাঁর পরিশ্রম দিয়ে করা যাবে না। কিন্তু তিনি যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন প্রকৃত মূল্যায়ন শুধু তা দিয়েই সম্ভব।

(বাংলা ভাষার ইতিহাসে)

কবিগুরু কেরী সম্পর্কে চারটি বইয়ের উল্লেখ করলেও কেরী সাহেব লিখিত সংকলিত এবং সম্পাদিত বইয়ের সংখ্যা এগারো।

১। নিউ টেষ্টামেন্ট—১৮০১। ২। বাংলা ব্যাকরণ—১৮০১। ৩। কথোপকথন—১৮০১ ৪। ওল্ড টেষ্টামেন্ট—১৮০২ (মোশার ব্যবস্থা)। ৫-৬। কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীরাম

দাসের মহাভারত ১৮০২। ৭। ওল্ড টেষ্টামেণ্ট—১৮০৩ (দাউদের গীত)। ৮। ওল্ড টেষ্টামেণ্ট—১৮০৭ (ভবিষ্যদ্বাক্য)। ৯। ওল্ড টেষ্টামেণ্ট—১৮০৯ (য়িশবালের বিবরণ)। ১০। ইতিহাস-মালা—১৮১২ (বাংলা শিশু সাহিত্যের সর্বপ্রথম সংকলিত পুস্তক বলা যায়। বইটি সম্পাদিত হয় কেরী সাহেবের দ্বারা)। ১১। বাংলা-ইংরেজি অভিধান—১৮১৫—২৫।

ডেভিড হেয়ার ১৩ (১৭৭৫—১৮৪২-১লা জুন)

১৮০০ খৃঃ ঘড়িওয়ালার কাজ নিয়ে বাংলা দেশে আসেন। ১৮১৪ রাজা রামমোহন রায় কোলকাতায় এলে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। হিন্দুকলেজ স্থাপিত হয় ১৮১৭ খৃঃ ২০ জানুয়ারী। হিন্দু কলেজ স্থাপনার সঙ্গে হেয়ারের নাম জড়িত। হেয়ারের প্রধান উদ্যোগে ও দেশীয় ভদ্রলোকদের সাহায্যে স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপিত হয়। ঐ সভার সভ্যগণ নানা প্রকার পাঠোপযোগী গ্রন্থ (ইংরেজি ও বাংলা) প্রণয়ন ও মুদ্রণের ব্যবস্থা করলেন। এই সভা স্থাপন বাংলা দেশে নবযুগের একটি প্রধান ঘটনা। বাংলা পাঠশালা স্থাপন—১৪ই জুন, ১৮৩৯ খৃঃ। হেয়ার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন ও প্রসন্ন ঠাকুর প্রভৃতি বক্তৃতা দেন।

হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও ১৪ (১৮০৯—১৮৩১)

কোলকাতার ইটালির পদ্মপুকুরের সন্নিহিত মামলালীর দরগা নামক একটি ভবনে জন্ম হয়। ইনি জাতীতে পর্তুগীজ বংশোৎপন্ন কিরিঙ্গী। বাংলা দেশকে নিজের স্বদেশ হিসেবেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দু কলেজের শিক্ষক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাসে এঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। বাংলার কোন রচনার নিদর্শন পাওয়া না গেলেও ইংরাজিতে Fakir of Jhungeera লিখে সে যুগের শিক্ষিত বাঙালীর ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দী কবিওয়ালার যুগ বলেও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

সে সময়ে আণ্টুনী ফিরিঙ্গী নামে অবাঙালী কবিওয়ালার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আণ্টুনী ফরাসডাঙ্গাবাসী একজন ফরাসীর সন্তান ছিলেন। বাল্যকালে কুসঙ্গে পড়ে বিপথে গমন করেন। পরে নিজ প্রতিভাবলে ক্রমে একজন বিখ্যাত কবিওয়ালা হয়ে ওঠেন। তিনি অতি দ্রুত মুখে মুখে কবিতা রচনা করতে পারতেন।

অবাঙালী কবিওয়ালাদের মধ্যে গোপাল উড়ের নামও করা যায়। গোপালের পুরো নাম গোপাল চন্দ্র দাস উড়ে—চেলা কৈলাশচন্দ্র বারুই ও শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়।

দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় নীলমণি পাটুনী, সাধুরায় প্রভৃতির নামও কবিওয়ালা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। পদবী ও নাম দেখে মনে হয় এঁরা দুজনে অবাঙালী ছিলেন।

মিশনারিদের চেষ্টায় সাময়িক পত্র ১৫ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গ্রীয়ারসনের (G. A. Grierson) নাম উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। তিনি 'মাণিক চন্দ্রের গান' (সপ্তদশ শতাব্দীর রচিত) ও অনেক পদ সংকলন করেছিলেন। ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে ও বিদ্যাপতির পদ সংকলক হিসেবেও

তাঁর নাম সুপরিচিত হয়ে থাকবে।

পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর (১৮৬৯—১৯১২)

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের আর একজন অবাঙালী বাংলা দেশের সাহিত্য ও সমাজ জীবনের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি হলেন মারাঠী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর। প্রধানত বাংলা দেশ তাঁর কর্মস্থল হলেও সারা ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে মারাঠী জাতির অবদান সম্পর্কে বাঙালী জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যেই বিশেষ করে মহারাষ্ট্রের জাতীয় ইতিহাস তিনি বাংলা ভাষায় রূপ দিয়েছিলেন। মহারাষ্ট্র ও বাংলার মধ্যে তিনি সেতুবন্ধের ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর রচিত ঐতিহাসিক ১৬ গ্রন্থের মধ্যে ঝাঁসীর রাজকুমার, বাজীরাও, আনন্দী-বাঈ, শিবাজীর মহত্ব, শিবাজীর দীক্ষা, শিবাজী সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি কিছুকাল বাংলা 'হিতবাদী' পত্রিকার সম্পাদনাও করেছিলেন। তবে সখারাম বিশেষ করে বাংলা তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন তাঁর রচিত 'দেশের কথা' নামক গ্রন্থের জন্যে। সেকালের যে সকল বিপ্লবী যুবক অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে দেশের কাজে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন সখারামের 'দেশের কথা' তাঁদের জীবনে আত্মোৎসর্গের প্রেরণা জুগিয়েছে।

---

১ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—পৃঃ ৩৮　২ মণীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত চর্য্যাপদ গ্রন্থ।

৩ ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়—অরিজিন এণ্ড ডেভেলাপমেণ্ট অফ বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ।

৪ ডঃ সুকুমার সেন—মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী।　৫ —প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী।

৬ বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—ভূদেব চৌধুরী।

৭ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—(ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী লিখিত সূচী—পৃঃ ৪৬৮)

৮ ও ৯ ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

১০ ঈশান নাগরের অদ্বৈত প্রকাশ ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের (আনুমানিক ১৫৬৮) রচনা বলে ধরা যায়। কুমারহট্টবাসী পুরুষোত্তম দাস ছিলেন সদাশিব কবিরাজের পুত্র। পুরুষোত্তম ভনিতার পদগুলো এঁরই রচনা বলে মনে হয়। এঁর বিশেষ কোন বংশ পরিচয় জানা যায় না। মনে হয় ইনি অবাঙালী ছিলেন। ১১ ডঃ সুকুমার সেন—বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস।

১২ এই সময়কার নাটকের ইতিহাস রুশদেশীয় ভদ্রলোক হেরেসিম লেবেডফের নাম উল্লেখ-যোগ্য। তিনিই সর্বপ্রথম ইংরেজি থেকে বাংলায় নাটক অনুবাদ করিয়ে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন।

১৩ ও ১৪ শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।

১৫ দিগদর্শন—১৮১৮। সম্পাদক জে. সি. মার্শম্যান। সমাচার দর্পণ—সম্পাদক ঐ

বঙ্গদূত—সার্জ্জুন আর মণ্টগোমারি মার্টিন বেঙ্গল হেরাল্ড নামে পত্রিকা প্রকাশ করতেন। এরই বাংলা সংস্করণ হলো বঙ্গদূত। ১৮৩২ খৃঃ ফেব্রুয়ারী থেকে জুন পর্য্যন্ত 'সমাচার দর্পণে' সম্পাদকীয় কলমে 'বাবু' নামক রচনায় সর্বপ্রথম উপন্যাসের বীজ বপন করেন উইলিয়াম কেরী।

১৬ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সাহিত্য সাধক চরিতমালা দ্রষ্টব্য।

বাংলাসাহিত্যে প্রবন্ধ

সুখরঞ্জন চক্রবর্তী

আজকাল সাহিত্যশিল্প বলতে পাঠকমনে যে ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছে, হচ্ছে না বলে বদ্ধমূল করে দেওয়া হচ্ছে বলি,, সেটি অত্যন্ত হীন এবং বিপজ্জনক। সাহিত্যশিল্প বলতে আজকাল আমরা কেবলমাত্র গল্প কাহিনী বা উপাখ্যানকেই শ্রদ্ধেয় আসন দান করে থাকি। এর বাইরে অন্য কোন সাহিত্যকর্ম যথা, কবিতা বা প্রবন্ধ ইত্যাদির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা মাত্রাতিরিক্তভাবে সংকুচিত। কবিতার প্রতি যদিও বা কিছু ভালবাসা থাকে, প্রবন্ধের প্রতি আমাদের আচরণটা একান্তই বৈমাতৃসুলভ। আমাদের দেশে কবি ছিলেন, এখনও আছেন (?), ঔপন্যাসিক এবং গল্পকারদেরও অভাব নেই কিন্তু প্রবন্ধশিল্পী ?

আমাদের ধারণা হয়েছে প্রবন্ধলেখা সাহিত্যের পদবাচ্য নয়, কেননা তাতে যথার্থ সৃজনী প্রতিভার স্ফুরণ হয় না। অতএব ওটাকে বাতিল কর। কিন্তু যথার্থ প্রাবন্ধিকের মূল্য যে সকল প্রকার সাহিত্যশিল্পীদের উর্দ্ধে, সে কথা বোঝে কয়জন ? Mature সাহিত্যকর্ম, পরিণত শিল্পসৃষ্টি হচ্ছে প্রবন্ধ, এটা বিশেষ মনন নির্ভরশীল। এর জন্য সাহিত্যিকের সাবলকত্বের প্রয়োজন হয়। নাবালক সাহিত্যিক হয় তো ডজন কয়েক কবিতা, হাফ ডজন গল্প এবং চেষ্টা করে টেনেটুনে সিকিখানা উপন্যাস লিখে ফেলতে পারেন। কিন্তু একটা প্রবন্ধ লেখার দুঃসাহস সহজে তার আসবে না। না আসাটা অবশ্য খারাপ নয়। কিন্তু দুঃখের কথা হচ্ছে এই যে, পরিণত বুদ্ধি ও মননসম্পন্ন সাহিত্যিকেরাও অক্লেশে প্রবন্ধ লেখার দায়িত্বটি এড়িয়ে যান। আর যাঁরাও এখানে ওখানে পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে থাকেন তাঁদের অনেকেরই লেখাই পঠনীয় হয় না। তার কারণ, প্রবন্ধ বলতে এই সমস্ত লেখকেরা মনে করেন যে তথ্যপঞ্জীর তালিকা নির্দেশ, দুটো চারটে উদ্ধৃতি, কোটেশান, অমুকে বলেছেন অমুক কথা,—বলতে পারলেই প্রবন্ধ লেখার দায়িত্ব বুঝি শেষ হয়ে যায়। সে কথা যাক। আমাদের সমকালীন বাংলা প্রবন্ধকারদের অনেকেরই লেখাতে যে স্বাধীন চিন্তার একান্ত অনুপস্থিতি এটাই পীড়াদায়ক।

অধুনাতন বাংলা সাহিত্যাংগণে প্রবন্ধশিল্পের এই দুরাবস্থাজনিত স্তম্ভিতউপত্যকা কিন্তু বাংলাসাহিত্যের চিরদিনকার রূপ নয়। উনবিংশ শতকে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য যেরূপ ফুলে ফলে পল্লবিত হয়েছিল তা' একান্তই শ্রদ্ধার সংগে স্মরণীয়। এই সময়ে বহু চিন্তাশীল মণীষীর দায়িত্ববোধ প্রবন্ধশিল্পের প্রতি ঝুঁকেছিল ফলে বাংলাসাহিত্যে বহু ভালো ভালো প্রবন্ধের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। আজ বাংলাগদ্যের যে বিশিষ্টরূপ আমরা দেখতে পাই তার সূতিকাগারটি ছিল এই প্রবন্ধসাহিত্যেরই ঘনমৃত্তিকা সমৃদ্ধ।

বাংলাসাহিত্যের অতীত ঐতিহ্যকে বিস্মৃত হয়ে আজ আমাদের কথাসাহিত্যের প্রতি যে শ্রদ্ধা (?) বা মাত্রাতিরিক্ত আকর্ষণ তা ভালো কি মন্দ সে বিচারে না গিয়েই একথা বলবো আজ বাংলা সাহিত্যে কবিতা বা প্রবন্ধ দুইই বিশেষভাবে অবহেলিত, অনাদৃত। আপাতদৃষ্টিতে সম্পর্কটি

নজরে পড়বে না। কিন্তু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে কারুকর্ম ও শিল্পাদর্শের দিক থেকে এদের একটা মিল আছে। ইংরেজিতে essay শব্দটির একটি ব্যাপক এবং সুবিশাল সীমা রয়েছে। সংস্কৃতিতেও তাই। ফলে, কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দিয়ে প্রবন্ধ বলতে কি বোঝায় সেটা বোঝানো যাবে না। Essay শব্দটির ব্যাপক প্রচলনের দিকে দৃষ্টি রেখে এর একটি সাধারণ সূত্র নির্দেশ করে কোন সমালোচক বলেছেন—'In general it is a composition usually in prose of moderate length and on a restricted topic. বর্তমান কালে শব্দটি to be found applied to the most diverse form of writing from the solemn and learned treatise to the most ephemeral effusion of the moment.' এককথায় নিতান্ত শুষ্ক কঠোর যুক্তিবাদী আলোচনা থেকে শুরু করে হালকা কথায় চটুল রচনা পর্যন্ত কাহিনীহীন কথা শিল্পের এলাকা বহির্ভূত সমস্ত রচনাকেই Essay বলা চলে। সংস্কৃত ভাষায় আলংকারিকেরা বলেছেন, যা কিছু প্রকৃষ্ট বন্ধনযুক্ত, তাইই প্রবন্ধ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে গদ্য পদ্য, দুই জাতের রচনাকেই প্রবন্ধ আখ্যা দেওয়া চলে। কেবল দেখবার বিষয় হচ্ছে, রচনার বিভিন্ন অংশের মধ্যে অন্বয় সাধিত হয়েছে কিনা, এবং সব জড়িয়ে রচনাটি একটি অখণ্ডত্ব প্রাপ্ত হয়েছে কিনা? এই মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হলে যে কোন প্রকারের রচনাকেই প্রবন্ধ বলতে পারা যায়। বাংলায় অবশ্য প্রবন্ধ শব্দের পরিধি নির্ধারিত হয় নি, গদ্য-সাহিত্যের কোঠাতেই তাকে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে, তবু গদ্যের উদার সীমাটুকু মেনে নিলে যে কোন প্রকারের ভাবাত্মক রচনাকেই 'প্রবন্ধ' আখ্যা দেওয়া চলতে পারে। ইংরেজী-সাহিত্যেও প্রবন্ধ সম্পর্কে এই উদার মনোভাবকে পোষণ করা হয়েছে। প্রবন্ধ শব্দটিকে সেখানে কোন সংজ্ঞার মধ্যে তেমন করে বাঁধা হয় নি। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা রচনার মেজাজ অনুযায়ী প্রবন্ধশিল্প মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করেছেন—(১) প্রথম বিভাগটির মধ্যে objectivity বা তন্ময়তাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছ এবং এই শ্রেণীর বুদ্ধিপ্রধান রচনাগুলির মধ্যে (ক) তথ্য সম্বন্ধ আলোচনা, (খ) গ্রন্থাদির সমালোচনা, (গ) জীবনী বিজ্ঞান, ইতিহাসাশ্রয়ী আলোচনা। (ঘ) সম্পাদকীয়,—এই চার রকমের বুদ্ধিপ্রধান প্রবন্ধকে গ্রহণ করেছেন। (২) অপর পক্ষে দ্বিতীয় বিভাগটির মধ্যে Subjectivity বা মন্ময়তাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং এই শ্রেণীর মধ্যে (ক) সাধারণ সমালোচনা (খ) চরিত্র-চিত্র (গ) আত্মচিন্তা (ঘ) লঘু নক্সার স্থান নির্দেশ করেছেন। বিখ্যাত প্রবন্ধকার 'বেকন' এই শ্রেণীর রচনাকে dispersed meditations আখ্যা দিয়াছেন। তা যাই-হোক, প্রবন্ধ বলতে মোটামুটি কি বোঝায়, তা' বলা হলো। এক্ষণে দেখতে হবে বাংলাসাহিত্যে প্রবন্ধ কি ধারায় প্রবাহিত হয়েছে।

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের সূত্রপাত পাশ্চাত্য প্রভাবেরই প্রত্যক্ষ ফল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বাংলা গদ্যসাহিত্যের জন্মমুহূর্তে যুক্তিপ্রধান তথ্যাশ্রয়ী আলোচনার মাধ্যমে এই সহিত্যশাখা পুষ্টিলাভ করেছে। প্রাচীন কাহিনীর মূলানুবাদ বা কথোপকথনের অসংলগ্ন নিদর্শন সংগ্রহ ভিন্ন ফোর্টউইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত মুন্সীদের অন্যান্য সাহিত্য-কর্মের মধ্যে প্রবন্ধকারের ধর্মই অনেকখানি স্পষ্ট। তবে এই প্রবন্ধ-ধর্মী রচনাগুলি সার্থক প্রবন্ধ হয়ে উঠতে পারে নি। বিস্তৃতির কথা বাদ দিলেও তথ্য বা প্রসাদগুণ কোনদিক থেকেই এগুলি সার্থক সাহিত্যকর্মের অন্তর্ভুক্ত

হবার যোগ্যতা অর্জন করে নি। গত দেড়শো বছরের বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রকৃতি আলোচনাতে দেখা যাবে যে, তাতে চিন্তাশীলতার চাইতে ভাবুকতার চর্চা হয়েছে মাত্রাধিক। যুক্তিনিষ্ঠার অনুপস্থিতি এই সময়কার প্রবন্ধে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই সময়কার প্রাবন্ধিকদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, অক্ষয় দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয় সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ইত্যাদি। এঁদের প্রবন্ধে যে যুক্তিতর্কের অস্তিত্ব নেই, চিন্তার ঐশ্বর্য নেই, এ কথা জোর-গলায় ঘোষণা না করেও বলতে পারা যায় যে, এঁদের মধ্য দিয়ে যে প্রবন্ধসাহিত্যের ধারা প্রবাহ নেমেছে তা' ভাবুকতার সুরেই ভরপুর। রামমোহনের রচনায় কিছু অবশ্য যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়।

রামমোহনের সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে পাষণ্ডপীড়নের ছদ্মবেশী লেখক কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের নাম উল্লেখযোগ্য। তার বিতর্কমূলক বিষয়াশ্রয়ী পুস্তিকা-দুখানিতে প্রবন্ধলক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। এই সময়ে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের বিচিত্রতা সম্পাদিত হয় বিবিধ বিষয়ক ইংরেজী প্রবন্ধের অনুবাদে। এই অনূদিত প্রবন্ধ কর্মে অতুল গংগোপাধ্যায়, কালীপ্রসাদ ঘোষ গোপাল মিত্র প্রমুখ লেখকেরা যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। এঁদের অনুবাদকর্মই পরবর্তীকালে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে মৌলিক প্রবন্ধ রচনার ভূমিটি প্রস্তুত করেছিল। এ যুগের বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি বিভিন্ন বিষয়ের উপরে বিভিন্ন ধরণের প্রবন্ধ রচনা করে গেছেন।

ঊনবিংশ শতকের প্রাবন্ধিকদের মধ্যে যে দুইজন সর্বসম্মতিক্রমে শ্রেষ্ঠ—বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ তাঁদের লেখাতেও একপ্রকার তরল ভাবুকতা লক্ষণীয়। এর নিদর্শন পাওয়া যাবে, কমলাকান্তের দপ্তর। পঞ্চভূত শান্তিনিকেতন, সাহিত্যশিক্ষা সমাজ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন প্রবন্ধাবলীতে। রামেন্দ্রসুন্দর যদিও বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তথ্যের উপরে প্রবন্ধ সৃষ্টি করেছেন তথাপি তাঁকে একাবারেই ভাবুকতা মুক্ত বলতে পারিনা। আমাদের প্রবন্ধসাহিত্যকে স্বভাবতই পাশ্চাত্য অনুকরণ বলতে বাধে। বরং একে প্রতিভাশীলের প্রয়োজন মাত্র অনুসরণ বলা যেতে পারে। আমাদের প্রবন্ধকারেরা এক 'মধ্যবর্তীপথ' অবলম্বন করেছেন—যার একদিকে আছে শুষ্ক কঠোর যুক্তিবাদী গদ্যের ধারা, অন্যদিকে আছে একান্ত ব্যক্তিগত হাল্কা কথার ফুরফুরে আবহাওয়া।

আমাদের প্রবন্ধসাহিত্যে বস্তুভাবমণ্ডিত গম্ভীর প্রবন্ধের সংখ্যা যেমন কম, তেমনি হাল্কা খেয়ালখাতা জাতীয় রচনারও একান্ত অভাব। বরং সেই তুলনায় কার্লাইল, ইমার্সন, থোরো, হ্যাজলিট, ডি কুইনিস, রবার্টলুই ষ্টিভেনসন, রাসকিন প্রমুখ উনিশ শতকীয় আদর্শবাদী গদ্যলেখকদের রচনাদর্শ যেন বাঙালী গদ্যলেখকদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে সর্বাধিক। এর মানে হচ্ছে, বাঙালী মানসে ভাবুকতা যত ফলপ্রদ, যুক্তিগত ততটা নয়। কাজেই এক সময়ে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'উদভ্রান্ত প্রেম' কালিপ্রসন্ন ঘোষের 'প্রভাত চিন্তা' 'নিশীথচিন্তা' জাতীয় রচনাকে কেন্দ্র করে বাঙালীমন অসম্ভব আলোড়িত হয়েছিল। বলেন্দ্রনাথের রচনায় রোমান্টিক ভাবালুতার মাত্রাতিরিক্ত আতিশয্যে বাঙালীমন সুতৃপ্তির সংগেই অবগাহন করেছিল। এর পরে

রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের সকল রচনার মতন প্রবন্ধও অসামান্য সাহিত্যগুণে গুণান্বিত।

অতঃপর রমেন্দ্রসুন্দর, আচার্য জগদীশচন্দ্র, হরপ্রসাদশাস্ত্রী মহাশয় বাঙলাসাহিত্যে কিছু মননশীল যুক্তিবাদী রচনার সাক্ষর রেখে গেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাসাহিত্যে প্রবন্ধশিল্প চর্চা যা' হয়েছে তা' সাহিত্যের অন্যান্য দিক থেকে সমানুপাতিক হারে কম হলেও একাধারেই অকিঞ্চিৎকর বলতে পারি না। পূর্বে রচনার মধ্যে ভাবুকতার প্রাধান্য ছিল, কনটেন্ট-এর উপরে মাত্রাতিরিক্ত জোর দেবার প্রবণতা ছিল; কিন্তু আজ কনটেন্টের থেকে ফর্মের দিকেই নজর পড়েছে বেশী। আজকের লেখকেরা কি বলছির চেয়ে, কেমন করে বলবো তার চিন্তাতেই বেশী মশগুল। অর্থাৎ আজকের সাহিত্যকর্মে আংশিক সচেতনতাই লেখকের মূল কর্তব্যবোধ বলে স্বীকৃত।

আধুনিক যুগের প্রবন্ধসাহিত্যের সবচাইতে নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধি হলেন স্বর্গীয় প্রমথ চৌধুরী। ওরফে বীরবল। তাঁর রচনায় বক্তব্যের অভাব ছিল না, তবে তাকে ছাড়িয়ে সব সময় বড় হয়ে উঠেছে প্রকাশভংগীর বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য এসেছে তাঁর মাত্রাতিরিক্ত ভাবে ফরাসী সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগের ফলে। আমাদের পূর্ববর্তী প্রায় সকল রচনাকারেরাই ইংরেজী সাহিত্য এবং সাহিত্যিকদের আদর্শ বলে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ব্যতিক্রম এই বীরবল। তাঁর মধ্যে ফরাসী রচনাসাহিত্যের বক্তব্য-স্বচ্ছতা, প্রাঞ্জলতা, শব্দসচেতনতা এবং কাব্যকুয়াশার অনুপস্থিতি—এই সকলগুলি সমন্বিত হয়েছিল। বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য সস্তেনীয় এবং বের্গসীয় রীতির সাথে পরিচিত হবার নিশ্চিন্ত অবকাশ প্রমথ চৌধুরীই আমাদের সর্বপ্রথম দান করেছেন। গদ্যের মধ্যে পদ্যের সাহিত্য কেমন হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে তাঁর ধারণা কেমন ছিল বুঝাতে গেলে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি দিতে হয়:—

যেদিন থেকে ফরাসী জাতির ধারণা হ'ল যে, সাহিত্য রচনা করা একটা আর্ট, সেই দিন থেকে ফরাসী লেখকেরা কিসে রচনা সুগঠিত হয়, সেবিষয়ে পুরো লক্ষ্য রেখে এসেছেন। কি যে আর্ট, আর কি যে আর্ট নয়, সে বিষয়ে অদ্যাবধি বহু মতভেদ আছে। সৌন্দর্যের অর্থ যে কি, সে বিষয়ে দার্শনিক তর্কের শেষ সেই। তবে আমাদের সহজ মন এবং সাদা চোখ দিয়ে বিচার করতে গেলে আমরা দেখতে পাই যে, আমরা যাকে বস্তুর রূপ বলি তা' অনেক পরিমাণে তার আকারের উপর নির্ভর করে। অন্ততঃ আমরা বাঙালীরা যা কদাকার তা সুন্দর বলি নে। মানবমনের এই সহজ প্রকৃতির উপরেই ফরাসী জাতির রচনার আর্ট প্রতিষ্ঠিত। কিসে রচনার অঙ্গ—সৌষ্ঠব হয় সে বিষয়ে ফরাসী মণীষারা বহু চিন্তা বহু বিচার করে গেছেন এবং সেই চিন্তা সেই বিচারের ফলে ফরাসী রচনা এত সাকার, এত পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে।, (ফরাসী সাহিত্যের বর্ণপরিচয়॥ প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১২৮)

লেখক ফরাসী সাহিত্যের প্রতি সবিশেষ অনুরাগ পোষণ করতেন এবং সেই কারণেই তিনি বাংলা সাহিত্যের আলোচনার প্রয়োজন বোধ করছেন।

কিন্তু বীরবলী গদ্য সম্পূর্ণভাবে সমালোচনামুক্ত এমন কথা বলতে পারি না। গুরুগম্ভীর কিংবা ভাবগম্ভীর বিষয়ের ভার বীরবলী গদ্যের উপর সয় না। কথ্য ভাষার যথেচ্ছ ব্যবহারে তাঁর

বক্তব্যে এক তারণ্যের সুর সঞ্চারিত হয়েছে। বক্তব্যকে গভীর গম্ভীর রূপ দিতে গেলে যে পরিমিত শিল্পবোধ, কাব্যানুভূতি এবং আদর্শবাদী মনের গড়ন থাকা দরকার তা' স্পষ্টতই বীরবলের ছিল না, তাঁর কল্পনার দৈন্য যদিও প্রকাশভংগির অভিনবত্বের দ্বারা ঢাকবার চেষ্টা করা হয়েছে তথাপি তাকে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার অতিরিক্ত কিছু সার্থক ফলপ্রাবী মনে হয় না।

প্রমথ চৌধুরীর ধারাকে সজ্ঞানে অনুসরণ করার চেষ্টা দেখা গেছে শ্রী অতুল গুপ্ত, শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পরলোকগত শ্রীকিরণশঙ্কর রায়, শ্রীসতীশ ঘটক, শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী এবং শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়ের মধ্যে। সর্বশ্রী বুদ্ধদেব বসু, জ্যোতির্ময় রায়, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সদ্য লোকান্তরিত পরিমল রায়, যাযাবর, ইন্দ্রজিৎ, রঞ্জন প্রমুখ রচনাকারদের রচনাতেও সজ্ঞানে হোক অজ্ঞানে হোক একই ধারারই অনুবর্তন এসে গেছে।

স্বর্গত মোহিতলাল কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর রীতির সম্পূর্ণ বিপরীত রীতিতেই বাংলা গদ্যের পরিচর্যা করে গেছেন। মোহিতলালের রচনায় বক্তব্য প্রধান। প্রকাশভংগি গৌণ। তিনি সাধুভাষাতেই রচনাকে পরিশীলিত করেছিলেন। গদ্যের ভাষা গম্ভীর উদাত্ত, দৃঢ় করবার দিকে তাঁর দৃষ্টি। সর্বপ্রকার তারল্যের বিরোধী ছিলেন তিনি। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর মতন তিনি কবি-কল্পনা শূন্য ছিলেন না। তাঁর রচনা ভাবময়, কল্পনা সমৃদ্ধ। তাঁর প্রতিটি লেখায় প্রাজ্ঞের প্রত্যয়শীলতা, ভবিষ্যৎদৃষ্টির নিশ্চিত স্পষ্টতা, সুতীব্র সূক্ষ্মতা বর্তমান ছিল। কিন্তু প্রত্যেকের মতন তাঁর লেখাও un-mixed good নয়। সর্বগুণে গুণান্বিত মোহিতলালের দৃষ্টিভংগী ছিল মাত্রাতিরিক্ত ভাবে পক্ষপাত দুষ্ট। তিনি এক দেশদর্শী ছিলেন, এ্যারিষ্টোটেলের Golden means এর তত্ত্ব তাঁর অজ্ঞাত ছিল। মোহিতলাল একজন রুচিবান, সংস্কৃতিপ্রবণ লেখক হয়েও কেন যে Communal এবং Conservative ছিলেন' তা' ভাবতে আমাদের বিস্ময় জাগে।

পরলোকগত শ্রীরাজশেখর বসু মহাশয়ও কিছু ভালো প্রবন্ধ লিখে গেছেন। তাঁর রচনারীতি পরিচ্ছন্ন, সুসহঅর্থবহ এবং বৈজ্ঞানিক। তিনি রচনাতে বাহুল্য বর্জিত, ছিম-ছাম এবং সুস্পষ্ট প্রসাদগুণ ও সরসতার দ্বারা মণ্ডিত তাঁর গদ্যরীতি বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে এক মহামূল্য সম্পদ।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা ছিল চিত্রধর্মী। ভাবপ্রবণ ও রোমান্টিক। তাঁর লেখাতে আমরা গদ্যের মোড়কে যেন মনোময় কবিতার নির্যাসকেই লাভ করেছি কঠোর বুদ্ধিবাদ ও যুক্তিনিষ্ঠা হয় তো তাঁর প্রবন্ধাবলীর মধ্যে মিলবে না কিন্তু তাঁর রচনা আমাদের যে এই পরিচিত নিষ্ঠুর বাস্তবতার মাঝখানে দু'দণ্ড সান্ত্বনার অবকাশ এনে দেয়—কোন রকম গায়ের জোয়ারিতেই তা'কে অস্বীকার করা যাবে না।

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য যদি ও সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতন তেমন পল্লবিত নয়, তথাপি যে কয়জন মাত্র প্রাবন্ধিক বর্তমানে বাংলা প্রবন্ধ লিখছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেরই ভবিষ্যৎ বেশ আশাপ্রদ মনে হয়। মনে হয় নিষ্ঠায় নিবিড় থেকে প্রবন্ধ রচনা করতে থাকলে একদিন বাংলাভাষার প্রবন্ধকেও এই প্রাবন্ধিকেরা বিশ্ব প্রবন্ধের মানদণ্ডে এনে উপস্থাপিত করতে সফল হবেন।

প্রথমতম সংবাদপত্র

জীবনানন্দ চট্টোপাধ্যায়

বাংলাভাষায় প্রকাশিত প্রথমতম সংবাদপত্রটির নাম নিয়ে একদা বাংলাদেশে চরম বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলাদেশে সাময়িক পত্র সম্বন্ধে গবেষণার ভগীরথ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করে যান নি তবে মোটামুটি ভাবে সমাচার দর্পণকেই তিনি এই সম্মান দেবার ইঙ্গিত করেছেন বলা যেতে পারে।

অবশ্য এ সিদ্ধান্ত যে সর্বসম্মত এ দাবী স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনাথও করেন নি। তিনি ১৩২৮ সালের মাঘ ও চৈত্র মাসে, ১৩৩৬ সালের ফাল্গুন এবং ১৩৬৮ সালের বৈশাখ মাসে প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে বাংলা গেজেটটিকেই প্রথমতম সংবাদপত্রের সম্মান দিয়েছিলেন। তাঁর তৎকালীন সিদ্ধান্তের পেছনে প্রচলিত উদ্ধৃতির পটভূমিকা ছিল। ১৮৫০ সালে পাদ্রীলং Calcutta Review পত্রিকায় শ্রীরামপুরের সমাচার দর্পণের প্রথম সংবাদপত্র বললেও ১৮৫৫ সালে লংসাহেব সিদ্ধান্ত বদলান। In 1815, the Bengal Gazette was started by Gangadhar Bhattachrya who had gained much money by popular editions of Vidya Sundar, Betal and Various other works, illustrated with wood Cuts, the paper was short lived (Descriptive Catalogue of Bengali Books—By Rev. J, long 1856 page-66) বলাবাহুল্য এই গঙ্গাধর ভট্টাচার্যই গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। তিনি ১৮১৬ সালেই বটতলায় এই ছাপান রীতি সুরু করে প্রচুর লাভ করেছিলেন বটে তার বেঙ্গল গেজেট প্রকাশ হয়েছিল বছর দেড়েক পর—১৮১৮ সালে। ১৮১৬ সালে বই ছাপার রীতিতে গঙ্গাকিশোরের এত নাম হয় যে তিনি তখনই খ্যাত হয়ে পড়েন—এবং প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশের কৃতিত্বটাও বুঝি ঐ সালেই, ধরে নেন অনেকে (যথা কেদারনাথ মজুমদার) (১)। প্রকৃতপক্ষে বটতলা রীতিতে বই ছাপিয়ে যথেষ্ট 'মুনফা' অর্জন করার পরই গঙ্গাকিশোর ৯৫ (১৯৫) চোরবাগান স্ট্রীট অফিস খোলেন হরচন্দ্র রায়ের মাধ্যমে। এই হরচন্দ্র রায় গঙ্গাকিশোরের ব্যবসায়ের সহযোগী ছিলেন। হরচন্দ্র রাজা রামমোহনের আত্মীয় সভার সভ্য ছিলেন। সম্ভবত: তাঁরই মাধ্যমে গঙ্গাকিশোর রামমোহনের পরিচয় হয়। রামমোহন রায়ের অনেক বই গঙ্গাকিশোর প্রকাশ করেছেন মার্শম্যানের সহযোগীতায়। 'কবিতাকারের সহিত বিচার' বইয়ের প্রকাশক হিসেবে গঙ্গাকিশোরের নাম মুদ্রিতও হয়।

রাজা রামমোহন তখন তাঁর বক্তব্য প্রকাশের বাহন হিসাবে হয়ত সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছিলেন। সম্ভবত: তাঁরই উৎসাহে হরচন্দ্র রায়-গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যর যৌথপ্রচেষ্টায় একটি সংবাদপত্র প্রকাশের আয়োজন করা হয়। স্থির হয় বেঙ্গল গেজেট থাকবে সরকারী নিয়োগ-বদলী, সরকারী ঘোষণার অনুবাদ, স্থানীয় কৌতূহলজনক সংবাদ সহজ ও সরল বাংলায়। এ ছাড়া বাংলামাসের ক্যালেণ্ডার থাকবে অতিরিক্ত আকর্ষণ। দুর্ভাগ্যের বিষয় গেজেটের কপি আজও আবিষ্কৃত হয় নি। তবে এশিয়াটিক জার্নালের ১৮১৯ সালে, জুলাই

সংখ্যার ১৯ পৃষ্ঠায় জানা যায় সতীদাহ সম্বন্ধে এক ব্রাহ্মণ এক পুস্তক প্রকাশ করায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। এই উদ্ধৃতিতেই ইণ্ডিয়া গেজেট জানাচ্ছেন 'আমরা অবগত হইলাম কিছুদিন পূর্ব হইতে সম্পূর্ণ এদেশীয়গণের দ্বারা পরিচালিত হইয়া বাংলাভাষায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত যে পত্রিকাখানি প্রচারিত হইতেছে তাহাতে এই ছোট পুস্তিকাখানি পুর্ণমুদ্রিত হইয়াছে। এ সম্পর্কে রামমোহন রায়ের পরিশ্রমের যে ফল তাহার প্রচারের অধিকতর ব্যাপ্তি মঙ্গলজনক না হইয়া থাকিতে পারে না। আমরা জানিয়া সুখী হইলাম এই কাগজের পরিচালকবর্গ স্থির করিয়াছেন যে, যে প্রসিদ্ধ হিন্দু প্রাজ্ঞ সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে ওলাদেবীর পূজা ভিন্ন ওলাওঠা রোগের প্রতিকার সম্ভব নহে তাঁহার অনাবশ্যক কাঁপানো গুরুগম্ভীর রচনা অপেক্ষা এই শ্রেণীর লোকহিতকর প্রবন্ধ তাঁহারা ছাপাবেন।

এখন ১৮১৮ সালে বাঙালীদের পরিচালিত বাংলা সংবাদপত্র কেবলমাত্র বেঙ্গল গেজেটিই ছিল। এবং সে পত্রিকাতেই রামমোহনের সতীদাহের বিরুদ্ধে যুক্তি সহ প্রবন্ধ প্রকাশ খুবই স্বাভাবিক। কারণ হরচন্দ্র রায় মাধ্যমে রামমোহনের সঙ্গে গেজেটের যোগাযোগ অসম্ভব নয়। একটি লক্ষ্যণীয় বস্তু, তৎকালীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে ওলাবিবির দয়া ভিক্ষায় পূজার প্রভাবসংক্রান্ত প্রবন্ধের পরিবর্তে 'অ-হিন্দু' রামমোহনের প্রবন্ধ প্রচারই পত্রিকার উদ্দেশ্য বলে ঘোষিত—এর ফলে গেজেটটির সঙ্গে রামমোহনের যোগাযোগ সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণিত। রামমোহনের বক্তব্য প্রকাশের ক্ষেত্রে বেঙ্গলগেজেটিই ব্রাহ্মণ সেবধির অগ্রদূত বলা চলে।

এছাড়া ১৮১৯ সালে এশিয়াটিক জার্ণালের জানুয়ারী সংখ্যায় ৫৯ পৃষ্ঠায় ওরিয়েণ্টাল ষ্টার পত্রিকার ১৮১৮ সালের ১৬ই মে প্রকাশিত একটি সংখ্যায় উদ্ধৃতি আছে। এতে জানা যায়—'Amongst the improvements which are taking place in calcutta, we observe with satisfaction that the publication of a Bengali Newspaper has been commenced...'। অবশ্য এই has been commenced কথাটির অর্থ নিয়ে অনর্থের সৃষ্টি হয়েছে বিলক্ষণ। কারণ এশিয়াটিক জার্ণাল যে সংবাদ উদ্ধার করেছেন তা ওরিয়েণ্টাল ষ্টারে প্রকাশিত হয় ১৬ই মে তারিখে।

এদিকের ঘটনা হল: হরচন্দ্র গঙ্গাকিশোর অনেক দিন ধরেই বেশী লাভের আশায় (এবং হয়ত রামমোহনের উৎসাহে) একটি সংবাদপত্র প্রকাশের কথা ঠিক করেছিলেন। তাঁরা অনেকদিনের অভিজ্ঞ ও প্রকাশক ব্যবসায়ী। হয়ত সমস্ত দিক নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করে তারা ১৮১৮ সালে ১২ই মে তারিখে বেঙ্গল গেজেট প্রকাশ করার ঘোষণা জানালেন ওরিয়েণ্টাল ষ্টারে। সে সংবাদ (বিজ্ঞাপন) ওরিয়েণ্টাল ষ্টারে প্রকাশিত হয় ১৪ই মে। এর পর দিনই ১৫ মে শুক্রবার। বেঙ্গল গেজেট প্রকাশের দিন ধার্য করা হয়েছিল প্রতি শুক্রবার। অর্থাৎ গেজেট প্রকাশিত হল ১৫ই মে শুক্রবার। আর ১৬ই মে শনিবার ওয়েণ্টাল ষ্টারে নিজেরাই জানালেন একটি বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছে (publication of Bengali Newspaper has been commenced)। ব্রজেন্দ্রনাথের মতে ১৪ই মে বিজ্ঞাপন দিয়ে ১৫ই মে পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কিন্তু গঙ্গাকিশোর হরচন্দ্র ধুরন্ধর প্রকাশক ছিলেন। বটতলা প্রকাশরীতিতে তাঁরা প্রকাশনার ব্যাপারে চরম অভিজ্ঞতাও পেয়েছিলেন। উপরন্তু তাঁদের পেছনে সংবাদপত্র প্রকাশ উদ্যোগে হয়ত রামমোহনের সহযোগিতাও ছিল। বহু চিন্তার ফল—গেজেট প্রকাশের সঙ্গে এই

বিজ্ঞাপনের তারিখের তেমন কোন সম্বন্ধই হয়ত ছিল না। গেজেট প্রকাশিত হয়েছিল আপন গতিতে, নিজস্ব নির্দিষ্ট সময়েই। রাজা রামমোহনের স্পর্শ থাকলে সে যুগেও ব্যাপারটা খুব অসম্ভব মনে হয় না। ব্রজেন্দ্রনাথ বলেছেন ১৫ই মে পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে পত্রিকা দেখে তার সমালোচনা পরের দিনই প্রকাশকরা ওরিয়েন্টাল ষ্টারের পক্ষে সন্দেহজনকভাবে দ্রুত। কিন্তু 'সমালোচনা' অর্থে শুধু জানান হয়েছিল একটি নতুন পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। এর জন্য পত্রিকাটি নিখুঁতভাবে পড়ার দরকার নেই। আর মাত্র কয়েকশ কপি ওরিয়েন্টাল ষ্টার হ্যাণ্ডপ্রেসে ছাপা যাদের উদ্দেশ্য ছিল তাদের পক্ষে এটা কি খুবই কঠিন ছিল। সমালোচনায় তারা পত্রিকার সম্বন্ধে একমাত্র প্রকাশটুকু ছাড়া আর কোন ইঙ্গিতই করে নি।

ব্রজেন্দ্রনাথের শেষ যুক্তি সমাচার দর্পণের 'প্রথমত্ব' সম্পর্কে দর্পণেরই বক্তব্য। কিন্তু প্রবাসী সম্পাদক শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতে দর্পণের প্রথমত্বের প্রসঙ্গে দর্পণেরই অভিমত বিনাযুক্তিতে গ্রাহ্য হতে পারে না। অভিযুক্তের কৃতিত্ব সম্পর্কে তারই সাক্ষ্য কি গ্রহণ যোগ্য? ব্রজেন্দ্রনাথ বলেছেন যখন দর্পণ প্রথমত্বের দাবী উঠিয়েছিল তখন গঙ্গাকিশোর ও হরচন্দ্র জীবিত, অথচ কোন প্রতিবাদই তাঁরা করেন নি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গঙ্গাকিশোর ও হরচন্দ্র তখন বৈষয়িক মনোমালিন্যে বিভক্ত। তাঁদের গেজেট উঠে গেছে—গঙ্গাকিশোর জন্মগ্রাম বহরায় প্রত্যাবর্তন করেছেন, হরচন্দ্রও পৃথক ব্যবসা করছেন। আন্তরিক অভিমানের খেসারতিতে তাঁরা তখন আচ্ছন্ন তাঁদের পক্ষে গেজেটের প্রথমত্ব নিয়ে 'ময়নাতদন্তে' হয়ত নামতে ভাল লাগে নি। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। বিশেষতঃ গেজেট যখন তাঁদের যৌথ প্রচেষ্টা সেক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন অবস্থাতে তাঁদের এই প্রতিবাদ স্পৃহা নিশ্চয়ই ব্যঙ্গের খোরাক হত। তাই বিকৃত তথ্য দেখেও হয়ত তাঁরা ইচ্ছাকৃত নীরব ছিলেন—কারণ যুক্ত বিবৃতি দেওয়াও তখন সম্ভব ছিল না।

এছাড়া প্রতিবাদ জানালেও তা প্রকাশিত হবে কোথায়—গেজেট তখন উঠে গেছে। সমাচার দর্পণের 'প্রথমত্বে' প্রতিবাদ জানালেও সে পত্র দর্পণেই প্রকাশের সাংবাদিক উদারতা সে যুগে আশা করা অন্যায়।

এই প্রসঙ্গে একটি ছোট্ট অনুমানের কথা উল্লেখ করি। ভারতবর্ষে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্রের নাম ছিল বেঙ্গল গেজেট। সে যুগের একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যই ছিল চলতি বা সম্প্রতি-উঠে যাওয়া সংবাদপত্রের নাম অনুকরণ বা অনুসরণ করে নতুন সংবাদপত্রের নামকরণ করা। হিকির বেঙ্গল গেজেট অবিসংবাদিত ভাবেই ভারতের প্রথম সংবাদপত্র। গঙ্গাকিশোর তাঁর সংবাদপত্রের নামকরণে একই নামেরই আশ্রয় নিয়ে আমাদের অনুমানকে ঘনীভূত করেছেন। নতুন নামকরণ করার মত কল্পনার উদারতা তখন হয়ত কষ্টকর ছিল অথবা সম্প্রতি উঠে যাওয়া কিন্তু চালু সংবাদপত্রের goodwill বা সুনামের সুযোগ নেওয়াও ব্যবসায়ী গঙ্গাকিশোরের উৎসাহের কারণ হতে পারে। কিন্তু সমাচার দর্পণের পরে প্রকাশিত হলে গঙ্গাকিশোর হয়ত দর্পণকেই আশ্রয় করে তাঁর নব পত্রের নামকরণ করতেন বলে অনুমনে করা যেতে পারে।

তথ্যগত তর্কবিতর্কের পরে এই বিতর্ক চলাকালীন ব্রজেন্দ্রনাথ-প্রবাসীর সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। প্রবাসীতেই একদা ব্রজেন্দ্রনাথ বেঙ্গল গেজেটের সমর্থনে একাধিক

প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এরপর সজনীকান্ত দাস প্রবাসী ত্যাগ করে নিজের পত্রিকা শনিবারের চিঠি প্রকাশকালে ব্রজেন্দ্রনাথও সেখানেই আশ্রয় নিলেন। সেখানেই ব্রজেন্দ্রনাথ নবতথ্যের ভিত্তিতে সমাচারদর্পণকে প্রথমতম সংবাদপত্রের সম্মান দিলেন। এ সময় সজনীকান্ত ব্রজেন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রবাসীর সম্পর্ক সুস্থ ছিল বলা চলে না। প্রবাসী ও শনিবারের চিঠিতে প্রথমতম সংবাদপত্র প্রসঙ্গে প্রবন্ধ তর্ক বিতর্ক সমালোচনা প্রতিবাদ ও প্রতিবাদের উত্তর প্রকাশিত হত। প্রবাসী সম্পাদক যখন বিস্ময়কর নিরপেক্ষতায় ব্রজেন্দ্রনাথের প্রবন্ধের সমালোচনা করতেন, তখন ব্রজেন্দ্রনাথ-সাথী সজনীকান্ত প্রবাসী-সম্পাদকের 'মগ্নচৈতন্যের পক্ষপাতিত্বে'র সার ইঙ্গিত সহ সমালোচনা করতেন। এই সময় শনিবারের চিঠিতে ব্রজেন্দ্রনাথ এবং প্রবাসীতে প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ক্রমান্বয়ে প্রবন্ধ লিখতেন এই প্রসঙ্গে।

প্রাচীন বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিশেষতঃ মিশনারী যুগের বাংলা সাহিত্যের দুষ্প্রাপ্য ইতিহাস সংগ্রহে সজনীকান্ত ব্রজেন্দ্রনাথের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। বঙ্গীয় নাট্যশালার সর্বোপরি সে যুগের সংবাদপত্রের উন্মোচনে ব্রজেন্দ্রনাথের অমূল্য গবেষণা ও আবিষ্কার চিরস্মরণীয়। কিন্তু পুরাতন তথ্য পুনরুদ্ধারে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি অস্বাভাবিক নয়। ব্রজেন্দ্রনাথও তা অস্বীকার করেননি। রাজা রামমোহন রায় অথবা কাশীনাথ তর্ক পঞ্চানন প্রসঙ্গে তথ্য আবিষ্কারে এ ধরণের অনিচ্ছাকৃত বিভ্রাট ঘটেছে এবং স্বীকৃতও হয়েছে। আমাদের মনে হয়, গবেষণার সূক্ষ্মতত্ব প্রকাশ করতে গিয়েই এ প্রসঙ্গেও কিছু অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি বাসা বেঁধেছে। বাংলাভাষার প্রথমতম সংবাদপত্র বেঙ্গল গেজেট বলেই আমাদের সার্বিক অনুমান।

(* লং সাহেব, ঈশ্বর গুপ্ত, রামগতি ন্যায়রত্ন, রাজনারায়ণ বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ডঃ সুশীল দে, বিনয় ঘোষ প্রভৃতি)

❁ এই প্রবন্ধ প্রণয়নে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রায় সব বই ও বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। এছাড়া শনিবারের চিঠি ও প্রবাসীর পূর্বলিখিত সংখ্যাগুলি, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ, সাহিত্য পরিষদের ও চৈতন্য লাইব্রেরীর বইয়েরও সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

❁ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের মতগুলি আলোচনার সময় তাঁর সংগৃহীত উদ্ধৃতির পুনরুক্তি করি নি, কারণ তাঁর 'বাংলাসাময়িক পত্র' বইতে এ বিষয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং পাঠকমহলে তা বহু আলোচিত।

রমেশচন্দ্র ও ভারতের অর্থনীতি

মুরারি ঘোষ

ভারতের বহির্বাণিজ্য ও লুণ্ঠন

গ্লাসগোয় ভারত হিতৈষী ইংরেজদের এক সভা বসেছিল ১৯০১ সালে। সেই সভায় একমাত্র বক্তা ছিলেন রমেশচন্দ্র। বক্তৃতার বিষয় ছিল—ভারতের আর্থিক অবস্থা।

রমেশচন্দ্রের বক্তৃতার অংশ বিশেষ তুলে ধরে আমরা সুরু করতে পারি: আমরা প্রায়ই শুনে থাকি ভারতের বাণিজ্য ক্রমপর্যায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে আর বাণিজ্যের বৃদ্ধি মানেই দেশের লোকের সম্পদ বৃদ্ধি। বর্তমান শাসনকালের মধ্যেই ২ কোটি থেকে ২০ কোটি টাকায় গিয়ে ঠেকেছে ভারত বাণিজ্য। ভারত কোনোদিন চা রপ্তানী করতো না এখন সেখান থেকে রপ্তানী হয় বছরে দেড় লক্ষ পাউণ্ড চা। কাঁচা তুলো কোনোদিনও রপ্তানী করতো না, এখন করে দশ লক্ষ টন। গম রপ্তানী হত না, এখন হয় সাড়ে সাত লক্ষ টন—আরো নানা পণ্যের রপ্তানী বেড়েছে অবিশ্বাস্য ভাবে...ভারতের এই বহির্বাণিজ্যের বৃদ্ধিকে আমরা অস্বীকার করছি না—সংখ্যাতত্ত্বের প্রমাণ রয়েছে হাতে হাতে। কিন্তু এ-সব দিয়ে যখন প্রমাণ করতে চেষ্টা হয় যে এর ফলে ভারতের কৃষি ও শিল্পে উন্নতি ঘটছে—মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ বাড়ছে, তখন নিশ্চয় বুঝি যে যুক্তির অপপ্রয়োগ ঘটানো হচ্ছে।

এই হচ্ছে সেদিনকার রমেশচন্দ্রের মত, ভারতের বাণিজ্য প্রসঙ্গে। অবশ্যই আমরা সহজ চোখে দেখতে পাই ভারতের আর্থিক উদ্যোগের উন্নতি ঘটছে না—এর মধ্যে ফাঁক রয়েছে কোথায়?

যে কোনো আর্থিক উদ্যোগের আগে প্রয়োজন দুটি জিনিসের—পণ্যের চাহিদার ও সঞ্চিত মূলধন বা পুঁজির। কিন্তু মূলধনের সঞ্চয় আমাদের থাকছে কই? বহির্বাণিজ্যের রমণীয় পোষাক পরে চাষীর সম্পদ—শিল্পের শ্রম কোটি কোটি টাকার মূল্যে বছরের পর বছর দেশ ছাড়া হতে সুরু হয়েছে। এসব কিছুই ন্যায্য মূল্যে সংগ্রহ করা হয়নি—বিস্তৃত অত্যাচার আর লুটতরাজের মাধ্যমে এই সংগ্রহের ইতিহাস রমেশচন্দ্র ব্যক্ত করেছেন—দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের কথায় তা বিস্তৃত করে বলা যাবে। এখানে মোটামুটি তার উল্লেখ এই জন্যে যে এই সব সংগ্রহের মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষের হাতে অর্থ আসেনি—কাগজে কলমে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বিস্তার লাভ হলেও চাষী, শ্রমজীবী ও কারিগর মানুষেরা নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হয়েছে।

যদিও ভারতের মানুষের জীবনযাপনের উপযোগী পণ্য চাহিদা কোনোদিনই উগ্র ছিল না। সীমাবদ্ধ গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় যৎসামান্য উৎপাদনে স্বল্প প্রয়োজনের ক্ষুধা মিটে যেত। ভিন্ন দেশের রপ্তানীকৃত পণ্য গ্রামীণ সমাজের প্রয়োজনে আসতো না—স্বল্প চাহিদা মত পণ্যের উৎপাদন থেকে গ্রামের জীবনে সাধারণ মানুষের প্রয়োজন মিটে যেত। তবু যখন নানান পণ্যের আমদানী রপ্তানীর প্রচলন সুরু হল, এতে স্বাভাবিক ভাবেই মনে হতে পারে ভারতের পণ্য উৎপাদন করার দিন বদল হতে চলেছে বুঝি। একদা যা দেশের প্রয়োজনে লাগতো বিদেশে বাণিজ্যের কারণে তার

বর্ধিত উৎপাদন থেকে বাড়তি আয় নিশ্চয় হয়ে চলেছে। কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্যের মূল এখান থেকেই—এই বর্ধিত উৎপাদন প্রায় বিনামূল্যেই বেহাত হয়ে যাওয়ার করুণ কাহিনী ভারত বাণিজ্যে। বহির্বাণিজ্যের সংখ্যাতত্ত্বের দিকে তাকালে যাকে নিছক বাড়তি আয় বলে মনে হবে আসলে তা আমাদের দেশছাড়া সম্পদ।

১৮৩৪ সাল থেকে আমদানী-রপ্তানীর পরিসংখ্যান তুলে ধরেছেন রমেশচন্দ্র। তথ্যের সুরুতেই দেখি আমাদের লাভ। বাড়তি আয়। (১) বিদেশ থেকে যত পণ্য আসছে তার চেয়ে আমরা পাঠাচ্ছি জাহাজ বোঝাই করে। এই হিসেবে বাড়তি আয়—বাড়তি মালের দরুন।

আসলে ওটা যে বাড়তি আয় নয় আমাদের হাতছাড়া সম্পদ এই তত্ত্বই রমেশচন্দ্র বুঝিয়েছেন খুব সহজ ভাবে।

'৩৪ সালে বাড়তি রপ্তানী টাকার অঙ্কে ২ কোটি টাকার ওপর। '৩৫ সালে সওয়া ৩ কোটি। '৩৬ সালে ৬ কোটি। সিপাই বিদ্রোহের ২ বছর আগে পর্যন্ত প্রতি বছর আমদানীর চেয়ে বাড়তি রপ্তানী হয়েছে গড়ে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার মূল্যে। ১৮৫৫ সাল অব্দি বিশ বছরে প্রায় সাড়ে ৮৮ কোটি টাকার পণ্য আমাদের হাতের বাইরে চলে গেছে। অর্থনীতির পরিভাষায় এই নাকি একসপোর্ট সারপ্লাস। রমেশ দত্তের পরিভাষায় এ হল 'ইকনমিক ড্রেন'। অবশ্য সম্পূর্ণ 'ইকনমিক ড্রেন' এ নয়—ঐ হিসেবের কিছু ভগ্নাংশ মাত্র—ইকনমিক ড্রেনের পরিমাণ নানা খাতে আরো বেশি।

কিন্তু এই বাড়তি রপ্তানীর কথায় আসা যাক।

এই বাড়তি রপ্তানীতে আমাদের লাভ নেই কেন? কেনই বা রপ্তানী ইকনমিক ড্রেন নামে অভিহিত হয়েছে।

এই বাড়তি রপ্তানী আমাদের বহির্বাণিজ্যে উন্নতির সূচক নয়—রপ্তানীর পথ বেয়ে আমরা হারিয়েছি খাদ্যশস্য আর শিল্প পণ্য—উন্নতিকামী যে কোন দেশের পক্ষে যা অপরিহার্য। তবু এর দরুণ যে প্রাপ্য অর্থ তাও দেশের ভাণ্ডারে জমা পড়ে নি—আরেক রাস্তা বেয়ে নর্দমার স্রোতের মত বেরিয়ে চলে গেছে। পণ্যও গেছে, অর্থও গেছে।

ইংরেজ পরিসংখ্যানবিদ নিউমার্ক (Newmarch) বৃটেনের পার্লিয়ামেণ্টারী কমিটির সামনে এক সাক্ষে (১৮৫৫ খৃঃ) ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন।

১৮৫৫ সালের তথ্য নিয়েই তিনি হিসেব দিয়েছিলেন। ঐ বছরে বৃটেন থেকে ভারতে ১০,৩৫০,০০০ পাউণ্ড স্টার্লিং মূল্যের পণ্য রপ্তানী হয়েছিল—পরিবর্তে ভারত থেকে গিয়েছিল ১২,৬৭০,০০০ পাউণ্ড স্টার্লিং মূল্যের পণ্য। দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে প্রথম সংখ্যা বিয়োগ দিলে যা থাকে, অর্থশাস্ত্রের মতে, তা হল ভারতের লাভের অঙ্কে—ভারতের একসপোর্ট সারপ্লাস। নিউ মার্কের হিসেব মতই (২) (১২,৬৭০,০০০—১০,৩৫০,০০০)=২,৩২০,০০০ পাউণ্ড স্টার্লিং ভারতের বাড়তি আয়! কিন্তু নিউমার্ক দেখাচ্ছেন, ভারতের ভাণ্ডারে এ আয় জমা পড়ে নি। সে বছরেই কোম্পানী নিজস্ব খরচ-খরচার দরুণ ভারত থেকে নিয়েছে ৩,৭০০,০০০ পাউণ্ড স্টার্লিং।

শেষ পর্যন্ত হিসেবের কড়ি থেকে কানাকড়িও ভারতের ভাগ্যে জোটে নি—উপরন্তু আরো ১,৩৮০,০০০ পাউণ্ড স্টার্লিং (ভারতের বাড়তি রপ্তানীর আয়টুকু ছাড়াও) হাতিয়ে নেয় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। টাকার অংকে এই মোট প্রায় পৌণে চার কোটি টাকা (৩,৭০০,০০০ পা, স্টার্লিং) কোম্পানী তার লণ্ডনের আপিস খরচ আর অংশীদারদের লাভাংশ হিসাবে ভারত থেকে উঠিয়ে নেয়। প্রায় ছিনিয়ে নেওয়া। এই নেওয়াটা প্রতি বছরেই ছিল। হোমচার্জ এবং অন্যান্য খরচ বাবদ ছিনিয়ে নেওয়া টাকার অঙ্ক প্রতি বছরে প্রায় ৩ কোটি পাউণ্ডের মতই ছিল।

এই সূত্রে আধুনিক ভারতের এক প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করি। এই তথাকথিত একসপোর্ট সারপ্লাসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ডঃ বি, এন গাঙ্গুলীর উক্তি :

The export had to increaee in order to meet the fixed Home Charges in gold...It will be redily seen that the Vicious cir.le which was thus set up could operate through an increase of exports or an increase of sterling debt or both. These is clear evidenee of both processes. The increase in export-surplus reflected a further extraction of real purchasing power from the debilated Indian economy through an additional taxation. (৪)

কোম্পানী তার নিজস্ব খরচ আর দেনা (Indian Debt) মেটাতে বছর বছর ভারত থেকে যা নিয়েছে তার ফলে রপ্তানী বাড়িয়েও ভারতের লাভ থাকেনি। কোম্পানীর হাত থেকে ক্ষমতা চলে যাওয়ার পরেও ভারতের পরিত্রাণ ছিল না। ইণ্ডিয়ান ডেট মেটানোর ছলে ভারতের সম্পদে ভাগ বসিয়েছে ইংরেজ সরকার। এই সূত্রে রমেশচন্দ্রের উক্তিও স্মরণীয় :

The difference between the total imports and the total exports in the distressing anomaly of the Indian commerce. It represents the annual economic drain from India—the amount she paid from her food supply and for which she received no commercial equivalents. (৫)

১৯৩৯ সাল পর্যন্ত 'ইকনমিক ড্রেনের' একমুখী গতি। এর সংগে যোগ হয়েছে আরো অনেক বাবদে হাত সাফাই। ইকনমিক ড্রেনের অধ্যায়ে বিস্তৃত হিসেব দেওয়া যাবে।

ভারত বাণিজ্যের ফাঁক দিয়ে ভারতের সম্পদ যেমন বেহাত হয়েছে—সংগে সংগে ভারতের মানুষের ক্রয় ক্ষমতাও ধীরে ধীরে কমতে সুরু করেছে।

ক্রয় ক্ষমতার ক্রম-অবলুপ্তি মানুষের চাহিদা কমিয়ে আনে। নতুন চাহিদাও সৃষ্টি করে না। ফলে, সমাজে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা যেমন থাকে না তেমনি নতুন নতুন পণ্যের উৎপাদন সম্ভাবনা লুপ্ত হয়ে আসে। আবার উৎপাদন না বাড়লে সামাজিক সম্পদও সৃষ্টি হয় না—সমস্ত ব্যাপারটাই এমনই একটা অপচক্রের (Vicious circle) মধ্যে ডুবে যায় যার জল কেটে উন্নত আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে ফিরে আসতে গিয়ে প্রচুর-কাঠ খড় পোড়াতে হয়।

আমাদের ক্রয় ক্ষমতার ঘাটতি থাকলেও দেশের বাইরে আমাদের পণ্যের বিস্তৃত বাজার ছিল। সেই পণ্যের বিক্রী বাবদে বহির্বাণিজ্যের মারফৎ সাধারণ কারিগর, শিল্প শ্রমিক কিংবা

বণিকের হাতে যে অর্থাগম হতে পারতো তা থেকে নতুন শিল্পযুগের প্রাথমিক মূলধন সঞ্চিত হতো।

কিন্তু তা হয়নি। ক্রমাগত বাণিজ্যবৃদ্ধির মাধ্যমে আমাদের দেশ থেকে শিল্প পণ্য, খাদ্যশস্য ও অন্যান্য সম্পদ লুন্ঠিত হয়েছে। সেদিন, বহির্বাণিজ্যের বৃদ্ধি মানেই ছিল এই সম্পদ লুণ্ঠন—বহির্বাণিজ্যর বৃদ্ধি মানেই বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনার অবলুপ্তি।

ভারতের বহির্বাণিজ্যের এই মারাত্মক চরিত্র সম্পর্কে রমেশচন্দ্র যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। তখন বহির্বাণিজ্যের বৃদ্ধির মুখে আমাদের সম্পদ বৃদ্ধির কোনো রাস্তাই খোলা ছিল না—রমেশচন্দ্র তা পরিষ্কার দেখে নিয়েছিলেন।

(১) Appendix A

(২) রমেশ দত্তের দেওয়া পরিসংখ্যানে কিন্তু একসপোর্ট সারপ্লাস আরো বেশি।

(৩) Page 65,—B. N. Ganguli—Dadabhai Naoroji and the Drain theory.

(৪) R. C. Dutt—The Economic History of India (Part II). Publication Division Govt. of India. P. 385.

রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনস্টাইন, বন্ধুত্ব-ইতিহাস

অশ্রুকুমার সিকদার

আটলান্টিকের দুই তীর

রবীন্দ্রনাথ পুত্রপুত্রবধূসহ ইংল্যাণ্ডের নবপ্রাপ্ত বন্ধুমণ্ডলীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মার্কিনদেশের পথে যাত্রা করলেন এবং তাঁরা সম্ভবত ২৮শে অক্টোবর নিউইয়র্কে পৌঁছিয়েছিলেন।১৭ পৌঁছিয়েই বন্ধুকে লিখলেন—

This is my taste of America—the custom house and the interviewers.

মার্কিনদেশ থেকে লিখিত এই পত্র থেকে বোঝা যায় ছয় মাসের অল্প সময়ের মধ্যে রোটেনস্টাইন রবীন্দ্রনাথের জীবনে কতখানি গভীর বন্ধুত্বের আসন অধিকার করতে পেরেছিলেন।

In London your friendship was the only refuge I had, and I clung to you with all my heart. If I had not known you I should have gone back to India not knowing Europe. It fills me with wonder when I think how by a merest chance I came to know you and in what a short time your friendship has become a part of my life.

আর্বানার নির্জনবাস থেকে বন্ধুকে চিঠি লিখে (১৯শে নভেম্বর ১৯১২) তিনি জানিয়েছিলেন এই বন্ধুলাভের সৌভাগ্যকে তিনি ঐশ্বরিক আশীর্বাদ বলে মনে করেন। চিঠিটির অংশ বিশেষ রোটেনষ্টাইন আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডে উদ্ধৃত করেছেন।

I thought I had come to that age when the doors of my inner theatre must be closed and no more new admission could be possibie. But the impossible has happened and you have made my life larger by your friendship. I feel its truth and its preciousness all the more because it came to me so unexpectedly and in a surrounding not familiar to me at all. That, I should, while travelling in a foreign land, meet with some experience of life which is not temporary and superficial fills me with wonder and gratitude. It is to me a gift from the divine source and I shall know how to value it.

আর্বানার যে সংসার বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ ৮ ডিসেম্বর ১৯১২ তারিখে দিয়েছেন সেই কৌতুক-স্মিতহাস্য উদ্ভাসিত পত্র তখনই কোনো পত্রপ্রাপকের উদ্দেশ্যে লিখিত হতে পারে যখন তাঁর সঙ্গে সৌহার্দ্য নিবিড় হয়ে গভীর হয়ে অস্তিত্বের মূলকে স্পর্শ করে। চিঠিটি থেকে একটি বৃহৎ অংশ উদ্ধৃত করছি, এটি এতই সরল যে উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার।

The house we have engaged is a cosy little place and locality is very quite. Pratima is doing the house-keeping. We have been trying to find somebody to

help her in the kitchen but have not been successful yet. We had a Japanese student for a few days. We discovered that he had a very fair knowledge of Jujutsu but not the faintest notion of cooking. So we had to abandon that experiment soon enough. As there is no restaurant anywhere near our house we depend upon the unsophisti ated skill of Rathi and Pratima for our meals and we take our daily nourishment with uncomplaining resignation. We have an Indian student ১৮ to help us in dusting rooms and washing dishes. He had been a teacher of mathematics in our school. Being brought up as a poet, the only help that I can offer our party is never to try to assist them in their work. Our household here is a most bright example of self-help—certainly not very bright in its effect upon the external of our surroundings. I wish Mrs. Rothenstein could come and see us. I should not ask her to dinner, for that would be asking too much. But I am sure she would enjoy the sight of our professor of mathematics bravely tackling the problems of brooms and mops. Somendra ১৯ is living with us. He is a cheerful and lazy, always humming song out of tune in perfect unconcern. He has all the qualifications of a poet except the gift of the metre and music.

আর্বানার রচেস্টারে শিকাগোয় হারভার্ডে বক্তৃতা দিয়ে, ব্রুকস্ সেমুর লিউইস প্রভৃতি অধ্যাপকবর্গের সাহচর্যে প্রীত হয়ে, 'Poetry'-র সম্পাদিকা শ্রীমতী হ্যারিয়েট মনরো-র সঙ্গে সাক্ষাতের পর যখন মার্কিনদেশ থেকে আবার বিলাতে ফেরার পালা এলো তখনও রবীন্দ্রনাথ রোটেনষ্টাইনকে স্মরণ করেছেন যাত্রার পূর্বাহ্ণে ; তারিখবিহীন একটি চিঠিতে লিখেছেন,

I cannot tell you how glad I fell to be once again near you, for which I always had a longing since I came to this country.

এই আকুলতার সঙ্গে জানাচ্ছেন মার্কিনদেশ সম্বন্ধে তাঁর সাধারণ ধারণা—

I have refused to be handled and passed from one show to the other by the connoisseurs of genius. The people in this country are hearty in their kindness but there is a rudeness in their touch, it is vigorous but not careful. Their admiration is not convincing therefore I could not take any delight in it as I did in your country. However, I have met with some sincere friends in America and I am deeply grateful to them. ২০

রোটেনষ্টাইনের প্রতি তাঁর বন্ধুত্বের কথাকে যে রচনায় রবীন্দ্রনাথ স্থায়িত্ব দিয়েছেন সেটি 'পথের সঞ্চয়ের' 'বন্ধু' শীর্ষক রচনা—যাঁরা দুইজনের বন্ধুত্বনিবিড়তা জানতে চান তাঁদের এটি অবশ্যপাঠ্য। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

আমার বন্ধুটি স্বভাব বন্ধু—তাঁহার বন্ধুত্বের প্রতিভা অসামান্য। ইহার পক্ষে বন্ধুত্ব জিনিসটা সত্য বলিয়াই ইহাকে বিশেষ যত্নে বন্ধু বাছিয়া লইতে হয়।…ইহার যাঁহাদের সম্বন্ধ আছে সকলেই ইহার বন্ধু এবং সকলেই গুণী এবং বিশেষভাবে সমাদরের যোগ্য।…অপরিচয় হইতে পরিচয়ের পথ অতি দীর্ঘ। সেই দুঃসাধ্য পথ অতিক্রম করিবার মত সময় আমার ছিল না। আমার শক্তিও অল্প।…এমন সময় প্রবেশ করিলেন বন্ধু, পর্দা তুলিয়া দিলেন—দেখিলাম আসন পাতা, দেখিলাম আলো জ্বলিতেছে। বিদেশীয় অপরিচয়ের মস্ত বোঝাটা বাহিরে রাখিয়া, পথিকের ধূলিলিপ্ত বেশ ছাড়িয়া ফেলিয়া, এক মুহূর্তে ভিড়ের মধ্য হইতে নিভৃতে প্রবেশ করিলাম।

এই বন্ধুপ্রেম এই অনুরাগ যে একতরফা ছিল না তার একটি প্রমাণ মার্কিনদেশে যাত্রার পূর্বাহ্ণে রবীন্দ্রনাথকে লেখা রোটেনষ্টাইনের একটি চিঠি (অক্টোবর :৮, ১৯১২। চিঠিটি 'Visva Bharati Quarterly'-র রবীন্দ্রশতবার্ষিক সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে।

You have walked so quietly into my life, yet somehow you have filled it with a new essence and I don't feel it will now be quite the old life I shall live again. To me they have been wonderful days, these days I have spent with you. I have never, I think, been so near to another man, or looked so deep into the well of another's soul. What I have seen there will help me to respect and love my fellows more than ever before and so long I hope as I live this vision will remain with me···Your poems and your personality will bring you the love and admiration of many men and women but somehow I feol that no lne will ever know better than myself that in loving and admiring you they are paying their homage to life itself.

॥ আবার বিলাত ॥

Olympia জাহাজ যোগে ১২ই এপ্রিল নিউইয়র্ক থেকে যাত্রা করে ১৪ই এপ্রিল রবীন্দ্রনাথ পুনরায় লণ্ডনে উপনীত হলেন।২১ মার্কিনদেশে যাত্রার পূর্বে অর্শের রক্তপাতজনিত কারণে খানিকটা অসুস্থ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। যাত্রার পূর্বে রবীন্দ্রজীবনী-২ এ উদ্ধৃত এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—

অ্যালোপ্যাথদের মতে এই রোগে অস্ত্রাঘাত ছাড়া অন্য পন্থা নেই। তাহলে আমাকে অন্তত একমাস হাসপাতালে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে থাকতে হবে। সেটা আমার ভালো লাগবে না। তাই ঠিক করেছি আপাতত কিছুদিন আমেরিকায় ডাক্তার গ্লাসের দ্বারা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করাব, তাতে যদি ফল না পাই তখন অস্ত্রচিকিৎসা করালেই হবে।

কিন্তু সেখানে রোগের উন্নতি হয় নি। বিলাতে ফিরে এসে তাই Caxton Hall-এ 'Sadhana' বক্তৃতাবলী দানের পর অস্ত্রচিকিৎসার শরণাপন্ন হতে হলো। প্রথমে তিনি বহুব্যয়সাধ্য অস্ত্রচিকিৎসায় রাজি হন নি, কিন্তু পরে রোটেনষ্টাইনের চেষ্টায় ইংলণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শল্যচিকিৎসক নামমাত্র ফীর বিনিময়ে অস্ত্রোপচার করতে রাজি হন। তিনি Duches Nurshing Home-এ

(রবীন্দ্রজীবনীতে এই নাম, রোটেনষ্টাইনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রে আরোগ্য নিকেতনের নাম Duches House) ভর্তি হলেন। তিনি সেখান থেকে রোটেনষ্টাইনের উৎসাহপত্রের উত্তরে লিখলেন (৬ জুলাই ১৯১৩)

Tbe forced cheerfulness of your letters are sadly pathetic, my friend,—for I know you had to go through all this interminable series of out rages not very long ago. It is dreadful to have to watch helplessly the indignity that is being daily offered to my poor body in the name of the science of healing, as if the body were no more than a peace of flesh and bones. Surely she has her claims to be treated with the utmost delitacy and respect, considering that it is her noble privilege to initiate our soul into the double mystery of life and death.

আরোগ্যনিকেতন থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি 16 More's Garden, Cheyne Walk-এর ঠিকানায় অবস্থান করলেন এবং গান রচনা ও অনুবাদ-সংস্কারে নিজেকে নিযুক্ত করলেন। অসুস্থ শরীরে অনুবাদকর্মের যান্ত্রিকতায় কবির মন যতই ক্লান্ত ততই বোলপুর আশ্রমের প্রতি ধাবমান। এই মনোভাবের সাক্ষী আর একটি চিঠি (১৭ আগষ্ট ১৯১৩)।

This coldblooded literary craftsmanship, this weighing of words and expressions is utterlty wearisome. I am pining for touch of life, for the warmth of reality—and that is the reason why the call of my Bolpur school is getting to be more and more insistant.

স্বদেশ যাত্রার পূর্বে দুদিনের জন্য রোটেনষ্টাইনের নতুন পল্লীবাসগৃহ Far Oakridge-এ কাটিয়ে এলেন, সেখানে রচিত হলো একটি গান 'জীবন যখন ছিল ফুলের মতন'। রবীন্দ্রনাথ কালীমোহন ঘোষ ও সুকুমার রায় ২২ এই দুই সহযাত্রী নিয়ে লিভারপুল থেকে ৪ঠা সেপ্টেম্বর S. S. City of Lahore জাহাজে দেশাভিমুখে যাত্রা করলেন। রোটেনষ্টাইনের আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডে ও Speaight-রচিত রোটেনষ্টাইন জীবনীতে রবীন্দ্রনাথের ইংল্যাণ্ড ত্যাগের প্রাক্কালে তাঁর সম্মানে এক ভোজসভার বিবরণ পাই। Speaight-এর জীবনী অনুযায়ী

Ernest Rhys invited Rothenstein to preside at a Farewell Dinner to Tagore at the Hotel Brice on 5th Sept. 1913.

এই তারিখ ভ্রমাত্মক মনে হয় কারণ রবীন্দ্রজীবনী মতে রবীন্দ্রনাথ ৪ঠা তীরভূমি ত্যাগ করেন। আবার Speaight-এর বিবরণী মতে সভার উদ্যোক্তা রীস্, রোটেনষ্টাইনের নিজের বিবরণে উদ্যোক্তা তিনি স্বয়ং এবং ইয়েটস্। সভার পরবর্তী কাহিনী কৌতুকপ্রদ ; Speaight লিখেছেন—

The evening ended on a note of competitive patriotism with Yeats, William and Tagore each forgetting the words of their national anthems.

রোটেনষ্টাইন এই তালিকায় রীসের নাম যোগ করে বলেছেন, রীস্‌ও ওয়েলশ্ জাতীয়

সঙ্গীতের কথা মনে করতে পারেন নি। Speaight লিখছেন ভোজসভার পরের দিন সকালে ইউসটন থেকে লিভারপুলগামী ট্রেনে ওয়ালফোর্ড ডেভিস সমভিব্যাহারে রোটেনষ্টাইন কবির সঙ্গে গেলেন বন্দর পর্যন্ত, জাহাজ ছাড়ার পূর্ব মুহূর্তে বিদায় সম্ভাষণ জানানোর জন্য। যখন—

We are passing through Gibralter—the rock looks like a dozing sentry in the early morning light.

তখনও রবীন্দ্রনাথ বন্ধুকে উদ্দেশ করে সমুদ্র ও সহযাত্রীদের বিবরণ দিয়ে কৌতুকরসসিঞ্চিত চিঠি (৭ সেপ্টেম্বর ১৯১৩) লিখে চলেছেন।

১৭ Herald Sqare Hotel, 34th Street & Broadway, New York থেকে রবীন্দ্রনাথ যে চিঠিতে লিখেছেন, 'We have landed in New York this morning' সেই চিঠির তারিখ ২৭ অক্টোবর ১৯১২। কিন্তু রবীন্দ্রজীবনী-২ অনুসারে পৌঁছানোর তারিখ ২৮শে।

১৮ বঙ্কিমচন্দ্র রায়

১৯ সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মণ

২০ রোটেনষ্টাইনকে লেখা পত্রে রবীন্দ্রনাথের সম্বোধনের বিবর্তন লক্ষণীয়—প্রথমে 'Dear Mr. Rothenstein'; মার্কিনদেশে পদার্পণ করে দূরের বন্ধুকে সম্বোধন 'Dear Friend'; তারপর সারা জীবন 'Dear friend' বা 'My dear friend'; কচিৎ 'Beloved friend' (ভারতযাত্রী জাহাজ City of Lahore থেকে লেখা ৭ সেপ্টম্বর ১৯১৩-র চিঠি); অনেকক্ষেত্রে 'My dearest friend' (২০ আগষ্ট ১৯১৫)। মার্কিনদেশে যাবার পর নামধরে সম্বোধন বিরল।

২১ এই তারিখ রবীন্দ্রজীবনী-২ অনুযায়ী; রবীন্দ্রনাথের চিঠি অনুযায়ী তাঁরা লণ্ডনে পৌঁছান 'rather tired for want of sleep' ১৯শে এপ্রিল।

২২ ১৯২২ সালে সাউথ কেনসিংটনের বাসা বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের থাকাকালীন ক্রমোয়েল রোডস্থ Indian Students' Hostel নিকটে ছিল। ছাত্ররা অবাধে রবীন্দ্রনাথের কাছে আসত। রবীন্দ্রনাথ সেই প্রসঙ্গে লিখছেন—"But the one who was the life and soul of the party —Sukumar Roy—a process engraver by profession but far better known as a humorist and writer—is no more."

বঙ্কিম উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা

অশোক কুণ্ডু

চিত্রা (রাধাঃ ৮ম পরিঃ) ॥

রাধারাণীর দাসী। মণিরাণীর দয়িতের সংগে মিলনে সে পুরস্কার আদায় করতে পটু।

চুণিলাল দত্ত (কৃঃ উঃ ২।১০) ॥

প্রসাদপুরে বসবাসকালে গোবিন্দলালের ছদ্মনাম।

জগৎশেঠ [স্বরূপচন্দ ও মাহতাবচন্দ] (চন্দ্রঃ ২।৬) ॥

মুর্শিদাবাদস্থ বণিক পরিবারের পদবী ছিল জগৎশেঠ। এঁদের আদি বাসস্থান ছিল রাজপুতনার যোধপুর রাজ্যের শগর নামক নগরে। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে স্বরূপচন্দ্র ও মাহতাবচন্দ নামক শেঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের সংগে গুরগণ খাঁ, নবাবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দৃঢ় করার জন্য অর্থাগামের পরামর্শ করেছিলেন।

এঁরা ঐতিহাসিক ব্যক্তি। দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক হিসাবে এঁদের নাম ইতিহাসে কলঙ্কিত। ১৭৬৩ খ্রীঃ মীরকাশেম এঁদের বন্দী করার আদেশ দেন। উধুয়ানালার যুদ্ধে নবাব পরাজিত হলে এঁদের নিয়ে মুঙ্গেরে আসেন। অবশেষে নবাবের ক্রোধে এঁদের প্রাণবিনাশ হয়।

জগৎসিংহ (দুর্গেঃ ১।১) ॥

জগৎসিংহ 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের নায়ক। অম্বরাপতি মানসিংহের পুত্র তিনি। বর্তমান উপন্যাসে জগৎসিংহের যে কাহিনী বর্ণিত আছে—তার উৎস 'Stewart's History of Bengal' কিন্তু এই বর্ণনায় অনেক ভুল তথ্য আছে। যদুনাথ সরকারের মতে আকবরের সমসাময়িক পারসিক ইতিহাসগুলির মধ্যে আকবরনামা (৩য় ভলুমে) গ্রন্থটিতেই জগৎসিংহের যুদ্ধের বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনা আছে। যদুনাথ সরকার আকবরনামায় যে প্রয়োজনীয় অংশটুকুর বঙ্গানুবাদ করেছে তাতে জানা যায়, মানসিংহ পুত্রের অধীনে এক ফৌজ দিয়ে পাঠানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠালে, ভৎলু খাঁয় সেনাপতি মদের নেশায় অচেতন ও অনভিজ্ঞ জগৎসিংহকে সহজেই বন্দী করেন। এর থেকে জানা যায় জগৎসিংহের চরিত্র ছিল নিতান্তই মদ্যলিপ্ত। এবং অতিরিক্ত মদ খাওয়ার ফলেই ৬ই অক্টোবর ১৫৯৯ খ্রীঃ আগ্রার নিকট তিনি অকাল মৃত্যুবরণ করেন। বহাবাহুল্য উপন্যাসের জগৎসিংহ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের চরিত্র।

উপন্যাসে জগৎসিংহের বীরত্ব সর্বত্রই প্রকাশিত হয়েছে। গড়মান্দারণ দুর্গে বন্দী অবস্থায় তিনি জ্ঞান না হারান পর্যন্ত বীরের মত যুদ্ধ করেছেন। ওসমানের সংগে দ্বন্দ্ব যুদ্ধেও তাঁর বীরত্বের

মহিমা ঘোষিত হয়েছে। বীরত্বের সংগে এই চরিত্রের মধ্যে আদর্শবাদী মনোভাবটিও সংমিশ্রিত হয়েছে। তাই ওসমান কর্তৃক প্রলোভিত হয়ে তিনি বাদশাহের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে সন্ধিস্থাপনে স্বীকৃত হননি।

জগৎসিংহ কেবল বীর নন, প্রেমিকও। প্রেমিকাকে দর্শনের জন্য তিনি বিমলার সংগে গড়মান্দারণ দুর্গে চোরের মত প্রবেশ করেছিলেন, অথচ সেই জগৎসিংহই আয়েষার সাহায্যে কতলু খার বন্দীত্ব থেকে পালাতে চাইলেন না,—এমনি প্রেমের মহিমা!

প্রেমিকা হিসাবে জগৎ সিংহের সংগে ওসমানের পার্থক্য এই যে—একজন না চাইতেই পান, অপরজন চেয়েও প্রত্যাখ্যাত হন। তবে জগৎসিংহের প্রেমেও একনিষ্ঠতা আছে। তিলোত্তমার সম্বন্ধে ভুল সংবাদ শুনে তার প্রতি জগৎসিংহের যতই ক্রোধ জন্মাক এবং তিলোত্তমাকে যতই রূঢ় আঘাত দিন না কেন, আয়েষার মত রমণীরত্নের প্রেমোপহার গ্রহণ না ক'রে যথার্থই প্রেমিকরূপে চিহ্নিত হয়েছেন। জগৎসিংহের কোমলহৃদয়ে আয়েষার জন্য ছিল অকৃত্রিম মমত্ববোধ। অবশ্য এই দুই নায়িকার আকর্ষণের মধ্যে তাকে পরবর্তীকালের ঔপন্যাসিকদের হাতে যে হৃদয়দ্বন্দ্বের ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হতে পারত, বঙ্কিমের উপন্যাসে তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নি। সাধারণ মান-অভিমানের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত স্বাভাবিক মিলনান্তক পরিণতিই ঘটেছে উপন্যাসের মধ্যে।

বঙ্কিমচন্দ্র এই চরিত্রটিকে নায়কের আদর্শানুসারে যত্নের সঙ্গে গড়লেও, উপযুক্ত বিশ্লেষণের অভাবে চরিত্রটি সক্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি।

জন ষ্ট্যালকার্ট (চন্দ্রঃ ৬।৪) ॥

সমরুর কাছে ফষ্টার এই নামে পরিচয় দিয়েছিল।

জন্সন্ (চন্দ্রঃ ২।৭) ॥

অমিয়টের সহচর ইংরেজ। স্বতন্ত্র চরিত্র হিসাবে নয়, অমিয়টের ছায়ারূপেই 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে বিদ্যমান।

জনার্দন (মৃণাঃ ২।২) ॥

জনার্দন মনোরমার প্রতিপালক। বৃদ্ধ জনার্দন ও তাঁর বৃদ্ধা স্ত্রী মনোরমাকে নিয়ে নবদ্বীপের এক কুটীরে বাস করতেন। ঝড়ে সে কুটীর ভেঙে যাওয়ায় রাজপুরুষদের অনুগ্রহে তিনি এক রাজগৃহে স্থান পেয়েছিলেন। জনার্দন বধির। তাঁর সঙ্গে হেমচন্দ্রের কথোপকথনে বঙ্কিম হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। বিশেষ করে যখন জনার্দন তাঁর স্ত্রীকে 'কালা' অপবাদ দেন তখন হাস্যরস আরো জমে ওঠে।

কিন্তু উপন্যাসে জনার্দনের প্রয়োজন অন্যত্রও আছে। জনার্দন মনোরমার পিতা কেশবের আচার্য। মৃত্যুকালে কেশব এঁর হাতে মনোরমার ভার দিয়ে যান এবং পশুপতি যে মনোরমার

স্বামী সেকথা বলে যান। উপন্যাসে অনুক্ত থাকলেও মনে হয় জনার্দনের কোন সন্তানাদি ছিল না, তাই মনোরমাকে তাঁরা প্রাণাপেক্ষা ভালবাসতেন।

জনার্দনের ব্রাহ্মণী (মৃণাঃ ২।২) ॥

উপন্যাসে নামোল্লেখ মাত্র আছে।

জয়ধর সিংহ (দুর্গেঃ ১।৫) ॥

জয়ধর সিংহ বীরেন্দ্র সিংহের পূর্বপুরুষ। তিনি হোসেনশাহার একজন হিন্দু সৈনিক ছিলেন। কালক্রমে গড়মান্দারণ তিনি জায়গীর হিসাবে প্রাপ্ত হন। কোন চরিত্রবৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়নি।

জয়ন্তী (সীতাঃ ১।১১) ॥

প্রফুল্লর নিষ্কাম-ধর্মানুশীলন জীবনের সঙ্গীনা ছিল নিশি, শ্রীর সন্ন্যাসজীবনের সঙ্গী জয়ন্তী। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য প্রচুর। নিশি প্রধানতঃ প্রফুল্লর চিন্তার দ্বারা আচ্ছন্ন, অথচ শ্রী জয়ন্তীর দ্বারাই প্রভাবিত।

জয়ন্তী সন্ন্যাসিনী। বঙ্কিম অপ্রয়োজনবোধে তাঁর পূর্বজীবনের কোন কথা বলেননি। কিন্তু জয়ন্তীর মধ্যে সন্ন্যাসধর্মের কঠোরতা অপেক্ষা স্নেহের কোমলতা অধিক পরিমাণে বিদ্যমান। তাই দুঃখিনী শ্রীকে তিনি বোনের মতই ভালবেসেছেন। নিজের পথে শ্রীকে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন।

জয়ন্তী শ্রী ও সীতারামের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীনী। গঙ্গারামের বিশ্বাসঘাতকতায় সীতারামের নিশ্চিত সর্বনাশকালে জয়ন্তীই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রতিরোধ দান করেছেন। আবার শ্রীর মুখের দিকে তাকিয়েই তিনি গঙ্গারামের দ্বিতীয় বারের প্রাণদণ্ড মকুব করে দিয়েছেন। শ্রীকে উদ্ধার করার সময়ও জয়ন্তীর স্নেহভাবই প্রকাশিত।

কিন্তু সর্বক্ষেত্রে জয়ন্তীর বুদ্ধির প্রশংসা করা চলে না। তাহলে সীতারামের নৈতিক অবনতির কারণ সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হয়েও তিনি কেন শ্রীকে সংসারধর্মে প্রবেশ করতে অনুরোধ করলেন না।

জয়ন্তীকে বঙ্কিম বাইরে সন্ন্যাসিনী সাজিয়েছেন, কিন্তু অন্তরের মানবীভাবকে দূরে সরিয়ে দেননি। সীতারামের আদেশে জয়ন্তী নিজেই বিবস্ত্রা হতে গিয়ে নিজের নারীত্বের লজ্জা ও সংকোচকে আবিষ্কার করে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন।

সন্ন্যাসিনী জয়ন্তী অপেক্ষা এই মানবী জয়ন্তীই উপন্যাসে সর্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

জয়সিংহ (রাজঃ ৫।৬) ॥

জয়পুরের রাজা জয়সিংহ ঔরংজেবের অনুগত ছিলেন। তিনি ঔরংজেবের সেনাপতিত্বও

করেছিলেন। কিন্তু—"বিশ্বাসঘাতক বন্ধুহস্তা ঔরঙ্গজেবের কৌশলে বিষপ্রয়োগ দ্বারা তাঁহার মৃত্যু সাধিত হইয়াছিল।"

জাঁহাগীর (কপাঃ ৩।১) ॥

দ্রঃ সেলিম।

জীবন ভাণ্ডারী (সীতাঃ ১।২) ॥

সীতারামের পরিবারের ভাণ্ডাররক্ষক। "জীবন ভাণ্ডারীর বয়স কিছু বেশী, কতকগুলো চাবি ঘুন্‌সিতে ঝোলান। মুখ বড় রুক্ষ।" কিন্তু প্রাপ্তিযোগ থাকলে জীবনভাণ্ডারী বেশ প্রসন্ন হয়, বেশ বোঝা যায়।

রবীন্দ্র সদন প্রসঙ্গে

গত দু'বছর ধরে রবীন্দ্র সদন নিয়ে যে টানা হেঁচড়া চলছিল এ বছর তার নিরসন হবে প্রত্যাশা করা গিয়েছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ির ঠেলায় এবারও বেশ একটা গোলযোগ দেখা দিল। এর পর যদি রবীন্দ্র সদন প্রতিষ্ঠার আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে এমন ধারণা করলে নিশ্চয় অন্যায় হবে না। তবে গরুর ঘর পুড়লে সে স্বাভাবিক ভাবেই সাবধান হয় ধরে নিয়ে রবীন্দ্র সদনের সুষ্ঠু পরিচালনা ব্যবস্থার একটি ছক কর্তৃপক্ষের সামনে উপস্থাপিত করা হচ্ছে।

স্বাভাবিক ভাবেই নাট্য পরিচালক তথা ব্যবস্থাপক হিসাবে উপযুক্ত ব্যক্তির নির্বাচন রবীন্দ্র সদনের সুষ্ঠু পরিচালনার প্রথম প্রয়োজন। নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের মত সর্বজনমান্য কেউ থাকলেও না হয় কথা ছিল কিন্তু বর্তমানে কোন নট-পরিচালকই যখন যে দাবী করতে পারেন না তখন পরিচালক নির্বাচন পর্বটার কথা প্রথমে না ধরে শেষে ধরতে চাইছি।

প্রথমেই ধরা যাক কার্যনির্বাহক সমিতির কথা। এখানে নির্দিষ্ট সংখ্যক সভ্য নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচকমণ্ডলীকে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ভাগ করতে হবে যেমন অভিনেতাদের জন্য, নাট্য পরিচালক ও প্রয়োগ প্রধান, দৃশ্য ও মঞ্চকল্পক, আলোক প্রক্ষেপক শব্দ নিয়ন্ত্রক প্রভৃতির জন্য হিসাবমত নির্দিষ্ট সংখ্যক সভ্য নির্বাচন করতে দেওয়া হবে। এছাড়া নাট্য সমালোচক, নাট্য রসিক প্রভৃতিদেরও উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি থাকবে। যেমন থাকবে সরকারী প্রতিনিধি। এঁরা সকলে মিলে রবীন্দ্র সদনের কর্মপরিচালনার রূপরেখা ছকে দেবেন। আর ব্যয় সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যবস্থাবলীও এঁরাই গ্রহণ করবেন।

নাট্য পরিচালনার দায়িত্ব পালনের জন্য কোন বিশেষ ব্যক্তি (এক বা একাধিক)কে নির্দিষ্ট কালের জন্য নিয়োগ করবেন। এই কাল সময় দ্বারা নিরূপিত বা নাটক বিশেষ দ্বারা নিরূপিত হবে। তবে বোধ হয় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিয়োগই সমীচিন হবে কারণ তাহলে নিশ্চিন্ত মনে তিনি তাঁর ইচ্ছামত নাট্যায়ন করতে পারবেন প্রয়োজন বোধে সহযোগী ও সহকারী পরিচালকও নির্বাচিত করা যেতে পারে। পরিচালক প্রয়োজনমত বিশেষজ্ঞ সদস্যদের মধ্য থেকে আলোক সম্পাত, শব্দ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির জন্য লোক বেছে নিতে পারবেন।

পরিচালকের নাট্য নির্বাচন, ভূমিকা বণ্টন প্রভৃতির কাজে নিরংকুশ স্বাধীনতা থাকবে। তবে কার্যনির্বাহক সমিতি কি ধরণের নাটক করলে ভাল হয় বা বাংলা নাট্য সাহিত্যের পূর্ণরূপ রেখা অনুধাবনের জন্য কোন কোন নাটক কিভাবে উপস্থাপন করা প্রয়োজন সে বিষয়ে পরি-চালককে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত জানাবেন। তবে গ্রহণ বা বর্জন সম্পূর্ণতঃ পরিচালকের

ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনার ওপর নির্ভরশীল থাকবে।

কার্যনির্বাহক সমিতি নাট্যশিক্ষা তথা নাট্যসহযোগিতার বিভিন্ন অংগ সম্বন্ধে একটা শিক্ষাক্রমও স্থাপিত করবেন এবং উপযুক্ত শিক্ষকদের সাহায্যে তা কার্যে রূপান্তরের জন্য সচেষ্ট হবেন।

বিভিন্ন বিভাগীয় বিশেষজ্ঞ সভ্যরা নিজেদের বিশেষত্ব সম্বন্ধে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হবেন। আলোক সম্পাত, শব্দ প্রক্ষেপণ, মঞ্চকল্পনা এমনকি সমালোচনারও নির্দিষ্ট মাত্র প্রতিষ্ঠা সেক্ষেত্রে সম্ভবপর হবে বলেই মনে হয়। তবে এর জন্য রবীন্দ্র সদনের নিজস্ব মুখপত্র থাকা দরকার।

এবার আসা যাক পরিচালক নির্বাচনের প্রশ্নে। সাধারণতঃ প্রয়োগকর্তা বা পরিচালকরূপে যাঁরা স্বীকৃতি লাভ করেছেন, পরিচালক তাঁদের মধ্যে থেকেই নির্বাচিত হবেন। তবে অবস্থা ও ক্ষেত্র বিশেষে অন্যান্য বিশেষজ্ঞদেরও পরিচালক নির্বাচিত করা যাবে।

প্রথমতঃ পরিচালক পদ গ্রহণেচ্ছুদের নাম আমন্ত্রণ করা হবে, তারপর একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের সাহায্যে প্রার্থীদের বাছাই করা হবে। সর্বনিম্ন সংখ্যক ভোট প্রাপ্ত প্রার্থী (এক বা একাধিক) প্রতিবার বাদ যাবেন যতক্ষণ না দু'জন মাত্র প্রার্থী অবশিষ্ট থাকেন। এই দু'জনের সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যিনি জয়লাভ করবেন তিনিই হবেন পরিচালক। তাঁর কর্মকাল অন্ততঃ তিন বছর হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং মাত্র একবার তিনি পুনর্নিবাচনের অধিকার পাবেন। অবশ্য অন্য একজন পরিচালকের পর পূর্ববর্তী পরিচালক আবার নির্বাচনপ্রার্থী হতে পারবেন।

এতে নাট্য পরিচালনার উপযুক্ত পরিবেশ যেমন গড়ে উঠবে, তেমনি সময় পাওয়ায় পরিচালকের পক্ষে সুষ্ঠু কার্যক্রম অনুসরণ সম্ভব হবে।

এ ছক সম্বন্ধে নাট্যরসিকরা কি বলেন জানার আগ্রহ রইল। সেই সব আলোচনার পরি-প্রেক্ষিতে রবীন্দ্র সদন তথা বাংলা নাট্যশালার ভবিষ্যত পথ ও মত সম্বন্ধে আলোচনার ইচ্ছা রইল।

রবি মিত্র

সাহিত্যে আধুনিকতার তাৎপর্য ও ইতিবৃত্ত

ইদানীংকালে নানা দেশের সাহিত্যকৃতির মধ্যে যে আধুনিক মননের ইঙ্গিত হামেশাই পাওয়া যায় এবং যা নিয়ে সাহিত্যিক মহলে বিতর্কের সীমা নেই, আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, তা বোধ হয় হাল আমলেরই বিশেষত্ব—উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদ থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদের সাহিত্যিক মননের মধ্যেই এই আধুনিক বিচিন্তা মহীরুহের বীজরোপন ও ফলন। অর্থাৎ কম বেশি একশ' বছর। কিন্তু সাহিত্যে আধুনিকতার ইতিহাস যে কতদূর অতীতে প্রসারিত—খৃঃ পূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতেও যার পরিচয় পৃথিবীর নানা দেশ ও নানা জাতির প্রাচীন সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে, সে সম্বন্ধে একালের সাহিত্যিকরা যথাযথ অবহিত নন বললে অন্যায় হয় না। বিশেষ করে আমাদের বাংলা সাহিত্যের লেখক ও ভাষ্যকারদের সম্বন্ধে এ রকম অনুযোগ অনায়াসেই করা চলে। এঁদের দৃষ্টি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সাহিত্যিক গোষ্ঠীর ধ্যান-ধারণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বস্তুতঃ উনবিংশ, বিংশ শতাব্দীর 'কন্টিনেণ্টাল' সাহিত্য অনুধাবনের মধ্যেই তা পরিসীমিত। য়েটস্, এলিয়ট্, স্পেণ্ডার, গেভস্ ও ম্যাকৃনিসের সাহিত্য কৃতিত্বে আধুনিক বৈশিষ্ট্যের সীমানার মধ্যেই এঁদের চলাফেরা। কিন্তু বর্তমান 'কন্টিনেণ্টাল' সাহিত্যিকদের পূর্বসূরীরা, যেমন চসার, বার্ণস্, মিল্টন ও ডোন—যাদের মননের মধ্যেও যে আধুনিক চিন্তার বীজ উপ্ত ছিল বা প্রাচীনতম গ্রীক ও লাতিন সাহিত্যিকদের ভেতরও যে পথিকৃৎ স্রষ্টা ছিলেন সে বিষয়ে এ কালের বাংলা সাহিত্যিকরা ঠিক অবহিত নন। বাংলা সাহিত্যিক বলছি, এই কারণে যে, বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যে যেটুকু আধুনিক ভাবনার স্ফুরণ দেখা যাচ্ছে এবং যা নিয়ে আধুনিকতার পরিপ্রেক্ষিতে কূট সাহিত্য বিচার চলছে, তা ওই ফ্রান্স-ইংলণ্ডের সাহিত্যকে কেন্দ্র করে। প্রাচীন গ্রীক ও লাতিন সাহিত্যেও যে কেউ কেউ সমকালীন অনুভাবনায় দিশারী বলে গণ্য হতে পেরেছিলেন, বাংলা সাহিত্য ভাষ্যকারের রচনায় কোথাও তার উল্লেখ পাওয়া যায় না। খৃঃ পূর্ব প্রথম শতাব্দীতে সিসেরো (১০৬—১৪৩) আধুনিক ও প্রাচীন চিন্তার বিভিন্নতা লক্ষ্য করে Poetae novi বা Neoteroi লাতিনে যার শব্দগত অর্থ 'আধুনিক' ব্যবহার করেছিলেন। তারও অনেক আগে এরিষ্টোফিনিস্ (খৃঃ পূর্ব ৪২৩) তাঁর 'ক্লাউড নামক নাটকে এমন একটি দৃশ্যের অবতারণা করেছেন যাতে সাহিত্যে আধুনিক ও প্রাচীনের দ্বন্দ্ব যেমন কৌতুকপূর্ণ তেমনি ইঙ্গিতপূর্ণ। দৃশ্যটিতে এথেন্স নগরের অধিবাসী একজন পিতা ও তাঁর পুত্রের মধ্যে আধুনিক ও পুরাতনের সাহিত্যিক মতবাদ নিয়ে কলহদৃশ্যের সুন্দর রূপায়ণ রয়েছে। পিতার সঙ্গে পুত্রের মতান্তরের কারণ, পুত্র কবি সাইমনডাইসকে কবি হিসাবে অতি নগণ্য ও কাব্যে তাঁর বক্তব্য যুক্তিহীন ও অকিঞ্চিতকর বলে নিন্দা করেছিলেন। পুত্র প্রমাণ স্বরূপ সাইমনডাইসের 'এসকাইলাস' কাব্যগ্রন্থের

নামোল্লেখ করেছিলেন। পিতা পুত্রের মৌখিক কলহ শেষ পর্যন্ত হাতাহাতি সংঘর্ষে গিয়ে দাঁড়ায়। এরিষ্টোফিনিসের নাটকে বর্ণিত এই কলহদৃশ্যটি নতুন সাহিত্য চিন্তা ও পুরাতন সাহিত্য চিন্তার প্রাচীনতম নিদর্শন বলা যায়। অবশ্য স্বাভাবিক কারণেই এরিষ্টোফিনিস নতুন চিন্তাকে আমল দেন নি। কারণ বলাবাহুল্য, তিনি ছিলেন পুরোপুরি প্রাচীন পন্থী সাহিত্যিক। 'ক্লাউড' নাটকের এই দৃশ্য ছাড়া 'ফ্রগস' নামে আর একখানি নাটকের নাম করা যেতে পারে যার মধ্যে এসকিউলাস ও ইউরিপিডিসের তীব্র বিতর্কের একটি দৃশ্য আছে। এখানেও এরিষ্টোফিনিসের বিজয়মাল্য এসকিউলাসকে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি ইউরিপিডিসকে নিজের বক্তব্য বলবার সুযোগ দিয়েছেন এই ভাবে :

আমি এইরকমভাবেই আমার বক্তব্যকে প্রমাণ করতে চাই যুক্তি নস্যাৎ করেও, কারণ আমি চাই আমার পাঠকরাই আমার বক্তব্যের ভেতর থেকে যুক্তি টেনে বার করুক এবং জেনে নিক 'কেন' এবং 'কেমন করে'। আবার এস্‌কিউলাসের আধুনিকদের সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক উত্তরও পাওয়া যাচ্ছে এই রকম : স্রষ্টা এবং সৃষ্টির পক্ষে এর পাপের অন্ত নেই,—কী সব ভয়ঙ্কর কলঙ্কিত দৃশ্যেরই না অবতারণা করছে।

অবশ্য এও লক্ষ্যণীয় যে, এরিষ্টোফিনিসের সমসাময়িক সাহিত্যিকদের মধ্যে সাহিত্য দৃষ্টির ব্যাপারে নতুন ও পুরাতনের মতভেদটা খুব উগ্রভাবে স্পষ্ট নয়। কেননা তাঁরা তখনও প্রাচীন বা কয়েমী সাহিত্য ধারণা থেকে নিজেদের পরিপূর্ণভাবে বিচ্যুত করতে পারেন নি। তবুও একথা সত্য যে, খৃঃ পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর ভেতরই সাহিত্যে আধুনিকতা বা হাওয়া বদল বলতে যা বোঝায় তার প্রস্তুতির ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। এই সময়েই আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাচীন পাঠাগারের অধ্যক্ষ এরিষ্টারকাস (খৃঃ পূর্ব ২১৭-১১৫) হোমারের সঙ্গে পূর্বোল্লিখিত Neateroi নামক আধুনিক সাহিত্য গোষ্ঠীর তুলনামূলক সমালোচনা কারছিলেন। পাশ্চাত্য ভাষাগুলির মধ্যে লাতিন ভাষায় রচিত সাহিত্য কৃতিতে স্পষ্ট একটা ঐতিহাসিক কাল পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। ইতিহাসে ইনিয়ান কালের ভাবনার সঙ্গে Neoteroi দের বিভেদ যেমন স্পষ্ট আবার পরবর্তী অগষ্টান যুগের সঙ্গেও তেমনি লক্ষ্যণীয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, খৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে এসেই আমরা প্রথম এই প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যিকদের ঐতিহাসিক পারম্পর্যের সঙ্গে সরাসরি পরিচিত হতে আরম্ভ করি। এণ্টনাইনের যুগেই প্রথম পাওয়া যায় সিসেরোর Neoteroi এর রূপান্তরিত লাতিন শব্দ Neotorici। এই Neotorici শব্দটির উদ্ভব ও বহুল ব্যবহার তৎকালীন সাহিত্য সমীক্ষায় দিকদর্শী বললে অত্যুক্তি হয় না। কারণ এই একটি শব্দ সাহিত্য বিচারে সকল সময়েই দ্বি-অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। নতুন লেখক ও নতুন রচনাশৈলি দুই-ই বুঝিয়েছে। তখনও পর্যন্ত কিন্তু 'মডার্ণাস' এই নতুন লাতিন শব্দটির আমদানী হয় নি। Neotoricus শব্দটি দিয়েই নতুন ও পুরাতন সাহিত্যের বিভেদ বিচার বেশ সুষ্টুভাবেই চলে যাচ্ছিল। মহাপণ্ডিত ইরাসমাস লেখক ইকুইনাসকে 'Neotericum ominum'—অর্থাৎ বিশিষ্ট আধুনিক লেখক বলে প্রশংসা করেছিলেন। এই কালে যে লেখকই নতুন রচনা শেলী গ্রহণ করেছেন তাঁকেই Neotericus বলে চিহ্নিত করার রেওয়াজ ছিল। বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত Neotericius—(আধুনিক) শব্দটি আবার এক নতুন তাৎপর্য বহন

করতে শুরু করলো কিছুদিন পরেই। আলাস গেলিয়াস (১৩০ খৃঃ) এই সূত্রে প্রথম 'Classic' কথাটি ব্যবহার করেন। যে সমস্ত লেখক বৈয়াকরণের প্রাচীন সূত্রগুলি তাঁদের রচনায় যথাযথ ব্যবহার করতেন, এবং কোনো কারণেই সূত্রের নির্দেশ অমান্য করতেন না, অলাস গেলিয়াস তাঁদেরই তাঁদেরই 'ক্লাসিক' বলে অভিহিত করতে আরম্ভ করেন। আবার মজার ব্যাপার এই যে, সেই সময় এই ক্লাসিকরা প্রথম শ্রেণীর নাগরিক বলে স্বীকৃত হতেন। প্রমাণ আছে সার্ভিয়ার প্রাচীন সংবিধানের নির্দেশে নাগরিকদের পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা হতো। এর পর খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে লাতিন মডার্ণাস শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। লাতিন ('মডো'—modo) ইংরেজিতে ('নাউ'—now) অর্থ বহন করে। সাহিত্যিক ক্যাসিডোরাস (খৃঃ ৪৮০-৫৮০) তাঁর 'ভ্যারি' নামক সুচিন্তিত পত্র সঙ্কলনে 'মডার্ণাস'—এই শব্দটি বহুবার ব্যবহার করেছেন। শার্লামেনের রাজত্বকালেও আধুনিকদের চিন্তাভাবনার পক্ষে খুবই অনুকূল ছিল। এই কালকে লক্ষ্য করে বিশিষ্ট অধ্যাপক কার্টিয়াস মন্তব্য করেছেন: লাতিন থেকে উদ্ভূত এই 'মডার্ণ' শব্দটি পরবর্তী প্রাগ্রসর সাহিত্য মননের পক্ষে নিঃসন্দেহে একটি মূল্যবান দান। কিন্তু তা হলেও খৃঃ উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মডার্ণ শব্দটি ঠিক কায়েম হয়ে বসতে পারেনি। বিচ্ছিন্ন সময়ে কোনো কোনো লেখক সম্বন্ধে বিক্ষিপ্তভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্বোল্লিখিত সাহিত্যিকদের কেউ কেউ শব্দটি ব্যবহার করে থাকলেও তার প্রভাব রসিক মনে খুব ব্যাপক হয় নি। তখনও সাহিত্যে আধুনিকতার ইতিবৃত্ত অনুসরণ করলে ৬১৫ খৃষ্টাব্দকেই আধুনিকতার প্রারম্ভকাল বলে মানতে হবে। পাশ্চাত্য ইতিহাসে ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপলের পতন কালকেই সাহিত্যে আধুনিক যুগের উদযোগ পর্ব বলা হয়েছে। কারণ এই কালেই প্রথম এবং স্পষ্টভাবে সাহিত্য, ধর্ম, সমাজ, নীতি—সবকিছুই ঢেলে সাজবার একটা সাজ সাজ রব উঠেছিল। সব কিছুর ওলটপালটের এই আন্দোলনও আনুসঙ্গিক চেতনাকেই পণ্ডিতেরা রেনেসাঁ (Renaissance) বা নবযুগ বলে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ সমস্ত কিছু পুরাতন থেকে নবতর চেতনার দিকে মুখ ফেরাবার প্রচেষ্টার একটা সূচনা। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই রেনেসাঁ যুগের নবতর চেতনাও উনবিংশ শতাব্দীর আধুনিক চেতনার মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য থেকে যাচ্ছে যা নাকি খুবই বিচিত্র। দুই ক্ষেত্রেই 'মডার্ণ' কথাটি প্রযোজ্য হলেও কার্যতঃ বিভিন্ন অর্থ বহন করে। ইউরোপে রেনেসাঁ যুগের আধুনিকতা বলতে মধ্যযুগীয় সাহিত্য, দর্শন, কলার সঙ্গে প্রচণ্ড একটা সংঘর্ষ বোঝায় যার কারণ এই মধ্যযুগীয় বোধ সমস্ত প্রাচীন বোধের বিরোধী এবং যা নাকি রেনেসাঁ সমাজে জাত্য নয়। বিষয়টা আরো স্পষ্ট হয় যদি সাহিত্য ভাবনায় ইতালীয় রেনেসাঁর তথ্য ও অর্থ যথাযথ অনুধাবন করা যায়। তা করলে দেখা যাবে ইতালীয় সাহিত্য, কলা, দর্শন প্রভৃতিতে প্রাচীন ধ্যান, ধারণা, মত, রীতি ও পন্থার নব উজ্জীবনই হচ্ছে রেনেসাঁর মহৎ উদ্দেশ্য। কিন্তু নবচেতনার এই জটিল পথ পরিক্রমণ সত্ত্বেও একথা স্বীকার করতেই হবে যে, ইউরোপের রেনেসাঁই পরবর্তী আধুনিক চিন্তার পোষক হয়েছে। বেশ কয়েক শতাব্দী পেরিয়ে এসে অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীতে বিশেষ করে এই 'মডার্ণ' বা আধুনিক শব্দটি বিশিষ্ট অর্থবাহী হয়েছে। এই কালেই শব্দটির এক বিশেষ মূল্য সাহিত্যে স্বীকৃতি পেতে আরম্ভ করে। প্রমাণ হিসেবে কবি পোপের কাছে লেখা সুইফটের পত্রাংশ উল্লেখ করলেই যথেষ্ট

হবে বলে মনে করি। সুইফট লিখছেন : গন্থ ও পত্তে (একালে) বিচিত্র, বিরক্তিকর সংক্ষিপ্তকরণ এবং অদ্ভুত আধুনিকতা। রাসকিন দুঃখ করেছেন এই বলে যে আধুনিক লেখকরা খৃষ্টানধর্মের বিরোধী আর সাহিত্যিক গ্রোট নিন্দা করেছেন এই বলে যে, আধুনিকরা মহান ক্লাসিকবোধের শত্রু। খৃঃ পূর্ব ৪২৩ সাল থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত সাহিত্যে আধুনিকতার ইতিহাস সমীক্ষা করেও কিন্তু এই আধুনিকতার নির্দিষ্ট কোনো প্রারম্ভ কালের হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ কোন শতাব্দীর ঠিক কোন সালটি যে এই আধুনিক চিন্তার স্ফুরণ কাল, তা ঠিকমত নির্ণয় করা আজ পর্যন্ত সম্ভব হয় নি—সম্ভব হয় নি জানা কোন বিশেষ সাহিত্যিক গতানুগতিক থেকে বিচ্যুত এই বিশিষ্ট মানসিকতার প্রথম প্রবক্তা। রোম গ্রীসের কৃষ্টির জটিল বন্ধন থেকে মুক্ত করে, ইউরোপের একক ও আধুনিক চেতনার ইতিবৃত্ত নির্ণয় করতে পারলেই বর্তমান সাহিত্য ভাবনায় প্রাচীন ও হালের গোলযোগ হয়তো কিছুটা মিটতে পারে। আর তা নির্ণয় করতে অবশ্য রেনেসার পরবর্তীকালের মধ্যেই আমাদের অনুসন্ধান কার্য চালাতে হবে। কিন্তু কাজটি অত সহজ নয়। বহু বহু সাহিত্য গবেষক এ কাজে হার মেনে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। কারণ মূলতঃ সাহিত্যে 'আধুনিকতা' শব্দটির সংজ্ঞা নিয়েই গোলযোগ বেধেছে। সেই জন্যেই এ সম্বন্ধে সঠিক একটা রায় কোনো সাহিত্য বিচারকই দিয়ে উঠতে পারছেন না। দিলেও সকলে তা মানতে রাজি হচ্ছে না। অনুযোগ গুঞ্জরণ থেকেই যাচ্ছে। যাই হোক, এরকম অবস্থায় আপাততঃ আধুনিক শব্দটির তাৎপর্য এলিয়টের বিশ্লেষণের মধ্যে কতকটা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। তিনি বলছেন : আমাদের সভ্যতার এই পর্বে কবিরা অনিবার্য কারণে দুর্বোধ্য হতে বাধ্য কারণ আমাদের সভ্যতার চালচলনের মধ্যে এমন একটা জটিল ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, যা নাকি আমাদের পূর্বসূরীদের সভ্যতায় কোনো কালেই ছিল না। ফলে একালের লেখকদের কিছু না কিছু জটিল, রহস্যবাদী ও অন্তর্মুখীন হতে হয়েছে। অনিবার্য কারণেই তাঁদের লেখাকে রূঢ় ও আত্মনিষ্ঠ হতে হয়েছে, বক্তব্যকে হৃদয়গ্রাহী করতে। একালে সাহিত্য অতিবাস্তবিক, অবচেতনিক ও পরাবাস্তবিক বলে যে সমস্ত অনুভূতির ব্যপক স্ফুরণ দেখা যাচ্ছে, তাকেই ইঙ্গিত করে এলিয়ট এইরকম মন্তব্য করেছেন। আবার ম্যাথু আরনল্ডের সমীক্ষা সাহিত্যে আধুনিকতাকে অন্য এক বোধে সম্মুখে এনে হাজির করেছে। তাঁর মতে হাল ও পুরাতন সাহিত্যের চিন্তার সংঘর্ষের ফলশ্রুতি হচ্ছে আধুনিক মনন। ষ্টিফেন স্পেণ্ডার ঠিক এই কথাই বলেছেন : প্রাচীন ও পুরাতনের চিন্তা দ্বন্দ্বই হচ্ছে আজকের এই আধুনিকতার ভিত্তি-প্রস্তর। এর ওপরই ভর করে উঠেছে নানা আকারের সৌধ, হর্ম্য-বিচিত্র সব কারুকার্য্য মণ্ডিত। আবার তিনি এও বলেছেন যে, এ এমন একটা সঙ্কট যার মধ্যে আমাদের সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস সমস্ত কিছুই অনিবার্যরূপে জড়িয়ে পড়েছে। সে যাই হোক, আপাততঃ আমাদের সাহিত্য মননে আধুনিকতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এই কথাটাই স্পষ্ট হয় যে, এই আধুনিকতা যদিও আমাদের সাহিত্যে নতুন আমদানী বলে মনে হয়—যা নিয়ে এত তর্কবিতর্ক—ফলে কোনদিনই তা বর্তমান বিংশ শতাব্দীর একক দাবি বলে স্বীকার করবে না। এরিষ্টোফিনিস্ থেকে ষ্টিফেন স্পেণ্ডার কিংবা কালিদাস, ভবভূতি থেকে একালের আধুনিকতম কোনো সাহিত্যিকই তাঁদের সাহিত্য কৃতিতে নিজেদের আধুনিক মননের

স্রষ্টা প্রবর্তক বলে প্রমাণ করতে পারবেন না। ম্যাথ্ আরনল্ড ঠিকই বলেছেন যে, সুপ্রাচীন গ্রীক সাহিত্যিক থুসিডিডিস্ তাঁর সমকালীন সাহিত্যিকদের কাছে যে অর্থে আধুনিক ছিলেন; ঠিক সেই অর্থেই আবার মধ্য যুগের পাঠকদের কাছেও তিনি অভিনবত্বে আংশিকভাবে আধুনিক বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন। কালের পশ্চাদপটে এইভাবেই আমরা বিহারীলাল, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন দত্ত জীবনানন্দ এবং আরো অনেক নতুন রূপ দেখেছি। কিন্তু সেইরূপ কোনো কালের মধ্যেই Static থাকে নি। নতুন ও পুরাতনের সংঘর্ষে শুধু নয়, নতুনের বলিষ্ঠ প্রচেষ্টায় তাঁদের প্রত্যেকেই এক একজন বিশিষ্ট অংশীদার। আজকের নতুন আগামীকালের চোখে পুরাতনের পরিচয়বাহী। পৃথিবী থেমে থাকে নি। থেমে থাকছেও না। কখনও থেমে থাকবেও না। সে চলেছে, অবিরামভাবে চলেছে এবং চলবে। এই বিরামহীন চলার পথে আমরা সবাই পথিক মাত্র। প্রতিটি বাঁকের দিকে চোখ রেখে চলার সাধ্য কারো নেই। কিছু সময়ের গণ্ডীতে কিছু পথের পরিচয় অনেক কথাকার তাঁদের মনের পটে এমনভাবে এঁকে রেখে গেছেন এবং যাচ্ছেন যে, তাই ভবিষ্যতকালের কাছে সাময়িক সাহিত্যিক পথ পরিক্রমণের দিশারী বলে গৃহীত হয়েছে। সাহিত্যে এই নব নব নির্দেশনার চিহ্নগুলিই আধুনিকতার প্রতীক। তা কোনোদিনই কালের সীমানার মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ নয়। প্রাচীন লাতিন সাহিত্যের আদিপর্বের সেই 'Poetae novi' বা 'neoteroi'—(আধুনিক) দের অলক্ষ্যে চলাফেরার ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। আমাদের এ কালের আধুনিক সাহিত্য গুঞ্জনের মধ্যেও প্রাচীন লাতিন সাহিত্যের সেই poetae novi বা neoteroi দের বিস্মৃত ইচ্ছা মিশে আছে—কান পাতলেই শোনা যায়। খৃঃ পূর্ব ৪২৩ এর সেই অনুনয় আজকের সাহিত্যরসিকদের সহৃদয় হৃদয় দুয়ারে ঘা দিয়ে ফিরছে। এই ঘা দেওয়ার শেষ নেই; মনে হয় সাহিত্য সৃষ্টির অন্তকাল পর্যন্ত এই ঘা দিতেই থাকবে। এবং এই একই শব্দ ফিরে ফিরে নানা সুরে শুনতে পাওয়া যাবে অনাগত অনেক শতকেই।

বিদ্যুৎ মৈত্র

বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) সংক্ষেপিত সংস্করণ॥ লেখক—সমবায়-সমিতি। ৭৩ বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রোড্ কলিকাতা-২৬, মূল্য-১৮৲।

১৩৫৬ বঙ্গাব্দের শরৎ কালে ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব' প্রথম প্রকাশিত হয়। বাংলার ইতিহাস বিষয়ে ইতিপূর্বে যে সমস্ত গ্রন্থাদি লিখিত হইয়াছে তাহা প্রধানতঃ বাঙলার রাজবৃত্ত। রাজা ও রাজকর্মচারীদের শাসন ও উত্থান পতনই ইহাদের মুখ্য বিষয় ছিল। যাহাদের লইয়া বাংলা দেশ বা বাঙালী জাতি তাহাদের ভূমিকা এই সব গ্রন্থে ছিল গৌণ। বাঙ্গালী জাতির সামাজিক ইতিহাস রচনায় প্রথম পদক্ষেপকারীরূপে নীহাররঞ্জন এই গ্রন্থ প্রকাশ কালে প্রচুর অভিনন্দন লাভ করেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় ইতিহাসাচার্য ডঃ যদুনাথ সরকার মহাশয় লেখেন 'বাঙ্গালী জাতি কিরূপে তাহার এখনকার বিদ্যা-বুদ্ধি, আচার ব্যবহার, চরিত্র ও জীবন প্রণালী লাভ করিয়াছে, কত শতাব্দীর বিচিত্র অভিব্যক্তির ফলে, এবং কোন্ কোন্ বাহিরের ঘাত-প্রতিঘাতে আর ভিতরকার উৎসের প্রবাহে বাঙালী ও বাংলা দেশ আজিকার এই আকার ধারণ করিয়াছে, এই সব কথা জানিবার ইচ্ছা খুব স্বাভাবিক এবং এই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়াই ইতিহাসের চরম গৌরব ও সার্থকতা। অধ্যাপক নীহাররঞ্জনের এই মহাগ্রন্থে এই চেষ্টা করা হইয়াছে এবং সে চেষ্টা অসামান্যতা লাভ করিয়াছে।...ইতিহাসের কথা ছাড়িয়া, ভাষা ও সাহিত্যের দিক হইতেও সমগ্র বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে ইহা একটি অনন্যপূর্ব গ্রন্থ। ইতিহাস বিষয়েই শুধু নয়, সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে এত বিশদ, এত পূর্ণাঙ্গ, এত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও যথার্থ বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে রচিত গ্রন্থ ইহার আগে কেহই লিখেন নাই।...বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রতি নীহাররঞ্জনের অটুট নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা, অসংখ্য ক্ষেত্রে গভীর জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গির সজীব বৈশিষ্ট্য, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, উচ্চস্তরের বস্তুনিষ্ঠ-কল্পনা এবং সর্বোপরি সত্যে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন চিন্তা করিবার শক্তি এই গ্রন্থকে সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের জগতে অদ্বিতীয় আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।' শিক্ষিত বাঙালীর নিকট সুপরিচিত, আচার্য যদুনাথের আশীর্বাদ ধন্য ও রবীন্দ্রপুরস্কার সম্বর্ধিত 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থের সম্বন্ধে আর নূতন কোন কথা বলার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না।

এই পুস্তকখানির প্রথম প্রকাশ কালে ভূমিকায় আচার্য যদুনাথ এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে বহুল প্রচারের জন্য এই গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ সুলভ মূল্যে প্রচারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তিনি আরও মন্তব্য করেন যে ইহার ইংরাজী সারাংশ প্রকাশও কর্তব্য।

১৩৫৯ বঙ্গাব্দে বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দীর্ঘকাল এই পুস্তক অপ্রকাশিত থাকার পর বর্তমানে লেখক সমবায় সমিতি আলোচ্য সংস্করণটি মূল পুস্তকের সংক্ষেপিত সংস্করণরূপে প্রকাশ করিয়া বাঙালী পাঠক সমাজের সবিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

পরলোকগত আচার্য যদুনাথের ইচ্ছা পূরণের নিমিত্ত বাঙ্গালী জাতির ধন্যবাদও তাঁহাদের প্রাপ্য।

এই সংস্করণ প্রকাশে নীহাররঞ্জনের সম্মতি ও সহযোগিতা ও বিশেষ আনন্দের বিষয়।

আলোচ্য সংস্করণটি, লেখক সমবায় সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্না সিংহ রায় কর্তৃক সংক্ষেপিত হইয়াছে, তাঁহাকে এই সংস্করণের সম্পাদক বলা যাইতে পারে। সংক্ষেপীকরণের ব্যাপারে সিংহ রায় মহাশয়ের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য, মূল গ্রন্থের তথ্য ও বক্তব্য এমন কি ভাষাও অবিকৃত রাখার কঠিন কাজে তাঁহার কৃতিত্বও সাফল্য বিস্ময়জনক। যাঁহারা বাঙ্গালীর ইতিহাসের পূর্ববর্তী সংস্করণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষেও পূর্ব আলোচ্য সংস্করণের সহিত ইহার পার্থক্য নির্ধারণ বিষয়বস্তুর বিচারে সুগম হইবেনা, দুইটি সংস্করণের পৃষ্ঠাসংখ্যা ও মূল্যের বহিরঙ্গ বিচারেই আপাতঃ দৃষ্টিতে এই পার্থক্য ধরিয়া ফেলা সম্ভব। মূল সংস্করণের প্রয়োজনীয় অংশের মধ্যে প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে প্রদত্ত গ্রন্থপঞ্জীর অভাবটিই লক্ষ্য করা গেল।

আলোচ্য সংস্করণটি প্রকাশের জন্য প্রকাশন সংস্থাকে আর একবার ধন্যবাদ জানাইয়া তাঁহাদের দৃষ্টি আচার্য যদুনাথের দ্বিতীয় অভিলাষের প্রতি আকৃষ্ট করা যাইতে পারে। লেখক সমবায় সমিতি ডাঃ নীহাররঞ্জনের সহযোগিতা ও সম্মতি লইয়া এই পুস্তকের একটি ইংরাজী সারাংশ প্রকাশ কি করিতে পারেন না? আশাকরি এই প্রস্তাবটি তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

'বাঙালীর ইতিহাস—আদিপর্বে' মুসলমান কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের কাল পর্যন্ত বাঙালী জাতির বাস্তব ও মানসিক অভিব্যক্তি অতি নৈপুণ্যের সহিত চিত্রিত হইয়াছে। এই পুস্তকের প্রকাশ কালে আচার্য যদুনাথ আশীর্বাদ সহকারে এই আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে বাকী দুই খণ্ডে (মুসলমান ও ইংরাজ অধিকার কালে) বাঙালীর ইতিহাস রচনাও নীহাররঞ্জন তাঁহার প্রতিভা ও অধ্যবসায় বলে সম্পন্ন করিবেন। অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়যে দীর্ঘদিনের ব্যবধানে প্রথম খণ্ডের অভাবিত সাফল্য সত্ত্বেও নীহাররঞ্জন বিষয়ান্তরে ব্যস্ত থাকিয়া এই পুস্তকের বাকী খণ্ডগুলি রচনায় ও প্রকাশে তৎপর হন নাই। পরশাসন সত্ত্বেও মুসলমান ও ইংরাজ অধিকার কালে বাঙালী জাতির প্রতিভা ও কর্মোদ্দীপনা তুঙ্গ স্পর্শ করিয়াছিল। সেই গৌরবময় অতীতের হৃদয়গ্রাহী ও বস্তু-নিষ্ঠ বিবরণ রচনার দুর্লভশক্তি ও মণীষা যে নীহাররঞ্জনের সহজাত তাহার পরিচয় তিনি নিজেই বাঙালীর ইতিহাসের আদিপর্বে দিয়াছেন। মণীষী ঐতিহাসিক টয়েনবী বাঙালীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থনৈতিক ও সামাজিক সর্বনাশের মুখে দণ্ডায়মান ও রাজনৈতিক চক্রান্তের নাগপাশে বিভ্রান্ত ধ্বংসোন্মুখ বাঙালী জাতি তাহার গৌরবময় সস্ত অতীতের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ-রেখা দেখিতে পাইলে হয়তো আর একবার জগৎসভায় নিজের যোগ্যস্থান বুঝিয়া লওয়ার প্রেরণা পাইত। অশেষ প্রত্যাশার সঞ্চার করিয়াও নীহাররঞ্জন বাঙালীর ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ রূপটি এখনও জাতির হস্তে তুলিয়া দেন নাই, ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য। বয়সসত্ত্বেও নীহাররঞ্জন এখনও বৃদ্ধ হন নাই। চির-তরুণ, কর্ম-চঞ্চল নীহাররঞ্জনের স্বদেশ ও স্বজাতিয় প্রেম আর একবার উদ্দীপ্ত হইয়া তাঁহাকে বাঙালীর ইতিহাসের বাকী দুই অধ্যায় রচনায় প্রবৃত্ত করুক—আমাদের ইহাই প্রার্থনা। এই খণ্ড দুইটি রচনারঅনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির দায়িত্ব বাংলার পাঠক সমাজেরও আছে। তাঁহারাও এ সম্বন্ধে অবহিত হইলে কাজটি অচিরেই সম্পন্ন হইতে পারে।

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

No. C-315 Phone : 23-5155 September '67 (0'50) Central Regd. No. R.N.2602/57 SAMAKALIN

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্র

আনন্দে
উৎসবে...
প্রাত্যহিক প্রয়োজনে..
সবার মনোরঞ্জনে..
পরিনামরমনীয়
কেশতৈল
কেশরঞ্জন

বাড়ীতে বহুদিন রাখার মত
একটি রেডিও উপহার দিন

ফিলিপ্‌স
সোনোর‍্যামিক
রেডিও

PHR 4084

A
R
U
N
A

শারদীয়
প্রীতি
সম্ভাষণ
উৎসবের দিনগুলি
গানে গন্ধে রূপে
রসে ভরে উঠুক্—
সার্থক হোক্ মাতৃপূজা।
এনামেলের বাসন
খাস জনতা
খাস জনতা
দীপ্তি লণ্ঠন
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৬৭, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২ ফোন : ৩৪-৫৪১১-৩
KALPANA. OM.48

সাইকেলে আরামের সীট বলতে **উইটকপ**

QUALITY RUBBER PRODUCTS .....
OUR SPECIALITY
PATHASATHI
&
PATHABIR
CYCLE TYRE & TUBE
A.R.P
1 INSERTION SHEET
2 RUBBER TUBE & HOSE
3 V. BELT
4 HORN-BULB
5 SOLE-HEEL
6 TRI-OYOLE RUBBER PARTS
7 SPONGE PAD
8 PEDAL
9 SADDLE-TOP
10 BRAKE-RUBBER
11 PLAY BALL
12 BLADDER
13 HOT-BAG
14 RUBBER CLOTH
15 ERASER
STOCKISTS ALL OVER INDIA
ASSOCIATED RUBBER & PLASTIC WORKS
CALCUTTA • DUM-DUM
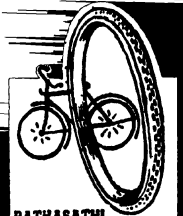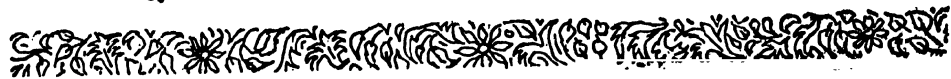
পঞ্চদশ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আশ্বিন তেরশ' চুয়াত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

কোম্পানীর নথিপত্রে কলকাতার সমাজচিত্র

নারায়ণ দত্ত

ভারতবর্ষে বসে সেকালের অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধের কলকাতার গোটা ছবি পাবার নির্ভরযোগ্য কোন উপায় নেই। কেননা, যেসব তথ্যের ওপর নির্ভর করে' মাত্র আড়াইশ' বছর আগেকার বাংলা দেশের ইতিকাহিনী গড়ে তুলতে হবে, তাতে খাদ এত বেশি, যে তাকে গিণ্টি ছাড়া অন্য কোন সোনা বলে চালান শক্ত। এ সময়ের যা'সব আকর তথ্য সে সবই বিদেশী পর্যটকদের ডায়ারি, নয় ভ্রমণকাহিনী—যাতে তাদের ব্যক্তি চিন্তা মিশে প্রায়শঃই সত্যকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তা'ছাড়া তাঁরা নিজেদের গাওনা যতটা গেয়েছেন, এদেশের মানুষের কথা ততটা বলেননি। বলার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। অথচ এই দিশী লোকেদের কথা বাদ দিয়ে এদেশের ইতিহাস রচনার চেষ্টার মত বিড়ম্বনা আর কিইবা হতে পারে!

অথচ দিশী লোকদের লেখা সেকালের ইতিহাসের মালমশলা বিশেষ কই? কিছু কাব্যকাহিনীর ফোকরে ফোকরে ইতিহাসের মজ্জা বিন্দু হয়তো বা সঞ্চিত হয়ে আছে, কিন্তু সেই মজ্জা দিয়ে এক আনা অনুপান কবিরাজী ওষুধ খাওয়া চলে—নিত্যপ্রয়োজনের শর্করা-ইক্ষুরসের অভাব তা দিয়ে পূরণ করা সম্ভব নয়। মুসলমান ঐতিহাসিক কিছু কিছু আছেন। কিন্তু মোহাচ্ছন্নতার হাত থেকে তাঁরাও বড় একটা অব্যাহতি পাননি। তাঁদের ব্যক্তি ভাবনাও তাদের রচিত ইতিবৃত্তে ছায়া ফেলতে কসুর করেনি।

তাছাড়াও কথা আছে। অষ্টাদশ শতকের এই দুর্য্যোগমুহূর্ত বাঙালী জাতির এক সন্ধিলগ্ন। বাঙালী ব্যক্তিত্বের জন্মক্ষণ। ইংরাজ বণিকের ঐশ্বর্য্যের অংশপুষ্ট কতকগুলি অপরিচিত বাঙালী বণিকপুরুষ, রাজকর্ম্মচারীরা এই সময়ে বাঙালী জাতির এক চরিত্র রচনায় মশগুল। না

বিদেশীর ডায়ারি, না দিশী ইতিহাস কেউই এদের বড় একটা পাত্তা দেয়নি। অথচ এদের বাদ দিয়ে অষ্টাদশ শতকের বাঙালীর ইতিহাস রচনা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

ব্যাপারটা খোলসা করার জন্যে একটা উদাহরণ দিই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন বাঙলা দেশকে একটা আলাদা প্রেসিডেন্সী বানালে; মাদ্রাজ থেকে তাকে একেবারে পৃথক করে দিলে; তখন 'উইলিয়ম হেজেস এলেন হুগলীর বড় কর্তা হয়ে। এঁরই ডায়ারি (১) হেনরি ইয়ুল সাহেব পুরনো বই-এর দোকান থেকে কিনে সম্পাদনা করে ছাপেন। সেকালের কোম্পানীর কাজকর্ম স্বভাবচরিত্র বুঝতে বইখানা খুবই সাহায্য করবে। এই হেজেস সাহেবকে এক বঙ্গ সন্তান পরমেশ্বর দাসের পাল্লায় পড়তে হয়। পরমেশ্বর দাস ছিলেন হুগলীর মুঘল দেওয়ান বুলচাঁদের একজন গোমস্তা মাত্র। কিন্তু এই সামান্য ব্যক্তি কি করে মহামান্য হেজেস সাহেবের নাকে ঝামা ঘষে দিয়েছিল, সেটা বেশ মুখরোচক জমাট কাহিনী। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে এই পরমেশ্বর দাসের ব্যক্তি পরিচয়, বংশ পরিচয়, তাঁর চরিত্রের অন্যান্য দিক, কিছুই আজ আর জানবার উপায় নেই।

এইসব অসুবিধা সত্ত্বেও যদি অষ্টাদশ শতকের কলকাতার ইতিহাস রচনার কাজে যদি এগোতে হয়, তাহলে বেশ একটা নির্ভরযোগ্য উপাদান হবে কোম্পানীর নথিপত্র। যার কিছুটা সি. আর. উইলসন ও পরে কারমিঙ্গার সাহেব—আর্লি অ্যানালস অব ইংলিশ ইন বেঙ্গল-গ্রন্থের চারটি খণ্ডে প্রকাশ করেছেন। সরকারের শিক্ষাবিভাগকে ইণ্ডিয়া অফিসের মহাফেজ খানায় রক্ষিত (?) কোম্পানীর এই সব রেকর্ডপত্র মাইক্রোফিল্ম করে আনলে বাঙলাদেশের এই সময়ের ইতিহাস রচনার খুবই সাহায্য হবে বলে বিশ্বাস। কি রকম সাহায্য দেবে তার একটা হাতেনাতে প্রমাণ দেবার জন্য সেকালের খেপে খেপে নিত্যব্যবহার্য জিনিষপত্রের দাম কিভাবে বেড়েছিল এবং কোম্পানীর কলকাতা কাউন্সিলের বড় কর্তারা এ নিয়ে কিভাবে কি করেছিলেন তার একটি মোটা-মুটি বিবরণ হাজির করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

কোম্পানীর এই সব রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে সতের শ' দশ সালে কলকাতায় খুব ভারী একটা দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। এটাই কোম্পানীর কলকাতায় খুব সম্ভবতঃ প্রথম দুর্ভিক্ষ। তবে শুধু কলকাতায় নয়। বোম্বে, মাদ্রাজ—সব জায়গায় চালের জন্য সে বছর হাহাকার পড়ে গিয়েছিল। কলকাতার বন্দরে দু'তিনটে জাহাজ এসে ভিড়েছিল চালের জন্যে। এ হেন অবস্থায় ইংরেজ কোম্পানী প্রথমেই চালের বিক্রয় মূল্য বেঁধে দিয়েছিল। কোম্পানীর হুকুমটা ছিল নিম্নরূপ:

There being now a very great scarcity of rice to the degree that the poor are ready to starve, agreed. We order to be sold in the bazar, the fine at one maund for a rupee, and the coarse at maunds 10 for a rupee and to encourage the same : it is ordered that the Buxie sell five hundred maunds of the Company's at that price ; by reason a great many of the country people hoard it up in getting a great price for it." (২)

এই সিদ্ধান্ত কোম্পানীর জুন মাসের মাঝামাঝি। এ থেকে সেকালের দুর্ভিক্ষের সঙ্গে

এ কালের দুর্ভিক্ষের একটা সাধারণ লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে এর অন্যতম ফল হোর্ডিং, মজুতদারি। এবং এর জন্য কোম্পানী যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, তা একালেও সমান প্রযোজ্য। এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জন্য কোম্পানী চালের ধর বেঁধে দিয়েছিলেন এবং বাজারে যাতে সেই দরে চাল পাওয়া যায় সেই জন্যে কোম্পানীর নিজের গুদাম থেকে সেই কণ্ট্রোল দরে পাঁচশ মণ চাল বাজারে ছাড়তে থাকে, যাতে তার বাঁধা দরেই চাল বাজারে পাওয়া যায়।

কোম্পানীর কাউন্সিলের পরবর্তী একটা মিটিং-এর সিদ্ধান্তে দেখা যাচ্ছে, কোম্পানী আরও চাল বাজারে ছেড়েছিল। তবে এবারে এই চাল বিক্রি করার পিছনে কলকাতার গরীবগুর্বাদের জন্যে কোম্পানীর দরদ ছিল কতটা, কতটাই বা তাদের বণিকবুদ্ধি সক্রিয় ছিল, সেটা ঠিক করে বলা যায় না। কেননা এই 'মিনিটে' রয়েছে—There being in the Company's store house a quantity of rice which is in a decaying condition, and rice being very scarce among the inhabitants of this place, order the Buxie to dispose there of at 1 maund 10 seer per rupee, and when the new rice comes in buy up more for a store and to supply the coasts. (৩)

কোম্পানীর বাঁধা দরে যাতে চাল বাজারে পাওয়া যায় তার জন্য কোম্পানীর সাধ্যপ্রচেষ্টা ছাড়াও এ থেকে আরও একটা ব্যাপার নজরে আসছে। কোম্পানী চালের একটা 'স্টক' সব সময় রাখত। আজকালের বাজার স্টকের মত।

তবে যেসব সমস্যার কথা আগেও বলেছি, সেগুলি এখানে রয়ে গেছে। কেননা, এই যে 'ডিকেইং' বা পোকাধরা চাল কোম্পানী বিক্রি করলে, সেগুলি কিরূপ ব্যবহার্য ছিল, সেগুলো সঠিক মানুষের খাদ্য তখনও ছিল কিনা, এইসব প্রশ্ন রয়েই যায়। এ গুলোর জবাব না পেলে কোম্পানীর আসল মাহাত্ম্য অনুধাবন করা শক্ত। উইলসন সাহেব কোম্পানীর কনসালটেশন-এর সব টুকুতে কিছু কিছু অংশ তাঁর 'অ্যানালস'-এর সংকলন করেছেন। কিন্তু সেকালের অবস্থা সঠিক বিচারের জন্যে মনে হয় কিছুই ফেলবার নয়। এইসব নথিপত্রের আগাগোড়া গবেষকদের ভালো করে দেখা দরকার। তার কোন লাইনই হয়ত তুচ্ছ নয়।

সেকথা যাক। কলকাতার দুর্ভিক্ষের রোগটা দেখা যাচ্ছে ক্রনিক দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কেননা, সতের শ' এগার সালের কোম্পানীর কলকাতা কাউন্সিলের মিটিং-এ কলকাতার এক দুর্ভিক্ষের কথা রয়েছে। গতবছর যাকে 'স্কারসিটি' বলে উল্লেখ করা হয়েছিল, এ বছর তাকে 'ফেমিন' বলে ঘোষণা করা হল। সেই বিবরণটা এই রকম—"Here having been a Famine in the country for this several months so that several thousands have famished for want of rice and the poor people of this place complaining that they are not able to pay their monthly rents. Agreed that we forbear taking it from them till such time as Grain becomes cheaper, otherwise if oppression should be used, they will leave this place. (৪)

বেশ বোঝা যাচ্ছে, সতের শ' দশের দুর্ভিক্ষের প্রকোপ পরের বছরও কমেনি। এবং এবার

কোম্পানী খাজনা মকুব করতে বাধ্য হচ্ছে। বলছে, দেশে চালের দর না কমা পর্যন্ত খাজনা আদায় বন্ধ থাকবে। না করার কারণ যতটা না কলকাতার বাসিন্দাদের জন্য অনুকম্পা তারচেয়ে বেশী হচ্ছে কলকাতা শহরের অস্তিত্বের সম্বন্ধে সংশয়। টকের জ্বালায় দেশ ছেড়ে কে আর তেঁতুল-তলায় বাস করবে। মুঘল অত্যাচার কলকাতায় থাকলে লোকে সেখানে থাকবে কেন? কোম্পানীকে জলাভূমি কলকাতাকে সোনার শহর কলকাতা করতে অনেক রকম আক্কেল সেলামী দিতে হয়। পাছে দিশী লোকে পালায় এই ভয়ে মনে হয় তাকে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। মনে তো হয় তাই। তবে এ সময়েও দেখা যাচ্ছে, কোম্পানী দরিদ্র জনসাধারণের জন্যে চাল সস্তা দরে বিক্রি বা বিতরণ বন্ধ রাখেনি। তবে আগের বছর যেমন টাকায় একমণ দশ সের দরে চাল বিক্রি করার ব্যবস্থা করেছিল পাঁচশ মণ, এবারে হুকুম দিয়েছিল একেবারে ত্রাণার্থে বিতরণের জন্য—"Agreed also 500 maunds of Rice be distributed amongst some poor inhabitants of this place who are just ready to famish. (৫) অবশ্য ইংরেজ যে বেণের জাত এই দান ব্রতে সেই স্বাক্ষরও রয়েছে। ইংরেজ কোম্পানীকে এই দমকা লোকসানের টাকাটা পুষিয়ে নেবার জন্যে একটা কাজ করতে দেখা যাচ্ছে। 'মেরী বয়ার' বলে জাহাজটাকে তারা বালেশ্বরে পাঠাচ্ছে, সেখান থেকে জাহাজে বোঝাই চাল আনতে। বালেশ্বরের চাল অবশ্যই দর কম। অন্ততঃ কলকাতার চালের চেয়ে। কোম্পানী আশা করছে, এর ফলে যে লাভ হবে, তাতে ত্রাণকার্য্যের এই দাক্ষিণ্যের খরচ সুদেমূলে উসুল হয়ে যাবে!

প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে যে কোম্পানীর কর্তারা কলকাতার গায়ে দুর্ভিক্ষের আঁচ না নামতে পারে, তার জন্যে সব সময়েই বেশ সজাগ থাকতেন। কেননা সম্রাট শাহ আলমের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদের মধ্যে সম্ভাব্য যুদ্ধের ফলে জিনিষপত্র বিশেষ করে চালের দাম যাতে বেড়ে না যায় তার জন্যে পঁচিশ হাজার মণ চাল কিনে রাখেন বলে জানা যায়। এর ফলে কোম্পানীকে বেশ লোকসান দিতে হয়। তবে কোম্পানী সে লোকসান করেও ধান্য 'স্টক' করে রাখতে পেছপা হননি।

সতের শ' দশ-এগার সালের পরে বেঙ্গল পাবলিক কনসালটেশনস্-এর পাতায় যে দুর্ভিক্ষের খবরটি পাওয়া যাচ্ছে, সেটা সতের শ' সাইত্রিশ সালে। কারণটা অবশ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ। টমাস মুর তখন কলকাতার জমিদার। তাঁর ভাবনা কলকাতার রাজস্ব আদায়ের। কোম্পানীর সদর দপ্তরের কড়া হুকুম, কলকাতার জমিদারী চালাবার জন্যে কোম্পানীর তহবিল থেকে একটি পয়সাও দেওয়া হবে না। কাজেই দিশী লোকদের কাছ থেকে নানা ধরণের ট্যাক্স আদায় করে চালাতে হয়। কিন্তু এই দারুণ ঝড়ে কলকাতার সে এক সর্বস্বান্ত চেহারা। মুরের রিপোর্টেই জানা যায়। কমসে কম তিন হাজার লোক এই ঝড়ে মারা যায়। মুরের বিবরণ যেটাকে কোম্পানী তাদের নথিভুক্ত করে রেখেছিল তাতে ব্যাপারটা এই রকমভাবে তুলে ধরা হয়েছে—

What still adds to the calamity is that by the violent force of the wind the river over-flowed so much that a great quantity of Rice was quite spoiled so that article is rose from 1 md. 30 seer per Rupee to 1 md. 5 seer and near 3,000

inhabitants were killed as great number of large cattle besides goats and poultry destroyed. (৬)

ঝড়টা সেপ্টেম্বর মাসে। কাজেই মুর সাহেব কি কলকাতার ব্যবসায়ীদের ধানের গুদাম নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা তো বলছেন না, গঙ্গার স্ফীত জলে ধানজমি ডুবে যাওয়ার কথা বলছেন, বোঝা যাচ্ছে না। তবে মনে হয় ব্যাপারটা উভয়তঃই। এবং এর ফলে চালের দাম টাকায় এক মণ ত্রিশ সেরের জায়গায় বেড়ে একমণ পাঁচ সের হয়ে গিয়েছিল।

শুধু এইখানেই এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের অবশ্যম্ভাবী কুফল থেমে থাকেনি। কোম্পানীর পরবর্তী কাগজপত্রে তার হিসেব রয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, কলকাতা ও শহরতলীতে দুর্ভিক্ষের সুরু হয়ে যায়। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। যেটা লক্ষণীয়, সেটা হচ্ছে, কোম্পানী তড়িঘড়ি এই দুর্ভিক্ষ নিবারণে যে সব সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন সেগুলি। কলকাতা কাউন্সিল লিডেন হল ষ্ট্রীটের সদর দপ্তরে তাদের গৃহীত ব্যবস্থার যে ফিরিস্তি পাঠিয়েছিলেন, তাতে রয়েছে—

A sad effect of the Hurricane was a Famine that raged all round the country best part of the year were obliged to forbid the exportation of Rice, the 5th June (1738) which affected private trade (৭) ঘটনাটা খুবই সত্যি। কেননা, এই সময়ে ইলিঅট বলে এক সাহেবের দু'দুটো জাহাজ চাল ভর্তি হয়ে বাইরে রপ্তানীর জন্য অপেক্ষা করছিল। এই আদেশের ফলে সেই জাহাজ দুটো থেকে চালের বস্তা নামিয়ে নেওয়া হয়।

(২) Took off the Duty on all rice brought into the town the 12th June, Hughby Government had done same Rice was brought on the Company's account Delivering it out in small quantitis at the Bazar rate when Rice grew cheap again, the Duty was bried as formerly and Madras was supplied with a large quantity. (৮) এতে দুটো ইঙ্গিত রয়েছে। একটা শুল্ক ছাড়ের আদেশ যাতে চালের দাম আর না বাড়তে পারে। কিন্তু এর চেয়েও বড় যে সিদ্ধান্ত কোম্পানী গ্রহণ করে, সেটা হচ্ছে, আজকালের অনেকটা কন্ট্রোল ও স্টেট ট্রেডিং-এর পর্যায়ে পড়ে। কোম্পানী নিজেই চাল কিনে নিজেই নীচু দরে বাজারে বাজারে দোকান খুলে চাল বিক্রি আরম্ভ করে এবং ফলতঃ যা হওয়া স্বাভাবিক, তাই হয়েছিল। বাজারে চালের দাম পড়তে শুরু করেছিল।

সতের শ' এগার সালে কোম্পানী যে খাজনা মকুবের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, এ সময়েও সেটা আবার চালু করে তারা। জমিদার মুর এ সম্বন্ধে কোম্পানীকে আগে থাকতেই ওয়াকিফহাল করে রেখেছিল। অবশ্য দেশের লোক কোম্পানীর এই দয়া ভোলেনি। দেশে আবার ফসল ভালো হতেই, তারা সেইসব বাকীবকেয়া মিটিয়ে দিয়েছিল।

কলকাতার কোম্পানীর নথিতে এর পরের যে দুর্ভিক্ষের সংবাদ পাওয়া যায় তখন কলকাতার জমিদার জাফানিয়া হলওয়েল। সেটা সতের শ' একান্ন সালের কথা। নবেম্বর মাস। কলকাতার সেই দুর্দিনের বিবরণটা কোম্পানীর খাতায় রয়েছে এই রকম—"The poor inhabitants of this town daily crying out to us concerning the great distress and want they

labour under, and our merchants and others representing to us it is owing to the dearness of rice and oil; agreed that the annual duties taxed on these articles, amounting to near Rs. 500, be forgiven this year, and that the Zemindar do give public notice there of." (১) দেখা গেল, এবারের কলকাতায় চাল ও তেলের মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা সমাধানের জন্য কোম্পানী চাল ও তেলের শুল্কটা মকুব করে দিলে। অবশ্য এতে যে কলকাতার সাধারণ মানুষ কিভাবে সুবিধা পেলে, বোঝা যায় না। জমিদার হলওয়েল সাহেব কোম্পানীর এই পাঁচশ টাকা ছাড়ের বিরুদ্ধে প্রচুর আপত্তি জানিয়েছিলেন। কিন্তু কোম্পানীর তাঁবে যে সব ব্যবসায়ীরা কলকাতা আলো করে রেখেছিল, তাঁদের দেখা যাচ্ছে, বেশ খুঁটির জোর, কেননা এই পাঁচশ টাকা ছাড়ের সিদ্ধান্ত শেষ অবধি বহাল ছিল। এই ঘটনা থেকে কলকাতা সমাজের একটা বিবর্তন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কলকাতার দরিদ্র জনসাধারণ ছাড়া একদল মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী চাকুরে মানুষের মধ্যেই কলকাতার সমাজে দল বেঁধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। দেখা যাচ্ছে তাদের অস্বীকার করার ক্ষমতা কোম্পানীর নেই।

অবশ্য মধ্যবিত্তদের সন্তুষ্ট করেই কোম্পানী রেহাই পায়নি কেননা অচিরেই কোম্পানীকে চালের দর বেঁধে দিতে বাধ্য হতে হয়েছিল। সতের শ' বাহান্ন সালের দোসরা জানুয়ারি কলকাতা থেকে লণ্ডনে জানান হচ্ছে—

The Zeminder informing us on the 20th September that the poor were greatly oppresed by the dearness of rice, we directed him to give public notice in all the market places that no person should exact higher price than hereafter specified under a serevee penalty :

For Good November Bund rice 35 seers per a Rupee.

Ordinary rice 1 maund 10 ,, ,, ,, ,,

এই যে সাধারণ চাল টাকায় একমণ দশ সের আর ভালো চাল টাকায় পঁয়ত্রিশ সের হিসেবে বিক্রির হুকুম কোম্পানী জারী করে, তার ফলে ব্যবসায়ীদের কোন অসুবিধা হয়েছিল বলে মনে হয় না। কেননা সমসাময়িক অপর এক সূত্রে সেকালের জিনিষপত্রের যে দর পাওয়া যাচ্ছে, দর এর চেরে কম। দরের হিসেবটা এই রকম।—(১১)

	অক্টোবর ১৭৫১ দর—টাকা প্রতি	অক্টোবর, ১৭৫২ দর টাকা প্রতি
চাল	১ মণ ৩২ সের	১ মণ ১৬ সের
ছোলা (শস্য)	১ মণ —	১ মণ ১২ সের
গম	১ মণ ৩২ সের	১ মণ ৬ সের
ময়দা	১ মণ ৩ সের	১ মণ —
তেল	১ মণ —	১ মণ —

সে সময়ে টাকায় ছয় পাই করে বিক্রয় কর আদায় করত কোম্পানী। এবং জিনিষপত্রের

দাম এইভাবে বাড়ার ফলে, কোম্পানী নিলেমে যে সব 'ফার্ম' বা জমিদারী বিক্রি করে সেগুলোর দর খুব বেড়ে যায়।

কলকাতায় এই দুর্ভিক্ষকে রোধ করায় জন্যে, আশ্চর্যের কথা, কোম্পানী অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি যদিও এই দুর্ভিক্ষকে সমসাময়িক বিবরণে' গ্রেট ফেমিন—এবং স্কারসিটি অব অল কাইণ্ড অব নেসেসারিজ অব লাইফ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে এই ধরণের ভীষণ দুর্ভিক্ষ গত ষাট বছরে নাকি কলকাতায় হয়নি। কলকাতার পথেঘাটে বহু লোক ক্ষুধায় অনশনে মারা যায়। কিন্তু এসব সত্বেও দেখা যাচ্ছে, কোম্পানী এই সময়েই কলকাতা থেকে চাল রপ্তানি বহাল রেখেছে। সতের শ' বাহান্ন সালের নয়ই অক্টোবর কোম্পানী যে হিসাব দাখিল করেন জমিদার হলওয়েল, তাতে দেখা যাচ্ছে, রপ্তানীর জন্য চাল খরিদের খাতে কোম্পানী সে বছর ১,১০৬৵০ খরচ করেছে! কোম্পানীর এই হৃদয় পরিবর্তন থেকে তার চরিত্রের পরিবর্তনটাও সহজেই লক্ষ্য করা যায়। দেখা যায়, এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই কোম্পানী আর কলকাতায় একভাবে আমজনতা, সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের সম্বন্ধে বিচলিত নয়। কলকাতা উঠে যাবার ভয় নেই কাজেই নিজের স্বার্থের দিকে মন দিয়েছে।

তবে এ সময়ে না হোক, দুর্ভিক্ষ রোধের জন্য কোম্পানী চালের রপ্তানী সতের শ' ষাট সালে একবার বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এবং পর বছর কলকাতার দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত মানুষদের খাওয়াবার জন্য বাইরে থেকে চাল আনার একটা ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই হুকুমনামায় রয়েছে—"The scarcity of grains in the place being at present such as to distress the poorer sort of people in the greatest degree, in order therefore to relieve the wants of the poor, the Board propose sending a sum of money to the markets in the country for the purchase of a quantity to be sold at an easy rate." (১২)

এই সময়ে কোম্পানী তাদের কাশিমবাজার, ঢাকা ও লক্ষ্মীপুর কুঠীতে চাল সংগ্রহের জন্যে টাকা পাঠায়। লক্ষ্মীপুরে তারা পাঠায় পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং এখানে চাল কেনার কাজটা উমিচাঁদের শ্যালক হুজুরীমল সাহেব। কোম্পানী দেয় সাড়ে সাঁইত্রিশ হাজার টাকা আর হুজুরীমল দেন সাড়ে বার হাজার টাকা। এবং এই পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে হুজুরীমল বের হল কলকাতার জন্য চাল কিনতে।

প্রসঙ্গতঃ সেকালের এইসব কোম্পানীর কাগজপত্রে চাল বা চালের বাজার সম্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। দেখা যাচ্ছে কোম্পানীর হুগলী কুঠিতে চাল কেনা হত বছরে দু' বার। একবার জুলাই-অগষ্টের সঙ্গে শনও পাটও কিনত কোম্পানী। দ্বিতীয় দফায় চাল কিনত ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে। এ সময়ে চাল কিনত আর কিনত লঙ্কা আর তেল। শীতকালে এখনও নতুন ধানের বাজার হয় কিন্তু জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে কেন চাল কিনত কোম্পানী এটাই রহস্য। সমসাময়িক আর একটি নির্ভরযোগ্য বিবরণ হচ্ছে অ্যালেকজাণ্ডার হ্যামিলটনের। ভদ্রলোক সতের দশ সাল নাগাদ ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তিনিও বলেছেন কলকাতায় চালের বাজার ছিল তাঁর বিবরণটা এই রকম—Along the River of Hooghly are many small villages

and Farms, intersperst in those large Planis, but the first of any note on the River's side, is Calcutta, a Market Town for Corn, coarse cloth, Butta and oil with other production of the country above it. (১৩)

হ্যামিলটন সাহেব আরও বলেছেন যে—'A little higher up on the East Side of Hoogbly River, is Ponjelly, a village where a Corn Mart is kept is kept once or twice in a week, it exports more rice than any place on this River : (১৪)

এখন এই পঞ্জেলী কোন জায়গায়? ডে ব্যারোমের বিখ্যাত ম্যাপ থেকে এবং হ্যামিলটন সাহেব যতটুকু তার নিশানা দিয়েছেন, তা থেকে জায়গাটা বোধহয় উলুবেড়িয়ার অপর তীরে দেখান Pacculi গ্রামটি হবে।

সে যাই হোক কোম্পানীর এই সব নথিপত্র থেকে দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় সেকালের কলকাতায় চালের বাজারের যে ছবি পাওয়া গেল, যা অন্য কোন সূত্রে তা দুর্লভ। এবং সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া গেল কলকাতার উৎপত্তিও বিবর্তনের একটা অস্পষ্ট রূপরেখা, জানি, এই ছবি নিতান্তই স্কেচ, এখানে অনেক মাটি, অনেক শিল্প দৃষ্টির প্রয়োজন যার সহযোগে এই কাঠামো মৃন্ময় মূর্তি হয়ে বর্ণে, রূপে রসে বাঙালীর মনপ্রাণ আমোদিত করবে, এর এই কঙ্কালের যে অংশ বিশেষ এই সব তথ্যপ্রধান ব্যক্তিভাবনাহীন বিবরণী থেকে পাওয়া গেল, সেগুলি ছাড়া সেই বিশ বছরের যৌবন মূর্তির আবির্ভাব কল্পনা নিতান্তই বাতুলতা। একেবারে অসম্ভব বলাই শ্রেয়।

(১) Diary of William Hedges. Ed. Henry Yule, vol. 1 (ভূমিকা) (২) Early Annals of the English in Bengal vol. I page 333 (৩) 1 bid. page 340. (৪) 1 bid. vol. II page 15 (৫) 1 bid. vol. II page 16. (৬) Old Fort William in Bengal. vol. I page 146 (৭) 1 bid. page 150. (৮) 1 bid page 151 (৯) Selections from unpublished Records, vol. I page 27 (১০) 1 bid page 30 (১১) 1 bid page 38 (১২) 1 bid page 255 (১৩) A new Account of the East Indies-A. Hamilton. (১৪) 1 bid.

৩ (ক) পাঠক সাধারণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য বলা প্রয়োজন কলকাতার একটা বড় চালের গোলা ছিল আজকের বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট (সেকালের কসাইটোলা) ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটের (সেকালের রানীমুদির গলি) মোড়ে। সিরাজদ্দৌলা কলকাতা আক্রমণের বেশ কিছু আগে সতের শ' বিয়াল্লিশ সাল নাগাদ কলকাতার আরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য কোম্পানী এখানেই দুটো কামান বসিয়েছিল। কোম্পানীর গোলাগুলোর আকার সম্বন্ধে ধারণা দেবার জন্যে জানান যাচ্ছে যে পঁচিশ হাজার মণের চালের গোলা সেকালে কলকাতায় বেশ কয়েকটাই করেছিল কোম্পানী।

মহাবিশ্বের রহস্যলোকে

অমিয়কুমার মজুমদার

মহাবিশ্বের অভিব্যক্তি অথবা ক্রমবিকাশ তত্ত্ব যেমনি সাধারণ মানুষের কাছে, তেমনি বিজ্ঞানীদের কাছেও বিস্ময়কর অধ্যায়। বহু যুগ ধরে এ নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা চলে এসেছে, কত সমীকরণ, যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগের মালা গেঁথে ভারী হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। গ্যালিলিও থেকে সুরু করে আধুনিক কালের বন্ডি, গোল্ড, হয়েল, ম্যাকক্রিয়া পর্যন্ত সকলেই বহু তত্ত্ব উপস্থাপনা করেছেন, আবিষ্কৃত তত্ত্ব ও তথ্যের সম্ভার সাময়িকভাবে বিজ্ঞানী সমাজে আলোড়ন এনেছে, কিন্তু তা বুদ্বুদের মত ক্ষণস্থায়ী এবং ক্ষণজীবীও। প্রাচীন ভারতে কতিপয় বিজ্ঞানী দার্শনিক ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব নিয়ে গভীরভাবে মনঃসংযোগ করেছেন। তাঁদের গবেষণালব্ধ তত্ত্ব হয়তো অতীত স্মৃতিরূপেই বিরাজিত। যেহেতু তা বিদেশের কষ্টিপাথরে যাচাই হবার সুযোগ পেয়ে চিহ্নিত হতে পারেনি। এ ত্রুটি কাদের জানিনে। তবুও সৌভাগ্যের কথা ভারতের অন্ততঃ কয়েকজন মনীষী প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানী দার্শনিক কপিলের ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্বটিকে বিদেশের জ্ঞানী-গুণী সমাবেশে উপস্থিত করেছেন।

সাংখ্যদর্শনে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব উপনিষদের ধারা থেকে অধিকতর বৈজ্ঞানিক। তাঁর মতে এক 'প্রকৃতি' থেকে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। বেদান্তে এই 'প্রকৃতিকে' বলা হয়েছে 'অব্যক্ত'। বেদান্ত মতে এই 'অব্যক্ত' সমগ্র জীবের অদৃষ্ট সংস্কার বা বীজের আকারে সঞ্চিত থাকে। এই ধারণা থেকে অভেদানন্দ, বিবেকানন্দের মত পৃথক এবং তা বৈজ্ঞানিক। স্বামী বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ বলেছেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আকস্মিকভাবে সৃষ্টি হয়নি, ক্রমবিকাশের সিঁড়ি বেয়ে গড়ে উঠেছে পৃথিবীর এই কলেবর এবং তা এগিয়ে চলেছে পরিণতির দিকে। সমগ্র সৃষ্টিকার্য নানা বৈচিত্রে ভরা।

মুণ্ডকোপনিষদে জগৎ সৃষ্টির ভাষ্য আছে—

'এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সার্বন্দ্রিয়ানি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্যধারিনী॥' (মুণ্ডকো, ২।১।৩)

এই পুরুষ থেকে প্রাণ জাত হয় এবং মন, সর্বেন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও সকলের আধারভূতা ক্ষিতি সম্ভূত হয়।

ভাবতে অবাক লাগে বহু হাজার বছর আগে প্রাচীন ভারতের চিন্তাবিদ ও দার্শনিকেরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, মন, চিন্তা, মনীষা এবং ইথার এই চারটি এক অবিভাজ্য শক্তিপুঞ্জ হয়ে উদগত হয়েছে বিবর্তনের ফলশ্রুতিতে। স্বামী অভেদানন্দের কথায়, 'The whole universe. before the evolution of name and form began, remained potentially in that unmanifested causal state! এই 'Causal Energy'কে বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। কেউ বলেছেন 'অব্যক্তম্' কেউ 'প্রকৃতি' অথবা 'মায়া'।

সৃষ্টিরহস্য বিষয়ে সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনের মত পূর্বমীমাংসাতেও আলোচনা আছে। জৈমিনির মতে (পূর্বমীমাংসা) জগতের উৎপত্তি নেই, অতএব বিনাশও নেই। এখন যে অবস্থায়

বা যে নিয়মে জগৎ চলেছে, অতীত কালেও এই নিয়মে চলে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে। 'ন কদাচিদনীদৃশম্'—কদাচ এর অনুরূপ নয়। অনাদি অনন্ত কাল ধরে এবং অনাদি ভবিষ্যৎকাল ব্যাপী জগৎ একভাবে ও এক নিয়মে চলতে থাকবে। জৈমিনির এই মতবাদ আধুনিক কালের এক শ্রেণী বিজ্ঞানীদের মতের অনুরূপ? আধুনিক বিজ্ঞানের 'steady state Theory And Continuous Creation' তত্ত্ব অনুসরণ করলে জৈমিনির বক্তব্যের গভীরতা উপলব্ধি করা যাবে। এ প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করবো। 'তৈত্তিরীয় উপনিষদে' সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

'তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধীভ্যোঽন্নম্। অন্নাৎ পুরুষঃ।' (২।১।৩)।

—উক্ত এই আত্মা থেকে আকাশ উৎপন্ন হলো, আকাশ থেকে বায়ু। বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল, জল থেকে পৃথিবী, পৃথিবী থেকে ওষধি সমূহ, ওষধি থেকে অন্ন এবং অন্ন থেকে পুরুষ (অর্থাৎ মানুষ) উৎপন্ন হলো।

সাংখ্যকার 'পঞ্চবিংশতি' তত্ত্ব অবলম্বনে সৃষ্টি প্রক্রিয়ার ক্রমিক ধারা নির্ণয় করেছেন—

সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্মহান্
মহতোঽহঙ্কারোঽহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণুৎভয়মিন্দ্রিয়ং
তন্মাত্রেভ্যং স্থূলভূতানি পুরুস ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ।' (সাংখ্যসূত্র ১।৬১)

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা 'প্রকৃতি'। প্রকৃতি থেকে মহৎ, মহৎ থেকে পঞ্চতন্মাত্রা ও দুই ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্রা থেকে পঞ্চস্থূলভূত।

'প্রকৃতি' কি? সাংখ্যের মতে প্রকৃতি হলো জগতের মূলবস্তু। জগতের অব্যক্ত অবস্থা বা সৃষ্টির পূর্বাবস্থা এবং প্রকৃতির ব্যক্তাবস্থা হলো জগৎ। প্রকৃতি ত্রিগুণ সম্পন্না—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। এদের বলা হয় প্রকৃতির অঙ্গ, ভাব বা অবয়ব।

পুরুষ বা আত্মার (universal self) সন্নিধিবশতঃ তার তুরীয় (transcendental) প্রভাবে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটে। তখনই মহাজাগতিক অভিব্যক্তি বা সৃষ্টির প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। ফলে তিনগুণের নির্বিশেষ সংমিশ্রণ হয় সবিশেষ (heterogeneous)। সমষ্টিগতভাবে পরিণামের কোন ব্যতিক্রম হয় না। গুণের পারস্পরিক রূপান্তর হতে পারে কিন্তু তার বিনাশ ঘটে না।

প্রকৃতির বিবর্তন বা পরিণাম নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করা চলে।
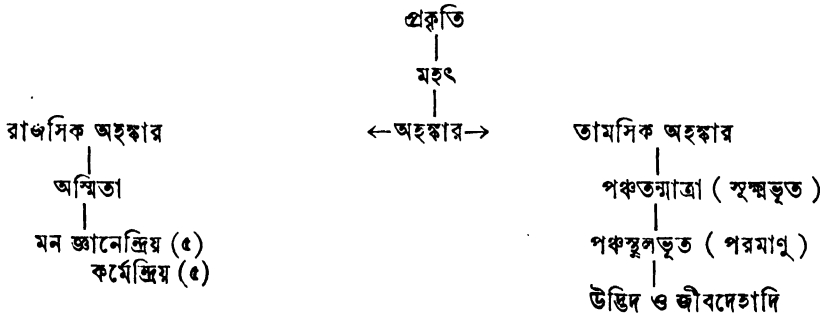
সাংখ্যকার কপিল বলেন অবস্তু থেকে বস্তুর সৃষ্টি হতে পারে না। তিনি বলেন কারণের মধ্যে তার কার্য বা ফল নিহিত। অর্থাৎ 'কারণ' হলো সুপ্ত অবস্থা, যখন ব্যক্ত হলো তখন হলো 'কার্য'। তিনি মনে করতেন ধ্বংস মানে পুনরায় সেই কারণাবস্থায় ফিরে যাওয়া। 'নাশঃ কারণালয়ঃ' (সাংখ্যসূত্র ১,১১৯) আধুনিক কালে 'বিগ্ ব্যাং থিয়োরী'র (Big Bang Theory) মূলকথা এটিই। কপিল বলেছেন প্রকৃতির নিয়ম (Law) সর্বত্র একরকম এবং সুনিয়ন্ত্রিত। স্থূলেও যা সূক্ষ্মেও তা একই। সাংখ্যমতে সৃষ্টিপ্রণালীতে 'উদ্বর্তন' ও 'অনুবর্তন উভয়ই স্বীকৃত।

প্রাণের বার বার আঘাতে 'আকাশ' থেকে বায়ু বা 'আকাশের' স্পন্দনশীল অবস্থা হয়। এ থেকে বায়বীয় বা বাষ্পীয় পদার্থের উৎপত্তি। স্পন্দন ক্রমশঃ দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে থাকলে উত্তাপ বা তেজের উৎপত্তি হয়। উত্তাপ ক্রমশঃ হ্রাস পেয়ে শীতল হতে থাকে, তখন ঐ বাষ্পীয় পদার্থ তরলভাব ধারণ করে, তাকে 'অপ' বলা হয়। অবশেষে তা কঠিনাকার প্রাপ্ত হলে তাকে বলা হয় 'ক্ষিতি' বা 'পৃথিবী'। সর্বপ্রথমে আকাশের স্পন্দনশীল অবস্থা, তারপর উত্তাপ, তারপর তা তরল হয়ে যায়, আর যখন আরো ঘনীভূত হবে, তখন তা কঠিন জড়পদার্থের আকার ধারণ করবে। ঠিক এর বিপরীতক্রমে সব কিছু অব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

'কঠিন বস্তুসকল তরলপদার্থে পরিণত হইবে, তরল পদার্থ কেবল উত্তাপ বা তেজোরাশিতে পরিণত হইবে, তাহা আবার ধীরে ধীরে বাষ্পীয়ভাব ধারণ করিবে, পরে পরমাণুসমূহ বিশ্লিষ্ট হইতে আরম্ভ হয় এবং সর্বশেষ সমুদয় শক্তির সামঞ্জস্য অবস্থা উপস্থিত হয়। তখন স্পন্দন বন্ধ হয়—এইরূপে কল্পান্ত হয়। আমরা আধুনিক জ্যোতিষ হইতে জানিতে পারি যে, আমাদের এই পৃথিবী ও সূর্যের সেই অবস্থা পরিবর্তন চলিয়াছে, শেষে এই কঠিনাকার পৃথিবী গলিয়া গিয়া তরলাকার এবং অবশেষে বাষ্পাকার ধারণ করিবে।' (১)

সাংখ্যকার কপিল বলেন এই জগৎ সৃষ্ট হয়নি, তার স্রষ্টা কেউ নেই। জগতের ক্রমবিকাশ হয়েছে। তিনি বলেছেন প্রকৃতি এই জগতের কারণ।

'মূলে মূলাভাবাদ মূলং মূলম্' (সাংখ্যদর্শন ১।৬৭)

প্রকৃতিই সকলের মূলে, তার মূলে কেউ নেই। কোন এক পরমপুরুষ জগতের সৃষ্টিকর্তা এমনি যে প্রবাদ আছে তার সম্বন্ধে কপিল বলেছেন—'প্রকৃতেরাদ্যোপদানতানেয্যাং কার্যত্বশ্রুতে' (সাংখ্যদর্শন ৬।৩২) অর্থাৎ প্রকৃতিই হচ্ছে আসল সৃষ্টিকর্তা পুরুষেতে তার আরোপ হয় মাত্র। জগতের ক্রমবিকাশ হয় প্রকৃতি থেকেই।

'নাবস্তুনোবস্তুসিদ্ধিঃ' (সাংখ্য ১।৭৮)—অবস্তু থেকে বস্তুর, অভাব থেকে ভাবের অথবা নিরাকার ব্রহ্ম থেকে সাকার জগতের সৃষ্টি হতে পারে না। অথচ 'শ্রুতি'তে বলা হয়েছে সৃষ্টিকারী ঈশ্বর। তাহলে তাকে কি ভুল বলবো? এর উত্তরে কপিল বলেছেন, 'মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসাসিদ্ধসব্যা' (সাং ১।৯৫) অর্থাৎ শ্রুতিতে যে ঈশ্বরের উল্লেখ আছে তা মুক্ত বা সিদ্ধপুরুষের প্রশংসাপত্রমাত্র। সেখানেও যে ঈশ্বরই সৃষ্টিকর্তা এমন কোন উল্লেখ নেই।

সাংখ্যদর্শনে যে ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব আছে তা পড়ে এটুকুই বোঝা যায় যে এর মধ্যে উদ্বর্তন, অনুবর্তন (ক্রমসঙ্কোচ) এবং বৃত্তাকারে বিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। বিজ্ঞানী টেলহার্ড দ্য সাডিন বলেন, (২)

'Thus wherever we look on earth, the growth of the 'within' only takes place thanks to a 'doubly related involution', the coiling up of the molecule upon itself and coiling up of planet upon itself. The initide quantum of consciousness contained in our terrestrial world is not formed merely of an aggregate of particles caught fortuitously in the same net.'

প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির আগে কি ছিল এবং তার প্রলয় সম্ভবপর কি না এবং হলে তার অবস্থা কি হবে? বিবেকানন্দ অভেদানন্দ বলেন, আমরা এসেছি সৎ স্বরূপ ব্রহ্মসমুদ্র থেকে, আবার সেখানে ফিরে যাব। একেবারে ধ্বংস বলে কোন কথা নেই। জগতে ধ্বংস বলতে কার্যেরই কারণাবস্থা বোঝায়। আমাদের কোনদিনই ধ্বংস হবে না, পার্থিব শরীর নষ্ট হতে পারে। কিন্তু যে পঞ্চভূত বা আদি পঞ্চতন্মাত্র থেকে সৃষ্টিলাভ করেছি, সেখানেই আবার ফিরে যাব, নতুন বিশ্বের সৃষ্টি হবে এবং আমরাও অনন্তকাল ধরে বেঁচে থাকবো। পুরোনো এই জড় পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলেও তার বুকে গড়ে উঠবে নতুন পৃথিবী। তার সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হবে নতুন সৌরজগৎ, নতুন গ্রহ-উপগ্রহ; এই হচ্ছে প্রকৃতি সৃষ্টির নিয়ম। এই অনন্ত সৃষ্টি প্রবাহের মধ্যেই আমরা বেঁচে থাকবো।

কপিল বলেছেন,

'প্রকৃতের্মহাংস্ততো অহংকারস্তস্মাদগণশ্চ ষোড়শ কঃ
তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি' (সাংখ্যকাবিকা ২২ শ্লোক)

প্রকৃতি থেকে মহৎ বা বুদ্ধি, মহৎ থেকে অহং জ্ঞান, অহংজ্ঞান থেকে ষোড়শ তত্ত্ব এবং তার চেয়ে নিকৃষ্ট স্থূল পঞ্চতত্ত্ব থেকে পঞ্চভূতের উৎপত্তি হয়েছে। কপিল বলেন মহৎ-ই সমস্ত বিশ্বের কারণ, প্রকৃতির প্রথম ফল। অহংকার থেকেই সকল ভূতের উৎপত্তি।

কপিলের মতে এই জগৎ নিত্য পরিবর্তনশীল। এখানে রূপান্তর হচ্ছে অবিরাম। কোন কিছুই স্থির নেই। বস্তুবাদী দার্শনিক কপিলের দৃষ্টিভঙ্গী অনেকটা অষ্টাদশ শতকের ফরাসী দার্শনিকদের মধ্যে যান্ত্রিক বলা যেতে পারে। তাঁর যুগে লোহার তৈরী বা বাষ্পচালিত যন্ত্রের প্রচলন না থাকলেই কাঠের তৈরী যন্ত্রের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। একারণে ঐ যন্ত্রসভ্যতার প্রভাব কপিলের উপর পড়েছে তা ভাবা অস্বাভাবিক নয়।

এবারে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞানের মত পর্যালোচনা করা যাক। বিজ্ঞানীরা বলেন জড়বিশ্বের আদিম উপাদান হলো হাইড্রোজেন গ্যাস। হাইড্রোজেন পরমাণুর ঘন সংযোগের ফলে গড়ে উঠেছে অন্যান্য যাবতীয় মৌলের পরমাণু। পরমাণু থেকে সৃষ্টি হয়েছে অণু, যৌগিক অণু এবং তার ফলশ্রুতিতে গড়ে উঠেছে বিশ্বের যাবতীয় বস্তুনিচয়—আকাশের সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র থেকে শুরু করে পৃথিবীর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জলকণা পর্যন্ত। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন হাইড্রোজেন পরমাণু সৃষ্টি হয়েছে প্রোটন ও ইলেকট্রনের মিলনে। প্রশ্ন উঠেছে এই পরমাণু এসেছে কোথা থেকে। বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন নীহারিকাগুলির মধ্যে তারকারাজির পশ্চাতে হাইড্রোজেন গ্যাস সূক্ষ্মভাবে ছড়িয়ে আছে। আমাদের সৌরজগৎ একটি নীহারিকার ক্ষুদ্রতম অংশ মাত্র।

আদিতে সব কিছুই ছিল ঘূর্ণায়মান গ্যাসের সমষ্টি। কোন তারকা তখন জন্ম নেয় নি। এই গ্যাস ঘনীভূত হয়ে জন্ম দিল তারকার। ঠিক একইভাবে আরো সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্মতরভাবে পরিব্যাপ্ত গ্যাস থেকে মহাশূন্যে ঘটে নীহারিকার উৎপত্তি একথা বিজ্ঞানীরা বলেন।

এই প্রচণ্ডগতিসম্পন্ন নীহারিকা কখনও মহাকাশের নির্দিষ্ট স্থান জুড়ে বসে থাকে না। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে তারা অবিরত এক স্থান থেকে অন্যস্থানে তড়িৎগতিতে চলে যাচ্ছে। পালিয়ে যাচ্ছে আমাদের দৃষ্টির সীমানা থেকে। আমাদের অতি নিকটবর্তী যে সব নীহারিকা, তাদের গতিবেগ ঘণ্টায় এক কোটি মাইলেরও বেশি। যারা আরো দূরে, তারা আরো বেগে প্রায় ঘণ্টায় কুড়ি কোটি মাইল বেগে ছুটে চলেছে। নীহারিকার দূরত্ব যত বাড়ে, তাদের গতিবেগও তত বেড়ে যায়। ফলে তাদের পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই বাড়ে এমনকি কোন কোন নীহারিকার গতিবেগ আলোকের গতিবেগের চেয়েও বেশি হয়। এই যে আন্তর্নীহারিকার দূরত্ব বেড়ে চলেছে তার কারণ কি? জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেন এই ব্রহ্মাণ্ডের কলেবর অনবরত বেড়ে যাচ্ছে। নীহারিকাগুলি যদি এমনিভাবে অবিরত ছুটে পালায় তাহলে বহু আগেই আমাদের মহাকাশ হতো নীহারিকাশূন্য। একেবারে না হলেও অনেকটা তো বটেই। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হয়নি। মহাকাশ নীহারিকাশূন্য হয়নি। কাজেই একথা সহজেই অনুমান করা চলে যে নতুন নীহারিকার জন্ম হচ্ছে হাইড্রোজেন গ্যাস থেকে। এবং এই জন্মগ্রহণ অতি দ্রুত। অর্থাৎ নীহারিকার দৌড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে হয়।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন একদিকে যেমন ক্রমাগত নীহারিকা সৃষ্টির ফলে হাইড্রোজেন গ্যাসের ঘাটতি হচ্ছে, তেমনি তার ক্ষতিপূরণ হচ্ছে নতুন হাইড্রোজেন গ্যাসের সৃষ্টিতে। এর ফলে নীহারিকাগুলির মাঝখানের জায়গাতে হাইড্রোজেনের চাপ বেড়ে যায়, ফলে নীহারিকাগুলি একে অপরের কাছ থেকে দূরে সরে যায়। বিশ্বের প্রসারণ তত্ত্বের (Expansion of Universe) কারণ মেলে এইখানে। প্রোটন ও ইলেকট্রনের সাহায্যে সৃষ্টি হয় হাইড্রোজেন পরমাণুর। প্রোটন ও ইলেকট্রন আসছে কোথা থেকে? তা আসছে শক্তিকণিকা থেকে। আইনস্টাইনের বিখ্যাত সমীকরণ $E = mc^2$ (E = শক্তির পরিমাণ, m = ভর, c = আলোর গতিবেগ) থেকে আমরা বুঝতে পারি শক্তি থেকে বস্তুকণার সৃষ্টি সম্ভব। একে বরং বলা যেতে পারে শক্তিকণিকা। হাইড্রোজেন গ্যাস থেকে নীহারিকা মেঘ, এবং মেঘ থেকে তারকা, তারকা থেকে গ্রহ উপগ্রহের সৃষ্টিকালীন সময়ে প্রচুর পরিমাণে শক্তির উদ্ভব হয়। তার থেকে সৃষ্টি হয়েছে শক্তি কণিকা। এমনিভাবে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে যুগ যুগ ধরে।

সাংখ্য-পাতঞ্জল তত্ত্বের উৎকর্ষ সম্বন্ধে বিখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য প্রিয়দারঞ্জন রায় সুন্দর কথা বলেছেন—'বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে তুলনা করলে অনেক স্থলে সাংখ্য-পাতঞ্জল তত্ত্বের উৎকর্ষ দেখা যায়। সাংখ্যের নামরূপহীন, অনাদি, অনন্ত, সর্বব্যাপী, অব্যক্ত, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির কল্পনা অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক। বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্বে চেতনার কোন স্থান নেই। বিজ্ঞানীরা মনে করেন মন, বুদ্ধি ও চেতনা জড়ের ধর্মবিশেষ; অনুকূল অবস্থায় তাদের বিকাশ ঘটে। সাংখ্যের সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় এরা হয়েছে প্রকৃতির পরিণাম মাত্র। জগতে যা কিছু ব্যক্ত, অব্যক্ত—প্রকৃতি হচ্ছে

তাদের সবার মূল বা বীজ। বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্বে হাইড্রোজেন গ্যাস হচ্ছে সৃষ্টির আদিম উপাদান। তারই ঘনসংযোগে গড়ে উঠেছে বিশ্বজগৎ। মহাশূন্যে এই হাইড্রোজেন গ্যাসের সৃষ্টি হচ্ছে অহরহ—এটা বিজ্ঞানীদের ধারণা। শক্তিকণা বা ফোটন থেকে আসে হাইড্রোজেন পরমাণুর মালমশলা। প্রকৃতির কল্পনা করে সাংখ্য একেও গেছে ছাড়িয়ে। কেবলমাত্র যুক্তিবিচার ও সাধারণ পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে কল্পনার সাহায্যে প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতেরা যে সব গভীর তত্ত্বের উদ্ভাবন করে গেছেন, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্বে তড়িৎ-চুম্বক ক্ষেত্রের কল্পনাকে এর সঙ্গে তুলনা করা চলে। কিন্তু তাতে চেতনা, প্রাণ ও মনের কোন সম্পর্ক নেই। তবে তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র নিছক কল্পনা নয়, কারণ তত্ত্ব পরীক্ষা ও প্রমাণসিদ্ধ। এই কারণে তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের তত্ত্ব বিজ্ঞানের একটি মূল্যবান তত্ত্বও প্রধান ভিত্তি।'(৩)

মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডুইন হাব্‌ল (Eduin Huffle) আবিষ্কার করেন বিশ্বের অসংখ্য নক্ষত্র ও অগণিত নীহারিকা অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে একে অপরের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্যেই বিশ্বের বিস্তৃতি ঘটছে। বিশ্বকে একটা বেলুনের সঙ্গে তুলনা করা যাক। মনে করা যাক, ঐ বেলুনের গায়ে অনেক বিন্দু চিহ্ন দেওয়া আছে। বেলুন যখন চুপসে থাকে তখন বিন্দুগুলি গায়ে লেগে থাকে। কিন্তু বেলুন যতই ফুলবে বিন্দুগুলির পারস্পরিক দূরত্ব ততই বাড়বে। বিশ্ব-বেলুনের গায়ে বিন্দু চিহ্নগুলি নক্ষত্র-নীহারিকার দল। এখানে প্রশ্ন উঠবে কৌতূহলী চিত্তে, সরে যাওয়ার পালা আরম্ভ হবার আগে বিশ্বের অবস্থা কি ছিল।

এর জবাব দিলেন 'বিগ ব্যাং থিয়োরীর' সমর্থকেরা। এঁদের মধ্যে আছেন বার্ণার্ড লভেল, মার্টিন রাইল, জর্জ গ্যামো প্রমুখ বিজ্ঞানীরা। তাঁরা মনে করেন বিশ্ব বিস্তৃত হবার আগে সমগ্র বস্তুনিচয় ঘন নিবদ্ধ অবস্থায় ছিল, অনেকটা ডিমের মতো। বহু বছর আগে আকস্মিকভাবে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে তা টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়লো। এ থেকে এসেছে গ্যালাক্সি ও সূর্যসমূহ। বিস্ফোরণের পরে মহাকর্ষের ফলে খণ্ড কণাগুলি আবার দানা বাঁধতে লাগলো। তা থেকেই প্রথমে নীহারিকা ও পরে নক্ষত্রের জন্ম। বিস্ফোরণের ফলে বস্তু কণাগুলির মধ্যে এত অধিকমাত্রায় বেগ সঞ্চারিত হয়েছিল যে, তার ফলে নীহারিকা ও নক্ষত্রপুঞ্জ ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু একটি প্রশ্ন তাঁরা এড়িয়ে গেলেন। অপসারণ ক্রিয়া শুরু হবার আগে বিশ্বের বস্তুনিচয়ের অবস্থা কেমন ছিল ?

পালসেটিং বা প্রসারণ-সঙ্কোচন তত্ত্ব আলোচনা করলে জানা যায় বিশ্বের প্রসরণশীলতা ক্রমেই কমে আসছে এবং এক সময়ে তা বন্ধ হয়ে যাবে। তারপরে শুরু হবে সঙ্কোচনের পালা। অবশেষে বিশ্ব পূর্বেকার ঘননিবদ্ধ বস্তুতে পরিণত হবে, তখন আবার হবে এক বিস্ফোরণ। পরেই প্রসারণ ক্রিয়া আরম্ভ হবে। এমনিভাবেই সঙ্কোচন প্রসারণের চক্র আবর্তিত হয়। কতিপয় জ্যোতির্বিদ মনে করেন যে, সৃষ্টির মুহূর্তে যখন বিশ্ব বস্তুপিণ্ডরূপে অথবা অতি ঘন নিবদ্ধ অবস্থায় ছিল, তখন তা ছিল শুধু শক্তিপুঞ্জ। তারপর বিশ্ব যত প্রসারিত হতে লাগলো, তখন শক্তি বস্তুতে পরিণত হতে আরম্ভ করলো। পূর্বেকার তত্ত্ব অনুসারে একথা ধারণা করা যেতে পারে, শক্তি যখন সম্পূর্ণরূপে বস্তুতে পরিণত হবে তখন তার পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

ফলে দেশ ও কাল লুপ্ত হবে। প্রকৃতপক্ষে বস্তু থেকে আবার শক্তি সৃষ্টি হয়।

পালসেটিং থিয়োরী অনুসারে জানা যায় যে, সর্বোত্তম বিস্তৃতির সময়েও অনেক শক্তি বাড়তি থাকে। তার ফলে গ্যালাক্সিপুঞ্জ তাদের পারস্পরিক আকর্ষণের সাহায্যে ফের চলতে শুরু করে এবং সঙ্কোচনের পালা আবার আরম্ভ হয়।

স্থির-তত্ব বা ষ্টেডি-ষ্টেট-থিয়োরীর মূল কথা হচ্ছে বিশ্ব অনন্ত কাল ধরেই ছিল এবং থাকবেও। প্রাচীন নক্ষত্রসমূহ অন্তিম দশা প্রাপ্ত হলে তার জায়গায় নতুন নক্ষত্র জন্ম নিচ্ছে। এক কথায় বলতে গেলে এই মহাবিশ্বের আদি নেই, অন্ত নেই। আদিতে যে সংখ্যক নীহারিকা ছিল, এখনও তাই-ই আছে।

বৃটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল বলেন যে, বিশ্ব বিস্তারশীল তা ঠিক। কিন্তু বিস্তারের ফলে আন্তর্নীহারিকার শূন্যতা বেড়ে যাচ্ছে তা তিনি মানেন না। তিনি বলেন, নব নব সৃষ্টির ফলে উৎপন্ন বস্তুনিচয়ের ধাক্কাতে বিশ্ব বেড়ে চলেছে। যদিও নক্ষত্র এবং নীহারিকাগুলি ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে, কিন্তু ফাঁকা স্থান মুহূর্তে ভর্তি করে দিচ্ছে নতুন বস্তু এসে। এই যে অনবরত বস্তু সৃষ্টি হচ্ছে তা আসবে কোথা থেকে? ফ্রেড হয়েল বলেন, 'It does not come from anywhere. Material simply appears, it is created.'

ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিতত্ব নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা চলছে। কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপস্থিত হতে পারেননি বিজ্ঞানীরা। ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলে নানা যুক্তিতর্ক উপস্থাপিত করা যায়। কিন্তু আদিতে কিছুই ছিল না এমন অবস্থার কথা কল্পনা করা সম্ভব হলেও বিজ্ঞান তার কোন ব্যাখ্যা দিতে অপারগ।

নীহারিকা সমূহ যে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে দূরে সরে যাচ্ছে তা নিয়েও সন্দেহ উঠেছে বিজ্ঞানী মহলে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিদ্যার এমেরিটাস অধ্যাপক বিজ্ঞানীপ্রবর হ্যারো স্যাপলে (Harrow Shapley) এক প্রবন্ধে বলেছেন, (৪)

'Accepting the strong evidence of an expansion from a denser conglomeration of matter, we can say that the speed of metagalactic scattering is a linear or nearly linear function of the distance, and the size is a function of time. The rate is still under investigation.'

প্রশ্ন হতে পারে—'স্থান' বা 'দেশ' কি অসীম? বহু দূরবর্তী স্থানে নীহারিকা সমূহের গতিবেগ কি আলোকের গতিবেগকে অতিক্রম করে যেতে পারে? এ প্রশ্নগুলির উত্তর এখনও সঠিকভাবে পাওয়া যায়নি। এ নিয়ে সকলেই ভিন্ন মত পোষণ করেছেন বললেই চলে। মহাকাশের সম্বন্ধে গবেষণা চলছে। 'সৃষ্টিকর্তা'র কল্পনা করতে আমাদের চিত্ত এখন দোলায়িত, যেহেতু অনেক কথাই অজ্ঞাত। আগামী দিনের বিজ্ঞানের আবিষ্কারে হয়ত এই দ্বিধা দূরীভূত হবে।

বেদান্তে বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা কেউ আছে এমন কথা বলা হয় না, যেহেতু আমরা যখন ক্রমবিকাশ তত্বে আস্থাশীল তখন 'সৃষ্টিকর্তা'র কল্পনা অসম্ভব। যেহেতু আমরা প্রত্যক্ষ করি যে বিশ্বের যাবতীয় ঘটনা বা বস্তুনিচয় সেই চিরন্তন শক্তিপুঞ্জ থেকে উদগত হয়েছে। একে বলা হয় 'প্রকৃতি'।

তাহলে দেখা যাচ্ছে 'শক্তি' থেকে 'পদার্থের' সৃষ্টি হচ্ছে। পদার্থ যদি শক্তি থেকে অভিব্যক্তির ফলে জন্ম নেয়, তবে বিশ্বের মূল কি? তাহলে মধ্যেকার পরমাণু, ইলেকট্রন ইত্যাদির নাম করা কেন? কেবল মাত্র 'শক্তি'কেই তো বিশ্বের মূল উপাদান বলা চলে। এর সঙ্গে 'তড়িৎ' যোগ করলেই হলো। এই ব্রহ্মাণ্ড যত বিরাট হোক, যত কল্পনাতীত হোক, তার মূলে মাত্র ছুটি কথা—শক্তি আর তড়িৎ। পদার্থ শক্তির রূপান্তরিত অবস্থা মাত্র। আবার পদার্থের ধ্বংসে শক্তির উৎপত্তি। শক্তির হ্রাস নেই, বৃদ্ধি নেই তা অবিনশ্বর। তাহলে শক্তির উৎপত্তির স্থান কোথায়, কত দূরে? ব্রহ্মাণ্ডের বিবর্তন মেনে নিলাম কিন্তু কোথায় তার উৎপত্তি এই চিরন্তন জিজ্ঞাসার উত্তরে বিজ্ঞানী স্যাপলের কথা আবার তুলে ধরছি—(৫)

'With bold advances in Cosmogony we may in future hear less of a creator and more of suce things as 'antimatter', 'mirror worlds', and 'Closed space-time.' Finality, however, may always elu le us. That the whole universe evolves or from where, or where to the answers to these questions may be among the unknowable.'

যতদিন এগিয়ে চলেছে, বিশ্ব সম্বন্ধে নতুন জ্ঞান, গভীরতর জ্ঞান আহরণ করে চলেছি বটে, কিন্তু একথা অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ হবে যে আমরা আরো গাঢ় অন্ধকারে যেন ডুবে যাচ্ছি। এ অন্ধকার অজ্ঞানতার। বহু বছর আগে সার আইজাক নিউটন বলেছিলেন, 'আমি বেলাভূমি থেকে উপলখণ্ড সঙ্কলন করছি মাত্র, জ্ঞান সমুদ্র সামনে অক্ষুণ্ণ আছে।' নিউটনের পর ছুশো বছর বেশী সময় চলে পড়েছে মহাকালের গর্ভে; বিজ্ঞানের অগ্রগতি দেখে আজ সাধারণ মানুষ স্তম্ভিত, বিমূঢ় এবং আতঙ্কিতও। তথাপি বিজ্ঞানীরা আজও নিউটনের সেই আপ্তবাক্য একইভাবে উচ্চারণ করে চলেছেন।

১। স্বামী বিবেকানন্দ, সাংখ্যীয় ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব (বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৭)
২। The Phenomenon of Man : Teilhard de Chardin (P. 73-74).
৩। জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ১৭শ বর্ষ ১ সংখ্যা, পৃ ৪৫-৪৬
৪। On the Inorganic Evolution, Evolution After Darwin, Vol I, P33.
৫। On the Inorganic Evolution P. 33.

মহামহোপাধ্যায় বাপুদেব শাস্ত্রী

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

৮২১ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর বর্তমান মহারাষ্ট্র রাজ্যের পুনা নগরে এক চিৎপাবন ব্রাহ্মণ পরিবারে াসুদেবের জন্ম হয়। মাতা সত্যভামা দেবী নৃসিংহ দেবের আরাধনা করিয়া পুত্রলাভ করায় বজাত পুত্রের নাম রাখা হয় নৃসিংহদেব। প্রিয় অর্থে বাপু নামে আত্মীয় স্বজন কর্তৃক অভিহিত ইতে থাকায় পরবর্তী কালে এই শিশু বাপুদেব নামেই খ্যাত হন। বাপুদেবের পিতা সীতারাম পরাঞ্জপে টোনকেকার, একজন বেদশাস্ত্র পারঙ্গম পণ্ডিত ছিলেন। পুনায় মাতৃভাষা মারাঠিতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর সংস্কৃত শিক্ষার জন্য ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে বাপুদেব পিতার সহিত নাগপুরে আসিয়া সংস্কৃত পাঠশালায় প্রথমে ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। "সিদ্ধান্ত-কৌমুদী" প্রভৃতি ব্যাকরণ গ্রন্থ ও জ্যোতিষশাস্ত্রের কোন কোন গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া তিনি কান্যকুব্জ জাতীয় ব্রাহ্মণ ঢুণ্ডি রাজ মিশ্রের নিকট ভাস্করাচার্য রচিত গণিতগ্রন্থ সিদ্ধান্ত-শিরোমণির "লীলাবতী" অংশ বিশেষভাবে পড়িতে থাকেন। শিশুকাল হইতেই বাপুদেব গণিতশাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গণিতের প্রতি তাঁহার অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ঢুণ্ডিরাজের শিক্ষায় অল্পদিনের মধ্যেই হিন্দু-গণিতে বাপুদেব বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। ইতিপূর্বেই তিনি নিজের চেষ্টায় ইউরোপীয় গণিতে দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন।

বাপুদেব যখন নাগপুরে হিন্দু-গণিত শাস্ত্র পাঠ করিতেছেন এমন সময়ে দৈবক্রমে তিনি মধ্যভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহের রাজপ্রতিনিধি (Political Agent to the Govt of India) মিঃ লান্সেলট্ এট্‌কিন্‌সনের সহিত পরিচিত হন। সংস্কৃত বিশেষতঃ হিন্দু-গণিতে মিঃ এট্‌কিনসনের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তরুণ-বালক বাপুদেবের গণিতে অসাধারণ অনুরাগ ও ব্যুৎপত্তি দেখিয়া গণিত-প্রেমিক মিঃ এটকিন্‌সন্ তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। বিদ্যানুরাগী এট্‌কিন্‌সনের মনে এই ধারণা জন্মে যে উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ বালক উত্তরকালে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ গণিতবেত্তা হইবে এবং হিন্দু-গণিতের লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিবে। এট্‌কিন্‌সনের কর্মস্থল সিহোরে এই সময় একটি সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় ছিল। মিঃ এট্‌কিন্‌সনের সহায়তায় বাপুদেব সিহোরের সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন ও সেখানে দুই বৎসর কাল বিশেষভাবে রেখাগণিত ও বীজগণিত অধ্যয়ন করিয়া "শাস্ত্রী" উপাধি লাভ করেন। সিহোর মহাবিদ্যালয়ের পাঠাগারে বহু দুষ্প্রাপ্য গণিতশাস্ত্রীয় পুঁথি ছিল। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বাপুদেব এই গ্রন্থগুলি পাঠ করেন এবং হিন্দু গণিতে প্রগাঢ় জ্ঞান অর্জন করেন। সিহোরে মধ্যাহ্নকালে বাপুদেব একটি বিদ্যালয়ে হিন্দীতে বীজগণিত (Algebra) ও রেখাগণিত (জ্যামিতি) শিক্ষা দিতেন, এইভাবে তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্বাহিত হইত।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বাপুদেবের বয়স যখন মাত্র ২১ বৎসর তখন মিঃ এট্‌কিন্‌সনের চেষ্টায় কাশী সংস্কৃত কলেজে তিনি রেখাগণিত ও জ্যোতিষের (Astronomy) সহকারী

অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিছুদিন পর এই মহাবিদ্যালয়ের প্রধান গণিতাধ্যাপক পণ্ডিত লজ্জাশঙ্করের মৃত্যু হইলে বাপুদেব তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাপুদেব এই পদে নিযুক্ত ছিলেন।

কাশীতে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া অধ্যাপনার অবসরে বাপুদেব গণিতচর্চায় ও পুস্তক রচনায় নিমগ্ন থাকিতেন। এইভাবে তিনি সংস্কৃত ও হিন্দীতে বহু গণিত গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার রচিত সংস্কৃত পুস্তকগুলির মধ্যে (১) রেখা গণিতম (২) ত্রিভুজ গণিতম্ (৩) ত্রিকোণমিতিতন্ত্রম্ (৪) সায়ন বাদঃ (৫) প্রাচীন জ্যোতিষাচার্যাশয় বর্ণনম্ (৬) বিচিত্র প্রশ্নানাং সংগ্রহম সোত্তরম্ (৭) তত্ত্ব বিবেক পরীক্ষা (৮) কাশ্যাং মানমন্দিরস্থ যন্ত্র বর্ণনম্। (৮) ব্যক্তগণিতম্ (Arithmetic), (৯) চলনকলনস্থা আদ্যা অধ্যায়স্য সিদ্ধান্ত বোধকান্ বিংশতি সিদ্ধান্তাঃ (১০) চাপীয় ত্রিকোণমিতিঃ (১১) যন্ত্ররাজোপযোগী ছেদ্যকম্ (১২) লঘুশঙ্কুশ্ছিন্নক্ষেত্রগুণম প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

বরাহ মিহির রচিত "সূর্য সিদ্ধান্ত" গ্রন্থটি বৈজ্ঞানিক রীতিতে লিখিত প্রথম হিন্দু-জ্যোতিষ গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হয়, এই গ্রন্থটি আনুমানিক খৃষ্টিয় পঞ্চম শতাব্দীতে লিখিত। অনেকে মনে করেন যে পূর্বসূরীদের নিকট হইতে প্রাপ্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে ইহা রচিত হয়। এই গ্রন্থের প্রাচীনত্ব ও প্রামাণিকতা সর্বজন স্বীকৃত। বাপুদেব এই গ্রন্থটি সর্বপ্রথম ইংরাজীতে অনূদিত করিয়া প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটি কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে "বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা" সিরিজে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ৩২ সংখ্যক গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্বে এসিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে এই গ্রন্থমালায় (২৫নং) মূল সংস্কৃত "সূর্য সিদ্ধান্ত" গ্রন্থটি Fitzerald Hall কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণটির সম্পাদনায়ও বাপুদেব সহায়তা করেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে ভাস্করাচার্য রচিত সিদ্ধান্ত-শিরোমণির সর্বপ্রথম ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। বাপুদেবের পরম সুহৃৎ ও পৃষ্ঠপোষক মিঃ ল্যান্সেলট্ এট্‌কিন্‌সন কৃত এই অনুবাদও বাপুদেব কর্তৃক সংশোধিত ও সম্পাদিত হয়। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বাপুদেব ভাস্করাচার্য রচিত সিদ্ধান্ত-শিরোমণি গ্রন্থের গণিত ও গোলোধ্যায় খণ্ড দুইটি ভাস্করাচার্যের স্বয়ং কৃত বাসনাভাষ্য, নিজকৃত টিকা টিপ্পনী ও ইংরাজী ভূমিকা সহ সম্পাদন করিয়া বারাণসী হইতে প্রকাশ করেন। "সিদ্ধান্ত-শিরোমণি" হিন্দু-জ্যোতিষ গ্রন্থগুলির মধ্যে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ, এই গ্রন্থের কোন নির্ভর-যোগ্য সংস্করণ ছিল না। প্রচলিত মুদ্রিত গ্রন্থগুলির বহু ভ্রম প্রমাদ অমুদ্রিত বহু পুঁথির 'পাঠ' পর্যালোচনা দ্বারা সংশোধিত করিয়া বহু পরিশ্রমে বাপুদেব এই গ্রন্থটি সম্পাদন করেন। এই গ্রন্থটি চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে কাশী হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্রে (J. A. S. B. vol-28) একটি প্রবন্ধ লিখিয়া বাপুদেব ইহা প্রতিপন্ন করেন যে একাদশ শতাব্দীতে উজ্জয়িনী নিবাসী ভারতীয় গণিতবেত্তা ভাস্করাচার্য বিভেদক অন্তরকলন বিদ্যা (Differential Calculus) পরিজ্ঞাত ছিলেন এবং তিনি তাঁহার গণিতগবেষণায় এই বিদ্যাকে সম্যগরূপে ব্যবহার করেন। বাপুদেব শুধু হিন্দু-গণিতেই পারদর্শী ছিলেন না, ইউরোপীয় গণিত-বিদ্যাতেও তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। ইউরোপীয়

পণ্ডিতগণ বাপুদেবের এই প্রবন্ধ পাঠে বিচলিত হন, তাঁহাদের ধারণা ছিল যে অন্তরকলন বিদ্যা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় গণিতজ্ঞদের একটি অতি যুগান্তকারী আবিষ্কার। বাপুদেবের গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিমতের প্রতিবাদ করা ইউরোপীয় গণিতজ্ঞদের পক্ষে সহসা সম্ভব হয় নাই। ইংল্যাণ্ড এর রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ হইতে সোসাইটির ডিরেক্টর ভারতবিদ্ পণ্ডিত হোরেস হেমান উইলসন এবিষয়ে একজন বিখ্যাত ইংরাজ গণিতজ্ঞের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে ইনি (William Spottiswode) মন্তব্য করেন যে বাপুদেবের ধারণা খুব নির্ভুল না হইলেও ইহা একেবারে ভ্রান্ত না হইতেও পারে, কারণ ভাস্করাচার্যের জ্যোতিষগণনারীতির সহিত আধুনিক ইউরোপীয় গণনারীতির উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য আছে। ইংরাজ গণিতজ্ঞের এই অভিমতটি লণ্ডন এশিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে প্রকাশিত হইয়াছিল (J. R. A. S, 1860)। কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে ভাস্করাচার্য সম্বন্ধে বাপুদেবের বহু তথ্যপূর্ণ আর একটি প্রবন্ধ তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয় (J. A. S. B, Vol 62, 1893)

বাপুদেব হিন্দী ভাষাতে বীজগণিতম্ (১৮৫০), ব্যক্তগণিতম (১৮৭৫) ফলিত বিচার:, সায়নবাদানুবাদ পঞ্চাঙ্গোপপাদনম (পঞ্জিকা রচনা পদ্ধতি) ইত্যাদি কয়েকটি গণিত গ্রন্থ রচনা করেন। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের গভর্ণমেণ্টের (ঐ সময়ে বর্তমান উত্তর প্রদেশ North Western Province নামে পরিচিত ছিল) ইচ্ছাক্রমে বাপুদেব হিন্দী ভাষাভাষী বিদ্যার্থীদের জন্য ব্যক্ত গণিত (Arithmetic) ও বীজগণিতের (Algebra) ১ম ও ২য় ভাগ রচনা করেন। হিন্দী ভাষায় বীজগণিত (১ ভাগ) রচনার জন্য উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেঃ গভর্ণর মিঃ টমাসন্ ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ্য দরবারে বাপুদেবকে ২০০০৲ মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করেন। বীজগণিতের দ্বিতীয়ভাগ রচনা করার পর বাপুদেব লেঃ গভর্ণর মুইরের নিকট হইতেও নগদ ১০০০৲ ও একজোড়া শাল পারিতোষিক প্রাপ্ত হন।

বাপুদেব ইউরোপীয় পদ্ধতিতে গণনা করিয়া সংস্কৃত পঞ্চাঙ্গ বা পঞ্জিকা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বাপুদেব কর্তৃক ইউরোপীয় পদ্ধতিতে চন্দ্রগ্রহণের নির্ভুল গণনায় মুগ্ধ হইয়া কাশ্মীর ও জম্মুর অধিপতি মহারাজা রণবীর সিংহ তাঁহাকে এক সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করেন।

যৌবনে উপনীত হইবার পূর্বেই গণিতজ্ঞরূপে বাপুদেবের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি শুধু দেশেই নহে বিদেশেও বিস্তৃত হয়। প্রাচীন হিন্দু গণিতবেত্তাগণের ও হিন্দুগণিতের গৌরব প্রচারে ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে বাপুদেবই সর্বপ্রথম অগ্রণী হন। সূর্য সিদ্ধান্তের ইংরাজী অনুবাদ ও সিদ্ধান্ত শিরোমণির সুসম্পাদন দ্বারা তিনি ইউরোপী ভারত-বিদ্দের নিকটও সমধিক আদরণীয় হন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে গ্রেট ব্রিটেন ও আয়র্লণ্ডের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি বাপুদেবকে সোসাইটির সম্মানিত সদস্য (Honarary fellow) মনোনীত করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিও তাঁহাকে অনুরূপভাবে সম্মানিত করেন।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বাপুদেব শাস্ত্রী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য (fellow) পদ লাভ করেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁহাকে সদস্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া সম্মানিত করে। কাশী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ (১৮৬৩-১৮৬৫) প্রসিদ্ধ ভারতবিদ্ ও

সংস্কৃতজ্ঞ ডাঃ হেণ্ডরীক কার্ণ (ভট্ট কন্ন, ১৮৩৩-১৯১৭) অসাধারণ গাণিতিক প্রতিভা ও গণনা দক্ষতার জন্য বাপুদেবকে "ভারতভূষণম্" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার বাপুদেবকে C. I. E (Companion of the Indian Empire) উপাধি দান করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ ভারত সরকার কর্তৃক বাপুদেব মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত হন।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বাপুদেব স্বেচ্ছায় কাশী সংস্কৃত কলেজের প্রধান গণিতাধ্যাপকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী (১৮৬০-১৯১০) এই পদে তাহার স্থলাভিষিক্ত হন। উত্তরকালে পণ্ডিত দ্বিবেদীও দেশে বিদেশে একজন অদ্বিতীয় গণিতজ্ঞরূপে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। গণিত ব্যতীত অন্যান্য বিদ্যাতেও তাঁহার পাণ্ডিত্য সকলের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে কাশীতে বাপুদেবের জীবনান্ত হয়। তাঁহার এক পুত্র গণপতিদেব শাস্ত্রীও গণিতজ্ঞ পণ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ করেন।

বিদ্যালয়ে ভাষা শেখার সমস্যা

ভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

সেকাল

বাঙলার শিক্ষাক্ষেত্রে ভাষা শেখা এক পুরানো সমস্যা। নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। ভাষা উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র। দীর্ঘকাল ধরে উপায় উদ্দেশ্যকে ছাপিয়ে উঠেছে। দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তনের কাল থেকে ইংরেজি ভাষা পাঠ্য তালিকায় প্রধান স্থান অধিকার করে রয়েছে। শিক্ষার্থীদের সময় ও শক্তির বেশীর ভাগ নিয়োজিত হয়ে থাকে এই বিদেশী ভাষা শেখার জন্য। প্রথম যুগে ইংরেজি ছিল শিক্ষার মাধ্যম ও আপিস আদালতের ভাষা। জ্ঞানার্জন ও বৈষয়িক উন্নতির জন্য ইংরেজি শেখা ছিল অপরিহার্য, বিদ্যালয়ের প্রতি ক্লাসে ইংরেজি ছিল অবশ্য পাঠ্য ভাষা। প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের নানা বিষয়ে জননী ভাষায় লেখা কমপক্ষে হাজার পৃষ্ঠা ইংরেজি না পড়ে উপায় ছিল না। ক্রমাগত আট বৎসর কঠোর পরিশ্রম করেও অনেকের পক্ষে এই বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করা অসাধ্য ছিল। প্রতি পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণদের বেশির ভাগ হত ইংরেজি ভাষার বলি। ইংরেজি শেখার অক্ষমতা বহু বাঙালির জীবনে ব্যর্থতার কারণ। সে যুগে বাংলা ছিল ভাষা গোষ্ঠীর সিণ্ডারেলা, অবজ্ঞাত, অবহেলিত। বিদ্যার্থীরা মাতৃভাষাকে বিদায় দিত ষষ্ঠ মানের শেষে। সপ্তম থেকে দশম মানে·ছিল সংস্কৃতের·অধিকার। এ ব্যবস্থায় কোন ক্লাসে তুটির বেশী ভাষা পড়তে হত না।

শিক্ষার নতুন যুগের সূত্রপাত হয়েছিল চলতি শতকে দ্বিতীয় দশকের প্রারম্ভে। একে বাংলার গৌরব বৃদ্ধি ও ইংরেজির গুরুত্ব হ্রাসের যুগ বলা যেতে পারে। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা থেকে ইংলণ্ডের ইতিহাস বাদ দেওয়া হল। ভূগোল ও ভারতের ইতিহাস হল ঐচ্ছিক বিষয়। ইংরেজি সাহিত্য পাঠ বন্ধ হয়ে গেল। সব মিলে ছাত্ররা প্রায় সাতশ পৃষ্ঠা ইংরেজি পড়ার দায় থেকে অব্যাহতি লাভ করেছিল। বিদেশী নাগপাশ থেকে মুক্তির ফল হাতে হাতে দেখা গেল। ইংরেজির বাঁধ ভেঙে পড়ায় পাশের প্লাবন এসেছিল। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পাশের হার উঠে গেল শতকরা আশিতে। ম্যাট্রিকুলেশন যুগের দ্বিতীয় ভাগে বাংলাকে করা হল শিক্ষার মাধ্যম। ইংরেজি সাহিত্য পাঠ পুনরায় প্রবর্তিত হল। পাশের হার আবার নেমে গেল পঞ্চাশের ধারে। অবশ্য পাঠ্য ভাষা তখন তিন, ইংরেজি বাংলা ও সংস্কৃত। ভাষার তালিকায় বাংলার স্থান ছিল প্রথম। ইংরেজির স্থান দ্বিতীয় হলেও তার মর্যাদা সবচেয়ে বেশি। বাংলার চেয়ে বেশি সময় দেওয়া হয় ইংরেজির জন্য। সপ্তম থেকে দশম মানের প্রতি ক্লাসে একসঙ্গে পড়তে হত ইংরেজি বাংলা ও সংস্কৃত।

একাল

স্বাধীনতা লাভের পর শিক্ষার ক্ষেত্রে নবাগত ভাষা হিন্দীর আবির্ভাব ঘটেছে। এখন অবশ্য

পাঠ্য ভাষার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে চার। প্রথম থেকে সংস্কৃত যদিও অবশ্য পাঠ্য ভাষা তথাপি ভাষার কথা বলার সময় দেশের প্রধানেরা সংস্কৃতের নাম উল্লেখ করেন না। ইংরেজি হিন্দী ও আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে তাঁদের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকে। তাঁরা একেই বলেন ত্রিভাষা সূত্র।

ভাষার দাবি

চার ভাষার প্রত্যেকটির দাবি এত জোরালো যে পাঠ্যসূচী থেকে কাউকে বাদ দেওয়া ভাবী নাগরিকদের স্বার্থবিরোধী হবে। মাতৃস্তন্য যেমন দেহ পুষ্ট ও বৃদ্ধি করে তেমনি মনের বিকাশ সাধনে সহায়তা করে থাকে মাতৃভাষা। মুখে কথা ফোটার সময় থেকে যে ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করতে অভ্যস্ত তা যে ভাবপ্রকাশের সহজ ও স্বাভাবিক উপায় তা বলাই বাহুল্য। সেকালের শিক্ষিতদের ভাবপ্রকাশের একমাত্র ভাষা ছিল ইংরেজি। বিদেশী ভাষায় আত্মপ্রকাশ দুরূহ বলে সেযুগে সাধারণ বাঙালির মন ছিল নিষ্ক্রিয় ও বন্ধ্যা। বাংলা পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্তির পর থেকে বাংলা সাহিত্য বিচিত্র সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। মাতৃভাষার মধ্যে বাঙালি পেয়েছে আত্মপ্রকাশের পথের সন্ধান। ভাষা শিক্ষায় বাংলার দাবি যে অগ্রগণ্য তা বলা নিষ্প্রয়োজন।

ইংরেজি, ফরাসি, জর্মান ও রুশভাষা বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের চার প্রবেশ দ্বার। পৃথিবীর যে কোন ভাষায় লেখা মূল্যবান গ্রন্থের অনুবাদ পাওয়া যায় এ চার ভাষায়। যুগে যুগে সঞ্চিত মানুষের জ্ঞান সম্পদের অংশীদার হতে হলে এ চার ভাষার একটি জানতেই হবে। ঐতিহাসিক কারণে দেশের শিক্ষিতদের ইংরেজির সহিত পরিচয় চলে আসছে প্রায় দুশ বছর ধরে। এর ফলে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর ইংরেজি সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্থায়ী প্রভাব গড়ে উঠেছে। বাঙালি জনসাধারণের মধ্যে এখন বহু ইংরেজি শব্দ প্রচলিত। পৃথিবীতে এখন ইংরেজি সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ভাষা। কোন বাঙালি তরুণ যদি ঘরের কোণে আবদ্ধ না থেকে জগৎটাকে ঘুরে দেখার সঙ্কল্প গ্রহণ করে তবে ইংরেজিকেই করতে হবে তার পথের সম্বল। রাষ্ট্রসংঘ বা অন্য কোন বিশ্বসভায় সক্রিয় অংশগ্রহণে সাহায্য করতে পারে ইংরেজি। আন্তর্জাতিক শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রের অন্যতম ভাষা ইংরেজি। ভারতীয় সংসদ ও উচ্চআদালত ও সরকারী দপ্তরখানায় কাজকর্ম এখনও ইংরেজিতেই চলে। ইংরেজি বাদ দিলে বাঙালি বহু কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে, আর সে হয়ে পড়বে প্রাক ব্রিটিশ যুগের কূপমণ্ডুক।

উত্তর ও মধ্যভারতের অধিবাসীদের বেশির ভাগের মাতৃভাষা হিন্দী। আমাদের রাজ্যে বহু হিন্দীভাষী লোকের বাস। পশ্চিমবঙ্গের বাণিজ্য ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিক ও শ্রমিকদের অধিকাংশই হিন্দীভাষী। কাজকর্ম উপলক্ষে প্রত্যহ হিন্দীভাষী লোকদের সহিত আমাদের আলাপ করতে হয়। হিন্দী ভাষায় অজ্ঞতা কাজে নানা বিষয়ে অসুবিধার সৃষ্টি করে থাকে। ইংরেজি যেমন আন্তর্জাতিক ভাষা, হিন্দী তেমনি আন্তঃরাজ্যিক ভাষা। সংবিধানে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি দান করা হয়েছে। ইংরেজিকে অপসারিত করে হিন্দী সরকারী কাজকর্মের একমাত্র ভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত করার দিন বেশি দূরে নেই। ভারতের এই সংযোগসাধক ভাষা পাঠ্য তালিকায় অবশ্যই রাখতে হবে।

যুগের উপযোগী যোগ্যতা অর্জনের জন্য বাঙালি ছেলেমেয়েদের এ তিনটি আধুনিক ভাষা শিক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন।

প্রাচীন ভারতের নীতি, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিচয় আবদ্ধ রয়েছে সংস্কৃত গ্রন্থরাজিতে। সংস্কৃতে অজ্ঞতা নিজেদের গৌরবময় অতীত সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের অন্তরায়। আমাদের পূজা অর্চনা স্তব-স্তুতি ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানের ভাষা সংস্কৃত। সংস্কৃত না জানলে মন্ত্রগুলি হয়ে দাঁড়ায় অর্থহীন শব্দমাত্র। এজন্য পাঠ্য তালিকায় সংস্কৃতের স্থান থাকা বাঞ্ছনীয়।

বয়স ও ভাষা

উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ক্লাসের সংখ্যা নয়। ছাত্রছাত্রিদের সাধারণ বয়স আট থেকে ষোল। তৃতীয় মানে প্রবেশ করে আট বছরের শিশুকে পড়তে হয় বাংলা ও বিদেশী ভাষা ইংরেজি। কলকাতার একটি নামী বিদ্যালয়ে তৃতীয় মানের ছেলেদের জন্য ইংরেজি রীডার, গ্রামার, ওয়ার্ডবুক ট্রেনস্লেশন পাঠ্য করা হয়েছে, দেখেছি। নয় বছরের বালকদের জন্য চতুর্থ মানেও অনুরূপ ব্যবস্থা। পঞ্চম মানে দশ বছরের ছেলেমেয়েদের পড়তে হয় ইংরেজি, বাংলা, হিন্দী। বাংলার দুধ চা চিনি শাক যা পড়; হিন্দীতে হয়ে গেছে দুধ চায়ে চিনি সাগ জা ও পঢ়্। এরূপ বানান ও ব্যাকরণের জটিলতায় শিশু শিক্ষার্থীদের মনে যদি গোলক ধাঁধার সৃষ্টি হয়, তাহলে তাদের দোষ দেওয়া যায় কি?

ইংরেজি, ফরাসি ও লাতিন ভাষার জন্য ইংরেজ ছেলেমেয়েদের জানতে হয় মাত্র ছাব্বিশটি বর্ণ; বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজি লেখা ও পড়ার জন্য বাঙালি শিশুদের শিখতে হয় তিন বর্ণমালার একুশ বাইশটি বর্ণের রূপ ও উচ্চারণ, এ সংখ্যা তাদের সমবয়সী ইংরেজ বন্ধুদের শেখা বর্ণের প্রায় পাঁচগুণ।

ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম মানের ছেলেমেয়েদের এক সঙ্গে চারটি ভাষা, বাংলা, ইংরেজি, হিন্দী ও সংস্কৃত পড়ানো হয়ে থাকে। এ তিন ক্লাসে শিক্ষার্থীদের সাধারণ বয়স এগারো থেকে তেরো। নবম মানে হিন্দী উঠে যায়। বাংলা ইংরেজি ও সংস্কৃত কলা শাখার ছাত্রছাত্রীদের অবশ্য পাঠ্য। বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখায় সংস্কৃত থাকে না।

ভাষা ও সময়

কলকাতার একটি বে-সরকারী বড় বালক-বিদ্যালয়ের সাপ্তাহিক কর্মসূচী পরীক্ষা করে দেখা যায় সপ্তম মানে কাজের সময় মোট সাড়ে চব্বিশ ঘণ্টা। এর মধ্যে ভাষা শেখার জন্য নির্ধারিত হয়েছে সতেরো ঘণ্টা। অবশিষ্ট সাড়ে সাত ঘণ্টায় শিখতে হয় পাটীগণিত, জ্যামিতি, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস ও কাঠের কাজ। ভাষা শেখার সতেরো ঘণ্টার মধ্যে ইংরেজি শেখার জন্য সাড়ে সাত ঘণ্টা, বাংলার জন্য সাড়ে চার ঘণ্টা, সংস্কৃতের জন্য পৌনে চার ঘণ্টা এবং হিন্দীর জন্য সোয়া ঘণ্টা সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই থেকে দেখা যায় ইংরেজি ভাষা শেখার জন্য যে সময় ব্যয়িত হয়ে

থাকে, গণিত প্রভৃতি সাতটি বিষয়ের জন্যও সেই পরিমাণ সময় দেওয়া হয়। পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, বিজ্ঞান ও ভূগোলের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের পরিমাণ মাত্র সোয়া ঘণ্টা করে, ইতিহাস ও কাঠের কাজের জন্য সময় আটত্রিশ মিনিট। সময়ের এই স্বল্পতা গণিত প্রভৃতি বিষয়গুলির শিক্ষার প্রধান অন্তরায়। ভূগোলের পাঠ্যসূচী প্রতি ক্লাসেই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আধুনিক সভ্যতার জন্মভূমি ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার ভূগোল না পড়ে বাঙালী ছেলেমেয়েরা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করে থাকে। ষষ্ঠ মানে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রাচীন যুগ, সপ্তম মানে মধ্য যুগ ও অষ্টম মানে আধুনিক যুগ পড়াবার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু কোনো ক্লাসেই ইতিহাস সম্পূর্ণ করা হয় না। এমন কি ভারতের ধারাবাহিক ইতিহাস সম্বন্ধে ছেলে মেয়েরা থাকে অজ্ঞ। বিজ্ঞান শিক্ষার অবস্থাও সেরূপ, গণিতের পাঠ্যসূচী ক্লাসে শেষ করা হয় বটে কিন্তু সময় অভাবে এপর্যন্ত অনুশীলনের ফলে গণিতের নিয়ম ও সূত্রাদি ছাত্রদের মনে স্থায়ী রেখাপাত করতে পারে না।

ভাষা শেখার জন্য দীর্ঘ নয়বৎসর ধরে বিপুল সময় ব্যয় করবার পরে দেখা যায় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ছেলেমেয়েদের অনেকেই স্বাধীনভাবে ইংরেজি ও বাংলায় শুদ্ধ করে মনের ভাব প্রকাশে অক্ষম। ইস্কুলে হিন্দী ও সংস্কৃত যতটুকু শেখে তা ভুলে যেতে বেশি সময় লাগে না। ভাষা শেখায় কাজের সময়ের দুই তৃতীয়াংশের বেশি ব্যয় করায় অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষা বিঘ্নিত হয়ে থাকে।

সমাধানের উপায়

সমস্যা সমাধানের যে কোন প্রয়াসে লক্ষ্য থাকবে তিনটি, ভাষার ভার লাঘব, কোনো ক্লাসে এক সংগে একটির বেশি নতুন ভাষা না শেখানো এবং অন্যান্য বিষয় শেখাবার জন্য ভাষা থেকে সময় বাঁচানো।

উপরে সংস্কৃত শেখা বাঞ্ছনীয় বলা হয়েছে। সংস্কৃত কঠিন ভাষা। তা শেখার জন্য দীর্ঘ সময় পরিশ্রম ও আগ্রহ আবশ্যক। বিদ্যালয়ে সংস্কৃত শেখার পদ্ধতি ও শিক্ষকের ঢিলেমি শিক্ষার্থীদের মনে সংস্কৃতের প্রতি অরুচি ধরিয়ে দেয়। ইস্কুলে শেখা সংস্কৃতের বিদ্যায় পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ ছাড়া আর কিছু পড়ার ক্ষমতা জন্মে না।

বিদ্যালয় ছেড়ে যাবার পর সংস্কৃত ভুলে যেতে বিলম্ব ঘটে না। যে উদ্দেশ্যে সংস্কৃত শেখা প্রয়োজন বলা হয়েছে ইস্কুলের বিদ্যায় তা সিদ্ধ হয় না। চার বৎসর ধরে সংস্কৃতের জন্য বৃথা সময় নষ্ট হয় মাত্র। নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীতে কলা শাখায় সংস্কৃত নির্বাচিত বিষয় হলে কেবলমাত্র অনুরাগী ছাত্রেরাই উহা ভাল পড়বে। এ ব্যবস্থায় সুফল পাওয়া যেতে পারে। এর ফলে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম মান পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের অবশ্য পাঠ্য ভাষার সংখ্যা হ্রাস পাবে এবং প্রতি সপ্তাহে সময় বাঁচবে সাড়ে তিন ঘণ্টা।

সংস্কৃতের ভাণ্ডারে রক্ষিত জ্ঞানের পরিচয় অনুবাদের সাহায্যে লাভ করা সম্ভব। বাংলা ভাষায় অনেক মূল্যবান সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। উহাদের আড়ষ্ট পণ্ডিতী ভাষা অপরিচ্ছন্ন ছাপা ও অশোভন বাঁধাইর জন্য অনুবাদগ্রন্থ জনপ্রিয় হতে পারে নি। হিব্রু ও গ্রীক থেকে অনূদিত বাইবেল-এর সুখপাঠ্য ভাষার সহিত আমরা পরিচিত। এদেশে অনুবাদ গ্রন্থের

ভাষা বাইবেলের ভাষার মত সরল ও সহজ হলে মুল গ্রন্থ না পড়েও সাধারণ শিক্ষিতরা প্রাচীন ভারতীয় চিন্তার সহিত পরিচিত হতে পারে। আমাদের পূজা, বিহাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি মন্ত্রাদির অনুবাদ করার সময় এসেছে। বাংলায় মন্ত্র পড়লে বর-কনে বুঝতে পারবে বিবাহ অনুষ্ঠানে নারায়ণ সাক্ষী করে কি চুক্তিতে আবদ্ধ হল, মন্ত্রাদি বাংলায় পাঠ করলে বহু কুসংস্কার দূর হয়ে যাবে। আমাদের ধর্ম সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে সহজ সরল বাংলা বইর অভাবে তরুণদের মনে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়ে থাকে। দেশের আদর্শ সম্বন্ধে অজ্ঞ বলে তারা বিদেশের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। কঠিন বিষয় সহজ করে বলার আদর্শ দেখতে পারা যায় পরমহংসদেবের কথামৃতে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ও মুদলিয়র কমিশন পঞ্চম মানে ইংরেজি আরম্ভ করার পরামর্শ দিয়েছেন। সকল উন্নত দেশে পঞ্চম সালের পূর্বে বিদেশী ভাষা শেখার নিয়ম নেই। মাতৃভাষার ভিত গড়ে ওঠবার জন্য সময় দেওয়া এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। পশ্চিম বংগের অবস্থা ভিন্নরূপ। এখানে ইংরেজি শেখাকে শিক্ষার প্রধান অংগ বলে মনে করা হয়। এজন্য অনেক ছেলেমেয়ে হাতেখড়ির পূর্বেই মুখে মুখে কোনো কোনো ইংরেজি শব্দ ও তার বাংলা প্রতিশব্দ শিখে থাকে। তৃতীয় মানে প্রবেশের সময় দেখা যায় তারা ইংরেজী বর্ণমালা ও একখানা প্রাথমিক পুস্তক পড়ে এসেছে, এজন্য বাঙালি ছেলেমেয়েদের তৃতীয় মানে ইংরেজি শেখানো বেশী কঠিন নয়। শিশু শ্রেণীর এবং প্রথম ও দ্বিতীয় মানে তারা বাংলা পড়ে এসেছে। ষষ্ঠ মানে যদি হিন্দী আরম্ভ করা যায় তাহলে বালক-বালিকারা তিন বৎসর ইংরেজি শেখার সুযোগ পেতে পারে। ষষ্ঠ সপ্তম ও অষ্টম মানে তারা শিখবে নতুন ভাষা হিন্দী। কলা শাখার ছাত্রছাত্রীরা নবম মানে সংস্কৃত আরম্ভ করবে। এই ব্যবস্থায় তৃতীয় থেকে পঞ্চম মান পর্যন্ত থাকবে বাংলা ও ইংরেজি, ষষ্ঠ থেকে অষ্টম মান পর্যন্ত পড়বে বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দী। নবম, দশম ও একাদশ মানে যারা সংস্কৃত নির্বাচিত বিষয়রূপে গ্রহণ করবে তারাই শুধু তিনটি ভাষা পড়বে, অন্যদের পড়তে হবে শুধু ইংরেজি ও বাংলা। এতে ভাষার বোঝা খানিক হালকা হবে।

ভাষা শেখার টেক্‌নিক্ বা কৌশল এখন সুনির্দিষ্ট রূপ নিয়েছে। আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণ করে ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা হলে এজন্য ব্যয়িত সময় ও পরিশ্রম বেশ কিছু হ্রাস করা সম্ভব। আমাদের বিদ্যালয়ে ইংরেজি সর্বাধিক সময়গ্রাসী ভাষা। বর্তমান শতাব্দের প্রথমার্ধে বিদেশী ছেলেমেয়েদের ইংরেজি শেখবার প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবনের জন্য বহু পণ্ডিত ব্যক্তি গবেষণা করেছিলেন। লণ্ডন ও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক এ কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বিভিন্ন গবেষকের একক গবেষণার ফলের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য চেষ্টা চলেছিল শেষ পনেরো বৎসর। কারণেগী কর্পোরেশনের অর্থে এ প্রচেষ্টা চলে।

গবেষকদের প্রথম কাজ ছিল বিদেশী ছেলেমেয়েদের উপযোগী ও প্রয়োজনীয় শব্দ নির্বাচন। মুদ্রিত পুস্তকে ব্যবহৃত শব্দসমূহ তাদের প্রয়োগের পুনঃপৌনিকতার সংখ্যা অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। তখন মনে হয়েছিল যে সব শব্দ সব চেয়ে বেশী বার ব্যবহৃত হয়েছে তা নিয়েই ইংরেজি শেখা আরম্ভ করা উচিত। পরে দেখা গেল পুনঃপৌনিকতা শব্দ নির্বাচনের একমাত্র মানদণ্ড হতে পারে না। একাধিক অর্থবিশিষ্ট শব্দের কোন্ অর্থটির বেশী প্রয়োগ হয়েছে তা দেখতে হবে। কোনো

শব্দ নির্বাচনে আরো কতকগুলি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্যরাখা আবশ্যক। এ কাজের ভার অর্পিত হয় ডঃ মাইকেল ওয়েষ্ট-এর উপর। তিনি কঠোর পরিশ্রম করে শব্দের যে তালিকা প্রণয়ন করেছেন তা পণ্ডিতদের সর্বসম্মত অনুমোদন লাভ করেছে। তাদের মতে ওয়েষ্ট সম্পাদিত জেনারেল সার্ভিস লিষ্ট অব ইংলিস ওয়ার্ডস্ বিদেশী ছেলেমেয়েদের জন্য শব্দ নির্বাচনের শেষ কথা। এতে এবিষয়ে গবেষণার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ডঃ ওয়েষ্ট ভারতীয় শিক্ষা বিভাগের কর্মচারী ছিলেন। তিনি বিদেশী ছেলেমেয়েদের ইংরেজি শেখাবার পদ্ধতি নিয়ে গবষণা আরম্ভ করেন বর্তমান শতকের তৃতীয় দশকে। তিনি অবিভক্ত বাঙলার পাঠশালার ছেলেমেয়েদের উপর তার উদ্ভাবিত শিক্ষা-প্রণালীর পরীক্ষা করেছিলেন। এই পরীক্ষা ও গবেষণার ফল ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত বাই লিঙ্গুয়েলিজম বা দ্বিভাষা তত্ত্ব নামক গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। বাঙলাদেশে উদ্ভাবিত ইংরেজি শেখাবার পদ্ধতি অবলম্বন করে ওয়েষ্টের যে সব পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়েছে, বাঙলার বাইরে এশিয়া ও আফ্রিকা বহু দেশে তা প্রচলিত। এ নতুন পদ্ধতির প্রচলন পশ্চিমবঙ্গে নেই। অদৃষ্টের পরিহাস বৈকি!

ডঃ ওয়েষ্টের শব্দ-তালিকা প্রকাশের চার বৎসর পরে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাপর্ষদ এক সার্কুলার জারি করে ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশক ও রচয়িতাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তারা যেন ঐ তালিকা থেকে শব্দ নিয়ে বই রচনা করেন। এই সার্কুলারের পরে প্রায় পনেরো বৎসর কেটে গেল। পশ্চিমবঙ্গে ইংরেজি পাঠ্যপুস্তকের অথবা ইংরেজি শিক্ষার কিছুমাত্র উন্নতি ঘটে নি। সার্কুলার জারি করা ছাড়া আর কোন কর্তব্য আছে বলে পর্ষদ মনে করেন নি।

ইংরেজি শেখাবার নতুন প্রস্তাব

ডঃ ওয়েষ্টের তালিকায় প্রায় চার হাজার শব্দ স্থান পেয়েছে। তা থেকে আড়াই হাজার অতি প্রয়োজনীয় শব্দ বেছে নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শেখাতে হবে। তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম মানের জন্য সাতশ শব্দ এবং ষষ্ঠ থেকে একাদশ মান পর্যন্ত আঠারশ শব্দ দিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য বই রচনা করা আবশ্যক। প্রতি ক্লাসের জন্য নির্দিষ্টশব্দ দিয়ে গড়া বাক্যাংশ ও ইংরেজি বাগধারা এই সংগে শেখাতে হবে। ইংরেজি ব্যাকরণের জন্য পৃথক বই রাখা অনাবশ্যক। রীডারে ব্যাকরণের যে উদাহরণ পাওয়া যায় কেবলমাত্র তাহাই পড়াতে হবে। রচনা ও অনুবাদের বইতে ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তকের বাইরের কোন শব্দ থাকবে না। এভাবে নয় বৎসরে আড়াই হাজার নির্বাচিত শব্দ ছেলেমেয়েদের আয়ত্ত হয়ে যাবে। বিদেশীর ইংরেজি শেখার জন্য এই সব শব্দই যথেষ্ট। কেউ যদি বেশী শিখতে চায় সে নিজে অভিধানের সাহায্যে তার শব্দসম্পদ যত ইচ্ছা বাড়িয়ে নিতে পারবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে অধ্যাপক অকডেন তার বেসিক ইংরেজিতে মাত্র সাড়ে আটশ শব্দ নির্বাচিত করে বিদেশীদের ইংরেজি বলা ও লেখার সুযোগ করে দিয়েছেন।

শব্দনিয়ন্ত্রণ আধুনিক পাঠ্যপুস্তক রচনার একটি মূল সূত্র। ডঃ ওয়েষ্টের নিউ মেথড রীডার্স

সিরিজে উহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখা যায়। এই শব্দ, বাক্যাংশ অথবা ইডিয়ম বিভিন্ন প্রসঙ্গে বার বার ঘুরে ফিরে এলে ছাত্রছাত্রীরা বিনা আয়াসে সে সব শিখে ফেলে। ইহাই ভাষা শেখার স্বাভাবিক উপায়। শিশুরা মাতৃভাষা এ উপায়ে শিখে থাকে।

ভাষা শেখার আরেকটি প্রধান কথা শব্দ ও তাহার অর্থের সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন। কোনো বস্তু ও ক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটাতে হবে, মাতৃভাষার পরোক্ষ সাহায্যে নহে। এই প্রত্যক্ষ সংযোগ সাধনের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের প্রতি ক্লাসের জন্য একটি সংগ্রহশালা স্থাপন করা প্রয়োজন। মাটির মডেল অথবা নকল বস্তু সংগ্রহশালায় রাখলে ছাত্রছাত্রীদের অর্থ শেখা সহজ হয়ে যাবে। পাঠ্য পুস্তকে আঁকার মতো প্রতিটি শব্দের অর্থবোধক ছবি থাকা উচিত। এবিষয়েও ডঃ ওয়েষ্টের রীডারসমূহ পথ দেখাতে পারে। এ ছাড়া কার্ডে আঁকা ছবি দেখিয়ে ছাত্রছাত্রীদের শব্দের অর্থ অনায়াসে শেখানো সম্ভব। কলকাতার কোনো কোনা মিশনারী বিদ্যালয়ে ছবির সাহায্যে ক্রিয়াপদগুলোর অর্থ শেখাবার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

ভাষা শেখার উদ্দেশ্য দুটি, ভাব গ্রহণ ও ভাব প্রকাশ। পরের ভাষা গ্রহণ করি শুনে ও পড়ে; নিজের ভাব প্রকাশ করি বলে ও লিখে। এ চার প্রকারে ভাষা ব্যবহারের যোগ্যতা অর্জন ভাষা শেখার উদ্দেশ্য। প্রত্যেক ক্লাসে এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইংরেজি শেখাবার ব্যবস্থা হলে শব্দের নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে ভাবগ্রহণ ও ভাবপ্রকাশ সহজ হয়ে উঠবে। ইংরেজি শেখার সময় ও পরিশ্রম অনেক হ্রাস পাবে। ইংরেজি আর পরীক্ষার্থীদের ভয়ের কারণ হবে না, বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক রচনায় ডঃ ওয়েষ্ট অথবা তাহার সহকর্মীদের সাহায্য গ্রহণ করে উৎকৃষ্ট রীডার ও সহযোগী পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করা উচিত। দেশের শিল্পায়নে বিদেশী যন্ত্রকুশলী ও কারিগরদের সাহায্য আমরা গ্রহণ করে থাকি। শিক্ষার ধারা পরিবর্তনের জন্য আমরা কেন বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সাহায্য গ্রহণ করব না তা বোঝা কঠিন। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষাপর্ষদের পারিজাত রীডার দেখে ইংরেজি শেখায় ইংরেজদের সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়

ভাষা শেখার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। বি, টি ক্লাসে অল্প সময়ে অন্যান্য বহু বিষয়ের সঙ্গে ইংরেজি শেখার যে ব্যবস্থা আছে তা নিতান্ত অপ্রচুর। শিক্ষণপ্রাপ্ত অনেকে তাদের অধীত বিদ্যা ক্লাসে প্রয়োগে অসমর্থ। ইংলণ্ডে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য বিবিধ বিষয় পড়াবার আধুনিক প্রণালী সম্বলিত সরকারী পুস্তক প্রকাশিত হয়ে থাকে, এদেশের শিক্ষকদের জন্য সেরূপ বই থাকা উচিত। বি টি ক্লাসে নানামুনির নানা মতে শিক্ষার্থী শিক্ষকদের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে থাকে। ভাষা শিক্ষার আধুনিক পদ্ধতির প্রধান প্রধান কথা এবং ক্লাসে তার প্রয়োগের উপায় পরিষ্কার ভাষায় লিখে শিক্ষকদের হাতে দিলে ভাষা সেখার উন্নতি সাধিত হবে।

হিন্দী

ইংরেজি শেখার প্রণালী হিন্দী শেখার জন্যও প্রযোজ্য। অহিন্দীভাষীদের মধ্যে হিন্দীভাষা প্রচারের জন্য প্রচলিত বর্ণমালা ও ব্যাকরণে জটিলতা হ্রাস করা আবশ্যক। সেবাগ্রাম থেকে প্রকাশিত বইতে বর্ণমালার সংশোধন করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের বিদ্যালয়ে যে সব বই প্রচলিত

তার মধ্যে আগেকার লিপিই রয়ে গেছে। হিন্দীর অভিধানিক লিঙ্গ নির্ণয় হিন্দী শেখার পথে এক বড়ো বাধা। ইংরেজি বাংলায় স্বাভাবিক নিয়মে লিঙ্গ স্থির করা হয়। কোনো শব্দের লিঙ্গ না জেনেও বাক্য রচনায় অসুবিধা ঘটে না। হিন্দীতে ক্রিয়াপদ বচন বিশেষণ প্রভৃতি শব্দের লিঙ্গের উপর নির্ভরশীল। ইংরেজির মতো হিন্দীতে স্বাভাবিক নিয়মে লিঙ্গ নির্ণয় করে হিন্দী শেখার অসুবিধা বহুল পরিমাণে হ্রাস করা যেতে পারে। কর্তায় নে বিভক্তি যুক্ত হলে কর্তৃবাচ্যে ক্রিয়াপদ কর্মের অনুসারে হবে। এই অস্বাভাবিক নিয়ম রহিত করা উচিত। এরূপ আরো নানাভাবে হিন্দী ব্যাকরণের সংশোধন করা আবশ্যক। যুক্তিহীন নিয়মকানুন মানতে গিয়ে সময় ও শক্তির বৃথা অপচয় ঘটে।

বাংলা

আমাদের বিদ্যালয়ে ভাষারূপে বাংলা শেখাবার ব্যবস্থা নেই। শিশুকাল থেকে ছেলেমেয়েরা বাংলা সাহিত্য পড়ে থাকে, ভাষা শেখে না। বাংলাব্যাকরণের অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। ইংলণ্ডে মাতৃভাষা ইংরেজি শেখাবার জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে সে ধরণের কোন চেষ্টা করা হয় না। অথচ শিক্ষার্থীদের কাছে লেখায় ভালো ভাষা দাবি করা হয়। ভালো বাংলা যাঁরা শেখে তারা নিজের চেষ্টায় শিখে থাকে, বিদ্যালয়ের সাহায্যে নয়। এদিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

সংস্কৃত বাদ দিয়ে ইংরেজি ও হিন্দী উপরে প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে শিক্ষা দিয়ে ভাষা শেখার সময় ও শক্তি সাশ্রয় করে উহা অন্যান্যবিষয় শিক্ষার জন্য ব্যয় করলে আমাদের ছেলেমেয়েরা ভাষা যেমন শিখবে তেমনি গণিত বিজ্ঞান প্রভৃতি শেখায়ও উন্নতি করতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনষ্টাইন, বন্ধুত্ব-ইতিহাস

অশ্রুকুমার সিকদার

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ছবির প্রকাশ ব্যবস্থা

১৩১৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসের 'ভারতী' পত্রিকায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত কয়েকটি রেখাচিত্র প্রকাশিত হয়। পত্রিকা থেকে সেই রেখাচিত্র রোটেনষ্টাইনের চোখে পড়লে তাঁর কাছে সেগুলি 'remarkable drawings' বলে মনে হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অঙ্কিত প্রতিকৃতি সংগ্রহের ভূমিকায় রোটেনষ্টাইন লিখেছেন (বিশ্বভারতী পত্রিকা কার্তিক পৌষ ১৩৫৯ সংখ্যায় উদ্ধৃত),

When Mr. Rabindra Nath Tagore was in England last year I dicovered they were done by one of his brothers. He immediately wrote for some of the originals and I received from the artist, Mr. Jyotirindra Nath Tagore, the generous loan of a number of his sketch books.

সেই ছবির খাতা দেখে রোটেনষ্টাইনের প্রথম দর্শনের মুগ্ধতা হ্রাস পায় নি, বরং তিনি আরো চমৎকৃত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পত্রযোগে সেই কথা জ্যোতিদাদাকে জানালেন (বিশ্বভারতী পত্রিকা প্রাগুক্ত সংখ্যা)—

আপনার ছবির খাতা আমি Rothenstein-কে দেখিয়েছি। তিনি এখানকার বিখ্যাত artist; তিনি দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেছেন। তিনি আমাকে বললেন, আমি তোমাকে বলছি, তোমার দাদা তোমাদের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রী। আমাদের দেশের প্রথম শ্রেণীর ড্রইং যারা করেন, তাঁদের সঙ্গেই ওঁর তুলনা হতে পারে। এতদিনে যে, আমাদের দেশে এ ছবির কোনো সমাদর হয়নি, এর মতে এমন অদ্ভুত ঘটনা কিছু হতে পারে না। Most marvellous, most magnificent—এই ত তাঁর মত। তিনি বলেছেন, এখানকার সব চেয়ে বিখ্যাত art critic-কে তিনি এই ছবি দেখাবেন, এবং এর একটা ছোট সমালোচনা তিনি নিজে লিখবেন।…রোথেনষ্টাইন খুব একজন গুণজ্ঞ লোক, এঁর মতে আপনার চিত্রশক্তি একেবারেই প্রথম শ্রেণীর গুণীর উপযুক্ত…।

জ্যোতিন্দ্রনাথের ছবি পোর্টফোলিয়ো আকারে প্রকাশ করা উচিত এই কথা যে রোটেনষ্টাইন বলেছেন তাও রবীন্দ্রনাথ জানালেন। এ সময়ে স্বর্ণকুমারী দেবীকে রবীন্দ্রনাথ যে চিঠি লিখেছিলেন তাও উদ্ধারযোগ্য (বিশ্বভারতী পত্রিকা প্রাগুক্ত সংখ্যা)। জ্যোতিদাদার ছবির খাতা এখানকার কোনো কোনো আর্টিষ্ট দেখে খুব প্রশংসা করচে। এরা বলে ওর drawing একেবারে প্রথম শ্রেণীর ওস্তাদের উপযুক্ত। এখানকার কাগজে ভালো লোক দিয়ে ওর ছবির সমালোচনার বন্দোবস্ত করা যাচ্চে। এঁরা বলচেন, উচিত ওর ছবির একটা selection ছাপাতে। ইতিমধ্যে ছবির খাতা পেয়ে ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯১২ তারিখে সপ্রশংস ধন্যবাদ দিয়ে রোটেনষ্টাইন জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে যে চিঠি লিখলেন (বিশ্বভারতী পত্রিকা প্রাগুক্ত সংখ্যা) তার প্রথম অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করছি।

Let me thank you for your kindness in sending over the three books containing your drawings. As I expected from the reproductions I saw in an article on your brother, thoy are admirable. I know of few drawings which show at the same time so much sensitiveness of line and sincerity in characterisation, and there is a beauty and nobility in the expression you give to your sitters which it would be difficult to match. I do not know which I prefer, the drawings of the men or of the women. your drawings of ladies remind me of the early drawings by Dante Gabriel Rossetty and the admirable drawings by the great French artist Puris de chavanes. Indeed the books have been—and still are a source of great delight to me, and all to whom. I have shown them have had similar feelings regarding them...If ever I return to India—a hope which is very near my heart—the privilege of your acquaintance will be one of the pleasures to which I shall look forward.

চিঠিপত্র ৫-এর ২নং চিঠিতে (৭ নবেম্বর ১৯১২) দেখি রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে জানাচ্ছেন একশো পাউণ্ড ব্যয়ে প্রস্তুত থাকলে রোটেনষ্টাইন ছবি ছাপানোর দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত আছেন। ঐ চিঠিতে তিনি আরো লিখলেন—রোটেনষ্টাইন বলছিলেন এরকম ছবির বই বেশি বিক্রি হবার আশা যেন না করা হয়—বিলাতের মত জায়গাতেও এর গ্রাহক অল্প। কেবল জিনিসটাকে স্থায়ীভাবে রক্ষা করবার জন্যই ওর থেকে বাছাই করে ছাপাবার বন্দোবস্ত করা উচিত। উনি নিজে একটি ভূমিকা লিখে দেবেন।

ঐ সংকলনের পরবর্তী তিনটি চিঠিতেও একটি বিষয়ের আলোচনা। রোটেনষ্টাইন Studio ও Modern Review পত্রিকায় জ্যোতিন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে নিবন্ধ লিখতে রাজি হয়েছেন এবং একটা প্রস্তাব আছে যে India society থেকে আপনার ছবির গোটাকতক selection যদি ওরা ছাপায় তাহলে অনেকটা প্রচার হতে পারবে। আপনি কিছু খরচ দিলে বাকি খরচ ওরা দেবে।

সংগ্রহের সর্বশেষ চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ আরো জানাচ্ছেন, রোটেনষ্টাইন আপনার হাতে আঁকা আমার একখানি ছবি চান সেটা আপনি তাঁকে পাঠাতে পারেন তাহলে ওটাও বইয়ের মধ্যে নিবিষ্ট করে দিতে পারেন।

এই সমস্ত প্রস্তাবের উত্তরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সম্মতি জানিয়ে এবং প্রকাশনা ব্যাপারে পরামর্শ দিয়ে রবীন্দ্রনথ আর্বানা থেকে রোটেনষ্টাইনকে লিখছেন (১২ নবেম্বর ১৯১২),

I have got a letter from my artist brother. He is so grateful to you for your appreciation. He has expressed his willingness to spend hundred pounds to have a selection of his drawings published. I have asked him to send the money to you and when you get them kindly make the necessary arrangements. If you select from the portraits of some of our known men the book may interest our people.

রোটেনষ্টাইন যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাতে আঁকা রবীন্দ্রনাথের একটি প্রতিকৃতি চেয়েছিলেন সেটি রবীন্দ্রনাথ পাঠালেন দেশে প্রত্যাবর্তনের পর এবং জানালেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এটি রোটেনষ্টাইনকে উপহার দিয়েছেন।

এই চিত্রাবলী ছাপানো ছবির নমুনা দেখে কোম্পানির পক্ষে জর্জ ম্যাকমিলন রোটেনষ্টাইনকে জানালেন (২৫ জুন ১৯১৪), যদিও এই চিত্রাবলী বিক্রীত হবার সমূহ সম্ভাবনা আছে কিন্তু এগুলি প্রকাশের তাঁরা উপযুক্ত লোক নন; পুস্তকব্যবসায়ীর পুস্তকপ্রকাশেই নিযুক্ত থাকা উচিত, কারণ it is difficult for him to get touch with the printseller through whom portfolios of this kind are most likely to be sold.

সুতরাং তিনি Fine Art Society বা Leicester Galleries-এর আরনেষ্ট ব্রাউনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে রোটেনষ্টাইনকে পরামর্শ দিলেন।১ শেষ পর্যন্ত এমেরি ওয়াকার লিমিটেডের সঙ্গে ব্যবস্থা স্থির হয়ে গেল। শিলাইদহ থেকে লিখিত পত্রে (১ মার্চ ১৯১৩) দেখি রবীন্দ্রনাথ ছবির প্রুফের জন্য রোটেনষ্টাইনকে তাগাদা দিচ্ছেন, এবং দুদিন পরে বোলপুর থেকে লিখছেন প্রুফ পেয়েছেন,

They are very well done. I am sending them to my brother.

কিন্তু প্রকাশ ব্যাপারে প্রকাশকের সঙ্গে যে গোলযোগ দেখা দিয়েছিল তার আভাষ একাধিক পত্রে মেলে। শ্রীনগর থেকে ১৪ অক্টোবর ১৯১৪ তারিখে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন,

We have paid walker's bills to full but the book does not seem to be forthcoming.

কলকাতা থেকে ১০ ডিসেম্বর ১৯১৫ তারিখে পুনরায় লিখলেন তিনি,

I suspect the time is hard for and the money he has got from us went down by a wrong passage. What I think was inexcusable for him was to ask from a further sum of money for the binding expenses while he was far from being ready with the book. However, do not warry too much about this—surely we shall be able to bear our loss much more easily than he his gain.

যাইহোক সমস্ত প্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে অবশেষে 'Twentyfive Collotypes | from the Original Drawings by | Jyotirindra Nath Tagore | Hammersmith | Made and Printed by | Emery Walker Limited | 1914' প্রকাশিত হলো। ভূমিকা লেখার যে প্রতিশ্রুতি রোটেনষ্টাইন বারবার দিয়েছিলেন সেই প্রতিশ্রুতি তিনি পালন করলেন। সেই কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করছি।

Mr. Tagore is not an artist by professfon. He has long been in the habit of making drawing of his friends and relations, for his own pleasure and interest, and these drawings seem to show just that qualities of concentration and sincerity which we should expect, but so rarely get, from the amature. The heads show

a sensitiveness of form which is unusual. Here is neither preoccupation with western models nor conscious attempt to follow a Mogul tradition. The drawings of Indian ladies are especially remarkable. The 17th and 18th centuries impossed so weak and characterless a vision of woman on European artist, that one has almost to go back to Duer and Holbein to find such frank and sincere portaits as these...

...Art is the cultivation of passion, which like all cultivation, demands infinite labour, skiil and patience, as well as infinite will. if it is to bear ripe and whole some fruit. Something of this passion I feel in the drawings of Mr. Jyotirindra Nath Tagore. It is of simple and modest kind, but in each of the drawings one feels modest kind, but in each of the drawings one feels he was absorbed by the unique desire to express something of the delicacy of form and gravity of character of his sitter...

I know of few modern portait drawings which show greater beauty and insight.

১ এই যুক্তি পুরোপুরি আন্তরিক মনে হয় না—কারণ পরের বছরই ম্যাকমিলনরা রোটেনষ্টাইনের Six Protraits of Rabindranath Tagore ছাপেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ছবি ছাপাতে না চাওয়ার কারণ সম্ভবত তাঁর খ্যাতির অভাব। অপরপক্ষে রোটেনষ্টাইন ছিলেন খ্যাতশিল্পী, আর রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি তো তখন সমুচ্চ চূড়ায়।

দ্বারকানাথ ও তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা

অমৃতময় মুখোপাধ্যায়

শিক্ষার রীতি, মান ও উদ্দেশ্য গত দেড়শত বৎসরে এতই বদলে গিয়েছে যে সেকালের শিক্ষার প্রথা বা শিক্ষার্থীদের সম্বন্ধে কল্পনা করাও দুঃসাধ্য।

আজকালকার শিশুশিক্ষা বিজ্ঞানসম্মত। তার মূলে শিশু মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ। বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে কতকগুলি পদ্ধতি এখন গড়ে উঠেছে। আজকে আমাদের শিক্ষাপ্রথার সাফল্য বিচার করার মান হল পাঠ্যবস্তুকে শিশুদের কতখানি পছন্দ সই বা আকর্ষণীয় করা হয়েছে। তাই 'নার্সারি' 'কিণ্ডার গার্ডেন' পার হয়ে ছেলে যখন রীতিমত ইস্কুলে যাওয়া আসা আরম্ভ করে ততদিনে মাষ্টার মশায়ের ভয় কেটে ত যায়ই, ইস্কুলের বাঁধা গতেও সে বেশ অভ্যস্ত হয়ে যায়।

আজকালকার শিক্ষায় আরেকটা জিনিসের প্রভাব বিশেষভাবে নজরে পড়ে—সেটা হল গুরুজনদের সাংসারিক অবস্থা, সামাজিক প্রতিপত্তি ও কোন বিশেষ সংস্কৃতির প্রতি ভক্তি। সেইজন্য অবস্থা যথেষ্ট সচ্ছল হলে, ছেলে হাঁটতে আরম্ভ করলেই বহুদূরের কোন নামজাদা বোর্ডিং ইস্কুলের প্রার্থী তালিকায় চিঠি লিখে, ভর্তি হবার কয়েক বছর আগে থেকে নাম লিখিয়ে রাখাও অসাধারণ নয়।

সেকালের শিক্ষায়তনের এত রকমফের ছিল না। শিশুকে দিনরাতের জন্য কোন ইস্কুলে দাখিল করে দেওয়ার কথাও কেউ চিন্তা করতে পারতো না।

দেড়শত বৎসর আগে পাড়ার পাঠশালাই ছিল লেখাপড়া শেখবার প্রায় একমাত্র উপায়। পাড়ার মধ্যে কোন বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থের বাড়ির বাইরে ঘরে বা চণ্ডীমণ্ডপের একাংশে বসত এই পাঠশালা। কলকাতা অঞ্চলের অধিকাংশ পাঠশালার গুরুমশাইরা সেকালে ছিলেন বর্দ্ধমান জেলার লোক—জাতিতে অনেকেই কায়স্থ। তিনি বেতটি হাতে নিয়ে খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে মধ্যখানে বসতেন; তাঁকে ঘিরে বেশ ফাঁক ফাঁক হয়ে নিজের নিজের মাদুর পেতে বসতো ছেলেরা। সর্দ্দার পোড়ো—যে লেখাপড়ায় গুরুমশায়ের প্রিয় ও বয়সে বা আকারেও কিছুটা বড়—সে ছাত্রদের পড়াতে ও শাসন করতে গুরুমশায়কে সাহায্য করত।

কোন ছেলের লেখাপড়া আরম্ভ করবার বয়স হয়েছে অনুভব করলে তার গুরুজনস্থানীয় কেহ আসিতেন এই গুরুমশাই পণ্ডিতমশাইদের কাছে। আলোচনা করে গণনা করে ভাল দিন ঠিক হত। তারপর সেই ধার্য্য দিনে হত আনুষ্ঠানিকভাবে ছেলের অক্ষরপরিচয় ও হাতে খড়ি। তারপর থেকে ছেলের অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল সকাল বিকালে ঠিক সময় মত পাঠশালায় গুরুমশায়ের কাছে হাজিরা দেওয়া। গুরুমশাইকে মাসিক পারিশ্রমিক কত দিতে হবে সে বিষয়েও ঐ সময়েই একটা নিষ্পত্তি করে লওয়া হত। গুরুমশায়দের মাইনে কিছু বাঁধাধরা ছিল না। প্রত্যেক গৃহস্থ নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী নিজস্ব একটা বন্দোবস্ত করে নিতেন। এই ভাবে গুরুমশায়ের মাসে চার পাঁচ টাকা হত। এর উপর যাত্রা, উৎসব, পালা পার্ব্বণে প্রত্যেক গৃহস্থই কিছু কিছু দিতেন।

এ ছাড়া ছাত্রেরা গুরুমশায়ের প্রিয়পাত্র হবার জন্য প্রায়ই লুকিয়ে কখনও বা প্রকাশ্যে ফলটা এটা ওটা নিয়ে আসত। না নিয়ে এলে গুরুমশায়ের অপ্রিয় হতে হত। তাহলে সামান্য দোষেও নানারকম লোমহর্ষক শাস্তি ব্যবস্থার অভাব ছিল না।

লর্ড বেন্টিঙ্ক যখন এদেশের বড়লাট তখন তিনি উইলিয়াম অ্যাডাম নামে এক পাদ্রীকে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে রিপোর্ট দিতে নিয়োগ করেন। এই অ্যাডাম সাহেব বিলাত থেকে আসেন শ্রীরামপুরের মিশনের পাদ্রী হিসাবে কিন্তু রামমোহন রায় প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুত্ব হওয়ার পর খৃষ্টধর্ম প্রচার ছেড়ে দেশের নানা জনহিতকর কাজে যোগ দেন। এ সম্বন্ধে অ্যাডাম সাহেবের লেখা চিঠিপত্র থেকে বেশ মুখরোচক খবর পাওয়া যায়। রামমোহন রায় ১৮২১ খৃষ্টাব্দে যখন বাইবেল তর্জ্জমা করছিলেন তখন ব্যাপটিষ্ট মিশনের পাদ্রী উইলিয়াম ইয়েটস ও অ্যাডাম সাহেব তাঁকে সাহায্য করতে রাজি হন। এই অনুবাদ সংক্রান্ত আলোচনা সময়েই অ্যাডাম সাহেব ক্রমশঃ একেশ্বরবাদী হয়ে পড়েন। মিশনের ১৮২২ সালের খবরা খবরের মধ্যে দেখি আক্ষেপ করা হয়েছে যে 'কিছুদিন পর্য্যন্ত এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত উইলিয়াম অ্যাডাম মহাশয় সম্প্রতি ভগবান যীশুখৃষ্টের প্রতি সম্মান হানিকর মনোভাব পোষণ করায় এবং যীশুখৃষ্টকে ভগবান বলে মানিতে অসম্মত হওয়ায় তাঁহার সহিত সমিতির সমস্ত যোগাযোগ রহিত করা হইল।'

এই ব্যাপারে পাদ্রীর দল রামমোহনের দলের উপর ভীষণ ক্ষেপে গেল এবং শালীনতার সীমা ছাড়িয়েও গালিগালাজ আরম্ভ করলো। আর অন্য সাহেবরা রসিকতা করে বললেন ওটা 'আদম' নামের গুণ—বাইবেলের গোড়া থেকেই জানা কথা যে আদমের পতন অনিবার্য্য এটা দ্বিতীয় পতন মাত্র। এই অ্যাডাম সাহেব ১৮৩৪ সাল নাগাদ যে বিবরণী পেশ করেন তাতে গুটি পনের কড়া শাস্তির বর্ণনা আছে। শাস্তিগুলির নামও ছিল খাসা। ১৮৩৮ সালের ৩০শে জুনের এক সংবাদ থেকে জানা যায় যে এই বিবরণী 'তিন বৎসরাবধি এতদ্দেশীয় লোকেদের সাধারণ শিক্ষা বিষয়ে অনেক চেষ্টা ও অনুসন্ধান'এর ফল।

পাঠশালায় আসতে দেরী হলে শাস্তি ছিল 'হাতছড়ি'। বসবার আগেই গুরুমশায়ের কাছে গিয়ে ডান হাতটি পেতে দাঁড়াতে হত—সপাসপ কয়েক ঘা বেত পড়ত হাতে—তারপর ছেলে গিয়ে বসত স্বস্থানে। পাঠশালা থেকে পালালে ত আর রক্ষাই ছিল না। চ্যাংদোলা করে ধরে এনে এমন বেত লাগানো হত যে মারের চোটে কাপড় চোপড় নোংরা করে ফেলাও অসাধারণ কিছু ছিল না।

একটি শাস্তি ছিল 'নাড়ুগোপাল'। এতে দুই পা আর বাঁ হাতটি দিয়ে হামাগুড়ি দেওয়া গোপালের মত মাটিতে ভর করে ডান হাতটি তুলে রাখতে হত। তারপর সেই তোলা হাতের উপর চাপান হত নাড়ুর বদলে ইট বা ঐ রকম ভারী কোন জিনিস। সেই অবস্থায় জিনিসটিকে তুলে ধরে থাকতে হবে গুরুমশায়ের দয়া যতক্ষণ না হয়। তার আগে হাত কেঁপে যদি জিনিসটি একটুও নড়েছে ত তৎক্ষণাৎ প্রহার। এর আরেকটি প্রকারভেদ ছিল—তার নাম 'ত্রিভঙ্গ'। ত্রিভঙ্গমুরারির মত একপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বাঁশির বদলে দু হাতে একটা কিছু ভারী জিনিস ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। এতটুকু নড়লে চড়লেই পশ্চাদ্দেশের কাপড়টি তুলে সেই অবস্থাতেই বেত্রাঘাত চলতো।

আরও কড়া শাস্তির অভাব ছিল না। ছাত্র মাটিতে বসে নিজের একখানা পা নিজের কাঁধে চাপিয়ে থাকবে বা নিজের উরুর তল দিয়ে হাত চালিয়ে নিজের কান ধরে থাকবে বা তার হাত পা বেঁধে দেওয়া হবে। তারপর পশ্চাদ্দেশে জলবিছুটী—যাতে সে বেচারী চুলকোতেও না পারে। আরেকটী হিংস্র শাস্তি ছিল থলের ভিতর বেড়ালের সঙ্গে ভরে দিয়ে মাটিতে গড়িয়ে দেওয়া। ফলে বেড়ালের নখ দাঁতে ছেলের যা অবস্থা হত তা কল্পনা করা শক্ত নয়—আচড়ে কামড়ে সাংঘাতিক। আজকের দিনে ঐসব বর্ণনা পড়লে আশ্চর্য্য মনে হয় যে এইসব সত্ত্বেও ছাত্রেরা পঙ্গু না হয়ে পাঠশালা পার হত কি করে, এই সব ভয়াবহ অবস্থার মধ্যেও লেখাপড়া করবার উৎসাহ একজনও বা পেত কি করে ?

এই পাঠশালাতে ছেলেদের বর্ণপরিচয় হত প্রথমে মাটিতে খড়ি দিয়ে লিখে। অক্ষরগুলি ভাল করে মক্স হলে, তখন তালপাতায় লিখে ব্যঞ্জনবর্ণ, যুক্তবর্ণ, শতকরা, কড়াকিয়া, বুড়ীকিয়া শেখা হত। তারপর উন্নতি হলে কলাপাতায় লিখে শেখা হত জমাখরচ, শুভঙ্করী, কাঠাকালি, বিঘাকালি। শেষ পর্য্যন্ত যারা টিঁকে থাকত জমিদারী কাজ বা ব্যবসা করবে বলে, তারা কাগজে মক্স করে চিঠিপত্র লেখা শিখত। অধিকাংশ ছাত্রই এর অনেক আগেই পাঠশালা ছেড়ে অন্য পড়া ধরত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলেরা টোলে যেত ব্যাকরণ পড়তে আর সরকারী চাকুরীর আশা যার থাকত সে যেত মৌলবীর কাছে আর্বি, ফার্সী পড়তে। তখনও সরকারী ভাষা হিসাবে ইংরাজীর চল হয় নাই—আদালত, আর্জ্জি দলিল সর্ব্বত্র চল ছিল ফার্সীর।

এইরকমই এক পাঠশালায় পাঁচ থেকে ছয় বৎসর বয়সের ভিতরে দ্বারকানাথের হয়েছিল হাতে খড়ি ও অক্ষর পরিচয়। কয়েক বৎসর পড়ার পর তাঁর বড় ভাই রাধানাথ তাঁকে সরকারী কাজের উপযুক্ত করে তোলার জন্য ছেলেদের মতই বাড়িতে মৌলবীর কাছে আরবি ফার্সী পড়ার ব্যবস্থা করেন। এই দুই ভাষায় দ্বারকানাথ প্রগাঢ় পণ্ডিত হয়েছিলেন বলে জানা নেই, তবে অনায়াসে এই দুই ভাষাতেই কথা বলতে পারতেন তার প্রমাণ আছে। সমাচার দর্পণে এক পত্রলেখক উল্লেখ করেছেন যে নিম্‌কি বিভাগের দেওয়ানী করবার সময় দ্বারকানাথ দলিলে ফার্সীতেই দস্তখত করতেন। দ্বিতীয়বার বিলাত যাবার সময় মিশরের খেদিভ মহম্মদ আলির সঙ্গে যখন দেখা হয় তখন অ-মিশরীয়দের মধ্যে একমাত্র দ্বারকানাথকেই কথাবার্ত্তা আলোচনায় দোভাষীর সাহায্য নিতে হয় নাই।

আরবি, ফার্সী শেখার সময়েই দ্বারকানাথ ভর্ত্তি হন 'ফিরিঙ্গি' শবোর্ণ সাহেবের ইস্কুলে। মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট ও চিৎপুর রোডের মোড়ের কাছেই 'ফিরিঙ্গি' কমল বসুর বাড়িতে ছিল এই ইস্কুল। সেকালের অনেক বড় বড় লোক এইখানেই ইংরাজী শেখা আরম্ভ করেন। ইংরাজী শেখার ইস্কুল হিসাবে সেকালে এর নামডাক খুব ছিল।

শবোর্ণ সাহেবের বিশেষ জাঁকের বিষয় ছিল যে তাঁর মা ব্রাহ্মণকন্যা। সেই জন্য তিনি বিশেষ মর্য্যাদাও পেতেন। অবস্থাপন্ন ছাত্রেরা তাঁকে পণ্ডিতমশাইদের মতই পূজাবার্ষিক দিত। ছাত্রেরা যে এই 'ফিরিঙ্গি' মাষ্টার মশায়কে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করত তার প্রমাণ দেখি দ্বারকানাথ তাঁর আজীবন মাসহারার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। হরকুমার ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতির কাছেও শিক্ষক হিসাবে

তিনি বৎসরিক বৃত্তি পেতেন।

সচরাচর সেকালে 'সর্বপ্রথমে লোকের ইংরাজী পড়িতে হইলে টমাস ডিস্ প্রণীত স্পেলিংবুক স্কুলমাষ্টার, কামরূপ ও তুতিনামা এই সকল পুস্তক পাঠ করতে হত। 'স্কুল মাষ্টার' পুস্তকে সকলই ছিল গ্রামার, স্পেলিং ও রীডার। 'কামরূপা'তে এক রাজপুত্রের গল্প ছিল। তুতিনামা 'or Tales of the Parrot' হল ঐ নামের একটি ফার্সী বইয়ের ইংরাজী অনুবাদ। যিনি খুব বেশী পড়তেন, তিনি পড়তেন, 'আরবী নাইট'। এই সঙ্গে পড়ান হ'ত Universal letter writer, complete letter book ও Royal English Grammar. রয়েল গ্রামার যিনি পড়তেন তিনি রীতিমত বিদ্বান বলে মান পেতেন। লোকে বলত 'রয়েল গ্রামার—ময়াল সাপ'। আপজন সাহেব 'ইংরেজী ও বাঙ্গালী বোকেবিলরি' ও জন মিলার সাহেবের 'শিক্ষা-গুরু' ছাপা হলেও তখনও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সিবিলিয়ন ছাত্রদের মধ্যেই কেবলমাত্র চালু ছিল।

তখন বানানের উপর লোকের খুব ঝোঁক ছিল। বিয়ে বাড়ীতে বানান নিয়ে পরীক্ষা হ'ত। 'নেবুকাডনাজার্' বানান কর, জ্যারাক্‌যেস্ বানান কি? এই সব প্রশ্ন করা হত। তখন এই বানান জিজ্ঞাসাতেই বিদ্যার পরীক্ষা হত বলা যেতে পারে; আর বাহাদুরী ছিল যে যত বড় শব্দ ব্যবহার করতে পারবে। বাপের নাম জিগ্যেস করা হত what deomination did your pater put? বলে।

বানানের মত শব্দের অর্থও তখন খুব মন দিয়ে ছেলেরা মুখস্থ করস্থ করত। তার জন্য নানা রকম কায়দারও চল ছিল। মনে রাখবার জন্য কবিতা করে মুখস্থ করা হ'ত যথা—

লর্ডিশ্বর গডিশ্বর কম্মানে এসো
ফাদার্বাপ মাদার্মা সিম্মানে বোসো।
(Lord ঈশ্বর God ঈশ্বর Come মানে এসো
Father বাপ Mather মা Sit মানে বস)

যে ইংরাজী কথার একাধিক মানে হয়, সেগুলাকে একসঙ্গে করে মুখস্থ করা হত যথা—

Well আচ্ছা ভালো পাৎ কো (পাতকুয়া)
Bear সহ বহ ভালোক (ভাল্লুক)

অনেক সময়ে যে সব ইংরাজী কথার উচ্চারণ আসলে ঠিক এক নয়, কিন্তু অনেকটা কাছাকাছি, সেগুলোকেও এক ধরে নিয়ে মুখস্থ করা হত যথা ফ্লোর—ফুল, ময়দা, মেঝে।

ইস্কুলে ইংরাজী শেখাবার আরেক কায়দা ছিল 'ঘোষণ'—অর্থাৎ কোন সমশ্রেণীর একাধি জিনিষের ইংরাজী নাম পয়ার ছন্দে গেঁথে সুর করে মুখস্থ বলানো হ'ত। গণ্যমান্য কেউ ইস্কুল দেখতে গেলে মাষ্টারমশাই জিগেস করতেন 'কি ঘোষাব? গার্ডেন ঘোষাব না স্পাইস্ ঘোষাব।' অর্থা বাগানে যা যা হয় সেইসব জিনিষের নাম বলাবো, না সব মশলার নাম বলাবো? যদি বি হয় 'গার্ডেন' ঘোষাও, তবে সর্দার পোড়ো চেঁচিয়ে শুরু করে 'পাম্‌কিন্ লাউকুমড়ো' অমনি অ সকলে সমস্বরে বলে ওঠে 'পাম্‌কিন্ লাউকুমড়ো'। সর্দার পড়ুয়া বলে 'কোকাম্বার শসা' আর সক চীৎকার করে 'কোকাম্বার শসা'। এইভাবে চলতে থাকে—'পাম্‌কিন্ লাউকুমড়ো' কোকোম্বার শ

'ব্রীজেল বার্তাকু, প্লোমান চাষা।'

কখন কখন এইসব মুখস্থ করবার জন্য রীতিমত সুরতাল লাগিয়ে গান বানানো হ'ত। খাম্বাজ রাগিনীতে ঠুংরি তালে গাওয়া হবে এরকম একটুকরো গান পাওয়া যায়—

'নাই (nigh) কাছে, নিয়র (near) কাছে, নিয়রেই অতি কাছে।
কাট্ (cut) কাট্, কট্ (cot) খাট, ফলোয়িং পাছে ॥'

এসব ছাড়া আবার 'আরবী নাইটের পালা' গান হ'ত। তবলা ঢোলক মন্দিরা নিয়ে ইংরাজী পয়ারে লেখা Arabian nights ইংরাজী শেখার ছাত্রেরা বাসায় বাসায় গান করত।

'The chronicles of the Sarsamians
That extended their dominions'

করে একটি পালার আরম্ভ পাওয়া যায়।

এই সুর করে ইংরাজী পড়ার ফল পরে কাটিয়ে ওঠা অনেক সময়েই সম্ভব হত না—দ্বারকানাথ ঠাকুরও পারেন নাই। ১৮৯১ সালের মার্চ সংখ্যা ন্যাশনাল ম্যাগাজিনে একজন লিখেছেন—

আমাদের যৌবনাবস্থায় দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন বাঙালীদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত। তাঁকে আমি অনেকবার দেখেছি। আমাদের কলেজে তিনি প্রায়ই আসতেন এবং টাউনহল বা লাট ভবনে কলেজের যে দিন বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী হ'ত প্রতিবৎসর সেই দিন তিনি উপস্থিত থাকতেন। মেডিকেল কলেজেও তাঁকে কয়েকবার দেখেছি—লর্ড অকল্যাণ্ডের চেয়ারের ঠিক পিছনেই তিনি বসতেন এবং বড়লাট এসে দেশীয়দের মধ্যে একমাত্র তার সঙ্গেই করমর্দন করতেন দেখে তাঁর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আরও উচ্চ হয়ে যেত।

আমি দ্বারকানাথকে কয়েকবার সাধারণ সভায় বক্তৃতা দিতে শুনেছি। সেকালের বাঙালীদের মত সুর করে ইংরাজী বলতেন। তখন তাঁর জীবন মধ্যাহ্ন। দোহারা চেহারা—গায়ের রং সাধারণ মতই। তাঁকে দেখলে সবচেয়ে নজরে পড়ত তাঁর চোখদুটো। কোন বিষয়ে আলোচনার সময় চোখ দুটো তাঁর জলজল করত আর কিছু ভাবতে হলেই তিনি ডান হাত দিয়ে গোঁফে তা' দিতেন। *

তাঁর সাজ ও ব্যবহারে কোনরকম বাহুল্যতা ছিল না। আমি কোনদিন তাঁর গায়ে সাটিন্ বা মখমলের জামা বা পরণে হীরা মুক্তা দেখি নাই।

উচ্চারণে ত্রুটি থাকলেও দ্বারকানাথ ইংরাজী ভালো ভাবেই শিখেছিলেন। মুষ্টিমেয় যেকয়জন ভারতীয় সে যুগেও ভালো ইংরাজী লিখতে পারতেন দ্বারকানাথ তাঁদের মধ্যে একজন। রিকার্ডো সাহেব তাঁর facts about India বইয়েতে ভারতবাসীর ইংরাজী শেখায় বুৎপত্তি সম্বন্ধে উদাহরণ-স্বরূপ রামমোহন রায় ও রাধাকান্ত দেবের চিঠির সঙ্গে দ্বারকানাথের লেখা চিঠিও উদ্ধৃত করেছেন। এই শিক্ষা পান তিনি পূর্বোল্লিখিত অ্যাডাম সাহেবের কাছে। বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া দ্বারকানাথ এই পাদ্রী সাহেবের নিকটে ইংরাজী শিখিতেন এবং তাঁহার শিক্ষাগুণে তাহাতে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই শিক্ষকের সাহায্যেই দ্বারকানাথ অল্প বয়স হতেই সম্ভ্রান্ত ইংরাজগণের

পরিচিত হন, এবং অনেকের সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছিলেন। এই সময়ে কলিকাতা 'ম্যাকিণ্টশ এণ্ড কোম্পানী' নামক সওদাগরী আফিস বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। এই কোম্পানীর মিঃ জে, জি, গর্ডন এবং জেম্‌স্‌ ক্যাল্‌ডার নামক দুই ব্যক্তির সহিত দ্বারকানাথের ঘনিষ্ঠতা হয়। এই তিন ব্যক্তিই দ্বারকানাথের ইংরাজী শিক্ষা ও ইউরোপীয় বাণিজ্যব্যাপার শিক্ষা বিষয়ে যত্ন করিয়াছিলেন।'

'দ্বারকানাথ ম্যাকিণ্টশ কোম্পানীর কর্মচারীদিগের ঘনিষ্ঠতায় যে ব্যবসায় বুদ্ধিলাভ করেন, তাহার ফলে, তিনি যৌবনের প্রারম্ভেই নিজে ব্যবসায়ে করিতে আরম্ভ করেন। তিনি প্রথম প্রথম ম্যাকিণ্টশ কোম্পানীর জন্য রেশম ও নীলক্রয়ের গোমস্তা নিযুক্ত হন; পরে নিজেই এই নীল ও রেশমের চালানি কাজ করিতে আরম্ভ করেন। বিলাতের নানা সওদাগরী কুঠি হইতে অর্ডার আনাইয়া তিনি জাহাজ বোঝাই দিয়া ঐ দুই দ্রব্যের কারবার করিতেন। ইহাই দ্বারকানাথের প্রথম ব্যবসায়। এই ব্যবসায় শিক্ষার সময়ে তিনি প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া নিজ পৈত্রিক জমিদারী পরিদর্শনের ভার গ্রহণ করেন।'

* তখনকার ব্যবসায়ী মহলে লোকে বলিত—

'দোয়ারী ঠাকুরের গোঁফের চাড়া
এক এক লাখ টাকার তোড়া।'

অশ্বিনীকুমার দত্তের কবিপ্রাণ

অশ্বিনীকুমার কবি নন। হয়ত নীরব কবি। অথবা কবিতাব্রতী বোললে তা স্বীকার কোরে নিতে কারোর অনীচ্ছা থাকবে না। অশ্বিনীকুমারের যে দুটো গ্রন্থ পড়েছি (ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ) তাতে পৃথিবীর বিভিন্ন কবি সাহিত্যিকের (বৈষ্ণব পদাবলী, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন দাশ, ব্রাউনিং, টেনিসন, কলোরিজ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, মধ্যযুগীয় ভারতের জ্ঞানদাস, বিদ্যাপতি, বলরামদাস, রাধামোহন দাস ; এছাড়া উপনিষদ ও মদ্ভগবদগীতা (প্রয়োজনানুগ উদ্ধৃতি যে কোন মননশীল ব্যক্তিকেই বিস্ময়ে মৌন করে) । অবশ্য উদ্ধৃতির প্রাবল্যে গ্রন্থের মৌলিকতা যে কতখানি রক্ষিত হয়েছে তা এ প্রবন্ধের বিচার্য নয় বরং স্বকীয় রচনায় অশ্বিনীকুমারের কবিপ্রাণতা কতখানি সেটাই উচ্চার্য। উপরিউক্ত মনীষিদের মধ্যে অধিকাংশই কবি। তাঁদের উদ্ধৃতিকেই অশ্বিনীকুমার তার গ্রন্থে বড় বেশী জায়গা দিয়েছেন। এখানেই 'কবিতাব্রতী' বলার তাৎপর্য্য নিশ্চয় ফুটে ওঠে। কিন্তু অশ্বিনীকুমারের কবিমন বা কবিপ্রাণ এখানে নিহিত আছে কিনা, সে কথা কে বলবে ?

তবু আমি তাঁর কবিপ্রাণতা যে কেন্দ্র থেকে উন্মোচন করব তা হোল গান। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' ছাড়া অন্য সমগ্র রচনা যদি কারও অজ্ঞেয় থাকে, তাহলেও রবীন্দ্রনাথের কাব্য পেবলতা উপলব্ধি করতে তার কোন দ্বিধাদীর্ণতার বিপাকে পড়তে হয় না। তেমনি আমি অশ্বিনীকুমারের গানে ধ্বনিত কাব্য ব্যঞ্জনার কথা বোলব। যে কারণেই হোক একথা নিশ্চিত যে তিনি বাংলা কাব্যাকাশে স্বতন্ত্রতা একেবারেই দাবী করতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথ বা যতীন্দ্রনাথের মত তিনি যেমন কাব্যে কোন Iconoclastic ব্যক্তিত্ব নিয়ে আসেন নি, তেমনি একনিষ্ঠ কবিমন তার উপরে ছায়া ফেলতে পারেনি, তবুও তার কবিপ্রাণ বা কবি মহিমা দু একটা গানের মধ্যে বিকশিত হোয়েছে। এ গানগুলো প্রায় কবিতার মত। উদাহরণতঃ বলা যেতে পারে (এ গানটি লক্ষ্ণৌ জেলে বসে লিখেছিলেন)—

এই জ্যোৎস্না আমি খাব
ঐ জ্যোৎস্নার ঠাকুরকে নিয়ে
জ্যোৎস্নায় আমি শোব।

এই জ্যোৎস্নার মধ্যেই কবির আত্মার পরিশ্রুতি। তাই এ শুভ্র জ্যোৎস্নাকে অন্তরঙ্গ করার একটা অতৃপ্ত আকুতি প্রথম পংক্তিতেই নিবেদিত। আবার দ্বিতীয় পংক্তিতে জ্যোৎস্নার ঠাকুরকে নিকটবর্তী করার আবেদনের মধ্যে অধি-আত্মিক মননের পদপাত শুনতে পাই। এই জ্যোৎস্নার মধ্যেই অন্তরতম পরম কারুণিকের অন্তরঙ্গতা উপলব্ধি করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর একটি কবিতায় লিখেছেন—From that day for the where'er Iroam | I feel Him standing

by | Or hill and dale high mount vale | Far Far away and high বিবেকানন্দ পাহাড়ে পর্বতে উপত্যকায় দূরে দিগন্তে সেই আত্মোর্ধ সত্তাটির অশরীরী নৈকট্য সবসময়েই অন্তরে অন্তরে জেনেছেন। তাই এখানেও অশ্বিনীকুমার জ্যোৎস্নার ঠাকুরকে এত নিবিড়ভাবে পেয়েছেন যে তিনি তাঁর দেহলীন হোয়ে থাকার এক অরুন্তুদ্ আর্তি না জানিয়ে পারেননি। এর পরেই অশ্বিনীকুমারের অন্য যে অংশ উদ্ধৃত করা যায় তা হোচ্ছে—

ইনি যখন দয়া করেন, কি যে তখন হোয়ে যাই
চাঁদ এসে কোলে পড়ে প্রাণে মধুর নিঝর ঝরে
হীরা মাণিক মরি মরি হৃদয় মাঝে দেখতে পাই।
কি জানি কি পিয়ে পিয়ে ভাবে হয় বিভোর হিয়ে
ধুলো মুঠো হাতে নিয়ে শত শত চুমো খাই।

রবীন্দ্রনাথ এই 'দয়া'কে প্রেম বলেছেন। এই তো তোমার প্রেম ওগো হৃদয় হরণ এই যে পাতায় পাতায় আলো নাচে সোনারবরণ | এই যে মধুর আলস ভরে | মেঘ ভেসে যায় আকাশ পরে | এই যে বাতাস দেহে করে অমৃতক্ষরণ। আমাদের প্রতি আত্মোর্ধ সত্তার প্রেমাঞ্জলি এই নিসর্গরূপালোকের মধ্য দিয়ে গ্রহণ কোরতে হয়। অশ্বিনীকুমারও তেমনি নিলীমা বিধৃত রূপাতীত রূপের সুসংলগ্ন সৌন্দর্যবোধে মোহিত। তাই ধরাধুলি তাঁর কাছে মোহিনী। এই মোহিনী কবির অন্তরে ঈশ্বরের কারুণ্য বর্তায়।

অশ্বিনীকুমারের কবিপ্রাণতার পরিচয় দিতে গিয়ে যে দুটো উদাহরণ দেওয়া গেল তার মধ্যে কোন আপেলীয় মসৃণতা বা চিত্রার্পিত কাব্যকুসুমের প্রকাশ নেই। তবুও যা আছে তা হোচ্ছে হার্দ্য অনুকম্পা—শৈশরিকস্বাদ আর আত্মবেদের পরিচয়। অশ্বিনীকুমারে ছন্দ বোধও একেবারে ছিল না যে তা নয়। কারণ—

মধুর মুরতি, মধুর কীরতি, মধুর মধুর ভাষ
মধুর চলনি, মধুর দোলনী মধুর মধুর হাস
মধুর চাহনি, মধুর সাজনী, মধুর রূপের লেখা
মধুর মধুর মধুর মধুর মাহেন্দ্রক্ষণের দেখা।

শব্দের পৌনঃপুনিকতায় সুখশ্রুতি অনায়াসেই রক্ষিত হোয়েছে। কবিতার প্রাণ যে ছন্দ, সেই চেতনাতেই অশ্বিনীকুমার এখানে সংগীতবর্ণী লাবণ্য এনেছেন। তার কবিতা বা গানের মধ্যে সামষ্টিক ভাবে অদ্বৈতানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। ঠিক যেমনি স্বামী বিবেকানন্দের কবিতা। স্বামী বিবেকানন্দ যেখানে বলেছেন—

Till one day midst my one's and groans
Some one seemed calling me
A gentle soft and soothing voice
That said 'my son' 'my son'.

অশ্বিনীকুমারও যেন বাঁশীর মধ্য দিয়ে কার কম্পিতস্বরে ডাক শুনতে পেয়েছেন—

বিনোদিয়া, তুই কি বাজাস বাঁশী তোর ?
মরমে গেল যেন ধ্বনি প্রাণ হোল ভোর।
তোর মধুর বাঁশীর তানে, কি হয় মন মনই জানে
আবার মনে যে থাকে না মনে—ওরে মন চোর।

বিবেকানন্দও যেমন প্রাণের ঠাকুরের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারেন নি। অশ্বিনীকুমারও ঠিক তেমন, উভয়েই যেন একই সত্তার মুখাপেক্ষী। যাই হোক বিবেকানন্দ এখানে প্রতর্ক্য বিষয় নয়। তবু আধ্যাত্ম সুর সাধনার খাতিরে একত্রিত কোরলাম, অশ্বিনীকুমারের শব্দযোজনা, বাক্য গঠন এখন আমাদের কাছে বহুলাংশে প্রত্মাভ বলে মনে হবে। কারণ তিনি প্রথম পর্বে যে কাব্য গ্রন্থ পড়েছেন, তা সবই প্রায় প্রাক বৈবিক কাব্য, এবং তাই তাকে বেশী প্রেরণা দিয়েছে।

অশ্বিনীকুমার লোকনায়ক। তাই তার অধিকাংশ রচনায় স্বাদেশিকতার সুরধ্বনিত। তা ছাড়াও কিছু আছে যা আত্মোন্মোচনের দলিল হিসাবে স্বীকৃত। অশ্বিনীকুমার এত কঠোর তেজস্বী হোয়েও কোমল, নম্র, স্নিগ্ধ, নমনীয় এবং মননে প্রাঞ্জল। এতগুলো একচেটিয়া বিশেষত্ব পাশাপাশি রেখে ভাবতে পারি বলেযে গৌরব, সেটাই আমাদের মুনাফা।

ভবেশ দাস

রবীন্দ্রনাথ এণ্ড্রুজ পত্রাবলী। অনুবাদ মলিনা রায়। বিশ্বভারতী। দাম ৬.০০

দীনবন্ধু এণ্ড্রুজকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রসংকলনটি বহুকাল অমুদ্রিত আছে। কি কারণে এই অমূল্য রচনাগুলি একবার প্রকাশিত হয়েও পুনর্মুদ্রণের জন্য পুনর্বিবেচিত হয়নি তা অনুমান করে লাভ নেই। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ সেই চিঠিগুলির অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন এজন্য তাঁদের কাছে দেশবাসী কৃতজ্ঞ থাকবে।

দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ সেই সব অসামান্য য়ুরোপীয়দের একজন যাঁরা ভৌগোলিক সীমার সকল সংকীর্ণতা লঙ্ঘন করে নিজের স্বজাতীয়দের অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের জন্য পৃথিবীর নানা দেশে অত্যাচারিত মানুষের দুঃখের ভাগ নিয়েছে। তিনি ভারতবর্ষের কাছে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করলেন, বার বার দুঃস্থ মানবতার আহ্বানে ছুটে গেছেন দক্ষিণ আফ্রিকায়, ফিজি দ্বীপপুঞ্জে, অষ্ট্রেলিয়ায়। কিন্তু তিনি সেই মানুষদের দলে যাঁদের কৃতকর্মের মানদণ্ডে মহত্ব বিচার করা যায় না। তাঁর সম্বন্ধে একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে 'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ।'

ভারতবর্ষের সৌভাগ্য যে আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা অনেকেই বিদেশীদের শ্রদ্ধা শুধু কথায় পাননি পেয়েছেন তাঁদের সমগ্রজীবনব্যাপী আত্মদানের মধ্যে। রাজা রামমোহন রায় অ্যাডাম সাহেবকে বন্ধু পেয়েছিলেন সহকর্মী পেয়েছিলেন ডেভিড হেয়ারকে; তাঁর জীবনী লিখলেন মিস কলেট, মেরী কার্পেন্টার। বিবেকানন্দ পেয়েছিলেন নিবেদিতাকে, গান্ধীজী পেয়েছিলেন মীরাবেনকে শ্রীঅরবিন্দ ধ্যানসঙ্গিনী পেয়েছিলেন মাদারকে। এই ধারাতেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী হলেন দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ, উইলি পিয়ার্সন। জীবনের শেষে যুদ্ধোন্মত্ততা যত বাড়তে লাগলো, দেশে দেশে সংঘাতের প্রস্তুতি যত স্পষ্ট হতে লাগলো, পশ্চিমী সভ্যতার উপর রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস তত শিথিল হতে লাগলো। কিন্তু সেই হতাশা, সেই নৈরাশ্যের সামনে দাঁড়িয়েও রবীন্দ্রনাথ বার বার বলেছেন—"মাঝে মাঝে মহদাশয় ইংরেজের সঙ্গে আমার মিলন ঘটেছে। এই মহত্ব আমি অন্য কোন জাতির কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখতে পাইনি। এঁরা আমার বিশ্বাসকে ইংরেজজাতির প্রতি আজও বেঁধে রেখেছেন। দৃষ্টান্তস্থলে এণ্ড্রুজের নাম করতে পারি। তার মধ্যে যথার্থ ইংরেজকে, যথার্থ খৃষ্টানকে, যথার্থ মানবকে বন্ধুভাবে অত্যন্ত নিকটে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।"

ভারতবর্ষে এসে শিক্ষকতার কাজে লেগেছিলেন এণ্ড্রুজ। তারপরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা ইয়েটসের গীতাঞ্জলি-পাঠ সভায় লণ্ডনে। সেই দেখা কেমন করে দিনে দিনে গভীর বিশ্বস্ত বন্ধুত্বের গাঢ়তায় পরিণত হল সে এক বিচিত্র ইতিহাস। কলেজের অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে এণ্ড্রুজ নিজেকে ভারতবর্ষের দুই শ্রেষ্ঠ সন্তানের কাছে উৎসর্গ করলেন। গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ তাঁদের নানাপ্রকারের বিষন্নতার দিনে এই পরম বীর্যবান অথচ শিশুমতি ইংরাজকে পাশে পেয়েছেন। তাঁর কর্মক্ষেত্র

ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বিস্তৃত হলো, দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীদের আন্দোলনে তিনি সামিল হলেন, অষ্ট্রেলিয়া, ফিজি দ্বীপপুঞ্জে তিনি ভারতীয় শ্রমিকদের নেতা।

সে বিরাট জীবনের সব কথা বলার জায়গা এটা নয়। কিন্তু আজকের তরুণদের মুখে যখন শুনি যে এণ্ড্রুজের সঙ্গে তাদের পরিচয় নেই তখন যেখানে যতটুকু স্থান ততটুকুই এণ্ড্রুজের কথা বলে নিতে ইচ্ছা করে। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট লিখেছিলেন এণ্ড্রুজকে— "আমি ভারতবর্ষকে ভালোবাসি— কিন্তু এই ভারতবর্ষ কোনো ভৌগোলিক সত্তা নয়, সে একটি ভাবময় রূপ। তাই আমি প্রকৃতপক্ষে স্বদেশবৎসল নই, কারণ সারা পৃথিবী জুড়েই আমি আমার স্বদেশীয়দের সন্ধান করে বেড়াব। তাদের মধ্যে আপনি একজন।"

রবীন্দ্র-এণ্ড্রুজ পত্রাবলী ১৯১৩ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ লিখিত পত্রাবলীর সংকলন এর মধ্যে ১৯১৭।১৮ সালের চিঠি প্রায় নেই কারণ তখন এণ্ড্রুজ কবির সঙ্গেই আছেন। ঐ সময় পিয়রসনকে লেখা চিঠিগুলি এই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। পরিশিষ্টে রবীন্দ্রনাথকে (এণ্ড্রুজের ভাষা গুরুদেব) লেখা কয়েকটি চিঠি সংশ্লিষ্ট আছে। পরিশিষ্টের তৃতীয়াংশে এণ্ড্রুজ ও তাঁর মাকে লেখা কয়েকটি চিঠি আছে।

রবীন্দ্রনাথের মন ১৯১৩ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত কোন ধারায় ভেসেছিল তার সবচেয়ে ভাল পরিচয় এই চিঠিগুলির মধ্যে আছে। কতকগুলি দ্বন্দ্বে তাঁর চিত্ত সদা আলোড়িত—সেগুলির স্বরূপ এই ব্যক্তিগত চিঠিগুলিতে প্রকাশিত। তিনি কবি কিন্তু তাঁর ডাক আসে নানা অকবিজনোচিত কাজে এ দুঃখ ক্রমাগতই তাঁকে পীড়ন করে। য়ুরোপ বিদ্বেষ যখন দেশে ধাপে ধাপে প্রবল হচ্ছে তখন তিনি কেবলই য়ুরোপের যা আত্মিক শক্তি তার মহত্ত্ব অনুধাবন করতে চেষ্টা করছেন। য়ুরোপের লোক তাঁর বাণী গ্রহণ করেছে একথা যেমন প্রচুর সমারোহমূলক অভ্যর্থনাসভাগুলি থেকে তাঁর মনে হয়েছে তেমনি এ বাণী যে তারা বেশী দিন মনে না রাখতেও পারে সেকথাও তার অজানা ছিল না।

আজকাল কোন কোন সমালোচক এই কারণে ক্ষোভ প্রকাশ করে থাকেন যে রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমে আজ বিস্মৃত। আজ পশ্চিমের মানুষের কাছে তাঁর দেবার কিছু নেই। পৃথিবীতে এমন কোন সাহিত্যিকই নেই যুগ বদলের সঙ্গে সঙ্গে যার অভ্যর্থনার মান ও মূল্যের তফাত না ঘটে। আজকের যুদ্ধোন্মত্ততায় ক্ষতবিক্ষত ইউরোপ নিজেকে পুনর্গঠিত করার পথে অনেক কিছুই ভুলেছে। সেই ভোলাই যে শেষ তা কে হলপ করে বলবে। আর তাতে কবির জন্যে দুঃখ করে কাঁদুনি গেয়েই বা লাভ কি। কবির মনে তো ইউরোপের সসম্মান জনবহুল সম্বর্ধনা সভাগুলি এ ধারনার সৃষ্টি করেনি যে তাঁর বাণী ইউরোপ চিরকাল সমান শ্রদ্ধায় শুনবে। তিনি এণ্ড্রুজকে চিঠিতে লিখছেন (লণ্ডন। ১২ জুলাই ১৯২০)—"কয়েক বছর পরে সম্ভবত আমার চিন্তাধারায় এদের আবেদন নাও থাকতে পারে। তখন আমার ব্যক্তিত্বের মূল্যও হয় তো এদের কাছে কমে যাবে।...পাশ্চাত্যের মনুষ্যসমাজে আমার যে সংযোগ, তা প্রাণেরই যোগ। সে যোগ ছিন্ন যখন হবে, তখনো এ সত্যটি টিঁকে থাকবে যে আমার জীবন কিছু আলোর রশ্মি সেখানে নিয়ে গিয়ে সেখানকার চিৎসত্তায় পরিণত করে দিয়েছে।"

চিঠিগুলিকে এণ্ড্রুজ আটটি পর্বে বিভক্ত করেছিলেন। প্রত্যেকটি পর্বের সূচনায় একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা আছে যাতে পাঠক সে পর্বের চিঠিগুলির রস গ্রহণ করতে পারেন। এই ভূমিকাগুলি কবির প্রতি এণ্ড্রুজের পরম ভালবাসা ও শ্রদ্ধায় স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল।

এই গ্রন্থটি যিনি অনুবাদ করেছেন তাঁকে অন্তর থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কবিমনের এই ইতিহাসটি শুধু বাংলা জানা পাঠকের কাছে সহজ প্রাপ্য ছিল না। তিনি সেই পরমসম্পদ জাতির হস্তগত করলেন। অনুবাদ যেমন সাবলীল তেমনি কবির মনোভাবের গাম্ভীর্য ও উদারতার প্রকাশযোগ্যও বটে। অনুবাদিকা চেষ্টা করেছেন অনুবাদ যেন সপ্রাণ হয়, মূল রসের বিকৃতি বা লাঘব না হয়। তাঁর চেষ্টা যে অনেকাংশে সফল হয়েছে তা আমার মত আরও বহু পাঠক মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করবেন।

দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের কথা দেশবাসীকে আজ স্মরণ করাতে হয়। আমরা তাঁর জন্য কিছুই করিনি। তবু এই অনুবাদটি হাতে পেয়ে মনে হল হয় তো আবার কিছু লোক এ বই পড়ে তাঁকে স্মরণ করবে।

সোমেন্দ্রনাথ বসু

পঞ্চদশ বর্ষ ॥ কার্তিক ১৩৭৪
সমকালীন

নিয়মাবলী

সমকালীন

প্র ব ন্ধে র মা সি ক প ত্রি কা

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখে) বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক সাড়ে সাত টাকা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীনে' প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদি নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়। **গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না**—'সমকালীন' প্রবন্ধের পত্রিকা।

'সমকালীন'এর গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে, রসিক সমালোচকদের দ্বারা **শিল্প, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান ও সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ** ও **কাব্য গ্রন্থের** বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দুখানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোন ২৩-৫১৫৫

ROSE

পঞ্চদশ বর্ষ ৭ম সংখ্যা

কার্তিক তেরশ' চুয়াত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

অতুলপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথ

কল্যাণকুমার বসু

রবীন্দ্রনাথের সাথে অতুলপ্রসাদের প্রথম পরিচয় হয় ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে। অতুলপ্রসাদের বয়স তখন একুশ-বাইশ। বিলেত থেকে ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরলেন। একদিন শ্রীমতী সরলা দেবী তাঁকে সাথে করে রবীন্দ্রনাথের দরবার জোড়াসাঁকোয় উপস্থিত হয়ে বললেন 'ইনি অতুলপ্রসাদ সেন নব্য ব্যারিস্টার এবং কবি।' প্রথম দর্শনেই প্রেম। অতুলপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের অনিন্দ্য-সুন্দর স্নিগ্ধকান্তি দেখে লিখেছেন তাঁর 'রবীন্দ্রস্মৃতি' প্রবন্ধে—"ছেলে বয়েসে গোপনে একটু কবিতা লিখিতাম দু'একটি গান রচনাও করিয়াছিলাম নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু বা আত্মীয় ছাড়া আর কাহাকেও তাহা শোনাই নাই তাও আমার কবিতার খাতা ধরা পড়িয়া গিয়াছিল বলিয়া। আমার মনে আছে কোন এক চায়ের নিমন্ত্রণে কবি উপস্থিত ছিলেন আমিও একজন নিমন্ত্রিত সেখানে। তাঁর গান হয়। মনে আছে বড় ভালোলাগিয়াছিল তাঁর গান। সেই সময়ে আমার এক দুষ্ট বন্ধু তাঁকে বলিয়াছিল— দেখুন অতুল গান করে এবং নিজেও কিছু গান রচনা করে। আমারত তখন লজ্জায় সঙ্কোচে পৃথিবী দ্বিধা হও ভাব। প্রতিবাদ করিলাম কবি শুনিলেন না, বলিলেন 'সে ত ভাল কথা, আপনি নিজের রচিত একটি গান করুন।' তখন ছিলাম 'আপনি' এবং 'অতুলবাবু' এখন সৌভাগ্যক্রমে হইয়াছি 'তুমি' ও 'অতুল'। আমি তড়াইবার অনেক চেষ্টা করিলাম পারিলাম না। বুঝিতেই পারেন তখন আমার শরীরের এবং মনের কি দুরবস্থা। ভারতের শ্রেষ্ঠতম গীতিকবি ও একজন সুগায়কের সম্মুখে আমাকে নিজ রচিত গান গাহিতে হইবে। তিনি বুঝিলেন আমি বিব্রত হইয়াছি। তিনি আমাকে খুউব আশ্বাস দিয়া গাহিতে বলিলেন। আমি কম্পান্বিত কলেবরে, কম্পিত কণ্ঠে গাহিলাম। আমার অবস্থা সকলেই লক্ষ্য করিলেন। শিষ্টতার প্রতিমূর্তি রবীন্দ্রনাথ

যাহা বলিলেন তাতে আমি অনেকটা আশ্বস্ত হইলাম। যদিও আমার মুখের উষ্ণ ও রক্তিম ভাব কাটিতে বেশ সময় লাগিয়াছিল।"

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে খামখেয়ালী সভা নামে সাহিত্য এবং সঙ্গীত চক্র তৈরী হয়। খামখেয়ালী সভা নামকরণ করলেন অবনীন্দ্রনাথ। সভার সভ্য হলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, মহারাজা জগদীন্দ্রনারায়ণ রায়, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকেন্দ্রনাথ পালিত সাহিত্যিক সুরসিক শিল্পীগণ। অতুলপ্রসাদ খামখেয়ালী সভার সর্বকনিষ্ঠ সভ্যরূপে যোগদান করিলেন। খামখেয়ালী সভার কাজ ছিল খামখেয়ালী ধরনের। নিয়মের কোন বাঁধাবাঁধি ছিল না। হাসি হেসে গান গেয়ে উদরভর্তি খানা খেয়ে দিন পার করা।

খামখেয়ালী মজলিস এক এক দিন এক একজন সভ্যর বাড়িতে হ'ত। সেদিন সে সদস্য সকলকে নিমন্ত্রণ করতেন ভোজের ব্যবস্থা করতেন। অতুলপ্রসাদের বাড়িতে খামখেয়ালী আসর বসল যেদিন রবীন্দ্রনাথ বাড়ি ফিরলেন রাত বারোটার পর। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সারারাত কাটিয়ে ভোরবেলায়।

১৮৯৫খৃ ২৬শে জানুয়ারী অতুলপ্রসাদ লণ্ডনের মিডিল টেম্পল থেকে ব্যরিষ্টারী সনদ লাভ করেন। ১৮৯৫ অথবা ৯৬তে নতুন ব্যরিষ্টার অতুলপ্রসাদ কলকাতায় প্র্যাকটিশ করার চেষ্টা করছেন—কলকাতায় তখন স্বনামধন্য ব্যরিষ্টার উকিলদের যুগ। নতুন ব্যরিষ্টার অতুলপ্রসাদ মূলতঃ শিল্পী-সৌন্দর্য্যের পূজারী। বর্ষাকাল। কাজের কথা ভুলে পায়ে পায়ে পা বাড়াতেন জোড়া-সাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। কবি রবীন্দ্রনাথ কবি অতুলপ্রসাদকে আসতে বলতেন দ্বিপ্রহরের পরে। সেখানে চা পান করে সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরতেন অতুলপ্রসাদ। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে ছোট্ট একফালি একখানা ঘর ছিল, সেখান থেকে মেঘ-বর্ষা দেখা যেত। সেই ঘরখানিতে কবি রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদ এবং কবির প্রিয় বন্ধু লোকেন্দ্র পালিত বসতেন। রবীন্দ্রনাথ বর্ষার কবিতা আবৃত্তি করতেন গান গাইতেন। আর লোকেন্দ্র ইংরাজি ফরাসী ও ইউরোপীয় ভাষা থেকে রবীন্দ্রনাথের বর্ষার কবিতার অনুরূপ কবিতা আবৃত্তি করতেন, বুঝিয়ে দিতেন। অতুলপ্রসাদ মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতেন। লোকেন্দ্র বলতেন জগতের কোন ভাষায় রবীন্দ্রনাথের বর্ষার কবিতা এবং গানের তুলনা নেই।

কলকাতায় ব্যরিষ্টারীতে পসার জমল না অতুলপ্রসাদের। যাত্রা করতে হল রংপুর সেখানেও ব্যরিষ্টারীতে পসার হল না, ফিরে এলেন আবার কলকাতায়। ১৯০০ সালে এই ভারতবর্ষ ত্যাগ করে যাত্রা করতে হল তাকে বিবাহের জন্যে দূরে বিদেশে। লণ্ডনেও ব্যরিষ্টারী করবেন মনে মনে আশা সেখানে নিরাশা। ফিরে এলেন ভারতবর্ষে। যাত্রা এবার উত্তর প্রদেশের রাজধানী লক্ষ্ণৌ শহরে। অবশেষে সেখানে খ্যাতি প্রতিষ্ঠা সম্মান। লক্ষ্ণৌর তিনি মুকুটহীন রাজা, লক্ষ্ণৌর তিনি সেন সাহেব সাধারণের কাছে।

১৯১৪ রবীন্দ্রনাথ রামগড় যাত্রা করলেন সঙ্গে কন্যা পুত্রবধূ। কুমায়ুন প্রদেশে কাঠগুদাম থেকে ১৬ মাইল পার হয়ে রামগড়। কবিপুত্র রথী এক সাহেবের ফুলবাগান কিনলেন। ইচ্ছে গ্রীষ্মকালে বাবামশাই পাহাড়ে ঠাণ্ডায় বাস করবেন শরীর ভালো থাকবে। রথীন্দ্রনাথ বন্ধুবান্ধব

সহ বদরীকাশ্রম থেকে ফেরবার পথে রামগড়ে উপস্থিত হলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রবাসী কবি অতুলপ্রসাদকে লক্ষ্ণৌ থেকে ডাক পাঠালেন। অতুলপ্রসাদ সে প্রাণের আহ্বানে সব কাজকর্ম ফেলে রামগড় ছুটলেন। রবীন্দ্রনাথ আহ্বান জানিয়েছেন সাড়া না দিয়ে অতুলপ্রসাদ পারেন। দশ বারো দিন রবীন্দ্র-সঙ্গে দিন কাটিয়ে এলেন—মধুর সে দিনগুলি। অতুলপ্রসাদ 'আমার কয়েকটি রবীন্দ্র স্মৃতি' প্রবন্ধে রামগড়ের সে দিনগুলি স্মরণ করে লিখেছেন—"একদিন বৈকালে প্রবল বেগে বর্ষা নামিল এবং অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত অবিরাম বৃষ্টি হইল। সেদিন আমাদের বর্ষার আসর বসিল, বৈকাল হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি প্রায় ১০টা অবধি। কবি একাধারে বর্ষার কবিতা পাঠ করিলেন এবং বর্ষার গান গাহিলেন। সেদিনটি আমি কখোনোই ভুলিব না। রাত্রি ৮ টার সময়ে খাবার প্রস্তুত। কবিকন্যা ও পুত্রবধূ দ্বারে দাঁড়াইয়া আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন। কবি কিম্বা আমাদের কাহারও ভ্রুক্ষেপ নাই। বর্ষাগীতির মাদকতায় আমাদের বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়াছে।... এই প্রসঙ্গে একটি হাসির কথা মনে পড়িতেছে। সে আসরে রবীন্দ্রনাথ আমাকে আদেশ করিলেন—'অতুল তোমাদের দেশের একটা হিন্দী গান গাও ত হে।' আমি গাহিলাম 'মহারাজা কেওরিয়া খোল বসকি বুঁদ পড়ে।' সময়োপযোগী বলিয়া সকলের সে গানটি ভালো লাগিল। কবি সে গানটি আমার সহিত গাহিতে লাগিলেন। আমাদের সকলকেই বর্ষার মোহ আচ্ছন্ন করিয়াছে। এমন কি সঙ্গীত-অজ্ঞ রেঃ এণ্ড্রুজ সাহেবকেও সে গানের ছোঁয়া ধরিল। তিনি অদ্ভুত উচ্চারণ করিয়া এবং ততধিক বেসুরো কণ্ঠস্বরে আমাদের সহিত গাহিতে লাগিলেন মহারাজা কেওরিয়া খোলো......। তাঁর সঙ্গীতের আকস্মিক উচ্ছ্বাস রোধ করা দুষ্কর দেখিয়া আমরা তাঁকে বাধা দেওয়ার ব্যর্থ প্রয়াস করিলাম না। সে বার রামগড়ে কবির গান রচনার একটি স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিলাম। তিনি যে ঘরে শুইতেন আমার শয্যাও সেইঘরে ছিল। আমি দেখিতাম তিনি প্রত্যহ ভোর না হইতেই জাগিতেন এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্বেই বাটির বাহির হইয়া যাইতেন। একদিন আমার কৌতূহল হইল। আমিও তাঁহার অলক্ষিতে তাঁহার পিছু পিছু গেলাম। আমি একটি বৃহৎ প্রস্তরের অন্তরালে নিজেকে লুকাইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম তিনি একটি সমতল শিলার উপর উপবেশন করিলেন। যেখানে বসিলেন তার দুইদিকে প্রস্ফুটিত সুন্দর শৈল্য-কুসুম। তাঁর সম্মুখে অনন্ত আকাশ। এবং হিমালয়ের তুঙ্গ গিরিশ্রেণী। তুষারমালা বালরবি কিরণে লোহিতাভ। কবি আকাশ এবং হিমগিরির পানে অনিমেষ তাকিয়ে আছেন। তাঁর প্রশান্ত সুন্দর মুখমণ্ডল উষর মৃদু আলোয় শান্তুজ্জ্বল। তিনি গুনগুন করিয়া তন্ময়চিত্তে গান রচনা করিতেছেন—'এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর।' আমি সে স্বর্গীয় দৃশ্য মুগ্ধ নয়নে দেখিতে লাগিলাম এবং তাঁর সেই অনুপম গানটির সদ্য রচনা ও সুরবিন্যাস শুনিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ তাহা দেখিলাম এবং শুনিলাম এবং তিনি নামিয়া আসিবার পূর্বেই পলাইয়া আসিলাম। আর একদিন প্রাতে শুনিলাম তিনি তেমনি করিয়া গান রচনা করিতেছেন—'ফুল ফুটেছে মোর আসনের ডাইনে বাঁয়ে পূজার ছায়ে'। এই রকম করিয়া প্রায় প্রতি প্রাতে লুকাইয়া তাঁর গান রচনা শুনিতাম আর বাণীর বরপুত্রের সেই দেবময় মূর্তি হিমালয় কোলে উপবিষ্ট দেখিতাম। একদিন ধরা পড়িয়া গেলাম। পলাইয়া আসিবার সময়ে দেখিয়া ফেলিলেন। সুচতুর কবি বুঝিলেন যে,

গোপনে আমি তাঁর গান শুনিতেছিলাম। তিনি ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—অতুল এখানে এত ভোরে যে? কোথায় ছুটে যাচ্ছ? আমি দেখিলাম ধরা পড়িয়াছি আর উপায় নাই। বলিলাম লুকাইয়া আপনার গান শুনিতেছিলাম। তার দুইদিন পরে তিনি যখন আমাদের শুনাইলেন 'এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর, আমি বলিলাম ওই গানটি আমি পূর্বেই শুনিয়াছি তিনি বলিলেন 'পূর্বে কি করে শুনলে? আমি ত মাত্র দুদিন হল এই গানটি রচনা করেছি। আমি বলিলাম 'রচনা করবার সময় শুনেছিলাম' তখন কবি বললেন তুমি তো ভারি দুষ্ট এই রকম করে রোজ শুনতে বুঝি।' আমরা সকলে খুব হাসিলাম।

একদিন বৈকালে বাহিরে বসিয়া চা ও গৃহজাত নানাপ্রকার সুখাদ্যের সম্ভোগে ব্যস্ত ছিলাম। কবি হঠাৎ পিছন হইতে আসিয়া 'অতুল এস' বলে আমার হাত ধরে টানিয়া লইয়া চলিলেন। তাঁহার কন্যা ও পুত্রবধূ বলিয়া উঠিলেন—'বাবা ওকি! অতুলবাবুর যে খাওয়া এখনও শেষ হয়নি।' 'তা হবেক্ষণ' বলিয়া সঙ্গে লইয়া চলিলেন। তাঁহার বালকের মত উৎসাহ আমার বড় মধুর লাগিল। আমি আগ্রহের সঙ্গে চলিলাম। তিনি অনতিদূরে লইয়া গিয়া পরম রমণীয় পত্রপুষ্প শোভিত একটি সুন্দর নির্জন স্থান আমাকে দেখাইলেন। সত্যই মুগ্ধ হইবার মত সেই স্থান। তিনি বলিলেন আমি রোজ এখানে আসি এখানে বসি গান গাই এবং গান রচনা করি। আমি অনুরোধ করিবামাত্রই কয়েকটি গান সেখানে বসিয়া আমাকে শোনাইলেন। কি যে ভাল লাগিয়াছিল বলিতে পারি না। ফিরিয়া আসিলে কবিকন্যা বলিলেন 'বাবা তোমার যে কাণ্ড অতুলবাবুকে না খাইয়ে কোথায় এতক্ষণ ধরে রেখেছিলে?' তিনি বলিলেন অতুলকে একবার জিজ্ঞেস কর।' আমি বললাম 'আমি সেখানে খুব ভালো জিনিস খেয়ে এসেছি।' রামগড়ের সে দশদিনের সে অবিরাম আনন্দ ও গীত উৎসব কখনও ভুলব না।"

রবীন্দ্রনাথ ও অতুলপ্রসাদের এই কয়েকদিনের একত্র বাস সম্বন্ধে কবিগুরুর পুত্র রথীন্দ্রনাথও লিখেছেন—'১৯১৪ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মাবকাশের কথা মনে পড়ছে। ২৫শে বৈশাখ জন্মোৎসব যথারীতি হয়ে গেছে শান্তিনিকেতনে, আশ্রম ছেড়ে অধ্যাপক ছাত্র সকলে যে যার বাড়ি চলে গেছেন। ছুটীর মধ্যে গরমের কষ্ট ভোগ না করে বাবা স্থির করলেন রামগড় পাহাড়ে নতুন কেনা বাড়িটাতে গিয়ে কয়েকদিন থাকবেন। নৈনিতালের কাছে রামগড় নামে এক পাহাড়ের ওপর একটি বাগানবাড়ি বছরখানিক আগে কেনা হয়েছিল। বাড়িটির নাম ছিল 'স্নো ভিউ'—প্রায় তিনশো বিঘা জমির ওপর বাড়ি ও বাগান—আপেল, পেয়ারা, পীচ, খোবানি, আখরোট প্রভৃতি ভালো ভালো ফলের গাছ লাগানো। বাড়িটা কেনার পর বাবা 'স্নো ভিউ' নাম বদলে নতুন নাম দিয়েছিলেন—'হৈমন্তী'।

...যাহোক গ্রীষ্মাবকাশে সকলে মিলে সেই প্রথম যাওয়া হোল 'হৈমন্তীতে'। দীনেন্দ্র ও মুকুল দেকে নিয়ে আমি কিছুদিন আগেই বেরিয়ে পড়েছিলাম হিমালয় ভ্রমণে। বদরিকাশ্রম তীর্থ দর্শন করে যখন রামগড়ে এলুম তখন দেখি হৈমন্তীবাড়ি ভর্তি। বাবার সঙ্গে অনেক লোকজন। আমাদের পরিবারের সকলে আছেনই তাছাড়া লক্ষ্ণৌ থেকে এসেছেন কবি অতুলপ্রসাদ সেন ও পরে এলেন সি এফ এণ্ডুজ। বাড়ি জমজমাট দিনেন্দ্রের আগমনে আরো

জমে উঠল। গল্পগুজোব হাসি ও গানের বিরাম রইল না। আহারাদির প্রাচুর্যের অভাব হয়নি। নিজেদের বাগান থেকেই পর্যাপ্ত পরিমাণে শাক সব্জী ও নানাবিধ ফল আমদানি হতে লাগলো। সবচেয়ে জমিয়ে দিল গান। গায়কের ত্র্যহস্পর্শ—একই জায়গায় বাবা অতুলপ্রসাদ ও দিনেন্দ্রনাথ হৈমন্তীতে গানের ফোয়ারা ছুটল। বাবা অন্যকাজ ছেড়ে প্রতিদিন নতুন গান রচনা করে তাতে সুর দিতে লাগলেন। দিনেন্দ্র কাছে রয়েছেন—বাবা নির্ভয়। সুর হারিয়ে যাবে না, তাকে একবার নতুন সুর শোনালেই সে মনে রাখবে। তাই মনের আনন্দে বাবা গান বাঁধতে লাগলেন।

নতুন গান কী বাঁধা হয়েছে শোনবার জন্য সকলে উৎসুক হয়ে বসে থাকি। অতুলবাবুর আগ্রহ সবচেয়ে বেশী। তিনি বাবাকে অনুরোধ করলে বাবা দিনেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বলেন, তোকে কাল যেটা শেখালুম তুই-ই গেয়ে দেনা। আমার কি ছাই মনে আছে।' দিনেন্দ্র গান ধরেন, একটা শেষ হলে আর একটা, অতুলপ্রসাদের তবু তৃষ্ণা মেটে না। নতুন গান শেষ হলে পুরোনো গান থেকে গাইতে বলেন, তাঁর যেগুলি বিশেষ ভালো লাগে। বাবা তখন অতুলপ্রসাদকে বলেন, তোমার আশ মিটল। এখন আমাদের আশ মিটাও, আমরা এবার তোমার গান শুনি। অতুলপ্রসাদ তখন তাঁর মিষ্টি গলায় গানের পর গান গেয়ে যান! বনমালী যতক্ষণ না 'খেতে যে হবে' বলে সভা ভেঙে দেয় ততক্ষণ গান আর বন্ধ হয় না।

মনে পড়ে অতুলপ্রসাদ বাবাকে একদিন অনুরোধ করলেন আপনি কাল যে সুরটি গুণগুণ করছিলেন আপনার ঘরে, আমার বড় ভালো লাগছিল শুনতে, গান বাঁধা নিশ্চয়ই হয়ে গেছে, ঐ গানটি আমাদের শুনিয়ে দিন। বাবা বললেন—সেটা যে দিনুকে এখনও শেখানো হয়নি, তাহলে আমাকেই গাইতে হয় বলে বাবা গাইলেন 'এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর।'

সকালবেলা ঘাসের উপর তখনও শিশির লেগে আছে। পুব দিকের পাহাড়ের উপর থেকে সূর্যের আলো এসে পড়ে রৌদ্রছায়ার লুকোচুরি খেলছে পাতায় পাতায়। প্রকৃতির সেই প্রফুল্লতা, গানের কথা, গানের সুর সব মিলে একটি অপরূপ রস সৃষ্টি করল। শুনতে শুনতে অতুলপ্রসাদ অভিভূত হয়ে পড়লেন, বাবাকে গানটি বারবার গাইতে বললেন। যতবার গাওয়া হয় তাঁর কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। আর একবার শোনবার জন্য আকুল হয়ে পড়েন।

বাবা প্রতিদিন গান রচনা করতে লাগলেন আর আমরা বাগানের এক প্রান্তে গুহার সামনে আখরোট গাছের তলায় বসে সেই গান শুনতে লাগলুম। বাবার তখনো গান গাইবার গলা ছিল। ঘরের বাইরে উন্মুক্ত আকাশের নিচে বসে গাইতেন। তাঁর গানে গাছপালা পাহাড় যেন কেঁপে উঠত। অতুলপ্রসাদের গলা যেমন মিষ্টি, গাইবার ধরণও সুন্দর। সবচেয়ে ভালো লাগতো তিনি যে আন্তরিকতার সঙ্গে ভাবে বিভোর হয়ে গান করতেন। বাবা ও অতুলপ্রসাদ দুজনেই যখন শ্রান্ত হয়ে পড়তেন তখন দিনেন্দ্রনাথের পালা সুরু হোত। দিনের পর দিন এইরকম গানের উৎসব চলতো সারা সকালবেলা।

রামগড়ের আসর ভাঙাবার সময় এল। প্রথম চলে গেলেন অতুলপ্রসাদ। যাবার সময়ে বাবাকে লক্ষ্ণৌতে নিমন্ত্রণ করে গেলেন। তাঁর কাছে দুচারদিন থাকতে হবে কেবল নয়,

লক্ষ্ণৌতে একটি বক্তৃতা দিতে হবে। পরে দিনেন্দ্র ও মুকুল ফিরে গেল শান্তিনিকেতনে। এনড্রুজ সাহেবকে নিয়ে আমরা রইলুম সেখানে আরো কয়েকদিন।'

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এবং প্রবাসী অতুলপ্রসাদের মধ্যে বয়েসের ব্যবধান ১০ বছরেয় মতো। রবীন্দ্রনাথের জন্ম তারিখ ছিল ইংরেজী হিসেবে ৭ই মে ১৮৬১ এবং অতুলপ্রসাদ জন্মেছিলেন ২০শে অক্টোবর ১৮৭১। এঁদের মধ্যে যে অন্তরঙ্গতা হৃদ্যতা ছিল তা বোধ হয় বয়েসের হিসাব রাখে না। অতুলপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন।

একবার অতুলপ্রসাদের এক ভাগিনেয়ীর বিবাহ উপলক্ষে তাঁর পরিবারের সকলে ইচ্ছা করেছিলেন যে বিবাহের উপাসনায় অতুলপ্রসাদের রচিত সঙ্গীতই গীত হবে। তিনি পছন্দ করলেন না। বললেন রবীন্দ্রনাথের এত সুন্দর সঙ্গীত থাকতে শুধু আমার রচিত গানগুলিই হবে এ আমার ভালো লাগছে না। চারটি গানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের দুটি হোক।' কবি রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই অতুলকে শান্তিনিকেতনে ডেকে পাঠাতেন তাঁর সঙ্গ কামনায়। সুদূর প্রবাসে কর্মসূত্রে থেকে সকল সময়ে সকল ডাকে হয়তো সাড়া দিতে পারতেন না অতুলপ্রসাদ। তবু রবীন্দ্রসঙ্গ কামনায় 'অতুলের' মন সবসময়তেই ব্যাকুল হত। পারিবারিক কারণে লক্ষ্ণৌ প্র্যাকটিশ ত্যাগ করে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে অতুলপ্রসাদ কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিশে এলেন। চলল সাহিত্য সাধনা। সাহিত্যিকদের বৈঠক বসল তাঁর ওয়েলেসলী ম্যানসনের ফ্ল্যাটে···চলল গান বাজনা। মনডে বা মণ্ডা ক্লাবের বৈঠক, উপস্থিত হলেন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র সঙ্গমে। বাংলা দেশে কয়েকটি মধুর মাস অতিক্রম করে অতুলপ্রসাদ লক্ষ্ণৌএ কংগ্রেসের অধিবেশনের কর্মকর্তাদের ডাকে ফিরলেন আবার।

১৯২৩এর ১লা মার্চ থেকে ৪ঠা মার্চ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এলেন লক্ষ্ণৌএ। নামলেন অতুলপ্রসাদের আউটট্রাম রোডের বাড়িতে। কবি তারপর এলেন ১৯২৬এ জানুয়ারীতে লক্ষ্ণৌএ সঙ্গীত সম্মেলনীতে।

কবিগুরুর ৭০ তম জন্মদিন উপলক্ষে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌতে অতুলপ্রসাদের নেতৃত্বে একটি বিরাট রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষে অতুলপ্রসাদ গাইলেন।

'অমর কবি থাক মরলোকে
বর্ষ বহু আরো মোদের সম্মুখে
বঙ্গ বীণা আরো বাজাও গুণী
মহান মোহন বাণী কহ শুনি
রচহে ভুবনে শান্তিনিকেতন
পূর্ণ হোক তব পুণ্য সাধন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করে নোবেল পুরস্কারের সম্মান লাভ করলেন। অতুলপ্রসাদ গাইলেন—

বাজিয়ে রবি তোমার বীণে আনল মালা জগৎ জিনে
গরব কোথায় রাখি গো?

তোমার চরণ তীর্থে আজি
জগৎ করে যাওয়া আসা।

৩১শে ডিসেম্বর ১৯২৬ অতুলপ্রসাদ এবং দিলীপকুমার রায় প্রাণের টানে শিমুলতলা থেকে সোজা বোলপুর উপস্থিত হলেন। তিনদিন পরমানন্দে পার হয়েছিল গানে গানে, নানান আলোচনার মাঝে রোজ একই সঙ্গে আহার বিহার…রবীন্দ্রর অনুযোগ 'অতুল তুমি বড় কম আস হে শান্তিনিকেতনে।'

ইংরাজি ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ২৬শে আগষ্ট রাত ১টা ৪৫ মিনিটের সময় অতুলপ্রসাদ ৬১ বছর ১০ মাস বয়সের সময়ে সন্ন্যাস রোগে হঠাৎ পরলোক গমন করলেন একমাত্র সন্তান দিলীপকুমার সেনকে রেখে। পরদিন সারা লক্ষ্ণৌ শহরের মানুষ ঘুম ভেঙে শুনল তাদের সেন সাহেব আর ইহলোকে নেই। অতুলপ্রসাদ বয়েসে যদিও রবীন্দ্রনাথের থেকে ১০।১১ বছরের ছোট ছিলেন কিন্তু কবিগুরুর মৃত্যুর ৭ বছর আগে তিনি লোকান্তরিত হলেন। প্রিয়জনের বিচ্ছেদ ব্যথা মূর্ত হয়েছে অতুলপ্রসাদের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথের শোক গাথায়—

বন্ধু, তুমি বন্ধুতার অজস্র অমৃতে
পূর্ণ পাত্র এনেছিলে মর্ত্য ধরণীতে।
ছিল তব অবিরত
হৃদয়ে সদাব্রত
বঞ্চিত করোনি কভু কারে
তোমার উদার মুক্ত দ্বারে।

মৈত্রী তব সমুজ্জ্বল ছিল গানে গানে
অমরাবতীর সেই সুধাঝরা দানে
সুরে ভরা সঙ্গ তব
বারে বারে নব নব
মাধুরীর আতিথ্য বিলালো,
রসতৈলে জ্বেলেছিলে আলো।

দিন পরে গেছে দিন মাস পরে মাস,
তোমা হতে দূরে ছিল আমার আবাস
"হবে হবে দেখা হবে"
একথা নীরব রবে
ধ্বনিত হয়েছে ক্ষণে ক্ষণে
অকথিত তব আমন্ত্রণে॥

আমারও যাবার কাল এলো শেষে আজি
"হবে হবে দেখা হবে" মনে ওঠে বাজি,
সেখানেও হাসিমুখে
বাহু মেলি লবে বুকে
নব জ্যোতি দীপ্ত অনুরাগে
সেই ছবি মনে মনে জাগে॥

এখানে গোপন চোর ধরার ধূলায়
করে সে বিষম চুরি যখন ভুলায়।
যদি ব্যথাহীন কাল
বিনাশের ফেলে জাল
বিরহের স্মৃতি লয় হরি
সব চেয়ে সে ক্ষতিরে ডরি॥

তাই বলি দীর্ঘ আয়ু দীর্ঘ অভিশাপ,
বিচ্ছেদের তাপ নাশে সেই বড় তাপ।
অনেক হারাতে হয়
তারেও করিনা ভয়;
যতদিন ব্যথা রহে বাকি,
তার বেশী যেন নাহি থাকি॥

কালিদাসের কাব্যে প্রেমপত্র

শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী

খাজুরাহোর সেই পত্রলেখা নায়িকা প্রায় হাজার বছর ধরে একটিমাত্র প্রণয়লিপি রচনার ভংগীতে কেমন চিরন্তনী হয়ে রইলো। আর রইলো কালিদাসের শকুন্তলা—পাখির পেটের মতো মোলায়েম পদ্মপাতায় নখের আঁচড়ে ছোট্ট এক প্রেমপত্র লিখে। কেননা ও-চিঠি লিখেই প্রহরশেষের আলোয় দুষ্মন্তের চোখের তারায় একটি রমণীয় সর্বনাশকে দুলতে দেখেছিলো শকুন্তলা।

'চিঠি জিনিসটা ছোট্ট, মালতীফুলের মতো, কিন্তু সেই চিঠি যে আকাশের মধ্যে ফুটে ওঠে সেই আকাশ মালতী লতারই মতো বড়ো'—ভানু সিংহের পত্রাবলীতে (৫৬ সংখ্যক পত্রে) মন্তব্য করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই সূত্রেই কালিদাসের রচনাবলীতে উল্লিখিত কয়েকটি পত্রের প্রেরণায় সেই বিস্তৃত আকাশ, সেই গ্রন্থিল মালতীলতার পরিপ্রেক্ষিতকে বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

বিশেষত রেওয়াজ ছিলো না, তাছাড়া লাজুক ছিলেন বলেও বোধ হয় বইগুলো ছাড়া ব্যক্তিগত জীবনের আর কোনো প্রমাণপত্র রেখে যান নি কালিদাস। আর চিঠিপত্রতো দূরের কথা! অথচ তাঁর সমগ্র রচনাবলীতে ইতঃস্তত বেশ কিছু উল্লেখ ছাড়াও চারটে পুরো বয়ানের চিঠিকে সনাক্ত করে নেওয়া যাচ্ছে নাটকগুলো থেকে। বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্যে এদের দুটিকে প্রেমপত্র : এবং অন্য দুটির একটিকে রাজ-পত্র বা শাসন, আরেকটিকে পারিবারিক পত্রের আখ্যা দেওয়া চলে।

যদিও কালিদাসের কাব্যের প্রেমপত্রগুলোর প্রতি এ-প্রবন্ধের আনুগত্য তথাপি অন্যধরণের চিঠিগুলোকেও একেবারে অবহেলা করা যায় না। নাহলে বরং মূল বিষয়টির কয়েকটি কোণা-কুলুংগী অনালোকিত থেকে যাওয়ার আশঙ্কায় আতুর থাকতে হয়। কারণ সেকালীন পত্র-রচনা-কৌশলের (epistolary art) বিবর্তন বৃত্তান্ত, কিংবা পরক্ষোভাবে ভারতীয় লিপিতত্ত্বের প্রাচীনতার বিষয়ে চোখ রাখতে গেলে এই পর্যায়ের চিঠিগুলোর গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

রাজ-পত্রগুলো রাজ্যশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে রাজায় রাজায় কিংবা রাজায় প্রজায় সংযোগ-সেতু। কালিদাস অবশ্য রাজ-পত্রগুলোকে 'মন্ত্রপত্র' বলেছেন। বিক্রমোর্বশীয়-তে রাজার উক্তি : 'নেদং পত্রং ময়া মৃগ্যতে। তৎ খলু মন্ত্রপত্রং যদন্বেষণায় মমায়মারম্ভঃ।' (৩য় অঙ্ক)

মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে দুটি রাজপত্রের উল্লেখ আছে। প্রথম অঙ্কে মিশ্রবিষ্কম্ভক বা প্রিল্যুড অংশের পরেই যে-চিঠিটি নিয়ে রাজসভা আন্দোলিত হয়ে উঠলো তার বিষয়বস্তু মহারাজ অগ্নিমিত্রের পত্রোত্তরে বিদর্ভপতির কয়েকটি দম্ভবচন (পত্রাবলী-'ক' দ্রষ্টব্য)। নায়িকা মালবিকার আসল পরিচয় গোপন রাখবার যে প্রচ্ছন্ন প্রয়াস নাটকের উপভোগ্য অংশ তার সূত্রপাতও এ-চিঠি থেকেই। পত্রকর্মের পরিভাষায় এই প্রত্যুত্তরলিপিটি কৌটিল্য-কথিত প্রতিলেখর (১) একটি যথাযথ উদাহরণ। এ নাটকের পঞ্চম অঙ্কে আরো একটি রাজপত্র লিখবার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন বিদিশার রাজা অগ্নিমিত্র : 'তেন হি মন্ত্রিপরিষদং ব্রূহি—সেনান্যে বীরসেনায় লিখ্যতামেবংক্রিয়তাম ইতি।' নাটকের

উদ্ধৃত অংশের অব্যবহিত পরে নাতির বিজয় কাহিনীর উল্লেখ করে ছেলের কাছে একখানা রীতিমত পারিবারিক পত্র লিখেছেন রাজ-পিতা পুষ্পমিত্র (পত্রাবলী-'খ' দ্রষ্টব্য)। এতে সপরিবারে অশ্বমেধ যজ্ঞ দেখে যাবার জন্য অগ্নিমিত্রকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো। রাজপুত্রের আর একটি উল্লেখ পাওয়া যায় অভিজ্ঞান শকুন্তলের ষষ্ঠ অঙ্কে যেখানে রাজা প্রতিহারীকে ডেকে বলছেন : 'বেত্রবতী, আমার কথা বলে অমাত্য শ্রদ্ধেয় পিশুনকে বলো যে, ঘুম থেকে উঠতে বিশেষ দেরী হয়ে যাওয়ায় আজ আর বিচারে বসা সম্ভব হচ্ছে না ; এপর্যন্ত তিনি যেসব পৌরকর্ম দেখাশুনো করেছেন তার একটি বিবরণী 'পত্রাকারে' আমার কাছে পেশ করতে।

রাজপত্র এবং পারিবারিক পত্রগুলোর আলোচনা থেকে ধারণা করে নিতে অসুবিধে হয় না, যে কালিদাসের সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টাব্দ চতুর্থ-পঞ্চম শতকে পত্র-রচনা পাকাপাকি ভাবে একটা রীতি বা আর্টে পরিণত হয়ে উঠেছিলো। কেননা এর কিছু পরবর্তীকালে, কেমন করে ব্যবহারিক চিঠিপত্র লিখতে হবে সে-বিষয়ে বররুচি-রচিত 'পত্রকৌমুদী' (নামান্তরে, 'পত্রমঞ্জরী') কিংবা ধারারাজ ভোজের লেখা 'পত্রপ্রকাশিকা'র মতো গ্রন্থের বিশেষ প্রচলন হতে থাকে।২

আমাদের আলোচনার দ্বিতীয় পর্যায়ের পত্রাবলী সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ সূত্র মনে রাখা দরকার। প্রথমত এই প্রেম-পত্রগুলো নাটকের অংগীভূত এবং ব্যবহারিক চিঠির মতো গদ্যে নয়, ছন্দে রচিত ও প্রায় ক্ষেত্রেই ভাষা তাদের প্রাকৃত। অপিচ, এতে নাটকের নায়িকা তার দয়িতকে লিখছে : প্রেমের দেবতা অনঙ্গ বড়ো যন্ত্রণা দিচ্ছে, তুমি এসো আমাকে শমিত করো। তৃতীয়ত, রচনাস্থল উদারবিশ্ব—হয় প্রমোদ-উদ্যান, নয় তো তপোবন।

বাৎসায়ন ও তাঁর পূর্বসূরীগণ সেকালীন সংস্কৃতিবানকে অবশ্য আচরণীয় 'চতুঃষষ্ঠি কলা'র বিবরণ প্রসঙ্গে পত্ররচনা-কুশলতাকে অন্যতম মেনেছেন কিনা প্রসঙ্গত সে-বিষয়ে কৌতূহল থাকাও অস্বাভাবিক নয়। অর্থাৎ বাক্যান্তরে বলতে গেলে, প্রেমপত্র কিংবা অনঙ্গলেখ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কোনো আলোচনা কামশাস্ত্রে সূচিবদ্ধ আছে কিনা খবর নেওয়া প্রয়োজন। কামসূত্রে পঠন ও লিখন সংক্রান্ত তিনটি বিশেষ কলার কথা (২৮, ৪৪, ও ৫৩ সংখ্যক কলা দ্রষ্টব্য) বাৎসায়ন উল্লেখ করেছেন : যেমন নায়ক বা নায়িকাকে প্রহেলিকা রচনা ও সমাধানের কৌশল আয়ত্ত করতে হবে, দ্বিতীয়ত, সাংকেতিক অক্ষর পড়া ও লেখায় পারদর্শী হতে হবে ; এবং তৃতীয়ত গূঢ়লেখ-র পাঠোদ্ধার কিংবা সমস্যাপূরণ জাতীয় রচনা কুশলতার অধিকারী-হতে হবে। সুতরাং ঠিক ললিতকলা হিসেবে পত্র-রচনার স্বীকৃতি কামসূত্রে নেই। অথচ ঘর-সাজানো, খোঁপা বাঁধা প্রভৃতি অন্যতর অনেক গৌণচর্চাও 'কলা' হিসেবে বাৎস্যায়ন গ্রহণ করেছেন। তবে প্রেম পত্র সম্পর্কে তিনি একেবারে নিরুচ্চার নন। প্রসঙ্গটি পরে আলোচনার অবকাশ রইলো।

নাটকে নিহিত প্রেমপত্রগুলো সম্বন্ধে যখন আলোচ্য জিজ্ঞাসা তখন ভারতবর্ষের নাট্য আলোচনার প্রথম সূত্রধার ভরতমুনির সমীপস্থ হওয়া দরকার। তাঁর নাট্যশাস্ত্রের মতে প্রণয়ব্যাপারে চার রকমে রমণী মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে : পত্র পাঠিয়ে, নায়কের প্রতি স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাতে, মধুর বাক্যালাপে কিংবা প্রেমাস্পদের কাছে দূতীপ্রেরণ করে। লেখ্যপ্রস্থাপনৈঃ স্নিগ্ধৈঃ বীক্ষিতৈঃ মৃদুভাষিতৈঃ। দূতী-সম্প্রেষণৈঃ নার্য্যাঃ ভাবাভিব্যক্তিরিষ্যতে ॥ উদাহরণত কালিদাসের

কাব্যের দুই নায়িকা শকুন্তলা ও উর্বশী প্রণয়াস্পদকে তাদের মনের ভাব জানাতে দুটি প্রণয় লিপির আশ্রয় নিয়েছে। যদিও নাটকদুটির কাহিনীগত উপকরণ বিভিন্ন পুরাণ ও মহাকাব্য থেকে আহৃত, তথাপি কবি তাঁর অনেক মৌলভাবনা ও নিজস্বতার অনুপ্রবেশে রচনাকে অদ্বিতীয় সৃষ্টি করে তুলেছেন। প্রেমলিপি দুটির অবতারণায় সেই নিজস্বতায় উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন কালিদাস। বস্তুত এদুটি চিঠির অবতারণার পরে নাটকের পটবিস্তার ঘটেছে। অভিজ্ঞানশকুন্তলের ভূমিকায় (পৃঃ ৬৭) এম. আর. কালে এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন: In the third act Dushyanta himself hears from Shakuntala's own mouth that she is in deep love with the king. Dushyanta listens to her love-letter; it is only after this verbal and written proof that Dushyanta enters and proposes a lovemarriage.

তাছাড়া, প্রেমপত্রগুলো যে সামগ্রিক ভাবে নাটকের প্লট বা বিষয়বস্তুর বিস্তারপর্বে একটি উল্লেখযোগ্য ধাপ সেকথা পঞ্চদশ শতকের কালিদাস-ব্যাখ্যাতা কাটয়বেম-র মন্তব্য থেকেও স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। সংস্কৃত নাটকের আঙ্গিক বিচারে চিঠি দুটি 'সন্ধির অঙ্গ' বলে গণ্য হবে। বিক্রমোর্বশীয় নাটকের টিকায় কাটয়বেম বলেছেন—(নায়িকার) আপন অনুরাগ প্রকাশক কথাটি পাওয়া গিয়াছে বলে এ অংশটি (পত্রটি) 'উপন্যাস' নামক সন্ধির অঙ্গ বলে বিবেচিত হতে পারে অনুরূপভাবে অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকের পত্রটিকে 'লেখ' নামক সন্ধির অঙ্গ বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, কেননা এই লেখটিতে শকুন্তলার মনের অভিপ্রেত সমস্ত বক্তব্য সংকলিত হয়েছে। (৩)

আগেই বলেছি শকুন্তলার চিঠি তার আত্মসমর্পনের নিদান বা চরমপত্র, দুই হৃদয়ের সেতুবন্ধন; এবং স্বভাবে সেটি এক অমিত দ্যোতন মিতাক্ষরা। এত কম শব্দে এত বেশি অথচ সুস্থির কথা বোধ হয় শকুন্তলা আর বলেনি। হৃদয়পীড়নের নিবিড় মধুর যন্ত্রণা রিণ্‌রিণিয়ে একটি গীতি-কবিতা হয়ে ফুটে উঠেছে। হৃদয়ের স্বতোৎসার এক সাবলীল গাথা ছন্দে বিকশিত হয়ে উঠলো (পত্রাবলী 'গ' দ্রষ্টব্য)

তুজ্ঝ ণ আণে হিঅঅং মম উণ মঅণো দিবা বি রত্তিম্পি।
ণিগ্ঘিণ তবই বলীঅং তুই বুত্ত মণোরহাই অঙ্গাইং॥ (তৃতীয় অঙ্ক, ১৪শ শ্লোক)

ওগো নির্দয়! তোমার মনের কথা বলতে পারিনে; কিন্তু এদিকে কেবল তোমাকেই মন সঁপেছি বলে কামদেব দিনরাত আমার সর্বাঙ্গ জ্বালিয়ে খাচ্ছে। শুধু নাটকের অঙ্গ-সৌকর্যে সহায়তা করা নয়, চিঠিটি নায়কের চরিত্র বিশ্লেষণেও বিশেষ উপযোগী। আমার তো মনে হয় শকুন্তলার চিঠির অবতারণা করে কালিদাস দুষ্মন্তের ভারতীয় রাজাদর্শকে আরো স্পষ্ট করে তুলেছেন। অনেকে অত্যন্ত কামালু বলে দুষ্মন্তকে দোষারোপ করে থাকেন। কিন্তু এ চিঠির ভাষ্যে বোঝা যায়, মদন-পীড়ায় দেহ ও মনের ক্ষত থেকে ত্রাণ করতে যুবতী শকুন্তলা যে অনুরোধ করেছে, সেই লিখিত প্রমাণ হাতে পাওয়ার পরই দুষ্মন্ত গান্ধর্ব বিবাহে উদ্যোগী হয়েছিলো।

একথা ঠিক সেকালীন ভারতীয় সাহিত্যিকদের কিছু লিখতে গেলেই কতগুলো পিছুটানে ঘাড় ফেরাতে হত। কাব্যরচনা করতে বসে অলংকারশাস্ত্র থেকে শুরু করে ক্ষেত্রবিশেষে হস্তী-শাস্ত্রেরও বিধিনিষেধ স্মরণে রাখতেন কবিরা। তবে কৃতী লেখকেরা প্রায়শই শাস্ত্র-কথিত রীতি

প্রক্রিয়াগুলোকে শৈল্পিক সূক্ষ্মতা দিয়ে সাজিয়ে দিতেন। শকুন্তলার চিঠির উপস্থাপন প্রসঙ্গে কথাটি বলা যায়। শুধু শাস্ত্রানুসারী হলে কালিদাস পত্র-প্রসঙ্গে 'কামসূত্র'-র দূতীকর্মাণি অধ্যায়ের (৫ম অধিকরণ, ৪র্থ অধ্যায়) এই নির্দেশটুকু শিরোধার্য করে তাঁর কাব্যে বিনিয়োগ করতেন: দূতী অনেক রকমের। তৃতীয় ধরণের দূতীর নাম পত্রহারী যার কাজ খবর পৌঁছে দেওয়া; লিখিত সংবাদ কিংবা চিঠি ইত্যাদি। নায়ক নায়িকার অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতার সময়ে (বৈষ্ণব কাব্যে উল্লিখিত 'প্রেমবৈচিত্ত্য'-পর্বে) পত্রহারী দূতীর প্রয়োজন। সে নায়কের কাছ থেকে চিরোল করে কাটা পাতার গহনা, ফুলের তৈরী মাথার মুকুট আর কানছাবির তোড়ার মধ্যে চুপিসাড়ে নায়কের অভিপ্রায়ের কথা লেখা প্রণয়পত্রটি নিয়ে যাবে নায়িকার কাছে। 'সন্দেশমাত্রং প্রাপয়তীতি পত্রহারী। সা প্রগাঢ়সদ্ভাবয়োঃ সংসৃষ্টয়োশ্চ দেশকালসম্বোধনার্থম্।......পত্রচ্ছেদ্যানি নানাভিপ্রায়াকৃতন দর্শয়েৎ লেখপত্রগর্ভাণি কর্ণপত্রাণ্যাপীড়াংশ্চ। তেষু স্বমনোরথাখ্যাপনম্॥' এখন অনসূয়া-প্রিয়ংবদার কথোপকথনের সূত্র ধরে অভিজ্ঞান শকুন্তলের চিঠি লেখার পশ্চাদ্‌পটটি জানা যাক। তৃতীয় অঙ্কে অনসূয়া বলছে: আচ্ছা, কি করে নিভৃতে ও খুব তাড়াতাড়ি সখী শকুন্তলার মনের কথা (রাজাকে) জানানো যায়। উত্তরে প্রিয়ংবদা বললো: নিরিবিলিতে কি করে হয় তা ভেবে দেখতে হবে, তবে 'তাড়াতাড়িটা সহজেই করা যায়। একটু ভেবে প্রিয়ংবদা আবার বললো: আচ্ছা রাজাকে একটা প্রেমপত্র লিখুক শকুন্তলা। তারপর দেবতার নির্মাল্য নিয়ে যাচ্ছি ছল করে ফুলের মধ্যে লুকিয়ে সেটা নিয়ে যাবো রাজার কাছে। এই শুকের পেটের মতো মোলায়েম পদ্মপাতায় নখ দিয়ে বর্ণবিন্যাস কর্ শকুন্তলা!' অভিজ্ঞান শকুন্তলের পাঠকেরা জানেন, কামসূত্রের বিধানমত প্রিয়ংবদা 'পত্রহারী দূতী, হওয়ার প্রস্তাব রাখলেও শেষ পর্যন্ত কালিদাস অন্যভাবে চিঠিটি উপস্থাপিত করেছেন দুষ্মন্তের কাছে। আর এইখানেই কবি শাস্ত্রাধীনতা থেকে নিজেকে সরিয়ে এনেছেন নতুনত্বের বিস্তারে।

শকুন্তলার চিঠি আর এক দিক থেকেও উল্লেখযোগ্য। লেখার উপকরণ হিসেবে ভারতবর্ষে সাধারণত ভূর্জপাতা, তালপাতা প্রভৃতির ব্যবহার ছিলো প্রথাসিদ্ধ। এবং বিক্রমোর্বশীয় নাটকে কালিদাস যে চিঠির কথা উল্লেখ করেছেন সেটিও ভূর্জপাতায় লেখা। এছাড়া কুমারসম্ভবে (১ম সর্গ, ৭ম শ্লোক) কবি বলেছেন, বিদ্যাধর সুন্দরীরা প্রেমপত্র লিখতে হলে ভূর্জপাতা ব্যবহার করতো। সমগ্র শ্লোকটি এই রকম: ন্যস্তাক্ষরা ধাতুরসেন যত্রভূর্জত্বচঃ কুঞ্জরবিন্দুশোণাঃ।

ব্রজন্তি বিদ্যাধরসুন্দরীণামনঙ্গলেখক্রিয়োপযোগম্॥

অথচ অভিজ্ঞানশকুন্তলেই কবি লেখ্য-উপকরণের ক্ষেত্রেও প্রচলিত রীতি থেকে সরে এসেছেন। তাই শকুন্তলার চিঠি 'সুওদর সুউমারে ণলিনীবত্তে ণহেহিং নিক্খিত্তবণ্ণং'। নলিনীপত্রের উল্লেখে সমস্ত ব্যাপারটির মধ্যে একই সঙ্গে আশ্রমিক স্নিগ্ধতা ও প্রণয়নম্রতার আভাস এনেছেন কবি। কিন্তু শুকপাখির পেটের সঙ্গে তুলনা করেছেন অন্য কারণে। পক্ষিতত্ত্ববিদের মতে, সাধারণত শুকপাখির পায়ের রঙ হয় ঘাসবর্ণ; নয় পাতাসবুজ (৪) সুতরাং নলিনীপত্রের বিশেষণ হিসেবেও শুকপাখির উপস্থাপনা সার্থক। কিন্তু প্রিয়ংবদার প্রস্তাব মানলে ফুলপাতার শ্যামলিমায় বর্ণচোরা হয়ে থাকায় যোগ্যতা কেবল টিয়ারঙী পদ্মপাতারই আছে। তাই চারপাশের

আরণ্যক বর্ণময়তায় হারিয়ে গিয়ে শকুন্তলার প্রণয়পত্রটি কেমন যেন অভিলষিত গোপনীয়তা অর্জন করতে পেরেছে। গোতমীর মেয়েলি চোখও সেটা লক্ষ্য করে নি। আবার মিলনশেষে শকুন্তলা চলে যাবার পর সেই চিঠিই দুষ্মন্তের বিরহব্যথার একান্ত দোসর হয়ে পড়লো: ক্লান্তো মন্মথলেখ এষ নলিনীপত্রে নখৈরর্পিতঃ। (তৃতীয় অঙ্ক, ২৪-শ্লোকাংশ) সুখ নামে শুকপাখির সবুজাভা তখন চিঠির গায়ে ফিকে হয়ে এসেছে।

শকুন্তলার চিঠি স্থির প্রদীপের আলো—নাটকের বিশেষ একটি মুহূর্ত এবং ক'টি চরিত্রকে সংকেতিত করে। কিন্তু বিক্রমোর্বশীয়তে উর্বশীর পত্র বন-জোনাকির আলোকছটা, কেননা এটি নাটকের ক্রমবিবর্তনেরও দোসর। এ নাটকের বিদূষকের ভাষায়, চিঠিটি যেন কোত্থেকে শাপের খোলসের মতো এসে পড়লো। আর তারপর আক্ষরিক অর্থেই বাতাসে উড়তে উড়তে নাট্য কাহিনীর গতিবেগকে উদ্যান থেকে অন্দরে নিয়ে চললো। কিন্তু শকুন্তলার চিঠি মেজাজে যতটা স্বচ্ছ ও সংহত, বিক্রমোর্বশীয়-র প্রেমপত্র ঠিক ততটা নয়। এর রচনাবিন্যাস ও পরিবেশ উভয়েই কেমন যেন দ্রুততার ছাপ রয়ে গিয়েছে। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে স্বর্গের অপ্সরা উর্বশী সহচরী চিত্রলেখাকে নিয়ে প্রতিষ্ঠানের রাজা পুরূরবাকে লুকিয়ে দেখতে এসেছে। রাজা ও বিদূষকের কথার সূত্রে জানতে পেলো রাজা তার প্রতি প্রণয়াসক্ত। এরপরে দৈবীপ্রভাবে ভূর্জপাতা তৈরি করে চিঠি লিখলো উর্বশী (দ্বিতীয় অঙ্ক; ১১শ শ্লোক)। অধিকন্তু, পত্রাবলী-'ঘ' দ্রষ্টব্য।

সামিঅ সংভাবিত আ জহ অহং তুএ অমুণিয়া
তহ অ অণুরত্তস্‌স সুহঅ এ অমেএ তুহ।
ণবরি ন মে ললিঅ পরিআঅসঅণিজ্জম্মি
হোন্তি সুহা ণন্দণবণবাআ বি সিহিব্ব সরীরে॥

হে আমার সর্বস্ব! আমি তোমার মনের কথা বুঝতে পারিনি, একথা তুমি যেমন ভেবেছো আমিও ঠিক তোমার বিষয়ে তেমনটি ভেবেছি।

সেই থেকে পারিজাত ফুলের শয্যায় আমার সুখ নেই। নন্দনকাননের বাতাসেও যেন আগুনের হল্কা লাগছে গায়ে।

বিন্যাস ও আকার উভয় দিক থেকেই চিঠিটি তেমন নিবিড়বদ্ধ নয়। সংস্কৃত কাব্যও নাটকের প্রেমপত্রগুলো সাধারণত উদ্‌গাথাছন্দে রচিত হয়। কিন্তু বিক্রমোর্বশীয়ের এ চিঠিতে ব্যতিক্রম ঘটেছে বলে অনেকে মনে করেন। এর ছন্দোবিষয়ে এইচ ডি বেলঙ্করের মন্তব্য:

The love-letter is generally regarded as consisting of two 'Gathas'; but the internal rythm of the lines shows that the stanza is not a 'Gatha'. (বিক্রমোর্বশীয়ম্ পৃঃ ১১৯)

শকুন্তলার চিঠি যেমন প্রণয়ীসুলভ উৎকণ্ঠায় ভরা হলেও কেমন এক আত্মসমর্পণের সুরে স্পন্দিত। পক্ষান্তরে উর্বশীর চিঠিতে নায়িকার যুক্তিবিন্যাস ও আত্মগর্বের ভাব অপ্রকট নয়। তাই বিক্রমোর্বশীর চিঠি 'প্রাপ্তবয়স্কার' চিঠি। এ অনুমানের আরো কারণ, চিঠি লেখার আগে উর্বশীর সহচরী চিত্রলেখার সঙ্গে এ বিষয়ে কোনো আলোচনা করেনি; যেন নিজেই হোতা নিজেই

উদ্‌গাতা। এমনকি শকুন্তলার মতো চিঠিটি লেখার পর ভয়ে-বিভ্রমে আরেকবার পড়ে দেখার প্রয়োজন অনুভবও করেনি। অবশ্য চিঠির সূত্রেই মনে রাখতে হবে, উর্বশী স্বর্গের রূপ-জীবিনী—পুংশ্চলী—চলার পথে বহু চড়াই উৎড়াই তাকে ভাঙতে হয়েছে। আর শকুন্তলা আবাল্য অরণ্যলালিতা। দুষ্মন্ত তার জীবনে প্রথম পুরুষ, আর তার প্রেম প্রথম কদম ফুল।

"Compare with this, the highly dedicate and artistic situation in the Shakuntala, where the heroine first discusses the problem with her friends. One can easily account for the difference. Shakuntala is an unsophisticated, coy maiden, a child of nature; Urvashi, is a nymph, a heavenly courtesan." (Vikramorvashiyam, p 241-242, ed. by S. B. Athaley & S. S. Bhave) কালিদাসের কাব্যের প্রেমপত্র দুটির মধ্যে একটি আধা বাস্তববাদীর অন্যটি রোমান্টিকের।

নিছক নাট্যবিচারেও বিক্রমমোর্বশীয়ের চিঠির গুরুত্ব কম নয়। উর্বশী ও পুরূরবার গোপন প্রেমকাহিনী রাণী ঔশীনরীর গোচরে আনতে এই লিখিত প্রমাণ ছাড়া অন্য কোনো উপায় ব্যবহৃত হলে সেটা কিছুটা আরোপিত বলে মনে হত। শকুন্তলার চিঠির সার্থকতা দুই হৃদয়ের যোগসূত্রে। তৃতীয় অঙ্কে রাজার দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গেই এর প্রযোজনীয়তার সমাপ্তি। কিন্তু উর্বশীর প্রেমপত্র নায়ক নায়িকার মিলনে সহায়তা করার পর রাজারানীর দাম্পত্য কলহের সূত্রপাতে আপাত-বিয়োগ কাহিনীর সূচনা করে নাটকের আখ্যানভাগে গতি সঞ্চার করে দিয়েছে। সেকস্‌পীঅরের অ্যাজ ইয়ু লাইক ইট-এর (৩য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য) অর্ল্যাণ্ডোর প্রেমপত্রগুলোর তুলনায় তাই কালিদাসের কাব্যের প্রণয়পত্রগুলোর নাট্য-সন্নিধি অনেক গভীরমূল।

আমার মনে হয়, উল্লিখিত পত্রগুলি ছাড়া কালিদাস আরো এককটি প্রেমপত্র লিখেছেন যার সূচনা 'কশ্চিৎকান্তাবিরহগুরুণা…' দিয়ে। বিরহী যক্ষের হৃদয় বেয়ে নেমে আসা এ চিঠির শ্রুতলিপি নিরবধি কালের জন্য ধরে রেখেছেন কবি। যক্ষের 'শ্রোত্রপেয় সন্দেশ' পৌছে দিতে হবে—মানুষ-মানুষী নয়; মেঘ তার 'পত্রহারী দূত'। আর এ চিঠি তার কাছে লেখা যে প্রতীক্ষার অলকায় চিরকাল ধরে একা বসে থাকে।

ব্যবহারিক অর্থে মেঘদূত-কে হয়ত খাঁটি প্রেমপত্র বলা যাবে না। তবে 'প্রেমিক কালিদাসের জীবনছায়া' বলে এ-কাব্যকে স্বীকৃতি দিলে মেঘদূত একটি পত্রকাব্য—যার মূল কথা প্রণয় নামে এক প্রাণশিল্প।

কালিদাসের কাব্যের প্রেমপত্রগুলো সত্যিই মালতীফুল।

পরিশিষ্ট : পত্রাবলী

(ক) ইদানীমনেন প্রতি লিখিতম্। পূজ্যেনাহমাদিষ্টঃ। পিতৃব্যপুত্রো ভবতঃ কুমারো মাধবসেনঃ প্রতিশ্রুতসম্বন্ধো মমোপান্তিকমুপসর্পন্নন্তরা ত্বদীয়েনান্তপালেনাবস্কন্দ্য গৃহীতঃ স ত্বয়া মদপেক্ষয়া সকলত্রসোদর্য্যো মোচয়িতব্য ইতি। এতন্নন্ বো বিদিতং বিদিতং যত্তুল্যাভিজনেষু রাজ্ঞাং বৃত্তিঃ। অতোত্র মধ্যস্থ পূজ্যো ভবিতুমর্হতি। সোদর্য্যা পুনরস্য গ্রহণবিপ্লবে বিনষ্টা। তদন্বেষণায়

ষতিষ্যে। অথবা, অবশ্যমেব মাধবসেনো ময়া পূজ্যেন মোচয়িতব্য :। শ্রূয়তামভিসন্ধিঃ।

মৌর্য-সচিবং বিমুঞ্চতি যদি পূজ্যঃ সংযতং মম শ্যালম্।

মোক্তা মাধব সেনং ততোঽহমপি বন্ধানাৎ সদ্যঃ ॥ —ইতি। (মালবিকাগ্নিমিত্র, রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত। পৃঃ ৩২৯)

(খ) স্বস্তি, যজ্ঞশরণাৎ সেনাপতি, পুষ্পমিত্রো বৈদিশস্থং পুত্রমায়ুষ্মন্তমগ্নিমিত্রং স্নেহাৎ পরিষ্বজ্যানুদর্শয়তি! বিদিতমস্তু—যোঽসৌ রাজযজ্ঞদীক্ষিতেন ময়া রাজপুত্রশত পরিবৃতং বসুমিত্রং গোপ্তারমাদিশ্য বৎসরায় নিবর্ত্তনীয়ো নিরর্গলস্তুরঙ্গকো বিসর্জ্জিতঃ, স সিন্ধোর্দক্ষিণে রোধসি চরন্নশ্বানীকেন যবনেন প্রার্থিতঃ। ততঃ উভয়োঃ সেনয়োর্মহানসীৎ সংমর্দঃ।

ততঃ পরান্ পরাজিত্য বসুমিত্রেন ধন্বিনা।

প্রসহ্য হ্রিয়মাণো মে বাজিরাজো নিবর্ত্তিতঃ ॥

সোঽহমিদানীমংশুমতেব সগর: পৌত্রেণ প্রত্যাহৃতাশ্বো যক্ষে। তদ্ ইদানীমকালহীনং বিগতরোষচেতসা ভবতা বধূজনেন সহ যজ্ঞ সেবনায় আগন্তব্য মিতি। (মালবিকাগ্নিমিত্র, রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত। পৃঃ ৪২২)

(গ) তব ন জানে হৃদয়ং মম পুনর্মর্দনো দিবাপি রাত্রাবপি।

নির্ঘৃণ! তপতি বলীয়স্তুয়ি বৃত্তমনোরথায়া অঙ্গানি ॥

(অভিজ্ঞানশকুন্তল, রমেন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত। পৃঃ ২৬৪)

(ঘ) স্বামিন সম্ভাবিতা যথাহং ত্বয়া অজ্ঞাত্রী

তথা চানুরক্তস্য সুভগ! এবমেব তব।

অনন্তরং ন মে ললিত-পারিজাত-শয়নীয়ে

ভবন্তি সুখা নন্দন-বন-বাতা অপি শিখীব শরীরে ॥

(বিক্রমোবর্শীয়, রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত। পৃঃ ২৪০)

১। অর্থশাস্ত্রের ২য় অধিকরণের ১০ অধ্যায়ে কৌটিল্য প্রতিলেখ-র সংজ্ঞায় বলেছেন—'দৃষ্টা লেখং যথাতত্ত্বং ততঃ প্রত্যনুভাষ্য চ প্রতিলেখো ভবেৎ কার্যো যথা রাজবচস্তথা ॥'

২। এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : (i) A Descriptive Catalogue of Manuscript in Mithila, Vol : II, pp. 12-13 ; ed by K. P. Jayswal & A. Banerji

(ii) Indian Palaeography. pp. 96-97 by R. B. Pandey

(iii) Papers—relating to collection and preservation of records of Ancient Sanskrit Literature in India note by R. L. Mitra ; XVI, 133 ; General Editor—Gough.

৩। 'সন্ধি' সংস্কৃত নাটকের পর্ববিভাগ। পাঁচ রকমের সন্ধির আবার প্রত্যেকের চৌষট্টিটি বিভাগ। এদেরকে 'সন্ধ্যঙ্গ' বলে। 'লেখ' ও 'উপন্যাস' এক একটি সন্ধ্যঙ্গ।

৪। কালিদাসের পাখী, পৃঃ ২৩৯-২৫০ ; সত্যচরণ লাহা।

রমেশচন্দ্র ঃ হিন্দুস্থানের অন্তর্বাণিজ্য ও লুটতরাজ

মুরারি ঘোষ

বহির্বাণিজ্যের সংগে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে আছে অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য। অন্তর্দেশীয় বা অন্তর্বাণিজ্য ক্রমে বৃদ্ধি লাভ করে একদিন স্বদেশের বাইরে অন্য দেশের বাজারে গিয়ে হাজির হয়। অন্তর্বাণিজ্যের প্রেরণায় পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায়— বর্ধিত উৎপাদন স্বদেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশের বাজার আলো করে বসে, যদি বিদেশের বাজারে সেই পণ্যের চাহিদা থাকে। ভারতের কার্পাস বস্ত্র, সিল্ক, চিনি, মসলা এমনি করেই একদা (ইংরেজদের ভারতে আগমনের আগে) বহু যুগ আগে থেকেই এশিয়া আফ্রিকার বাজার দখল করে নিয়েছিল। গ্রামীণ অর্থনীতির স্বল্পায়তন পরিবেশের মধ্যে থেকেও বিস্তৃত অন্তর্বাণিজ্যের উৎকর্ষতার মধ্যে হিন্দুস্থানের জাতীয় অর্থনীতি যে প্রাগ্রসর ছিল তার অভঙ্গুর ঐতিহ্য এখনো বিদ্যমান। সেই ঐতিহ্য ছড়িয়ে রয়েছে আজো ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, সুরাট, আমেদাবাদ, গোয়া, কালিকট, কাসিমবাজার, হুগলী, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, বেনারস এবং আরো নানান শহরে বন্দরে। বহু শতাব্দী ব্যাপী অন্তর্বাণিজ্যের এই সব কেন্দ্র আমাদের সৌভাগ্যের সংগে দুর্ভাগ্যকেও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

অন্তর্বাণিজ্যের এই দুর্ভাগ্যের ইতিহাস লিখেছেন রমেশ দত্ত।

দুর্ভাগ্যর কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে আঠারো শতকের শুরু থেকেই। রমেশচন্দ্র ইতিবৃত্ত শুরু করেছেন পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে—যখন আমাদের অন্তর্বাণিজ্যের প্রায় সবটুকুই নানান কল-কৌশলে ইংরেজদের হাতে চলে আসে।

পথকর ও গোপন বাণিজ্য :

আঠারো শতকে দেশের স্থলপথে জলপথে পণ্য পরিবহনের দরুণ বণিক ও ব্যাপারীদের পথকর দিতে হত। কয়েক শতাব্দী থেকেই এ ব্যবস্থা চলে আসছিল। সম্রাট ফররুখশায়ারের কাছ থেকে ১৭১৭ সালে ইংরেজ বণিকেরা এক সনদ আদায় করে। সেই সনদের আদেশ বলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অন্তর্বাণিজ্যে পথকর রহিত করে দেওয়া হয়। বিক্রয়যোগ্য পণ্যের সংগে কোম্পানীর কোনো কারখানার অধ্যক্ষের স্বাক্ষরিত প্রমাণপত্র ('দস্তক') থাকলে পথের মধ্যে সম্রাটের বা নবাবের কর্মচারীরা কোনো কর নিতে পারবে না—এই ছিল মোগল সম্রাটের আদেশ। এ ব্যবস্থায় কেবলমাত্র কোম্পানীর বাণিজ্যিক পণ্য কর থেকে মুক্তি পেল। দেশী বণিকদের পণ্য এ সুযোগ পায় নি। অন্তর্বাণিজ্যে এই সর্বনেশে সুযোগের পূর্ণ ব্যবস্থা করেছে ইংরেজ বণিকেরা। অহেতুক অসম প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়ে হিন্দুস্থানের বণিকেরা মার খেতে সুরু করলো। ব্যাপারটা ক্রমে আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়ে দাঁড়ায় এবং দেশের পক্ষে সাংঘাতিক হয়ে পড়ে।

এদেশে বাণিজ্যের একচেটে অধিকার নিয়ে ইংলণ্ড থেকে আসে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী। কোম্পানী তার স্বদেশের অপর কোনো বণিককে এদেশে বাণিজ্যের সুযোগ প্রথম দিকে দেয়নি।

যদিও দস্যুবৃত্তি করে কিছু কিছু দুঃসাহসী ইংরেজ বণিক এদেশে বেআইনী বাণিজ্য করে গেছে—তবু সরকারী ভাবে বাণিজ্যের অধিকার ও কর্তৃত্ব বৃটেনবাসীদের কারুর ছিল না—ছিল ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর।

১৭১৩ সাল থেকে কোম্পানী স্বদেশবাসী কোনো কোনো বণিককে এদেশে বাণিজ্যের সুযোগ দিতে থাকে—ঐ সব বণিকদের বলা হত 'ফ্রী মার্চেন্ট'। তথাকথিত এই স্বাধীন বণিকেরা কোম্পানীর ক্রয়যোগ্য পণ্য ভারতের হাটবাজার শিল্পকেন্দ্র থেকে সংগ্রহ করে আনত কিংবা কোম্পানীর আমদানীকৃত পণ্য হিন্দুস্থানের বিভিন্ন বাণিজ্যকেন্দ্রে সরবরাহ করতো। অর্থাৎ, অন্তর্বাণিজ্যের যৎসামান্য সুযোগ এই সব স্বাধীন বণিকদের ছিল—বহির্বাণিজ্যের অধিকার ছিল না (১)। অন্তর্বাণিজ্যের দরুণ পথকর থেকে এদের রেহাই ছিল না, কেননা, এরা কোম্পানীর বাইরে স্বাধীন বণিকগোষ্ঠী। কোম্পানী নিজের লোকজন দিয়ে যে বাণিজ্য চালাতো তার পাশাপাশি এরাও অন্তর্বাণিজ্যের কিছু ভাগ পেয়েছিল পথকর থেকে রেহাই পেয়ে বিশেষ মুনাফার অধিকার একমাত্র ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ছিল।

কোম্পানীর কর্মচারীরা কিন্তু কোনাদিন কোনো সুবাদেই কোম্পানীর বিশেষ অনুগত ছিল না। বিলেতে কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাতে তাদের প্রায় সকলেরই কিছু না কিছু ব্যক্তিগত বাণিজ্যব্যাপার এদেশে ছিল। কোম্পানীর পরোয়ানা যা কেবল কোম্পানীর স্বার্থেই ব্যবহৃত হতে পারে, ব্যক্তিগত বাণিজ্যের প্রয়োজনে কর্মচারীরা তা কাজে লাগাত। কোম্পানীর ছোট বড় সমস্ত কর্মচারী রাইটার থেকে বিভিন্ন ফ্যাক্টরীর কর্মকর্তা—অধ্যক্ষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত ব্যবসার সুযোগ ছাড়ে নি। তাদের ব্যবসার নির্ধারিত নীতি আর লুটতরাজের কায়দা কানুন প্রায় একই ছিল। এ ব্যাপারে বিস্তর অভিযোগ ভারত-ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ আছে এবং সে সব অভিযোগ বিভিন্ন সময়ে এ দেশে কোম্পানীর উচ্চতম কর্মচারীরা বিলেতের কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। প্রশাসনিক কারণে বেআইনী ব্যাপারের বিরুদ্ধতা করলেও কোনোএক সময়ে এঁরা নিজেরাও এই ধরণের নিয়মবিরুদ্ধ কাজের সংগে প্রত্যেকেই যুক্ত ছিলেন। ক্লাইভ, হেষ্টিংস, ভের্লোষ্ট প্রমুখ উচ্চতম কর্মচারীরা ভারতবর্ষে চাকুরী-জীবনের প্রথম যুগে 'ফরচুন' গড়ে তোলার মোহ কাটিয়ে উঠিতে পারেন নি। এ প্রসংগে পরে আমরা আলোচনার সুযোগ পাব।

প্রথম প্রথম স্বাধীন বণিকদের সংগে কোম্পানীর কর্মচারীদের বিরোধ বাধতো। বাধতো কারণ, কোম্পানীর সংগে এক অসম বাণিজ্য প্রতিযোগিতা, তার ওপর কোম্পানীর কর্মচারীদের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পদার্পণ— 'স্বাধীন' বণিকদের প্রায় ভাতে মারার ব্যবস্থা। শেষে একটা রফা হল। বেআইনী ব্যাপার। স্বাধীন বণিকদের সংগে কর্মচারীদের আপোষ। কিছু অর্থ হস্তগত করে কোম্পানীর কর্মচারীরা অধ্যক্ষ স্বাক্ষরিত দস্তক স্বাধীন বণিকদের সরবরাহ করতে লাগলো ব্যপারটা সম্পূর্ণই বেআইনী।

একাজে কোম্পানীর শিল্পকেন্দ্রের অধ্যক্ষ থেকে সুরু করে অধস্তন কর্মচারীদের পাকাপাকি একটা আয়ের ব্যবস্থা ছিল। সুযোগ পেয়ে এদেশের সব সব ইংরেজ বণিকেই দস্তকের ব্যবহার সুরু করে দেয়। পলাশীর যুদ্ধের আগে ব্যাপারটা লুকিয়ে চুরিয়ে চলছিল— পলাশীর যুদ্ধের পর

ইংরেজ বণিকেরা নিজেদের ওজন বুঝে নিলো। নবাব মীরজাফর কোম্পানীর ক্রীড়নক মাত্র। মীরজাফরের সাধ্য কী দস্তকের এই খোলাখুলি অপব্যবহার রোধ করে? ব্যবসা ও ব্যবসার নামে লুটতরাজ এই হল ইংরেজ বণিক অনুসৃত অন্তর্বাণিজ্যের চেহারা। দেশী বণিকেরা ইংরেজদের হাতে ও ভাতে দুভাবেই মরতে সুরু করলো। আর, দস্তকের অপব্যবহারে নবাবের কোষাগারও প্রাপ্য কর থেকে বঞ্চিত হতে লাগলো নবাবের আয় কমলো।

মুর্শিদাবাদে ইংরেজ রেসিডেন্টের কাছে নবাব মৃদু আপত্তি জানালেন। ক্লাইভ তখন চলে গেছেন। মাদ্রাজ থেকে ভ্যান্সিটার্ট এসেছেন কলকাতা কাউনসিলের প্রেসিডেন্ট ও ফোর্টউইলিয়মের গভর্ণর হয়ে। এদিকে নবাব প্রতিমাসে কলকাতার কাউনসিলে একলাখ টাকা দিতে চুক্তিবদ্ধ। ঐ টাকায় কোম্পানী নবাবের হয়ে সেনাবাহিনী পুষবে। নতুন গভর্ণর দেখলেন নবাব ঐ টাকা দিতে পারছেন না। নবাবের কোষাগার শূন্য। একে তো আয় কমেছে তা ছাড়া নবাবী পাওয়ার সময়ে কোষাগার উজার করে লাখ লাখ টাকা ক্লাইভ ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের (২) দিতে হয়েছিল। এখন আবার আয়ও কমেছে। অতএব কাউনসিলের চাপে পড়ে মীরজাফরের পদচ্যুতি ঘটলো।

মীরকাসিমকে বসানো হলো তক্তে। কিন্তু সেই একই সমস্যা। ইংরেজ ব্যবসায়ীরা দেশের অধিকাংশ বাণিজ্য দখল করে নিয়েছে। পণ্য চলাচলের দরুণ পথকর ইংরেজ বণিকেরা দেয় না। প্রাপ্য থেকে নবাব বঞ্চিত হন। মীরকাসিম সহজ মানুষ ছিলেন না। তীব্র প্রতিবাদ জানালেন কলকাতার দপ্তরে। প্রত্যেক জেলায়, গঞ্জে, ইংরেজ কর্মচারী ও তাদের গোমস্তারা জমিদার তালুকদার ও প্রজাবর্গ থেকে নানাভাবে কর আদায় করে। অথচ হাটে বাজারে তাদের পণ্য বিনা করে বিক্রীত হয়। বিক্রয় যোগ্য প্রতিটি পণ্যেই তাদের বাণিজ্য— ধান, চাল, তেল, সুপুরী, মাছ, তামাক, চিনি, আফিম, বাঁশ, খড় কিছুই বাকী নেই। তাদের বাণিজ্য থেকে সরকার কিছুই পান না। দেশী বণিকেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ব্যাপারটায় ভ্যানসিটার্ট মনোযোগ দিলেন। দস্তকের এই অপব্যবহার— দেশী বণিকদের অবলুপ্তি— কর ফাঁকি দেওয়া— এসব বেশ বিরক্তিজনক ঠেকলো। এর প্রতিবিধানে একা কিছু করা তাঁর সাধ্যি নেই। কাউনসিল (শাসন পরিষদ) এর সদস্যদের সম্মতি দরকার। ভ্যাসসিটার্ট সেখানে গিয়েই ঠেকে গেলেন। কাউনসিলের সমস্ত সদস্যই ব্যক্তিগত বাণিজ্যে যুক্ত। কোম্পানীর বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রের সমস্ত কর্মচারীরা একজোট হয়ে গেলো মীরকাসিমের বিরুদ্ধে। তবু ভ্যানসিটার্ট নবাবের সংগে একটা চুক্তিতে (৩) এসেছিলেন। ঠিক হলো কোম্পানীর কর্মচারীরা ব্যবসায়ে নামলে তাদের একটা যৎসামান্য পথকর দিতে হবে— এর পরিমাণ প্রচলিত করের চেয়ে অনেক কম (a rate for below that levied on native traders'—R. C. Dutt) আর দেশী বণিকদের দেয় কর যা ছিল তার পরিবর্তন হবেনা। নবাব রাজী হয়ে গেলেন ভ্যানসিটার্টের প্রস্তাবে। কিন্তু কলকাতার কাউনসিল কোনমতেই এই চুক্তির ব্যাপারটা অনুমোদন করলো না। নবাব তখন বাণিজ্যকরের ব্যাপারটাই রহিত করে দিলেন। আদেশ দিলেন। দেশী বিদেশী কোনো বণিককেই এই বাণিজ্যকর দিতে হইবে না। অমনি কাউনসিল রায় দিলেন, এ ভারী অন্যায়— তাঁরা পথকর দেবেন না বলে দেশী বণিকেরাও দেবে না। হতেই পারে না। মীরকাসিমও

শুনবেন না। অতএব যুদ্ধের প্রস্তুতি ও যুদ্ধ। এ অবস্থায় নিরুপায় ভ্যানসিটার্ট লাটগিরি থেকে পদত্যাগ করে দেশে ফিরে গেলেন। যুদ্ধের শুরুতেই মীরকাসিমকে পদচ্যুত করে মীরজাফরকে ফের নবাব বানানো হয়।

ক্লাইভ ও অন্তর্বাণিজ্যে মনোপলি ঃ

ভ্যানসিটার্ট চলে গেলেন (নভেম্বর ১৭৬৫)। বিলেত থেকে ক্লাইভ আবার ফিরে এলেন শক্ত হাতে কোম্পানীর হাল ধরবেন বলে। ক্লাইভ এলেন কোম্পানীর পরোয়ানা নিয়ে। কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের অধিকার রদের আদেশ ছিল তার সংগে। কিন্তু এসে যা করলেন একেবারে উলটো ব্যাপার। একেতো মীরজাফরের রাজত্ব। ইংরেজদের পোয়াবারো। ক্লাইভ দেখলেন কাউনসিল সদস্য থেকে আরম্ভ করে কোম্পানীর নিম্নতম কর্মচারীরা (এমন কি কোম্পানীর দেশী গোমস্তারাও) সমস্ত দেশময় যার যার বাণিজ্য বিস্তৃত করে রেখেছে। ব্যক্তিগত বাণিজ্য বন্ধ করতে এসে ক্লাইভ তাদের বাণিজ্য অধিকার আইনসঙ্গত করার ব্যবস্থা করলেন।

কোম্পানী কর্মচারীদের নিয়ে ক্লাইভ এক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিলেন (Society for Inland Trade) (৪)। এর অংশীদার হলেন কোম্পানীর বড় বড় কর্মচারীরা। কলকাতার কাউনসিল থেকে এদের অনুমোদন দেওয়া হল বিলেতের অনুমোদন আসার আগেই। প্রতিষ্ঠানটির প্রেসিডেন্ট হলেন ক্লাইভ নিজে। সারা দেশের মধ্যে একমাত্র এই প্রতিষ্ঠানেরই নুন সুপুরী আর তামাকের একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার রইলো।

সোসাইটি তার পণ্যের যে দাম ধার্য করেছিলো তা অত্যন্ত চড়া। বিলেতের কর্তৃপক্ষ এই প্রতিষ্ঠানের কোন অনুমোদন দেয়নি— কিন্তু হিন্দুস্থানে ক্লাইভের অবস্থান পর্যন্ত (১৭৬৭ খৃ) প্রতিষ্ঠানটি অন্তর্বাণিজ্যে একচেটিয়া রাজত্ব করে গেছে।

মীরকাসিমকে সরানো হলো। অথচ মীরকাসিমের তীব্র বিরোধি লর্ড ক্লাইভ মীরকাসিমের বক্তব্যের সুরেই পরে বিবৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন : "Upon my arrival I am sorry, to say, I found your affairs in a condition so nearly desparate as would have alarmed any set of men whose sense of honour and duty to their employes had not been estranged by the two eager parsuit of their own advantage. The sudden, and among many, the unwantable acquisition of riches, *had introduced luxury in every shape and in the most pernicious excess.* These two enormous evils went hand in hand together *through the whole Presideney infecting about every member of each department*,…………Examples of this sort, set by superious could not fail of being followed in propertionable degree by inferious ; *that evil was contagious and spread among the Civil and the Military down to the Writer, the ensign and the free merchants.* (৬)

রমেশ দত্তের রচনা থেকে ক্লাইভের বিবৃতির কিছু অংশ তুলে দেওয়া হল। ব্যাপারটি কত

ব্যাপক ক্লাইভের বিবৃতিতে তা পরিষ্কার। 'Every member of each department'—ক্লাইভের এই স্বীকৃতিটুকু মীরকাসিমের এক যুগ আগের অভিযোগকে সম্পূর্ণ মেনে নিচ্ছে। মীরকাসিম বলেছিলেন : From the factory of Calcutta to Cossimbazar, Patna and Dacca, *all the English chiefs* with their Gomastahs, officers and agents·········*in every District in every Gunge, Pargana and Village* carry on a trade in oil, fish, straw, bamboos, rice paddy, betelnut and other things. (৭)

মীরকাসিমের বক্তব্য ১৭৬২ সালের। এর এগারো বছর বাদে বিলেতের হাউস অব কমন্সের Third Report-এ ক্লাইভের বিবৃতি প্রকাশিত হল। বিলেতে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট উত্যক্ত হয়ে উঠেছেন। কর্মচারীদের 'ফরচুন' গড়ে তোলার চাপে পড়ে কোম্পানীর ব্যবসাই অভাবনীয় ক্ষতিগ্রস্ত হতে চলেছে। যেখানে পরাক্রমশালী কোম্পানীর এই অবস্থা দেশী পাইকার ও বণিকদের ব্যবসার কী গতি হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়।

প্রসঙ্গত আরেকজন ঐতিহাসিকের বিবৃতি এখানে অপ্রাসঙ্গিক নয়—that almost the entire inland trade passed into the hands of the company's servants and their underlings who amassed huge profits (Economic Annal s of Bengal—J. C. Sinha পা-৬৯) এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে, দেশের যাবতীয় অন্তর্বাণিজ্য ইংরেজ কোম্পানীর কর্মচারীদের খাস দখলে চলে গেল।

অন্তর্বাণিজ্য ও লুটতরাজ

শুধু বড় বড় নগরে বন্দরে নয়—সুদূরতম গ্রামে, গঞ্জে, হাটে ফ্রী মার্চেন্ট আর কোম্পানীর কর্মচারীদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। দেশী গোমস্তা আর বেনিয়ান মারফৎ যাবতীয় পণ্যের ক্রয় বিক্রয় চলতো। মীরজাফরের মৃদু আপত্তি, মীরকাসিমের যুদ্ধ, কোম্পানীর নিষেধাজ্ঞা—কোন কিছু দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। আসল কোম্পানীর তোয়াক্কাই যারা করতো না তাদের হাতে এদেশের কী হাল হবে ?

রমেশচন্দ্র সার্জেন্ট ব্রেগোর সাক্ষ্য তুলে দেশী বণিক ও কারিগরদের ওপর অত্যাচারের নমুনা দেখিয়েছেন ৮। সার্জেন্ট ব্রেগোর কিয়দংশ বিবৃতি অনুবাদ করলে দাঁড়ায়—'কোনো এক ভদ্রলোক কোনো পণ্য কেনা কিংবা বেচার জন্য বাজারে গোমস্তা পাঠালেন—স্থানীয় অধিবাসীদের ওপর জোর ফলিয়ে তিনি পণ্য কেনাবেচায় তাদের বাধ্য করলেন, কারুর কোনো আপত্তি থাকলে তার শাস্তি বেত্রাঘাত নয় তো আটক। আর এও যথেষ্ট নয়—বাজারে তার পণ্য থাকলে একই পণ্য অপরে বেচতে পারবে না—অপরের মালও তিনি দখল করে একাই বেচবেন প্রয়োজন মনে করলে বাজারের আরো বিভিন্ন পণ্যে তিনি দখল নেবেন এবং দখল দারীর সময়ে তাঁর ইচ্ছা মত দাম দেবেন কি দেবেন না, আর এই ব্যাপারে আমি বাধা দিতে গেলে কর্তৃপক্ষের কাছে সংগে সংগে মিথ্যে অভিযোগ যাবে।'

আর, কর্তৃপক্ষ কি কোনোদিনও সারজেন্ট ব্রেগোর পক্ষ নেবেন ? কর্তৃপক্ষ তো একই রসের

নাগর। একই স্বার্থের সুতোয় প্রায় সকল কর্মচারীই জড়িয়ে রয়েছেন।

অতএব অন্তর্বাণিজ্য প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্রের আলোচনা থেকে মোটামুটি তিনটে সিদ্ধান্তে আসা যায়:

প্রথমত, কতকগুলি পণ্যে কোম্পানীর মনোপলি ও সেগুলির অন্তর্বাণিজ্যে কোম্পানীর কর্মচারীদের সিংহভাগ।

দ্বিতীয়ত, বিনা শুল্কে বাণিজ্য প্রসার।

তৃতীয়ত, বাণিজ্যের নামে লুটতরাজ ও অত্যাচার।

পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে যাঁরাই এদেশে কোম্পানীর রাজ্যপাটের হাল ধরেছেন তাঁরাই কোনো না কোনো সময়ে এ সবের বিরুদ্ধে বিলেতে কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ জানিয়েছেন ৯।

সমস্ত আঠারোশতক ধরে ভারতের অন্তর্বাণিজ্যের এই চেহারা। পাদটীকায় উল্লিখিত প্রত্যেকের সাক্ষ্য থেকে তা পাওয়া যাবে। বিশেষ করে দুজনের সাক্ষ্য আমাদের আলোচ্য ইতিহাসে যথেষ্ট মূল্যবান।

বুকাননের রিপোর্ট ও কর্ণওয়ালিসের নালিশ

কর্ণওয়ালিস এদেশে আসেন ১৭৮৬ সালে। কোম্পানীর বাণিজ্যের উন্নতি, আয়বৃদ্ধি, অরাজক রাজ্যে শান্তি স্থাপনা—নানান সমস্যার মুখোমুখি হলেন কর্ণওয়ালিস। সবকিছু দেখে শুনে বিলেতে লিখে পাঠালেন "that agriculture and internal commerce has for many years seen gradually declining and that at present *exeepting the class of shroffs and banians......the inhabitants of the provinces were advancing hastily to a general state of poverty and wretchedness*, (১০)

কর্ণওয়ালিস প্রথম বিদেশী যিনি সরকারী ক্ষমতা থেকে আর্থিক ভাগ্যের দ্রুত অবনতি লক্ষ্য করতে পেরেছিলেন, আর এজন্যে যে কোম্পানীর রীতিনীতিই দায়ী আভাসে ইংগিত তা বলতে পেরেছিলেন। ইংরেজ বাণিজ্যের মারাত্মক পরিণতি কী তাঁর রিপোর্টে প্রকাশ পেল।

এদেশের আর্থিক সৌভাগ্যের স্বর্ণসিঁড়ি কি কর্ণওয়ালিসের হাতে? কোম্পানীর তখন পড়তি অবস্থা—শিল্পে, বাণিজ্যে শাসন ব্যবস্থায় অসম্ভব অরাজকতা—তবু সাধ্যমত কোম্পানী ও সরকারের আয় বাড়ানো দরকার। সেদিক দিয়ে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের চেষ্টার কমতি ছিলো না। কর্ণওয়ালিসের পর এলেন ওয়েলেসলী। কর্তৃপক্ষের চাপ তখনো একটুও কমে নি—আয় বাড়ানোর রাস্তা বার করতে হবে। ওয়েলেসলী দেশের আর্থিক অবস্থা দেখেশুনে ফ্রানসিস বুকাননকে দক্ষিণ ভারত পরিদর্শন করে রিপোর্ট দিতে বললেন। রিপোর্টে (১১) দেশের কৃষি ও অন্তর্বাণিজ্যের রিক্ত চেহারা তুলে ধরলেন বুকানন। কোম্পানী ফের তাকে উত্তর বংগ সফরে পাঠালেন। দিনাজপুর ঘুরে বুকানন বাংলা দেশের এক বিস্তৃত অংশের অন্তর্বাণিজ্যের ছবি দিলেন: A great portion of the trade had passed from the hands of the native traders to that of the company. There were no longer any saudagars or great native merchants in the district. (১২)

বড় বড় দেশী বণিক ও সওদাগরের দল লোপাট হয়ে গেছে— বাণিজ্য এখন কোম্পানীর হাতে।

এজেন্সী হাউস ও অন্তর্বাণিজ্য

১৭৯৩ সালের নতুন সনদে বৃটেনের পার্লামেন্ট 'ফ্রী মার্চেন্ট'দের ভারত বাণিজ্যে বাড়তি সুযোগ দেয়। ৩ হাজার টন ওজনের পণ্যে 'ফ্রী মার্চেন্ট' বা বহির্বাণিজের অধিকার পেল। ক্রমে ক্রমে আমদানী রপ্তানীর জন্যে জাহাজী কারবারেও ফ্রী মার্চেন্টদের অধিকার এল— উপরন্তু দেশের মধ্যে অন্তর্বাণিজ্যের ঢালাও সুযোগ তো ছিলই। এই পরিবেশে কোম্পানীর বাণিজ্য ব্যাপারের সহায়করূপে বিদেশী স্বাধীন বণিকেরা এক ধরণের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের জন্ম দেয়। Agency house যখন জন্ম হলো (মোটামুটি আঠারো শতকের শেষ দশকে) দেশী বণিকদের রাজ্য পাট ততদিনে শুকিয়ে এসেছে। কোম্পানীর কর্মচারীদের হাতে অঢেল মুনাফা, অপরিমেয় সম্পদ —এই সব সম্পদ আইনসংগতভাবে স্ফীততর হবার রাস্তা খুঁজছিল— এতদিন যা চলছিল কাগজে কলমে তা নিশ্চিত বে-আইনী। ১৭৯৩ সালের নতুন সনদের কৃপায় এজেন্সী হাউসগুলোর মূলধনের অভাব হয়নি। কোম্পানীর কর্মচারীদের ফুলে ফেঁপে ওঠা সম্পদে ওদের মূলধনের ভাণ্ডার ভরে ওঠে। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, এ দেশে কোম্পানীর এমন কোনো কর্মচারী পাওয়া যেত না যার সংগে কোন না কোন এজেন্সি হাউসের যোগ নেই।

অবশ্য রমেশচন্দ্রের আলোচনায় এদের উল্লেখ নেই। আসলে এরাই ছিল কোম্পানীর পড়তি অবস্থায় দেশের অন্তর্বাণিজ্যে ও বহির্বাণিজ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতিয়ার বিশেষ। কোম্পানীর ব্যবসায়ে এজেন্টরূপে এরা কাজ করেছে। সাম্প্রতিক গবেষণায় (১৩) এজেন্সী হাউসগুলোর বিস্তৃত কর্মপদ্ধতি জানা গেছে। জানা গেছে, কেমন ভাবে সরকারী আইনের ছত্র ছায়ার বসে এই এজেন্সী হাউসগুলো হিন্দুস্থানের ক্ষতি সাধন করে গেছে। চলতি উৎপাদন ব্যবস্থা ও বাণিজ্য মার খেয়েছে কোম্পানী ও কোম্পানীর কর্মচারীদের হাতে। আর ভবিষ্যতের হিন্দুস্থানের স্বাভাবিক আর্থিক প্রগতির ক্ষীণতম সম্ভাবনাটুকু লোপ করেছে এজেন্সি হাউসগুলো সে আর এক বিস্তৃত ইতিহাস।

১। কোম্পানীর জাহাজের অধ্যক্ষদের যৎসামান্য বহির্বাণিজ্যের অধিকার ছিল। সেই অধিকারটুকু এই স্বাধীন বণিকেরা দখল করে নেয়। অধ্যক্ষদের নামে তারাই বাণিজ্য চালাতো— তবে সেই আইনসংগত বাণিজ্যের পরিমাণ কোম্পানীর বাণিজ্য পরিমাণের তুলনায় বেশ কমই ছিল।

২। মীরজাফরের কাছ থেকে ক্লাইভ ১,২৩,৮৫৭৫০ টাকা আদায় করেন মসনদ দেওয়ার সংগে সংগেই। এছাড়া দক্ষিণ ভারতে যুদ্ধের জন্য ইংরেজদের ৫ লাখ টাকা দান করেন মীরজাফর।

৩। ডিক্‌সনারী অব ন্যাশনাল বায়োগ্রাফী : বিংশতি খণ্ড : ভ্যানসিটার্ট।

৪। The Economic History of India—Vol I (Publication Div) পা ২৮

৫—৮। R. C. Dutt. Vol I

৯। হেষ্টিংস, কর্ণওয়ালিস, ভেরেলষ্ট, ভ্যান্সিটার্ট—এঁরা সবাই কোনো না কোনো সময়ে নালিশ জানিয়েছেন—Dutt. Vol I—Inland trade of Bengal অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১০। J. C. Sinha—পা ১৯৬

১১। R. C. Dutt Vol I পা ১৭০—১৬৫

১২। R. C. Dutt Vol I পা ২৫০

১৩। Economic Annals of Bengal—J. C. Sinha

Trade and Finance in the Bengal Presidency—Amalesh Tripathi

European Agency Houses of Bengal—S. B. Singh

বাংলার মন্দির

হিতেশরঞ্জন সান্যাল

রত্নরীতি : পঞ্চরত্ন

একরত্ন মন্দিরে নিম্নাংশের আচ্ছাদনের চারি কোণে চারিটি ক্ষুদ্রতর রত্ন সংযোজন করিলে পঞ্চরত্ন রূপের সৃষ্টি হয়। তাই, একরত্ন ভাবকল্পনার স্বাভাবিক বিস্তৃতি হইতে পঞ্চরত্ন রূপের উদ্ভব, যুক্তিসঙ্গতভাবে এ কথা কল্পনা করিতে বাধা নাই। কিন্তু এই ধারণার স্বপক্ষে উপস্থাপিত করা এমন কোন তথ্য-প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। বস্তুত এখন পর্যন্ত যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় বিষ্ণুপুরের পঞ্চরত্ন রীতিতে নির্মিত শ্যামরাই মন্দিরটিই রত্নমন্দিরের প্রাচীনতম নিদর্শন। ইহার তের বৎসর পরে ঐ একই স্থানে কালাচাঁদের উদ্দেশ্যে সমর্পণের জন্য যে মন্দিরটি নির্মিত হয় তাহাই প্রাচীনতম একরত্ন মন্দির। দেখা যাইতেছে রত্নমন্দিরের ভাবকল্পনা ঠিক কোন রূপটিকে আশ্রয় করিয়া সর্বপ্রথম বিকাশলাভ করিয়াছিল সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ যথেষ্ট। এই কারণেই প্রাচীনতম রত্ন মন্দিরটি পঞ্চরত্ন হওয়া সত্ত্বেও রত্নের বর্ধিত সংখ্যার কথা মনে করিয়া একরত্নের পরে পঞ্চরত্ন মন্দিরের আলোচনা করিতেছি।

একরত্ন মন্দিরের নিম্নাংশের আচ্ছাদনের চারি কোণে চারিটি ক্ষুদ্রতর রত্ন সংযোজন করিলে পঞ্চরত্ন রূপের সৃষ্টি হয়। বৃহত্তর কেন্দ্রিয় রত্নটি সহ পাঁচিশটি রত্নের অবস্থান একই ক্ষেত্রের উপর বলিয়া আসন হইতে রত্নের পাদমূল পর্যন্ত একরত্ন ও পঞ্চরত্ন মন্দিরদেহের আকৃতি একই প্রকারের। তাই মন্দিরদেহ নির্মাণের মূলগত সমস্যা ইহাদের অভিন্ন। পঞ্চরত্ন দেহে পার্শ্ব রত্নগুলির সংযোজনে আর একটি নূতন সমস্যা দেখা দিয়াছে—বৃহত্তর কেন্দ্রীয় রত্নের সহিত পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্রতর রত্নগুলির সম্পর্ক নির্ধারণের সমস্যা, পঞ্চরত্ন মন্দিরের স্থপতির সম্মুখে থাকিতেছে এই দ্বিবিধ সমস্যা সমাধানের প্রশ্ন। পঞ্চরত্নের নির্মাণকৌশল তাই একটু জটিলতর।

এখনপর্যন্ত যে তথ্যপ্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে মনে হয় পঞ্চরত্ন মন্দিরচর্চার সূত্রপাত হইয়াছিল বিষ্ণুপুরের মল্লরাজকুলের পৃষ্ঠপোষকতায়। প্রাচীনতম তিনটি পঞ্চরত্ন মন্দির শ্যামরাই (৯৪৯ মল্লাব্দ, ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দ) এই রাজবংশের আনুকুল্যে নির্মিত হইয়াছিল। ইহাদের প্রথম দুইটির অবস্থান মল্লরাজ্যের রাজধানী বিষ্ণুপুর নগরীতে। গকুলচাঁদের আবাসগৃহ তৃতীয় মন্দিরটি বিষ্ণুপুর হইতে দশ মাইল পূর্বে সলদা গ্রামের অন্তর্ভুক্ত। শুধুমাত্র কালানুক্রমিক সজ্জার দিক দিয়া নহে মন্দির তিনটির দেহ গঠনের মধ্যে সম্পূর্ণ অব্যবস্থিত পর্যায় হইতে ভাবকল্পনার ক্রমবিকাশের স্তর এমন সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে যে পঞ্চরত্ন মন্দিরের আলোচনায় ইহাদের কথাই সর্বাগ্রে বলিয়া নিতে হয়।

শ্যামরাই মন্দিরটির অবস্থান অত্যন্ত নীচু একটি বর্গাকার বেদীর উপর। আসনের আকৃতিও অনুরূপ। আসনের উপরে দেওয়ালের উচ্চতা আসনদৈর্ঘ্যের অর্ধেকের কিছুটা বেশী। দেওয়াল শেষ হইয়াছে চালা মন্দিরের মত নমনীয় বক্ররেখায় বাঁকিয়া। লম্বমান দেওয়ালে পরিবেষ্টিত ক্ষেত্রটির আচ্ছাদন রচনা বক্ররেখ চালার অনুকরণে। আকৃতি ও প্রকৃতিতে তাহা বিষ্ণুপুরের

একরত্ন মন্দিরের নিম্নাংশে যে আচ্ছাদন দেখা যায় তাহারই অনুরূপ। তবে এক্ষেত্রে ঢালটা কিছু বেশী।

সরকারী উদ্যোগে সংস্কারের পূর্বে মন্দিরটির কেন্দ্রীয় রত্নের আচ্ছাদন বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল প্রথমবার জীর্ণসংস্কারের সময় যে পুনর্গঠন তাহার আলোকচিত্র (ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষার কলিকাতাস্থ পূর্বাঞ্চলীয় সদর কার্যালয়ে রক্ষিত) দেখিয়া অনুমান হয় রত্নটির আদি রূপরেখা অনুসরণ করিবার প্রচেষ্টা এক্ষেত্রে হইয়াছিল। পরবর্তী সংস্কারে সংস্কারের সময় রত্নটির আচ্ছাদনের রূপরেখা পরিবর্তিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই পরিবর্তিত রূপটিই এখন দৃষ্টিগোচর। বর্তমান আলোচনায় ওই আলোকচিত্রটিকেই অবলম্বন করিব। পার্শ্বরত্নগুলির মধ্যে অগ্নি কোণেরটি সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ইহার পুনর্গঠন হইয়াছে একেবারে বেদীমূল হইতে। তবে রত্নটির রূপরেখার বিশেষ পরিবর্তন যে হয় নাই অন্যান্য পার্শ্ব রত্নগুলির আকৃতি বিচার করিলেই তাহার প্রমাণ মিলিবে। একটু পরেই এ প্রসঙ্গে আসিতেছি।

নিম্নাংশের আচ্ছাদনের উপর ঊর্ধাংশের পাঁচটি রত্নের সজ্জা। কেন্দ্রীয় রত্নটির অবস্থানক্ষেত্র আচ্ছাদনের স্থানটিতে। কোণে, ঢাল বহিয়া চালা যেখানে নিম্নতম পর্যায়ে আসিয়া থামিয়াছে সেখানে পার্শ্বরত্নগুলির অবস্থান। কেন্দ্রীয় রত্নটির আসন অষ্টকোণাকৃতি—আকৃতিও তাহাই। বিস্তারে ইহা নিম্নাংশের আচ্ছাদনের অর্ধেকের কিছুটা কম। কিন্তু উচ্চতায় নিজস্ব আসন দৈর্ঘ্য অপেক্ষা হ্রস্বতর। পার্শ্বরত্নগুলির আসন সুউচ্চ বেদীর উপর। বেদীগুলির উচ্চতা চালা আচ্ছাদনের সর্বোচ্চ বিন্দুর অনেক উপরে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় রত্ন অপেক্ষা উচ্চতর ক্ষেত্র হইতে পার্শ্বরত্নের উদ্গমন। উচ্চতায় ইহারা কেন্দ্রীয় রত্নটির প্রায় সমান। পার্শ্বরত্নগুলির আচ্ছাদনে দুই প্রকার রূপরেখা দৃষ্টিগোচর। বায়ু ও ঈশান কোণের রত্নদ্বার কার্ণিশ সোজা, আচ্ছাদনের আকৃতি খাড়া ঢালের চারচালার মত। নৈঋত কোণের রত্নটি বক্ররেখ চার চালায় আবৃত। অগ্নি কোণের পুনর্গঠিত রত্নটিতে এই রূপেরই পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে।

শ্যামরাই মন্দিরের দেহ সংগঠন সম্পর্কে একটু ভাবিলেই সংগঠিত পরিকল্পনার অভাব স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। ঊর্ধাংশ ও নিম্নাংশের কল্পনা হইয়াছে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে। আচ্ছাদন উচ্চায়ত হওয়াতে নিম্নাংশটিকে বাহির হইতে স্বয়ং সম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয়। উপরে যে পঞ্চরত্ন ঊর্ধাংশ রহিয়াছে তাহার সহিত ইহার কোনরূপ যোগসূত্র স্থাপনের সম্ভাবনা থাকিতেছে না।

ঊর্ধাংশে দেখিতেছি কেন্দ্রীয় রত্নটির আসন বিস্তারের মধ্যে উচ্চতা অর্জনের যে সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহার সদ্ব্যবহার হয় নাই। পার্শ্বরত্নগুলির ঊর্ধবিস্তারের মধ্যেও তো উচ্চতর কেন্দ্রীয় রত্নের ইঙ্গিত। প্রসার ও উচ্চতার মধ্যে ভারসাম্যের অভাবে কেন্দ্রীয় রত্নটি হইয়া উঠিয়াছে স্থূল ও খর্বাকার। পার্শ্বরত্নগুলির প্রতি তাকাইলে সর্বাগ্রে চোখে পড়ে তাহাদের সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র সম্ভাবনা। সুউচ্চ বেদী হইতে ইহাদের যে স্বাতন্ত্রের সূত্রপাত তাহা রূপলাভ করিয়াছে আচ্ছাদনের পারস্পরিক বৈষম্যে। উপরন্তু নিম্নাংশের আচ্ছাদনের ঢাল বাহিয়া কেন্দ্রীয় রত্ন হইতে ইহাদের ব্যাবধান পর্যাপ্ত। উচ্চতায় ইহারা কেন্দ্রীয় রত্নের প্রায় সমকক্ষ। পঞ্চরত্ন সংগঠনে রত্নগুলির মধ্যে যে পারস্পরিক ভাবগত বন্ধন কেন্দ্রীয় রত্নের প্রাধান্য প্রভাবে বিকশিত হইয়া উঠা প্রয়োজন তাহার সামান্যতম ইঙ্গিতও খুঁজিয়া পাওয়া ভার।

বিচ্ছিন্ন অঙ্গের শিথিল সমবায়ে গঠিত মন্দিরদেহে নিম্নাংশের সহিত উর্ধাংশের সুষ্ঠু আনুপাতিক সম্পর্ক বা ভাবগত বন্ধন গড়িয়া উঠে নাই। আসনবিস্তারের পরিপ্রেক্ষিতে মন্দিরদেহের মোট উচ্চতা সম্পর্কে খর্বাকার নিম্নাংশ যে ইঙ্গিত বহন করিতেছে কেন্দ্রীয় রত্নের মধ্যে তাহা উপেক্ষিত। অর্থাৎ মন্দিরের আসন দেখিয়া তাহার উচ্চতা সম্পর্কে যে ধারণা হয় প্রকৃত উচ্চতা তাহার অনেক নীচে পড়িয়া রহিয়াছে। এই অপূর্ণতার সহিত স্বয়ংসম্পূর্ণ নিম্নাংশ ও উর্ধাংশের শিথিল রত্নসমবায় একত্র করিয়া দেখিলে মনে হইবে পঞ্চরত্ন মন্দির নির্মাণ সম্পর্কে স্থপতির কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। একটা অস্পষ্ট ধারণাই ছিল তাহার অবলম্বন।

শ্যামরাই মন্দিরের অস্ফুট রূপরেখা সংহত হইয়া উঠিল মাকরা পাথরে নির্মিত মদনগোপাল গোকুলচাঁদ মন্দিরদ্বয়ে। মদনগোপালের মন্দিরের ভিত্তি অধিষ্ঠান শ্যামরাই অপেক্ষা অনেক উঁচু। দেওয়ালও উচ্চতর করিয়া গড়া। আসনদৈর্ঘ্যের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ পর্যন্ত ইহার উর্ধবিস্তার। দেওয়ালের উপরিভাগ বাঁকান কিন্তু বক্রতা সামান্যই। উপরে নিম্নশায়ী চালা আচ্ছাদনের আবরণ। আচ্ছাদনটির প্রান্ত বাহিয়া চারিদিক ঘুরিয়া আসিয়াছে একটি স্বল্পোচ্চোপত্রাকৃতি মোটিফের আবেষ্টনী। দেওয়াল ও এই আবেষ্টনী মিলিয়া দীর্ঘায়ত দেহের যে সম্ভাবনা সৃষ্টি করিয়াছে ভিত্তি অধিষ্ঠানটির প্রভাবে তাহা হইয়া উঠিয়াছে আরও অর্থপূর্ণ। কিন্তু দীর্ঘায়ত দেহের সম্ভাবনা উর্ধাংশের মধ্য দিয়া রূপলাভ করিতে পারে নাই। কেন্দ্রীয় রত্নটির উচ্চতা দেওয়াল অপেক্ষা কিছুটা কমই। ফলে, মন্দিরদেহ সংগঠনে নিম্নাংশের প্রাধান্যটাই বড় হইয়া চোখে পড়ে।

নিম্নাংশ প্রধান্য লাভ করিয়াছে বটে কিন্তু শ্যামরাই মন্দিরের মত ইহার স্বয়ং সম্পূর্ণতা সুস্পষ্ট-রূপে প্রতিভাত হইয়া উঠিতে পারে নাই। ইহার আচ্ছাদন রচিত হইয়াছে অত্যন্ত নীচু ঢালের উপর। চারিপাশে উচ্চতর আবেষ্টনী থাকিবার ফলে আচ্ছাদনের সর্বোচ্চ ক্ষেত্রটিও বাহির হইতে দৃষ্টিগোচর নহে। একই কারণে রত্নগুলির প্রারম্ভক্ষেত্রগুলিও দৃষ্টিপথের বাহিরে থাকিয়া যাইতেছে। নিম্নাংশের নিম্নশায়িত আচ্ছাদন ও তাহার উচ্চতর আবেষ্টনী রত্ন মন্দিরের মূলগত কৃত্রিমতার উপর একটি আবরণ টানিয়া দিয়া উভয় অংশকে খানিকটা একত্রবদ্ধ করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে।

উর্ধাংশে কেন্দ্রীয় রত্নটির আসন ও আকৃতি অষ্টকোণাকৃতি। পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তের মত নিম্নাংশের আচ্ছাদনের অর্ধেক জুড়িয়া ইহার প্রসার। রত্নটির উচ্চতা কিন্তু ইহার আসন দৈর্ঘ্য অপেক্ষা সামান্যই বেশি। ফলে ইহার আকৃতি হইয়া উঠিয়াছে খর্ব, দেহ গুরুভার। অনুচ্চ আকৃতি লইয়া কেন্দ্রীয় রত্ন দীর্ঘায়ত নিম্নাংশের উপযোগী হইয়া উঠিতে পারে নাই বটে, কিন্তু রত্ন সংগঠনের মধ্যে দেখিতেছি কিছুটা প্রাধান্য বিস্তার করিতে পারিয়াছে। এই উদ্দেশ্যেই বোধ করি পার্শ্বরত্নগুলির দেহ ক্ষুদ্রায়ত, ভিত্তি বেদী নিম্নশায়িত। নিম্নাংশের স্বল্পোচ্চ আচ্ছাদনও এই উদ্দেশ্যে কিছুটা কাজে লাগিয়াছে। ইহার ঢাল কম বলিয়া রত্নগুলির পারস্পরিক ব্যাবধান শ্যামরাই মন্দিরের মত প্রকট হইয়া উঠিতে পারে নাই। ভাবগত পর্যায়ে এই ব্যবধান আরও সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে রত্নগুলির আচ্ছাদনের রূপরেখায়। পার্শ্বরত্নগুলির কার্ণিস সোজা, আচ্ছাদন খাড়া ঢালের উপর গঠিত চারচালায়। অষ্টকোণাকৃতি কেন্দ্রীয়রত্নের আটপল চালা আচ্ছাদনও খাড়াঢাল বাহিয়া। রত্ন

সংগঠনের এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য সংহত রূপরেখা সৃষ্টি করিবার প্রয়াস হইতে জাত।

মদনগোপাল মন্দিরে নিম্নাংশ ও উর্ধাংশের মধ্যে সুষ্ঠুআনুপাতিক সম্পর্ক ও ভাবগত বন্ধন সৃষ্টি হয় নাই বটে, কিন্তু সংগঠন সংহত করিয়া তুলিবার ও মন্দিরদেহের উভয় অংশকে একত্রবদ্ধ করিয়া অখণ্ড রূপরেখা রচনা করিবার যে প্রয়াস স্থপতি করিয়াছেন পঞ্চরত্ন ভাবকল্পনার বিবর্তন পথে তাহা নিঃসংশয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

সলদা গ্রামের গকুলচাঁদ মন্দিরের দেওয়ালের উচ্চতা আসন দৈর্ঘ্যের ঠিক অর্ধেক। উপরে নিম্নশায়িত বেদীর উপর পাঁচটি রত্ন। কেন্দ্রীয় রত্ন আসন ও আকারে পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তগুলির মত অষ্টকোণাকৃতি। কিন্তু উর্ধবিস্তারে ইহা দেওয়ালের উচ্চতা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। পার্শ্বরত্নগুলির রূপরেখা মদনগোপালের অনুরূপ।

উপরে মন্দিরদেহের যে বর্ণনা করিলাম তাহা একটু বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে মন্দিরটির নির্মাণ একটি সুনির্দিষ্ট বিন্যাস পরিকল্পনা অনুসারে। কেন্দ্রীয় রত্নটি এখানে মন্দিরদেহের আসন বিস্তার ও উচ্চতার মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টির প্রধান মাধ্যম। নিম্নাংশের আচ্ছাদনের কেন্দ্রীয় রত্ন যতটুকু স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে—তাহার উপরে থাকিয়া কেন্দ্রীয় রত্ন সামঞ্জস্যের সহিত কতটা উচ্চতা অর্জন করিতে পারে সেকথা কল্পনা করিয়াই বোধ করি দেওয়াল আসন দৈর্ঘ্যের অর্ধেক সীমায় আবদ্ধ এবং মন্দিরদেহে ভারসাম্য সৃষ্টির জন্য কেন্দ্রীয় রত্নের উপর অধিকতর নির্ভরতা। দেওয়ালের এই সীমিত উচ্চতায় কেন্দ্রীয় রত্নের উচ্চতা সম্পর্কে যে ইঙ্গিত ছিল রত্নটির দেহে তাহা কিয়দংশে রূপলাভ করিয়াছে সত্য। উর্ধাংশ ও নিম্নাংশের মধ্যে ভাবগত বন্ধনের সূত্রপাতও এখানেই ঠিক এই প্রকারের অঙ্গবিন্যাসের মাধ্যমে রূপোপলব্ধির প্রয়াস বিষ্ণুপুরের একরত্ন মন্দিরে দেখিয়া আসিয়াছি।

মন্দিরদেহের উভয় অংশের ভাবগত বন্ধনকে দৃঢ়তর করিয়াছে পঞ্চরত্ন উর্ধাংশের সংহত রূপরেখা। রত্নসমষ্টির মধ্যে কেন্দ্রীয় রত্ন প্রসার ও উচ্চতা উভয়তঃই পার্শ্বরত্নগুলি অপেক্ষা বৃহত্তর—রত্ন সংগঠনে তাহার প্রাধান্যও অবিসম্বাদিত। পার্শ্ব রত্নগুলির প্রসার কেন্দ্রীয় রত্নের প্রায় অর্ধেক উচ্চতায় ইহারা কেন্দ্রীয় রত্নের দুই তৃতীয়াংশ পর্যন্ত উঠিয়াছে। তাই ক্ষুদ্রতর হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের অস্তিত্বের প্রভাব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সমবেত ভাবে তাহারা কেন্দ্রীয় রত্নের চারদিকে যে স্তর রচনা করিয়াছে তাহাকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছে বলিয়াই কেন্দ্রীয় রত্নের প্রাধান্যগৌরব। মদনগোপাল মন্দিরেও কেন্দ্রীয় রত্নের প্রাধান্য কিছুটা ছিল কিন্তু ক্ষুদ্রায়ত পার্শ্বরত্ন সেখানে অস্তিত্বের কোন সুস্পষ্ট প্রভাব রাখিতে পারে নাই। স্বাতন্ত্র্য সম্ভাবনা লোপ করিবার উদ্দেশ্যে পার্শ্বরত্নগুলিকে এতটাই সংকীর্ণ করিয়া তোলা হইয়াছিল।

সুস্পষ্ট সাফল্য সত্ত্বেও গোকুলচাঁদ মন্দিরে কিছুটা পরিমাণে দ্বিধা-সংকোচ কিন্তু থাকিয়াই গিয়াছে। নিম্নাশ ও উর্ধাংশের যোগসূত্র রচনা করিবার জন্য নিম্নাংশের আচ্ছাদন মদনগোপালের মত নীচু চালের উপরে রাখা। কেন্দ্রীয় রত্নটি ও তাহার অনুসঙ্গে পার্শ্বরত্নগুলি পরিপূর্ণ উচ্চতা অর্জন করিতে পারে নাই। আসন ও উচ্চতার মধ্যে ভারসাম্যের অভাবে মন্দিরদেহ তাই খর্বাকার।

গোকুলচাঁদ মন্দিরের অঙ্গবিন্যাস বিষ্ণুপুরের একরত্ন মন্দিরের বিবর্তন ধারার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। ক্রমাগত চর্চার ফলে একরত্ন মন্দিরের বিবর্তন ধারা বিষ্ণুপুরে আরও অনেক দূর পর্যন্ত বহিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু মল্লরাজকুলের আনুকুল্যে পঞ্চরত্ন মন্দিরের ইহাই শেষতম উদাহরণ। গোকুলচাঁদ মন্দিরে যে অসম্পূর্ণতা দৃষ্টিগোচর বিষ্ণুপুরের স্থপতিবৃন্দ তাহাকে পূর্ণ করিয়া তুলিবার অবকাশ পান নাই।

বিষ্ণুপুরে পঞ্চরত্ন মন্দির নির্মাণ আর না হইলেও মল্ল স্থপতিদের উদ্ভূত রূপলেখা অবলম্বন করিয়া পঞ্চরত্ন মন্দির চর্চা বিষ্ণুপুরের বাহিরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। মেদিনীপুর জেলার রাধানগর গ্রামের ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে মাকরা পাথরে নির্মিত রঘুনাথ মন্দিরটির দেওয়াল উচ্চতায় আসন দৈর্ঘ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া আরও একটু উঠিয়া গিয়াছে। কেন্দ্রীয় রত্নটির উচ্চতা দেয়াল হইতে কিছুটা বেশী। প্রসারে ইহা নিম্নাংশের আচ্ছাদনের অর্ধেকের বেশী ক্ষেত্র অধিকার করিয়া বিরাজমান। স্বভাবতই কেন্দ্রীয় রত্নের দেহে তাহার উচ্চতা সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ ঘটে নাই। সামগ্রিকভাবে মন্দিরটাও তাই খর্বাকৃতি। পার্শ্বরত্নগুলি প্রসারে কেন্দ্রীয় রত্নের এক তৃতীয়াংশ উচ্চতায় অর্ধেকেরও কম।

অঙ্গবিন্যাসে অসঙ্গতি স্বত্বেও মন্দিরদেহে অখণ্ড রূপরেখার আভাস যে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে রূপকল্পনার কতকগুলি নবতর বৈশিষ্টের প্রভাব। একটি ঢালু ছাজা। উদ্গত ছাজাটি দেওয়ালের উর্ধপ্রান্তবাহী নিরবচ্ছিন্ন আবরণ। পরিণাম প্রভাবে দেওয়ালের প্রকৃত উচ্চতা যে ইহার প্রভাবে কিয়দংশে ক্ষুন্ন হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, অর্থাৎ দেয়ালটিকে তাহার প্রকৃত উচ্চতা অপেক্ষা হ্রস্বতর বলিয়া মনে হয়। উর্ধাংশে রত্নগুলির আসন ও দেহ শিখর রীতি অনুসারে হইলেও আচ্ছাদন রচনা হইয়াছে দীর্ঘায়ত চারচালর বক্ররেখায়। কেন্দ্রীয় রত্নের দীর্ঘায়ত আচ্ছাদন তাহার দেহগত উচ্চতার প্রভাবকে আরও স্পষ্টতর ও কার্যকর করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে। খর্বাকৃতি নিম্নাংশের উপর উচ্চতর কেন্দ্রীয় রত্ন রচনা করিয়া রূপোপলব্ধির যে প্রচেষ্টা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করিয়াছি রাধানগরের রঘুনাথ মন্দিরে দেহগত পর্যায়ে তাহাকে পূর্ণাঙ্গ না করিয়া রূপকল্পনার অভিনবত্বের মাধ্যমে পরিণাম প্রভাবে উপলব্ধি করিবার প্রয়াস মন্দিরটিকে বিশিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। রূপগত পর্যায়ে এই ভাববন্ধন আরও নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে ছাজা ও রত্নের আচ্ছাদনের সমগোত্রীয় বক্ররেখার প্রভাবে।

চন্দ্রকোনা শহরের (মেদিনীপুর জেলা) মল্লেশ্বর শিব মন্দিরে অঙ্গবিন্যাস প্রায় রঘুনাথ মন্দিরের অনুরূপ। আসনদৈর্ঘ্যের সহিত দেওয়াল ও দেওয়ালের সহিত কেন্দ্রীয় রত্নের উচ্চতা সংক্রান্ত আনুপাতিক সম্পর্কে কোন পরিবর্তন হয় নাই। তবে মন্দিরটিতে রত্নের আকৃতি রচনা ও রত্ন সংগঠন হইয়াছে স্বতন্ত্র ভাবে। রত্নগুলির যোগচিহ্নীকৃতে রথকাসন হইতে চূড়াভাগ পর্যন্ত সবটাই শিখররীতির স্মৃতি অবশেষ। রত্নগুলির বিশেষ করিয়া কেন্দ্রীয় রত্নটির রূপরেখা বিষ্ণুপুরের একরত্ন মুরারীমোহন মন্দিরের ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে রত্নটির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সাদৃশ্যযুক্ত। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি অধিকাংশ পঞ্চরত্ন মন্দিরে রত্ন রচনা হইয়াছে শিখর রীতিতে। চালা রত্নের দৃষ্টান্ত একরত্ন মন্দিরের মত পঞ্চরত্ন মন্দিরেও অতিশয় সীমিত সংখ্যক।

নিম্নাংশের আচ্ছাদনের অর্ধেকের কিছুটা কম ক্ষেত্র বৃহত্তর কেন্দ্রীয় রত্নটির অধিকারে। আসনের এই বিস্তারে শিখর রত্নের যে উচ্চতা সম্ভাবনা সৃষ্ট হয় বর্তমান ক্ষেত্রে তাহা অনুপলব্ধ। উপরন্তু রত্নটির দেহস্থুল, আচ্ছাদন গম্বুজাকৃতি—প্রথমাবধিই বাঁকিয়া গিয়া অর্ধবৃত্তের গতিপথ অবলম্বন করিয়াছে। একে তো সীমিত উচ্চতায় রত্নটি হইয়া উঠিয়াছে খর্ব ও গুরুভার। তাহার উপরে। গম্ভীর গম্বুজাকৃতি প্রভাবে ইহাকে আরও খর্ব বলিয়া মনে হয়। নিম্নাংশের উপর খর্বাকৃতির গুরুভারটাই বড় হইয়া দেখা দেয়। মন্দিরদেহের সঙ্গতির অভাব ঘটিয়াছে এই কারণেই।

বিস্তৃত আয়তন কেন্দ্রীয় রত্নের অধিকৃত ক্ষেত্রের বাহিরে যেটুকু স্থান অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহার উপর থাকিয়া পার্শ্বরত্নগুলি প্রসারে কেন্দ্রীয় রত্নের অর্ধাংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। উচ্চতাও তাহাদের কেন্দ্রীয় রত্নের অর্ধেক। রত্ন সংগঠনের এইরূপ বিন্যাসে কেন্দ্রীয় রত্নের প্রাধান্য সর্বাত্মক উঠিবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় রত্নের গুরুভার পার্শ্বরত্নগুলির অস্তিত্ব প্রভাবকে কিয়দংশে ক্ষুণ্ন করিয়া ফেলিতে সমর্থ হইয়াছে।

বালী ও দেওয়ানগঞ্জ গ্রামের দালাল পাড়াস্থ লক্ষ্মীজনার্দন মন্দিরে (১৭:৬ খৃষ্টাব্দ) আসন ও দেওয়ালের আনুপাতিক সম্পর্ক মল্লেশ্বর মন্দিরের অনুরূপ কিন্তু রত্নদেওয়াল অপেক্ষা হ্রস্বতর—প্রকৃতপক্ষে আসনদৈর্ঘের অর্ধেকের সমান। রত্নটির আসন নিম্নাংশের আচ্ছাদনের অর্ধেকের কিছুটা কম ক্ষেত্র জুড়িয়া। ইহার উপরে যে উচ্চতা দেখিতেছি তাহা যেমন রত্নদেহের অসম্পূর্ণতার পরিচায়ক হ্রস্বাকৃতি দেওয়ালের-উপর তেমনই অসঙ্গত। পার্শ্ব রত্নগুলির একটিও আর অবশিষ্ট নাই। তবে নিম্নাংশের আচ্ছাদনের উপর কেন্দ্রীয় রত্নের আসন বিস্তার দেখিয়া মনে হয় পার্শ্বরত্নগুলিকে অন্তত প্রসারে সুসমঞ্জস করিয়া গড়িবার সুযোগ ছিল। খর্বতা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় রত্নটি গুরুভার নহে বলিয়া পার্শ্ব রত্নগুলির গুরত্বহ্রাসের সম্ভাবনাও কম।

যশোহর জেলার (পূর্ব পাকিস্তান) নলডাঙ্গা গ্রামে একটি ভগ্নদশাপন্ন পঞ্চরত্ন মন্দিরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। মন্দিরটির চাল নাই, চূড়া নাই, পার্শ্বরত্নগুলি ভাঙিয়া পড়িয়াছে, দেওয়ালগুলিও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। যেটুকু এখনও দাঁড়াইয়া আছে তাহা দেখিলে মনে হয় দেওয়াল সম্ভবত আসনদৈর্ঘের অর্ধেক সীমাতেই আবদ্ধ। নিম্নাংশের আচ্ছাদনের উপরে অষ্টকোণাকৃতি কেন্দ্রীয় রত্ন চন্দ্রকোণা ও বালী-দেওয়ানগঞ্জ মন্দিরের অনুরূপ ক্ষেত্র লইয়া বিদ্যমান, উচ্চতায় রত্নটি দেওয়াল অপেক্ষা অনেক বেশী। খর্বদেহ নিম্নাংশের উপর থাকিয়া মন্দিরের আসন ও উচ্চতার মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করিবার জন্য যতটা উচ্চ হওয়া প্রয়োজন উর্ধ বিস্তারে কেন্দ্রীয় রত্ন সেই সীমা স্পর্শ করিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হয়। মন্দিরটির দেওয়াল ও রত্নের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষ্ণুপুরের সমুন্নত একরত্ন মন্দিরগুলির একান্ত অনুরূপ। অষ্টকোণাকৃতি রত্নটির আচ্ছাদন চালারীতিতে নির্মিত। উর্ধাংশ নিম্নাংশের ভাবগত বন্ধন চালা আচ্ছাদনের বক্ররেখা নিঃসন্দেহে নিবিড় করিয়া তুলিয়াছে।

বিষ্ণুপুরের শ্যামরাই মন্দির হইতে নলডাঙার মন্দিরটি পর্যন্ত বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মাধ্যমে পঞ্চরত্নদেহের সুসমঞ্জস অঙ্গবিন্যাসে রূপময়তার যে সন্ধান চলিতেছিল তাহারই সাক্ষাৎ পাইতেছি রাজসাহী জেলার পূর্ব (পাকিস্তান) পুঁটিয়া গ্রামের গোবিন্দ মন্দিরে। পুঁটিয়ার রাজপরিবারের আনুকুল্যে নির্মিত মন্দিরটির কোন প্রতিষ্ঠালিপি নাই। তবে ইহার পোড়ামাটির অলঙ্করণ শৈলী

দেখিয়া মনে হয় সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছিল।

পূর্ববর্তী সবগুলি মন্দিরের মত গোবিন্দমন্দিরের আসন চতুরস্র। আসন অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছে চতুরস্র দেওয়াল। উচ্চতায় ইহা আসনদৈর্ঘ্যের অর্ধেক। দেওয়ালের উর্ধপ্রান্ত চালা মন্দিরের স্মৃতিতে অতি মৃদু বক্ররেখায় বাঁকিয়া গিয়াছে। কার্ণিসের বক্র রেখাতেও একই গতিভংগির পুনরাবৃত্তি।

দেওয়ালের খর্বদেহে যে সম্ভাবনার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার পরিপূর্ণ রূপায়ন দেখিতেছি চারচালা রত্ন সম্বলিত উর্ধাংশটির মধ্যে। উর্ধ বিস্তারে কেন্দ্রীয় রত্ন দেওয়ালের উচ্চতা অতিক্রম করিয়া অনেকটাই উঠিয়া গিয়াছে। নিম্নাংশের সহিত ইহার সম্পর্ক নলডাঙ্গা মন্দিরের মত; সার্থকও হইয়া উঠিয়াছে একই উপায়ে।

পঞ্চরত্ন উর্ধাংশে রত্নগুলির রূপরেখায় কোন প্রভেদ নাই। বর্গাকার আচ্ছাদনের উপর মলুটির মতন দীর্ঘায়ত চারচালা আচ্ছাদন সম্বলিত কক্ষ। নিম্নশায়িত বেদীর উপর পার্শ্বরত্নগুলি প্রসারে কেন্দ্রীয় রত্নের অর্ধেক, উচ্চতায় তাহার দুই তৃতীয়াংশ। পার্শ্বরত্নগুলির প্রত্যেকটিতেই আসন-দৈর্ঘের সমান করিয়া দেওয়াল ও আচ্ছাদন গঠিত। কেন্দ্রীয় রত্নটিতে আনুপাতিক সম্পর্ক ভিন্নতর। দেয়ালের উচ্চতা আসনদৈর্ঘ্যের কম কিন্তু আচ্ছাদন আসনদৈর্ঘ্যের সমান। দেওয়াল আসনদৈর্ঘ্য অপেক্ষা হ্রস্ব হওয়াতে কেন্দ্রীয় রত্নটির দেহে ভারসাম্যের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে।

দেহগত পরিমাপের দিক দিয়া কেন্দ্রীয় রত্ন পার্শ্বরত্নগুলির তুলনায় বৃহত্তর বটে কিন্তু উর্ধাংশের দিকে চাহিলে তাহার বৃহত্তর আকৃতির কোন বিশেষ প্রভাব পৃথকভাবে অনুভব করা যায় না। বস্তুত পঞ্চরত্ন ভাবকল্পনা লইয়া যে রূপলেখা সৃষ্টি করা হইয়াছে প্রকৃতপক্ষে তাহা একটি ডিজাইন—পাঁচটি রত্ন তাহারই বন্ধনে বিধৃত। রত্নগুলি তাহাদের সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়া এই ডিজাইনের মধ্যে এমনভাবে অংগীভূত হইয়া গিয়াছে যে দেখিলে মনে হইবে ইহাদের আকৃতি নির্ধারণ ডিজাইনেরই প্রয়োজনে। নিম্নাংশে চারিটি দেওয়ালকে সম্পূর্ণ আহত করিয়া যে সুবিস্তৃত পোড়ামাটির অলংকরণ রহিয়াছে তাহারও মূল প্রেরণা ডিজাইন সৃষ্টির আকাঙ্খা। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে ডিজাইনের এই প্রভাব যেমন মন্দিরদেহের রূপময় আবরণ। পরিণাম প্রভাবে ইহার অবদান সামান্য নহে।

খর্বাকৃতি দেওয়ালের ইংগিতকে রূপদান করিয়া দীর্ঘায়ত কেন্দ্রীয় রত্ন মন্দিরদেহে ভারসাম্য সৃষ্টি করিয়াছে, অঙ্গবিন্যাস আলোচনা করিবার সময় একথা বলিয়া আসিয়াছি। পঞ্চরত্ন দেহের মূলগত কৃত্রিমতা অতিক্রম করিয়া নিম্নাংশ ও উর্ধাংশের মধ্যে ভাবগত বন্ধনের সূত্রপাত এইখানেই এই বন্ধনকে দৃঢ়তর করিয়াছে রত্নদেহের রূপরেখা। উর্ধাংশের মাধ্যমে মন্দিরদেহের যে উচ্চতা রূপলাভ করিতেছে চালারত্নের দীর্ঘায়ত আচ্ছাদন সেই উচ্চতা-সম্ভাবনাকে করিয়া তুলিয়াছে আরও পরিস্ফুট। আর একদিকে নিম্নাংশের উর্ধপ্রান্তবাহী চালার বক্ররেখার সহিত চালা রত্নের রেখা প্রবাহের ঘনিষ্ঠ গোত্রবন্ধন। ইহাদের মিলনে মিশ্রণে সৃষ্ট অখণ্ড রূপরেখাটির উপর সর্বব্যাপী ডিজাইনের প্রভাব আনিয়া দিয়াছে রূপময়তার আবরণ। পুঁটিয়ার গোবিন্দ মন্দিরে স্থপতি যে প্রয়োগনৈপুণ্য ও কল্পনাশক্তির পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন পঞ্চরত্নমন্দিরের ইতিহাসে তাহার তুলনা সুদুর্লভ।

রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনস্টাইন, বন্ধুত্ব-ইতিহাস

অশ্রুকুমার সিকদার

নোবেল পুরস্কার

রবীন্দ্রনাথ যে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন এই খবর শান্তিনিকেতনে পৌঁছায় ১৯১৩ সালের ১৩ই নবেম্বর। এই সম্মানের সংবাদ পাওয়া মাত্র স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের মন ধাবিত হয়েছে সেই দূরের বন্ধুর প্রতি যে বন্ধু জয়মাল্য প্রাপ্তির ব্যাপারে সর্বাধিক আনুকূল্য করেছিলেন। ক্রমাগত অভিনন্দনের মত্ততার মাঝখানে প্রথম অবসরেই (১৮ নবেম্বর ১৯১৩) কবি রোটেনষ্টাইনকে লিখলেন—

My dear friend, The very first moment I received the message of the great honour conferred on me by the award of the Nobel Prize my heart turned towards you with love and gratitude. I felt certain that of all friends none would be more glad at this news than you. Honour's crown of honour is to know that it will rejoice the hearts of those whom we hold the most dear. But, all the same, it is a very great trial for me. The perfect whirlwind of public excitement it has given rise to is frightful. It is almost as bad as tying a tin can at a dog's tail making it impossible for him to move without creating noise and collecting crowds all along. I am being smothered with telegrams and letters for the last few days and the people who never had any friendly feelings towards me nor ever read a line of my works are loudest in their protestation of joy. I cannot tell you how tired I am of all this shouting...

অপরপক্ষে বন্ধুর সম্মানপ্রাপ্তিতে রোটেনষ্টাইন যে চিঠি লিখলেন তাতে তাঁর আনন্দ উচ্ছ্বসিতভাবে প্রকাশ পেয়েছে—

We have made a holiday of this day—all rejoice in the robe of honour in which you have been invested before the eyes of Europe. I took the children in a drive, a long promised one, we had a glorious day and as it is not often I play truant, the children were like a peal of bells...Poet of the Sun you will sit in the Sun, poet of the night you will go forth into the night, poet of the human heart, you will bring warmth and comfort to a thousand cold and dispirited.

কয়েকদিন পরে (১০ ডিসেম্বর ১৯১৩) সম্মানে-অভিনন্দনে ক্লান্ত কাতর রবীন্দ্রনাথ আবার রোটেনষ্টাইনকে লিখলেন—

I am worn out writing letters, distributing thanks by handfuls and receiving

visitors. I cannot tell you how unsuitable this sudden eruption of honour is to a man of my termperament...I want to be glouriously idle and let my thoughts melt and mingle in the blue of the space. I am begining to envy the birds that sing and gladly go without honour.

ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে সেই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ! যদিও দেশবাসীর প্রতিনিধিরূপে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ১৯১২ সালের জানুয়ারিতে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশতম জন্মবর্ষপূর্তি উপলক্ষে কবিকে অভিনন্দিত করে, তথাপি তাঁর বিরুদ্ধে পূর্বের বিদ্বেষপূর্ণ আক্রমণে তাঁর মন খানিকটা বিষাক্ত হয়েছিল এবং পাশ্চাত্ত্যে সম্মানিত হবার পর স্বদেশের অনেক অভিনন্দনের মধ্যে আন্তরিকতার অভাব উপলব্ধি করে সেই ক্ষোভ আরো বর্ধিত হয়েছিল। পুরস্কারপ্রাপ্তির খবরের দশ দিন পরে যখন কলকাতা থেকে স্পেশাল ট্রেণযোগে পাঁচশত ব্যক্তি কবিকে অভিনন্দিত জানাতে এলেন তখন অপ্রত্যাশিতভাবে সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটলো ; তিনি বললেন,

আজ আপনারা আদর করে সম্মানের যে সুরাপাত্র আমার সম্মুখে ধরেছেন তা আমি ওষ্ঠের কাছে পর্যন্ত ঠেকাব, কিন্তু এ মদিরা আমি অন্তরে গ্রহণ করতে পারব না। এর মত্ততা থেকে আমার চিত্তকে আমি দূরে রাখতে চাই।

এই ঘটনার ইঙ্গিত দিয়ে রবীন্দ্রনাথ রোটেনষ্টাইনকে লিখলেন (১৬ ডিসেম্বর ১৯১৩)—

I have already raised a howl of protest and vilifications in our paper by saying in plain words what was in my mind to a deputation who had come to Bolpur to offer me congratulations. This has been a relief to me—for honour is a heavy enough burden, even when it is real, but intolerable when meaningless and devoid of sincerity. ১

পরবর্তীকালে যে রাজনৈতিক বিষাবর্ত ঘুলিয়ে উঠেছিল নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে তাঁর সূত্রপাত। শ্বেতকায় জাতির একজন নয়, অন্ধকার এশিয়া থেকে একজন, এমন একজন যার নাম পর্যন্ত দুরুচ্চার্য, তিনি এই পুরস্কার পেলে শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের প্রথমভাগে পাশ্চাত্ত্যের পক্ষে তা মেনে নেওয়া কঠিন হয়েছিল।

The awarding of the Nobel Prize for literature···to a Hindu has occassioned much chagrin and no little surprise among writers of the Cancasian race. They cannot understand why this distinctiod was bestowed upon one who is not white.

Aronson-এর Rabindranath through Western Eyes গ্রন্থে উদ্ধৃত এই জাতীয় মন্তব্য সেদিন বিরল ছিল না। একদিকে যেমন ভারতীয়গণ এই ঘটনা জাতিগৌরবের কারণ হিসাবে গ্রহণ করলো, অপরপক্ষে ইউরোপবাসী রবীন্দ্রনাথের এই পুরস্কারপ্রাপ্তির অসাহিত্যিক সম্ভাব্য কারণ নিয়ে নানা গবেষণায় নিযুক্ত হলেন। কারো ধারণা হলো ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদকে বিব্রত করছি এই পুরস্কারদানের উদ্দেশ্য, কারো কারো ধারণা হলো সুইডেনের রাজকুমার উইলিয়মের সঙ্গে কলকাতায় কবির সাক্ষাৎ এই পুরস্কারপ্রাপ্তির পথ সুগম করেছে, ইংরেজ ভালো রক্ষণশীল

সুইস অ্যাকাডেমি নিরাশাবাদী বলে হার্ডিকে প্রাপ্য মর্যাদা দিল না, ফরাসী ভাবলো একই কারণে আনাতোল ফ্রাঁসের অগ্রগণ্য দাবী অগ্রাহ্য হলো। জার্মানি ক্ষিপ্ত হলো এই ভেবে যে জার্মাণ জাতীয়তাবাদী সাহিত্যিক রোজেগ্‌গারের হাত থেকে পুরস্কার ফস্‌কে গেল। এই জাতীয় প্রতিক্রিয়া কী রকম সর্বব্যাপী হয়েছিল তার প্রমাণ Paige-সম্পাদিত এজরা পাউণ্ডের পত্র সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত পাউণ্ডের একটি চিঠি (২৫শে জানুয়ারি ১৯১৭) ; তিনি লিখছেন,

Tagore got the Nobel Prize because, after the cleverest boom of our day, after the fiat of the omnipotent literati of distinction, he lapsed into religion and optimism and was boomed by the pious non-conformists. Also because it got the Swedish Academy out of the difficulty of deciding between European writers whose claims appeared to conflict. Sic. Hardy or Henry James ?

Tagore obviously was unique in the known modern Orient. And then, the right people suggested him. And Sweeden is Sweeden. It was also a down good smack for the British Academic Committee, who had turned down Tagore (on account of his biscuit complextion) and who elected in his stead to their august corpse, Alice Meynell and Dean Inge.

Therefore his Nobel Prize gave pleasure into the elect.

যাই হোক, যে সমস্ত রাজনৈতিক, গোঁড়া জাতীয়তাবাদী কারণ পাশ্চাত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভুল বোঝাবুঝির কারণ হয়েছিল পরবর্তীকালে তার বীজগুলি বপন হলো নোবেল পুরস্কারের সংবাদ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে।

(১) এই পুরস্কার প্রাপ্তির পর এই দুর্লভ সম্মানলাভের ব্যাপারে রোটেনস্টাইনের ভূমিকা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে গীতাঞ্জলির বাংলা ও ইংরাজি পাণ্ডুলিপি উপহার দিয়াছিলেন।

বঙ্কিম উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা

অশোক কুণ্ডু

জীবানন্দ (আনন্দ ১।৮) ॥

'আনন্দমঠে'র একই শ্রেণীর সন্ন্যাসীচরিত্রের মধ্যে জীবানন্দই সর্বাপেক্ষা ব্যক্তিবৈশিষ্টে সমুজ্জ্বল। জীবানন্দের পূর্বকাহিনীর কিছু আভাষদান করে এবং সন্ন্যাসী থাকাকালীন কিছু কিছু দোষের প্রকাশ দেখিয়ে লেখক তাঁর মধ্যে রক্তমাংসের প্রলেপ লাগিয়েছেন।

জীবানন্দকে প্রথম আমরা দেখলাম, যে তিনি মহেন্দ্রের কন্যাকে নিয়ে নিজ ভগ্নীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। সেখানে তিনি ভগ্নী নিমাইয়ের সংগে রসিকতায় মেতেছেন তাতে সন্ন্যাসীর আবরণটুকু খসে পড়েছে। সাধারণ মানুষের মতই ভোজনরসিক জীবানন্দ—তিনজনের খাদ্য, একটি পাকা কাঁঠাল, উদরসাৎ ক'রেও প্রতীক্ষা করেছেন নূতন কোন খাবারের।

জীবানন্দ যে সম্পূর্ণভাবে হৃদয়কে বশে আনতে পারেন নি, তা বুঝতে পারি স্ত্রীর সংগে সাক্ষাতে প্রবল আপত্তিতে। কিন্তু নিমাইয়ের উপরোধ অনুরোধে ও মনের নিভৃত আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় শেষপর্যন্ত স্ত্রীর সংগে সাক্ষাৎ করলেন। শান্তির ছিন্ন-মলিন বেশ দেখে জীবানন্দের অন্যতর কর্তব্যবোধ জেগে উঠল। তিনি আবার শান্তির সংগে ঘর বাঁধতে চাইলেন সন্ন্যাসধর্ম ত্যাগ ক'রে। বেশ বোঝা যায় জীবানন্দ একটু আবেগপ্রবণ অস্থিরমতি চরিত্র।

কিন্তু শান্তি তার যথার্থ সহধর্মিণী। তাই স্বামীকে সে ব্রতভংগ করতে বারণ করেছে। শান্তিই জীবানন্দের প্রেরণা। শুধু এখানেই নয়, শান্তি বারবার জীবানন্দকে সঠিকপথে চালিত করেছে। সত্যানন্দের নিকট দীক্ষা নিয়ে নবীনানন্দরূপে শান্তির প্রধান কাজ জীবানন্দকে নিজ পথে অটল রাখা। কারণ জীবানন্দ সন্তানসেনার ডানহস্ত স্বরূপ।

জীবানন্দ বেশ রসিক। নবীনানন্দরূপী শান্তিকে দেখে তাঁর রসবোধ ও কৌতুকপ্রিয়তা বেড়ে গেছে। সে সময়ের কথোপকথন বেশ উপভোগ্য। তাই জীবানন্দ যখন শান্তির প্রতি তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে বলেন—'আপনার বরণখানি বলপূর্বক গ্রহণান্তর অধরসুধা পান।' তখন অশ্লীল বলে মনে হয় না।

যুদ্ধক্ষেত্রে জীবানন্দ অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুবরণ যুদ্ধের স্বাভাবিক গতিতেই সম্ভব হতে পারত, কিন্তু বঙ্কিম তাকে শান্তির সংগে সাক্ষাৎরূপ পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য মৃত্যুবরণের সংকল্প দান ক'রে, নীতিবাদী মনোবৃত্তিরই আর একবার প্রকাশ দেখিয়েছেন।

মৃত্যুর পর পুনর্জীবনপ্রাপ্ত জীবানন্দকে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ বলিয়া মনে হয়। গৃহজীবনের সুখনীড় রচনা করবার কল্পনা তখন তাঁর মনে একবারের জন্যও স্থান পায় নি। প্রথমে তিনি আজীবন মাতৃসেবাই করতে চেয়েছেন, কিন্তু শান্তির কাছ থেকে তাতে আর অধিকার নেই শুনে—দু'জনে চির ব্রহ্মচর্য পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

জীবানন্দ চরিত্রে শান্তির প্রভাব যেভাবে দেখান হয়েছে, তাতে অনেকে তাকে স্ত্রৈণ বলে

মনে করতে পারে। কিন্তু স্ত্রীর সৎপরামর্শ শোনাকে কোনমতেই এ অপবাদ দেওয়া যায় না। জীবানন্দ এবং শান্তি মিলিতভাবে অতুলনীয়।

জেনোবিয়া (রাজঃ ২।২)॥

পালমিরার রাজার পত্নী। স্বামীর মৃত্যুর পর ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ২৭৩ খ্রীঃ রোম সম্রাটের কাছে ইনি পরাজিত হন। 'রাজসিংহ' উপন্যাসে পাশ্চাত্যদেশীয় মহিলাশাসকদের উদাহরণ প্রসংগে নামোল্লেখ মাত্র আছে।

জেব-উন্নিসা (রাজঃ ১।২)॥

জেব-উন্নিসা নামে একটি চরিত্র ইতিহাসে আছে, কিন্তু সেই চরিত্রটিই বঙ্কিম উপন্যাসের এই চরিত্র কিনা তা নিয়ে ঐতিহাসিক ও সমালোচকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে।

বঙ্কিম বলেছেন—জেব-উন্নিসা ঔরংজেবের অবিবাহিতা জ্যেষ্ঠা কন্যা এই প্রসংগে পাদটীকায় তিনি সংযুক্ত করেছেন—"মুসলমান ইতিহাসে ইনি জেব-উন্নিসা বা জয়েব্-উন্নিসা নামে পরিচিতা। পাদ্রি কত্রু বলেন, ইঁহার নাম যথর-উন্নিসা।"

ঔরংজেবের জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম জেব-উন্নিসা সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনিই যে যাথর-উন্নিসা একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। প্রিঙ্গল কেনেডির The History of the Great Moghuls গ্রন্থে বলা হয়েছে যথর-উন্নিনা জেব-উন্নিসার নামান্তর মাত্র। কিন্তু মানুচীর গ্রন্থে বলা হয়েছে যথর-উন্নিসা ঔরংজেবের চতুর্থ কন্যা। যদুনাথ সরকারও শতবার্ষিকী সংস্করণের ভূমিকায় জেব-উন্নিসা ও যথর-উন্নিসাকে স্বতন্ত্র শরীররূপে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর History of Aurangzib, vol. I, গ্রন্থে জেব-উন্নিসার চরিত্র সম্বন্ধে এরূপকথা আছে—"She seems to have inherited her father's keenness of intellect and literary tastes...

Scandal conected her name with that of Agilmana khan, a noble of her father's court and a versifier of some repute in his own day."

ইতিহাস অনুগত হোক বা না হোক রাজসিংহ উপন্যাসে সর্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণকারী চরিত্র জেব-উন্নিসা। রবীন্দ্রনাথের মতে তিনি উপন্যাস অংশের নায়িকা।

জেব-উন্নিসা চরিত্রে প্রথমে যে ক্ষমতালিপ্সা উচ্ছৃঙ্খলতা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা দেখান হয়েছে তা মুগলহারেমের বাদ্‌শাজাদীদের চরিত্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। সুতরাং ঔরংজেবের কন্যাও যে বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবেন তাতে আশ্চর্য কি!

কিন্তু বঙ্কিম সমস্যা সৃষ্টি করেছেন মবারককে এনে। মবারক জেব-উন্নিসার অনুগৃহীত ব্যক্তি। এরকম অনুগ্রহ তিনি অনেককেই করে থাকেন। কিন্তু মবারকের প্রতি দুর্বলতার মাত্রাটা একটু অধিক। মবারক বাদ্‌শাজাদীকে বিবাহের প্রস্তাব করলে যেভাবে ব্যঙ্গ করে জেব-উন্নিসা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাতে তাঁর চরিত্রবৈশিষ্ট্যই বজায় থেকেছে। ঐশ্বর্যের সুখাসনে বসে প্রেমের জ্বালা তিনি অনুভব করতে পারেননি। বিবাহ ও বিরহের জ্বালাকে তিনি চাষীর দুঃখভোগ বলে অভিহিত করেছেন।

কিন্তু মবারক দরিয়াকে বিবাহ করে সুখের জীবন যাপন করছে শুনে যখন জেব-উন্নিসার মনে ঈর্ষ্যা দেখা দিল তখনই ভালবাসার সূচনা হল তাঁর জীবনে। ঈর্ষ্যাই প্রেমের প্রথম সোপান। কিন্তু তখনো তাঁর রয়েছে ক্ষমতার মদমত্ততা। তাঁর আদেশে মবারকের প্রাণহানি হ'ল।

"মবারকের বধ-সংবাদও আসিয়া পৌঁছিল। জেব-উন্নিসা প্রত্যাশা করিয়াছিলেন যে, তিনি এই সংবাদে অত্যন্ত সুখী হইবেন। সহসা দেখিলেন যে, ঠিক বিপরীত ঘটিল। সংবাদ আসিবামাত্র সহসা তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল—এ সুকনা মাটিতে কখনও জল উঠে নাই। দেখিলেন, কেবল তাই নহে, গণ্ড বাহিয়া ধারায় ধারায় সে জল গড়াইতে লাগিল। শেষ দেখিলেন, চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছে। জেব-উন্নিসা দ্বার রুদ্ধ করিয়া হস্তিদন্তনির্মিত রত্নখচিত পালংকে শয়ন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।' (৬।৯)

বিরহে প্রেমের গভীরতা যেমন বোঝা যায় এমন করে আর কখনো বোঝা যায় না। তারপর প্রেমের প্রকাশে বাদশাজাদী জেব-উন্নিসার নবজন্ম হ'ল। রবীন্দ্রনাথের মধুর লিপিতে সে পরিবর্তন যেভাবে দেখান হয়েছে, তা' আর কারুর দ্বারাই প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাই উদ্ধৃতি দিয়েই ক্ষান্ত থাকতে হল——

'বিলাসিনী জেব-উন্নিসাও মনে করিয়াছিল সম্রাট-দুহিতার পক্ষে প্রেমের আবশ্যক নাই, সুখই একমাত্র শরণ্য। সেই সুখে অন্ধ হইয়া যখন সে দয়াধর্মের মস্তকে আপন জরিজহরৎ জড়িত পাদুকাখচিত সুন্দর বাম চরণখানি দিয়া পদাঘাত করিল তখন্ কোন অজ্ঞাত গুহাতল হইতে কুপিত প্রেম জাগ্রত হইয়া তাহার মর্মস্থলে দংশন করিল, শিরায় শিরায় সুখ মন্থরগামী রক্তস্রোতের মধ্যে একেবারে আগুন বহিতে লাগিল, আরামের পুষ্পশয্যা চিতাশয্যার মতো তাহাকে দগ্ধ করিল—তখন সে ছুটিয়া বাহির হইয়া উপেক্ষিত প্রেমের কণ্ঠে বিনীত দীনভাবে সমস্ত সুখসম্পদের বরমাল; সমর্পণ করিল' দুঃখকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া হৃদয়াসনে অভিষেক করিল। তাহার পরে আর সুখ পাইল না, কিন্তু আপন সচেতন অন্তরাত্মাকে ফিরিয়া পাইল। জেব-উন্নিসা সম্রাটপ্রাসাদের অবরুদ্ধ অবচেতন আরামগর্ভ হইতে তীব্র যন্ত্রণার পর ধূলায় ভূমিষ্ট হইয়া উদার জগতীতলে জন্মগ্রহণ করিল। এখন হইতে সে অনন্তজগৎবাসিনী রমণী।'

জ্ঞানানন্দ (আনন্দ ১।১৭) ॥

আনন্দমঠের সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের একজন। সে ভবানন্দকে এসে খবর দিয়েছে যে—'সত্যানন্দ-প্রভু গেরুয়া পড়িয়া একা নগরাভিমুখে গিয়াছেন।'

ডনিওয়ার্থ (আনন্দঃ ৩।২) ॥

শিবগ্রামের রেশম কুঠির অধ্যক্ষ। তিনি টমাসকে আশ্রয় দান করেন। উপন্যাসে নাম উল্লেখ আছে।

ডাইস সম্বর (চন্দ্রঃ ৬।৪) ॥

দ্রঃ সমরু।

হিমবাহ পথে বদ্রীনারায়ণ॥ শ্রীমতী ভক্তি বিশ্বাস॥ এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স্ প্রাঃ লিঃ।'' কলিকাতা-১২॥ পাঁচ টাকা॥

বছর তিনেক আগে গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখ যাবার পথে বিশ্রাম নেবার জন্যে জমে যাওয়া এক পাহাড়ী নদীর ধারে বসেছিলাম। সাথী এবং গাইড দিলীপ সিং দূরের পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানোতে মত্ত হরিণগুলোকে দেখাচ্ছিল আর মাঝে মাঝে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জমেযাওয়া নদীর জল গোলা পাকিয়ে মুখে দিচ্ছিল চকোলেটের সঙ্গে। হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করেই সে বলেছিল 'বাবু আপ মুখার্জি বাবুকো' 'পয়চান্তা ?'

প্রসঙ্গের আকস্মিক পরিবর্তনে প্রথমটা একটু অবাকই হয়েছিলাম। তবে মুখার্জীবাবুকে চিনতে কষ্ট হয় নি। কেননা হিমালয়ের গাড়োয়াল—কুমায়ুন অঞ্চলে সাধারণ মানুষের কাছে বাঙালী মুখার্জী বাবু একজনই। তিনি শ্রদ্ধেয় শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। মুখার্জীবাবুকে চিনি জেনে উৎসাহিত হয়েছিলো দিলীপ সিং এবং গর্বের সঙ্গে জানিয়েছিল পূর্ব বৎসরে মুখার্জীবাবুর দল-বলকে নিয়ে সে এই পথে গঙ্গোত্রী হিমবাহ পার হয়ে বদ্রীনাথ গিয়েছিল। বলতে বলতে বুকপকেট থেকে সযত্ন রক্ষিত একটি ছবি বের করে দেখিয়েছিল। হিমবাহ পথে কোন একস্থানে তোলা। দিলীপের সাথে শ্রদ্ধেয় শ্রীমুখোপাধ্যায় এবং এক ভদ্রমহিলা। জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম উনি ডগডর সাহেবের স্ত্রী। উনিও ছিলেন এই হিমবাহ যাত্রা পথের পথিক।

আশ্চর্য হয়েছিলাম তখনই। কেননা যে পথের পথিক আমি ছিলাম সেদিন সেপথে বাঙালী ঘরের বধুর পদার্পণ বেশ রোমাঞ্চকর ব্যাপার। এবং। এবং সেই দুঃসাহসিনী সে পথ দেখেই ক্ষান্ত হননি, গিয়েছেন আরও উত্তরে যা স্থান পরিবেশে চিন্তা করতেও অবাক মনে হয়।

এরপর কয়েক বছর কেটেছে। বিভিন্ন সূত্রে সেই অভিযাত্রী ভদ্রমহিলার নাম জেনেছিলাম এবং একটি পত্রিকার মাধ্যমে শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'কালিন্দীখাল লেখাটিতেই সেই ভ্রমণের পূর্বে পরিচয় পেয়েছিলাম। তিনি কোলকাতার হিমালয়ান এ্যাসোসিয়েশনর সভাপতি ডাক্তার মণি বিশ্বাসের স্ত্রী শ্রীমতী ভক্তি বিশ্বাস। এবং অবশেষে তাঁরই লেখা এই ভ্রমণের কাহিনী হিমবাহ পথে বদ্রীনারায়ণ বইটি হাতে এলো যে ভ্রমণের কাহিনী পুরোপুরি জানতে বহুদিন ধরে আগ্রহে উন্মুখ ছিলাম—বলতে দ্বিধা নেই গ্রন্থটি পাঠ করে আমার সেই আকাংখার, সে অপেক্ষার পূর্ণ পরিতৃপ্তি ঘটেছে।

শ্রীমতী বিশ্বাসের আলোচ্য পুস্তকটির পরিচয় পাঠকদের কাছে দিতে গেলে প্রথমেই পথের পরিচয়টা উল্লেখ করা প্রয়োজন এবং সে ক্ষেত্রে পুস্তকের ভূমিকায় শ্রদ্ধেয় উমাপ্রসাদ বাবুর বক্তব্যটাই তুলে দেওয়া ভালো—'হিমালয়ের সুপ্রাচীন তীর্থক্ষেত্রে গঙ্গোত্রী-গোমুখ এবং বদরীনাথ। এই দুই

তীর্থভূমি হিমালয়ের একই তুষার গিরি শ্রেণীর পাদদেশে। বছরের ছয়মাস সেখানে বরফ পড়ে, অপর ছয় মাসে প্রায় গলে যায়। যাত্রীরাও যান সেই সময়। কেউ বা একই যাত্রায় চতুর্ধামও করেন। যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদার, বদরী। সেই সাধারণ যাত্রা-পথে গঙ্গোত্রী থেকে মল্লোচটিতে ফিরে পাওয়ালির প্রসিদ্ধ চড়াই ভেঙে ত্রিযুগী নারায়ণে নামা। তারপর কেদার ও তুঙ্গনাথ হয়ে, বদরীনাথে আসা। গঙ্গোত্রী থেকে বদরীনাথের দূরত্ব সেই পথে হয় ২২২ মাইল। অথচ, যে তুষার শৈলশ্রেণীর নিম্নদেশে এই দুই তীর্থ, সেই হিমবান্ গিরি প্রাচীর অতিক্রম করতে পারলে, দুই ক্ষেত্রের ব্যবধান সামান্যই। মাপে হয়তো পঞ্চাশ মাইল হবে। শ্রীমতী বিশ্বাসের এই ভ্রমণকাহিণী এই হিমবান প্রাচীর অতিক্রমেরই গল্প। এই পুস্তক পাঠ করতে প্রথমেই দুটি বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে যে পর্বতারোহণের ট্রেনিংপ্রাপ্ত কেউ তাদের সাথে ছিলেন না। অত্যন্ত সাধারণ বাঙালী পরিবারের জনাকয়েক নরনারী এই পথের পথিক হয়েছিলেন এবং যে পথে তাঁরা যাত্রা করেছিলেন সেখানে পথ বলে কিছু নেই। ক্রমাগত পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে চলা। আর নয় তো বরফের উপর দিয়ে চলা। এবং সেই সাথে ক্রমাগত চড়াই উৎরাই। পথের উচ্চতা ক্রমে বেড়ে চলে। গোমুখীর উচ্চতা :২৭৭০ ফিট এবং এ পথে সর্বোচ্চ স্থান কালিন্দী খাল ১৯৫১০ ফিট। সেটি অতিক্রম করে তবেই পৌঁছোনো সম্ভব ১০,০০০ ফিট উঁচু বদরীনারায়ণে। এ পথে যত উচ্চতায় ওঠা যায় শরীরের কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা ততো কমে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয় অক্সিজেন স্বল্পতায়। এর সঙ্গে আছে 'হিমগিরির ভীতিবহ উগ্ররূপ' ভেঙেপড়া পাহাড়ের শিলাস্তূপ। বরফের অজস্র ফাটল। কোথাও বা Rock falls কখনো বা Avalanche। তুষার রাজ্যের প্রচণ্ড শীত। তারই মাঝে ছোট তাঁবুতে রাত্রিবাস। চারিপাশে সেখানে বিপদ ও আতংকের জাল পাতা।'

শ্রীমতী বিশ্বাসের লেখার গুণে পাঠক অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর সাথী হয়ে পড়বেন, মনে হবে পাঠক যেন নিজেই চলেছেন সেই যাত্রাপথে; সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনার সংগী হয়ে উঠবেন পাঠক সেই পথিকদলের সংগে তার নিজেরই অজান্তে।

ভ্রমণকাহিনীর দরবারে হিমালয় সংক্রান্ত পুস্তকগুলি বাংলা সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য অংশ অধিকার করে রয়েছে। তার আধিকাংশগুলিতেই দুটি ত্রুটি প্রায়ই চোখে পড়ে—হয় ভ্রমণ-কাহিনীকে দাঁড় করানোর চেষ্টা চলে রমণীয় উপন্যাসে আর নয়তো লেখক-নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে—সেখানে বাধাবিঘ্ন বিপদ আপদের কাছে সংগীরা পরাজয় মানলেও তিনি অবলীলাক্রমে পথ চলেন। কিন্তু শ্রীমতী বিশ্বাস তাঁর 'হিমবাহ পথে বদ্রীনারায়ণ গ্রন্থে' এই ত্রুটি ঘটতে দেন নি। তিনি অত্যন্ত সহজ সরল মনোরম ভংগীতে তাঁদের যাত্রার সেই কাহিনী বর্ণনা করেছেন। নিজেদের কষ্টের কথা অক্ষমতার চিত্র প্রকাশ করতেও তিনি কুন্ঠিত হন নি। ফলে পাঠক বহুদিন বাদে একটি সত্যিকারের ভ্রমণকাহিনী পাঠে উৎসাহিত হবেন।

উক্ত অভিযাত্রী দলে ছিলেন মোট পনেরো জন। তিনি তাঁর কাহিনীতে সবার প্রতি সম দৃষ্টি দিয়েছেন। মহীশূরের ছেলে পটবর্দ্ধন—স্বামী সুন্দরানন্দ অথবা গাইড দিলীপ সিং ও তাঁর মুখোবা গাঁয়ের সংগীদল সবাইকেই তিনি প্রাপ্য মর্যাদা দিয়েছেন। প্রত্যেকেরই চলার পথের সুখ দুঃখের পরিচয় দানে নতুনত্বও কিছুটা আছে।

শুধু ভ্রমণকাহিনী ছাড়াও বর্তমান গ্রন্থে মাঝে মাঝে সাধারণ পাঠকের সংগে পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছে—হিমবাহ কাকে বলে—গঙ্গোত্রী অঞ্চলের বিভিন্ন অভিযানের কাহিনী ইত্যাদির সঙ্গে যেটা গতানুগতিকতার থেকে এক বিরাট ব্যতিক্রম এবং হিমালয়ের সঙ্গে অপরিচিত পাঠকের এর ফলে বইটি পড়তে আরো সুবিধা হবে।

সর্বাঙ্গসুন্দর এই বইটির একটি ত্রুটি কিন্তু উৎসাহী পাঠকের ছবি এড়াবে না—আলোকচিত্র আছে অনেকগুলি কিন্তু তার একটিও ভালো মনে হলো না। ছাপার দোষেই হোক কিংবা অন্য কোন কারণে এগুলি দৃষ্টি আকর্ষণে একেবারেই অক্ষম। এ বিষয়ে আরও একটু সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

পরিশেষে বাঙালী পাঠকবৃন্দকে একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর ভ্রমণ কাহিনী এবং হিমালয়প্রেমী জনসাধারণকে একটি অপ্রচলিত কষ্টকর পথের বিবরণ দানে অভিযানে উৎসাহিত করায় লেখিকাকে ধন্যবাদ জানাই। ভ্রমণসাহিত্যে 'হিমবাহ পথে বদরীনারায়ণ' গ্রন্থটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

প্রদীপ্ত চক্রবর্তী

Regd No C-315 Phone : 23-5155 November'67 (0'50) Central Regd. No. R.N.2602/57 SAMAKALI

সমকালীন ঃ প্রবন্ধের মাসিক পত্র

পঞ্চদশ বর্ষ ॥ অগ্রহায়ণ ১৩৭৪

সমকালীন

ইনি একটী অফিসের হাস্যময়ী, এবং সুচতুরা সুপারিনটেণ্ডেণ্ট। কঠোর পরিশ্রম এবং কর্মকুশলতার জন্য তিনি টাইপিষ্ট থেকে এতোখানি উন্নতি করতে পেরেছেন। তিনি বলেন, "বাড়ীর জন্য আমাকে বিশেষ কোন চিন্তা করতে হয়না ব'লে আমার কাজ আমি মনযোগ দিয়ে করতে পারি। আমি এবং আমার স্বামী যে মাইনে পাই, তা আমাদের ছোট পরিবারের পক্ষে যথেষ্ট। আমাদের তিনটী সন্তানকে যথাসম্ভব উপযুক্ত ভাবে মানুষ ক'রে তোলবার জন্য আমরা চেষ্টা

করছি। ছয় বছর পূর্ব্বে যখন আমাদের তৃতীয় সন্তানটী জন্মগ্রহণ করলো তখনই আমরা স্থির করি যে আমাদের আর সন্তানের প্রয়োজন নেই! আমি সত্যিই সুখী।'

ইনি সুখী।

আপনি?

পঞ্চদশ বর্ষ ৮ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ তেরশ' চুয়াত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

সেলিমাবাদের বারা খাঁ ও নারায়ণ গোস্বামী

সুশীলকুমার মণ্ডল

ঐতিহ্যমণ্ডিত বাংলার গ্রামগুলি। বর্ধমান জেলার একটি সামান্য পল্লী একদিন বাংলার ইতিহাসের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। তার অনেক অলিখিত ঐতিহাসিক উপাদান আজও ছড়িয়ে আছে ঐ অঞ্চলে। সে ইতিহাসকে উদ্ধার করতে হবে কিছু জনশ্রুতি ও কিংবদন্তী হতে ঐতিহাসিকের সূক্ষ্ম ছাঁকনীর ভিতর দিয়ে চুইয়ে নিয়ে। জনশ্রুতি ও কিংবদন্তী সব সময় রূপকথার রাজ্যে বিচরণ করে না। অলিখিত ইতিহাসের অনেক প্রয়োজনীয় উপাদান এতে অনেক সময় ছড়িয়ে থাকে। সজাগ, সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে দেখলে অনেকখানি ইতিহাস হাতে এসে যায়।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল কাব্যের কাল বিচারে বারা খাঁ প্রসঙ্গ অপরিহার্য। কবি আত্মজীবনীতে বলেছেন—'রণে পড়ে বারা খাঁ বিপদে ছাড়িল গাঁ'

বারা খাঁ যুদ্ধে নিহত হলে কবিকে স্বগ্রাম ত্যাগ করে জগন্নাথপুরে যেতে হয়। সেখানে বিদ্যোৎসাহী ভারামল্লের পৃষ্ঠপোষকতায় কবি কাব্য রচনা করেন।

বারাখাঁ সম্বন্ধে জানার পথ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। তাই আমাদের নির্ভর করতে হবে মূলতঃ জনশ্রুতি ও অত্যল্প লিখিত ইতিহাসের উপরে।

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থে বলেছেন এই বারা খাঁ দক্ষিণ রাঢ় সেলিমাবাদ সরকারের শাসন কর্তা ছিলেন। তিনি ১৬৪০ খৃঃ যুদ্ধে নিহত হন।

এই বারাখাঁর কবর বর্ধমান জেলার পানাগড় ষ্টেশনের তিন মাইল দক্ষিণে দামোদর নদীর তীরে সিলামপুর গ্রামে এখনও আছে। সিলামপুরই সেলিমাবাদ। সম্ভবতঃ জাহাঙ্গীরের (সেলিম) নামানুসারে পরবর্তীকালে এই পরগণার নাম সেলিমাবাদ হয়, (দক্ষিণ রাঢ় সেলিমাবাদ) এর পূর্বে

এ স্থানের নাম ছিল ইস্‌লামপুর বা লাট্ ইস্‌লামপুর। এর উত্তরে গোপভূমি এইরূপ কথিত। বর্ধমান জেলার মধ্যপশ্চিম অংশের অজয় নদী তীরস্থ ভূমিকে বলা হ'ত গোপভূমি। ইছাই ঘোষ এই ভূমির একজন বিশিষ্ট রাজা। সিলামপুর এই ভূমির অব্যবহিত দক্ষিণেই অবস্থিত। ইসলামপুর বর্ণবিপর্যয়ে সিলামপুর হয়ে যাওয়াটাও বিচিত্র নয়। ইসলামপুর—ইছলামপুর—ছিলামপুর—সিলামপুর—এই ভাবেই হয় তো হয়েছে। এখনও ওখানকার সাধারণ লোক এই গ্রামকে ছিলামপুর বলে। আবার সেলিমাবাদ হতে সেলিমপুর বা সিলামপুর হতেও পারে।

এই সিলামপুরের পার্শ্ববর্তী কয়েকজন হিন্দুরাজারও সন্ধান পাওয়া যায়, যথা অমরার গড়ের রায় বংশের সদ্গোপ রাজা। কাঁকসার সদ্গোপ রাজা। এঁরা ছিলেন যথার্থ বড় রাজা। এ ছাড়া কয়েকজন ছোট ছোট রাজারও সন্ধান পাওয়া যায়; যথা সিলামপুরের একমাইল উত্তর পূর্বে অবস্থিত ভরতপুরের ভরত রাজা, পশ্চিমে স্ববরাজপুরের শুভরাজা। শুভরাজপুর হ'তে স্ববরাজপুর হয়েছে অবশ্য এর বর্তমান নাম মোবারকগঞ্জ। পরবর্তীকালে পরাজিত হিন্দুরাজাদের নাম মুছে অনেক স্থানেরই মুসলমানী নাম দেওয়া হয়েছে। সিলামপুরের পশ্চিমে দামোদরের তীরে এখনও 'ধোবাঘাটা' বর্তমান। এখানে রাজাদের কাপড়-চোপড় কাচা হতো বলে জনশ্রুতি আছে।

সে যাই হোক বারাখাঁর সঙ্গে এই সিলামপুরের যোগ অনস্বীকার্য। সিলামপুর গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে দামোদরের তীরে একটি নাতিউচ্চ পাকা গৃহের ভিতরে দুটি সমাধি আছে। স্থানটি 'পীরতলা' নামে খ্যাত। গৃহটিতে মন্দির ও মসজিদের সমন্বিত রূপ দেয়া হয়েছে। মসজিদের মত গম্বুজও আছে আবার পদ্ম আঁকা চূড়াও আছে।

এই সমাধি গৃহের সংলগ্ন একটি পুকুর আছে। জনশ্রুতি এরূপ যে এখানে শুদ্ধমনে স্নান করলে মনস্কামনা পূর্ণ হয়; যথা—ব্যাধি হতে মুক্তি ইত্যাদি। স্থানটির পরিবেশ অত্যন্ত শান্ত। দক্ষিণটি খোলা-মেলা দামোদরের গর্ভ।

সমাধি মন্দিরের বাইরে যেমন হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির পরিচয় আছে, তেমনি ভিতরেও পাশাপাশি শায়িত আছেন এক হিন্দু ও এক মুসলমান। মুসলমান বারা খাঁ আর হিন্দু নারায়ণ। নারায়ণ জাতিতে ব্রাহ্মণ। পুরা নাম সত্যনারায়ণ গোস্বামী। নারায়ণ গোস্বামী বাস করতেন কাঁকসা গ্রামে। কাঁকসা গ্রাম পানাগর ষ্টেশনের একমাইল উত্তরে। এই কাঁকসাই মনসামঙ্গলের কবি কেতকাদাসের 'কাঁথড়া' বলে অনুমিত।

এখানে কঙ্কেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত। কঙ্কেশ্বর শব্দটি হতে 'কাঁকসা' শব্দটি এসেছে বলে মনে হয়। জনশ্রুতি এরূপ যে নারায়ণ গোস্বামী কঙ্কেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করেন। এখনও এই গ্রামে কঙ্কেশ্বর শিব মন্দির আছে। এই মন্দিরের কাছেই একটি পুকুর আছে। এই পুকুরটির নাম 'জীবিতকুণ্ড'। জনশ্রুতি এই যে এখানে স্নান করলে মৃতব্যক্তি প্রাণ লাভ করে। এ পুকুরটি এখনও আছে থানা ও সরকারীডাক্তারখানার কাছে। তবে প্রাণদানের দায়িত্ব এখন ঐ সরকারী ডাক্তারখানা নিয়েছে। শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ মহাশয় প্রণীত 'পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি' গ্রন্থে কঙ্কেশ্বর (মহাদেব) মন্দির ও জীবিতকুণ্ডের উল্লেখ আছে। এই স্থানের নীচে খুঁড়লে অনেক প্রাচীন মূর্তি ও ঐতিহ্যের পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।

এখন প্রশ্ন, মন্দির জনশ্রুতি অনুযায়ী নারায়ণ গোস্বামী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কিনা ?

ইতিহাস বলে কঙ্কেশ্বর কাঁকসার রাজবংশের কুলদেবতা। কাঁকসার সদ্গোপ রাজবংশের রাজ্য আনুমানিক ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে ধ্বংস হয়ে যায়। সৈয়দ বোখারী কাঁকসার গড় ও দুর্গ দখল করে রাজাকে হত্যা করেন ও জমিদার মুসলমানদের 'আয়মা' দেন। (পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ)। কাঁকসার রাজবংশ যদি ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতাব্দীতে বিলুপ্ত হয়ে যায় তাহলে তাদের কুলদেবতা নিশ্চয়ই তাঁদের রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এদিকে বারাখাঁ যুদ্ধে মারা যান ১৬৪০ খৃঃ নাগাদ। বারাখাঁ যদি ১০০ বছর বেঁচেও থাকেন তা হলে ১৫৪০ খৃঃ তাঁর জন্ম। অবশ্য যদিও ১০০ বছরের বৃদ্ধের পক্ষে যুদ্ধ করার উৎসাহ অপেক্ষা আত্ম সমর্পণের উৎসাহ অধিক থাকে। তবু যাই হোক ধরে নেওয়া গেল তিনি ১০০ বছর বয়সে মারা যান। যদি তাঁর জন্ম ১৫৪০ খৃঃ হয় তাহলে তার বন্ধু নারায়ণ নিশ্চয়ই ঐ শতাব্দীর লোক অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর লোক। মাঝে একটি শতাব্দীর ব্যবধান। কাজেই নারায়ণ গোস্বামী কর্তৃক কঙ্কেশ্বর মহাদেব প্রতিষ্ঠার দাবী টেঁকে না, যদিও জনশ্রুতি এরূপই।

যাই হোক এই নারায়ণ গোস্বামী ছিলেন খুব ধার্মিক ও বারাখাঁর বিশিষ্ট বন্ধু। শ্রীহট্টের শ্রদ্ধেয় যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যটির ভূমিকায় লিখিত তথ্য হতে জানা যায় যে, যে যুদ্ধে বারাখাঁ নিহত হন সেই যুদ্ধেই নারায়ণ নিহত হন। পরে উভয়ের ছিন্নমুণ্ড যুদ্ধক্ষেত্র হতে নিয়ে এসে উভয়ের ইচ্ছানুসারে পাশাপাশি সমাহিত করা হয়। কিন্তু পীর বারাখাঁর সেবাইত বা 'খাদিম' বংশের বিশ্বাস শুধু মুণ্ড নয় দেহও সমাহিত আছে। সমাধি মন্দিরের ভিতরে দুটি সাধারণ বেদী আছে; একটি বড়, অপরটি ছোট, একটি পশ্চিমে অপরটি পুর্বে। পশ্চিমেরটিই বড়। সেটিই নাকি বারাখাঁর অপরটি নারায়ণের। মন্দিরের ভিতরে দুটি ঢাক আছে। প্রতি সন্ধ্যায় তার উপর কাঠি দিয়ে আঘাত করে বাজান হয়। তখন হয় 'নামাজ' বা আরাধনার সময়।

বারাখাঁ এ অঞ্চলে পীর বা সাধু বলে পরিচিত। বারাখাঁ যে শাসনকর্তা ছিলেন এ কথা এ অঞ্চলের লোকেরা মানতে চান না। বহু নরনারী প্রতি রবিবার এখানে জমায়েত হন নানা 'মানত' নিয়ে। কেউ চান রোগ মুক্তি, কেউ চান সন্তান ইত্যাদি। এই পীরের যিনি বর্তমান 'খাদিম' বা সেবাইত তিনি গাছ গাছড়া থেকে ওষুধ তৈরী করে নানা রোগের চিকিৎসা করেন; শরণার্থীরা পূজার জন্য দক্ষিণাও দিয়া যান, দিয়া যান 'সিন্নী'। পুকুরে স্নান করে অনেকে 'ধন্না' নেন পীরতলায়।

এই সব লোকদের কাছে বারাখাঁর শাসক পরিচয় অপেক্ষা পীরত্ব এই কারণেই প্রাধান্য লাভ করেছে।

তবে বারাখাঁ যে শাসনকর্তা ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। বর্তমান 'খাদেম' বা সেবাইত খাদেম ভোলা খাঁর পিতা খোদা নেওয়াজ খাঁর পূর্ব পুরুষদের আদি নিবাস ছিল লাহোরে। কয়েক পুরুষ আগের একটি পুঁথিতে তাঁর পরিচয় পাওয়া গেছে।

খাদেম পরিবারের লোকেরা নিজেদের মধ্যে ভাঙ্গা উর্দু ভাষায় কথা বলেন। এঁদের খেতাব 'খাঁ'। এ ব্যাপারে বারা খাঁর সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। বারাখাঁও বাংলায় বহিরাগত মুসলমান। তিনি শাসনকর্তারূপে এদেশে আসেন।

যে যুদ্ধে বারাখাঁ মারা যান সে যুদ্ধের ক্ষেত্রটি ছিল 'সাতকাটার বন'। সাতকাটার বন পানাগড় হতে তিনমাইল দূরে অবস্থিত। এই বনের মধ্য দিয়েই চলেছে সিউড়ী রোড। 'সাত-কাটার বন' 'সাতশো কাঠা সম্ভবতঃ হবে না। কারণ সে বন বেশ বিস্তৃত। এর পাশেই আছে 'নস্কর বাঁধ' নামক স্থান। 'নস্কর' 'লস্কর' শব্দ হতে এসেছে বলে মনে হয়। 'লোক-লস্কর' শব্দ আমরা প্রায়ই ব্যবহার করি। জনশ্রুতি এখানেই নাকি ছিল হিন্দু রাজার সৈন্যাগার।

বারাখাঁ যে সুশাসক ছিলেন তার পরিচয় আমরা পাই স্থানীয় কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে। বারাখাঁর মৃত্যুর পর দেশে অরাজকতা আরম্ভ হয়, এমনকি কবিকেই নিবাস ত্যাগ করতে হয়। কবি বলেছেন ঃ

রণে পড়ে বারাখাঁ বিপাকে ছাড়িল গাঁ
যুক্তি করি জননী জনক।
দিন কতক ছাড়ি যাই তবে সে নিস্তার পাই
দেওয়ানে হইল বড় ঠক।

এই সুশাসক বারাখাঁর শোক হয় তো এতদঞ্চলের মানুষ ভুলতে না পেরে তাঁকে স্মরণ করে 'পীর' হিসাবে, পুজা করে তাঁর পুণ্য স্মৃতিকে বংশানুক্রমে।

নারায়ণ গোস্বামী ছিলেন ধার্মিক ব্রাহ্মণ। তাঁর সঙ্গে বারাখাঁর মিলন ও বন্ধুত্ব প্রমাণ করে তাঁর হৃদয়ের উদারতা ও ধর্মপ্রাণতা। যে কালে সাম্প্রদায়িকতা ছিল প্রবল, সম্পর্ক ছিল শাসিত ও শাসকের সেই কালে একজন ধর্মপ্রাণ হিন্দুর সঙ্গে একজন ধর্মপ্রাণ পদস্থ মুসলমানের সুনিবিড় বন্ধুত্ব কি আজকের দিনের মানুষকে বিস্মিত করে না?

যে দুটি মানুষ সুখে দুঃখে, রাষ্ট্রবিপ্লবে যুদ্ধে, মৃত্যুকালে ও মৃত্যুর পরে একসঙ্গে থেকেছেন ও আছেন তাঁদের চিরজয়ী ও চিরজীবী প্রেম ধন্য, ধন্য তাঁদের বন্ধুত্ব। দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, শ্মশানে যিনি সঙ্গে থাকেন তিনিই তো যথার্থ বন্ধু।

ন্যায়মতে জ্ঞান ও তাহার বিভাগ

ব্রহ্মানন্দ গুপ্ত

ন্যায়মতে আত্মাকে চেতন বলা হইয়াছে। বেদান্তমতে যেমন স্বপ্রকাশ চৈতন্যরূপ অর্থে আত্মাকে চেতন বলা হয়, ন্যায়মতে সেইভাবে আত্মাকে চেতন বলা হয় নাই। পরন্তু বিষয় প্রকাশাত্মক চৈতন্যগুণের আশ্রয়রূপেই আত্মাকে চেতন বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই যে বিষয় প্রকাশরূপে আত্মার চৈতন্যগুণ ইহাকে ন্যায়শাস্ত্রে জ্ঞান, বুদ্ধি, উপলব্ধি প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ সাংখ্য এবং বেদান্ত শাস্ত্রে যেমন অন্তঃকরণকে বুদ্ধি, বিষয়াকার অন্তঃকরণ পরিণাম বিশেষকে জ্ঞান এবং উক্ত বৃত্তি প্রতিফলিত অথবা ঐ বৃত্তির দ্বারা অভিব্যক্ত চৈতন্যকে উপলব্ধি করা যায় বলিয়া উহাদের পরস্পর ভেদ স্বীকার করা হইয়াছে। ন্যায় মতে ঐরূপ কোন ভেদ স্বীকৃত হয় নাই পরন্তু একই বিষয় প্রকাশকে বুদ্ধি প্রভৃতি বিভিন্ন নামে কীর্তন করা হইয়াছে। ন্যায়মতে স্বতঃপ্রকাশ বলিয়া কোন কিছু স্বীকার করা হয় নাই। বস্তু মাত্রেই পরাধীন প্রকাশ অর্থাৎ ন্যায়মতে এমন কোন বস্তুই স্বীকৃত হয় নাই যাহা অন্যের সাহায্য ভিন্নই প্রকাশিত হয়। ঘট পটাদি জড় বিষয়গুলি জ্ঞান নামক আত্মগুণের সাহায্যে প্রকাশিত হয়। এবং জ্ঞান ও স্ববিষয়ক পরবর্তী জ্ঞানান্তরের সাহায্যে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই কারণে উক্ত মতে স্বপ্রকাশ বা স্বতঃপ্রকাশ বলিয়া কোন বস্তু থাকিতে পারে না। এ বিষয়ে যদি আপত্তি করা যায় যে এইরূপ হইলে জ্ঞান ও যদি তদ্বিষয়ক জ্ঞানান্তরের দ্বারাই প্রকাশিত হয় তাহা হইলে জড় ও চেতন ভেদে বস্তুর বিভাগ উৎপন্ন হইতে পারে না। অথচ বস্তু বিষয়ে উক্ত দ্বিবিধ বিভাগ সর্ববাদীসম্মত বলিয়াই প্রচলিত আছে। অভিপ্রায় এই যে ব্যবহারে তাহাকেই জড় বলা হইয়া থাকে যাহা অপরের সাহায্যে প্রকাশ পায়। ঘট পট বস্তুগুলিকে আমরা জড় বলিয়া থাকি এবং ঐগুলি বাস্তবিকপক্ষে অপরের দ্বারা অর্থাৎ তত্তদ্‌বিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। ন্যায় মত অনুসারে জ্ঞান ও যদি তদ্বিষয়ক জ্ঞানান্তরের দ্বারাই প্রকাশিত হয় তাহা হইলে অপরের সাহায্যেই উহা প্রকাশ পাইবে এবং জড় পদার্থের মধ্যেই জ্ঞানের ও অন্তর্ভাব হওয়া আবশ্যক। উত্তরে বলা যায় যে যদি অন্যাধীন প্রকাশমানত্বই জড়ের আপন স্বভাব হয় তাহা হইলে নৈয়ায়িকগণ জড় ও অজড় এইভাবে পদার্থের বিভাগ করিবেন না। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু অপ্রকাশস্বভাবতাই জড়ের প্রকৃত লক্ষণ হইবে অন্যের অধীন প্রকাশমানতা নহে। এইরূপ হইলে পদার্থের পূর্ব প্রদর্শিত দ্বিবিধ বিভাগ অনুপপন্ন হইবে না। কারণ ঘট পটাদি বস্তুগুলির কোন দিক দিয়াই প্রকাশ-স্বভাবতা না থাকায় উহারা জড়গণের অন্তর্ভুক্ত। এবং অন্যের অধীন প্রকাশ হইলেও জ্ঞানের নিজ বিষয়াংশে প্রকাশ স্বভাবতা অক্ষুণ্ণ থাকায় উহা অজড় বা চৈতন্যগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে। এইভাবে ন্যায়শাস্ত্রানুসারে জড় ও অজড় বিভাগের উপপত্তি বুঝিতে হইবে।

ভাট্টমতেও প্রদর্শিত রূপেই জড়াজড়ত্বের নিরূপণ হইবে। বেদান্ত বা সাংখ্যমতে চৈতন্য-পদার্থকে তত্ত্বতঃ নির্বিষয়প্রকাশস্বরূপ বলা হইয়াছে। অর্থাৎ যাহা তত্ত্বতঃ সবিষয়ক যেমন বিষয়াকারে পরিণত অন্তঃকরণ তত্ত্বতঃ সবিষয়ক, এবং ইহা জড় পদার্থ। উক্ত অন্তঃ করণের

আশ্রয়ীভূত যে চৈতন্য তাহা তত্ত্বতঃ নির্বিষয়ক। ঐ নির্বিষয়ক চৈতন্যই সবিষয়ক অন্তঃকরণবৃত্তির তাদাত্ম্যে অধ্যস্ত হওয়ায় বৃত্তির বিষয় দ্বারা চৈতন্যকে ঔপচারিক ভাবে সবিষয়ক বলা হয়। উক্ত মতে চৈতন্যের স্বরূপকে নির্বিষয়ই বলা হইয়াছে। ন্যায় মতে কিন্তু ঐ রূপে কোনও চৈতন্যাত্মক পদার্থ স্বীকৃত হয় নাই। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়াদির সম্পর্কের ফলে আত্মাতে যে গুণবিশেষ উৎপন্ন হয় সেই বিলক্ষণ গুণপদার্থকে জ্ঞান, বুদ্ধি বা উপলব্ধি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই যে ন্যায় মত সিদ্ধ জ্ঞান, বা উপলব্ধি ইহা কখনও নির্বিষয়ক হয় না। সুতরাং এইমতে জ্ঞানমাত্রই সবিষয়ক হইবে। এই জ্ঞান নিজ স্বরূপের প্রকাশক না হইলেও বিষয়ের প্রকাশক হয়। অতএব প্রকাশকাত্মকতা থাকায় ইহাকে আর জড় পদার্থের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। এই প্রকাশগুণ আত্মাশ্রিত হওয়ায় আত্মাও চেতন হইয়া থাকে। আত্মব্যতিরিক্ত বস্তুগুলির মধ্যে কোন বস্তু প্রকাশের অর্থাৎ জ্ঞান, বুদ্ধি বা উপলব্ধির আশ্রয় না হওয়ায় ঐগুলি কখনও চেতন হইবে না। পরন্তু একমাত্র আত্মাই চৈতন্যের আশ্রয়রূপে চেতন বলিয়া পরিগৃহীত হইবে। ন্যায় মতে নানা প্রকারে জ্ঞানের বিভাগ করা হইয়াছে।

প্রথমত জ্ঞানকে আমরা দুই ভাগ বিভক্ত করিতে পারি—যথার্থ ও অযথার্থ। জ্ঞানে বিশেষণরূপে প্রকাশমান বস্তু যদি বিশেষ্যরূপে প্রকাশমান বস্তুতে বাধা প্রাপ্ত না হয় অর্থাৎ বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে ঐ জ্ঞানকে যথার্থ বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই যথার্থ জ্ঞান হইতে যাহা পৃথক সেই জ্ঞানগুলিকেই অযথার্থ বলিয়া বুঝিতে হইবে। পূর্বোক্তরূপে নিরূপিত অযথার্থ জ্ঞানের মধ্যেই নির্বিকল্পক জ্ঞানের অন্তর্ভাব বুঝিতে হইবে। কারণ নির্বিকল্পক জ্ঞানে প্রকাশমান বস্তুগুলির মধ্যে বিশেষ্য বিশেষণভাবের প্রকাশ হয় না।

কিন্তু এইরূপ বিভাগকে আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করিতে পারি না। কারণ এইরূপ হইলে ভ্রমজ্ঞানগুলিকে অযথার্থ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না। কারণ ভ্রমজ্ঞানমাত্রই আংশিক-ভাবে যথার্থ হইয়া থাকে। কোন জ্ঞানই সর্বাংশে ভ্রমাত্মক হয় না। 'ইদং রজতম' এই শুক্তি রজত জ্ঞানেও ইদন্তারূপে বিশেষণাংশে যথার্থত্ব বিদ্যমান থাকে। অতএব উক্ত ভ্রমজ্ঞানকে অযথার্থের মধে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। জ্ঞানের বিভাগ করা হইল অথচ কতকগুলি জ্ঞান বিভাগের বহির্ভাগে থাকিয়া গেল। ইহা কখনই শাস্ত্রীয় বিভাগ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। আমরা যদি যাহা যথার্থ নহে তাহাই অযথার্থ এইভাবে অযথার্থের ব্যখ্যা না করিয়া যে জ্ঞান বিশেষণরূপে প্রকাশমান বস্তুর অভাব বিশিষ্ট কোন বস্তুকে সেই বিশেষণেরই বিশেষ্যরূপে প্রকাশ করে তাহাই অযথার্থ এইভাবে অযথার্থের নিরূপণ করি এবং পূর্ব কথিতরূপেই যথার্থের গ্রহণ করি তাহা হইলে যথার্থ অযথার্থ লইয়া জ্ঞানের বিভাগ করিতে হইলে উহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতে হয়—যথার্থ, অযথার্থ ও নির্বিকল্প। পূর্ব কথিত যথার্থ বা অযথার্থের মধ্যে নির্বিকল্প জ্ঞানের অন্তর্ভাব হইবে না। কারণ উহাতে বস্তুর বিশেষ্যবিশেষণভাব আদৌ প্রকাশই হয় না। এই কারণেই জ্ঞানগুলিকে বিভাগ করিবার সময় আমরা তিন ভাগে বিভক্ত করিলাম।

অথবা জ্ঞান দুই প্রকার—সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক। এইভাবেও সামান্যত জ্ঞানের বিভাগ হইতে পারে। ইহাতে পূর্ব প্রদর্শিত যথার্থ এই দুই প্রকারের জ্ঞানই সবিকল্পক জ্ঞানের মধ্যে

অন্তর্ভুক্ত হইবে। যে জ্ঞানে কোন বস্তু বিশেষ্যরূপে এবং তাহার বিশেষণরূপে অপর কিছু প্রকাশিত হয় অর্থাৎ বিশেষ্য ও বিশেষণের মধ্যস্থানীয় সম্বন্ধের সম্বন্ধত্বরূপে সংযোগাদির ভান হয় এমন জ্ঞানকে সবিকল্পক বলিয়া বুঝিতে হইবে। সবিকল্পক বলিতে যাহা বিকল্পের সহিত বিদ্যমান এমন জ্ঞানকে বোঝায়। 'ইদং পুষ্পং রক্তম্', 'ফলমিদং মধুরম্' ইত্যাদি আকারে অনবরতই আমাদের নিকট নানাবিধ বস্তু প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রদর্শিত জ্ঞানদ্বয়ের প্রথমটিতে 'ইদন্তা'রূপে অর্থাৎ সম্মুখস্থত্বরূপে 'পুষ্প' বস্তুটি বিশেষ্য এবং উহার বিশেষণরূপে 'রক্তত্ব'বর্ণ প্রকাশিত হইতেছে। এবং পুষ্প বস্তুটিকে পুষ্প নামের সঙ্গে ও রক্তত্ব বর্ণকে রক্ত নামের সঙ্গে যুক্তরূপেই ঐ জ্ঞান প্রকাশ করিতেছে। এমন কি পুষ্পরূপ বিশেষ্যটি তদীয় অসাধারণ জাতি পুষ্পত্বের দ্বারা ও তদীয় রক্তবর্ণকে রক্তত্ব জাতির দ্বারা আমরা বুঝিয়া থাকি। 'রক্তং পুষ্পম্' এই জ্ঞানটিতে দ্রব্যাদি বোধক নাম এবং জাতির সহিত যুক্তরূপে বিশেষ্য এবং বিশেষণাংশের প্রকাশ হইয়া থাকে। এই যে বস্তুর সঙ্গে নাম ও জাতির যোগ ইহাকে কল্পনা বা বিকল্প বলা হইয়া থাকে। উক্ত রূপ বিকল্প থাকায় প্রদর্শিত জ্ঞানকে সবিকল্পক বলা হইয়া থাকে। আরও কথা এই যে সবিকল্পক জ্ঞানে বিশেষ্য বিশেষণের সম্বন্ধও প্রকাশিত হয়। বিশেষ্য ও বিশেষণের সম্বন্ধ অপ্রকাশিত থাকিলে বিশেষণাত্মক বস্তু স্বরূপত প্রকাশিত থাকিলেও ঐ জ্ঞানে একটি অপরের বিশেষ্য বা বিশেষণরূপে প্রকাশিত হয় না। এই কারণে সবিকল্পক জ্ঞানমাত্রই বিশেষ্য ও বিশেষণের ন্যায় উভয়ের সম্বন্ধেরও প্রকাশ করিয়া থাকে। যদি লক্ষণ ধরিয়া আমরা সবিকল্পক জ্ঞানের নিরূপণ করি তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে যাহা অর্থাৎ যে জ্ঞান বিশেষ্য ও বিশেষণের মধ্যস্থলীয় সম্বন্ধের সম্বন্ধত্বরূপে প্রকাশ করে তাহাকে সবিকল্পক বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই কারণেই কেহ কেহ সাংসর্গিক বিষয়তাশালি জ্ঞানকে সবিকল্পক জ্ঞান বলে। আর যদি 'সবিকল্পক' এই পদের অর্থ ধরিয়া উহার নির্বাচন করিতে হয় তাহা হইলে যাহা পূর্বোক্ত রূপ বিকল্পের সহিত বিদ্যমান অর্থাৎ যাহাতে পূর্বোক্ত রূপ কল্পনা জ্ঞান শরীরে অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে তাহাকে সবিকল্পক বলিয়া গ্রহণ করিতে লইবে। ফল কথা এই যে যে জ্ঞানে সাংসর্গিক বিষয়তা বিদ্যমান থাকে তাহার শরীরে অবশ্যই কল্পনাও অনুপ্রবিষ্ট থাকিবে এবং কল্পনা যাহাতে অনুপ্রবিষ্ট থাকিবে সেই জ্ঞানে অবশ্যই সাংসর্গিক বিষয়তা বিদ্যমান থাকিবে। অতএব সাংসর্গিক বিষয়তাশালি জ্ঞান সবিকল্পক অথবা কল্পনাবিশিষ্ট জ্ঞান সবিকল্পক এই দুই প্রকারের যে কোন প্রকারেই সবিকল্পক জ্ঞান ব্যাখ্যাত হইতে পারে। যে জ্ঞান এইরূপ হইবে না অর্থাৎ যে জ্ঞানের শরীরে কল্পনা অন্তঃপ্রবিষ্ট থাকিবে না অথবা যে জ্ঞানের সাংসর্গিক বিষয়তা থাকিবে না তাহাই নির্বিকল্পক। নির্বিকল্পক জ্ঞানকে কোন আকার দিয়া উপস্থাপিত করা যায় না। আকারের দ্বারা জ্ঞানকে উপস্থাপিত করিতে হইলে প্রকাশমান বিষয়ের নামের যুক্ত করিয়াই জ্ঞানের আকার দিতে হয়। অতএব যে জ্ঞানে নাম বিবর্জিতভাবে বিষয়ের প্রকাশ হয় কোন আকার দিয়া তাহাকে উপস্থাপিত করা যায় না। নির্বিকল্পক জ্ঞান ফল কথা অতীন্দ্রিয়। কাজেই উহার অনুব্যবসায় হয় না। অনুব্যবসায় সিদ্ধ না হইলে যুক্তি সিদ্ধ বলিয়াই এইরূপ অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। এই সম্বন্ধে অগ্রে যুক্তির আলোচনা করা হইবে। এই দ্বিবিধ বিভাগের মধ্যে প্রবিষ্ট থাকিবে না এমন কোন জ্ঞান নাই। জ্ঞান হইলেই তাহা সবিকল্পক অন্যথা নির্বিকল্পক হইবে। এমন কোন জ্ঞান নাই যাহা

সবিকল্পকও হইবে না নির্বিকল্পকও হইবে না। অতএব এইভাবে জ্ঞানের বিভাগ করিলে উক্ত বিভাগ নির্দোষই হইবে।

অন্য এক প্রকারেও জ্ঞানের বিভাগ করা যাইতে পারে—যথা—স্মৃতি ও অনুভব। সংস্কার মাত্র জন্য যে জ্ঞান অর্থাৎ যে জ্ঞান নিজের উৎপত্তিতে পূর্বানুব জন্য সংস্কারের উদ্বোধকে অপেক্ষা করিয়াই ইন্দ্রিয় অনুমানাদির (যুক্তি) অপেক্ষা না করিয়াই উৎপন্ন হয় সেই জ্ঞানকে স্মৃতি বলিয়া বুঝিতে হইবে। স্মৃতিতে যে সংস্কারের উদ্বোধন আবশ্যক ইহা আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারি। আমাদের প্রত্যেকেরই অসংখ্য বস্তুবিষয়ক অসংখ্য অনুভব ও তজ্জন্য অসংখ্য সংস্কার বিদ্যমান আছে। কিন্তু সময় বিশেষে বস্তু বিশেষের স্মৃতি আমাদের হইয়া থাকে। সকল বস্তুর স্মৃতি সব সময়ে আমাদের হয় না। সুতরাং ইহাই বলিতে হইবে যে যখন যে সংস্কার সমুদ্বুদ্ধ হয় তখনই আমাদের সেই বিষয়ে স্মৃতি হইয়া থাকে। ঐ সময়ে আরও অনেক সংস্কার থাকিলেও উদ্বুদ্ধ না হওয়ায় সেই সকল বস্তু সম্বন্ধে আমাদের স্মরণ হয় না। এই যে কালবিশেষে বস্তুবিশেষের স্মরণ হয় তাহা এককালে অনেক অনেক বস্তুর স্মরণ হয় না ইহার দ্বারাই প্রমাণিত হইয়া যাইতেছে যে স্মৃতিতে সংস্কারের সমুদ্বোধ আবশ্যক। এইরূপে উদ্বুদ্ধ সংস্কারমাত্রজন্য যে জ্ঞান তাহাকে স্মরণ বা স্মৃতি বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র করা হইবে।

স্মৃতি ভিন্ন যে জ্ঞান তাহারই নাম অনুভব। অর্থাৎ আমরা চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় ও মনরূপ অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা সাক্ষাতভাবে জানি অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান, ব্যাপ্তিনিশ্চয়রূপ যুক্তির দ্বারা যাহা বুঝিতে পারি অর্থাৎ অনুমিতি, সাদৃশ্য জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া যে জ্ঞান হয় অর্থাৎ উপমিতি এবং বাক্য শ্রবণানন্তর বাক্যান্তর্গত পদের অর্থের স্মৃতির ফলে যে অন্বয়াবগাহী বোধ হয় তাহা শব্দবোধ; এই চারি প্রকার জ্ঞানকে অনুভব বলা হইয়া থাকে। এই দুইটি বিভাগের মধ্যে সব জ্ঞানই অন্তর্ভুক্ত আছে।

শাস্ত্রে আর এক প্রকারে জ্ঞানের বিভাগ করা হইয়াছে—প্রমা ও অপ্রমা। প্রমা জ্ঞান সম্বন্ধে মতভেদ বিদ্যমান আছে। স্মৃতি ব্যতিরিক্ত প্রমা অর্থাৎ যে জাতীয় জ্ঞান প্রমা হইবে তাহা কখনই স্মরণের অন্তর্ভুক্ত হইবে না। এবং স্মৃতি সাধারণ প্রমা অর্থাৎ প্রমা জাতীয় জ্ঞানের মধ্যে স্মর জাতীয় জ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। আমরা সূচীকটাহ ন্যায়ে প্রথমতঃ স্মৃতিসাধারণপ্রমার নির্বচন করিব। এই মতে যথার্থ জ্ঞানত্বই অর্থাৎ যে জ্ঞানে বিশেষ্যরূপে প্রকাশমান বস্তুতে বিশেষ রূপে প্রকাশমান বস্তুটি বাস্তবিকই বিদ্যমান থাকিবে তাহাকে প্রমা জ্ঞান বলিয়া বুঝিতে হইবে আমরা চাক্ষুষভাবে রক্তবর্ণবিশিষ্ট বলিয়া বুঝিলাম। 'পুষ্পটি রক্তবর্ণ' এইভাবে ঐ জ্ঞানটি ব্যবহারকে ঐ জ্ঞানের আকার বলা হইয়া থাকে। এই আকার অনুসারে বিশেষ্য বিশেষণভা বুঝিতে হইবে। জ্ঞানে আকার সংযোজন করিতে না পারিলে বিশেষ্যবিশেষণভাব বোঝা যায় না বস্তুগত বিশেষ্যবিশেষণভাব প্রকাশ করে বলিয়াই জ্ঞান সম্বন্ধী হইলেও বিশেষ্যবিশেষণভাব বস্তুগত হইয়া থাকে। উক্ত জ্ঞানে পুষ্পরূপ দ্রব্যটি বিশেষ্য এবং 'রক্তবর্ণ' রূপ গুণ উহার বিশেষণ রূ প্রকাশিত হইয়া থাকে। বিশেষরূপে প্রকাশিত পুষ্পাত্মক দ্রব্যের বাস্তবিকপক্ষে বিশেষণরূ প্রকাশিত রক্তবর্ণ রূপ গুণ সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান আছে। উক্ত জ্ঞান যে 'তদ্বতি তৎপ্রকার' ই

বুঝা গেল। অতএব যথার্থ বলিয়া ঐ জ্ঞানটি প্রমার লক্ষণে গৃহীত হইবে। এই স্থলে আমরা একটি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষকে অবলম্বন করিয়া প্রমা লক্ষণের সঙ্গতি দেখাইলাম। এক্ষণে একটি স্মরণাত্মক জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া প্রমা লক্ষণের সঙ্গতি প্রদর্শিত হইবে। উক্ত চাক্ষুষ অনুভব জন্য সংস্কার সমুদ্বুদ্ধ হইলে "সেই পুষ্পটি রক্তবর্ণ" এই আকারে দেশান্তরস্থ কালান্তরস্থ ঐ পূর্বদৃষ্ট রক্তপুষ্পটি আমাদের স্মৃতিপথে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই স্মরণাত্মক জ্ঞানটিকে প্রমার অন্তর্গত বলিয়াই বুঝিতে হইবে। এবং ইহাতে পূর্বের প্রমার লক্ষণেরও সঙ্গতি হইয়াছে। কারণ উক্ত স্মরণাত্মক জ্ঞানে দেশান্তরস্থত্বাদি রূপে পুষ্পটি বিশেষ্যরূপে এবং রক্তবর্ণটি বিশেষণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষণরূপে প্রকাশিত রক্তবর্ণ বাস্তবিকপক্ষে বিশেষ্যরূপে প্রকাশিত পুষ্পে বিদ্যমান থাকায় উক্ত স্মরণাত্মক জ্ঞানেরও প্রদর্শিত প্রমা লক্ষণে সঙ্গতি হইল। এই প্রণালীতেই অনুমান, উপমিতি বা শাব্দবোধ স্থলেও বিশেষ্য ও বিশেষণাংশ পৃথক পৃথক ভাবে গ্রহণ করিয়া বিশেষণটি বিশেষ্যে আছে কি না দেখিতে হইবে। যদি থাকে প্রমা লক্ষণের সমন্বয় হইবে অন্যথায় হইবে না বুঝিতে হইবে। এইরূপ 'তদভাববতি তৎপ্রকারক জ্ঞান' হইলেই তাহা অপ্রমা হইবে। যেমন কামলা রোগগ্রস্ত ব্যক্তি অতি শুভ্র স্বচ্ছ স্ফটিককেও 'অয়ং স্ফটিকমণিঃ পীতঃ' এই আকারেই দেখিয়া থাকে। সেই স্থলে বিশেষ্য স্ফটিকমণি এবং পীতবর্ণ উহার বিশেষণরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। উক্ত বিশেষণটি বিশেষ্য স্ফটিক মণিতে বাস্তবিক পক্ষে নাই। অতএব ঐ জ্ঞান 'তদভাববতি তৎপ্রকারক' হওয়ায় প্রমার অন্তর্গত হইবে না। উক্ত অপ্রমা জ্ঞান জন্য সংস্কারের ফলে উৎপন্ন যে স্মরণাত্মক জ্ঞান তাহাও মূলীভূত অনুভবের ন্যায় ('তদভাববতি তৎপ্রকারকে'র) ন্যায় হইয়া যাইবে। অতএব ঐ সকল স্মরণাত্মক জ্ঞান অপ্রমারই অন্তর্ভুক্ত হইবে। এইভাবে অপরাপর স্থলেও অপ্রমার লক্ষণ বুঝিতে হইবে।

এই যে স্মৃতি সাধারণ প্রমাত্বের কথা বলা হইল ইহা সূত্রকার গৌতম, ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন, বার্তিককার, উদ্দ্যোতকর—এই মুনিত্রয়ের সম্মত নহে বলিয়া মনে হয়। কারণ সূত্রকার "প্রত্যক্ষানু-মানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি" এই সূত্রের দ্বারা প্রমাণকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ইহার দ্বারা বোঝা যায় যে চতুর্বিধ প্রমাণেরও অতিরিক্ত প্রমাণ তিনি স্বীকার করেন না। কিন্তু যদি যথার্থ স্মরণাত্মক জ্ঞান প্রমার অন্তর্গত বলিয়া সূত্রকারের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে প্রমাণগুলিকে উক্ত ভাগ চতুষ্টয়ে বিভাগ করা সমীচীন হইত না। কারণ, স্মৃতিরূপে প্রমার করণ উক্ত চতুর্বিধ প্রমাণের বহির্ভূত আছে। অতএব প্রমাণের চতুর্ধা বিভাগের দ্বারা সূত্রকার ইহাই সূচনা করিয়াছেন যে স্মরণাত্মক জ্ঞান যথার্থ হইলেও উহা প্রমার অন্তর্গত হইবে না। অতঃপর যাহারা স্মৃতিকেও প্রমা বলিতে চান তাহারা প্রগল্‌ভ নৈয়ায়িক ছাড়া আর কিছুই নহে। আরও কথা এই যে, 'প্রমাণ' এই পদটির ব্যুৎপত্তি হইতেও প্রমা যে 'স্মৃতি সাধারণ' নহে তাহাই পাওয়া যায় সুতরাং স্মৃতি ব্যাবৃত্ত প্রমার লক্ষণই সূত্রকার ও ভাষ্যকারের অভিমত। 'প্রমীয়তে অনেন' এই ব্যুৎপত্তিতে প্রপূর্বক 'মা' ধাতুর উত্তর করণ বাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় করিয়া 'প্রমাণম্' এই পদটি নিষ্পন্ন হয়। ইহাতে প্রপূর্বক 'মা' ধাতুর অর্থ অন্তর্নিবিষ্ট আছে। 'প্র' উপসর্গটি প্রকর্ষের দ্যোতনা করিয়া থাকে এবং 'মা' ধাতুটি জ্ঞানরূপ অর্থের অভিধান করে। অতএব প্রমা বলিতে প্রকর্ষবিশিষ্ট জ্ঞানকে বুঝায়।

বিষয়ের সঙ্গে অব্যভিচার জ্ঞানের একপ্রকার প্রকর্ষ। ইহার দ্বারা বিষয় ব্যভিচারী ভ্রমাংশে যে প্রমা হইবে না তাহা বুঝা গেল। অজ্ঞাত অর্থের জ্ঞাপকত্ব জ্ঞানের অপর একটি প্রকর্ষ। এই প্রকর্ষ না থাকায় স্মৃতি ও প্রমার অন্তর্গত হইবে না। সুতরাং প্রকর্ষবিশিষ্ট জ্ঞান বলিতে এবং অনধিগত অর্থবিষয়ক জ্ঞানকেই বুঝিতে হয়। সুতরাং ফল কথা যথার্থ অনুভবই প্রমার লক্ষ্য হইবে। এতদনুসারে., অনধিগত অবাধিতবিষয়ত্বই প্রমার লক্ষণ হইবে। এই লক্ষণে অর্থে দুইটি বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, একটি অবাধিতত্ব অপরটি অনধিগতত্ব। প্রথম বিশেষণের দ্বারা ভ্রমজ্ঞানের ব্যাবৃত্তি হইয়াছে। কারণ ভ্রম জ্ঞানের অর্থ অর্থাৎ বিষয় পরবর্তী বলবান বাধজ্ঞানের দ্বারা, বাধাপ্রাপ্ত হইয়া যায় এই কারণে উহা অবাধিত অর্থ বিষয়ক হয় না। স্মরণাত্মক জ্ঞানের বিষয় স্থলবিশেষে বাধাপ্রাপ্ত না হইলেও সর্বত্রই উহা পূর্ববর্তী অনুভবের দ্বারা অধিগতই হইয়া থাকে। এই কারণেই অনধিগত বিষয়ক না হওয়ায় স্মরণাত্মক জ্ঞানে উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না। বাচস্পতি মিশ্র তদীয় তাৎপর্য টীকায় স্মৃতি ব্যাবৃত্ত লক্ষণেরই সমাদর করিয়াছেন। পরিশুদ্ধিকার ও স্মরণ জাতীয় জ্ঞানকে প্রমার অন্তর্গত বলিয়া মনে করেন নাই।

উক্ত প্রমা লক্ষণ সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রত্যক্ষস্থলে প্রত্যক্ষধারার অন্তর্গত দ্বিতীয়াদি প্রত্যক্ষে অব্যাপ্তির আশঙ্কা হইতে পারে। ঘট বা পটাদি কোন বস্তু বিশেষের সহিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে ঐরূপ সন্নিকর্ষ কিছুকাল পর্যন্ত স্থায়ী হইতে পারে যদি বিষয়ান্তরে মন বা বহিরিন্দ্রিয় সঞ্চারিত না হয়। এইরূপ অবস্থায় একই বিষয়ে একই আকারে পুনঃ পুনঃ চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে থাকে। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানগুলি একটির সহিত অপরটির অন্তর বা কাল ব্যবধান নাও থাকিতে পারে। এইরূপ স্থলীয় যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানগুলি তাহাকে প্রত্যক্ষধারা বলা হইয়া থাকে। এইরূপ স্থলে সর্বপ্রথম যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানটি উৎপন্ন হইয়াছে তাহার বিষয় অবাধিত ও অনধিগত হওয়ায় ঐ প্রত্যক্ষটিতে অবাধিত ও অনধিগত বস্তু বিষয়ক জ্ঞানত্বরূপ প্রমা লক্ষণের সঙ্গতি হইবে। কিন্তু দ্বিতীয়াদি পরবর্তী প্রত্যক্ষগুলিতে কথিত প্রমা লক্ষণের সঙ্গতি হইবে না কারণ দ্বিতীয়াদি প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত যে ঘট বা পটাদি বস্তু তাহা অবাধিত হইলেও ঐ ক্ষণে অনধিগত হয় নাই। কারণ পূর্ববর্তী প্রত্যক্ষের দ্বারা উহা অধিগতই হইয়া রহিয়াছে। অতএব অনধিগত বস্তুবিষয়ক না হওয়ায় ঐ দ্বিতীয়াদি প্রত্যক্ষে লক্ষণের অব্যাপ্তি হইল। মীমাংসক সম্প্রদায় এই স্থলে প্রমা লক্ষণের অন্যভাবে অব্যাপ্তি পরিহার করিয়াছেন। তাহারা রূপরহিত হইলেও কালের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেন। এইরূপ হইলে আর উক্ত অব্যাপ্তি হইবে না। কারণ দ্বিতীয়াদি প্রত্যক্ষগুলির বিভিন্ন প্রত্যক্ষে ভিন্ন ভিন্ন কাল বিষয় হওয়ায় ঐ প্রত্যক্ষগুলির প্রত্যেকটিই কালাংশে অনধিগত বস্তুবিষয়ক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই প্রণালীতে ন্যায় মতেও যে অব্যাপ্তি উদ্ধার হইয়া যাইবে তাহা নহে। কারণ এই মতে রূপ না থাকায় কালের প্রত্যক্ষ অস্বীকৃত হইয়াছে। অতএব ন্যায় মতানুসারে ধারাবাহিক স্থলীয় দ্বিতীয়াদি প্রত্যক্ষে প্রমা লক্ষণের অব্যাপ্তি পরিহৃত হইল না। উক্ত অব্যাপ্তি পরিহার করিতে হইলে প্রত্যেকটি জ্ঞানকে পৃথক পৃথক ভাবে গ্রহণ করিয়া তাহাদের বিষয় অনধিগত হইল কিনা এইরূপ ভাবে বিচার করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। কারণ পৃথক পৃথক ভাবে গৃহীত দ্বিতীয়াদি জ্ঞান ব্যক্তিগুলির বিষয় পূর্বপূর্ববর্তী জ্ঞানের দ্বারা অধিগতই হইয়াছে উহা

কখনও অনধিগত হইবে না। সুতরাং অন্য প্রণালীতেই এই অব্যাপ্তির নিরাশ করিতে হইবে। যে জাতীয় বিশিষ্ট জ্ঞানে প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানই সমানাকারক নিশ্চয়ের অপেক্ষা রাখে তজ্জাতীয় জ্ঞানকেই অধিগত বস্তুবিষয়ক বলিয়া পরিভাষিত হইয়াছে। এইরূপ হইলে ধারাবাহিক প্রত্যক্ষ স্থলে ও দ্বিতীয়াদি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উক্ত পারিভাষিক অনধিগতত্ব বস্তুবিষয়কত্ব অব্যাহত থাকিবে। অতএব আর অব্যাপ্তি হইবে না। যজ্জাতীয় বিশিষ্ট জ্ঞানের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সমানাকারক নিশ্চয়ের অপেক্ষা থাকে তজ্জাতীয় বিশিষ্ট জ্ঞান বলিয়া স্মরণজাতীয় জ্ঞানেরই গ্রহণ হইবে। কারণ স্মরণজাতীয় জ্ঞানের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পূর্বে সমানাকারক নিশ্চয় থাকে। অতএব পারিভাষিক নির্বচন অনুসারে স্মরণজাতীয় জ্ঞানই অধিগত বস্তুবিষয়ক হইবে। প্রত্যক্ষ জাতীয় জ্ঞানগুলির ক্ষেত্রে কোন কোন প্রত্যক্ষে যথা ধারাবাহিক প্রত্যক্ষ স্থলীয় দ্বিতীয়াদি প্রত্যক্ষে সমানাকারক নিশ্চয়ের উত্তর বর্তিত্ব থাকে। তাহা হইলে প্রত্যক্ষজাতীয় জ্ঞানের সর্বত্র উহা থাকে না। উক্ত ধারাবাহিক প্রত্যক্ষের প্রথম প্রত্যক্ষটিকেই আমরা সমানাকারক পূর্ববর্তিসমানাকারক কোন নিশ্চয় পাইব না। অতএব ধারাবাহিক প্রত্যক্ষস্থলীয় দ্বিতীয়াদি প্রত্যক্ষ ও পারিভাষিকভাবে অনধিগত বস্তুবিষয়ক হইয়া গেল। সুতরাং এক্ষণে আর কোন অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকিল না।

ভাট্ট মীমাংসক মতে ও যথার্থজ্ঞানত্বকে প্রমার লক্ষণ বলা যাইবে না। কারণ যথার্থ অনুভব জন্যে যে সংস্কার তদধীন জন্যা যথার্থ স্মরণকে প্রমা বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। এইরূপ হইলে এই মতেও অনধিগত অবাধিত অর্থবিষয়ক জ্ঞানত্বই প্রমার লক্ষণ হইবে। অনধিগতত্ব ও অবাধিতত্ব এই বিশেষণ দ্বয়ের ব্যাবৃত্তি পূর্বোক্তরূপই বুঝিতে হইবে। এইমতে ধারাবাহিক বুদ্ধিস্থলীয় দ্বিতীয়াদি জ্ঞানে সহজভাবে প্রমা লক্ষণের সঙ্গতি হইবে। কারণ ভাট্টমতে কালেরও প্রত্যক্ষ স্বীকার করা হইয়াছে। এইরূপ হইলে ধারাবাহিক প্রত্যক্ষস্থলে প্রথম জ্ঞানে যে কাল বিষয় হইয়াছে দ্বিতীয় জ্ঞানে তদ্‌ভিন্ন কালান্তর বিষয় হওয়ায় ঐ পরবর্তী জ্ঞানগুলিও কালাংশে অনধিগত বস্তুবিষয়কই হইল। অতএব এইমতে আর ধারাবাহিকস্থলীয় দ্বিতীয়াদি প্রত্যক্ষে অব্যাপ্তি বারণের নিমিত্ত যজ্জাতীয় বিশিষ্ট জ্ঞানত্বাবচ্ছিন্ন ইত্যাদি প্রণালী গ্রহণের আবশ্যকতা থাকিবে না। কারণ প্রত্যেক প্রত্যক্ষ জ্ঞানই কালাংশে অনধিগত বস্তুবিষয়ক হইবে। অতএব অনধিগত অবাধিত বস্তু-বিষয় স্বরূপ প্রমা লক্ষণের আর সংশোধনের আবশ্যক হইবে না।

বৌদ্ধমতে সম্যক্ জ্ঞানকেই প্রমা বলা হইয়াছে। এই মতে বিষয়ে আর পৃথক করিয়া অবাধিতত্ব ও অনধিগতত্ব বিশেষণের আবশ্যক হইল না। জ্ঞানগত সম্যকত্ব কাহাকে বলে এই প্রশ্নের উত্তরে ন্যায়বিন্দু টীকাকার ধর্মোত্তর…(অর্থ ক্রিয়া সমর্থে চ প্রবর্তকম্) (১) প্রবর্তকত্বকেই জ্ঞানের সম্যকত্ব বলিয়াছেন। কোন একটি লোক যেমন অপর একটি লোককে নানাপ্রকার বাক্যের দ্বারা প্রলোভিত করিয়া বিষয়বিশেষে প্রবর্তিত করে ঠিক এই প্রণালীতে জ্ঞান মানুষকে প্রবর্তিত করে না কারণ জ্ঞানের ঐরূপ কথোপকথনের সামর্থ নাই। অতএব প্রবৃত্তির বিষয়ীভূত যে অর্থ অর্থাৎ যে বিষয়ে লোক প্রবৃত্ত হয় সেই বিষয়টিকে সমুপস্থাপিত অর্থাৎ প্রকাশ করাই জ্ঞানের প্রবর্তকত্ব। বিসম্বাদী প্রবৃত্তিস্থলে জ্ঞান প্রবৃত্তির বিষয়ীভূত অর্থের প্রকাশ করে না। কারণ ভুল বুঝিয়া প্রবৃত্ত হইলে সেই প্রবৃত্তি বিসম্বাদী হইয়া থাকে। শুক্তিখণ্ডকে রজতরূপে বুঝিয়া রজতপ্রাপ্তির

নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইলে অভিমত বস্তুর অপ্রাপ্তিবশতঃ প্রবৃত্তি বিসম্বাদিনী হইয়া থাকে। ঐ স্থলে রৌপ্যই প্রবৃত্তির বিষয়ীভূত অর্থ। কারণ রৌপ্যপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে প্রবৃত্তি হইয়াছিল কিন্তু প্রবৃত্তির মূলীভূত জ্ঞান রৌপ্য রূপ অর্থের প্রদর্শন করে নাই অসদ্‌ভূত রৌপ্যেরই প্রদর্শন করিয়াছে। সুতরাং ভ্রমজ্ঞানে প্রকৃতি বিষয়ীভূত অর্থপ্রদর্শকত্ব না থাকায় উহা সম্যক জ্ঞান হইবে না। অতএব কথিত সম্যক্ জ্ঞাতত্বরূপ প্রমার লক্ষণ ভ্রান্ত বিজ্ঞানে অতিব্যাপ্ত হইল না। স্মরণে ও এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না কারণ স্মরণাত্মক জ্ঞান মূলীভূত অনুভবের বিষয়কে অতিক্রম করিয়া বিষয়ান্তরের প্রকাশক হয় না। অতএব উহার যাথার্থ্য যেমন মূলীভূত অনুভবের যাথার্থ্যকে অনুসরণ করে এইরূপ উহার প্রবর্তকত্বও অর্থাৎ প্রবৃত্তির বিষয়ীভূত অর্থপ্রদর্শকত্বও মূলীভূত অনুভবানুসারীই হইয়া থাকে। অতএব স্বতন্ত্র প্রবর্তকত্ব অর্থাৎ স্বাধীনভাবে প্রবৃত্তির বিষয়ীভূত অর্থ-প্রকাশকত্ব না থাকায় স্মরণে কথিত প্রমা লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না। জৈন দর্শনে প্রমাণের লক্ষণ বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রমাণ মীমাংসাকার হেমচন্দ্র বলিয়াছেন যে সম্যক অর্থ নির্ণয়ই প্রমাণ অর্থাৎ প্রমা নির্ণয় বলিতে যাহা সংশায়াত্মক নহে এবং অনধ্যবসায় বা নির্বিকল্পাত্মক নহে এমন জ্ঞানকে বুঝিতে হইবে। ফলতঃ নিশ্চায়ত্মক জ্ঞানকেই নির্ণয় বলা হইয়াছে। শুক্তিকা প্রভৃতিকে সম্মুখস্থিত বস্তু বিষয়ে দোষাধীন যে "ইদং রজতম্" এইরূপ আকারে অথবা দেহাদি অনাত্ম বস্তুতে আত্মতাবগাহী যে "অহং গৌরঃ, দীর্ঘঃ" এইরূপ আকারে আমাদের জ্ঞান সকল উৎপন্ন হয় তাহাও নির্ণয়ের মধ্যেই পরিগণিত হইবে। কারণ এই সকল জ্ঞান ভ্রান্ত হইলেও সংশয় বা নির্বিকল্পক নহে। এই সকল ভ্রান্ত বিজ্ঞানে প্রমা লক্ষণের অতিব্যাপ্তি আশঙ্কা করিয়া নির্ণয়ে "সম্যকৃত্ব" রূপ বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। "অবিপরীত ঈহা" ই 'সম্যক' এই পদের অর্থ। ইহার দ্বারা যাহা অবিপরীতভাবে অর্থের প্রকাশ করে এবং যাহা সংশয় বা নির্বিকল্পক জ্ঞান হইতে পৃথক এমন জ্ঞানকে জৈনমতে প্রমাণ বা প্রমা বলা হইয়াছে। ফলতঃ অবাধিত অর্থ বিষয়ক সবিকল্পক জ্ঞানকেই প্রমা বলা হইল। 'যাহার বিষয় বাধাপ্রাপ্ত হয় না' এইরূপ উক্তির দ্বারাই সংশয় বা বিপর্য্যাস এর প্রতিক্ষেপ করা হইয়াছে। কারণ ঐ সকল জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানান্তরের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। সবিকল্পক পদের দ্বারা নির্বিকল্পক জ্ঞানের পরিহার হইয়াছে। পূর্বে আলোচিত জ্ঞানের লক্ষণটি আর "যথার্থজ্ঞানং প্রমা" এই লক্ষণটি পৃথক পৃথক বাক্যের দ্বারা ব্যবহৃত হইলেও নিকৃষ্ট অর্থে কিন্তু লক্ষণদ্বয়ের একরূপতাই বুঝিতে হইবে। এই মতে অর্থাংশে আর অনধিগতত্বরূপ বিশেষণ প্রবিষ্ট হয় নাই অতএব ধারাবাহিক প্রত্যক্ষস্থলীয় দ্বিতীয়াদি প্রত্যক্ষে অব্যাপ্তির কোন প্রশ্নই উঠে না। যথা অনুভব জন্য সংস্কার সমুদ্বুদ্ধ হইলে যে স্মরণাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাও এই মতে প্রমারই অন্তর্গত হইবে।

ন্যায়বিন্দু ধর্মোত্তর টীকা ১ম পরিচ্ছেদ পৃ-৮

রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনষ্টাইন, বন্ধুত্ব-ইতিহাস

অশ্রুকুমার সিকদার

পরস্পরের প্রতি বন্ধুকৃত্য

রোটেনষ্টাইনকে রবীন্দ্রনাথ অগ্রগণ্য বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে স্থান দিয়েছিলেন। তাঁর বন্ধুত্বের সুস্বাদ পেয়ে সব সময়ই রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন তাঁর অন্য বন্ধু যাঁরা তাঁরাও যেন রোটেনষ্টাইনের সঙ্গে সৌহার্দ্য সম্পর্কে আবদ্ধ হন। এই বাসনার বশবর্তী হয়ে নানা বন্ধুর সঙ্গে তিনি রোটেনষ্টাইনের যোগাযোগ ঘটানোর চেষ্টা করেছেন। পরিচিত তরুণ ছাত্র যখনই বিদেশে গেছেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের হাতে রোটেনষ্টাইনের নামে পরিচয়পত্র দিয়েছেন এবং তাঁদের প্রবাস জীবন সহজ করার জন্য সমুদ্রপারের বন্ধু যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। কখনো তিনি রোটেনষ্টাইনকে লিখেছেন কারো পদোন্নতিতে, কারো গ্রন্থপ্রকাশে, বা অন্য কোন কোনো ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য। এই সমস্ত থেকে বোঝা যায় তিনি দৈবপ্রাপ্ত এই বন্ধুর উপর কতটা নির্ভর করতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন।

অবশ্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সঙ্গে রোটেনষ্টাইনের যোগাযোগ রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে হয় নি, ব্রজেন্দ্রনাথই বরং তাঁদের দুজনের যোগাযোগ ঘটাতে সাহায্য করেছিলেন। তবু পরের দিকে তিনি ব্রজেন্দ্রনাথের দায়িত্বও নিজ স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন এবং তার বিষয়ে রোটেনষ্টাইনকে চিঠিপত্রও লিখেছেন, যেমন নিউইয়র্কের Herald Square Hotel থেকে ৩১ অক্টোবর ১৯১২ তারিখে লিখেছেন,

I am eagerly waiting to have some news of Dr. Seal. I do hope it will be possible for him to stay in England and do his work there. I gathered from Mr. Arnold that it would be quite easy for Dr. Seal to get the appointment at Cromwell Road if he would only accept it.

এরপর ২৯ মার্চ ১৯১৪ তারিখে রবীন্দ্রনাথ আবার লিখলেন রোটেনষ্টাইনকে,

Dr. Seal is about to leave India for England with his daughter. He is anxious that you should know her. She is a widow though very young, and she has written a book in Bengali which is a remarkable production, destined to take a very high place in our literature. She wants to carry on her education in England and she should be glad to get your advice in this matter.

ব্রজেন্দ্রনাথের এই বিধবা কন্যার নাম সরযূবালা দাশগুপ্তা—দেশবন্ধুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসন্তরঞ্জনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। তাঁর যে গ্রন্থের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'destined to take a very high place in our literature' সেই গ্রন্থের নাম 'বসন্ত-প্রয়াণ', স্বামীর অকাল মৃত্যুতে স্বামীর স্মরণে লিখিত। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন। যদিও রবীন্দ্রজীবনীকার বলেছেন,

লেখার মধ্যে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় ছিল বলিয়াই যে রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন তাহা নহে, ব্রজেন্দ্রনাথের কন্যা বলিয়াও মমতাবশতঃ এটি লেখেন বলিয়া আমাদের সন্দেহ হয়।

তবু রোটেনষ্টাইনকে লেখা একান্ত ব্যক্তিগত পত্রে গ্রন্থটি সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা পড়ে মনে হয় গ্রন্থটির সাহিত্যমূল্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বাস্তবিকই উচ্চ ধারণা পোষণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে কেম্ব্রিজ থেকে রবীন্দ্রনাথকে লেখা ব্রজেন্দ্রনাথের ২৯শে মে ১৯১৪ তারিখের চিঠিটি (বিশ্বভারতী পত্রিকা ২০।২) উদ্ধারযোগ্য—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই আমি দেশের জন্য রওয়ানা হইব। এখানে এখনও আমি Rothenstein-এর সহিত সাক্ষাৎ করিতে সুযোগ পাই নাই। শীঘ্রই তাহার Country residence-এ যাইয়া সাক্ষাৎ করিব।

এবার জাহাজে Mr. Thompson-এর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইল। বসন্ত-প্রয়াণের সম্বন্ধে কথা হইলে, তিনি আমার সহিত প্রথম পরিচ্ছেদটি পাঠ করেন, ও অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে ইংরাজি অনুবাদ করিতে সম্মত হন। Marseilles এ পঁহুছিবার মধ্যে প্রথম অংশের এক রকম rough translation হইয়া যায়। বিলাতে এ কাজটা অগ্রসর হইবে না ভাবিয়া আপনাকে অনুবাদের বিষয় জানাই নাই। কিন্তু Thompson সাহেব সেই প্রথম অংশের অনুবাদটা revise করিয়া MacMillan-দের কাছে দিয়া আসেন। তাহার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের অনুবাদ এক রকম শেষ হইয়াছে, ও Thompson সাহেবের অনুরোধে আমি MacMillan-দের নিকট পাঠাইয়াছি।

Thompson সাহেব MacMillan-এর নিকট আপনার ভূমিকার কথা বলিতে তাঁহারা সেই ভূমিকাটি দেখিতে চান।

আমি MacMillan-দের লিখিয়াছি যে ভূমিকাটি অত্যন্ত উপাদেয়। ভূমিকাতে গ্রন্থসম্বন্ধে যে সমস্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও লিখিয়াছি। কিন্তু জানাইয়াছি যে আপনার অনুমতি বিনা সে ভূমিকার translation ছাপাইতে চাহি না। English translation টা ভূমিকা ছাড়া MacMillan ছাপাইতে সম্মত হইবে কিনা বিশেষ সন্দেহের বিষয়।

MacMillan-এর কাছে এইরূপে প্রথমে উপস্থিত হইতে আমার ইচ্ছা ছিল না—এখনও Rothenstein দেখেন নাই, ও তাঁহার পরামর্শ না লইয়া কিছুই করিব না।

আপনার ভূমিকাটি এখনও অনুবাদ করি নাই। কলিকাতায় যাইয়া ভূমিকার English translation ছাপা সম্বন্ধে আপনার মত জিজ্ঞাসা করিব। এখন সে বিষয়ে কিছুই স্থির করিবার আবশ্যক নাই।

রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি গীতাঞ্জলির সাফল্যে বাঙালী লেখকদের মধ্যে এই সময় নিজেদের রচনা ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়ে বিশ্বের পাঠকমণ্ডলীর গোচরে আনার আগ্রহ দারুণভাবে বেড়ে যায়। এই প্রচেষ্টার মধ্যে একটি যে করুণ দিক ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথ-রোটেনষ্টাইনের বন্ধুত্ব-ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে 'বসন্ত-প্রয়াণের' মতো আরো দু-একটি অনুবাদ চেষ্টার কথা আমরা জানতে পারি। রবীন্দ্রনাথের দিদি স্বর্ণকুমারী দেবীও ইংরেজী অনুবাদের মাধ্যমে খ্যাতির মায়া-

মৃগের পিছনে ছুটেছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ২৮ জানুয়ারি ১৯১৩ তারিখের পত্রে (বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫৯) জানতে পারি এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন,

তোমার বই আমি ঠিক আমেরিকায় আসবার দিকে রেলোয়ে স্টেশনে পেয়েছি। তুমি জান না এখানে কোনো বই প্রকাশ করা কত কঠিন। অবশ্য নিজের খরচে ছাপানো শক্ত নয় কিন্তু কোনো প্রকাশক, পাঠকদের কাছ থেকে বিশেষ সমাদরের সম্ভাবনা নিশ্চিত না বুঝলে নিজের খরচে ছাপাতে চায় না। এখানকার অনেক বই গ্রন্থকারের খরচে প্রকাশ হয়। আমি জানি এ বই প্রকাশ করবার চেষ্টা এখানে সফল হবে না। তাছাড়া তর্জমা খুব ভালো হয়েছে তা নয়—অর্থাৎ ইংরেজি রচনার উচ্চ আদর্শে পৌছয় নি।

পত্রোল্লিখ বইটি সম্ভবত স্বর্ণকুমারী দেবীর 'কাহাকে?' উপন্যাসের অনুবাদ "An Unfinished Song. By Mrs. Ghoshal (১) T. Warner Laurie, Ltd. London, Dec, 1913' কারণ 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'য় স্বর্ণকুমারী দেবীর নামে তালিকাবদ্ধ অপর দুইটি ইংরেজি অনুবাদের একটি 'The Fatal Garland' এই তারিখের অনেক আগে ১৯১০ সালে প্রকাশিত হয় এবং 'Short Stories' প্রকাশিত হয় মাদ্রাজ থেকে।

কিন্তু স্বর্ণকুমারী দেবী রবীন্দ্রনাথের অনুৎসাহে, প্রকারান্তর নিষেধে নিরস্ত হলেন না। তিনি এই উদ্দেশে বিলাতযাত্রার কথাও চিন্তা করতে আরম্ভ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন অত্যন্ত বিব্রত হয়ে রোটেনস্টাইনকে লিখলেন, (২)—

One thing is troubling my mind which I must tell you. You know my sister Mrs. Ghoshal who is an author. She is one of those unfortunate beings who has more ambition than abilities. But just enough talent to keep her mediocrity alive for a short period of time. Her weakness has been taken advantage of by some unscrupulous literary agents in London and she has had her stories translated and published. I have given her no encouragement but I have not been successful in making her see things in their proper light. It is likely that she may go to England and use my name and you may meet her but be mercyful to her and never let her harbour in her mind any illusion about her worth and her chance. I am afraid she will be a source of trouble to my friends who I hope will be candid to her for my sake and will not allow her to mistake ordinary politeness for encouragement.

দীনেশচন্দ্র সেনও ১৯০৭ সালে প্রকাশিত 'সতী' নামক পৌরাণিক কাহিনীর ইংরেজি অনুবাদ করেন এবং সেটি প্রকাশের জন্য রবীন্দ্রনাথের আনুকূল্য প্রার্থনা করেন। অনুবাদ পেয়ে আর্বানা থেকে ৬ই জানুয়ারি ১৯১৩ তারিখে রবীন্দ্রনাথ রোটেনস্টাইনকে লেখেন,—

Dinesh Babu has sent me proofs of his translation of 'Sati', and asked my

advice if it could be published in England. It is difficult for me to judge. But I think the story should be much more simply told and much of its prolixity cut down. Would if be possible for the Everyman's Library people to take it up and to include it in their series, after having throughbly revised it? Or perhaps, Mr. Crammer Byng might be tempted to take it in his hands.

সঙ্গে সঙ্গে তিনি দীনেশচন্দ্রকেও লিখলেন (চিঠিপত্র ১০-এর ৪১ নং পত্র)—সতীর তর্জমার প্রুফ পাঠাইলেন লিখিয়াছেন, কিন্তু পাই নাই, বোধহয় ভুলিয়াছেন। Paul Carus যে ধরনের বহি বাহির করেন তাহাতে মনে হয় না তিনি সতীর ইংরেজি অনুবাদ ছাপিতে প্রস্তুত হইবেন। আমার মনে হয় ইংলণ্ডে আপনার লেখা ছাপিবার চেষ্টা করা উচিত, কারণ, সেখানে আপনার ইংরেজি গ্রন্থটি (History of Bengali Language and Literature) প্রচুর সমাদর লাভ করিয়াছে। যে কেহ পড়িয়াছে সকলেই বিশেষভাবে প্রশংসা করিয়াছে। অথচ ছাপা কদর্য এবং ছাপার ভুল অপর্যাপ্ত। যাহাই হউক, সেখানে যখন আপনার আসন প্রস্তুত হইয়াছে তখন এদেশের দিকে না তাকাইয়া সেই দিকেই চেষ্টা করা কর্তব্য হইবে। আমার বোধহয় Everyman's Library Series-এর মধ্যে যদি আপনার বই চালাইতে পারেন তবে খ্যাতি অর্থ দুইই জুটিতে পারে।...Ernest Rhys ঐ series-এর Editor। আমাদের কালীমোহনের সঙ্গে তাঁহার খুব ভাব হইয়াছে।

এই চিঠির শেষে পুনশ্চ দিয়ে আবার জানালেন—এইমাত্র সতী পাইলাম। যদি বাহুল্য অংশ ছাঁটিয়া-ছুঁটিয়া মাজাঘষা করা যায় তবে এ জিনিস চলিতে পারিবে। মুশকিল এই এদেশের লোকের সময় এত অল্প যে এরূপ কাজে কাহারো রীতিমত সাহায্য পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। যদি কোনো প্রকাশক ইহা গ্রহণ করে তবে তাহারা সম্ভবত কাহাকেও দিয়া ইহার ব্যবস্থা করিতে পারে। আজ রোটেনস্টাইনকে লিখিয়া দিলাম যদি তিনি Wisdom of the East অথবা Everyman's Library-ওয়ালাদের দ্বারা আপনার এ বই মঞ্জুর করাইয়া লইতে পারেন। আগামী বসন্তে ইংলণ্ডে গিয়া আমি চেষ্টা দেখিব।

গ্রন্থকার-কৃত 'সতী'র ইংরেজি অনুবাদ 'Sati' ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয়।

এই সব ক্ষেত্রে রোটেনস্টাইনের সাহায্য প্রার্থনা ছাড়া শুধু বন্ধুতে বন্ধুতে যোগাযোগ ঘটানোর চেষ্টা রবীন্দ্রনাথ যে যে ক্ষেত্রে করেছেন তার কয়েকটি কথা উল্লেখ করছি। রোটেনস্টাইন ও জগদীশচন্দ্র দুজনেই বন্ধু, সুতরাং তাঁরা পরস্পরেরও বন্ধু হোন এই আকাঙ্ক্ষায় তাঁদের মধ্যে পরিচয় ঘটাতে তিনি উৎসুক। জগদীশচন্দ্রের বিলাতযাত্রার প্রাকালে আনুমানিক ১৪ই এপ্রিল ১৯১৪ তারিখে তিনি জগদীশচন্দ্রকে লিখলেন (চিঠিপত্র ৬)—

যদি সম্ভব হয় এবার একবার আমার বন্ধু রোটেনস্টাইনের সঙ্গে আলাপ করে এসো। তিনি তো খুশি হবেনই, তুমিও হবে। আমি তাঁকে, তোমার কথা আগেই লিখে দিয়েছি। তুমিও তোমার পৌঁছা সংবাদ তাঁকে দিয়ো।

রবীন্দ্রনাথ দুইটি চিঠিতে জগদীশচন্দ্রের যাওয়ার কথা রোটেনস্টাইনকে আগেই লিখে

দিয়েছিলেন। শিলাইদহ থেকে ১৯১৪-র পয়লা মার্চ লিখেছিলেন তিনি—

Dr. J. C. Bose will be in England sometime next May and I have been wishing I could accompany there.

অব্যবহিত পরেই একটি স্থানকাল নির্দেশহীন, সম্বোধনহীন, স্পষ্টতই খণ্ডিত চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ আবার লিখলেন—

Dr. J. C. Bose has started for England. I consider him my best friend in India and I hope you will have opportunity to know him and that he will meet with appreciation in the West which is his due.

রোটেনস্টাইন নিজের বাড়িতে সান্ধ্যসম্মিলনে বারট্রাণ্ড রাসেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে নিমন্ত্রণ জানালে তিনি সেই নিমন্ত্রণ সাগ্রহে গ্রহণ করে চিঠি লেখেন (৬ জুন ১৯১৩) এবং সেই চিঠির উল্টো পিঠে অনুরোধ করেন অনুষ্ঠানে সরোজিনী নাইডুকেও নিমন্ত্রণ করার জন্য— 'She is one of our famous poetesses.' তারপরে রোটেনস্টাইনের বন্ধু মাইকেল স্যাডলার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সভাপতি হিসাবে ভারতে এলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে সুখী হন এবং সেই আনন্দের কথা রবীন্দ্রনাথ দুইটি চিঠিতে (২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯১৫ এবং ১লা জুন ১৯১৮) রোটেনস্টাইনকে নিবেদন করেছেন।

শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় (৩) যখন বিলাতে গেলেন তখন রবীন্দ্রনাথ রোটেনস্টাইনের কাছে পরিচয়পত্র দিলেন তাঁর হাতে (১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯১৯)। তরুণ বয়সে যিনি সামান্য সাহিত্যচর্চা করেছিলেন, অবিভক্ত বাংলার রাজনৈতিক নেতা পরলোকগত সেই কিরণশঙ্কর রায়ের সঙ্গেও তিনি রোটেনস্টাইনের উদ্দেশে পরিচয়পত্র (২৬শে নবেম্বর ১৯১৯) দিয়েছিলেন। এইরকম পরিচয়পত্র দিয়েছিলেন ক্ষিতীশচন্দ্র রায়কেও (৩১শে জুলাই ১৯৩১) যখন শান্তিনিকেতনের এই প্রাক্তন ছাত্র শিল্পশিক্ষার জন্য বিলাতে যাচ্ছিলেন।

খ্যাতনামা চিত্রী হিসাবে এবং শিল্পশিক্ষালয়ের শিক্ষক হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত রোটেনস্টাইন বিশেষ করে ভারতশিল্পের অনুরাগী বলে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে ভারতীয় শিল্পীদের স্বপক্ষে প্রভাব বিস্তার করতে অনেকবার অনুরোধ করে চিঠি লিখেছেন। শ্রীনগর থেকে তিনি হিরন্ময় রায়চৌধুরীর জন্য লিখেছেন (১৪ই অক্টোবর ১৯১৪)—

Hironmoy Ray Chowdhury is here, in the vain attempt at securing an appointment. He asks me to request you to speak for him to some India Office authorities. Abanindra has resigned his post of Vice-Principal of Calcutta Art School and Hironmoy wants to fill the vacancy. But as this post commands comparatively high salary and with the solitary exception of Abanindra, has been held by Europeans, there is very little chance for him unless specially favoured by the higher powers. His qualifications are not inferior to those of the present Principal, but you know India is not for Indians and therefore he is trying to

approach India Office people, hoping against hope.

কিন্তু সুপারিশ করতে যেয়ে বিচারক্ষমতা রবীন্দ্রনাথ একেবারে হারিয়ে বসেন নি। রোটেনস্টাইন যখন হিরন্ময় রায় চৌধুরী সম্বন্ধে ততটা অনুকূল মত দিলেন না তখন রোটেনস্টাইনের অপক্ষপাত বিচারকে সমর্থন করে রবীন্দ্রনাথ (১০ই ডিসেম্বর ১৯১৫) লিখলেন—

My dearest friend, you are wonderfully right in your estimate of Hironmoy, who is no nephew of mine but a cousin of my late wife. He is some what foolish and his physical and mental indolence is far above normal.

অথচ রোটেনস্টাইনের কাছে লেখা এই মন্তব্যের কথা ভুলে এক যুগ পরে (১৫ই জুন ১৯২৭) দেখি হিরন্ময় রায়চৌধুরী যাতে কলকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষের পদ পান তার জন্য রবীন্দ্রনাথ রোটেনস্টাইনকে চেষ্টা করতে লিখছেন—

as far as I know, he has the best qualifications for it. রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী যিনি পরবর্তীকালে কলকাতা আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন, তাঁর অনুকূলেও প্রভাব বিস্তার করার জন্য রবীন্দ্রনাথ রোটেনস্টাইনকে অনুরোধ করেছেন ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯২৯ তারিখে লেখা চিঠিতে—

Dear friend, In connection with the decoration of the India House, London, the High Commissioner for India has submitted a scheme for the award of scholarships tenable in Europe to enable Indian artists to obtain further training in Europe. I am sure you have a voice in the selection of candidates and I have no hasitation in sending you my recomendation of a student named Ramendranath Chakravarty who is one of the most promising of our young artists. I feel certain that his training under your guidance will be very valuable for us when he comes back to us after his duties are over in England.

১। স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামীর নাম জানকীনাথ ঘোষাল।

২। হুটন গ্রন্থাগারে রক্ষিত চিঠিটির প্রথম অংশ নেই, ফলে তারিখ জানা যায় না। আভ্যন্তরীণ প্রমাণে মনে হয় নোবেল পুরস্কার লাভের পরে স্বদেশ থেকে এটি লিখিত ; সম্ভবত ১৯১৪ বা ১৯১৫ সালের কোন সময়ে।

৩। ইয়েটস্ যাঁর অনুরাগী ছিলেন, যাঁর নামে তিনি একটি কবিতা লিখেছিলেন, ইনি সেই Mohini Chatterji-র পুত্র।

বাংলার মন্দির

হিতেশরঞ্জন সান্যাল

রত্ন রীতিঃ পঞ্চরত্ন

বিষ্ণুপুর উদ্ভূত অঙ্গবিন্যাস অবলম্বন করিয়া রূপানুসন্ধানের যে পরিচয় পূর্ববর্তী প্রবন্ধে দিয়া আসিয়াছি তাহারই সমসাময়িককালে অঙ্গবিন্যাসের ভিন্নতর একটি পরিকল্পনা অবলম্বন করিয়া পঞ্চরত্ন মন্দির চর্চার আর একটি ধারা প্রবাহিত হইতেছিল। সংখ্যা ও ব্যাপ্তির দিক দিয়া দেখিতে গেলে এই ধারাটিই প্রবলতর। এই ধারার অনুপ্রেরণা আসিয়াছে দীর্ঘায়ত মন্দিরদেহের কল্পনা হইতে। দীর্ঘায়নের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে দেওয়াল আসনদৈর্ঘের অর্ধেক সীমা অতিক্রম করিয়া অনেকটা উঠিয়া আসিয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা আসন দৈর্ঘের সমান। দ্বিতায় পর্যায়ে আসিতেছে উর্ধাংশ প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রীয় রত্নটি। দীর্ঘায়ত দেওয়ালের পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু কেন্দ্রীয় রত্নের ভূমিকা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। খর্বাকৃতি নিম্নাংশের ক্ষেত্রে মন্দিরদেহের বিস্তার ও উচ্চতার মধ্যে সমতা রক্ষা করিবার ভার বহুলাংশে কেন্দ্রীয় রত্নের উপর ন্যস্ত। এইশ্রেণীর মন্দিরে দেওয়াল অপেক্ষা উচ্চতর কেন্দ্রীয় রত্ন গঠনের যুক্তি ইহাই। রত্ন বিন্যাসে ভারসাম্যের প্রয়োজনে পার্শ্বরত্নসমূহের স্থান ছাড়িয়া দিয়া কেন্দ্রীয় রত্ন যতটুকু ক্ষেত্র অধিকার করিতে পারে সাধারণতঃ তাহা নিম্নাংশের আচ্ছাদনের এক তৃতীয়াংশ বা তাহার সামান্য কিছুটা বেশী অংশের মধ্যে ব্যপ্ত। ইহার উপরে থাকিয়া কেন্দ্রীয় রত্নের পক্ষে খর্ব দেওয়ালের উচ্চতা অতিক্রম করা সহজেই সম্ভব। তাই নিম্নাংশের তুলনায় উচ্চতর কেন্দ্রীয় রত্ন অস্বাভাবিক হইয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু দীর্ঘায়ত দেহের পরিবর্তিত অবস্থায় দেওয়াল যেখানে উর্ধবিস্তারে অর্ধেক সীমা অতিক্রম করিয়া তাহার সমান হইয়া উঠিতেছে, মন্দিরদেহের মোট উচ্চতায় উর্ধাংশের ভূমিকাও হইয়া উঠিয়াছে সঙ্কুচিত। সুসমঞ্জস রত্ন বিন্যাসে নিম্নাংশের আচ্ছাদনের উপর যেটুকু ক্ষেত্র লইয়া ইহার আসন তাহাতে স্বাভাবিক ভাবে মোট উচ্চতায় ইহা মন্দিরের আসন দৈর্ঘের সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। কেন্দ্রীয় রত্নের এই অন্তর্নিহিত সীমা বদ্ধতার ফলে এই শ্রেণীর মন্দিরে দেওয়াল আসন দৈর্ঘের সীমা অতিক্রম করিলে মন্দিরদেহে সৃষ্ট হইবে হ্রস্বায়ত উর্ধাংশের অসঙ্গতি। দীর্ঘায়ত এই মন্দিরগুলিতে মোট উচ্চতার অর্ধেক থাকে নিম্নাংশের অধিকারে—তাই হ্রস্ব নিম্নাংশের মন্দিরগুলির মত দেহের বিস্তার ও উচ্চতার মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টির জন্য কেন্দ্রীয় রত্নের উপর অতটা নির্ভর করিতে হয় নাই—দেওয়ালই অনেকটা আগাইয়া থাকিতেছে।

বিষ্ণুপুরে উদ্ভূত অঙ্গবিন্যাস ও দীর্ঘায়ত দেহের মন্দিরসমূহের মধ্যবর্তী স্থান অধিকার করিতে পারে এমন কতকগুলি মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। এই মন্দিরগুলিতে দেওয়ালের উচ্চতা আসন দৈর্ঘ অপেক্ষা কিছুটা কম—দুই তৃতীয়াংশ হইতে তিন চতুর্থাংশের মধ্যে। বাঁকুড়া জেলার মেট্যালা গ্রামের লক্ষ্মীজনার্দন মন্দিরে (আনুমানিক অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত)

দেওয়ালের উচ্চতা আসন দৈর্ঘের দুই তৃতীয়াংশ। উর্ধাংশে কেন্দ্রীয় রত্ন দেওয়ালের ঠিক সমান। মন্দিরটিতে দেওয়াল যতদূর উচ্চ হইয়াছে তাহাতে মন্দিরদেহের ভারসাম্য সৃষ্টিতে নিম্নাংশের গুরুত্ব বাড়িয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু কেন্দ্রীয় রত্নের ভূমিকা এখনও প্রধান। কেন্দ্রীয় রত্নটি দেখিতেছি প্রাধান্যের সে পর্যায়ে গিয়া পৌছিতে পারে নাই। অথচ তাহার আসন বিস্তারের মধ্যে কিন্তু সে ইঙ্গিত বিদ্যমান। ইহার আসন নিম্নাংশের আচ্ছাদনের এক তৃতীয়াংশ ক্ষেত্র লইয়া ব্যাপ্ত। ফলতঃ রত্নটির দেহ হইয়াছে খর্ব এবং গুরুভার। কেন্দ্রীয় রত্নের অধিকারের বাহিরে যতটা স্থান রহিয়াছে তাহার উপরে পার্শ্বরত্নগুলিকে সুসমঞ্জস করিয়া তুলিতে কোন অসুবিধা ছিল না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পার্শ্বরত্নগুলি কেন্দ্রীয় রত্ন অপেক্ষা অনেক ছোট—ব্যবধানও বিস্তর। রত্ন সংগঠনে তাই পার্শ্বরত্নগুলি হইয়া উঠিয়াছে নিষ্প্রভ। এরূপ অবস্থায় নিম্নাংশ যে মন্দির সংগঠনে প্রাধান্য লাভ করিবে ইহাই স্বাভাবিক। হইয়াছেও তাহাই। বিশেষতঃ নিম্নাংশের আচ্ছাদনের ধর বাহিয়া পত্রাকৃতি আবেষ্টনী তাহার স্বাভাবিক সার্থকতা সত্বেও নিম্নাংশের প্রাধান্য আরও স্পষ্ট করিয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছে।

বীরভূম জেলার সুরুল গ্রামের লক্ষ্মীজনার্দন মন্দিরে (আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়)। দেওয়ালের উচ্চতা আসন দৈর্ঘের তিন চতুর্থাংশ এবং কেন্দ্রীয় রত্নের উচ্চতা দেওয়ালের ঠিক সমান। দেওয়াল আসন দৈর্ঘ অপেক্ষা কিছুটা কম বলিয়া কেন্দ্রীয় রত্ন এখনও সামঞ্জস্য না হারাইয়া দেওয়াল অপেক্ষা কিছুটা উচ্চ হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু এ সম্ভাবনা উপেক্ষিত থাকিয়া গিয়াছে। রত্নটির দেহ গঠনেও অসঙ্গতি বিদ্যমান। ইহার আসন বিস্তৃত হইয়াছে নিম্নাংশের আচ্ছাদনের অর্ধেকেরও বেশী ক্ষেত্র জুড়িয়া। আসনের পরিসরের পরিপ্রেক্ষিতে রত্নটি যতটা উচ্চ হইতে পারিত সেই সীমায় পৌছিবার পূর্বেই তাহার দেহ পরিসমাপ্ত। দেহ গঠনের এই বৈশিষ্টগুলি ইহাকে করিয়া তুলিয়াছে খর্ব এবং বিশেষরূপে গুরুভার। নিম্নাংশের সহিত মিলাইয়া দেখিলে এই বৈশিষ্টগুলিই বেশী করিয়া চোখে পড়ে। উভয় অংশের মধ্যে সুসমঞ্জস সম্পর্কের পথে এইগুলিই দেখিতেছি সর্বপ্রধান বাধা। রত্ন সংগঠনেও বিপর্যয় ঘটিয়াছে কেন্দ্রীয় রত্নের প্রসার হইতেই। ইহার অধিকারের বাহিরে যেটুকু ক্ষেত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহার উপর থাকিয়া পার্শ্বরত্নগুলির পক্ষে রত্ন সংগঠনে কোন প্রভাব বিস্তার করা অসম্ভব। বিস্তারে ইহারা কেন্দ্রীয় রত্নের এক তৃতীয়াংশ। উচ্চতায় অর্ধেক।

মুর্শিদাবাদ জিলার গোবরহাটি গ্রামের বৃন্দাবনচন্দ্র মন্দিরটিকে (১৭৭২ খৃষ্টাব্দ) সুরুল মন্দিরের অনেকটা সংশোধিত রূপ বলা যাইতে পারে। মন্দিরটির আসন ও দেওয়ালের সম্পর্ক সুরুল মন্দিরের অনুরূপ কিন্তু কেন্দ্রীয় রত্ন দেওয়াল অপেক্ষা উচ্চতর—আসন দৈর্ঘের সমান। এই ধরণের অঙ্গবিন্যাসের সম্ভাবনা স্থপতি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, মনে হয়। কেন্দ্রীয় রত্ন নিম্নাংশের আচ্ছাদনের এক তৃতীয়াংশের কিছুটা বেশী ক্ষেত্র অবলম্বন করিয়াছে। ইহার উপর তাহার ঐ উচ্চতা উর্ধবিস্তার সম্পর্কে তাহার নিজস্ব আসন ও মন্দিরের আসনের মধ্যে যে ইঙ্গিত বিদ্যমান তাহারই পূর্ণ রূপায়ন। এতদসত্বেও পার্শ্বরত্ন-সমূহের গঠনে কিছুটা ত্রুটি ঘটিয়া গিয়াছে। পার্শ্বরত্নগুলি প্রসারে কেন্দ্রীয় রত্নের অর্ধেকের মত হইলেও উচ্চতায় তাহার অর্ধেকের সামান্যই বেশী। এইজন্যই রত্ন সংগঠনে কেন্দ্রীয় রত্নের প্রাধান্য একটু অতিরিক্ত বলিয়া মনে হয়।

দীর্ঘায়ত দেহের লক্ষণ সম্বলিত প্রাচীনতম মন্দিরটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় হুগলী জেলার কৃষ্ণপুর গ্রামের পরিত্যক্ত একটি শিব মন্দিরে। ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে নির্মিত মন্দিরটির দেওয়াল আসন দৈর্ঘ্যের সমান উচ্চ। কিন্তু রত্ন বিন্যাসে ও তাহাদের আকৃতি নির্ধারণে দীর্ঘায়ত দেহের কোন লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি না। উচ্চতায় কেন্দ্রীয় রত্ন দেওয়ালের দুই তৃতীয়াংশ, প্রসারে নিম্নাংশের আচ্ছাদনের তিনভাগের একভাগ মাত্র। পার্শ্বরত্নগুলি প্রসারে কেন্দ্রীয় রত্নের অর্ধেকের মত উচ্চতায় তাহার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ শুধুমাত্র আকৃতির কথা ধরিলে রত্নগুলির পারস্পরিক সম্পর্কে ত্রুটি ঘটিয়াছে মনে হয় না। আকারের পরিমাপগত প্রশ্নে রত্ন সংগঠন ত্রুটিহীন হওয়া সত্ত্বেও উর্ধাংশ যে সংহত হইয়া উঠিতে পারে নাই তাহার বোধ করি কেন্দ্রীয় রত্ন হইতে পার্শ্বরত্নগুলির অতিরিক্ত দূরত্ব-ব্যবধান। দেওয়াল হইতে হ্রস্বতর কেন্দ্রীয় রত্ন দীর্ঘায়ত দেহের রূপ সম্ভাবনা শুব্ধ করিয়া দিয়া যে অসঙ্গতি সৃষ্টি করিয়াছে রত্ন সংগঠনের দুর্বলতায় তাহাই হইয়া উঠিয়াছে প্রকট। উপরন্তু মন্দিরদেহের উভয় অংশকে একত্র সংহত করিয়া তুলিবার কোন সচেতন প্রচেষ্টার সাক্ষ্য মন্দিরটিতে নাই— নিম্নাংশের আচ্ছাদনের প্রান্তবাহী বেষ্টনীও অনুপস্থিত।

দীর্ঘায়ত মন্দির দেহ নির্মাণে নিম্নাংশ ও উর্ধাংশের সম্পর্ক নির্ণয়ে যে অসঙ্গতি দৃষ্টিগোচর পরবর্তী কতকগুলি মন্দির যেমন, হুগলী জেলার দশঘড়া গ্রামের গোপীনাথ মন্দির (১৭২৯ খৃঃ) ও বাঁকুড়া জেলার কোতলপুর গ্রামের ভদ্রপাড়াস্থ শ্রীধরজীউ মন্দিরে (১৮৩৩ খৃঃ) দেখিতেছি তাহারই পুনরাবৃত্তি। এ দুইটি মন্দিরে অবশ্য রত্ন সংগঠন অনেকটা সংহত। বিশেষ করিয়া, কোতুলপুরের মন্দিরটির রত্ন বিন্যাস তো সমুন্নত পঞ্চরত্নের মতই। নিম্নাংশের আচ্ছাদনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ক্ষেত্র জুড়িয়া কেন্দ্রীর রত্নের অবস্থান। পার্শ্বরত্নগুলির বিস্তার ক্ষেত্র কেন্দ্রীয় রত্নের অর্ধেক পরিমাণ। বৈষম্য ঘটিয়াছে উচ্চতা নির্ধারণে। কেন্দ্রীয় রত্ন উর্ধ বিস্তারে দেওয়ালের দুই-তৃতীয়াংশ আর পার্শ্বরত্নগুলি কেন্দ্রীয় রত্নের অর্ধেক পর্যন্ত উঠিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে।

দীর্ঘায়ত দেহের সূত্র ধরিয়া কতকগুলি মন্দিরে দেওয়ালকে আসন দৈর্ঘ অপেক্ষা বড় করিয়া তোলা হইয়াছে। ইহাদের কয়েকটিতে যেমন, মুর্শিদাবাদ জেলার ভট্টমাটি গ্রামের শিব মন্দিরে (আনুমানিক অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ) ও বর্ধমান জেলার দক্ষিণ শুরা গ্রামের ধর্ম মন্দিরে কেন্দ্রীয় রত্ন দেওয়াল অপেক্ষা হ্রস্ব। কয়েকটি মন্দিরে আবার দীর্ঘায়ত দেহের ছন্দ সর্বাঙ্গীন করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় রত্ন দেওয়াল অপেক্ষা উচ্চতর করিয়া গঠিত। হুগলী জেলার ইনাথনগর গ্রামের শিব মন্দিরে দেওয়াল আসন দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বড়। কেন্দ্রীয় রত্ন দেওয়াল অপেক্ষাও বৃহত্তর। অথচ পঞ্চরত্ন উর্ধাংশের সাংগঠনিক সমস্যার কথা মনে রাখিয়াই হয়ত ইহার আসন বিস্তার নিম্নাংশের আচ্ছাদনের এক-তৃতীয়াংশের কিছুটা বেশী ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আসনের এই পরিসর অবলম্বন করিয়া কেন্দ্রীয় শিখর রত্নকে স্বাভাবিকভাবে যতটা উচ্চ করিয়া তোলা সম্ভব প্রকৃতপক্ষে ইহার উচ্চতা অপেক্ষা অনেক বেশী। উচ্চায়ন হইয়াছে শুধুমাত্র দেওয়ালের মাধ্যমে, তাহাকে অসঙ্গতভাবে বড় করিয়া তুলিয়া। পার্শ্বরত্নগুলির প্রসার যুক্তিসঙ্গত কিন্তু উচ্চতায় ইহারা কেন্দ্রীয় রত্ন অপেক্ষা অনেক নীচে। দেহগত সীমা সম্ভাবনা অতিক্রম করিয়া কেন্দ্রীয়-রত্ন রত্ন সংগঠনকে করিয়া তুলিয়াছে বিশৃঙ্খল ও শিথিল আর মন্দির দেহের উভয় অংশের মধ্যে গড়িয়া

তুলিয়াছে দুস্তর ভাবগত ব্যবধান। হরিপাল গ্রামের (হুগলী জেলা) রায়পাড়াস্থ পঞ্চরত্ন শিব মন্দিরটিতে অঙ্গবিন্যাস অনুরূপ তবে কেন্দ্রীয় রত্ন এখানে সীমা-সম্ভাবনা অতিক্রম করিয়া ব্যপ্ত নহে, তাহাকে দীর্ঘায়ত করা হইয়াছে সুউচ্চ বেদীর উপর বসাইয়া। বেদী অংশ বাদ দিয়া দেখিলে রত্নটির রূপকল্পনা সম্পর্কে কোন অভিযোগ থাকে না। ইহার দেহে দেওয়াল অপেক্ষা আচ্ছাদন বা গন্তীর প্রভাবই অধিক। ধীর বক্ররেখায় বিধৃত ক্রমহ্রস্বায়মান গণ্ডীর বহিরেখায় দীর্ঘায়ত দেহের ব্যঞ্জনা। স্থপতির রূপকল্পনার প্রেরণা তো ইহাই।

বীরভূম জেলার সুপুর গ্রামের শিব মন্দিরে ১৮১৭ খৃঃ আসন ও দেওয়ালের সম্পর্ক ইনাথনগর ও হরিপাল মন্দিরের অনুরূপ। কেন্দ্রীয় রত্নটি কিন্তু একান্তভাবে তাহার নিজস্ব সীমা ও সম্ভাবনার মধ্যে আবদ্ধ। নিম্নাংশের আচ্ছাদনের এক-তৃতীয়াংশের কিছুটা বেশী ক্ষেত্র অধিকার করিয়া ঊর্দ্ধ-বিস্তারে ইহা মন্দিরদেহের আসনের ঠিক সমান। উচ্চতর দেওয়ালের উপর ইহার হ্রস্বতার অসঙ্গতি ম্লান হইয়া গিয়াছে গণ্ডীর বহিরেখা রচনার কৌশলে, দীর্ঘায়ত মন্দিরদেহের সামঞ্জস্যে গণ্ডীটি দীর্ঘছন্দে বাঁধিয়া দেওয়া। উপরন্তু দেওয়াল ও কেন্দ্রীয় রত্নের উচ্চতার ব্যবধানও খুব বেশী নহে। দীর্ঘায়ত দেহ ছন্দের সর্বাঙ্গীন বিস্তার বাধা পাইয়াছে পার্শ্বরত্নগুলিতে। প্রসারে ইহারা কেন্দ্রীয় রত্নের অর্ধেক, উচ্চতাতেও তাহাই। এইগুলিকে আর একটু উচ্চ করিয়া তুলিলে—আসনে তো সে ইঙ্গিত ছিলই—কেন্দ্রীয় রত্নের প্রাধান্য সর্বাত্মক হইয়া উঠিতে পারিত না। কিন্তু সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও মন্দিরটির দেহে যে অখণ্ড রূপরেখার আভাস সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে সামগ্রিক ভাবানুভূতি এবং নিম্নাংশ ও কেন্দ্রীয় রত্নের মধ্যে সমগোত্রীয়তার বন্ধন।

দীর্ঘায়ত মন্দিরদেহের যতগুলি রূপভেদের কথা বলিয়া আসিলাম তাহাদের প্রত্যেকটিতেই দেখিতেছি দেহগত অসঙ্গতির লক্ষণ। পঞ্চরত্ন ভাবকল্পনার অন্তর্নিহিত সীমা-সম্ভাবনা লঙ্ঘন করিয়া ইহাদের অঙ্গবিন্যাস। সামঞ্জস্যের স্বাভাবিক যুক্তিতেই কেন্দ্রীয় রত্ন আসন দৈর্ঘ্যের সীমা লঙ্ঘন করিতে পারে না। ফলতঃ, দেওয়ালও একই সীমাবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। উপরে যতগুলি দীর্ঘায়ত মন্দিরদেহের বর্ণনা করিয়াছি তাহাদের সব কয়টিরই অঙ্গবিন্যাস সামঞ্জস্য সৃষ্টির এই স্বাভাবিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া। একমাত্র সুপুরের মন্দিরটি ছাড়া এই মন্দিরগুলিতে তাই সংবদ্ধ রূপরেখার কোন পরিচয় মিলিতেছে না—সামঞ্জস্যের অভাবে মন্দিরদেহের উভয় অংশেই থাকিয়া গিয়াছে স্বাতন্ত্র্যের সম্ভাবনা। রত্নমন্দিরের মূলগত কৃত্রিমতা অতিক্রম করিবার কোন প্রচেষ্টা এগুলিতে নাই।

দীর্ঘায়ত মন্দিরদেহে পঞ্চরত্ন ভাবকল্পনার সীমা ও সম্ভাবনা উপলব্ধি করিয়া যে মন্দিরগুলি নির্মিত হইয়াছিল তাহাদের দেওয়ালের উচ্চতা ও কেন্দ্রীয় রত্নের ঊর্দ্ধবিস্তার উভয়েই আসন দৈর্ঘ্যের সমান। পাত্রসায়র সহরের (বাঁকুড়া জেলা) উত্তর পাড়ার বিষ্ণু মন্দিরে, হুগলী জেলার বোরাগড় গ্রামের গঙ্গাধর ও রামেশ্বর মন্দিরে এবং ঐ জেলারই আলা গ্রামের রাধাগোবিন্দ জীউর দোলমঞ্চে এই প্রাথমিক সামঞ্জস্যের উপরে পঞ্চরত্ন ঊর্ধাংশে কেন্দ্রীয় রত্নটির পরিপ্রেক্ষিতে পার্শ্বরত্নগুলির সুসম বিন্যাস ও সামঞ্জস্যপূর্ণ আকৃতি সংহত ভাবকল্পনার পরিচায়ক। ইহাদের অঙ্গবিন্যাসের ত্রুটিহীন পরিমাণ বোধ মন্দিরদেহের বিভিন্ন অংশকে একত্র সংহত করিয়া একটা অখণ্ড বহিরেখার মধ্যে

বাঁধিয়া দিয়াছে। তবে শিখর রত্নগুলির—বিশেষ করিয়া কেন্দ্রীয় রত্নের রূপরেখা কিছুটা বিচ্ছিন্ন ভাবে কল্পিত। ইহাদের অঙ্গবিন্যাসে দেওয়ালের স্থানটাই প্রধান। গণ্ডীর আকৃতি রচনাও গম্বুজের মত অর্ধবৃত্তের গতিপথ অনুসরণ করিয়া।

উপরি উক্ত মন্দিরগুলিতে রূপোপলব্ধির পথে শিখর রত্নের আকৃতি যে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছিল কাঞ্চনগর গ্রামের (বর্দ্ধমান জেলা) বিষ্ণু মন্দিরে স্থপতির কল্পনা তাহা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। রত্নগুলির ধীর বক্ররেখায় বিধৃত ক্রমহ্রস্বায়মান গণ্ডী দীর্ঘায়ত দেহের সবটুকু ছন্দ কেন্দ্রীভূত করিয়া ধীর গতিতে উপরের দিকে উঠিয়া যাইতেছে। দীর্ঘায়ত দেহ ছন্দের সামগ্রিক বন্ধনে মন্দিরদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাহিয়া বহিয়া চলিয়াছে সরল রেখার নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ। রত্ন মন্দিরদেহের অন্তর্নিহিত কৃত্রিমতার অসঙ্গতি এই রেখা প্রবাহের অন্তরালে অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ভাবকল্পনার ঠিক অনুরূপ পরিণতির সাক্ষাৎ মিলিবে মানকড় গ্রামের (বর্ধমান জেলা) রাইপুর পল্লীর মহাদেব মন্দিরে (আনুমানিক অষ্টাদশ শতকের শেষ বা উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত)

রূপভেদের কতগুলি অপ্রধান দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া পঞ্চরত্ন মন্দিরের প্রসঙ্গ শেষ করিব ; রত্ন মন্দিরে শিখর রত্নের গণ্ডী গাত্রে নিয়মিত ব্যবধানে স্থাপিত ঈষৎ উদ্গত আনুভূমিক রেখা সংযোজন করিয়া বৈচিত্র্যায়নের প্রচেষ্টা প্রায় সর্বতোগ্রাহ্য প্রথায় পরিণত হইয়াছিল। পঞ্চরত্ন মন্দিরের অধিকাংশ শিখর রত্নেই গণ্ডীগাত্রের আনুভূমিক রেখা বন্ধনী অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। বিষ্ণুপুরের শ্যামচাঁদ মন্দির, মদন গোপাল মন্দির, সলদা গ্রামের গোকুলচাঁদ মন্দির ও রাধানগর গ্রামের রঘুনাথ মন্দিরের চালারত্নের আচ্ছাদনেও দেখিতেছি আনুভূমিক বন্ধনীর ব্যবহার। এই প্রায় সর্বতোগ্রাহ্য পদ্ধতির ব্যতিক্রম ঘটাইয়া কিছু সংখ্যক পঞ্চরত্ন মন্দিরের রত্ন শিখরে গণ্ডীর দেহ করিয়া তোলা হইয়াছে সমতল ও সরল। এইরূপ রত্ন শিখরের সাক্ষাৎ মিলিবে বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী সহরের অন্তর্গত ঘরপাড়া পল্লীর কুলি শিব মন্দিরে, বীরলোক গ্রামের (হুগলী জেলা সিংহবাহিনী মন্দিরে. মাণিকপাট গ্রামের (হুগলী জেলা) সীতারাম মন্দিরে ও জগদানন্দপুর গ্রামের (বর্ধমান জেলা) একটি মন্দিরে। সোনামুখী সহরে বৃন্দাবনের গোবর্ধন পর্বতের স্মৃতিবাহী গিরিগোবর্ধন নামে আখ্যাত পঞ্চরত্ন সৌধটির রত্ন দেহ পর্বত গাত্রের অনুকরণে সম্পূর্ণ উচ্চাবচ করিয়া গড়া।

কতকগুলি ক্ষেত্রে পঞ্চরত্ন দেহকে স্থাপন করা হইয়াছে সমতল আচ্ছাদনের একটি কক্ষের উপরে। ফলে, সমগ্র দেহটি হইয়াছে দ্বিতল। বীরলোকের সিংহবাহিনী মন্দির, সোনামুখী সহরের ঘরপাড়া পল্লীর কুলি শিব মন্দির এই রূপ দ্বিতল পঞ্চরত্নের নিদর্শন। সবগুলি মন্দিরেই গর্ভগৃহের অবস্থান প্রথম তলের কক্ষটিতে। দ্বিতলের পঞ্চরত্ন কক্ষটির যোজনা বোধ করি বৈচিত্র্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে।

বঙ্কিম উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা

অশোক কুণ্ডু

তকি খাঁ (চন্দ্র: ৩।৩)

তকি খাঁ-র চরিত্র চিত্রণে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের নির্দেশ অমান্য করেছেন। ইতিহাসে আছে তকি খাঁ মীরকাশেমের বিশ্বস্ত সেনাপতি এবং সিংহাসন রক্ষার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম প্রথম তকি খাঁকে বিশ্বস্ত রাজকর্মচারী রূপেই অংকন করেছেন। দলনীকে উদ্ধারের ভার পড়েছিল তাঁরই ওপর। কিন্তু দলনী উদ্ধারে ব্যর্থ হয়ে, নিজের কৃতিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য শেষপর্যন্ত তিনি মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। তবে তকি খাঁর মধ্যে মাঝে মাঝে অনুশোচনাও জেগেছে। দলনী বিষপান করতে রাজী হলে—'মহম্মদ তকি মর্মের ভিতর লজ্জায় মরিয়া গেল।' কিন্তু আবার দলনীর রূপ-যৌবন দর্শনে তিনি মনে মনে পাপ আশাও পোষণ করেছেন—তিনি বলেছেন—'শুন সুন্দরী আমাকে ভজ।' তকি খাঁ পাপী, কিন্তু নির্বোধ পাপী। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাঁকে করতে হয়েছে নবাবের তরবারি নিজের রক্তে রঞ্জিত করে।

তসবিরওয়ালী (রাজ: ১।১)

অল্প বয়সেই বুড়ী তসবিরওয়ালীয় চরিত্রটি বিশিষ্টতা লাভ করেছে। একরাশ সুন্দরী যুবতীর সামনে তার বিহ্বলভাব এবং চঞ্চলকুমারীর অপূর্ব সৌন্দর্য দর্শনে বিভ্রম—হাস্যরসের খোরাক জুগিয়েছে। কিন্তু বুড়ী সেখানে নিজ পুত্রের নিকট রূপনগরে চিত্রদলন বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছে, সেখানেই তার ভাবভংগী লক্ষ্য করার মত। চরিত্রটি হাস্যরসের আমদানী করলেও উপন্যাসের মুল ঘটনার সূত্রপাতে তার ভূমিকা অনেক।

তারাচরণ (বিষ: ৬ষ্ঠ পরি:)

তারাচরণ সূর্যমুখীর আপন ভাই নয়। ছেলেবেলায় শ্রীমতী নামে এক কায়স্থ বিধবা সূর্যমুখীকে লালন-পালন করত। 'শ্রীমতীর একটি শিশুসন্তান ছিল, তাহারই নাম তারাচরণ। সে সূর্যমুখীর সমবয়স্ক। সূর্যমুখী তাহার সহিত বাল্যকালে খেলা করিতেন এবং বাল্যসখীত্ব প্রযুক্ত তাঁহার প্রতি তাঁহার ভ্রাতৃবৎ প্রেম জন্মিয়াছিল।'

অল্প পরিসরে তারাচরণের চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সে ইংরাজী বিদ্যা কোন রকম আয়ত্ত করে গ্রামে স্কুল করে সেখানকার দেবতাস্বরূপ হয়ে উঠেছে। সে ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হয়ে মুখস্ত বক্তৃতা দেয়। স্ত্রীস্বাধীনতার কথা বলে। কিন্তু নিজের বৌকে বাইরে বের করায় সময় তার কুণ্ঠার অন্ত নেই। বঙ্কিমসমকালে এই ধরণের মূর্খ ব্যক্তিরা সমাজ সংস্কারের নামে কি প্রকার হাসির খোরাক জোগাত তারাচরণ তার সার্থক প্রতিলিপি। তারাচরণ কুন্দের মত নারীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল সত্য, কিন্তু বানরের গলায় মুক্তোর মালার মত তা সহ্য হল না।

তাই তারাচরণকে মৃত্যুবরণ করতে হল। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে দুর্ভাগ্য যে সে তিন বছরের সংসার-জীবনেও কুন্দনন্দিনীর মনে এতটুকু দাগ কাটতে পারল না।

তারার মা (দেবী: ১।২)

হরবল্লভের বাড়ীর একজন চাকরানী। সে দুই একবার প্রফুল্লদিগের বাড়ী গিয়াছিল। 'তাই সে সহজেই প্রফুল্লর মাকে চিনতে পারে।

তিনকড়ি (রজনী: ২।৭)

দাসী। অমরনাথ রজনীকে উদ্ধার করে কলকাতা নিয়ে যাবার সময় রজনীর মন প্রসন্ন রাখবার জন্য এই দাসীটিকে সঙ্গে নিয়েছিলেন।

তিলোত্তমা (দুর্গে: ১।১)

'দুর্গেশনন্দিনী'র রোমান্টিক নায়িকা হিসাবে বঙ্কিম তিলোত্তমাকে তিল তিল সৌন্দর্য দিয়ে গড়ে তুলেছেন। তাই এই চরিত্রটি সমগ্র উপন্যাসে নেপথ্যে সঙ্গীতের মত সুরঝঙ্কার দিয়েছে। নেপথ্যে বলার কারণ এই যে অত্যন্ত যত্ন স্বত্বেও বঙ্কিম চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলতে পারেম নি। কথার ইন্দ্রজালে তিলোত্তমা সুন্দরী হয়ে উঠেছেন, কিন্তু ঘটনার রাত-প্রতিঘাতে তার ভাগ্য শুধু ভেসে চলেছে মাত্র, সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে নি।

উপন্যাসের সূচনাতে তিলোত্তমাকে শৈলেশ্বরের মন্দিরে দেখা গেলেও সেখানে বঙ্কিম তিলোত্তমার রূপের বিস্তারিত বর্ণনা দেননি। যে বর্ণনাটুকু দিয়েছেন তাতে তিলোত্তমার আভিজাত্যের লক্ষণগুলিই ফুটে উঠেছে। কিন্তু সপ্তম পরিচ্ছেদে তিলোত্তমার রূপের যে বিস্তারিত বর্ণনা আছে, তার সঙ্গে সঙ্গে এই চরিত্রটির অন্যান্য গুণগুলিও প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে লক্ষ্য করবার বিষয়, তিলোত্তমার রূপের ঔজ্জ্বল্য আছে কিন্তু মাধুর্যও কম নেই। যাঁরা দুর্গেশনন্দিনীর চরিত্রগুলিকে স্কটের 'আইভ্যান হো'র প্রভাবজাত বলে থাকেন, তারা লক্ষ্য করবেন—তিলোত্তমা-চরিত্রে পরপুরুষের প্রতি প্রেম বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নূতনত্ব থাকলেও, বাঙালীনারীর কোমল মধুর সমস্ত গুণাবলীই বঙ্কিম তার ওপর আরোপ করেছেন।

উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিলোত্তমা ও জগৎসিংহের চার চক্ষুর মিলনকালে তিলোত্তমাকে কিছুটা জীবন্ত ও চপলস্বভাবা বালিকা বলে মনে হয়। তার পরেই সপ্তম পরিচ্ছেদে বঙ্কিম তিলোত্তমাকে একেবারে জগৎসিংহের প্রতি অনুরক্তা করে তুলেছেন। এর মধ্যে বঙ্কিম কোন মনবিশ্লষণের অবকাশ রাখেন নি। এই ধরণের প্রেমবন্ধন কিছুটা অস্বাভাবিক হলেও আমরা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারি না। অভিরাম স্বামীর মত আমরাও বলতে পাতি—'দর্শনমাত্র গাঢ় অনুরাগ জন্মিতে পারে না, তবে স্ত্রীচরিত্র, বিশেষতঃ বালিকাচরিত্র ঈশ্বরই জানেন (১।৮)

বিমলা জগৎসিংহের সঙ্গে শৈলেশ্বরের মন্দিরে সাক্ষাৎ করতে যাবার আগে যখন তিলোত্তমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে তখন তিলোত্তমাকে আমরা আনন্দোচ্ছল রূপেই দেখি। তারপর ইতিহাসের

জটিল আবর্তনে মোগল-পাঠানের বিরোধে তিলোত্তমা লুপ্তপ্রায়। পাঠানহস্তে বন্দিনী তিলোত্তমার দুঃখকথা বঙ্কিম বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাকে সক্রিয় করে তুলতে পারেননি। বিমলার কাছ থেকে অঙ্গুরীয় নিয়ে তিলোত্তমা জগৎসিংহের সঙ্গে কারাগারে দেখা করেছে, কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হয়ে ছিন্নমূল তরুর মত হতচৈতন্য হয়ে পড়েছে। তারপর তিলোত্তমাকে দেখতে পাই অভিরামস্বামীর তত্ত্বাবধানে বিরহাতুরা শীর্ণকায়া মৃত্যুপথযাত্রিণীরূপে। অভিরামস্বামীর আমন্ত্রণে জগৎসিংহের সঙ্গে তিলোত্তমার সাক্ষাৎদৃশ্যে তিলোত্তমা যেন যোগিনী। চিরন্তন বাঙালী নারীর মতই তার হৃদয়ে পুঞ্জীভূত অভিমান, কিন্তু কোন ধিক্কার নেই। কেবলমাত্র সে বলেছে—'তোমার জন্য যে কুসুমনিগড় রচিয়াছিলাম, বুঝি তাহা সত্যই অশ্বচরণে লৌহনিগড় হইয়া ধরিয়াছে। যে কুসুমমালা পরাইয়াছিলাম, তাহা অসির আঘাতে ছিঁড়িয়াছে।'

কিন্তু জগৎসিংহ যখনি তিলোত্তমাকে বিবাহ করতে রাজি হয়েছে, তখন তিলোত্তমা কোন প্রতিবাদ করেন নি। এমনকি শেষে বিবাহের দিনে আয়েষার বহুমূল্য অলংকারে তিলোত্তমাকে চমৎকৃতা করে বঙ্কিম তাকে অলংকারপ্রিয় সাধারণ বাঙালীমেয়ে করে ফেলেছেন। আসলে উপন্যাসের প্রথম দিকে তিলোত্তমা যেমন বঙ্কিমের মন অধিকার করেছিল শেষের দিকে তেমনি আয়েষা প্রাধান্য পেয়েছে। তাই তিলোত্তমা অস্ফুট চরিত্র।

তৃতীয় জর্জ (চন্দ্রঃ ৫।১
ইংলণ্ড অধিপতি তৃতীয় জর্জের নামোল্লেখ মাত্র আছে।

তৈমুরলঙ্গ (দুর্গেঃ ১।৩)
প্রকৃত নাম আমির তৈমুর বা তাইমুর। কিন্তু তিনি খোঁড়া ছিলেন বলে তৈমুর লঙ্গ (খোঁড়া) নামেই সম্যক পরিচিত। মধ্য এশিয়ার অন্তর্গত প্রাচীন সগদনিয়া রাজ্যের কুশনগরে ১৩৩৬ খ্রীঃ ৯ই এপ্রিল, মঙ্গলবার তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম আমির তুরা খাই এবং মাতার নাম তকিনা খাতুন। তিনি প্রসিদ্ধ চেঙ্গিস বা জঙ্গিনা খাঁর বংশধর। আবার তাঁর বংশধর বাবর ভারতবর্ষে স্থায়ী রাজত্ব স্থাপন করেন। তইমুর ছিলেন চাযতাই তুর্কীদের নেতা। ১৩৭০ খ্রীঃ তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তারপর সমরকুশলী তৈমুর ক্রমে ক্রমে পারস্য, বোগদাদ, কান্দার প্রভৃতি স্থানে রক্তের বন্যা বইয়ে ১৩৯৮ খ্রীঃ ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। ভারতবর্ষে তাঁর অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী ইতিহাসে তাঁকে কলঙ্কিত করে রেখেছে। তৈমুরের রাজধানীর নাম ছিল সমরখন্দ। ১৪০৫ খ্রীঃ ১৮ই ফেব্রুয়ারী বুধবার তাঁর মৃত্যু হয়।

'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে তৈমুর লঙ্গ বংশীয়দের অর্থাৎ মুঘল শাসকদের উল্লেখ আছে।

তোরাব খাঁ (সীতাঃ ১।৯)
ফৌজদার তোরাব খাঁ চরিত্রটির উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায়। সীতারামের বিরুদ্ধে আক্রমণ করার করার চেষ্টা তিনি বার বার করেছেন। উপন্যাসে তোরাব খাঁর কৌশলী মনোবৃত্তির পরিচয় অনেক পাওয়া যায়।

দয়াল সাহা (রাজঃ ৮।৮)
রাজসিংহের একজন কর্মচারী। তিনি রাজসিংহকে পরামর্শ দিয়েছিলেন ঔরঙ্গজেবকে বন্দী অবস্থায় বধ করার।

দরিয়া বিবি বা দরীর-উন্নিসা (রাজঃ ১।৫)
সমগ্র 'রাজসিংহ' উপন্যাসে দরিয়া বিবি প্রেতাত্মার মত বিচরণ করেছে। এমন স্থান নেই যেখানে তার গতি রুদ্ধ। এই অতি নাটকীয় উপকরণেই দরিয়া চরিত্র গড়ে উঠেছে।

দরিয়া মবারকের বিবাহিত স্ত্রী, কিন্তু মবারক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত। দরিয়া অবশ্য আপন বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রেখেছে—একদিন সে মবারককে পাবেই।

দরিয়ার সমস্ত আচরণই রহস্যজনক। উপন্যাসের প্রথমেই সে মবারককে জোর করে ভাগ্য গণনা করিয়েছে। কিন্তু নিজে ভীড়ের অন্তরালে থেকে রহস্যময়তা বজায় রেখেছেন। যেন বঙ্কিম দরিয়াকে মবারকের নিয়তির সোচ্চার প্রতিরূপ হিসাবেই অঙ্কন করেছেন। আবার দরিয়া শাহজাদী জেন-উন্নিসার কাছে গিয়ে মবারক সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলেছে, তার উদ্দেশ্য মবারকের প্রতি শাহজাদীর বিদ্বেষ জন্মান হলেও, তার পরিণাম যে কী ভয়ানক তা দরিয়ার মত বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকের পক্ষে বোঝা শক্ত নয়। কিন্তু তবুও দরিয়া আগুন নিয়ে খেলা করেছে। এক দরিদ্র স্ত্রীলোক কেবলমাত্র প্রেমের বহ্নিতে দুনিয়ার ঐশ্বর্যের মালিক জেব-উন্নিসার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছে।

দরিয়া ছদ্মবেশ ধারণেও পটু। সে নৃত্যগীতে মুঘল সেনাপতিকে মুগ্ধ করে রূপনগরে মুঘল-সৈন্য মধ্যে স্থান গ্রহণ করেছে। উদ্দেশ্য—মবারকের পাশে পাশে থাকা। কূপের মধ্যে পতিত মবারককে বাঁচিয়ে দরিয়া স্ত্রীর কর্তব্য করেছে।

তারপর মবারকের সঙ্গে দরিয়ার সুখময় সংসার-জীবনের ছবি কিছুদিন আমরা দেখেছি। কিন্তু সে সুখ দরিয়ার বেশি দিন সহ্য হয় না। জেব-উন্নিসার চক্রান্তে মবারকের মৃত্যু হল। উন্মাদিনী দরিয়া কিন্তু প্রতিশোধের বাসনা ত্যাগ করেনি। তাই সে ছুটে গিয়েছে জেব-উন্নিসার কাছে। কিন্তু শাহাজাদীর চোখে জল দেখে বুঝলো এর চেয়ে ভাল প্রতিশোধ আর নেওয়া সম্ভব নয়।

তারপর দীর্ঘকাল দরিয়ার উপস্থিতি নেই যুদ্ধক্ষেত্রে মবারক জেব-উন্নিসার পুনর্মিলনে বাধ সেধেছে দরিয়া দরিয়ার হস্তনিক্ষিপ্ত বন্দুকের গুলিতেই মবারকের মৃত্যু হয়েছে। দরিয়াচরিত্র যেমন সাহসিক তেনি প্রতিশোধ স্পৃহায় প্রচণ্ড। মবারকের নিয়তিরূপেই যেন তার উপস্থিতি।

দলনী (চন্দ্রঃ ১।১)
'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের দলনী বেগম একটি সুন্দর সুগন্ধিযুক্ত দলিত কুসুম। যদিও ঐতিহাসিক চরিত্র গুরগণ খাঁর ভগিনী হিসাবে উপন্যাসে দলনীবেগমকে অঙ্কিত করা হয়েছে এবং মীরকাশেমের বেগমরূপে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, তবু এই চরিত্রটি ঐতিহাসিক চরিত্র নয় বলেই মনে হয়। বঙ্কিম নিজস্ব কল্পনা দ্বারাই এই চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছেন।

দলনীচরিত্রের প্রধান এবং একমাত্র বৈশিষ্ট্য বা গুণ হল—স্বামীপ্রেম। তার ভাই নবাব-হারেমে তাকে নবাবের সর্বনাশসাধনের জন্য প্রেরণ করলেও, নবাবকে মনেপ্রাণে ভালবেসেছে। শেষপর্যন্ত এই ভালবাসার জন্যই ভাইয়ের বিরোধিতা করতেও তার বাধেনি। সেই মুহূর্তেই এই সহজ-সরল-সুন্দর-সাবলীল নারীটির জীবনে নেমে এসেছে দুর্যোগের ঘনঘটা।

দলনীর জীবনে যে ভয়ানক পরিণাম নেমে এসেছে তার জন্য তার কোন অন্তর্নিহিত দোষকে দায়ী করা যায় না। ইতিহাসের জটিল ঘটনার আবর্তে তার জীবন হয়েছে নিষ্পেষিত। দলনীর সরলতাই তার সর্বনাশ করেছে। গুরগণ খাঁর কৌশলে তার সামনে প্রাসাদের দ্বার রুদ্ধ হয়েছে। শুধু তাই নয়, ভাগ্যচক্রে প্রতাপের বাড়ী থেকে ইংরাজ কর্তৃক অপহৃত হয়ে শেষপর্যন্ত তকি খাঁর হাতে পড়তে হয়েছে। অবশেষে এই পতিগতপ্রাণা নারী স্বামীর আদেশ পালনের জন্য বিষপানে মৃত্যু বরণ করেছেন।

দলনীচরিত্রের ট্রাজেডী গ্রীক ট্রাজেডীর মত নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসের ফলে সংগঠিত হয়েছে। তবে দলনীর এই করুণ পরিণামের মধ্যে পাঠক-হৃদয়ে একটু সান্ত্বনা এই যে দলনীর পতিপ্রেম নিষ্ফল হয়নি, শেষপর্যন্ত মীরকাশেমকে দলনীর জন্য হাহাকার করতে হয়েছ। দলনীর প্রতি মীরকাশেমের ঘৃণা নয়, প্রেমই দলনীচরিত্রের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে।

দাউদ খাঁ (দুর্গেঃ ১।৩)
বাংলার পাঠান সুলেমান কররাণীর পুত্র। দাউদ শাহ নামেও তিনি খ্যাত। ১৫৭৩ খ্রীঃ তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর পিতা আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু তিনি স্বাধীন নৃপতির মত চলতে থাকেন। তখন আকবর মুনাইম খাঁর সাহায্যের জন্য রাজা টোডরমল, লাল খাঁ, রাজা ভগবন্ত দাস, মান সিংহ, জৈন খাঁ, খোকা প্রভৃতি অনেক সেনাধ্যক্ষ প্রেরিত হয়। ১৫৭৬ খ্রীঃ-এর জুলাই মাসে দাউদ পরাজিত হন এবং তাঁর ছিন্ন শির সম্রাটের কাছে প্রেরিত হয়।

'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে দাউদ খাঁ এবং আকবরের সংঘর্ষের উল্লেখ আছে। তবে সেখানে বঙ্কিম লিখেছেন—'দাউদ ৯৮২ হেঃ অব্দে উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন...।'

দানেশ খাঁ (কৃঃ উঃ ২।৬)
প্রসাদপুরে গোবিন্দলালের গানের আসরের একজন গায়ক।

দামোদর (মৃণাঃ ২।১)
গৌড়েশ্বরের সভাপণ্ডিত। রাজার মতই এঁকেও রাজার মত গুণলেশহীন রূপে অঙ্কন করা হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করেন যে, শাস্ত্রে লিখিত আছে তুরকীয়েরা এদেশ অধিকার করবে। কিন্তু মাধবাচার্যের কাছে শাস্ত্রগ্রন্থটির নামোল্লেখ অপারগ হয়ে পাঠকের কাছে হাস্যাস্পদ হয়ে ওঠেন তবে পশুপতির নির্দেশে দামোদরের, পুঁথির পৃষ্ঠা পরিবর্তন করে, রাজাকে ভুল বোঝানোর চেষ্টা তার শঠতার পরিচয় বহন করে।

দিগ্বিজয় (মৃণা ১।১)
দিগ্বিজয় হেমচন্দ্রের বিশ্বস্ত ভৃত্য। সে হেমচন্দ্রকে যেমন ভালবাসে, তেমনি ভয়ও করে। সে হেমচন্দ্রের ছায়াস্বরূপ। এই চরিত্রটি গিরিজায়ার কাছে তবু দু'একবার মুখ খুলেছে। কিন্তু কখনও গিরিজায়ার সঙ্গে পেরে ওঠেনি। শেষ পর্যন্ত গিরিজায়াকে বিয়ে করে, তার শ্রীহস্তে সম্মার্জনীর আঘাত সহ্য করে সুখে কালাতিপাত করেছে। কিন্তু এই চরিত্রটিকে বিশিষ্টতা লাভ করতে দেখি উপন্যাসের শেষভাগে একটিমাত্র ঘটনা—'একদিন কোন দৈবকারণবশতঃ গিরিজায়া ঝাঁটা মারিতে তুলিয়াছিলেন, ইহাতে দিগ্বিজয় বিষণ্ণ বদনে গিরিবালাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'গিরি, আজ তুমি আমার উপর রাগ করিয়াছ নাকি ?' (মৃণাঃ পরিশিষ্ট)।

দিবা (দেবীঃ ১।১৩)
দিবাকে নিশির বোন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু দীক্ষা সম্পর্কে বোন হওয়াই সম্ভব। দিবা মিতবাক। সাহেবকে প্রকৃত দেবী সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করার সময় দিবা একবার মুখরা হয়েছিল। দিবা অশিক্ষিতা।

দুর্গাদাস (মৃণাঃ ৪।১৫)
ইনি পশুপতির অষ্টভূজার নিত্যসেবা করতেন। মূর্তিসমেত পশুপতি দগ্ধ হলে ইনিই প্রথম তা আবিষ্কার করে তার সংকারের ব্যবস্থা করেন। তারপর মনোরমা সহমরণের জন্য এসে উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মণ কিন্তু গোঁড়া নয়, তাই তিনি মনোরমাকে সহমরণ থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছিলেন।

দুর্গাদাস (রাজঃ ৮।১৬)
ইনি যশোবন্ত সিংহের শিশুপুত্র অজিত সিংহের পক্ষে থেকে ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

দুর্মদ সিংহ (সীতাঃ ৩।২২)
সীতারামের একজন বিশ্বস্ত সিপাহী।

দুর্মখ (রাজঃ ২।২)
কৃত্তিবাসী রামায়ণের মতে রামচন্দ্রের গুপ্তচর।

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস

কাব্যের 'রস' বিচারের পূর্বেই আসে 'ভাব'। এই 'ভাব' সকলের মনেই আছে। কাব্যে বা সাহিত্যে এই ভাব-ই মানুষের মনে উদ্রিক্ত হয়ে আনন্দের সৃষ্টি করে। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্র মতে, এই মূল বা প্রধান বা স্থায়ী ভাবের সংখ্যা আট, কাহারও কাহারও মতে নয় প্রকার, তাদের মধ্যে 'হাস' ভাব অন্যতম। এই 'হাস' ভাব নানা বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারীভাব ইত্যাদির সহযোগে যখন কাব্যে বা সাহিত্যে বিশেষ প্রকার আনন্দ বা রসের সৃষ্টি করে তখনই তাহাকে বলে হাস্যরস।

সুপ্রাচীনকালে সংস্কৃত আলঙ্করিকগণ কর্তৃক কাব্যে ও সাহিত্যে অন্যতম স্থায়ী-ভাব ও স্থায়ী-রস হিসাবে হাস-ভাব বা হাস্য-রসকে স্বীকার করায় বোঝা যাচ্ছে যে তাঁরা কাব্যে ও সাহিত্যে এর বিশেষ উপযোগীতার বিষয় সম্যকভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন।

এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে যে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কী পরিমাণে ও কী প্রকৃতির হাস্যরস তাই নির্ণয় করা।

হাস্যরস সৃষ্টি নিতান্ত সহজসাধ্য কাজ নয়। যথার্থ হাস্যরস সৃষ্টি করতে যথার্থ প্রতিভার প্রয়োজন হয়। কারণ আকার-প্রকার রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার ইত্যাদির অসঙ্গতির চিত্র অঙ্কণ বা বর্ণনা করে যে হাস্যরসের সৃষ্টি করা হয় তার মধ্যে সূক্ষ্মতা ও গভীরতা না থেকে যদি তা' স্থূল রকমের সস্তাধরণের হয় তবে তা হাস্যরস নামের যোগ্য হয় না; তা ভাঁড়ামি বা নিম্ন শ্রেণীর রঙ্গ-রসিকতার পর্যায়ভুক্ত হয়; কখনও বা তা ইতরতার অশ্লীলতার স্তরে নেমে যায়।

মধ্যযুগে বাংলাসাহিত্যে অবশ্য খুব উচ্চাঙ্গের খুব সূক্ষ্ম অথচ গভীর হাস্যরসের পরিচয় কোথাও নাই। নিপুণ হাতে সূক্ষ্ম তুলির আঁচড়ে উচ্চাঙ্গের হাস্যরস সৃষ্টি করার মতো প্রতিভাধরের আবির্ভাব সেযুগে হয়নি। তবে মোটা তুলির মোটা মোটা আঁচড়ে স্থূল হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস মধ্যযুগের কোন কোন কাব্যে দেখা যায়। সেই হাস্যরসের ব্যাপ্তি হয় তো বেশি নয়; তার গভীরতা হয়তো বর্তমান কালের সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হাস্যরসের তুলনায় নিতান্তই তুচ্ছ; তার পরিমাণ হয়তো মধ্যযুগে রচিত সমগ্র বাংলাসাহিত্যের পরিমাণের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য; তবুও তাকে অগ্রাহ্য করা যায় না, তার অস্তিত্বকে অগ্রাহ্য করা যায় না। অন্ততঃ সে যুগের সাহিত্যের মধ্যেও তার যে দীপ্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে, সে যুগের পাঠক সম্প্রদায়কে তা যতটা আনন্দ দিয়েছিল তা স্মরণে রেখে তার মূল্য স্বীকার করতেই হবে। অর্থাৎ মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের হাস্যরসের মূল্য, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে যথেষ্টই আছে।

সাহিত্যিক দৃষ্টিতে মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের হাস্যরসের প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্ণয় করতে হলে পূর্বেই আমাদের জানা দরকার যে, মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে প্রধানত হাস্যজনক অঙ্গ-বিকৃতি ও

বাক্যাদির সাহায্যেই হাস্যরস সৃষ্টির প্রচেষ্টা দেখা যায়। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও যে নাই, তা নয়। ঐযুগে রচিত কাব্যাদি নিয়ে আলোচনা করলেই এতক্ষণ যা বলা হলো তা অন্ততঃ খানিকটা স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে বলে আশা করা যায়।

মধ্যযুগে বাংলাসাহিত্যকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা,—মঙ্গল কাব্য-সাহিত্য ; বৈষ্ণব কাব্যসাহিত্য ; ও অনুবাদসাহিত্য।

সাহিত্যের এই তিনটি বিভাগের মধ্যে বৈষ্ণবকাব্য সাহিত্যে হাস্যরসের সন্ধান করতে যাওয়া অর্থহীন বলেই মনে করি। কারণ কৃষ্ণরাধার বিরহজনিত আর্তিকে ভিত্তি করেই এই সাহিত্য রচিত হয়েছে ; এতে হাস্যরসের স্থান কোথায় ?

অনুবাদসহিত্যেও হাস্যরসের স্থান নিতান্তই নগণ্য। তবে যেটুকু হাস্যরস আছে তার মধ্যে কয়েকটি স্থান বেশ ভালই লাগে, অবশ্য সে যুগের রুচিতে। যেমন,—শ্রীকরণ নন্দীকৃত মহাভারতের অনুবাদের একজায়গায় শ্রীকৃষ্ণ ও ভীমের মধ্যে উত্তর প্রত্যুত্তর হিসাবে আছে :—

শ্রীকৃষ্ণ—'বহু ভক্ষ হএ ভীম স্থূল কলেবর
হিড়িম্বা রাক্ষসী ভার্যা যাহার সহচর।'
ভীমের উত্তর—'সংসার উপলান্ত সব খাইলা তুম্মি
তাহা হইতে বহু ভয়ঙ্কর বোলে আম্মি।
ভল্লুক কুমারী তোমার ঘরে জাম্ববতী
তাহা হইতে অধিক বোল হিড়িম্বা যুবতী।'

কাশীরাম দাস-কৃত মহাভারতের অনুবাদে এই স্থানটি শ্রীকরণ-কৃত অনুবাদ অপেক্ষ সরল বটে ; কিন্তু ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা তাতে হ্রাস পেয়েছে।

এরপর দেখা যাক মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের সমৃদ্ধতম শাখা—মঙ্গলকাব্য শাখায় হাস্যরসের স্থান কোথায় ?

মঙ্গলকাব্য, শিবায়ন ইতাদি মধ্যযুগের লৌকিক ধর্মশাখার সাহিত্যে হাস্যরসের স্থান অল্প হওয়াটা খুব অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কারণ হাস্যরসের সন্ধানে কেহ ধর্মমূলক সাহিত্যের রাজ্যে যে বিচরণ করেন না, একথা অন্যান্য সব যুগের কবিদের মতো মধ্যযুগের কবিরাও নিশ্চয় জানতেন। মানুষের ভয়-ভক্তি শ্রদ্ধার ফলেই ধর্মসাহিত্যের সৃষ্টি হয় ; আর ভয়-ভক্তি অথবা শ্রদ্ধার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েই পাঠকসম্প্রদায় সেই সাহিত্য আস্বাদনে অগ্রসর হয়। তবে এটা উল্লেখনীয় যে এই শাখাটি ধর্মীয় শাখা হলেও মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের সব ক্ষেত্র অপেক্ষা এই স্থানটিতেই মানুষের কথা, মানুষের সংসারের কথা, বাস্তব জীবনের কথা সর্বাপেক্ষা অধিক উচ্চারিত হয়েছে। এই কারণে এই সাহিত্যের কবিরাই—প্রাকৃত মানব-সংসারের প্রতি সহানুভূতিশীল কবিরাই হাস্যরস সৃষ্টিতে কিছুটা সচেতন ছিলেন। তাঁরা এবিষয়ে সচেতন ছিলেন যে, সাধারণ মানুষের মনে যেসকল স্থায়ীভাব আছে 'হাস' ভাব' তাদের অন্যতম। হাস্যরস মানুষের অন্যতম প্রিয় রস।

বিভিন্ন কাব্য থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি সহযোগে ওপরের বক্তব্যটি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

বিভিন্ন কৃষ্ণায়ণ কাব্যের মধ্যে কবিশেখরের 'গোপালবিজয়' হাস্যরসের আলোচনায় স্থান

পেতে পারে। অধ্যাপক শ্রীসুকুমার সেন মহাশয়ের ভাষায় বলা যায়, 'সখিগণ সমভিব্যাহারে রাধা মদনপূজায় চলিয়াছেন। সঙ্গে অভিভাবিকা হইয়া চলিয়াছে বড়াই, মূর্তিমান হাস্যরসের বেশে। সুদূর অতীতে বাংলাদেশে পল্লীগ্রামের অতি বৃদ্ধা সধবা নারীর বর্ণনা হিসাবে (ইহা) চমৎকার।' প্রসঙ্গতঃ কয়েকটা পংক্তি উদ্ধৃত করে দেখানো যায় :—

'না বলিতে সব আগু চলিল বড়াই
তার রূপ গুণের কি কব বড়াঞি।
ধবল কেশের মাঝে সিন্দুর উজলে
ফুটিল কাশীর বন জ্বলন্ত অনলে।
পরম যতনে যদি সর্বাঙ্গ নেহালী
কোথায় না দেখি কাঁচ লোম এক পাড়ি।
কোটরের পেঁচা যেন চঞ্চল নয়নে
... ...
হেন রূপে আগু যাএ প্রাণের বড়াই
হেন মূর্তিমান হাস্য ভূমিতে বেড়াই।'

শিবায়ন কাব্যসমূহের মধ্যে অষ্টাদশ শতকের কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্যে স্মিত হাস্যের বেশ একটু মাধুর্য অনুভূত হয়। রামেশ্বরের শিবসংকীর্তন অনুপ্রাস বাহুল্যে ভারাক্রান্ত হলেও তারমধ্যে স্বাভাবিক হাস্যরসের অস্তিত্বটুকু সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সন্তান-সহ শিবের আহারে উপবেশন, ও পরিবেশন-রত দুর্গার বিব্রত অবস্থাটির চিত্র চমৎকার হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে।

এরূপ, ধর্মমঙ্গল কাব্য ইত্যাদিতেও অল্পাধিক পরিমাণে হাস্যরসের স্থান আছে। 'শূন্যপুরাণ' নামে প্রকাশিত ধর্মপূজা পদ্ধতিতেও কিছু হাস্যরসের অবস্থিতি উল্লেখযোগ্য। শূন্যপুরাণ সাহিত্যের শ্রেণীতে পড়ে না; সুতরাং এর সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজনে। তবু, হাস্যরসের সন্ধানে এর 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' শীর্ষক অংশটি দেখা যেতে পারে বলেই এর নামটুকু বলা হলো।

এরপর মনসামঙ্গল কাব্যে হাস্যরসের কতটা পরিচয় পাওয়া যায় তা দেখা যেতে পারে।

পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে কবি বিজয়গুপ্ত মুসলমান কাজির বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন,

'কাজির ওস্তাদ এক তার নাম খালাস
কেতাব কোরাণে তার বড়ই অভ্যাস।
অতি বড় মজবুত পাকা চুল দাড়ি
পরিধন ভাঙ্গা ইজার ফেরে বাড়ী বাড়ী।
না খায় পীরের ছিন্নি ভগ্ন ঠাঞি ঠাঞি
সর্ব গায় চর্মদড়ি মুখে দন্ত নাই।'

এছাড়া পদ্মার বিবাহ সম্বন্ধে শিব ও চণ্ডীর আলাপের মধ্যেও বিজয়গুপ্ত কিছু কিছু হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন। শিব চণ্ডীকে পদ্মার বিবাহসজ্জা করতে বললে চণ্ডী বললে যে বিবাহের ব্যাপারে অর্থের প্রয়োজন। এয়োরা এসেই পান চাইবেন, তেল-সিন্দুর চাইবে। অর্থ ব্যতীত

তিনি এয়োদের প্রার্থীত বস্তু কেমন করে সংগ্রহ করবেন।

তখন, 'হাসি বলে শূলপাণি এয়ো ভাণ্ডাইতে জানি
মধ্যে দাঁড়াব নেংটা হয়ে।
দেখিয়া আমার ঠান এয়োর উড়িবে প্রাণ
লাজে যাবে সবে পালাইয়ে।
আচ্ছুক পানের কাজ এয়োগণ পাবে লাজ
পান গুয়া দিবে কোন জনে।'

বিজয়গুপ্তের কাব্যের এই সব অংশ দেখেই আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে লিখে গিয়েছেন, 'বিজয়গুপ্তের কবিতা কথায় ব্যঙ্গের দিকে ধাবিত হয়, সেই ব্যঙ্গেই তাহার কবিতা বেশ ফুটিয়া উঠে। সেই নগ্নপদ, উত্তরীয় সার, ঔষধের পুটলি-কক্ষ 'বেজ মহাশয়' সেকালের একজন বিশিষ্ট রসিক লোক ছিলেন, সন্দেহ নাই। সেকালের রসিকতা এখন ভাঁড়ামি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু বিজয়গুপ্ত ভাঁড় ছিলেন না।' বিজয়গুপ্ত সম্বন্ধে আচার্য সেনের সব কথা মেনে নিয়ে কেবলমাত্র এই উদ্ধৃত অংশটির শেষ কাব্যটিতে তিনি যা বলেছেন তার সম্বন্ধে এইটুকু বলতে চাই যে, বিজয়-গুপ্তের যুগের দৃষ্টিতে কথাটি সত্য হতে পারে; কিন্তু বর্তমান যুগের রুচিতে বিজয়গুপ্তের সৃষ্ট হাস্যরস বেশ কিছু স্থূল, আরোও একটু নামিয়ে বললে বলতে হয় অশ্লীল।

বিজয়গুপ্তের তুলনায় ষোড়শ শতকের কবি বংশীদাস উন্নততর হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন। মধ্যযুগচিত নীতি অনুসরণ করে গতানুগতিক পন্থায় বিকৃত অঙ্গ ব্রাহ্মণকুমারের যে চিত্র তিনি অঙ্কণ করেছিলেন,

অষ্টাবক্র নামে মুনি অঙ্গিরার পুত্র
অষ্ট অঙ্গ বাঁকা তার কাঁধে যজ্ঞসূত্র ॥
বাঁকা কাঁকালি গলা বাঁকা হাত পাও
নাক মুখ চক্ষু বাঁকা বাঁকা কাড়ে রাও ॥'

তার মধ্যে স্থূল হাস্যরস সৃষ্টির পরিচয় থাকলেও, অন্য কয়েক স্থানে বংশীদাস অনাবিল হাস্যরস সৃষ্টিতে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন, তাঁর কাব্যোক্ত চরিত্র বণিক চন্দ্রধর বিদেশী রাজার কাছে বহুমূল্য বলে চট বিক্রয় করতে গেলে মূর্খ রাজা ও তাঁর পারিষদবর্গ সেই চট ক্রয় করে পরিধান করলেন। সেই চট পরিধান করে তাঁদের অস্বস্তির সীমা সেই—'চটের কামড়ে রাজার গাও চুলকায়।' কিন্তু মূর্খ রাজা তাতে মনকে প্রবেধ দিতে লাগলেন, 'শন পাট পবিত্র বড় শাস্ত্রেতে বিদিত।' এদিকে চন্দ্রধর রাজার মূর্খামী দেখে নিদারুণ কটাক্ষ করে চলেন,

'মিতা তোমার লেজ শিঙ্গা নাই ॥
এই দুইখান যদি থাকিত তোমার
যে মারিত গোবধ প্রায়াশ্চিত্ত তার ॥'
চান্দ বলে মিতা তোমার বুদ্ধি অপার
আমার দেশে হইলে পারি হাল চষিবার ॥

এছাড়া কলির ব্রাহ্মণের বর্ণনা, দক্ষিণ পাটনের অধিবাসিদের রীতি-নীতির বর্ণনা ইত্যাদির মধ্যেও যথেষ্ট যৌতুক-রসের পরিচয় বিদ্যমান। এখানে উল্লেখযোগ্য' বিজয়গুপ্তের হাস্যরস নিছক হাস্যরস—সৃষ্টির জন্যই, কিন্তু বংশীদাসের হাস্যরস তীব্র ব্যঙ্গ মিশ্রিত, শ্লেষাত্মক। যেমন কলির ব্রাহ্মণের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন,

'কলির ব্রাহ্মণ আর বলির ছাগল
ভাল মন্দ জ্ঞান নাই প্রশ্রয় পাগল।'

তারপর এই প্রসঙ্গে তিনি আরোও বলেছেন, চরম বলেছেন যে,

'গরু আর ব্রাহ্মণ যে শূদ্রের দেবতা।'

এইরূপ বিশিষ্ট ধরণের হাস্যরসের ব্যবহার বংশীদাসের কাব্যের একটি বৈশিষ্ট্য, একটি স্বতন্ত্রতা দান করেছে।

কিন্তু মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে হাস্যরসের সর্বশ্রেষ্ঠ আধার হচ্ছে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরামের কাব্যে ধনপতি সওদাগরের কাহিনী-অংশে মশানে শ্রীমন্তের কাহিনী বর্ণনাকালে কবি 'বাঙাল' মাঝিদের যে দুর্দশার চিত্র অঙ্কণ করেছেন তাতে কবির যথেষ্ট পরিহাস-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 'বাঙাল'রা ভয়ে-ভাবনায় বলেন,

'যুবতী যৌবনবতী ত্যাজিলাম রোষে
আর বাঙাল বলে দুঃখ পাই গ্রহদোষে॥
ইষ্ট-মিত্র কুটুম্বের লাগে মায়া মো
আর বাঙাল বলে না দেখিনু মাগু পো॥'

অবশ্য পূর্ববঙ্গবাসীদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে হাস্যরস সৃষ্টি বাংলাসাহিত্যে এই প্রথম নয়, চৈতন্যভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থ থেকেই জানা যায় যে, শ্রীচৈতন্য এবিষয়ে রীতিমতো পাণ্ডা ছিলেন। সুতরাং এই ধরণের হাস্যরস সৃষ্টিই চণ্ডীমঙ্গলের কবিকে হাস্যরস সৃষ্টির কৃতিত্বে অনন্যসাধারণতা দান করেনি। প্রকৃতপক্ষে ধূর্ততার জীবন্ত প্রতিমূর্তি মুরারী শীল ও ভাঁড়ুদত্তের চরিত্র সৃষ্টিই মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের কবিদিগের হাস্যরস সৃষ্টিতে নিপুণতার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচায়ক। মুরারী শীলের নিকট কালাকেতুর অঙ্গুরীয় ভাঙ্গাইবার দৃশ্যটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। প্রবঞ্চক মুরারীর কপট ভদ্রতাসূচক প্রশ্নভঙ্গি সত্যই লক্ষণীয়। আর এই বিষয়ে ভাঁড়ুদত্তের সমগ্র চরিত্রটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনার যোগ্য।

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, 'এই চরিত্র বর্ণনায় কবিকঙ্কণ অপেক্ষা মাধবাচার্য বেশী ক্ষমতা দেখাইয়াছেন;' আর অধ্যাপক শ্রীসুকুমার সেনের মতে 'ভাঁড়ুদত্তের চরিত্র বর্ণনায় মুকুন্দরামের মত সংযম মাধবাচার্য দেখাইতে পারেন নাই।' কিন্তু ভাড়ুদত্তের চরিত্রটি যে মোটেই উপেক্ষনীয় নয়, এই সত্যটি এই উভয় সমালোচকই সুস্পষ্টভাব স্বীকার করেছেন। সুতরাং কোন কবির রচনা ভাল আর কোন কবির রচনায় অধিক সংযমের পরিচয় আছে সে বাদানুবাদের মধ্যে প্রবেশ না করেই এই চরিত্রটিকে অবলম্বন করে আমাদের আলোচনা স্বাচ্ছন্দ্যে অগ্রসর হতে পারে।

ক্ষুধার্ত ভাঁড়ুদত্ত ঘরে খাবারের অভাব শুনে খাদ্যবস্তু সংগ্রহের জন্য বাজারে যেয়ে কীভাবে খাদ্য

সংগ্রহ করলেন তার চিত্রটি উল্লেখযোগ্য। প্রবন্ধের আয়তন বৃদ্ধির সম্ভাবনার প্রতি লক্ষ্য রেখে এই বিষয়ে পূর্ণ চিত্রটি দেওয়ার থেকে বিরত থাকতেই হয়। সংক্ষেপে সেই বিষয়ের উল্লেখপ্রসঙ্গে বলতে হয় যে, ভাঁড়ু ধূর্তামির সাহায্যে সকলকে প্রতারিত করে জিনিষ সংগ্রহ করলেও বাঙালীর ভীতি উৎপাদনকারী জেলেনীকে প্রতারণা করতে সক্ষম হয়নি। মাছের মূল্য না দিয়ে পালাতে চেষ্টা করলে জেলেনীর টানাটানিতে,

'কচ্ছ হতে ভাড়ুদত্তের পড়ে কাণা কড়ি।
কাণা কড়ি পড়ে ভাঁড়ু বহু লজ্জা পায়॥
মৎস্য ছাড়িয়া তবে উঠিয়া পালায়॥'

তারপর, ভাঁড়ু আবার যখন রাজসভায় যেয়ে কালকেতুর সঙ্গে প্রতারণা আরম্ভ করে, কালকেতুকে অপমানিত করে তখন কালকেতুর লোকজন ভাঁড়ুকে বিষম প্রহার করে। ভাঁড়ু কিন্তু বাড়ীতে এসে স্ত্রীর নিকট কৈফিয়ৎ দেয় যে মহাবীর কালকেতুর সঙ্গে পাশা খেলবার সময় আনন্দের বশে ধূলায়গড়াগড়ি দেওয়ায় তার দেহে ধূলা লেগেছে।

ভাঁড়ু চরিত্রটিকে সর্বশেষে এক চরম অবস্থার মধ্যে দেখা যায়। প্রতিহিংসাবশতঃ ভাঁড়ু কালকেতুর রাজ্য ধ্বংসের আয়োজন করে। কিন্তু দেবীর কৃপায় কালকেতু সেই বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ করে ভাঁড়ুর মস্তক মুণ্ডন করিয়ে তাতে ঘোল ঢালিয়ে গঙ্গাপারে পাঠিয়ে দেয়। এই অবস্থায়ও

লোকের সাক্ষাতে ভাঁড়ু কহে কথা
গঙ্গাসাগরে গিয়া মুড়ায়েছি মাথা।
এ বলিয়া মাগি খায় নগরে নগরে॥'

চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের এই স্বভাবধূর্ত, প্রতারক, কপট লোকটি বারে বারে অপদস্থ হয়েছে, বারে বারে সে তা নানা প্রকারে ঢাকতে চেষ্টা করেছে; এবং পুনর্বার প্রতারণার বুদ্ধি নিলে অগ্রসর হয়েছে। এইভাবে পদে পদে পাঠকের হাস্যের উদ্রেক করেছে এই চরিত্রটি।

গীতা পাল

হিমালয় ॥ সুকুমার বসু। লেখক সমবায় সমিতি। কলিকাতা-২৬। মূল্য পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

আমাদের এই মহান ভারতবর্ষের উত্তরে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিলম্বিত দেড় হাজার মাইল দীর্ঘ হিমালয় পর্বত শ্রেণী যুগযুগান্তর থেকে নানা শ্রেণীর মানুষকে নানা ভাবে কাছে টেনে আসছে। হিমালয়ের আকর্ষণ অপার; রহস্য অশেষ। নানারূপে নানা বেশে জনসাধারণের একাংশ স্থিতধী হিমালয়ের আশ্চর্য আকর্ষণকে উপেক্ষা করতে না পেরে যুগে যুগে সেখানে ছুটে গিয়েছেন। কেউ গিয়েছেন সেখানে ভ্রমণকারী রূপে, কেউ বা তীর্থধর্ম করতে; কখনো হিমালয়ের গহন গিরিকন্দরে হাজির হয়েছেন যোগী, ধ্যানী, সন্ন্যাসীর দল—সংসার ও বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক শূন্য হয়ে তাঁরা করেছেন পরমার্থের সাধনা। আবার অন্য দিকে কখনো দেখা গিয়েছে অভিযান চলেছে—হিমালয়ের শিখর থেকে শিখরে।

হিমালয়ের ক্রোড় থেকে আবার যখন পথিকদল সমতলে ফিরে এসেছেন—তখন তাদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের জ্ঞানের ভাণ্ডার, পরিচিত হওয়া হিমালয়ের বহু বিচিত্র সৌন্দর্যের খনির গুহামুখ উন্মোচন করেছেন সাধারণের নিকট, তাঁদের বিভিন্ন রচনার মধ্যে; এবং যেহেতু আমরা বাঙ্গালীরা অন্যান্য ভারতীয়ের তুলনায় কিঞ্চিৎ অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় জাতি, আমরা হিমালয় সম্বন্ধে অন্য ভারতীয়দের থেকে একটু বেশি উৎসুক—এবং তার অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসাবেই বাংলা ভ্রমণকারীর দরবারে হিমালয় সংক্রান্ত ভ্রমণবৃত্তান্ত একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অধিকার করে রয়েছে।

হিমালয় ভ্রমণসংক্রান্ত রচনার কথায়, অপরপক্ষে অন্যভাবে হিমালয়চর্চা প্রসঙ্গে সাধারণ পাঠকের প্রথমেই মনে পড়ে যায় স্বর্গত জলধর সেনের কথা। তাঁর হিমালয় ভ্রমণ গ্রন্থটি আজও হিমালয় উৎসুক বাঙালী পাঠককে আকৃষ্ট করে—জলধর সেন যদি হিমালয়কে ভ্রমণবিলাসীর চোখে দেখে থাকেন তবে তন্ত্রাভিলাষী প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়ের বিভিন্ন পুস্তক হিমালয়ের গহনগিরি কন্দরের সাধকশ্রেণীর সঙ্গে আমাদের অনেক ঘনিষ্ট পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন নিঃসন্দেহে। এর পরেই প্রবোধ কুমার সান্যাল মহাশয়ের 'মহাপ্রস্থানের পথে' অন্যতর আঙ্গিকে হিমালয়ের আর এক জগৎ সম্বন্ধে সাধারণ পাঠককে উৎসাহিত করে তুলেছিল এবং এটা অস্বীকার করার কারণ নেই যে মহাপ্রস্থানের পথের কাহিনী—যে কাহিনীতে পথের দুর্গমতা, হিমালয়ে বিরাট অপার মহান সৌন্দর্য, তীর্থ পরিচয় আর সেই সঙ্গে প্রবহমান জীবনের ব্যথা বেদনা সুখ দুঃখ চাওয়া পাওয়া এক অপরূপ সম্মিলন ঘটেছে—তা সাধারণ মানুষকে করেছিল বিপুল ভাবে আকর্ষণ, এবং এরই ফলশ্রুতি, পরবর্তী কয়েক দশকের বাংলা-সাহিত্যের ভ্রমণকাহিনীতে 'রাণী'দের অবাধ আগমন। এবং এর ফলে অনেক লেখকের হাতে হিমালয় গৌণ হয়ে ভ্রমণকাহিনীর আধারে কল্পনার চরিত্রের রাণীরাই হয়ে উঠেছে

প্রধান অর্থাৎ সর্বত্র হিমালয় থেকেছে পটভূমিকায়।

বলা বাহুল্য, বিশেষতঃ ১৯৫৩ সালে এভারেষ্ট বিজয়ের পর আমাদের দেশে হিমালয় সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে চিন্তা, উৎসাহ উদ্দীপনা বিপুলভাবে বর্ধিত হয়। দিকে দিকে সাড়া পড়ে যায়। দার্জিলিং-এ ট্রেনিং ইনস্‌টিটিউট স্থাপিত হওয়ায় বাঙালীদের পর্বতারোহণ স্পৃহা তথা হিমালয় চর্চা বর্ধিত হয় বহুগুণ। এবং এরই ফলে প্রায় প্রতি বছরই বেসরকারী পর্যায়ে যেকটি পর্বতারোহণ চেষ্টিত হচ্ছে তার অর্ধেকই এই বাংলা দেশ থেকে। এবং আরো উল্লেখ্য পর্বত অভিযান ব্যতিরেকে আরও কত অসংখ্য বাঙালী প্রতি বৎসর বসন্ত ও শরৎকালে হিমালয়ের দুর্গম পথে ছোট খাট অভিযানের নেশায় বেড়িয়ে পরেন তার হিসাব কে করেন?

হিমালয়ে ভ্রমণ এবং অভিযান যত বাড়ছে, বাংলা বইয়ের বাজারে হিমালয় সংক্রান্ত গ্রন্থের সংখ্যাও ঠিক সেই অনুপাতে বেড়ে চলেছে। অবশ্য এর ফলে একশ্রেণীর ভ্রমণ কাহিনী লেখকের আর কাহিনীর প্রয়োজনে ভ্রমণের প্রয়োজন হয় না গুটিপাঁচেক বই হাতের কাছে থাকলেই তিনি স্বচ্ছন্দে কুলু থেকে ফালুট ভ্রমণ করে আসতে পারেন তাঁর কল্পিত মানসীর সঙ্গে।

কিন্তু হিমালয় প্রেমী পাঠকের এতদিন যে অভাবটা প্রতিপদে বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছিল তা দূর করার দাবী নিয়ে উপস্থিত হয়েছে শ্রীযুক্ত সুকুমার বসুর 'হিমালয়' গ্রন্থখানি।

হিমালয় সংক্রান্ত, হিমালয় প্রসঙ্গে নানা গ্রন্থ আমাদের হাতে এসেছে, কিন্তু অধিকাংশ গ্রন্থেই চিত্রিত হয়েছে হিমালয়ের খণ্ড খণ্ড রূপ; সেই অন্যান্য গ্রন্থে প্রায় অসম্পূর্ণ থেকে গেছে হিমালয় সম্পর্কিত সেই ইতিহাস যা সাধারণ পাঠককে সাহায্য করবে হিমালয়কে জানতে, হিমালয়ের উৎপত্তি, হিমালয়ের গঠন, হিমবাহ, নদনদী হ্রদের উৎপত্তির কথা, হিমালয়ের বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ, জীবজন্তু পাখীর কাহিনী জানতে। এবং সেই সঙ্গে হিমালয়ের অধিবাসী ভাষা জাতি এবং বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন রূপের বিশদ পরিচয় পেতে। সেদিক থেকে শ্রীযুক্ত সুকুমার বসুর 'হিমালয়' ব্যতিক্রম—হিমালয় সম্পর্কিত প্রায় সমস্ত জিজ্ঞাসাই বর্তমান গ্রন্থে সযত্নে উপস্থাপিত।

আপাত দৃষ্টিতে শুধুমাত্র উপরিউক্ত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা নিরস হতে বাধ্য, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ত জটিল বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকের মতই সাধারণ পাঠকের হাতের নাগালের বাইরেই থাকার কথা। কিন্তু অত্যন্ত যত্ন এবং বিপুল পরিশ্রমের ফলে সুকুমারবাবু আমাদের এমন একটি পুস্তক উপহার দিয়েছেন যার মধ্যে নেই পাণ্ডিত্য ফলনোর অহেতুক প্রচেষ্টা। অপর পক্ষে তাঁর অধ্যবসায়ে আলোচ্য গ্রন্থটি হয়ে উঠেছে একটি নির্ভরযোগ্য আদর্শ 'হ্যাণ্ডবুক' যেটি হিমালয় প্রেমী, হিমালয় ভ্রমণেচ্ছু মাত্রেরই একটি সহায়ক পুস্তক। শুধু অবশ্য পাঠ্য নয় সর্বসময়ের সাথী হবার যোগ্যতা আছে বর্তমান গ্রন্থটির।

সুকুমারবাবু অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে এক এক করে হিমালয়ের প্রতিটি রূপের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এই গ্রন্থে। তাঁর আলোচনা হিমালয়ের টেথিস সাগর থেকে উৎপত্তি থেকে সুরু করে অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি, হিমবাহ, নদনদী, গিরিবর্ত্ম নিসর্গ জলবায়ু, উদ্ভিদ প্রাণী খনিজ সম্পদের সীমা ছুঁয়ে পরিশেষে হিমালয় অভিযান-এ এসে পরি সমাপ্তি লাভ করেছে। সাধারণ চিন্তায় এই ব্যাপক বিষয়াবলী নিয়ে আলোচনা একটা মহাভারত আকার ধারণ করার

কথা কিন্তু বর্তমান গ্রন্থকার তাঁর অপূর্ব্ব মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়ে তাঁহার তথ্য সমৃদ্ধ বিরাট বিশদ আলোচনা মাত্র দুশো পৃষ্ঠার মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ করতে পেরেছেন। এবং এ পুস্তক পাঠের সময় পাঠক কখনও ক্লান্তি অনুভব করবেন না—পরন্তু প্রতিটি পরিচ্ছেদ অন্তে তিনি চিরচেনা হিমালয়কে আরো ঘনিষ্ঠ, বিশদভাবে জানতে পেরে আরও বেশী উৎসাহ অনুভব করিবেন।

অবশ্যই পুস্তকের প্রারম্ভেই লেখক স্বীকার করেছেন 'হিমালয় পর্বত নিয়ে সবদিক দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এমন কোনো বই পাওয়া যায় না—বাংলাতে প্রথম এই চেষ্টা হোলো' এবং 'এই বই খানার কাজ তথ্য নিয়ে, মতামত ব্যক্ত করার স্থান এতে অল্পই আছে। সেই কারণে তথ্যের যাথার্থের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সর্বদা রাখার চেষ্টা হয়েছে।' কিন্তু শুধু তথ্য সংগ্রহ এবং পরিবেশনই নয়, উপস্থাপনায়ও লেখক যে প্রচুর পরিশ্রম এবং পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তা পর্যাপ্ত প্রশংসার দাবী রাখে।

শুধু ভৌগোলিক বিষয়ে আলোচনা নয়, শ্রীযুক্ত সুকুমার বসু হিমালয় অভিযানের প্রায় অবজ্ঞাত একটি দিকের উপরেও আলোকপাত করেছেন তাঁর এই গ্রন্থে। হিমালয়ের অজানা অংশকে জানার জন্য—শুধু জানা নয় সেই বিষয়কে তথ্য নির্ভর করার জন্য তৎকালীন জি, টি, এস অর্থাৎ গ্রেট ট্রিগনমেট্রিক সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার ভারতীয় কর্মচারীবৃন্দ যে অমানুষিক শ্রম স্বীকার করেছিলেন তার পুরো স্বীকৃতি এই গ্রন্থেই প্রথম পরিলক্ষিত হলো আবার সেই সঙ্গে আমাদের দেশের বহুল প্রচলিত ধারণাটি, রাধানাথ সিকদারই যে এভারেষ্টের উচ্চতা প্রথম পরিমাপ করেন, সেই প্রচলিত ধারণাটি যে ভ্রান্তিকর সে কথা তথ্য সহযোগে প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে।

গ্রন্থের অভিযানকাহিনীর অংশটি খুবই সংক্ষিপ্ত কিন্তু সে কারণে কোন সৌন্দর্য হানি হয়নি বরং আদিকাল থেকে আজ অবধি হিমালয় অভিযানের সংক্ষিপ্ত বিবরণী উদ্যোগী পাঠককে আরও উজ্জীবিত করবে হিমালয় সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক পুস্তকগুলি পাঠ করার জন্য। এবং সে উদ্দেশ্যে একটি সুনির্বাচিত গ্রন্থ-তালিকাও পুস্তকটির শেষে সংযোজিত হয়েছে।

পরিশেষে, গ্রন্থটির বিভিন্ন পরিচ্ছেদ সংস্থাপন সম্বন্ধে একটি বক্তব্য আছে। হিমালয়ের ভৌগোলিক বিবরণ এবং উত্তর খণ্ড নিয়ে আলোচনা যার মধ্যে ১৯৬২'র চীনা বিবাদ ইত্যাদি প্রসঙ্গ উপস্থাপিত এবং তারই পরবর্তী পর্যায়ে ভূতাত্ত্বিক আলোচনার সূত্রপাঠ পাঠককে রীতিমত বিস্মিত করে। কেননা, ১৯৬২ থেকে মনকে আবার হঠাৎ টেথিস সাগরের যুগে টেনে নিয়ে যাওয়া কষ্টকর এবং এ ক্ষেত্রে হয়ে পড়ে অপ্রাসঙ্গিক।

অথচ ভূতাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনায় বর্তমান গ্রন্থের ধারাবাহিকতা বজায় থাকতো যদি উক্ত অনুচ্ছেদটি পুস্তকের প্রারম্ভে সংযোজিত হতো। 'হিমালয়ে'র মতো সর্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থে এ ধরণের বিন্যাস-ত্রুটি পরবর্তী মুদ্রণে সংশোধনের অপেক্ষা রাখে।

বর্তমান গ্রন্থে হিমালয়ের নদ নদী নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে একটি সামান্য ত্রুটি হয়তো উৎসাহী পাঠকের দৃষ্টি এড়াবে না। লেখক বলেছেন, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে এক পাহাড় ধ্বসে পড়ে অলকনন্দার স্রোতের মুখ বন্ধ করে দেয় এবং তার ফলে দেখা দেয় এক প্লাবনের সৃষ্টি। পাহাড় ধ্বসে পড়েছিল ঠিকই তবে অলকনন্দার উপনদী বিরহী গঙ্গার উপরে—যে নদী চামোলীর কিছু আগে এ

অলকানন্দায় মিশেছে। সেই ধ্বংসের কিছু স্মৃতি আজও অবশিষ্ট থাকায় বিরহীগঙ্গার উৎস মুখে সৃষ্ট গোণাতাল এখনো বহু দর্শককে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা রাখে। তবে উল্লিখিত বন্যার কথায় ভুল নেই। ১৮৯৩-এ বিরহী গঙ্গার বাঁধ ভাঙা জলরাশি অলকানন্দায় এসে পড়ে চামোলী শহরকে পর্যন্ত বিপর্যয়ের সম্মুখীন করে তুলেছিল।

তবে বর্তমান গ্রন্থের কৌলিন্যের পাশাপাশি এই ত্রুটিগুগুলি নিতান্তই গৌণ। এবং আলোচনার প্রারম্ভে যে কথা উল্লেখ করেছিলাম সে কথার পুনরাবৃত্তি করা যায় স্বচ্ছন্দে—হিমালয়ের উপর সম্পূর্ণ নতুন ধরণের এই তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থখানি যে অচিরেই হিমালয়প্রেমী জনসাধারণের একটি অত্যাবশ্যকীয় গ্রন্থ হয়ে উঠবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 'হিমালয়' গ্রন্থ প্রণয়নে শ্রীসুকুমার বসু মহাশয় বিপুল পরিশ্রম করেছেন—তাঁর পরিশ্রম সার্থক হয়েছে—সাধারণের উপযোগী করে হিমালয়-এর ভূগোল ও ইতিহাস রচনার দায়িত্ব বাংলা ভাষায় গ্রহণ করার জন্য তিনি নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ। বলাবাহুল্য' 'হিমালয়' গ্রন্থখানি হিমালয় সম্পর্কিত একটি আকর গ্রন্থ—হিমালয়ের বহু বিচিত্র বৈজ্ঞানিক রহস্য, ইতিহাস. ভূবিদ্যা, প্রাণীতত্ব, নৃ-তত্ব, তীর্থস্থান, অভিযান ইত্যাদি তত্ত্ব ও তথ্যসহ, বর্তমান গ্রন্থে উন্মোচিত। গ্রন্থকারের ভাষা পরন্তু প্রকাশরীতি সাবলীল। সত্যজিৎ রায় কৃত প্রচ্ছদসজ্জা মনোরম।

প্রদীপ্ত চক্রবর্তী

রবীন্দ্রসঙ্গীত স্বরলিপি জিজ্ঞাসা ॥ কিরণশশী দে। প্রকাশক : 'টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট', ৪ এলগিন রোড, কলিকাতা-২০। মূল্য : এক টাকা।

রবীন্দ্র সংগীতের যে বিকৃতি এখন ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এই বাংলা দেশে বহুল প্রচারিত এবং কিছুটা প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে, শ্রীকিরণশশী-দের 'রবীন্দ্রসংগীত স্বরলিপি জিজ্ঞাসা' তার বিরুদ্ধে একটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদ জানিয়ে শ্রী দে, একটি জাতীয় কর্তব্য পালন করেছেন। কারণ রবীন্দ্রনাথ আজ কেবল শান্তিনিকেতন বা অন্য কোন সমাজ বা সম্পদ সীমিত পরিধির নন। তিনি সর্বদেশ ও কালের এক অমৃত সম্পদ। তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি অর্থাৎ, তাঁর সংগীত, আমাদের একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। যাতে তা বিকৃত না হয়, সংগীত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের আবর্জনা যাতে এই সম্পদকে নোংরা না করে, তার প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখা যে কোন সংগীতসচেতন মানুষের নৈতিক দায়িত্বের অন্তর্গত। শ্রী দে, শান্তি নিকেতনের একজন বিশিষ্ট প্রাক্তন ছাত্র, যাঁর সংগীতসাধনা স্বয়ং দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে। রবীন্দ্রসংগীতকে দূষিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার যে দায়িত্ব তাঁদের মত শিল্পীর অবশ্য কর্তব্য বলে আমরা মনে করি, শ্রী দে তা নির্ভয়ে পালন করেছেন। এজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

আলোচিত গ্রন্থে শ্রী দে রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে কয়েকটি মূল প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন।

(১) রবীন্দ্র সংগীতের আগেকার স্বরলিপির (দিনেন্দ্রনাথ, কাঙ্গালীচরণ প্রভৃতির) বহুল ও বেপরোয়া পরিবর্তন। (২) এ পরিবর্তন কেন করা হ'ল, সে সম্পর্কে পরবর্তী পরিবর্তনকারী স্বরলিপিকারদের আপত্তিকর নীরবতা। (৩) এ পরিবর্তনের অধিকার তাঁরা কোথা থেকে পেলেন। (৪) এই পরিবর্তনের ফলে রবীন্দ্রসংগীতের পবিত্রতা ও চরিত্র নষ্ট হল কি না ? যদি হয়ে থাকে, তবে এজন্য কে দায়ী। (৫) এবং ঐ পরিবর্তিত সংগীত রবীন্দ্রসংগীত কিনা ?

শ্রী দে-র এই প্রশ্নগুলি, রবীন্দ্রসংগীত-পিপাসু বা রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ও অনুশীলনকারীদের সকলেরই প্রাণের কথা। তিনি প্রায় শতাধিক গানের মূল স্বরলিপি এবং পরিবর্তিত স্বরলিপি অংশ-উদ্ধৃত করে, পরবর্তী স্বরলিপিকারদের দ্বারা পরিমার্জিত অংশগুলি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। এই পরিবর্তন কেন করা হ'ল, বা এগুলি সুরান্তর কিনা, পরিবর্তনকারীগণ তার কোন জবাব দেন নি, দেবার দরকারও মনে করেন নি। রবীন্দ্রসংগীতকে নিজেদের সম্পত্তি ভাবলেই, এই ধরণের নীরবতা ও ঔদ্ধত্য সম্ভব। নতুবা তাঁরা এই পরিবর্তনের কৈফিয়ত দেবার নৈতিক দায়িত্ব পালন করতেন।

শ্রী দে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাতে জানা যায়, কবিগুরু নিজে এই ধরণের পরিবর্তনকে অসহ্য মনে করতেন। তিনি বলেছেন, 'রচনা যে করে, রচিত পদার্থের দায়িত্ব একমাত্র তারই ; তার সংশোধন বা উৎকর্ষ সাধনের দায়িত্ব যদি আর কেউ নেয় তা'হলে কলাজগতে অরাজকতা ঘটে'।

রবীন্দ্রসংগীতের এই স্বরলিপি পরিবর্তনের মধ্যে যে দোকানদারী মনোভাব পরিস্ফুট, রবীন্দ্রনাথ সে সম্পর্কে বলেছেন, 'দোকানদারী প্রবল হয়ে পড়েছে·· দোকানের মাপেতে দর অনুসারে বাঁকা চোরা করে তার রস-টস চেপেচুপে চলেছে আমারই গান'।

রবীন্দ্রনাথের এই উদ্ধৃতিগুলি, তাঁর গভীর দুঃখের সাক্ষর বহন করেছে। তাঁর মৃত্যুর পর এই পরিবর্তনের ঘটা আরও প্রবল ও উদ্ধত হয়ে উঠেছে। এর প্রতিবাদ এ প্রতিবিধান না হলে, তাঁর সংগীত একদল 'সেলফ্ মেড' ওস্তাদের হাতে পড়ে অচিরেই সুরের আবর্জনায় ভরে উঠবে।

এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে, শ্রী দে যে তথ্যনিষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন, রবীন্দ্রসংগীত অনুশীলনের ক্ষেত্রে তা এক অত্যন্ত মূল্যবান সংযোজন। তাঁর কাছে রবীন্দ্র-সংগীত শিল্পী সমাজ কৃতজ্ঞ হয়ে রইলেন।

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

আনন্দে
উৎসবে...
প্রাত্যহিক প্রয়োজনে..
সবার মনোরঞ্জনে...
কেশতৈল
কেশরঞ্জন

SADHANA Beauty CREAM ANTISEPTIC Indispensable for Women

সাধনা
বিউটি
ক্রীম

S Ph. 2/67

মেয়েদের
ত্বক-সৌন্দর্যের
গোপন রহস্য

প্রতিদিনের রূপ-সাধনায় এই ক্রীম অপরিহার্য
কুসুম-কোমল, পাপড়ি-পেলব, যৌবন সুলভ, লাবণ্যময় ত্বক—
এইতো সাধনা বিউটি ক্রীমের সবচেয়ে বড়ো অবদান
সাধনা বিউটি ক্রীম সৌন্দর্য-লোকের প্রবেশপত্র

অধ্যক্ষ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.এ. আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ.সি.এস. (লণ্ডন) এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ-শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনানগর, কলিকাতা-৪৮
কলিকাতা কেন্দ্র :
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম.বি.বি.এস. (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য

অত্যন্ত আরামদায়

নং ২২২

নং ৭৭

নং ৮৫৫

নং ১০৫

নং ৯০৩
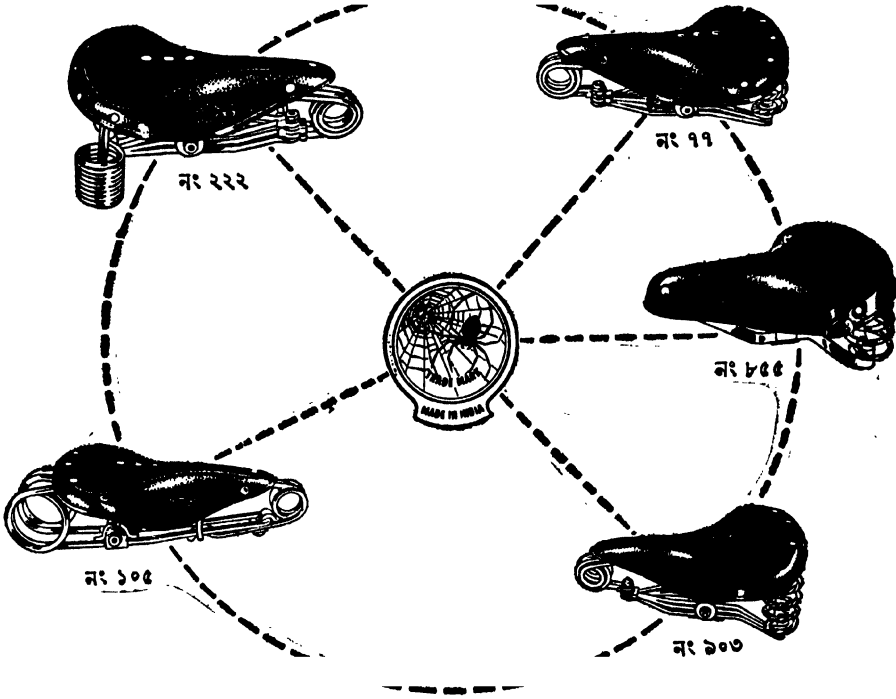
উইটকপ

সীট—বিভিন্ন টেঁকসই ডিজাইনে পাওয়া যায়

প্রথম শ্রেণীর বাট লেদার এবং বিশেষ ধরনের ইস্পাতের স্প্রিং-এ তৈরী
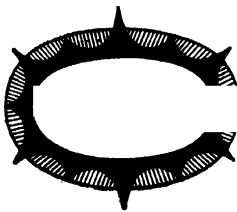
ইনি একটা কারখানার সহকারি ফোরম্যান। এই কারখানাটির গবেষণাগারে একজন সহকারি হিসেবে যোগ দিয়ে, সাত বছরের মধ্যে তাঁর এই পদোন্নতি হয়েছে। তিনি বলেন, "আমি যে উন্নতি করেছি, চেষ্টা ও যত্ন থাকলে অন্যেও অবশ্য এই রকম উন্নতি করতে পারেন। তবে আমি যখনই যে কাজ করি, তা নিষ্ঠার সঙ্গে করি। আমার কয়েকজন সহকর্মীর, ছেলেমেয়ে বেশী আর তাঁদের দুরবস্থা আমি সব সময়েই দেখছি। আমার মাত্র দুটী সন্তান এবং তাদের আমি, আমার সাধ্যানুসারে মানুষ ক'রে তোলবার চেষ্টা করছি। সেই জন্যই আমি সুখী।"

ইনি সুখী।

আপনি ?

পঞ্চদশ বর্ষ ৯ম সংখ্যা

পৌষ তেরশ' চুয়াত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

স্টাইলিস্টিক্স্

নবেন্দু সেন

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ হল 'স্টাইল'। বেশভূষায়, লেখাপড়ায়, সিনেমা বায়োস্কোপে, চলনে-বলনে, খেলাধুলায়, এককথায় আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে শব্দটি নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। অথচ শব্দটির জন্ম অন্য দেশে, অর্থও ভিন্ন। ল্যাটিন স্টাইলাস থেকে স্টাইল ও স্টাইলিস্টিকস্ এসেছে। 'স্টাইলাস' অর্থ একপ্রকার 'লেখন দন্ত'। কিন্তু 'স্টাইল' শব্দের বাংলা প্রচলিত শব্দ রীতি। অথচ 'রীতি'র বুৎপত্তি এবং অর্থ যথাক্রমে রী+তি, ধরণ, প্রণালী, প্রথা, পদ্ধতি বা আচরণ এবং প্রাচী বৈয়াকরণেরা 'অপভ্রংশে'র আঞ্চলিক বিভাষাগুলির যে ব্রাচড়ক, উপনাগরক, বৈদর্ভী, লাটি, গৌড়ী, পাঞ্চালী, ঢক্কি এবং সিংহলী প্রভৃতির নামে গৌড়ী, পাঞ্চালী, লাটী ও বৈদর্ভীর যে চারটি রীতিগত পরিচয় দিয়ে থাকেন তাও ভাষার বৈশিষ্ট্যগত স্বাতন্ত্র্য অপেক্ষা অঞ্চলগত, স্থানীয় নামের সঙ্গেই সম্পর্কিত বেশী। অতএব প্রচলিত 'রীতি' অর্থে 'স্টাইল' বা 'স্টাইলিস্টিকস্'র বিচার সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে স্টাইল ও স্টাইলিস্টিকস্ ল্যাঙ্গুয়েজ ও লিঙ্গুইস্টিকস্'এর মত ভাষা বিজ্ঞানের বিষয়। ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যে স্টাইলিস্টিকস্ নূতন বিষয়। স্টাইল স্টাইলিস্টিক্স্-এর উৎপাদন। 'স্টাইলিস্টিকস্' 'স্টাইলাস' থেকে আগত। 'স্টাইলাস'এর সঙ্গে লেখার সম্পর্ক। স্টাইলিস্টিকস্ও ভাষার গঠন ও রচনার আবেদন নির্ণয়ক ভাষা বিজ্ঞান। 'স্টাইল' তাই ভাষার গঠন ও আবেদন বিষয়ক পরিচিতি। অর্থনীতির পরিভাষায় 'স্টাইল' 'স্টাইলিস্টিক্স্'এরই 'Finished Product.

বিশেষ্যপদ রূপে **'Stilistik'** শব্দটি ইংরেজী অভিধানে আসে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে। রচনার রূপ ও ভাবব্যঞ্জক শব্দার্থে **'Stylistique'** ফরাসী সাহিত্যের অভিধানে স্থান পায় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে।

১৮৮২—১৮৮৩'র মধ্যে ওল্ড ইংলিশ ডিক্‌সেনারীতে 'রেগুলার ওয়ার্ড' হিসাবে ব্যবহৃত হয়। জার্মাণ ভাষায় অবশ্য উনবিংশ শতকের গোড়া থেকেই **Stilistik** শব্দটির ব্যবহার লক্ষিত হয়। Stylistics'র সংজ্ঞা প্রসঙ্গে Ullmann লিখেছেন—

Stylistic is not a branch of linguistics, it is a parallel science which examines the same problems from a different point of view. (১)

Ullmann'এর এই সংজ্ঞার তাৎপর্য আছে। লিঙ্গুইস্‌টিকস্‌ আর স্টাইলিস্‌টিকস্‌'এর মূলতম পার্থক্য উভয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে। ই. জে. স্পেনসার এবং এম. গ্রেগরী রচিত লিঙ্গুইস্‌টিকস্‌ এ্যাণ্ড স্টাইল (১৯১৪) গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ভাষার স্বাভাবিক 'ক্রমে'র ব্যতিক্রম বিচারই স্টাইলিস্‌টিকস্‌'এর ধর্ম, অপরপক্ষে লিঙ্গুইস্‌টিকস্‌ ভাষার ধ্বনিবিজ্ঞান ধ্বনিবিচার ধ্বনিতত্ত্ব রূপতত্ত্ব বাক্যরীতি শব্দার্থতত্ত্বের আলোচনা করে। আরো স্পষ্টতর করে বলা চলে, স্টাইল বিচারে রচনার গঠন ও গমক, নির্মাণ ও নির্মাল্য, ভাব ও ভাষা উভয়েরই পূর্ণ পরিচয় দেয়। এদিক থেকে স্টাইলিস্‌টিকস্‌'এর গুরুত্ব লিঙ্গুইস্‌টিকস্‌'এর গুরুত্ব অপেক্ষা অনেক বেশী। (২) অবশ্য উভয়ের একটা যোগও আছে। ভাষার স্বাভাবিক 'ক্রম' নিয়ে স্টাইলিস্‌টিকস্‌'র অগ্রগতি তা'র 'প্রিসাইজ প্যাটার্ণ'টা তো ভাষাতত্ত্বের কাঠামোয় পড়ে। তাই বলা হয়—Roughly speaking, two utterances in the same language which convey approximately the same information, but which are **different** in their linguistic structure, can be said to **differ** in Style (৩) 'ডিফারেন্স আছে, ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে 'স্টাকচারাল, স্টাইলিস্‌টিকস্‌'র ক্ষেত্রে ইন্‌ফরমেটিভ। এক্ষেত্রেও প্রশ্ন থেকে যায়। লিঙ্গুইস্‌টিকস্‌ 'ইন্‌ফরমেশন্‌'এর সঙ্গে একেবারেই জড়িত নয়? বিশেষত Gleason-র মত প্রখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানীও যখন বলেন, "Language operates with two kinds of material. One of these is sound.…The other is ideas, social situations, meanings…these two, in sofar as they concern linguists, may conviently be labeled **expression** and **content**." ৪

এই 'কনটেণ্ট'এর সঙ্গে স্টাইলিস্‌টিকস্‌-এর পার্থক্য কোথায়? আছে, স্টাইলিস্‌টিকস্‌-এর সঙ্গে লিঙ্গুইস্‌টিকস্‌-এর মূল পার্থক্যও এখানে। লিঙ্গুইস্‌টিকস্‌-এর একস্‌প্রেসন এবং কন্‌টেণ্ট দুটি ভাগ থাকলেও তা বস্তুত নির্মাণমূলক। ভাষা বিজ্ঞানের 'একস্‌প্রেসন' সাউণ্ড-এর ভাষাতাত্ত্বিক নাম, যেমন আইডিয়াস্‌-এর নাম কন্‌টেণ্ট, কিন্তু ভাষাবিজ্ঞান যে কোন 'ধ্বনি' বা 'ধারণা' নিয়ে গঠিত নয়। It is orderly in terms of a very complex set of patterns. Which repeatedly recur and which are at least partially predictable." ৫ এই প্যাটার্ণের ষ্ট্রাক্‌চার নিয়ে লিঙ্গুইস্‌টিকস্‌ রচিত। স্টাইলিস্‌টিকস্‌ও ষ্ট্রাকচার নিয়ে জড়িত কিন্তু অন্যভাবে। ষ্ট্রাক্‌চারাল নর্‌ম্‌-এর যথার্থ্য বিচার, নর্‌ম্‌-এর বিচ্যুতি তৎজনিত রচনার সৌন্দর্যও অপকর্ষমূলক বিশ্লেষণ করা স্টাইলিস্‌টিকস্‌-এর বিষয়। কাজেই ঠিক লিঙ্গুইস্‌টিকস্‌-এর মত নয় রাইটিংস্‌-এর সামগ্রিক রসাবেদন বিচারও স্টাইলিস্‌টিকস্‌-এর বিষয়। এই 'রেটোরিক্যাল এ্যাপিল' কিভাবে গড়ে উঠেছে, তার পেছনে ভাষার গঠন বা নির্মাণকৌশলের কতখানি অবদান আছে তার হিসাব

ও মূল্যবিচার করে স্টাইলিস্‌টিকস্‌; রচনার **ভাল, মন্দ** বিচারও তাই তার ক্ষেত্রের বিষয়। ভাষা ব্যবহারের 'পছন্দ' শব্দ সাযুজ্য, শব্দ সামীপ্য বাক্যের 'এফেক্ট' ও 'পিরিওডিক' 'ক্রিসেণ্ডো' জাতের কথাও তাই স্টাইলিস্‌টিক্‌স্‌-এর বিষয়। যতি চিহ্ন, ধ্বনি তরঙ্গ, শব্দ, বাক্য, অনুচ্ছেদ, সববিষয়েই স্টাইলিস্‌টিকস্‌-এর বিচার হয়ে থাকে। অর্থাৎ ভাষার যে সমস্ত উপাদানে রচনা সৃষ্টি হয় তার সব কিছুর বিশ্লেষণই স্টাইলিস্‌টিকস্‌ করে এবং বিশ্লেষণান্তে একটি বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। অর্থাৎ 'বঙ্কিমী রীতি, 'আসামী ভাষা' বা 'পণ্ডিতী গদ্য' প্রভৃতি বাংলা ভাষা সম্পর্কে প্রচলিত যে, 'ফ্রেজ'গুলি ব্যবহৃত হয়, স্টাইলিস্‌টিকস্‌-এর প্রয়োগে এই 'ফ্রেজ'গুলির 'কেন'র উত্তর পাওয়া যায়। 'Style is the man' বাক্যের তাৎপর্য উদ্ঘাটিত করে। একজন লেখকের রচনা কেন রোমাণ্টিক, বা মিষ্টিক তার ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণ রাখতে পারে স্টাইলিস্‌টিকস্‌। অনেক ক্ষেত্রে অপরিচিত অথচ সন্দেহযুক্ত পরিচিত লেখকের লেখা নিয়ে যে সমস্যার উদ্ভব হয় স্টাইলিস্‌টিকস্‌ তারও পরিচয় উদ্‌ঘাটনে সাহায্য করে। (৬)

স্টাইলিস্‌টিকস্‌-এর সাহায্যে রচনার স্টাইল নির্ণয়ের নিম্নলিখিত সুবিধাগুলির জন্যে বিদেশে (আমেরিকায়, ইংল্যাণ্ডে এবং জার্মানে ও ফ্র্যান্সে ব্যাপকভাবে) লিঙ্গুইস্‌টিকস্‌-এর সঙ্গে সঙ্গে স্টাইলিস্‌টিকস্‌-এরও চর্চা হচ্ছে। সুবিধাগুলি :—

(ক) ভাষার উপাদানগুলির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে বক্তব্য বস্তু তথা রচনার ভাব বিষয় অবহিত হওয়া যায়।

(খ) পূর্ব থেকে একটা ধারণা করে রচনার ভাব বিশ্লেষণের আবশ্যক হয় না বিশ্লেষণ করে 'ধারণা'য় উপনীত হওয়া যায় এবং ধারণা তখন **সিদ্ধান্তে** রূপ নেয়।

(গ) 'ভেগনেস্‌'-এর পরিবর্তে 'প্রিসাইজ্‌নেস' আসে এই রীতির বিশ্লেষণে।

(ঘ) স্টাইলিসটিক্যাল মেথড-এ ডায়াগ্রাম্‌-এ এবং গ্রাফ্‌-এ এই বিশ্লেষণ যত বেশী নির্ভুল এবং বৈজ্ঞানিক হয় তত নির্ভুল পদ্ধতি এখন পর্যন্ত ভাষার স্টাইল বিচারের ক্ষেত্রে আবিষ্কৃত হয়নি। অতএব স্টাইল নির্ণয়ক এই বিজ্ঞান, রচনার সঙ্গে রচয়িতার যে সম্পর্ক প্রমাণ করে তার গুরুত্ব ভাষা বিজ্ঞানের চর্চার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বিশেষ মূল্যবান।

দেশ ও জাতি, সভ্যতা ও সমাজ অনুযায়ী ভাষার স্বভাব স্বতন্ত্র হয়। সেই স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে ভাষাতাত্ত্বিক সচেতনতা রেখে (ভাষাগুলির স্বভাব জেনে) যে কোন ভাষারই স্টাইল নির্ণয় সম্ভব। ভাষাতত্ত্বের চেয়েও এক্ষেত্রে স্টাইলতত্ত্ব অধিক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ভাষাতত্ত্বের জ্ঞান-সীমারও ঊর্ধ্বে প্রসারিত স্টাইলতত্ত্বের জ্ঞানসীমা। জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞানীর ত্রিসঙ্গমে উভয় তত্ত্বই হয়তো পূর্ণ, কিন্তু "আমাদের জানা দু-রকমের, জ্ঞানে জানা আর অনুভবে জানা।" ভাষাতত্ত্ব জ্ঞানের, স্টাইলত্বে জ্ঞান ও অনুভব দুয়েরই।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "ভাষার ক্ষেত্রেও প্রকাশ দুই শ্রেণীর। একটিতে প্রতিদিনের প্রয়োজন সিদ্ধ হতে হতে তা লুপ্ত হয়ে যায়, ক্ষণিক ব্যবহারের সংবাদ বহনে তার সমাপ্তি। আর একটাতে প্রকাশের পরিণাম তার নিজের মধ্যেই।…বিচিত্র ফুলে ফলে পল্লবে শাখায় কাণ্ডে ভাবের এবং রূপের সমবায়ে সমগ্রতায় সে আপনার অস্তিত্বেরই চরম গৌরব ঘোষণা করতে থাকে

স্থায়ী কালের বৃহৎ ক্ষেত্রে।" (৭)

স্টাইল ভাষার এই দু' শ্রেণীরই পরিচয় উদ্ঘাটন করে। আমরা রচনার কিছু শব্দ এবং কয়েকটি বাক্য বিচার করে বিষয়টি সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করছি এখানে। নীচে যে কোন রচনার দুটি অংশ তোলা হল।

(ক) "তুমি সৎস্বরূপ ও জগতের কারণ এবং জ্ঞান-স্বরূপ ও সকলের আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার ; তুমি মুক্তিদাতা, অদ্বিতীয়, নিত্য ও সর্বব্যাপী ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার। তুমিই সকলের আশ্রয়-স্থান, তুমিই কেবল বরণীয়, তুমিই এক এই জগতের পালক ও স্ব-প্রকাশ, তুমিই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তা, তুমিই সকলের শ্রেষ্ঠ, নিশ্চল ও দ্বিধাশূন্য।"—

(খ) এই সকল জুতা-পেটাকরা, সার্বজনিক মতামতকে কলা দেখাইবার ক্ষমতাওয়ালা, বেয়াড়া রকমের তাজা-তাজা চিন্তা ও কর্মের প্রবর্তক লোকগুলিকে এককথায় আমি বলি তাঁদড়। এই সকল তাঁদড় নিজ মাথায় সকল প্রকার কুৎসা-নিন্দা বহিয়া সমাজ-রাষ্ট্র-মন্দির-পরিবারের জন্য নতুন-নতুন পথ খুলিয়া ধরিতে পারদর্শী।—

'ক' ও 'খ'-র রচনাংশ দুটির রসাবেদনের পার্থক্য তীব্র এবং স্পষ্ট। কারণ হিসাবে প্রথমে উভয়াংশের ব্যবহৃত শব্দগুলির বিচার করা যাক।

(ক) **অংশে ব্যবহৃত শব্দ সম্পদ :**

তৎসম	তদ্ভব	দেশী	বিদেশী	মোট
২৭%	১৬%	০%	০%	৪৩%

(খ) **অংশে ব্যবহৃত শব্দ সম্পদ :**

তৎসম	তদ্ভব	দেশী	বিদেশী	মোট
২১%	১০%	৩%	৭%	৪১%

গোত্র অনুযায়ী শব্দ ব্যবহারে 'ক' ও 'খ'-র মধ্যে বড় পার্থক্য দেশী ও বিদেশী শব্দের ব্যবহারে। ক-তে দেশী, বিদেশী শব্দের ব্যবহার নেই। খ-তে আছে, বিদেশী বেশী, দেশী কম। অথচ মোট শব্দের সংখ্যাতে 'ক' ও 'খ'-তে মাত্র ২'এর পার্থক্য। তৎসম ও তদ্ভব শব্দের ব্যবহারে ক ও খ মোটামুটি এক নীতির বলে মনে হতে পারে অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই সর্বাপেক্ষা বেশী তৎসম তার পরেই তদ্ভব। কিন্তু উভয়ের তুলনামূলক ব্যবহার রীতিতে পার্থক্য আছে। তৎসম শব্দের ব্যবহারে ক অপেক্ষা খ ৫% কম, তদ্ভবেও ৬%। মোট পার্থক্য'র সংখ্যা তাহলে ১৬ দাঁড়ায়।

এই পার্থক্য শব্দগুলির গঠন ও ব্যবহারিক আবেদনেও লক্ষিত হয়। যেমন **কম্পাউণ্ড ওয়ার্ড** (আধুনিক লিঙ্গুইস্টিকস্-এর ভাষায় word = included position of the language) এবং **সিম্পল ওয়ার্ড** গঠনের ক্ষেত্রে 'ক'-তে রূপক অলঙ্কারের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে বেশী অথচ 'খ'-তে রূপক অলঙ্কারের কোন ব্যবহারই নেই।

যেমন : (i) সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তা

(ii) জ্ঞান-স্বরূপ

(iii) সৎ-স্বরূপ

(বিকল্পে ষষ্ঠী তৎপুরুষ ও হতে পারে)। কিন্তু খ-তে **'জুতা-পেটা করা', 'কুৎসা-নিন্দা'** ষষ্ঠী বা রূপক অলঙ্কার নয়। 'সমাজ-রাষ্ট্র-মন্দির-পরিবার' ও দ্বন্দ্ব। কেবল তাই নয় এই কম্পাউণ্ড ওয়ার্ডগুলির নির্মাণ বিশ্লেষণেও লক্ষ্য করা যায় যে 'ক'-তে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি কম্পাউণ্ড ওয়ার্ডই তৎসম শব্দে গঠিত (যেমন 'সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তা') খ-তে তা নয় (যেমন 'জুতা-পেটা-করা)। প্রকৃতপক্ষে বিদেশী (প্রধানত হিন্দী শব্দ) শব্দের সঙ্গে তদ্ভব বা তৎসম শব্দের সম্পৃক্ত ব্যবহার খ-তে ব্যবহৃত শব্দ-সম্পদের একটি বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্ট্য। (যেমন ক্ষমতাওয়ালা' 'জুতা-পেটা করা')। কিংবা সংস্কৃত ছিত্বর—প্রাচীন বাংলায় আছিদার—ছেদর—চ্যাঁদড়—তোঁদড়—ত্যাঁদড় শব্দের ব্যবহার খ-র দেশী করণের প্রবণতাকেই চিহ্নিত করে বলা যায়।

শব্দের নির্বাচনের এই স্বাধীনতা প্রকৃতপক্ষে উভয় অংশের রচনাগত আবেদন সৃষ্টিতে স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করেছে। দু'একটি উদাহরণ :—

(ক) (i) আশ্রয় **স্থান** (তুমি)

(ii) (তুমি) **নিশ্চল** ও **দ্বিধাশূন্য**

(iii) (তুমিই) এই জগতের পালক ও **স্ব-প্রকাশ**

(খ) (i) **বেয়াড়া** রকমের **তাজা তাজা চিন্তা**

(ii) **জুতা-পেটা করা** লোকগুলা

(iii) সার্বজনিক **মতামতকে কলা দেখাইবার ক্ষমতাওয়ালা**

নিশ্চল, বেয়াড়া, দ্বিধাশূন্য জুতা-পেটা করা, জগতের পালক, কলা দেখানো, স্বপ্রকাশ, তাজা তাজা চিন্তা—পাশাপাশি রাখলেই জ্ঞানের ভাষাগত ইন্‌ফরমেশন্‌ এবং কন্‌টেণ্ট-এর পার্থক্যটা ধরা পড়ে। অথচ 'পালকে'র 'লক' এবং 'লোকগুলা'র লোক ধ্বনিগত সূক্ষ্ম পার্থক্য বজায় রাখে।

পার্থক্য বাক্য বিন্যাসেও (আধুনিক ভাষাতত্ত্বে বাক্য = Absolute position of language) ; দুটি পূর্ণচ্ছেদে উভয় অংশ দুটিই সমাপ্ত, কিন্তু ক-অংশের এক একটি বাক্যে একাধিক ক্ষুদ্র বাক্যের সমাবেশ আছে যা পৃথকভাবে লিখলেও লেখা যায়, যথা—

(i) তুমি সৎস্বরূপ ··· আশ্রয়। (ii) তোমায় নমস্কার। (iii) তুমি মুক্তিদাতা। (iv) অদ্বিতীয়, নিত্য ও সর্বব্যাপী ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার। (v) তুমিই সকলেব আশ্রয় স্থান। (vi) তুমিই কেবল বরণীয়। (vii) তুমিই এই ··· স্বপ্রকাশ। (viii) তুমিই ··· কর্তা। (ix) তুমিই ··· শ্রেষ্ঠ। (x) নিশ্চল ও দ্বিধাশূন্য।

কিন্তু খ'র বাক্য দুটি এভাবে সাজানো চলে না। যায় না। কারণ বাক্যবয়নে কর্তা, কর্ম ও উহ্য ক্রিয়া—এই প্যাটার্নে ক-অংশের অধিকাংশ বাক্যগুলি রচিত ; কিন্তু খ-অংশে কর্ম, সম্বন্ধ পদ, ষষ্ঠী এবং অসমাপিকা ক্রিয়ায় বাক্যগুলি বিস্তৃত। অনেক ক্ষেত্রে 'এ' বিভক্তি এই বিস্তৃতির সহায়ক হয়েছে। যেমন ··· মতামতকে ... লোকগুলোকে এক কথায় আমি বলি ত্যাঁদড়। আবার দ্বিতীয় বাক্যে **বহিয়া ··· খুলিয়া ··· ধরিতে ··· পারদশা** এইভাবে সমাপিকা ক্রিয়া ও কর্ম দিয়ে গঠিত হয়েছে।

প্রথমাংশে ছোট ছোট বাক্য একত্রে বিন্যস্ত হয়ে ভাবের সমৃদ্ধি সৃষ্টি করেছে। ভাবের

সমুন্নতিতে গাম্ভীর্য এসেছে, 'নিশ্চল' 'দ্বিধাশূন্য', 'জগতের কারণ', 'সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্তা' 'নমস্কার' প্রভৃতি শব্দ নির্বাচন করায়। একটা অধ্যাত্ম চিন্তা, একটা ভগবৎ-প্রেমমূলক দর্শন প্রকাশিত হয়েছে। অন্যদিকে প্রবাহিত বাক্য দুটিতে 'জুতা-পেটা করা' 'বেয়াড়া রকমের তাজা তাজা চিন্তা, 'তঁ্যাদড়, 'কলা দেখাইবার ক্ষমতাওয়ালা' শব্দগুচ্ছের ব্যবহারে খ-অংশে সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রকাশিত বিদ্রূপাত্মক লঘুভাব অথচ স্যাটায়ারের জ্বালাধরা উপলব্ধি প্রকাশিত হয়েছে।

স্টাইলের পরিপ্রেক্ষিতে প্রথমটি সাহিত্যধর্মী দ্বিতীয়টি রচনাধর্মী, বৈঠকী মেজাজের। ভাষা বিচারের ক্ষেত্রে স্টাইলিস্‌টিকস্‌-এর ব্যবহার আমাদের দেশে এখনো নূতন বিষয়। ক্রমশ চর্চায় স্টাইলিস্‌টিকস্‌ একদিন আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের সম্পর্ক স্থাপনেও সাহায্যশীল পদ্ধতি রূপে পরিগণিত হবে। প্রকৃতপক্ষে ভাষার কম্পোজিশন্‌ ও রেটোরিক্‌-এর সম্মিলিত মূল্য বিচারই স্টাইলিস্‌টিকস্‌-এর ধর্ম। অতএব স্টাইল বিচারে রচনার প্রতিটি শব্দ, সংযোজক অব্যয়, ক্রিয়া, যতি, বাক্য, অনুচ্ছেদ সমস্ত, এমনকি প্রতিটি শব্দের উচ্চারণ জাত ধ্বনি বা ধ্বনিপুঞ্জ সমস্তই, অতিসূক্ষ্ম ও সতর্ক বিশ্লেষণীয়। চিত্রকল্প, ভাষণ কলা সব জড়িয়ে স্টাইল; —কারণ স্টাইলিস্‌টিকস্‌ কোন আইডিয়া নয়, কোন ভাববস্তু নয় "It is concerned with linguistic values, not with historical development. Naturally, any stage in the evolution of a language can become the subject of stylistic enquiry, but the approach will always be descriptive." (৮)

১. Ullmann, Stephen, **Style in the French novel**, England, 1957, I0

২. War burg, 'Some aspects of Style' in **Linguistics and Style**, London, 1964, 19. By Spencer & Gregory.

৩. Charles W. Hockett, **A course in modern Linguistics**, Newyork, 1948, 536.

৪. Gleason, H. A. Jr., **Descriptive Linguistics**, sept. 1965, New York, 2.

৫. Ibid. 3.

৬. এ সম্পর্কে বর্তমান লেখকের 'অপরিচিতের পরিচয়' : সমকালীন (১৪ বর্ষ ১ সংখ্যা, মে ১৯৬৬), ৪৬-৫০ দ্রষ্টব্য।

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যের তাৎপর্য' : 'সাহিত্যের পথে' (১ম ১৯৩৬, ১৯৫০) ১৩৩-৩৪।

৮. Ullmann, Stephen, **op. cit**, 20-21.

স্পেনীয় নাট্যপ্রতিভা ক্যালডেরন

সত্যভূষণ সেন

স্পেন দেশের নাট্যকার ক্যালডেরন, শুধু স্পেন দেশে নয়, পৃথিবীর সকল দেশের সকল যুগের সকল নাট্যকারদের হিসাব নিতে গেলেও সেই জগৎসভায়ও ক্যালডেরনের আসন লাভ সুনিশ্চিত। সকল প্রকার রসসাহিত্যের ন্যায় নাটকেরও প্রধান উদ্দেশ্য জনগণের আনন্দ বিধান ; নাটক অভিনীত হয় বলেই এই রসসাহিত্যের উপভোগ হয় আরও নিবিড়। প্রাচীন গ্রীসে এবং প্রাচীন ভারতবর্ষে নাট্যসাহিত্যের উদ্দেশ্য যেমন ছিল জনগণের আনন্দবিধান তেমনই নাট্যরচয়িতারা তাদের রচনার মধ্য দিয়ে লোকশিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধেও সচেতন ছিলেন। প্রবীণ গ্রীসে শুধু ঈস্‌কাইলাস, সফোক্লিস ইউরিপিডীস নয়, কমিডি রচয়িতা অ্যারিষ্টোফেনীসের মধ্যেও এই ভাবাদর্শ দেখা যায়। যেমন ইংরেজি ভাষার নাট্যসাহিত্য তেমনই স্পেন দেশের নাট্যসাহিত্যেরও বিকাশ লাভ হয় মধ্যযুগের ধর্মমূলক নাটকের ভিত্তি থেকে।

স্পেন দেশের লোপ ডে ভেগা তার নিজ প্রতিভার রসায়নে দেশের মধ্যযুগীয় নাট্যসাহিত্যকে নবরূপে রূপায়িত করেন। লোপ ডে ভেগার পরে ক্যালডেরন এসে তার প্রতিভা এবং বিষয়ের প্রতি তার প্রেমের আবেগে নাট্যসাহিত্যকে আরও মার্জিত এবং অলংকৃত করে তার নির্দিষ্ট রূপ উৎকর্ষ সাধন করেন। ক্যালডেরন ছিলেন সেক্সপীয়রের সমসাময়িক। ইংরেজিতে একটি প্রবচন আছে—To have a great poet we must have great audiences also. মোটের উপর ও একথা সত্য যে একটা উন্নত সমৃদ্ধ দেশ এবং গরিষ্ঠ জনসমাজের ভিত্তি না থাকলে কোনও শ্রেষ্ঠ কবি বা সাহিত্যিক বা দার্শনিকের উদ্ভব হয় না। এই হিসাবে সেক্সপীয়র এবং ক্যালডেরন উভয়েই ছিলেন বিশেষরূপে ভাগ্যবান। ইংলণ্ডে তখন এলিজাবেথীয় যুগের গৌরবোজ্জল দীপ্তি ; ষোড়শ শতাব্দীর স্পেনও স্বকীয় শক্তিতে এবং মর্যাদায় সমগ্র ইওরোপের সম্ভ্রম এবং ঈর্ষার পাত্র, রাজ্য জয় এবং ঘটনাবহুল ইতিহাসের উত্তরাধিকারী।

স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার এবং সমগ্র ইওরোপের কবিদের মধ্যে অন্যতম ক্যালডেরন (Calderon da la Barca) জন্মগ্রহণ করেন ম্যাড্রিদে ১৬০০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী তারিখে। তিনি ছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। চৌদ্দ বৎসর বয়সে সালামাঙ্কা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন উনিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত সেখানে শিক্ষা লাভ করেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সেই আরম্ভ করে এই সময়ের মধ্যে তিনি অনেকগুলি নাটক রচনা করেন, তার মধ্যে বিশিষ্টভাবে খ্যাতি লাভ করে The Devotion of the cross নামে নাটকখানা। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের পরে তিনি সামরিক বিভাগের কার্যে যোগদান করেন এবং ইতালী এবং ফ্লাণ্ডার্সে যুদ্ধক্ষেত্রে কাজ করেন। স্পেনের রাজা চতুর্থ ফিলিপ নাট্যসাহিত্যের উৎসাহী ছিলেন, তিনি ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে ক্যালডেরনকে আহ্বান করে আনেন ; তখন লোপ ডে ভেগা লোকান্তরিত, তার পরিত্যক্ত আসনে বসে ক্যালডেরনের পক্ষে জনগণের চিত্তে প্রতিষ্ঠালাভে কিছুমাত্র বিলম্ব হল না।

রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় নাটক রচনা অবিচ্ছিন্ন ধারায় চলতে লাগল এবং নাটকের অভিনয়ও চলতে লাগল রাজকীয় আড়ম্বরে। ১৬৫১ সালে ক্যালডেরন ধর্মযাজকের বৃত্তি গ্রহণ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে তার নাটক রচনাও চলতে লাগল অব্যাহত ধারায়। কিন্তু এই সময় থেকে সাধারণত তার নাটকের আদর্শ হল ধর্মমূলক। আরও বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার মনোবৃত্তিতে এমনই পরিবর্তন এসে গেল যে তার যে সকল নাটকের মধ্যে ধর্মভাবের প্রণোদনা ছিল না সেক্ষেত্রে তিনি সেগুলিকে প্রতিভার ব্যভিচার বলে মনে করতেন। তার প্রতিভার উর্বরতা শক্তি ছিল অসাধারণ। তার পূর্ণাঙ্গ নাটকের সংখ্যা ছিল ১০৮ থানা, তার মধ্যে ট্রাজেডি এবং কমিডি দুইই ছিল; তা ছাড়াও ছিল ৭৩ থানা অটো বা ধর্মমূলক নাটক। নাটকের ক্ষেত্রে তার উদ্ভাবনী শক্তিও ছিল অসামান্য, তার অনেক নাটকের মধ্যে এত উপকরণ বাহুল্য আছে যে এক একখানা নাটকের উপকরণ নিয়ে তিন চার খানা ফরাসী বা ইংরেজি সমিতি নাটকের সৃষ্টি হতে পারে। তার পরবর্তী নাট্যকারদের মধ্যে অনেকে কোনও না কোনও ভাবে তার এই উদ্ভাবনী শক্তির নিকট ঋণী। 'হেরড ও মারিয়ামনে' একখানা প্রসিদ্ধ নাটক, তার লেখক Stephen Philips এই আখ্যায়িকার জন্য ক্যালডেরনের নিকট ঋণী। ক্যালডেরনের একখানা শ্রেষ্ঠ নাটক থেকে জার্মান কবি নাট্যকার গ্যেটে তার ফাউষ্ট নাটক রচনার ক্ষেত্রে অনেক সহায়তা পেয়েছেন।

ক্যালডেরন বিশিষ্ট দেহসৌন্দর্যেরও অধিকারী ছিলেন; প্রশস্ত ললাটে যেন স্পষ্ট দেবভাবের ছাপ। সে যুগের একমাত্র সেক্সপীয়রের মুখের সহিত তার তুলনা করা যায়। সেক্সপীয়রের মুখাবয়বে গাম্ভীর্যের সঙ্গে হাসিখুশির আনন্দদীপ্তি; ক্যালডেরনের মুখে হাস্যচপলতার লেশমাত্র দেখা যেত না, ছিল শুধু গাম্ভীর্য এবং নিষ্ঠা, যেন কবি-ধর্মযাজকের মূর্তি। ক্যালডেরন ও সেক্সপীয়র সমসাময়িক যুগের কবি; তারা উভয়ে যেন নিজ নিজ দেশের এবং যুগের চিন্তাধারা নিজেদের মধ্যে আত্মসাৎ করে নিয়েছিলেন। ক্যালডেরন ছিলেন তার দেশের সেই যুগের প্রতিনিধি স্থানীয় কবি, জাতীয় জীবনের প্রেম, বীর্য, সম্মান, ধর্মের যেন তিনিই ছিলেন মর্মব্যাখ্যাতা। তার সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে যে আদর্শ সৌন্দর্যলাবণ্য এবং পরিবেশ সৃষ্টির মধ্যে যে কবিত্বের অভিনব প্রকাশ তা অতুলনীয়। তার আমলে ল্যাটিন-ভাষা-দুহিতা স্পেনীয় ভাষা সুপ্রতিষ্ঠিত; কালডেরনের হাতে সেই ভাষা অভূতপূর্বভাবে সমৃদ্ধ এবং অপরূপ অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে উঠল, তার ভাবকল্পনার প্রাচুর্য যেন প্রয়োজনকে অতিক্রম করেও উপচে পড়ত।

ক্যালডেরন ছিলেন একজন খাঁটি স্পেনীয়, তার অন্তরে ছিল তার দেশের স্বভাবগত প্রাণ-শক্তির আবেগ, বীর্যের পরিচয় দানের জন্য আকুল তৃষ্ণা, এই সকলই তার সাহিত্যে মূর্ত হয়েছে অক্ষয় সৌন্দর্য প্রতিমারূপে। কারণ, তার শিল্পী-মানসের আদর্শনিষ্ঠা ছিল এরূপ অমলিন যে আত্মমর্যাদার কলঙ্ক সম্ভাবনাকে মনে হত অস্ত্রাঘাতের মত মর্মন্তুদ। এই আদর্শেরই পরিচয় দেখা যায় একখানা নাটকে। একজন স্পেন দেশের লোককে রাজাদেশে কোনও প্রকার ঘৃণ্য কাজ করতে বলা হয়, স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় রাজার প্রতি আনুগত্যের কথা; তার জবাবে সে বলে, অসম্ভব। আমার ধনসম্পদ এমন কি আমার জীবনের উপরেও রাজা আনুগত্য দাবী করতে পারেন; কিন্তু আমার ব্যক্তিত্ব বা আত্মমর্যাদার বেলায় আমি একমাত্র ভগবান ছাড়া আর কারও আনুগত্য স্বীকার করি না।

অনুরূপ আর একটি চিত্র দেখা যায় তার The Steadfast Prince নামক ঐতিহাসিক নাটকে, সেখানে আত্মমর্যাদার মহিমার যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে সাহিত্যে তা প্রায় অতুলনীয়। মূরদের রাজা ফেজের বিরুদ্ধে এক অভিযানে ফার্ডিনেণ্ড বন্দী হয়েছেন, তাকে মুক্তিদানের সর্ত নির্দিষ্ট হয়েছে খৃষ্টান নগরী কিউটাকে মূরদের নিকট সমর্পণ করতে হবে। পোর্তুগালেরই অন্যতম যুবরাজ হেনরী এই বিষয়ে তাকে প্ররোচিত করবার চেষ্টা করলে ফার্ডিনেণ্ড জবাব দিলেন, সাবধান, হেনরী, তোমার মুখে এরকম কথা শুধু একজন খৃষ্টান সৈনিক এবং পর্তুগালের একজন যুবরাজকে হেয় করে না, খৃষ্ট-ধর্মের আলোকবিরহিত একজন বর্বরের পক্ষেও এটা গ্লানিকর। যেখানে আমরা ভগবানের মন্দির গড়ে তুলেছি সেই নগর আমরা পরিত্যাগ করব, ভগবানের মন্দির মস্তক অবনত করবে মূরের পতাকা তলে; এ হবে আমাদের দেশাত্মবোধ আমাদের পবিত্র খৃষ্টানধর্ম এবং ধর্মনিষ্ঠার ব্যভিচার। এই নগর সমর্পণ করে দিলে হয়তো শত শত নগরবাসী খৃষ্টান ধর্ম পরিত্যাগ করে মূরদের বর্বর ধর্মানুষ্ঠানে বাধ্য হবে। আমার মত একজনকে উদ্ধার করবার জন্য শত শত লোককে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেব? রাজাকে উদ্দেশ্য করে ফার্ডিনেণ্ড বললেন, আমি এখন তোমার একজন দাসরূপে পরিণত হয়েছি; আমি বরং দাসই থেকে নির্যাতন ভোগ করব তথাপি তোমার ঐ সর্তে মুক্তি ক্রয় করব না। ফার্ডিনেণ্ড নিষ্ঠুর নির্যাতনের মধ্য দিয়ে তিলে তিলে মৃত্যু বরণ করে ব্যক্তিত্ব গৌরবের মর্যাদার অপূর্ব দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

মানুষের ব্যক্তিত্ব গৌরব এবং আত্মমর্যাদার রূপদান করতে গিয়ে যেমন তার প্রতিভা অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছে তেমনই নিসর্গরাজের মধ্যে যে সুন্দরের প্রকাশ এবং সংসারে মানুষের চিত্তে ভাবের অভিব্যক্তি এবং বিকাশে যে কত বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা তাও তার হাতে এসে অপরূপ মহিমা লাভ করেছে এবং তার প্রকাশেও তার কবিত্ব প্রতিভা বিকশিত হয়ে উঠে উঠেছে। অনুবাদে মূল কবিতার সৌন্দর্য মহিমা রক্ষা সম্ভব নয়; তথাপি বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি ভাবানুবাদ দৃষ্টান্ত স্বরূপ সঙ্কলন করে দেওয়া হল।

(১) সূর্যকান্তের গরিমা প্রকাশে বলছেন—

পর্বত শিখরের সহিত মেঘ এবং মেঘের সহিত উন্মুক্ত আকাশের সীমাহীন বিস্তার—সব যেন এক অবিচ্ছিন্ন ধারায় বিধৃত এবং সামগ্রিকভাবে এক অপরূপ লাবণ্য গরিমায় মণ্ডিত।

(২) প্রেমের রহস্যময়তা প্রকাশে—

ডন জুয়ানা! ভগবানের আকস্মিক প্রকাশে ভক্তের হৃদয়ে যে কম্পন দেখা দেয়, ঐ নামের উচ্চারণে আমার হৃদয়ে তেমনই স্পন্দন জাগে।

(৩) নারীর দেহ লাবণ্যের স্তুতিতে—

এই নারীর দেহে বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য এসে যেন কেন্দ্রীভূত হয়েছে—সূর্যের সকল আলোকদীপ্ত একটি রশ্মিতে বিধৃত, উষার স্বর্গোপম গরিমা একটি শিশিরবিন্দুর মধ্যে প্রকাশিত, বসন্ত ঋতুর সমস্ত হৃৎস্পন্দন একটি গোলাপের মধ্যে এসে বিকশিত।

(৪) প্রেমিকের মূল্য নিরূপণে—

যে নিজে কোনও দিন প্রেমের আস্বাদ লাভ করেনি সে কি করে প্রেমিকের চিত্তের

অনুপ্রেরণার মূল্য বুঝবে। একজন নৃত্যশিল্পী নৃত্য করে চলেছেন, একজন দর্শক দূর থেকে দেখছেন; যে সঙ্গীতের সুর সঙ্গতের অনুপ্রেরণায় এই নৃত্য চলেছে সে সম্পর্কে যদি দর্শকের কোনও জ্ঞান বা রসবোধ না থাকে তবে তার নিকট এই নৃত্য মনে হবে উন্মাদের অর্থহীন অঙ্গভংগী মাত্র। তেমনই প্রেমিকের দীর্ঘশ্বাস, অশ্রু হা-হুতাশ তার নিকট মনে হবে উন্মাদগ্রস্তের অর্থহীন প্রলাপ মাত্র—যতক্ষণ সে না বুঝতে পারে কোন দেবশিল্পীর অমৃতপম সুরধারার অনুপ্রেরণায় এই প্রেমিকের চিত্ত মন্ত্রমুগ্ধ।

সফল নাট্যকার কবিদের মধ্যে ক্যালডেরন ছিলেন একজন আদর্শ খৃষ্টান। নাট্যসাহিত্যিক শিল্পী হিসাবে তার অমরতার দাবীর ভিত্তিতে অনেকটা অংশ আছে তার ধর্মমূলক নাটকসমূহ যাকে বলা হয় অটো; শব্দটির মূল অর্থ Act সেই হিসাবে প্রথমদিকে সকল প্রকার নাট্য রচনাকেই এই সংজ্ঞা দেওয়া হত। কিন্তু স্পেনীয় নাট্য রচনার স্বর্ণ যুগে শুধু ধর্মাদর্শমূলক নাটকের এই সংজ্ঞা বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হয়। অনেকের নিকট এই শ্রেণীর নাটক বিশেষ আমল পায় না, তাঁরা মনে করেন ক্যালডেরন যে স্পেন দেশের একজন ক্যাথলিক, এই সকল নাটকের মধ্যে আছে শুধু সেই ধর্মনিষ্ঠার পরিচয় মাত্র। কিন্তু বর্তমান যুগের রসগ্রাহী ইংরেজ কবি শেলী একস্থলে বলেছেন, আমি এই সকল দীপ্তিমান অটোর আলোকে এবং সৌরভে স্নিগ্ধস্নাত বোধ করছি।

এই সকল নাটকের কতকগুলিতে আছে প্রতীকের মাধ্যমে ধর্মাদর্শের প্রতিষ্ঠা; বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(1) There is no fortune but God.

(2) The Great Theatre of the World.

এই সকল নাটকের মধ্যে শিল্পাদর্শকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করেও ক্যালডেরন যেন নীতি এবং ধর্মোপদেষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। মানুষের জীবনে প্রলোভন, প্রলোভন জয়ের জন্য জীবন-সংগ্রাম, তার জীবনে পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থার কাহিনী অতি সুনিপুণভাবে চিত্রিত করে তিনি শিল্পীরও মর্যাদা রক্ষা করেছেন।

সেক্সপীয়রের নাটকে আছে—আমাদের এই পৃথিবী একটা রঙ্গমঞ্চ, নরনারী সকলে এই রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা মাত্র। এই কল্পনাকে ক্যালডেরন তাঁর নাটকে The Great Theatre of the World—নূতন ভাবে রূপায়িত করেছেন। সকল মানবের ভাগ্যনিয়ন্তা তার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থেকে বলছেন—

আমি এই নাটকে ব্যবস্থা করেছি যাতে আমার মহিমা প্রকাশিত হতে পারে। আমার এখানে চিরন্তন দিনমান, আমার সিংহাসনে বসে আমি এখান থেকে সব লক্ষ্য করব। তোমরা মর্তভূমির মানব জরা মরণের অধীন, শিশু শয্যার দ্বার দিয়ে তোমাদের পৃথিবীতে প্রবেশ এবং সমাধি মন্দিরের দ্বার দিয়ে তোমাদের পৃথিবী থেকে নির্গমন। যার যার ভূমিকা অভিনয়ে তোমরা প্রস্তুত হও, তোমাদের জীবন দেবতা তোমাদের লক্ষ্য করেছেন।

ইতিমধ্যে একজন এসে অভিযোগ করলে, তার আকাঙ্ক্ষা ছিল সে রাজার ভূমিকা পাবে কিন্তু তাকে দেওয়া হয়েছে ভিক্ষুকের ভূমিকা; তখন তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল যে ভূমিকার নামে কিছু এসে যায় না, কিভাবে সে ভূমিকা অভিনীত সেটাই বিবেচ্য। তার ভূমিকা অভিনয়ে

সে যদি নিষ্ঠার পরিচয় দিতে পারে তবে একজন রাজার চেয়েও তার মর্যাদা বেশি হতে পারে। জীবনের ক্ষেত্রে কি ভূমিকা তাকে দেওয়া হয়েছে তাদ্বারা সে তার ভাগ্য নিয়ন্তার নিকট মর্যাদা বা অমর্যাদার অধিকারী হবে না; কিভাবে সে সেই ভূমিকার মর্যাদা রক্ষা করতে পারে তাই দিয়েই তার মূল্য নির্ধারিত হবে।

অন্যতম নাটক There is no fortune but God. মূলতঃ একই আদর্শের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে, কিন্তু একটু ভিন্নভাবে।

প্রস্তাবনায় আছে, যার উপরে ন্যস্ত আছে ন্যায় বিচার বিতরণের ভার সেই দেবদূত সকল মানবকে জীবনের দায়িত্ব বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে তাদের আহ্বান জানিয়েছেন ভগবানের নিকট থেকে নিজ নিজ ভূমিকা গ্রহণের জন্য—এই ভূমিকার সার্থক অভিনয়ের উপর নির্ভর করবে তারা স্বর্গরাজ্যে স্থান পাবে অথবা স্বর্গ থেকে বিচ্যুত হবে।

আমি বিধান দিচ্ছি এই সকল ভূমিকায় সকলেই পরস্পরকে সমদৃষ্টিতে দেখবে, সার্থক ভাবে অভিনয় করতে পারলে কোনও ভূমিকারই মূল্য কিছুমাত্র কম নয়। জীবনে আনন্দ বা দুঃখ বেদনা যাই আসুক না কেন কখনও নিত্য ভূমিকা ছেড়ে অপরের ভূমিকার জন্য আগ্রহান্বিত হইও না। জন্মের মধ্য দিয়ে তোমাদের সংসারে প্রবেশ, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সংসার থেকে বিদায় গ্রহণ—এ বিষয়ে সকলের ভাগ্যই সমান।

এই আহ্বানবাণী শুনতে পাবার আগেই ঈর্ষা সকলের অন্তরে গিয়ে এই ধারণা অনুপ্রবিষ্ট করে দিয়ে বলে গেল—সকলই নির্ভর করে ভাগ্যদেবীর উপরে; মজুর তার যন্ত্র নিয়ে, সৌন্দর্য প্রতিমা তার দর্পণের সম্মুখে আসীন, তরবারি হস্তে সৈনিক, গ্রন্থ অধ্যয়নে রত শিক্ষার্থী, যষ্টি অবলম্বনে ভিক্ষুক, সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজা সকলেই ঈর্ষার এই মোহময় রাজ্যে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ভাগ্যদেবীর উদ্দেশ্যে অভিষারে বার হয়ে পড়ল। যাত্রাপথে প্রথমেই একটা গাছ থেকে একটা ক্রস্ (খৃষ্ট ধর্মের প্রতীক) তাদের সামনে এসে পড়ল। তারা এর অর্থ বা অভিপ্রায় বুঝতে না পারলে ন্যায় দেবতা বললেন—যার খুশী এটা গ্রহণ করতে পার, কারও উপরে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হবে না। যে স্বেচ্ছায় এটা গ্রহণ করবে তার পক্ষে এটা আশীর্বাদস্বরূপ হবে; শ্রমের কাজকে মধুময় করে তুলবে। দারিদ্র্যকে মর্যাদা দান করবে, অধ্যয়নকে পবিত্র করে তুলবে, সৌন্দর্যকে ক্ষয় থেকে রক্ষা করবে, রাজঐশ্বর্যকে লাবণ্যমণ্ডিত করবে এবং মহিমান্বিত করে তুলবে। কিন্তু কেউ সেই 'ক্রস' গ্রহণ করবার জন্য আগ্রহ-বোধ করল না। সৌন্দর্য প্রতিমা বললে যখন তার বৃদ্ধ বয়স আসবে তখন 'ক্রস' গ্রহণ করবার জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে; রাজা বললে, এখন তার কর্মব্যস্ততা এবং সম্ভোগের সময়, এখন ক্রশ গ্রহণ করবার অবসর কোথায়; সৈনিক এবং শিক্ষার্থীও সেই রকম সব মন্তব্য প্রকাশ করল। শ্রমিক ও দরিদ্রজনেরাও দেবতার আশীর্বাদের জন্য আগ্রহ প্রকাশ না করে নিজ নিজ দুরদৃষ্টের জন্য নিয়তির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রকাশ করতে লাগল।

পরবর্তী দৃশ্যে দেখা গেল সকলেই সৌন্দর্য প্রতিমার প্রীতিসম্পাদনে ব্যস্ত, রাজা তার নিকটে গিয়ে তার প্রীতিসাধন করছেন, শ্রমিক ফুল ফল আহরণ করে এনে দিচ্ছে তারই জন্য, সৈনিক যুদ্ধে আহৃত সকল সম্পদ এনে তাকেই উপহার দিচ্ছে, শিক্ষার্থীও তার স্তুতিতে প্রবৃত্ত।

হঠাৎ তাদের সকলের সম্মুখে ধরণীতল দ্বিধাবিভক্ত হয়ে সৌন্দর্য প্রতিমাকে গ্রাস করে ফেলল এবং সেখান থেকে উদ্ভূত হয়ে এল এক বীভৎস কঙ্কাল মূর্তি, তার এক হাতে রাজদণ্ড অপর হাতে সৈনিকের প্রতীক দণ্ড। এই দেখে সকলের দৃষ্টি থেকে মায়া অপসারিত হয়ে গেল। রাজা তার অবিবেচনা প্রসূত কর্মফল দেখতে পেয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন, তখন তিনি স্বেচ্ছায় শ্রমিক বা ভিক্ষুকের সহিত তার ভাগ্য পরিবর্তনে আগ্রহান্বিত, যাতে চরম বিচার সভায় তার অপরাধের ভার লাঘব হতে পারে ; কিন্তু তারা সম্মত হল না, কারণ তাদের সম্পদও যেমন সামান্য সেই অনুপাতে তাদের পাপের ভারও হবে অপেক্ষাকৃত লঘু, তারা রাজার গুরুতর পাপের গুরুতর শাস্তির দায়িত্ব নিতে যাবে কেন। তখন সকলে বুঝতে পারল যে সেই ক্রস্-ই সকলের জীবনের পরম আশ্রয় এবং তাদের জীবনের নিয়তি বিধানের বেলায়ও একমাত্র ভগবানই আশ্রয় স্থল, ভাগ্যদেবী নয়।

যেমন সকল দেশে তেমনই স্পেন দেশেরও ট্রাজেডি নাটকের মূল ভিত্তি মানব চিত্তের প্রেমের ভাবাবেগ। এই ক্ষেত্রেও ক্যালডেরনের শিল্প নিপুণতা, ভাবাদর্শ কত উন্নত এবং কত সার্থক ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় তার একখানা বিশিষ্ট নাট্য রচনায়—The Painter of his own Dishonour. নাটকের নায়িকা সেরাফিনা। সে ছিল অ্যাল্‌ভারোর নিকট বাগদত্তা, কিন্তু জাহাজ ডুবিতে তার মৃত্যু ঘটেছে এই সংবাদের ভিত্তিতে সেরাফিনা আবার অপর একজনকে বিয়ে করে। ঘটনার পরিণতিতে দেখা গেল যে অ্যালভারোর মৃত্যু ঘটেনি। সেরাফিনা সম্পর্কে নিয়তির বিধানকে অস্বীকার করে অ্যালভারো সেরাফিনার স্বামীর অনুপস্থিতিতে সেরাফিনার নিকটে গিয়ে প্রেম নিবেদন করে—যে সেরাফিনা তখন অপরের পত্নী।

সেরাফিনা তাকে বললে—তুমি এখনই চলে যাও এখান থেকে, যাতে আমি আশ্বস্ত হতে পারি—তুমিও বুঝতে পেরেছ যে, কালের ব্যাবধানে স্ত্রী হিসাবে আমার কর্ত্যব, পতি-পত্নী হিসাবে আমাদের পরস্পরের ভালবাসা আমাকে আমূল পরিবর্তিত করেছে। ঝড় ঝঞ্ঝা বা সাগর তরঙ্গের বিক্ষোভ যদি বা ওক বৃক্ষ বা তার প্রতিষ্ঠা ভূমি পর্বতকেও উন্মিলিত করতে পারে তথাপি তোমার দীর্ঘশ্বাস বা অশ্রুর সঙ্গে যদি সম্মিলিত হয় আকাশ ও সাগরের সকল শক্তি তারা আমায় বিক্ষুব্ধ করতে পারবে না।

অ্যালভারো—কিন্তু আমার স্মৃতিতে আছে এমন কালের কথা যখন আকাশের সাগরের পঙক্তিকে পরাভূত করবার জন্য সেরাফিনাকে কঠোর ওক বৃক্ষের ভূমিকায় দেখা যেত না, সে ছিল প্রেমের প্রথম আলোকে উন্মিলিত একটি সুন্দর পুষ্প এবং প্রেমের পথেই ছিল তার জীবন যাত্রার সম্ভাবনা, সে তো হৃদয়হীনা বন্ধ্যা পর্বত মাত্র ছিল না, সে ছিল যেন একটি সুন্দর মন্দির—যে মন্দিরের বিগ্রহ ছিল প্রেম এবং যেখানে নিশিদিন অর্ঘ অর্পিত হত একটি মানুষের পরিপূর্ণ হৃদয়।

সেরাফিনা—আমি তা অস্বীকার করি না। কিন্তু তোমার কল্পিত উপমা অনুসরণ করেই বলছি—সেই ফুল গাছকে স্থানান্তরিত করে অন্য দেশে ভিন্ন পরিবেশে নিয়ে প্রোথিত করলে সেখানেই সে স্থায়ী প্রতিষ্ঠাভূমি লাভ করবে—যেখানে থেকে তাকে আর বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হবে না। সেই মন্দিরেও অবিবেচনা প্রসূত সেই পুরাতন বিগ্রহকে স্থানান্তরিত করে সেখানে যদি প্রকৃত দেবতার মূর্তির প্রতিষ্ঠা করা যায় তবে সেই মন্দিরও নূতন বিগ্রহের পূজায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে যুগ যুগ ধরে

চিরস্থায়ী হয়ে থাকতে পারে।

তার দেশে এবং যে যুগের জনগণের রুচিতে প্রেমের কাহিনী এবং কান্তকবির রচনা খুবই জনপ্রিয় ছিল, কিন্তু ক্যালডেরনের প্রতিভা তাতেই নিঃশেষিত হয়ে যায় নি; তার যেমন ছিল কল্পনার প্রসার তেমনই ছিল ভাব গরিমার উৎকর্ষ। তার একখানা নাটকে The Wonder Working Magician তিনি শয়তানের যে চিত্র অঙ্কিত করেছেন তাতে স্বভাবতই মিল্টনের প্যারাডাইজ লস্ট কাব্যের 'শয়তানের' পরিকল্পনার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। শয়তান নাটকের নায়ককে স্বধর্ম ত্যাগের জন্য প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করতে গেলে নাটক তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। তখন শয়তান তার পরিচয় দিতে গিয়ে বলে—

আমার অন্তরে আছে এক সুখ সৌভাগ্যের জগৎ আবার আছে এক দুঃখ বেদনার জগৎ। স্বর্গরাজ্যে আমার বংশ-গরিমা ছিল গৌরবময়, আমার-বীরত্ব ছিল অসাধারণ, আমার প্রতিভা ছিল এমনই প্রখর যে এক দৃষ্টিপাতে সমস্ত জগৎ আমার নিকট উদ্‌ঘাটিত হত। এই সব বিবেচনায় যিনি সেখানে পরম দেবতা বলে গণ্য ছিলেন তিনি আমাকে তার উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োজিত করেছিলেন। কিন্তু এই পরম দেবতাকে সকলে এমন উচ্চ প্রশংসায় স্তুতি করত যে আমি তাতে বিদ্বিষ্ট এবং ঈর্ষান্বিত হয়ে তার প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হলাম—তারই সিংহাসনে বসে তারই অনুসরণে তার অনুগত সকল সামন্তদের সিংহাসনে পদ স্থাপনা হল আমার সঙ্কল্প। ফলে আমি তিরস্কৃত এবং ধিকৃত হলাম—এখন বুঝতে পারছি অসম উচ্চাকাঙ্ক্ষার পতন কত গভীর হতে পারে তারই ফল ভোগ করছি আমি। কিন্তু অনুশোচনা আমার ধাতে নেই সেজন্য তার সৃষ্ট জগতের ধ্বংস সাধনই এখন আমার একমাত্র পরিকল্পনা তথাপি তার নিকট নতি স্বীকার নয়।

ক্যালডেরনের জীবিতকাল বা পরমায়ুও ছিল লক্ষ্যণীয়। তিনি ষাট বৎসরকাল ধরে সাহিত্য রচনা করেছিলেন। তার মৃত্যু হয় সাতাশি বৎসর বয়সে; সুতরাং তখন তার দেশের গরিমাময় যুগের অবসানে পতনের যুগও আরম্ভ হয়েছে। দেশের পক্ষে এবং তার জীবনের পক্ষে সেই প্রদোষকালেও যেন তার সংগীতের বিরাম ছিল না। কিন্তু তখন নাইটিঙ্গেলের করুণ সুরের পরিবর্তে এসে গিয়েছিল যেন লার্ক পাখীর আলোর জগতের উদাত্ত সুর। ক্রমশ তার জীবন থেকে যেন পৃথিবী সরে গেল এবং তিনি গিয়ে স্থান লাভ করলেন অমর লোকের গায়কদের দলে।

রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনস্টাইন, বন্ধুত্ব-ইতিহ

অশ্রুকুমার সিকদার

ব্রিজেস—রোটেনস্টাইন—রবীন্দ্রনাথ সংবাদ

রাজকবি রবার্ট ব্রিজেস যখন 'The Spirit of Man' সঙ্কলনের কাজে নিযুক্ত তখন তিনি রোটেনস্টাইনকে বলেন রবীন্দ্রনাথকৃত কবীরের দোহার কয়েকটি তর্জমা এবং রবীন্দ্রনাথের 'Gitanjali'-র দুই-একটি কবিতা তিনি অন্তর্ভুক্ত করবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গুলি সম্বন্ধে he (অর্থাৎ ব্রিজেস) believed he could improve.' ব্রিজেস যে পরিবর্তনগুলি প্রস্তাব করেন সেগুলি রোটেনস্টাইনের কাছে এতই তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয় যে, আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি লিখেছেন, তিনি ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এই পরিবর্তনগুলি মেনে নেবেন।

কিন্তু ব্যাপারটি এতো সরলভাবে মিটে গেল না। ব্রিজেসের প্রস্তাব পেয়ে রবীন্দ্রনাথ রোটেনস্টাইনকে শান্তিনিকেতন থেকে ৪ঠা এপ্রিল ১৯১৫ তারিখে যে চিঠি লেখেন সেটি রোটেনস্টাইন আত্মচরিতের দ্বিতীয় খণ্ডে উদ্ধৃত করেছেন।

I got a lettr from Dr. Bridges with his own version of a Gitanjali poem. I cannot judge it. But since I have got my fame as an English writer I feel extreme reluctance in accepting alterations in my English poems by any of your writers. I must not give any reasonable ground for accusing me,—which they do,—of reaping advantage of other men's genius and skill. There are people who suspect that I owe in a large measure to Andrew's help for my literary success, which is so false that I can afford to laugh at it. (১) But it is different about Yeats. I think Yeats was sparing in his suggestion—moreover, I was with him during the revisions. But one is apt to delude himself, and it is very easy for me to gradually forget the share Yeats had in making my things passable. Though you have the first draft of my translation with you I have unfortunately allowed the revised typed pages to get lost in which Yeats pencilled his corrections. Of course, at that time I never could imagine that anything that I could write would find its place in your literature. But the situation is changed now. And if it be true that Yeats' touches have made it possible for Gitanjali to occupy the place it does then that must be confessed. At last but my subsequent unadulterated writings my true level should be found out and the faintest speak of lie should be wiped out from the fame I enjoy now. It does not matter what the people think

of me but it does matter all the world to me to be true to myself. This is the reason why I cannot accept any help from Bridges excepting where the grammar is wrong or wrong words have been used.

পুনশ্চে আরো লিখেছেন—

Andrews does not admire the alterations made by Bridges but that does not affect me. In fact I am not so much anxious about mutilations as about added beauties which I cannot claim as mine.

তিনি এখন খ্যাতনামা কবি, তাঁর লেখায় কেউ যেন হাত দেবার স্পর্ধা না করে, এই অহমিকা চিঠিতে প্রকাশ পায় নি, যদিও সেই অহঙ্কার অখ্যাত কবিরও স্বভাবত থাকে। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অনেক বিনীত—অন্যের সাহায্যে তিনি তাঁর রচনাকে 'added beauty'-তে ভূষিত করতে চান না, তাঁর ক্ষমতার সত্যসীমা সকলেই জানুক এই তাঁর অভিপ্রায়। সুতরাং ব্রিজেস-কৃত পরিবর্তন ভালো কি মন্দ সে প্রশ্ন তাঁর কাছে অবান্তর। পূর্বে যিনি রীস ইয়েটস বা স্টার্জ মূরের কাছ থেকে সাহায্য নিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি (রোটেনস্টাইনকে লেখা ১২ই আগস্ট ১৯১৩ তারিখের চিঠি দ্রষ্টব্য) তাঁর মনোভাব পরিবর্তনের হেতু অন্য।

এই সময় জটিলতার জট ছাড়াতে অবতীর্ণ হলেন ইয়েটস্। তিনি ১৯১৫-র জুলাই মাসের কোনো তারিখে তিনি ব্রিজেসকে যে চিঠি লেখেন তার পুনশ্চে লিখলেন—

I have hard from Binyon a week ago that Rothenstein had told him of the difficulty with Tagore about your book. (২) is the mischief maker. I have written Rothenstine an urgent letter and suggested his sending it to Tagore but have not heard from Rothenstein.

১লা আগস্ট ১৯১৫-র ইয়েটস ব্রিজেসকে আবার লিখলেন—

I have written to Tagore; I wrote a couple of days ago and hope we have prevailed.

ইতিমধ্যে ব্রিজেসের কাছ থেকে চিঠি পেয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রকারান্তরে অসম্মতি জানিয়ে তাঁকে উত্তর দিলেন এবং ব্রিজেসকে লেখা চিঠির শেষ অনুচ্ছেদ রবীন্দ্রনাথ রোটেনস্টাইনকে লেখা ২০শে আগস্ট ১৯১৫ তারিখের চিঠিতে উদ্ধৃত করে দিলেন। উদ্ধৃত অনুচ্ছেদটি এই—

I got Dr. Bridges' letter last week and following is the extract of the concluding portion of my reply to it—

"I think there is a stage is all writings where they must have a finality inspite of their short comings. Authors have their limitations and we have to put up with them if they give us something positively good. If we begin to think of improvement there is no end to it and differences of opinion are sure to arise. Please do not think I have the least conceit about my English. Being not

born to it I have no standard of judgement in my mind about this language—at least, I cannot consciously use it. Therefore I am all the more helpless in deciding whether certain alterations add to the value of a poem with which my readers' mind have already become familiar. I know, habit gives a poem its true living character, making it seem inevitable like a flower or a fruit. Flaws are there but life makes up for all its flaws."

তারপর প্রায় উত্যক্ত হয়ে তিনি রোটেনস্টাইকে প্রশ্ন করেছেন—

Why does't Dr. Bridges try to translate some of my poems directly from the original with the help of his Bengali friends in Oxford ?

এই সমস্ত প্রসঙ্গে ব্রিজেস নিজে রোটেনস্টাইনকে যে চিঠি লিখেছিলেন সেটি রোটেনস্টাইন আত্মজীবনের দ্বিতীয় খণ্ডে উদ্ধৃত করেছেন। প্রায় ক্লান্ত ব্রিজেস লিখেছিলেন—

I feel sorry now that I indulgaed in a notion of dealing with Tagore's poems ; but when you were here, your liking for the version that I had sent him of the one that I had ventured to alter must have overset my judgment. I see now that I would do nothing with them without his consent and approval, and I had sent him the one that I worked on, in order that he might tell me what he would wish. I certainly could not bring myself to altering anything that he had written, and then allowing it to be published without his approval.

শেষ পর্যন্ত রোটেনস্টাইন ও ইয়েটসের হস্তক্ষেপে এই সমস্যার সমাধান হয়েছিল। 'The Sprit of Man' সংকলনে 'Gitanjali' কবিতাবলীর তিনটি এবং 'One Hundred Poems of Kabir'—এর নয়টি গৃহীত হয়েছিল। 'Gitanali'-র ৯২ সংখ্যক কবিতার শেষ স্তবক অবিকৃতভাবে সংকলনে ২৮২ নং কবিতারূপে গৃহীত হয়েছে। ৩১ নং কবিতার শেষ দুই স্তবক ব্রিজেসের সংকলনে ২৮৪ কবিতা—উদ্ধৃতিচিহ্ন বর্জন, একটি কমা যোগ ও একটি কমা বর্জন ছাড়া অপরিবর্তিত। কিন্তু 'Gitanjali-র' ৬৭ নং কবিতা ব্রিজেসের হাতে বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হয়ে সংকলনের ৩৮ নং কবিতা হয়েছে। পরিবর্তনগুলি এখানে মূলের পাশাপাশি সাজানো হয়েছে।

মূল—Thou art the sky and thou art the nest as well.

ব্রিজেস—Thou art the sky and Thou art also the nest.

মূল—O thou beautiful, there in the nest it is thy love that encloses the soul with colours and sounds and odours.

ব্রিজেস—O Thou Beautiful ! how in the nest thy love embraceth the soul with sweet sounds and colours and fragrant odours.

মূল—There comes the morning with the golden basket in her right hand bearing the wreath of beauty, silently to crown the earth.

ব্রিজেস—Morning cometh there, bearing in her golden basket the wreath of beauty, silently to crown the earth.

মূল—And there comes the evening over the lonely meadows deserted by herds, through trackless paths. carrying cool draughts of peace in her golden pitcher from the western ocean of rest.

ব্রিজেস—And there cometh Evening, o'er lonely meadows deserted of the herds, by trackless ways, carrying in her golden pitcher cool draughts of peace from the ocean calms of the west.

মূল—But there, where spreads the infinite sky for the soul to take her flights in, reigns the stainless white radiance. There is no day nor night. nor form nor colour, and never, never a word.

ব্রিজেস—But where thine infinite sky spreadeth for the soul to take her flight, a stainless white radiance reigneth ; wherein is neither day nor night, nor form, nor colour, nor over any word.

রবীন্দ্রনাথের কবিতার এই রূপান্তর সম্বন্ধে ব্রিজেস 'The Spirit of Man'-এর টীকায় মন্তব্য করেছেন—

I have to thank him and his English publisher for allowing me to quote from this book, and in the particular instance of this very beautiful poem, for the author's friendliness in permitting me to shift a few words for the sake of what I considered more effective rhythm and grammar.

রবীন্দ্রনাথের কৃত কবীরের দোহার তর্জমাতেও ব্রিজেস হস্তক্ষেপ করেছিলেন, কিন্তু সেখানে পরিবর্তনের কারণ শুধু ব্যাকরণ বা ছন্দস্পন্দনগত নয়, সেখানে কারণ অনুবাদকে আরো বেশি মূলানুগ করার প্রয়াস ; রবীন্দ্রনাথের তর্জমা যেহেতু—

really based not on the Hindi text but upon the Bengali translation, which is far from accurate. (৩)

এইভাবে রবীন্দ্রনাথ—ব্রিজেস সমস্যা ইয়েটস্ রোটেনস্টাইনের হস্তক্ষেপে সুষ্ঠু সমাধান লাভ করেছিল। (৪)

গীতাঞ্জলির অনুবাদক কে ?

এজরা পাউণ্ড এলিয়টের 'The Waste Land'-কে গুরুতরভাবে ছাঁটকাট করেছিলেন—পাণ্ডুলিপিতে কবিতাটির যে দৈর্ঘ্য ছিল কেটে তার একতৃতীয়াংশ করেছিলেন। কিন্তু এজন্য কেউ এলিয়টকে প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করেনি, বা এলিয়ট যে পরস্বাপহরণ করছেন এমন অভিযোগ কেউ করেনি। 'Gitanjali'-র পাণ্ডুলিপিতে ইয়েটস্-এর হস্তক্ষেপ পরিমাণগতভাবে সামান্য

হলেও রবীন্দ্রনাথ পরের ধনে ধনী এই অভিযোগ প্রায় তৎক্ষণাৎ উঠেছিল এবং এখনো থামেনি। (৫) নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির অব্যবহিত পরে লেখা (সংরক্ষিত পত্রটি খণ্ডিত বলে তারিখ নেই, সম্ভবত ১৯১৪-১৫ সালে লেখা) একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ রোটেনস্টাইনকে জানাচ্ছেন—

It will amuse you to learn that at a semi-public conference of the Mohamedan leaders of Bengal Valentine Chirol (৬) gave his audience to understand that the English Gitanjali was practically written by Yeats. Naturally, such rumours get easy credence among our people who can believe in all kjnds of miracles except genuine worth in their own men. It is annoyingly insulting for me to be constantly suspected of being capable of enjoying a reputation by fraud and it makes me wish that the chance had never been given to me to come out of the quiet corner of my obscurity.

এই বিষয়ে তর্কবিতর্ক যে আবহাওয়া কলুষিত করে তুলেছিল তা বোঝা যায় যখন দেখি রোটেনস্টাইন 'Men add Memories'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছেন—

I knew that it was said in India that the success of Gitanjali was largely owing to Yeats re-writing of Tagore's English. That this is false can easily be proved, The original Mss of Gitanjali in English and in Bengali is in my possession. Yeats did here and there suggest slight changes but the main text was printed as it came from Tagore's hands. (৭)

রবীন্দ্রনাথ নিজেও অবশ্য ইয়েটসের সহায়তার পরিমাণ সম্বন্ধে নানা জায়গায় নানা কথা বলেছেন। ইয়েটস্ নিজেই নাকি প্রথমে বলেছিলেন (রবীন্দ্রনাথের চিঠি, রবীন্দ্রজীবনী হতে উদ্ধৃত)—

এই অনুবাদের কোনো কথা বদল করিয়া তুলিতে পারা যায়, যদি কেহ এমন কথা বলে তবে সে সাহিত্য কী তাহা জানে না। ইতিপূর্বে উদ্ধৃত একটি চিঠিতে তিনি রোটেনস্টাইনকে লিখছেন 'Yeats was sparing in his suggestion,' তাছাড়া সংস্কারকালে তিনি ইয়েটসের হাতের কাছে ছিলেন ; অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেছেন—

But one is apt to delude himself, and it is very easy for me to gradually forget the share Yeats had in making my things passable.

অনেক পরে তিনি ইয়েটসের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লিখেছিলেন (হোন কৃত ইয়েটস্ জীবনীতে উদ্ধৃত) 'greater mastery of the English language'-এর জন্য তিনি ঋণী 'intimate instruction in a quiet little room off Euston Road' এর কাছে রোটেন্স্টাইনের লেখা (২৬ নবেম্বর ১৯৩২) চিঠিতে গীতাঞ্জলির দিনগুলির স্মৃতিরোমন্থন করতে যেয়ে কৃতজ্ঞতাবোধে অভিভূত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ—

Then came those delightful days when I worked with Yeats and I am sure

the magic of his pen helped my English to attain some quality of permanence... please thank Yeats once again on my behalf for the help which he rendered to my poems in their perilous adventure of a foreign reincarnation and assure him that I at least never underrate the value of his literary comradeship. (৮)

ইংরেজি ভাষা সম্বন্ধে নিজের ক্ষমতার সীমা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ চিরকাল সচেতন ছিলেন। Gitanjali'-র সাফল্য সত্ত্বেও কখনো তিনি ইংরেজি ভাষা সম্বন্ধে দক্ষতা অর্জন করেছেন এমন দাবী ভুলেও করেন নি। যে চিঠিতে মুসলমান নেতাদের সম্মেলনে 'Gitanjali' ইয়েটসেরই লেখা এই অপবাদের কথা উল্লেখ করেছেন সেই চিঠিতেই তিনি রোটেনস্টাইনকে লিখেছেন—

I know I am apt to make a mess of your prepositions and in my blissful ignorance I go on dropping your articles in wrong places or dropping them out altogether. Than I do not know set phrases which greatly economise trouble in sentence making and very often I do not know how to write simple matter of fact things in English. No wonder people can hardly believe that I had any hand in translating the poems of Gitanjali.

ম্যাকমিলান কর্তৃপক্ষ যখন গল্পের অনুবাদের জন্য তাড়া দিচ্ছেন তখনো তিনি দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে রোটেনস্টাইনকে লিখেছেন (৩১শে ডিসেম্বর ১৯১৫)—

I do not have sufficient command of English to venture to do it.

অন্যের সাহায্যপ্রাপ্ত সৌন্দর্যে নিজের রচনাকে ভূষিত করতে চান না বলে, পরস্বাপহারীর অপবাদ দ্বিতীয়বার শুনতে চান না বলে, তিনি 'Gitanjali'-র পর কারো সাহায্য সহজে নিতে চাইলেন না, অথচ ইংরেজি ভাষায় নিজের দক্ষতা সম্বন্ধেও তিনি আত্মপ্রত্যয়ী নন—এ অবস্থায়, প্রশ্ন ওঠে, কেন তিনি বারংবার নিজের রচনার অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন। 'Gitanjali'র সমতুল্য প্রশস্তি তাঁর অপর কোনো অনুবাদ গ্রন্থে পেলো না, তার অনেক কারণ বর্তমান যদিও, কিন্তু একটি কারণ এই যে 'Gitanjali' রচনাকালে পশ্চিমে অজ্ঞাত পরিচয় রবীন্দ্রনাথ অন্যদের সাহায্য নিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি, অপরপক্ষে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত রবীন্দ্রনাথ পূর্বোক্ত কারণসমূহের ফলে সেই সাহায্য নিতে পরবর্তীকালে অনিচ্ছুক। এণ্ড্রুজ তাঁকে ছোট গল্পের তর্জমা করতে বলছেন এই খবর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ রোটেনস্টাইনকে যে চিঠি লেখেন (১৫ই জুন, ১৯১৪) তা থেকেই বোঝা যায় ইংরেজি ভাষায় ক্রমাগত লেখা সম্বন্ধে তিনি কত দ্বিধাগ্রস্ত—

...after all I am an interloper whose intrusions into your literature must not be too often, and in my unseemly greed I should not let your warm welcome of guest degenerate into sullen tolerance or what is worse into angry hospitality.

এই দ্বিধা সত্ত্বেও কেন তিনি বার বার স্বীয় রচনার ইংরেজি তর্জমা করেছেন তার কারণ সাহিত্যিক নয়। তিনি লিখেছেন (রোটেনস্টাইনকে লেখা চিঠি, ২৬শে নবেম্বর ১৯৩২) শিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য নয়, তাঁর ধ্যানধারণা ও দর্শনোপলব্ধিকে পশ্চিমে প্রচারের জন্যই

তাঁর এই প্রয়াস—

Latterly I have written and published both prose and poetry in English, mostly translations, unaided by any friendly help, but this again I have done in order to express my ideas, not for gaining any reputation for my mastery in the use of a language which can never be mine. (৯)

উদ্দেশ্য তাঁর যাই হোক, যে কারণেই তিনি নিজেকে এই কাজে নিযুক্ত করুন না কেন, ইংরেজিতে ভাষান্তরিত তাঁর রচনাকে স্বভাবতই সাহিত্যের মানদণ্ডে বিচার করা হলো এবং ইংরেজ পাঠকবর্গ, এমন কি সহানুভূতিশীল পাঠকবর্গও, হতাশ হলেন। রোটেনষ্টাইন 'Since Fifty'-তে লিখেছেন—

Tagore continued to pour out poems, translations of which he sent me from time to time, also poems he wrote English. Yeats and sturge Moore were critical of these…He (অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ) had been some what rash in allowing translations to be published with none of the fire, of the delicate rhythm, which we weve, told marks him as the true poet in his own language.

রবীন্দ্রনাথ তত্ত্ব এবং জীবনদর্শন প্রচারের জন্য তর্জমার কাজে নিযুক্ত হলেন, অথচ তাঁর কবিতার প্রেমিকরা তাঁকে কবি হিসাবেই পেতে চেয়েছিলেন। অনুবাদের অপকর্ষতায়, নির্বিচার অনুবাদে তাঁদের অনেকের অনুরাগ বিরাগে পরিণত হতে চললো। তাঁর কবিতাকে যিনি সব চেয়ে তন্ময়ভাবে বুঝতে চেয়েছিলেন সেই এজরা পাউণ্ড-ও হ্যারিয়েট মনরোতে লিখলেন (২২শে এপ্রিল ১৯১৩)—(১০)

…it will be difficult for his dependers in London if he takes to printing any thing except his best work. As a religious teacher he is superfluous, wive got Lao Tse…So long as he sticks to poetry he can be depended on stylistic grounds aganist those who disagree with his content. And there's no use his repeating the vedas and other sfuff that has been translated. In his original Bengali he has the novelty of rime and rhythm and of expression, but in a prose translation it is jnst 'more theosophy'. Of course if he want to set a lower level than that which I am trying to set in my translations from Kabir, I cannot help it. It's his own affair.

অবশ্য রোটেনস্টাইন দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। তাঁর সাহিত্যবোধের উপর রবীন্দ্রনাথের অটুট আস্থা ছিল এবং তিনি রোটেনস্টাইনকে রচনার প্রতিলিপি পাঠাতেন তাঁর অপক্ষপাত বিচারের জন্য। কিন্তু রোটেস্টাইন সম্ভবত সংকোচবশে তাঁর মনোগত সন্দেহ প্রকাশ করেন নি। হোন রচিত জীবনী পাঠে জানা যায় অধ্যাপক অবিনাশচন্দ্র বসুর সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে ইয়েটস্ বলেছিলেন—

Indians should write in Urdu or in Bengali…Let Tagore cast off English.(১১)

নিজের কবিতার অনুবাদের দায়িত্ব কবির নয় একথা রবীন্দ্রনাথেরও মনে হয়েছিল। যিনি কবিসার্বভৌম হিসাবে দেশবাসীর হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত তাঁর পক্ষে অনুবাদকর্মের মধ্য দিয়ে বিদেশের অনুগ্রহ যাচ্ঞার মধ্যে একটি আত্ম-অবমাননা আছে একথাও রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল। ১৯৩১-র ২৬ নবেম্বরের চিঠিটির অন্য অংশ রবীন্দ্রনাথ তাই রোটেনস্টাইনকে লিখেছেন,

But yet sometimes I feel ashamed that I whose undoubted claim has been recognised by my countrymen to a sovereignity to our own world of letters shonld not have waited till it was discovered by the out side world in its own true majesty and environment, that I should ever go out of my way to court the attention of others having their own language for their enjoyment and use. At least it is never the function of a poet to personally help in the transportation of his poems to an alien form and atmosphere, and be responsible for any unseemly risk that may happen to them,

কবির যা করণীয় নয় তাই যে তিনি করেছেন তার জন্য তিনি দায়ী করেছেন রোটেনস্টাইনের আগ্রহাতিশয্যকে। যে অনুবাদগুলি অবসরবিনোদনের জন্য খেয়াল-খুশিতে করা, জনসমক্ষে প্রদর্শনের জন্য রচিত হয় নি, বন্ধুদের তাড়নায়, প্রকাশিত হয়ে কবিকে এনে দিল বিপুল খ্যাতি। এক দিকে সেই খ্যাতির প্রবর্তনা, অন্য দিকে যুদ্ধ ক্লান্ত পাশ্চাত্য তাঁর মধ্যে যে প্রবক্তাকে আবিষ্কার করেছিল সেই প্রবক্তার ধ্যানধারণা দর্শন-উপলব্ধিকে প্রকাশের প্রয়োজনে তিনি নিজের রচনা নিজেই ক্রমাগত ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করে গিয়েছেন।

(১) "অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে Andrews অনুবাদ করে দিয়েছেন। বেচারা Andrews সে-কথা শুনে ভারি লজ্জা পেতেন।"—মংপুতে রবীন্দ্রনাথ।

(২) Wade-সম্পাদিত ইয়েটসের পত্রসংগ্রহে 'mischief maker'-এর নাম ড্যাসের অন্তরালে গোপন করা হয়েছে। কৌতূহলবৃত্তি তাই সম্ভাব্য নাম অনুমান করে।

(৩) রবীন্দ্র জীবনী ২-এর পৃষ্ঠার পদটীকা দ্রষ্টব্য।

(৪) ব্রিজেস হপকিন্সেরও কবিতার শব্দ পরিবর্তন করে 'The Sprit of Man'-এ গ্রহণ করেছিলেন; অবশ্য তখনো হপকিন্স মুদ্রণসৌভাগ্য লাভ করেন নি এবং অখ্যাত।

(৫) পাউণ্ডের হস্তক্ষেপ-চিহ্নিত 'The Waste Land'-এর পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেছে, ইয়েটসের হাতের পেনসিলে-করা শোধন-চিহ্নিত 'Gitanjali'-র পাণ্ডুলিপিও হারিয়ে গেছে। (রোটেনস্টাইনকে লেখা ৪ঠা এপ্রিল ১৯১৫-র পূর্বোদ্ধৃত চিঠিটি দ্রষ্টব্য)।

(৬) 'Indian Unrest' গ্রন্থ প্রণেতা।

(৭) সেই পাণ্ডুলিপি এখন হুটন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত। রবীন্দ্রনাথ রোটেনস্টাইনকে শোকে সান্ত্বনা দিয়ে ১৬ই জুলাই ১৯১২ তারিখে যে চিঠি লেখেন তার সঙ্গে এই কবিতাটী পাঠান—In desparate hope I go and search her in all corners of my room; I find her not.

My house is small and what once is lost from there can never be regained. But infinite is they mansion, my lord, and seeking her I have come to thy door. I stand under the golden canopy of thine evening sky and I lift my eager eyes to thy face. I have come to brink of eternity from which nothing can vanish—no hope, no happiness, no vision of a face seen through tears. Oh, dip my emptied life into that ocean, plung it into the deepest fulness. Let me for once feel that lost sweet touch in the allness of thine universe. অনুমান করি সদ্য অনুবাদ করেই রবীন্দ্রনাথ এটি পাঠিয়েছিলেন। কিঞ্চিৎমাত্র পরিবর্তিত হয়ে এটি 'Gitajali'-র LXXXVII সংখ্যক কবিতা হয়েছে। পরিবর্তনের পরিমাণ এই—দ্বিতীয় রূপে দুইটি 'the' যুক্ত হয়েছে, 'search her' হয়েছে 'search for her', 'is lost from there' হয়েছে 'has gone from it', 'allness of thine universe' হয়েছে 'allness of the universe' এবং 'fulness' বানান 'fullness' হয়েছে। ইয়েটসের পরামর্শে এই পরিবর্তন হয়ে থাকলে বোঝা যায় সেই পরিবর্তনের পরিমাণ কত সামান্য।

(৮) রোটেনস্টাইনকে লেখা ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯১৩ তারিখের চিঠি থেকে একটি কৌতূহলপ্রদ তথ্য জানা যায়—"Mr. Yeats is not satisfied with some of the corrections that have been made without his knowledge. I have promised him to submit to him the proofs of the second edition of Gitanjali, for him to make necessary restration. Will you ask MacMillans to arrange it ?"

(৯) রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী অনুবাদের দুর্বলতা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রসঙ্গে রোটেনস্টাইনও আত্মজীবনীয় তৃতীয় খণ্ড Since Fifty-তে লিখেছেন—A poet must write in his own language. The meaning of words in an aline tongne eludes him ··"

(১০) Paige সম্পাদিত The Letters of Ezra Pound 1907—1941 দ্রষ্টব্য।

(১১) অবিনাশচন্দ্র বসুর লেখা বিবরণ একটু আলাদা। ১৯৩৫ সালের সম্ভবত মে মাসে Riversdale থেকে ইয়েটস রোটেনস্টাইনকে যে চিঠি লিখেছিলেন সেটি সম্পূর্ণ Wade সম্পাদিত ইয়েটসের পত্রাবলী সংগ্রহ থেকে এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করছি। "My dear Rothenstein, Damn Tagore. We got out three good books, Sturge Moore and I, and then, because he thought it more important to see (?) and know English than to be a great poet, he brought out sentimental rubbish and wrecked his reputation. Tagore does not know English, no Indian knows English. Nobody can write with music and style in a language not learned in childhood and ever since the language of his thought. I shall return to the question of Tagore but not yet—I shall return to it because he has published, in recent (years) and in English, prose books of great beauty, and these books have been ignored because of the eclipse of his reputation as a poet. Yours W. B. Yeats." অন্যত্র ইয়েটস লিখেছেন শ্রীঅরবিন্দ এক ডজন কবিতায় এবং তরু দত্ত তাঁর চিঠিতে 'have ever written well in English.' আর একজন ভারতীয় কবির রচনার কবিকৃত তর্জমা রোটেনস্টাইন ইয়েটসকে পাঠালে তিনি জবাবে লেখেন—'Tell him to go back to India and start a boycott of the English language.'

বঙ্কিম উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা

অশোক কুণ্ডু

দুর্লভচন্দ্র চক্রবর্তী (দেবী: ১।৮)।

উপন্যাসের অল্প অবসরে দুর্লভ চক্রবর্তীর চরিত্রটি অপূর্ব। তিনি প্রফুল্লদের গ্রামের জমিদারের গোমস্তা। অর্থের জন্য এইসব লোকেদের অকরণীয় কিছুই নাই। প্রফুল্লকে অপহরণের হীন ষড়যন্ত্রে তিনি লিপ্ত। কিন্তু ডাকাতের ভয়ে পলায়নরত দুর্লভের চরিত্রটিই সর্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণ করে।— 'ফুলমণি যত ডাকে, ও গো দাঁড়াও গো! আমায় ফেলে যেও না গো!' দুর্লভচন্দ্র তত ডাকে, 'ও বাবা গো! ঐ এলো গো!' কাঁটা-বনের ভিতর দিয়ে, পগার লাফাইয়া, কাদা ভাংগিয়া, উর্ধ্বশ্বাসে দুর্লভ ছোটে—হায়! কাছা খুলিয়া গিয়াছে, একপায়ের নাগরা জুতা কোথায় পড়িয়া গিয়াছে, চাদরখানা একটা কাঁটা-বনে বিঁধিয়া তাঁহার বীরত্বের নিশানস্বরূপ বাতোসে উড়িতেছে। তখন ফুলমণি সুন্দরী হাঁকিল, 'ও অধঃপেতে মিনসে—ওরে মেয়েমানুষকে ভুলিয়ে এনে—এমনি ক'রে কি ডাকাতের হাতে সঁপে দিয়ে যেতে হয় রে মিনসে?' শুনিয়া দুর্লভচন্দ্র ভাবিলেন, তবে নিশ্চিত ইহাকে ডাকাইতে ধরিয়াছে। অতএব দুর্লভচন্দ্র বিনাবাক্যব্যয়ে আরও বেগে ধাবমান হইলেন" (১।১০)

দেবী (রাজ : ২।৭)।

দেবী যোধপুরী বেগমের পরিচারিকা। সে রাজপুত। যোধপুর থেকে বেগমের সংগে এসেছিল দীর্ঘদিন পরে চঞ্চলকুমারীকে সংবাদ দেবার প্রয়োজনে যোধপুরী বেগম তাকে মুক্তি দিলেন। দেবীর বেশ কিছু বুদ্ধি আছে। তাই সে চঞ্চলের কাছে ইচ্ছা করেই বেগমের দেওয়া পাঞ্জাটা ফেলে গিয়েছিল।

দেবী চৌধুরাণী (দ: চৌ: ১।১)। দ্রঃ প্রফুল্ল।

দেবী সিংহ (দে: চৌ: ১।৮)

১৭৫৬ খ্রীঃ দেবী সিংহ (সিং) পূর্বপুরুষের বাসস্থান পানিপথ থেকে বাংলা দেশে এসে বসবাস করতে থাকেন। ১৭৭৩ খ্রীঃ ইংরেজ কোঃ দেবী সিংহকে রাজস্ববিভাগের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করেন তাঁর সময়ে ইংরেজের রাজস্ব বৃদ্ধি পায় কিন্তু তিনি জনগণের উপর নানা অত্যাচারের জন্য ইতিহাসে কুখ্যাত। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মে ইনি পুর্ণিয়া, এদ্রবকপুর, রংপুর ও দিনাজপুর জেলার ইজারা গ্রহণ করেন। ১৭৮৩ খ্রীঃ রংপুরের প্রজাগণ তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করায় তাঁর পদচ্যুতি ঘটে। তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের বিচার হয়, কিন্তু শেষপর্যন্ত অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। এডমণ্ড বার্কের রচনায় দেবীসিংহের অত্যাচারের কথা জীবন্ত হয়ে আছে। (দ্রঃ এডমণ্ড বার্ক)।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল দেবীর সিংহের মৃত্যু হয়।
'দেবী চৌধুরাণী'তে দেবী সিংহের অত্যাচারের উল্লেখ আছে।

দেবেন্দ্র (বিষঃ ৬ষ্ঠ পরিঃ)।
দেবেন্দ্র মদ্যপ জমিদার। তাঁর অনেক সদগুণ ছিল। তিনি রূপবান, গুণবান, সংগীতজ্ঞ। কিন্তু সংসারে গৃহিণীর জ্বালায় তিনি বহির্বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং মদের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেন। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা, নারী স্বাধীনতা প্রভৃতির জন্য তাঁকে ইয়ংবেঙ্গলের প্রতিভূ বলে মনে হয়। কুন্দনন্দিনীর প্রতি আসক্তি তাঁর অত্যন্ত প্রবল। এজন্য তাঁকে বৈষ্ণবী বেশে নগেন্দ্রের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে দেখি। এতে দেবেন্দ্রের দুঃসাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। হীরার প্রতি দেবেন্দ্রের আচরণ তাঁকে নিষ্ঠুর প্রমাণিত করে। দেবেন্দ্রের পাপের ফলে তাঁর 'মৃত্যুশয্যা কণ্টকময় হয়ে উঠেছে।

দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় (রাধাঃ ৭ম পরিঃ)।
রুক্মিণীকুমারের প্রকৃত নাম। (প্রঃ রুক্মিণীকুমার)।

ধনদাস (যুগঃ ১ম পরিঃ)।
হিরণ্ময়ীর পিতা। তিনি দৈবে বিশ্বাসী। তাই গুরুর পরামর্শ মত কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা করেছেন। তবে কন্যার সুখের জন্য তারই মনোমত পাত্রের সংগে বিয়ে দিয়েছেন। এতে তাঁর উদার মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

ধরম সিংহ (দুর্গেঃ ১।২)।
একজন রাজপুত সৈনিক। শৈলেশ্বরের মন্দিরে জগৎসিংহকে দু'জন মহিলার সংগে দেখে ধরম সিংহ বিস্মিত হয়েছিল। তাছাড়া জগৎ সিংহ যখন মহিলাদের জন্য শিবিকা আনার কথা বলল তখন তার যথেষ্ট কৌতুহল হয়। কিন্তু যথার্থ সৈনিক হিসাবে সে নির্বিবাদে সেনাপতির আদেশ মান্য করল।

ধীরানন্দ গোস্বামী (আনন্দঃ ১।১২)।
ধীরানন্দ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত। ভবানন্দকে পরীক্ষা করার জন্য সত্যানন্দ কর্তৃক প্রেরিত হয়ে যখন তিনি বিশ্বাসঘাতকতার ষড়যন্ত্র করেন তখন তাঁকে আমরা বিশেষভাবে চিনতে পারি। তিনি যে সত্যানন্দ কর্তৃক প্রেরিত একথা সে সময় না জানা থাকায় আমাদের এই চরিত্রটির তৎকালীন ব্যবহারে মনে ঘৃণা জন্মে।

কিন্তু ধীরানন্দ কর্তব্যপরায়ণ। সর্বোপরি স্নেহশীল। তাই ভবানন্দের মৃত্যুকালে তিনি ভবানন্দকে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েছেন, ভবানন্দকে ঘৃণা করেন নি।

নগেন্দ্রনাথ দত্ত (বিষঃ ১ম পরিঃ)।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের নায়ক নগেন্দ্রনাথ বঙ্কিম-উপন্যাসের এক স্মরণীয় পুরুষচরিত্র। 'বিষবৃক্ষে'র পূর্ববর্তী উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র যে সকল নায়কচরিত্র অংকন করেছেন, তাঁরা রূপে-গুণে অতুলনীয় হলেও, দোষেগুণে সাধারণ মানুষ থেকে অনেক দূরের। নগেন্দ্রনাথই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম নায়ক, যিনি আমাদের মাটির মানুষের অত্যন্ত কাছাকাছি।

'জগদীশ্বর তাঁহাকে সকল সুখের অধিপতি করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। কান্ত রূপ ; অতুল ঐশ্বর্য ; নীরোগ শরীর ; সর্বব্যাপিনী বিদ্যা, সুশীল চরিত্র, স্নেহময়ী সাধ্বী স্ত্রী ; এ সকল এক জন্মের ভাগ্যে প্রায় ঘটে না। নগেন্দ্রের এ সকলই ঘটিয়াছিল।' (২৯ পরিঃ)। কিন্তু নগেন্দ্র এর জন্য স্মরণীয় নন। তিনি স্মরণীয় তাঁর দোষে। নগেন্দ্রনাথের চরিত্রদোষই 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের বিষের বীজ। তা থেকেই উপন্যাসরূপ মহীরুহের সৃষ্টি হয়েছে। নগেন্দ্রনাথের চরিত্রের এই দোষটি কি? সেটি হোল 'রিপুর প্রাবল্য'। কুন্দের প্রতি তাঁর যে রূপজ মোহ, এটিই তাঁর চরিত্রের অবনতির মূল কারণ। এছাড়া আরও একটি কারণ বঙ্কিম নির্দেশ করেছেন। সেটি স্থির চিত্ত-সংযমে অক্ষমতা। তাঁর নিরবচ্ছিন্ন সুখই তাঁর দুঃখের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে।—'দুঃখী না হইলে লোভে পড়িতে হয় না। যাহার যাহাতে অভাব, তাহার তাহাতেই লোভ। কুন্দনন্দিনীকে লুব্ধলোচনে দেখিবার পূর্বে নগেন্দ্র কখনও লোভে পড়েন নাই ; কেন না, কখনও কিছুরই অভাব জানিতে পারেন নাই। সুতরাং লোভ সম্বরণ করিবার জন্য যে মানসিক অভ্যাস বা শিক্ষা আবশ্যক, তাহা তাঁহার হয় নাই। এই জন্যই তিনি চিত্ত সংযমে প্রবৃত্ত হইয়াও সক্ষম হইলেন না।' (২৯ পরিঃ)।

এই দোষের জন্য কি আমাদের নগেন্দ্রকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা করে? নিঃসংকোচে বলতে পারি—না। সূর্যমুখীর দুর্দশা, কুন্দনন্দিনীর জীবনত্যাগ প্রভৃতি ঘটনায় এক-একবার নগেন্দ্রের প্রতি মন বিরূপ হয়ে ওঠে বটে, কিন্তু যখন নগেন্দ্রের মানসিক টানা-পোরনের ছবিটি বঙ্কিম উপস্থাপিত করেন তখন মনে হয়—এই মানুষটিও কম বিড়ম্বিত নন।

সূর্যমুখীর প্রতি নগেন্দ্রের ভালোবাসায় কোন ফাঁকি ছিল না। কিন্তু তবুও কুন্দকে তাঁর কি প্রয়োজন ছিল। উপন্যাসমধ্যে দু'টি প্রয়োজনের কথা প্রচ্ছন্ন আছে বলে মনে হয়। একটি হল—সূর্যমুখীর রূপ, আর কুন্দের রূপের পার্থক্য। সূর্যমুখীর রূপ স্নিগ্ধ গৃহের কল্যাণশ্রীমণ্ডিত, কুন্দর রূপ উজ্জ্বল—বনের অনাঘ্রাত পুষ্পের উৎকট গন্ধযুক্ত। প্রথমটি নগেন্দ্রনাথ এত অপর্যাপ্ত পরিমাণে পেয়েছেন যে তার মূল্য বুঝতে পারেন নি। তাই দ্বিতীয়টিতে হঠাৎ আকৃষ্ট হয়েছেন। দ্বিতীয় কারণটি হল—সূর্যমুখী সন্তানহীনা। নগেন্দ্র তাঁর দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করার সময় এ যুক্তিটিকে গ্রহণ করেছেন। নগেন্দ্রনাথ কুন্দকে ভালবেসেছেন প্রথমদর্শনেই, কিন্তু সে ভালবাসা প্রবল হয়ে উঠল কুন্দ বিধবা হবার পর। তারাচরণের সংগে কুন্দের বিয়ে হবার আগেই যে নগেন্দ্রের আকর্ষণ কেন প্রবল হয়ে উঠল না তা বোঝা যায় না। দীর্ঘ তিন বছর পর বিধবা কুন্দের প্রতি নগেন্দ্র আবার আকর্ষণ বৃদ্ধির কারণ কি? অবশ্য অনুমান করা চলে কুন্দের ভাগ্য বিপর্যয় নগেন্দ্রকে কুন্দের প্রতি আরও সহানুভূতিশীল করে তোলে।

নগেন্দ্র সূর্যমুখীর গুরুত্ব প্রথমে বুঝতে না পারলেও, সূর্যমুখীর গৃহত্যাগের পর সাংঘাতিকভাবে বুঝতে পারলেন তাই গৃহত্যাগ করে তাঁকেও পথে পথে ঘুরে বেরাতে হয়েছে। আবার কুন্দের

মর্যাদা তিনি বুঝতে পারলেন কুন্দের মৃত্যুর পর। কুন্দের মূর্তি তাঁকে প্রাচীন বয়স পর্যন্ত হৃদয়ে অংকিত রাখতে হয়েছে। উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত জিনিষের মর্যাদা বুঝতে না পারা—নগেন্দ্রনাথকে অনুশোচনা করতে হয়েছে।

বিষবৃক্ষের ফলভোগ যাদের করতে হয়েছে, তার মধ্যে হীরা-দেবেন্দ্রের প্রায়শ্চিত্ত বাহ্যিক দিক থেকে নিদারুণ হলেও অন্তর্নিহিত বিষজ্বালা নগেন্দ্রকে কম ভোগ করতে হয় নি। সূর্যমুখীকে হারিয়ে তাঁর জ্বালা যে তীব্রতর হয়েছিল তার সুদীর্ঘ বর্ণনা আছে নগেন্দ্রের পদব্রজে ভ্রমণে, শ্রীশচন্দ্রের সঙ্গে কথা বলার সময় নিজের হাতে নিজের গলা টিপে ধরায় এবং শয্যাগৃহে সূর্যমুখীর ছায়া দর্শনে। কুন্দের জন্য তাঁর বেদনাবোধ কতখানি গভীর বঙ্কিম অপ্রয়োজনীয় বোধে তা বর্ণনা করেন নি। কিন্তু প্রাচীন বয়স পর্যন্ত যাঁর মর্মান্তিক মৃত্যু, সর্বদা বুকে ধরে রাখতে হয়, সেখানে জ্বালা যে কত তীব্রতর, তা' যাঁর ক্ষত আছে তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন।

বকাউল্লা খাঁ (চন্দ্র ২।৭)।

ফষ্টরের নৌকার তেলিঙ্গা অর্থাৎ এদেশীয় সৈনিক। "বকাউল্লার নিবাস, গাজিপুরের নিকট।" শৈবলিনীকে প্রতাপেরা উদ্ধার করলে সে গোপনে অনুসরণ করে তাদের বাসস্থান দেখে গিয়েছিল। সহস্র মুদ্রা পারিতোষিকের লোভে সে অমিয়টকে তাদের সন্ধান বলে দেয়।

বখ্ত খাঁ (রাজ: ৭।৩)।

ঔরঙ্গজেবের একজন মনসবদার। সে-ই সওদাগর বেশী মবারকের নির্দেশিত ভুল পথ দেখে এসে মোগলসৈন্যকে বিপদের মধ্যে নিয়ে যেতে অগ্রসর হয়।

বখ্তিয়ার খিলজি (দুর্গে: ১।৩), (মৃণা: ১।১)।

'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে বখ্তিয়ার খিলজির নামোল্লেখ আছে। কিন্তু 'মৃণালিনী' উপন্যাসে এঁর একটি ভূমিকা রয়েছে।

বখ্তিয়ার খিলজি ঐতিহাসিক চরিত্র। ভারতে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠাকারী মুহম্মদ ঘোরীর তিনি অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। বঙ্গদেশ বিজয়ে তাঁর কৃতিত্ব অসীম। তিনি অসাধারণ বীররূপে খ্যাত। ১১৯৭ খ্রী: তিনি অযোধ্যা ও মগধ জয় করেন। তারপর বাঙ্গালার বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণসেনের অকর্মণ্যতার কথা শুনে তিনি রাজধানী নবদ্বীপের দিকে রওনা হন। নগরীর অদূরে বনমধ্যে সৈন্য লুকায়িত রেখে সুযোগমত মাত্র সপ্তদশ অশ্বারোহী সেনা নিয়ে তিনি রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেন। বৃদ্ধ রাজা সপরিবারে পলায়ন করেন (১৬৯৯ খ্রী:)। বঙ্গদেশ জয়ের পর তিনি কামরূপ জয় করতে গিয়ে বিফল হন। বখ্তিয়ার নিজেরই এক অনুচরের হাতে নিহত হন।

ইতিহাসের এই চরিত্রটিকে বঙ্কিমচন্দ্র 'মৃণালিনী' উপন্যাসে উপস্থিত করেছেন। 'মৃণালিনী'র প্রথম কয়েকটি সংস্করণে 'রঙ্গভূমি' ও 'গজহস্তা' নামক দু'টি পরিচ্ছেদ ছিল। এই পরিচ্ছেদে বখ্তিয়ারের হস্তিযুদ্ধ ও হেমচন্দ্র কর্তৃক হস্তীর হাত থেকে বখ্তিয়ারের রক্ষা কাহিনী বর্ণিত

হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সংস্করণে এই ঘটনার শুধুমাত্র উল্লেখ আছে। উপন্যাসে নবদ্বীপ অধিকার কালে বখ্‌তিয়ারকে সৈন্যদলের পরিচালনা করতে দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে বেঁটে সৈনিক বলে অভিহিত করেছেন। পশুপতির সংগে সাক্ষাৎকারে আর একবার বখ্‌তিয়ারকে দেখা গেছে। তাঁর কথাবার্তায়—চাতুর্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র বখ্‌তিয়ারের চরিত্র উপস্থাপন অপেক্ষা, তৎসংক্রান্ত ঘটনাবর্ণনাকেই এই উপন্যাসে অধিক প্রয়োজন বলে মনে করেছেন।

বনাসী (রাজ: ৪।৪)

যোধপুরী বেগমের বিশ্বাসী, নবাব হারেমের এক খোজা। যোধপুরী বেগম নির্মলকুমারীকে এর সাহায্যেই হারেমের বাইরে বের করে দিতে চেষ্টা করেছিলেন।

বন্দেআলি (সীতাঃ ২।৯)।

বন্দেআলি গঙ্গারামের একজন বিশ্বস্ত মুসলমান অনুচর। এই বন্দেআলির মাধ্যমেই গঙ্গারাম তোরাব খাঁর সংগে ষড়যন্ত্রের পথ প্রস্তুত করে।

বল্লালসেন (মৃণাঃ ১।৯)।

কৌলিন্যপ্রথার প্রসঙ্গে নামোল্লেখ মাত্র আছে। বল্লালসেন বাংলাদেশের সেনরাজবংশের রাজা। পিতা বিজয়সেন, মাতা বিলাসদেবী। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি বিদ্বান ও বিদ্যোৎ সাহীরূপে পরিচিত। তাঁর রচিত দুখানি সংস্কৃত গ্রন্থ 'দান-সাগর' ও 'অদ্ভুত-সাগর'। বল্লালসেনই কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করেন। ১১১৮ বা ১৯ খ্রীঃ তিনি পরলোক গমন করেন।

বসন্তকুমারী (ইন্দিরা ১৮ শ পরিঃ)।

ইন্দিরার একমাত্র ভ্রাতার নাম। উল্লেখমাত্র আছে।

বসন্তকুমারী (রাধাঃ ৩য় পরিঃ)।

রাধারানীর সখী। কামাখ্যানাথবাবুর কন্যা। কাহিনীর অল্প অবসরে চরিত্রটির বিস্তারের সম্ভাবনাকে সীমিত করা হয়েছে। তবুও বসন্তকুমারীর রসিক রূপটি প্রকাশিত।

বাঞ্ছারাম মিত্র (রজনী ২।৫)।

শচীন্দ্রনাথের পিতামহের নাম বাঞ্ছারাম মিত্র। তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। কিন্তু বন্ধু মনোহরদাসকে পুত্র অপমান করায়, পুত্রকে সম্পত্তি না দিয়ে বন্ধুর উত্তরাধিকারীদের সম্পত্তিভোগের অধিকার দিয়ে যান। এটি তাঁর দৃঢ়চরিত্র ও আদর্শবাদী মনোভাবের পরিচয়।

বান্সিসাট (গভর্ণর) (চন্দ্রঃ ২।৫)।
দ্রঃ গভর্ণর বান্সিসাট।

বাবর (দুর্গেঃ ১।৩)।
উপন্যাসে নামোল্লেখমাত্র আছে।

জন্ম ১৪৮৩ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৫৩০ খ্রীঃ। তাঁর পুরা নাম—জহিরউদ্দিন মহম্মদ বাবর। পিতার দিক থেকে চেঙ্গিস খাঁ ও মাতার দিক থেকে তিনি ছিলেন তৈমুরলঙ্গের বংশধর। তাঁর পিতা রুশ-তুর্কীস্থানের অন্তর্গত ফারগানা নামক স্থানের অধিপতি ছিলেন। মাত্র বারো বছর বয়সে বাবর পিতার রাজ্যে অভিষিক্ত হন। তারপর আফগান সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে তিনি ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছেন। ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। বাবর একাধারে সুদক্ষ সৈনিক, কবি ও সুসাহিত্যিক ছিলেন। রাসব্রুক-উইলিয়াম বাবর চরিত্রের বহু গুণের উল্লেখ করেছেন—'Babar possessed eight fundamental qualities—lofty judgement, noble arbition, the art of victory, the art of government, the art of conferring prosperity upon his people, the talent of ruling mildly the people of God, the ability to win the heart of his soldiers and love of justice.'

বামন ঠাকুরাণী (ইন্দিরা ৭ম পরিঃ)।
সুভাষিণীদের বাড়ীর এই বৃদ্ধা বামন ঠাকুরাণীর জায়গায় ইন্দিরা কাজে লাগে। বুড়িকে নিয়ে ইন্দিরার রসিকতার অন্ত নেই। বুড়ি একদিন ছুঁড়ি সাজার জন্য কলপ মাখতে গিয়ে মুখময় মেখে ফেলে। শেষপর্যন্ত তার কি কান্না। ইন্দিরার স্বামীর সংগে চলে যাবার পর বুড়ি তাকে খারাপ বলত, কিন্তু যখন শুনলো সে অন্যপুরুষের সংগে যায়নি নিজের স্বামীর সংগেই গিয়েছে তখন খুশী হল। আসলে বুড়ি মুখে যাই বলুক, ইন্দিরাকে সে ভালবাসত।

বামাচরণ (রজনী ১।১)।
রজনীর প্রতিবেশী কালীচরণ বসুর চারবৎসরের শিশুপুত্র। রজনীর খেলা চলত তার সংগে। বামাচরণ বায়না করে রজনীর 'বল' (বর) হয়ে বসল।

বিক্রমসিংহ বা বিক্রম সোলাঙ্কি (রাজঃ ১।১)।
রূপনগরের রাজার নাম বিক্রমসিংহ। তিনি চঞ্চলকুমারীর পিতা। উপন্যাসের প্রথমদিকে তার বিশেষ কোন চরিত্র পরিচয় ব্যক্ত হয়নি। মুঘলের পদলেহী অন্যান্য কিছু রাজপুতের মতই তাঁর মনোভাব। তাই নিজ কন্যার মুঘল বাদশাহের সঙ্গে বিবাহ দিতে তিনি উৎসুক।

তারপর মাণিকলাল যেভাবে বিক্রমসিংহের কাছে মিথ্যা কথা বলে তাঁর সৈন্য সামন্ত নিয়ে এসে মুঘলদের বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়েছে, তাতে রূপনগরের রাজাকে স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন না বলে উপায় নেই।

কিন্তু রাজসিংহের বিবাহ প্রস্তাবের উত্তরে বিক্রমের পত্র তাঁর উগ্র ব্যক্তিত্বের পরিচয় বহন করে। তিনি রাজসিংহের প্রতি এবং কন্যার প্রতি কঠোর অভিশাপবাণী প্রয়োগ করেন। কিন্তু একথাও স্বীকার করেন, যদি কোনদিন রাজসিংহ যোগ্য বীরত্ব দেখাতে পারেন তবে তিনি স্বেচ্ছায় তখন কন্যা সমর্পণ করবেন।

এই প্রতিশ্রুতি বিক্রম রেখেছিলেন। ঔরঙ্গজেবকে রাজসিংহ পরাজিত করলে তিনি সসৈন্যে রাজসিংহের সৈন্যদলে যোগ দেন। কন্যাও সমর্পণ করেন এবং মুঘলের সঙ্গে যুদ্ধে যথেষ্ট রণকৌশলের পরিচয় দেন।

বিক্রমসিংহের চরিত্রের প্রথম ও শেষে সঙ্গতির অভাব আছে। প্রথমদিকে যেভাবে তাকে অঙ্কন করা হয়েছে তার দ্বারা বোঝা যায় না পরবর্তীকালে তিনি এরূপ আচরণ করবেন।

এরূপ হওয়ার কারণ, 'রাজসিংহে'র প্রথম প্রকাশকালে বঙ্কিম যে পরিকল্পনা নিয়ে বিক্রমকে এঁকেছিলেন, পরবর্তী সংস্করণে তা পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু জোড় মেলবার চেষ্টা তিনি করেন নি।

বিন্দু ঠাকুরাণী (ইন্দিরা ১৮শ পরিঃ)
ইন্দিরার বিয়ের সময় ইনি বরের কান মলে দিয়েছিলেন।

বিনোদ ঘোষ (বিষঃ ৪র্থ পরিঃ)।
গ্রামবাসীরা নগেন্দ্রকে বলেছিল যে শ্যামবাজারে কুন্দর মেসো বিনোদ ঘোষ থাকে, তার কাছে কুন্দকে পৌছে দিলে উপকার হবে। কিন্তু বিনোদ ঘোষকে খুঁজে পাওয়া গেল না। "সুতরাং কুন্দ নগেন্দ্রের গলায় পড়িল।"

বিনোদলাল (কৃঃ ঐঃ ১।১)
কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে কৃষ্ণকান্তকে দ্বিতীয়বারের উইল বদলের সময় হরলালের পুত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। কোন চরিত্রবৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়নি।

ট্র্যাডিশেনাল এস. ওয়াজেদ আলি

একদা যিনি বলেছিলেন, 'মানুষ সাহিত্যের জন্য নয়, সাহিত্যই মানুষের জন্য।··· মানুষের মঙ্গলই হবে সাহিত্যের লক্ষ্য।' বলেছিলেন,—'আমি মুসলমান সমাজের বটে, কিন্তু তারও উপর আমি মানুষ। আমি ভারতবাসী বটে কিন্তু তারও উপর আমি মানুষ। আমি বাঙালী বটে কিন্তু তারও উপর আমি মানুষ।' তিনি হলেন আমাদের অতি কাছের মানুষ, রামায়ণ মহাভারতের পাঠ মুখর নিঝুম দ্বিপ্রহরে মুদির দোকানের নিভৃতে চিরন্তন ভারতবর্ষের শাশ্বত রূপসন্ধানী দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ভাষা-শিল্পী এস. ওয়াজেদ আলি।

তাঁর হয়তো অনেক লেখার সঙ্গে আমাদের অনেকেরই তেমন পরিচয় ঘটে নি, আর ব্যস্ত জীবনকালে চব্বিশ ঘণ্টার লেখক হতেও তিনি পারেন নি তথাপি তাঁর লেখা ভারতবর্ষ সম্ভবত আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোকেরই অপঠিত আছে। তাঁর এই স্নিগ্ধ রচনাটির শেষ ছত্রক'টি এখনো এই ব্যস্ত জীবনকালে যখন নিত্যকার কঠিন জীবিকার যন্ত্রণাতে আমরা প্রস্তুত তখন আমাদের চিন্তাক্লিষ্ট মাথার উপরে ছায়াপত্র মেলে ধরে, 'প্রকৃত ভারতবর্ষের নিখুঁত একটা ছবি আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল।—সেই tradition সমানে চলেছে, তার কোথাও পরিবর্তন ঘটে নি।'

প্রতিদিনকার জীবনপ্রবাহে, জাগতিক কোন সংঘাতেই আলি সাহেব ঐতিহ্যকে ভেঙে, ট্রাডিশেনকে নস্যাৎ করে দিয়ে কোন এক অচেনা ভুবনের সিংহদ্বারে উপস্থিত হতে চান নি। তাই আধুনিককালের লেখক হয়ে, সাহিত্যে মানব প্রত্যয়ের প্রতিষ্ঠাতে সোচ্চার হয়েও তিনি সাহিত্যের যে শাশ্বত আদর্শ শিব ও সুন্দরের অনুধ্যান থেকে বিচ্যুত হন নি। বাগানে মালী যেমন সকল আগাছা মুক্ত করে বাগানের সুন্দর সুন্দর ফুল গাছগুলিকে সুগঠিত করে গঠন করেন, সাহিত্যিক, কবি ইত্যাদি ভাষা-শিল্পীকেও সমাজকে অনুরূপ নির্মাণের দিকে নিয়ে যেতে হবে—এমন ধারণার বশবর্তী হয়েই এস. ওয়াজেদ আলি হাতে কলম তুলে নিয়েছিলেন।

আধুনিককালের লেখকদের মতন পশ্চিমবাহিত কোন শিল্পচিন্তা—সুরোরিয়ালিজম, ডাডাইজম, ইমেজইজম ইত্যাদি কোন 'ইজম' বা মতবাদে তাঁর তেমন আস্থা ছিল বলে মনে হয় না। তাঁর সমগ্র লেখাতে যদি 'ইজম' বা মতবাদ তিনি প্রচার করে থাকেন তা হলো হিউম্যানইজম বা মানবতাবাদ। আলিসাহেবের লেখার মধ্যে মানবতাবাদ এত অতিরিক্ত মাত্রায় পরিলক্ষিত হয় যে তার ফলে, তিনি বহু পাঠকের কাছে পরিচিত না হয়েও যেসব পাঠক নিজের গরজে তাঁর লেখা পড়েন তাঁরা তাঁকে কখনই ভোলেন না।

বক্তব্য বিষয় নির্বাচনে ট্র্যাডিশেনাল ছিলেন তিনি। ভাঙা বাঁশী, মাশুকের দরবার, গ্রানাডার শেষবীর, গুলদস্তা, দরবেশের দোয়া ইত্যাদি গল্প-কাহিনী থেকে শুরু করে তাঁর নাটক সুলতান

সালাদিন, প্রবন্ধ ভবিষ্যতের বাঙালী, আমাদের সাহিত্য, আল্লার দান, পীর পয়গম্বরদের কথা, ইসলামের ইতিহাস ইত্যাদি প্রায় সকল রচনার বিষয়বস্তুই ট্র্যাডিশেনাল—ঐতিহ্যানুসারী। কিন্তু ঐতিহ্যকে অনুসরণ করলেও আলিসাহেব তাকে আপন মনের মাধুরী মিলায়ে, আধুনিক দৃষ্টির আলোকে আলোকিত করে নূতনরূপে প্রকাশ করেছেন। তার প্রকাশভঙ্গীও অত্যন্ত আধুনিক। এখানে কিন্তু তিনি ট্র্যাডিশেনকে মানেন নি। প্রমথ চৌধুরীর ভাবশিষ্য এস. ওয়াজেদ আলি চৌধুরী মশায়ের মতনই সাধারণ মানুষের পরিচিত আটপৌরে ঘরোয়া ভাষায় তাঁর বক্তব্যকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর এটি একটি মহৎ গুণ। সাধারণ মানুষের প্রতি ভালবাসা ছিল বলেই আলিসাহেব সাধারণ মানুষের ভাষাকে তাঁর রচনা প্রকাশের অন্যতম মাধ্যমরূপে গ্রহণ করেছিলেন। কঠিন ব্যাকরণের নিয়ম-শৃঙ্খলায় শৃঙ্খলিত করে তিনি তাঁর রচনাকে কখনোই মুষ্টিমেয় বিদগ্ধ পাঠকের সম্পদ করে রাখতে চান নি। অথচ তাঁর বৈদগ্ধ্য কম ছিল না। পাণ্ডিত্যে কোথাও তিনি খর্বাকায় ছিলেন না। কিন্তু রচনাকে পাণ্ডিত্যে ভারাক্রান্ত করতে তাঁর একটা সহজাত লজ্জাবোধ ছিল হয়ত। হয়ত এই জন্যেই তিনি সহজতার দিকে সরসতার ভাবসঙ্গমে বারবার অবগাহন করেছেন। গল্প বলার ভঙ্গি যে কতদূর সহজ হতে পারে তারই অক্ষয় নিদর্শন ছড়ানো রয়েছে মাশুকের দরবার গ্রন্থখানিতে। এর সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশের মতন বিদ্যুৎসঞ্চারী ভাষা আমার নেই। তাই এর ভূমিকাতে সুধীপ্রধান সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় যা' বলেছেন তাই উদ্ধৃত করছি—

'গল্পগুলিতে জ্ঞান আছে, বস্তু আছে; এবং গল্প বলিবার কৌশলটুকু ওয়াজেদ আলি সাহেব বেশ জানেন, তিনি সুপণ্ডিত কিন্তু তাঁর রচনায় পাণ্ডিত্যের হুঙ্কার নেই, ইবসেন-হামসুনকে বাঁধিয়া কসরৎ নাই, হালকা ঝরঝরে ভাষায় ভাবের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে অজস্র, বেশ স্বচ্ছন্দ মুক্তধারার রচনায় thought আছে তা' সত্যই too deep for tears মানবচিত্ত নিমিষে তা স্পর্শ করে। রচনার সার্থকতা এইখানে।...প্রত্যেকটি গল্প প্রাণের দরদে আগাগোড়া ভরা। তবে এগুলিকে বোধ হয় গল্প বলা চলে না। এর জুড়ি পাই তুর্গেনিভের prose poems নামক রচনায়।'

এইরকম prose poems এর নিদর্শন মিলবে ন্যূট হামসুনের লেখা প্যান গ্রন্থে। মিলবে হিলটনের লেখাগুলিতে। বক্তব্য প্রকাশের এ ধরণের স্বচ্ছন্দগামীতা সমকালীন আর কোন বাঙালী লেখকের লেখায় আমরা আবিষ্কার করতে পারবো না।

মুসলিম সংস্কৃতির আদর্শ, সভ্যতা ও সাহিত্যে ইসলামের দান, ইসলামের ইতিহাস, আকবরের রাষ্ট্রসাধনা, ইবনে খালদুনের সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি গ্রন্থগুলির মধ্য দিয়ে এস. ওয়াজেদ আলি সাহেব ইসলামের ঐতিহ্যকে মানুষের দৃষ্টির সামনে খুলে ধরতে প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু এই ঐতিহ্য দৃষ্টি কোথাও তাঁকে ইসলাম সম্পর্কে কতিপয়ের মতন গোঁড়া ও সংরক্ষনশীল করে তোলে নি। ধর্মীয় গোঁড়ামী সম্পর্কে আলি সাহেব স্বয়ং বলেছেন, 'গোঁড়া ধার্মিক প্রকৃতপক্ষে ধার্মিক নয়—সে হল্ল ধর্মের একটা বিকৃত প্রতিচ্ছবি—caricature।'

এককথায় বলতে গেলে ঐতিহ্যানুসারী হয়েও আলি সাহেব ছিলেন নির্মোহ, স্বচ্ছদৃষ্টিসম্পন্ন। বাংলা দেশের ঐতিহ্যের প্রতি, স্বাতন্ত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তিনি। বাঙালীর

স্বাতন্ত্র্যবোধ ও বৈশিষ্ট্যের গৌরবে তিনি নিজেকে গৌরান্বিত মনে করতেন। অথচ দুঃখের বিষয়, এই মহান বাঙালী সন্তানকে অনেক বাঙালীই ভালো করে চেনেন না।

বাঙালা দেশের অখণ্ড ও বিরাট ঐতিহ্যে বিশ্বাসী আলি সাহেব রাজনৈতিক কারণে বাংলা দেশের বিভাজনকে বাহ্যত মেনে নিলেও, অন্তরে মানেন নি। তিনি বিশ্বাস করতেন বাঙালী ও বাঙলার সত্তা দ্বি-খণ্ডিত হয় নি। হতে পারে না। তাঁর মনে এমনও বিশ্বাস ছিল যে অদূর ভবিষ্যতে আমরা সবই এক হব। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গেই তাই উচ্চারণ করে গেছেন। 'স্বার্থান্ধ লোকের প্ররোচনা না থাকলে বাঙলার হিন্দু মুসলমানের মিলন খুবই সহজ ছিল এবং এখনও আছে আর ভাবীকালেও থাকবে। আর ভাবীকালের এই রচনার দায়িত্ব হচ্ছে, বাঙলার তরুণ কবি ও সাহিত্যিকদের। তারা এইদিকে সচেতন হলে, সক্রিয় হলে, ভাবীকালের নব জাতীয়তার রাজপথে সমব্যথা বেদনায় হাত ধরাধরি করে চলবার পথে হিন্দুমুসলমানের কোন বাধা থাকবে না। বাঙালী হিন্দু, বাঙালী মুসলমান বাঙলার সব ভাই-বোনের সম্মিলিত চিত্তে এই অখণ্ড জাতীয়তার অভিনব শুভ প্রেরণা মূর্ত হয়ে উঠুক, এই প্রার্থনা।'

আলি সাহেবের এই ট্র্যাডিশেনাল দৃষ্টি কোন সঙ্কোচনের দিকে আমাদের নিয়ে নিক্ষেপ করে না। পরন্তু আমাদের নিয়ন্ত্রিত করে এক মহৎ উৎসর্জনের দিকে।

বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের যে অবদান যুগে যুগে এক অক্ষয়ভাণ্ডার সূচনা করে আসছে সেই প্রাচীনকাল থেকেই, সৈয়দ আলাউদ্দিন, রোম রাজসভার কবিদের রচনার মধ্যে যার প্রথম ভোরের ভাঁয়রো সঙ্গীত শোনা গিয়েছিল তা, বর্তমানকালে অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে। অনেক রাগরাগিনীর জলতরঙ্গ বাজছে আজ বাঙালী মুসলমান ভাষাশিল্পীদের হাতে।

আমাদের আলোচ্য এস. ওয়াজেদ আলি অবশ্য বাংলা সাহিত্য সরস্বতীর দেউল প্রাঙ্গনে অসংখ্য নৈবেদ্য পাঠাতে পারেন নি। তিনি অনধিক কুড়িটি গ্রন্থের মাত্র লেখক। সেগুলি হচ্ছে, যথাক্রমে—

গল্প ও কাহিনী ॥ ভাঙা বাঁশী, মাশুকের দরবার, গ্রানাডার শেষ বীর, গুলদস্তা, দরবেশের দোয়া।

রম্যরচনা ॥ খেয়ালের ফেরদৌসী ॥

নাটক ॥ সুলতান আলাবিন ॥

ভ্রমণ কাহিনী ॥ মোটরযোগে রাঁচি সফর ॥

প্রবন্ধ ও আলোচনা ॥ ভবিষ্যতের বাঙালী, জীবনের শিল্প, আমাদের সাহিত্য, আল্লার দান, পীরপয়গম্বরদের কথা, মুসলিম সংস্কৃতির আদর্শ, আকবরের রাষ্ট্র-সাধনা, ইসলামদের ইতিহাস, একবালের পয়গাম, Bengalee of to morrow,

স্মৃতিকথা ॥ Aligarh Momories and a Persian Bouquet.

অনুবাদ ॥ ইবনে খালদুনের সমাজবিজ্ঞান॥

শিশুসাহিত্য ॥ বাদসাহী গল্প, গল্পের মজলিস ॥

আজ আর আলি সাহেব জীবিত নেই। কিন্তু তাঁকে স্মরণ করবার মতন উল্লিখিত গ্রন্থগুলি

রয়ে গেছে। জানি না, বাংলাদেশের ক'টি গ্রন্থাগারে বা গৃহে খোঁজ করলে এই গ্রন্থগুলি পাওয়া যাবে? যাবে না হয়তো অনেক গৃহেই, অনেক গ্রন্থাগারেই। কিন্তু তাবলে বাংলা সাহিত্যের পাঠকেরও, শ্রদ্ধাশীল পাঠকেরও অন্তরেতে তাঁর কোন অস্তিত্ব রবে না এমন নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি অন্তত মনে করতে পারি না কখনই। কারো মধ্যে এহেন নৈরাশ্য দেখলেও সন্তুষ্ট হতে পারব না। কেন না এস. ওয়াজেদ আলি তার সামান্য ক'খানা লেখার মধ্য দিয়ে যে ঐতিহ্যের সঙ্গে আমাদের পরিচিত করে দিয়েছেন তাতে আমাদের কোন অসন্তোষের কারণ নেই। বরং এই বিশ শতকের সভ্যতা ও শিক্ষাভিমানের প্রখর খরতাপের মধ্যে তাঁর ঐতিহ্যানুসরণ আমাদের সত্যকার ভারতবর্ষের সঙ্গেই এক নির্মল একাত্মতার বন্ধনে বেঁধে দিয়েছে। তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থেরই শব্দের মধ্যে কান পাতলে আমরা যেন ভারতবর্ষেরই হাজার হাজার বছরের হৃৎস্পন্দন শুনতে পাই।

সুখরঞ্জন চক্রবর্তী

বিদ্যাসাগর রচনাবলী ॥ দেবকুমার বসু সম্পাদিত ॥ মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮।১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত।

বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব এক বিশেষ যুগসন্ধিক্ষণে। মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও আচার সর্বস্বতাকে আঘাত করে মোহ ও ধর্মান্ধতার ওপর যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা করেন নবজাগৃতির অগ্রদূত রামমোহন। রামমোহন নব্য বাংলার ভগীরথ। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের ধারাকে শঙ্খনিনাদে বরণ করে মৃত বাঙালী জীবনকে নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন তিনি। মুক্তিপথের একক সেনানী রামমোহনের সার্থক উত্তরসাধক বিদ্যাসাগর।

১৮৩৩ খ্রীঃ রামমোহন মারা যান। বিদ্যাসাগর তখন ত্রয়োদশ বর্ষীয় শিক্ষার্থী। জীবনের পাথেয় সঞ্চয় করতে বীরসিংহ থেকে কলকাতায় এসেছেন। নবজাগৃতির কেন্দ্রস্থল কলকাতা তখন বিচিত্র ভাবের আন্দোলনে উত্তাল। একদিকে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ও পাশ্চাত্য শিক্ষার অত্যুগ্র আলোয় বিভ্রান্ত 'ইয়ং বেঙ্গল' সম্প্রদায়ভুক্ত যুবকবৃন্দ অন্যদিকে রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সনাতনধর্মধ্বজী সমাজপতিগণের 'গেল গেল' আর্তরব। উভয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত ব্রাহ্ম সম্প্রদায়। পরস্পরের আক্রমণ প্রতি-আক্রমণের, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তর্ক বিশ্লেষণে, সদ্য প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাগুলো মুখর। ইংরেজের হাতে গড়া অমরাপুরী কলকাতায় ধনাঢ্য জমিদার বেনিয়ান মুৎসুদ্দি প্রভৃতি 'হঠাৎ নবাব'দের বিলাসস্রোত, ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ের মদ্যপান, পাদ্রীদের খ্রীষ্টধর্ম প্রচার ও খ্রীষ্টমহিমা কীর্তনের সঙ্গে সমান্তরাল ধারায় চলেছিল সতীদাহ নিবারণ আইন, দাসত্ব নিরোধ আইন প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলন। ডিরোজিও, রিচার্ডসন, টমসন, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষের ইংরেজী বক্তৃতা গোলদিঘির হিন্দু কলেজের হলঘর ছাড়িয়ে পড়েছিল লালদিঘির ফোর্টউইলিয়ম কলেজে। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষন শেষ করে বিদ্যাসাগর ফোর্টউইলিয়ম কলেজের অধ্যাপনায় রত। বয়স তাঁর তেইশ।

ধর্মসভা, ব্রাহ্মসভা এবং ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত না হলেও সংস্কৃত কলেজের ভিন্নতর পরিবেশে শিক্ষালাভ করলেও উদার দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর চলার গতিপথ নির্ণয়ে তাঁকে সাহায্য করেছিল। সাহায্য করেছিল মোহমুক্ত ও যুক্তিবাদী মনের অধিকারী হতে। মধুসূদনের বিপরীত কোটির মানুষ হয়েও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে উভয়ের পার্থক্য ছিল না। রামচন্দ্র ও তাঁর বানরসেনাদলকে ঘৃণা করা কিংবা বিভীষণকে ঘরের শত্রু নামে আখ্যাত করা এবং বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শনকে ভ্রান্ত বলে উড়িয়ে দেওয়া অথবা বিধবা বিবাহ প্রচলন করার পেছনে একই যুক্তিবাদ কার্যকরী। আসলে রামমোহনের সময় থেকে যে যুক্তিবাদের উন্মেষ এবং বিদ্যাসাগরের ছাত্র ও কর্মজীবনের প্রারম্ভকাল

পর্যন্ত যে যুক্তিবাদের বিকাশ তারই সাধারণ ভিত্তিভূমিতে অন্য বহুজনের মত তাঁকে বিচরণ করতে হয়েছিল। সেই কারণে আদালতের সাক্ষ্যদানকালে রসিককৃষ্ণ মল্লিক গঙ্গাজলের পবিত্রতায় সংশয় প্রকাশ করেছিলেন এবং একই কারণে বিদ্যাসাগরের পক্ষে যুক্তিবাদের অধিকারী হওয়া সহজতর ছিল। এই প্রসঙ্গে তাঁর উদার শিক্ষা গ্রহণক্ষম প্রশস্ত চিত্তকে তুচ্ছ করলে অন্যায় হবে। এইখানেই বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব। প্রত্যক্ষবাদী বিদ্যাসাগর সবকিছুকেই যাচাই করতেন দৈনন্দিন উপযোগিতার আলোকে। তাই গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারজাত বিদ্যাসাগর পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকেন নি। বার্কলের দর্শন তাঁর কলেজে শিক্ষনীয় না করার কারণরূপে তিনি বলেছিলেন: আমি বার্কলের দর্শন আমার কলেজের শিক্ষনীয় বিষয়ের অন্তর্গত করি নাই, কারণ উহাতে ছাত্রগণের কুসংস্কার দূরীভূত না হইয়া বরং আরও বদ্ধমূল হইবে; যেহেতু তাহারা একজন প্রতীচ্য পণ্ডিতের মুখে বেদান্তের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইবে।

রামমোহনের কলকাতায় আগমনের মধ্য দিয়ে ধর্ম নিয়ে যে বাদ-বিতণ্ডা শুরু হয়েছিল পরবর্তী কালেও তা সমানে অগ্রসর হয়েছিল। বিদ্যাসাগর ধর্ম সম্বন্ধে তুষ্ণীভাব অবলম্বন করে সমাজ-সংস্কার কর্মে অধিকতর অগ্রবর্তী ছিলেন। প্রত্যক্ষবাদ বিষয়ে অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গে তাঁর সাধর্ম লক্ষ্য করা যায়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রবন্ধ নির্বাচনীর সভার 'গ্রন্থাধ্যক্ষ'রূপে অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর পরস্পর পরস্পরের ঘনিষ্ট সংস্পর্শে এসেছিলেন। এঁদের সমাজ-সংস্কারপ্রবণতা, যুক্তি-নির্ভর প্রত্যক্ষ জ্ঞানমূলক নিবন্ধ প্রচার এবং সর্বোপরি ধর্মবিষয়ে ঔদাসীন্য লক্ষ্য করে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত সহনশীল ব্যক্তিও এঁদের কতগুলান নাস্তিক' বলে অভিহিত করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলির অন্যতম তাঁর মানবপ্রেম। তাঁর সমগ্র জীবনই মানব প্রেমের এক বিশিষ্ট উদাহরণ। তাঁর সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টার মূলে রয়েছে এই মানবপ্রেম। বিদ্যাসাগরের মানব প্রেমের পরিচয় বিস্তৃত রয়েছে তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত অজস্র কাহিনীগুলোতে। তাঁর গুণমুগ্ধ স্বদেশবাসী তাঁকে আখ্যাত করেছে 'দয়ার সাগর' ও 'করুণা সাগর'রূপে। আত্যন্তিক মানবপ্রেমবশেই অভিমানক্ষুব্ধ হয়ে শেষ জীবনে তিনি বন্ধু ও পরিজনমণ্ডলী ত্যাগ করে কার্মাটারে সরল বিশ্বাসী সাঁওতালগণের মধ্যে বাস করেছিলেন।

প্রাচ্য দেশীয় প্রজ্ঞা, পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদ ও মানবপ্রেম এই ত্রিবেণী ধারার সমন্বয় বিদ্যাসাগরে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সমাজে ও সাহিত্যে যে সমন্বয়ী দৃষ্টি প্রতিফলিত হয়েছে বিদ্যাসাগরের চরিত্রে তাঁর পূর্ণতম প্রকাশ।

বিদ্যাসাগরের প্রধান কীর্তি 'বঙ্গভাষা'। বর্ণ পরিচয় থেকে শুরু করে যতি-চিহ্নের যথাযথ প্রয়োগ এবং সার্থক অনুবাদ কর্মের মধ্য দিয়ে কিভাবে শুষ্ক জড় ভাষার দেহে তিনি প্রাণসঞ্চার করেছিলেন তা আজ কোন ব্যক্তির কাছে অবিদিত নয়। বিদ্যাসাগর মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের মত অবিমিশ্র সাহিত্যসাধনা করার সুযোগ পান নি। সমাজ সংস্কার কর্মের অবসরে চলেছিল তাঁর সাহিত্যসাধনা। তাঁর সাহিত্যিক কর্মকে উপরি পাওনা (by-product) হিসেবে গ্রহণ করলেই তাঁর সাহিত্যিক অবদানের যথার্থ মূল্যায়ণ সম্ভব হবে। তাহলে মৌলিক সৃষ্টির স্বল্পতার জন্য কোন অনুযোগ থাকবে না। সৌন্দর্যের চকিত দর্শনে প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য ভাণ্ডারের পরিচয় যেমন

অনাবৃত হয়ে থাকে বিন্দুতে সিন্ধুর আভাসের মত তাঁর আত্মজীবনীর কয়েকটি পৃষ্ঠা থেকেই তাঁর শিল্পক্ষমতার পরিচয় স্পষ্ট হবে।

এই স্বল্প পরিসরে বিদ্যাসাগরের জীবনের সর্বাঙ্গীণ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। শতাব্দীকাল পারে বসে বিদ্যাসাগরের জীবনী পাঠ করতে বসে অনেক কথা নতুন করে মনে জাগে, শতাব্দীপারের আলোয় তাঁকে নতুন করে দেখলে মনে হয় আমাদের দেখার মধ্যে অনেক ফাঁক আছে। অনুসন্ধানী পাঠক তাঁর জীবনী পাঠের মধ্য দিয়ে এক বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের পরিচয়ই শুধু পাবেন না সদ্য বিলীয়মান কর্মচঞ্চল অতীতের আলোকে নিজেকে নতুন করে দেখতে পাবেন। সম্প্রতি চার খণ্ডে সমগ্র বিদ্যাসাগর রচনাবলী প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়ে এই দেখার সুযোগ ঘটিয়েছেন সাহিত্য ও সংস্কৃতি-প্রেমী দেবকুমার বসু। তিন খণ্ড ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে চতুর্থ খণ্ডটিও যথাসময় প্রকাশিত হবে বলে আশা করছি। বিদ্যাসাগরের রচনাবলী ইতিপূর্বে যাঁরা প্রকাশ করেছেন তাঁরা এমন সামগ্রিক ভাবে তাঁর রচনা প্রকাশ করেছেন বলে আমার জানা নেই। বর্তমান কাঞ্চন-কৌলিন্য যুগে প্রতিপত্তি লাভের সহজ পন্থা পরিহার করে বিদ্যাসাগর রচনাবলী প্রকাশের দ্বারা তিনি 'জাতীয় কর্তব্য পালন' করতে চেয়েছেন। তাঁর এই মহৎ প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত না করে পারছি না। সযত্ন প্রকাশিত এই রচনাবলীর প্রতি সুধীজনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে তাঁরাও কথঞ্চিৎ জাতীয় ঋণ পরিশোধে সমর্থ হবেন বলে মনে করি।

ভোলানাথ ঘোষ

Regd No. C-315 Phone : 23-5155 January '68 (0'50) Central Regd. No. R.N.2602/57 SAMAKALIN

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্র

পঞ্চদশ বর্ষ ॥ মাঘ ১৩৭৪

সমকালীন

পঞ্চদশ বর্ষ ১০ম সংখ্যা

মাঘ তেরশ' চুয়াত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

অসতো মা

সঙ্করণ রায়

রবীন্দ্রনাথের একটা গান আছে :

"তোর ভিতরে জাগিয়া কে যে,
তারে বাঁধনে রাখিলি বাঁধি।
হায় আলোর পিয়াসী সে যে
তাই গুমরি উঠিছে কাঁদি ॥"

মানুষের জীবনে এই আধা-আধির দ্বন্দ্ব এ যুগে যেমন করে অনুভূত হচ্ছে, বোধ করি তেমন করে আগে কখনো হয় নি। আজকের মানুষের বর্ণনায় প্রগতিশীল চিন্তানায়করা এখন যে সব কথা বলছেন তার মূল সুর হল : মানুষ নিঃসঙ্গ অসম্পূর্ণ বহিঃকেন্দ্রিক স্বার্থসন্ধ হৃতমন ছিন্নমূল দিগভ্রান্ত অন্তর্বিরোধী। কোথায় তার শ্রেয় তা সে জানে না। যদি বা জানে সেই শ্রেয়কে উপলব্ধি করবার সামর্থ্য যেন তার নেই। সে দ্বিধাবিভক্ত, বলে, 'যাহা পাই তাহা ভুল করে চাই। যাহা চাই তাহা পাই না।" অপূর্ণতার বেদনায় তার একান্ত আপন গোপন মুহূর্তগুলি উদ্‌ভ্রান্ত। হয় তো সে অনুভব করতে পারে কেন তার এই অপূর্ণতার বেদনা। কিন্তু তবু যেন পূর্ণতার লক্ষ্যপানে চলবার মত শক্তি তার নেই। আত্মিক পঙ্গুতায় সে স্থাবর।

সত্যিই কি তাই? আজকের মানুষের দিকে তাকালে অনেকের কাছেই এমন বর্ণনা অহেতুক নৈরাশ্যব্যঞ্জক বলে মনে হবে। প্রেক্ষাগৃহ আর খেলার মাঠ থেকে বেরিয়ে-আসা কোলাহলমুখর জনস্রোত, সুসজ্জিত দোকানের সুবেশ ভীড়, পথে-ঘাটে হাটে-বাটে রংবাহার হাসির কলোচ্ছ্বাস—এ সব দেখে কে বলবে মানুষ নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণায় কাতর, অপূর্ণতার বেদনায় অধীর?

মদিরোচ্ছল জীবনসুরা পান করে সে তো আনন্দে আবিষ্ট হয়ে আছে।

অবশ্য এ কথা সত্য যে, বিরাট এক অংশ বহু ঐহিক সুখ থেকে বঞ্চিত, দারিদ্র্যের পীড়নে নিষ্পেষিত। কিন্তু তাদের কথা তো সমাজ ভোলে নি। সবার পিছে সবার নীচে যে সর্বহারার দল রয়েছে, তারা ধর্মগুরুর কথকতায় দার্শনিকের চিন্তায় সমাজতাত্ত্বিকের বিশ্লেষণে রাজনীতিকের পরিকল্পনায় অহরহ বিরাজ করছে। বঞ্চিতের দল ওপরতলার দিকে তাকিয়ে আছে লোলুপ আশায়। সেখানকার সোনার তালের দ্যুতি যখন তাদের চোখ ঝলসে দেয়, তখন তারা আশ্বাসবাণী শুনতে পায়, 'ধৈর্য ধরো, তোমাদের জন্যও সমসুখের যোগাড়যন্ত্র চলেছে।' War on poverty-র শ্লোগান তো ঋদ্ধিমান দেশেও আজকাল শোনা যায়। তবে ?

সমাজ যখন আর্থিক সচ্ছলতায় উচ্ছল হয়ে উঠবে, যখন অভাব শব্দটা আর শোনা যাবে না, তখন তো আর সার্বিক সুখের পথে কোন অন্তরায় থাকবে না। এমনি করে সৃষ্ট হয়ে উঠবে বহু সাধের অনেক-পাওয়ার সমাজ। সে সমাজে ধনী দরিদ্রের বৈষম্য থাকবে না, কারণ সকলের জীবনই তখন প্রাচুর্যে ভরে উঠবে। অর্থাৎ, সকলেই টেরেলীন পরবে, পোলাও কালিয়া খাবে, গাড়ি চড়বে, পার্কস্ট্রীট থেকে আনা পালঙ্কে শোবে। স্বপ্ন ও সাধনার মিলন ঘটবে। সুতরাং মানুষ অসম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ ছিন্নমূল ইত্যাদি বর্ণনাগুলি নিছক নৈরাশ্যব্যঞ্জক ছাড়া আর কিছুই নয়।

তা ঠিক যদি সুখ বলতে টেরেলীন পোলাও কালিয়া গাড়ি বাড়ি বোঝায় তবে এগুলো পেলেই মানুষ সুখী হবে সন্দেহ নেই। আজ যারা সেই সুখ থেকে বঞ্চিত একদিন তারাও এগুলো পাবে, সেদিন তারাও সুখীর দলে যোগ দেবে। কিন্তু সমস্যা হল এই 'সুখী' মানুষকে নিয়েই। সে ক্ষ্যাপার মত সুখ খুঁজে বেড়াচ্ছে বাড়ি গাড়ি আসবাবপত্রের মধ্যে, যেন এই বস্তুপুঞ্জের ভিতরে সুখের পরশরতনটি লুকানো আছে। বস্তুমোহই তাকে বহিঃকেন্দ্রিক করে ফেলেছে। ভিতর দুয়ারে কপাট দিয়ে মানুষ নিজেকে পরিপূর্ণরূপে বাহিরের জীব করবার সাধনায় নেমেছে। সারাদিন কোলাহলের মধ্য দিয়ে সে ছুটে চলে দুরন্ত বেগে। যখন অবসর মুহূর্ত এসে পড়ে তখনও নিস্তার নেই, চিরাভ্যস্ত কোলাহল চাই হৈহুল্লোড় চাই। এ যেন নিরন্তর নিজেকে ভুলিয়ে রাখার নিজেকে ভুলে থাকার একটা অদম্য চেষ্টা। বহির্ব্যস্ততা দিয়ে মানুষ কিছু একটা চাপা দিয়ে রাখতে চায় ; যেন কোলাহলহীন নীরবতার মধ্যে নিজের মুখোমুখি দাঁড়াতে সে ভয় পায়। গভীর সমস্যা এই নিজেকে নিয়ে। আপনার reality বা সত্তা তার কাছে বিরাট এক অস্বস্তিকর প্রশ্ন। যখনই সে একা' তখনই মনের গভীরে প্রশ্ন উঠতে থাকে', যা কিছু করছি এর অর্থ কি ? কেন করছি ? কি আমার পরিচয় ?' প্রশ্নের অঙ্কুশ তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে। এটাকে ভুলবার জন্যই তার যত কোলাহলের আয়োজন, যেন কখনো তাকে নিজের সঙ্গে একা থাকতে না হয়। কিন্তু রাত্রি তো আসবেই, কোলাহল তো নীরব হবেই। তখনকার সেই নির্জন নৈঃশব্দ্যে আত্মজিজ্ঞাসা অধীর হয়ে ওঠে আর তার অতন্দ্র মুহূর্তগুলিকে দুঃসহ করে তোলে। তখন তার দরকার ঘুমের ঘুমের ওষুধ। কিন্তু কেন ?

মানুষ যখন জন্মায় সে একটা biological existence বা জৈবিক অস্তিত্ব পায়, যেমন পায়,

জন্তুজানোয়ারেরা। এই অস্তিত্বের অর্থ হল খাওয়াপরাথাকার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে চেতনা। জন্তুর মধ্যেও এই চেতনা বর্তমান। কিন্তু জন্তুর সঙ্গে মানুষের তফাৎ হল খাওয়া-পরা-থাকার ব্যাপারে তার স্বাধীনতা। জন্তুকে প্রকৃতির উপর পুরোপুরি নির্ভর করতে হয়। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য। প্রকৃতিকে বশে এনে মানুষ এই পরনির্ভরতার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে। সে আত্মনির্ভর হতে শিখেছে। সে অস্ত্র তৈরি করেছে শত্রু নিপাতের জন্য। আগুনকে সে কাজে লাগিয়েছে। উৎপাদনের পথ আবিষ্কার করেছে দেহমনের চাহিদা মেটাতে। ভাষা সৃষ্টি করেছে যাতে একের অভিজ্ঞতা অন্যের কাজে লাগে। এই স্বাধীনতা মানুষ অর্জন করেছে তার বুদ্ধিবৃত্তির প্রভাবে। বুদ্ধির প্রণোদনাতেই খাওয়া-পরা-থাকার সমস্যাকে সে ভাল খাওয়া ভাল পরা ভাল থাকার সমস্যায় উন্নীত করেছে। সে মোর্‌গ্‌-মসল্লাম রাঁধে রসনার তৃপ্তির জন্য, টেরেলীনের পোশাক পরে সুন্দর দেখাবার জন্য, বাড়ি তৈরি করে থাকবার আরামের জন্য। বুদ্ধি তাকে এগিয়ে নিয়ে চলে ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার মধ্যে নিশ্চয়তার আশ্বাস জাগাতে। বুদ্ধিই তার সভ্যতার পথপ্রদর্শক।

খাওয়া-পরা-থাকা ব্যাপ্যারটা জৈবিক অস্তিত্বের প্রয়োজন মেটায়। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রয়োজন। কিন্তু এই প্রয়োজনের সীমা কতদূর? কোন সীমা আছে কি? সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জৈবিক প্রয়োজনের সীমারেখাও বিস্তৃত হতে থাকে। শুধু দেহরক্ষার জন্যেই যদি খাওয়ার দরকার হত, তাহলে পৃথিবী জোড়া এত হোটেল রেষ্টুরেণ্টের আবির্ভাব ঘটত না। আমরা খেতে চাই, ভালো খেতে চাই, ভালোতর খেতে চাই। ধরা যাক প্লেটো-সক্রেটিসের যুগ। সে যুগে "The diet was monotonous and anything but sumptuous, consisting of typically barley cakes, dried fish and watered wine." আজকের দিনে নিমন্ত্রণ সভায় কেউ যদি এই খাবার পরিবেশন করে সমাজে তার মুখ দেখাবার জো থাকবে না। অথচ এই খেয়েই সে যুগের নিমন্ত্রিতেরা খুশি হতেন। এই খেয়েই সে যুগের মানুষেরা বেঁচে ছিল। এই খেয়েই চিন্তানায়কেরা এথেন্সের স্বর্ণযুগ সৃষ্টি করেছিলেন। সুতরাং খাওয়া-পরা-থাকার ব্যাপারটা যদি কেবল বেঁচে থাকার প্রশ্নই হত তাহলে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য এত বিলাসবহুল বৈচিত্র্য বাহুল্য মনে করা হত। আসল কথা, জৈবিক প্রয়োজনটার সঙ্গে মানুষের মন জুড়ে দিয়েছে 'ভাল' শব্দটা। ভাল খাব, ভাল পরব, ভাল থাকব।

'ভাল' শব্দটা value judgment-র প্রতীক। ওটা মূল্যায়ন ক্রিয়াকে বোঝায়। ফুলকে ফুল বললে কোন মতদ্বৈধ হবার কথা নয়। কিন্তু ফুলটা সুন্দর কিনা, কতটা সুন্দর, তার গন্ধ মনমাতান কি না—এধরণের প্রশ্নে মতদ্বৈধ হবার সম্ভাবনা আছে। কারণ এগুলো value judgment—মূল্যায়ন-প্রসূত মতামত। মূল্যায়ন করার ভার মনের উপর। মন বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে বলে—এটা ভাল, এটা নাও। মন বলে, একটা গাড়ি চাই, নইলে সমাজে ঠিক পাত পাওয়া যাচ্ছে না। মনই বলে, দেখ দেখ ওই লোকটাকে, কত সুখী ও; আর আমি?

মনের সংজ্ঞা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। দর্শন-মনস্তত্ত্বের বিচারবিশ্লেষণের গোলকধাঁধায় মনের ঠিকানা বার করা কঠিন। বরং কবির সহজ দৃষ্টি মন সম্বন্ধে ধারণা সহজভাবে ধরা দেয়। কবি যখন বলেন, 'মন মোর মেঘের সঙ্গী,' তখন আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না মন কি। সহজ অর্থে

যদি মনকে গ্রহণ করি তাহলে মন বলতে বোঝায় এমন একটা চেতনাশক্তি যা আমাদের অস্তি-বোধকে জাগায়, আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে সচেতন করে, ভাল-মন্দের দ্বন্দ্বে আমাদের নাড়া দেয়—যা আমাদের ইচ্ছাকে প্রয়াসকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে পরিচালিত করে। মন মেঘের সঙ্গী, ঢেউএর সাথী, আগুনের সখা। সে স্বর্গ-নরক দেবতা-অসুরের স্রষ্টা। মন একাধারে জৈবিক ও অজৈবিক; মৃত্যুকে ভয় করে আবার মৃত্যুকে জয় করে। তার বুকে অন্ধকারে কান্না, অমৃতত্বের প্রার্থনা।

যে-মেয়েটি মোটা হয়ে যাচ্ছে বলে খাওয়ার প্রবৃত্তিকে সংহত করে রাখে, মুখরোচক পদার্থ সামনে এলেও লোভ সামলায়, সে-মেয়েটি তার মনের নির্দেশেই চলেছে। সুতরাং 'ভাল খাওয়া'-র তার মনের কাছে অন্য দশজনের থেকে আলাদা। জৈবিক প্রবৃত্তিকে সে নিয়ন্ত্রিত করছে এক উচ্চতর (অন্তত তার কাছে) আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তির জন্য। সে তন্বী থাকতে চায়। যদি তার 'বিশ্বসুন্দরী' প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার বাসনা থাকে, তাহলে আরো কত রকমে সে নিজেকে নানা সুখ থেকে বঞ্চিত করে দেহসৌষ্ঠব গ'ড়ে তুলবে আপন অভীষ্ট সাধনের জন্য। তার মনের কাছে ওই 'বিশ্বসুন্দরী' হওয়ার লক্ষ্যটাই সবচেয়ে বড়; সেই লক্ষ্যলাভের জন্য সবরকম জৈবিক কষ্ট স্বীকার করতে সে রাজি। মনের কাজ হল এটাই। একটা লক্ষ্য স্থির করা এবং সমস্ত প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের পানে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

লক্ষ্য হল উদ্দেশ্যবোধক। লক্ষ্যে পৌছলে উদ্দেশ্য সাধিত হবে। অর্জুন লক্ষ্যভেদ করলেন—উদ্দেশ্য দ্রৌপদী লাভ। মানব জীবনে উদ্দেশ্যের একটা বিশিষ্ট অর্থ এবং প্রয়োজনীয়তা আছে।

একটা না একটা কিছু হয়ে-ওঠার অমিত সম্ভাবনা নিয়ে মানুষ জন্মায়। তার ভবিষ্যৎ তারই হাতে, কেমন করে সে তাকে মূর্ত করে তুলবে তার উপর নির্ভর করবে তার জীবনবোধের সার্থকতা। সার্ত্রে বলছেন :

"...there is a future to be fashioned, a virgin future that awaits him."

এই সম্ভাবনার সম্মান একমাত্র মানুষেরই। একটা শেয়াল নিশ্চয়ই ভেবে ভেবে সারা হয় না সে ডাক্তার হবে কি ইঞ্জিনীয়ার হবে কি অধ্যাপক হবে; সে নিশ্চয়ই ভাবতে বসে না তার সাধু হওয়া উচিত না অসাধু। সম্ভাবনার দ্বন্দ্ব একমাত্র মানুষের মনেই। ধরা যাক' উপরি-উক্ত যুবতীটির সামনে দুটি সম্ভাবনা আছে—সে ডাক্তারী পরে অপরের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারে, কিংবা বিশ্বসুন্দরী হয়ে পৃথিবীময় আপন দেহসৌষ্ঠব দেখিয়ে লোকের নয়নরঞ্জন করে বেড়াতে পারে। যে-সম্ভাবনাকে যুবতীটি গ্রহণ করবে, সেটাই হবে জীবনের লক্ষ্য—আর সেই লক্ষ্যে পৌছনই তখন তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, তার সার্থকতা বোধের উৎস। সে নিজেকে সার্থক মনে করবে যখন তার উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

আর-একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। একটা নৌকাডুবি হল। একজন সাঁতরে পারে উঠল, নিজের জীবন বাঁচাল। আর-একজন একটি ডুবন্ত যাত্রীকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের জীবন বিসর্জন দিল। এদের দুজনার সামনেই সম্ভাবনার দ্বন্দ্ব। যে পরকে বাঁচাতে গিয়ে মরল, সে ইচ্ছে করলে অপরজনের মত নিজেকে রক্ষা-করতে পারত। কিন্তু তার মন সেই আত্মরক্ষায় সম্ভাবনাকে নাকচ

করে অপার সম্ভাবনাকেই শ্রেয় বলে গ্রহণ করল। তখন তার মন সমস্ত প্রবৃত্তি ও প্রয়াসকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে নিয়ে গেল। এই লক্ষ্য লাভটাই তার জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াল। আর সেই উদ্দেশ্য সাধন হতেই উৎসারিত হল তার সার্থকতা বোধ।

কোন পথে সার্থকতাবোধ উপলব্ধি করা যাবে, মন তাই খুঁজে ফেরে। মানুষ যদি কেবলমাত্র জান্তব প্রাণী হত, যদি শুধু জৈবিক অস্তিত্বের মোহই তার পথপ্রদর্শক হত, তাহলে কেবল বেঁচে থাকার মধ্যেই সে সার্থকতার সন্ধান পেত। কিন্তু জৈবিক জন্তু মাত্র নয় বলেই তার মন খোঁজে কোথায় তার অন্তুতর সার্থকতা, বিচার করে কোন সম্ভাবনার মধ্যে তার পরিপূর্ণতার বীজ উপ্ত আছে। এই অন্বেষণ এই বিচার—এটা হল মানবমনের ধর্ম। এই ধর্ম থেকে যখন সে বিচ্যুত হয়, তখন স্বধর্ম হননের গ্লানি তাকে স্পর্শ করে।

কিন্তু মন তো আর শূন্যে আত্মপ্রকাশ করে না। আন্তর্ব্যক্তিক সম্বন্ধের মধ্য দিয়েই তার বিকাশ। আন্তর্ব্যক্তিক সম্বন্ধ রূপ নেয় সমাজে। তাই মনের প্রকাশ এবং বিচরণ সমাজের বুকেই। সাধারণতঃ মনের মাঝে দুটি প্রবণতা দেখা যায় : প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে প্রচলিত মূল্যবোধকে স্বীকার করে নেওয়া এবং সেই স্বীকৃতি অনুসারে আপন সম্ভাবনাকে বেছে নেওয়া ; কিংবা, প্রচলিত সমাজব্যবস্থা এবং মূল্যবোধকে অস্বীকার করে নূতন সম্ভাবনার জন্য সাধনা করা। এই দুই ধারার সংঘর্ষ যেমন বৃহত্তর ক্ষেত্রে সমাজের বুকে ঘটে থাকে, তেমনি আবার ব্যক্তি মানুষের জীবনেও ঘটে। সমাজ প্রত্যেক মানুষের সামনেই একটা লক্ষ্য ধরে দেয়—তুমি অমন হবে। আমি, এমন হবো। তুমি আমি সেভাবে গড়ে উঠতে পারি, আবার বিদ্রোহও করতে পারি। সমারসেট মম-এর একটা গল্প মনে পড়ে। বাবা লক্ষপতি ব্যবসায়ী, তাঁর ইচ্ছে ছেলে ব্যবসায় যোগ দিক। ছেলে চায় সঙ্গীতসাধনায় আত্মনিয়োগ করতে। বাবার কাছে সঙ্গীতসাধনা ব্যাপারটা একেবারেই হাস্যকর। ছেলে যদি পিতৃনির্দিষ্ট সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নেয় তাহলে ব্যবসায়ী হয়ে ওঠার মধ্যে সে তার সার্থকতা খুজে পাবে। কিন্তু ছেলেটি এই সম্ভাবনাকে অস্বীকার করল। এখানেই তার বিদ্রোহ। নূতন সার্থকতাবোধে সে জীবনকে উদ্বুদ্ধ করতে চাইল। স্বনির্দিষ্ট সার্থকতাবোধের উপলব্ধি যদি সম্ভব না হয়, তবে জীবনটাই তার কাছে অর্থহীন মূল্যহীন বলে মনে হয়। অমন করে মৃত হয়ে বেঁচে থাকার চাইতে মৃত্যুও তার কাছে শ্রেয় বলে গৃহীত হল। সাধারণ ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রচলিত সমাজব্যবস্থা যে সম্ভাবনাকে শ্রেয় বলে জাহির করে, মানুষ সেটাকেই গ্রহণ করে, তাকে মূর্ত করে সে নিজেকে সার্থক মনে করে।

বর্তমান সমাজকে ভোগবাদী বা consumptionist বলা হয়। ভোগবাদী সমাজ ব্যবস্থা যে সার্থকতাবোধকে বড় বলে স্বীকার করে প্রচার করে তার মূল কথা হল, ভোগ করো, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। জৈবিক অস্তিত্বই এই জীবনবাদের কাছে একমাত্র সত্য—খাও দাও নৃত্য করো মনের আনন্দে। ভালো খাও ভালো থাকো ভালো পড়ো। তাই বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার যেটা আদর্শ, সেটা হল High standard of living, high standard of living বলতে বোঝায় গাড়ি বাড়ি আসবাবপত্র রকমারী পোশাক খাবার দাবার স্ফূর্তির উপায়। পত্রপত্রিকার পাতায় পাতায় বিজ্ঞাপনের বাহার, কেমন করে জীবনযাত্রার মান উঁচু করা যায় তার মনোহরণ নির্দেশ। জেট

যদি এই নির্দেশ না মানে, সে উপেক্ষা উপহাসের পাত্র হয়ে দাঁড়ায়।

মানুষ স্বীকৃতি চায়। কারণ স্বীকৃতির মাধ্যমেই সে দশের সঙ্গে যুক্ত হয়। একঘরে হওয়ার ব্যাপারটা মানুষের কাছে ভয়াবহ কারণ সে তখন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। তাই সমাজব্যবস্থায় যে-আদর্শ বড়ো বলে পরিগণিত হয় স্বভাবত মানুষ তাকেই অনুসরণ করে। দশজন যেটার পিছনে ছোটে সেও তার পিছনে ছুটতে থাকে। দশজন যদি সোনার হরিণ চাই বলে চিৎকার শুরু করে, সেও গলা মেলায়। নইলে সে সঙ্গছাড়া হয়ে পড়বে। তাকে কিম্ভূতকিমাকার অদ্ভুত জীব বলে পরিহার করা হবে। ইয়োনেস্‌কোর 'Rhinoceros' নাটকে যেমন সকলেই একে-একে দলে দলে গণ্ডার হয়ে উঠবার জন্য উদ্‌গ্রীব হল, তেমনি করে আমরাও সকলে status-seeker বা one-dimensional man হয়ে উঠবার জন্য লালায়িত। কেউ যদি আলাদা হতে চায়, অদ্ভুত জীব বলে পরিগণিত হতে চায় তবে তাদের ক্ষমা নেই। অবশ্য তারা যদি মহামানবত্ব লাভ করেন তাহলে আলাদা কথা। তখন তাদের মাথায় তুলে রাখব, ধূপধুনো দিয়ে পুজো করব, তাদের বাণী নিয়ে দিস্তে দিস্তে বই লিখব। কিন্তু তাঁদের জীবনযাত্রার আদর্শ নিজের জীবনে অনুসরণ করবার কথা উঠলে হেসে ফেলব। সত্যি কথাই তো। গান্ধীজী হাঁটু-কাপড় পরতেন। কিন্তু আমি তুমি হাঁটু কাপড় পরে অফিসে গেলে লোকে যদি অট্টহাস্য শুরু করে কে আর দোষ দেবে তাদের!

মহামানবরা বলে গেছেন জৈবিক অস্তিত্বের প্রয়োজন অল্পেই মেটানো চলে। সে প্রয়োজনটাকে যদি কেবলি বাড়িয়ে চলো তাহলে বস্তুভারে তুমি নুয়ে পড়বে, নিজেই ক্রমশ বস্তুভূত হয়ে পড়বে। এমনি করে হারিয়ে যাবে তোমার মানবিক পরিচয়। ভোগবাদী সমাজের দিকে তাকালে বোঝা যায় কথাটা কত সত্য। এই সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের পরিচয় কি? শুধু একটিমাত্র পরিচয়—মানুষ ভোগী যার কাছে একমাত্র ভোগ্যবস্তুই মূল্যবান। বস্তু চাই বস্তু চাই—চারিদিকে শুধু এই রব। তাও আবার সব বস্তুই নয়। যে-বস্তুর 'utility' আছে। যেটার কোনো uility নেই সেটা পরিহার্য। বস্তুত এই উপযোগিতার ধারণা দিয়েই আমাদের আন্তর্ব্যক্তিক সম্বন্ধও নির্নীত হয়। যে-মানুষের কোনো utility নেই তার কদর থাকে না। মানুষের দিকে যখন তাকাই, তখন ভাবি সে আমার কতটা কাজে লাগবে কতটা প্রয়োজনের ক্ষুধা মেটাবে। আমার কাছে তার মূল্যও সেই পরিমাণে বাড়বে কমবে। এই 'বস্তু'বাদী দৃষ্টিভঙ্গীর কাছে মানবিক পরিচয়ের কি কোনো অর্থ থাকতে পারে। মানুষের মূল্য তার মনুষ্যত্বে নয়, তার প্রয়োজন সাধনে। ভোগবাদী সমাজে মানুষ তাই means to an ends, এক আর একজনের অভীষ্ট সাধনের উপায়মাত্র।

মানবিক পরিচয় কি? আমরা বলি মানুষের আত্মা আছে, মানুষ অমৃতের পুত্র। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আত্মার কাজ আত্মীয়তা করা।' আত্মা হল মানুষের সেই শক্তি যা একজনকে অপরের সঙ্গে যুক্ত করে। তার প্রার্থনা—'যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে'। সে দূরকে নিকট করে, পরকে ভাই করে। আত্মীয়তা সৃষ্টি করবার ক্ষমতা আছে বলেই মানুষ মানুষ। ওই শক্তির বিকাশেই তার মানবিক পরিচয়। ভোগবাদী সমাজ ব্যবস্থায় ওই শক্তিবিকাশের কোনো সম্ভাবনা আছে কি?

মানুষ ভোগ্যপণ্যের জন্ম আকুলি বিকুলি করছে। তার কারণ জীবনধারণের প্রয়োজন বলে ততটা নয় যতটা ভোগ্যপণ্যের সম্মানসূচক পদমর্যাদা। যার যত ভোগ্যপণ্য, সমাজে তার আসন তত উঁচুতে। সমাজে স্বীকৃতি পেতে হলে, উঁচু স্তরে আসন লাভ করতে হলে মানুষকে ভোগ্যপণ্যের পিছনে ছুটতেই হবে। যে ট্রামে করে ঘুরে বেড়ায় তার চেয়ে গাড়ি চড়ে যে বেড়ায় তার কদর বেশি। 'উচ্চে ওঠার দুরাশা' যার নেই, বর্তমান যুগের মানদণ্ডে সে অচল। তার না আছে 'drive', না আছে 'ambition'। প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাজারে সে অকেজো ফেলনা। কে চায় এমন করে ফেলনা হয়ে থাকতে? তাই সকলেই high standard of living এর সম্বন্ধে তৎপর। কিন্তু জীবনযাত্রার মান বাড়াতে হলে, বস্তু-আহরণের বাসনা সফল করতে হলে, চাই টাকা। তাই সোনার হরিণের পিছনে উদয়াস্ত ছোটা। প্রত্যেকেই ছুটছে। কিন্তু সকলেই তো আর সমানভাবে পায় না বা পাবেওনা। সুতরাং পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালায় কে কত বেশি পেতে পারে। যেখানে অবিশ্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা সেখানে মানসিক শান্তি পারস্পরিক নির্ভরতা-বিশ্বাস কখনো গড়ে উঠতে পারে না। একেই বলে gladiatorial existence, আমরা যাকে জীবনসংগ্রাম বলে থাকি। পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে যাও, যে জিতবে সৌভাগ্যলক্ষ্মী তার গলায় সোনার মালা পরিয়ে দেবে। যে জেতে তার মুখে হাসি, নূতন উদ্যমে নূতন করে সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু করে। যে হারে তার জীবন অন্ধকার। সমাজ তার পিঠ চাপড়ে বলবে 'Better luck next time.' কিন্তু মানুষের মাঝে দুটো ভাগ হয়ে গেলো। একদল বিজয়ী, একদল বিজিত। যারা হারল, তাদের মনে নিরাশা ক্রোধ ঈর্ষা—সুযোগ পেলেই তারা প্রতিশোধ নেবে, সুযোগ না পেলে গুমরে গুমরে মরবে। যারা জিতল' তারা উচ্চাশার তাড়নায় অস্থির উন্মত্ত—বিজিতের প্রতি উদার অবহেলা, অথচ মনে মনে ভয় তাদেরকেও একদিন হয় তো হারের দলে পড়তে হতে পারে। সফলতার পিছনে নিষ্ফলতার ভ্রূকুটি। দুদলই কিন্তু অসুখী। যে হারে তার না-পাওয়ার অশান্তি, যে জেতে তার আরো চাওয়ার অতৃপ্তি।

এমন পরিস্থিতিতে সত্যিকারের আত্মীয়তা সৃষ্টি করার সম্ভাবনা কোথায়? অনেকে বলে আত্মা বলে কিছু নেই। কথাটা নেহাৎ মিথ্যে নয়। আত্মীয়তা সৃষ্টি করবার ক্ষমতাই যদি না রইল, তবে আত্মাই বা থাকবে কেমন করে? প্রতিদ্বতার অঙ্কুশে সবাই জর্জরিত। স্বার্থসন্ধ কামনার কাছে অপরের চিন্তা মূল্যহীন। নিজে বাঁচলে বাপের নাম। ভোগ দর্শনের এটাই হল মূল সুর।

ভোগ শব্দটার কেন্দ্র কথা হল 'আমি'। অন্য কেউ ভোগ করছে, আমি দাঁড়িয়ে দেখছি—ভোগের অর্থ তা নয়। ভোগের শুরু আমাকে দিয়েই, শেষ আমাকে নিয়েই। ভোগলিপ্সু যযাতির মত, ছেলের বার্ধক্যর কথা ভাবে না, নিজের যৌবন ফিরে পাওয়াটাই প্রধান। প্রকৃতপক্ষে অপরের কথা চিন্তা করা সত্যিকারের সুখভোগের অন্তরায়। কথাটা নির্জলা স্বার্থপরতার মতো শোনায় বটে, শুনতে ভালো লাগে না। কিন্তু সত্য। মন যে পরিমাণ অপর ধর্মী হয়ে ওঠে সেই পরিমাণে তাকে আপন ভোগ ছাড়তে হয়। আমি যদি 'দুটি খেতে দাও বাবা' শুনে বেদনা পাই, তবে আমার থালাভরা অন্ন মুখে রুচবে না। অথচ আত্মীয়তার প্রধান প্রয়োজন হল অপরের কথাটা

আগে ভাবা।

জৈবিক অস্তিত্ব ও আত্মিক সত্তার মধ্যে প্রভেদ এই যে, জৈবিক অস্তিত্ব নিজেকে নিয়ে মত্ত, আত্মিক সত্তা দশের মধ্য দিয়ে নিজেকে সৃষ্টি করে। মানুষ জৈবিক অস্তিত্ব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু আত্মাকে তার সৃষ্টি করতে হয়। এই আত্মসৃষ্টির সম্ভাবনার মধ্যেই মানুষের যথার্থ মানবিক পরিচয়। ভোগবাদী সমাজের বাসিন্দা হয়ে আছি বলে প্রতিদিনের কর্মসূচী এমন কুহেলী রচনা করে রাখে যে, ওই সম্ভাবনার আভাস দেখতে পাই না। তাই আমরা বেঁচে থাকি বটে কিন্তু সত্তাবান হইয়া উঠতে পারি না। এই সত্তাহীনতাই আমাদের অপূর্ণতার বেদনা। আমরা মানুষ হয়েও মানুষ হয়ে উঠতে পারিনি। সংকীর্ণতার অচলায়তন ভেঙে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে যুক্ত হতে চাই কিন্তু পেরে উঠি না। মানুষ সমাজ সৃষ্টি করেছে একই সঙ্গে চলবে বলে; কিন্তু সেই সঙ্গে সমাজই আবার তার আত্মসৃষ্টির শক্তিকে পঙ্গু করে রেখেছে। এটাই মানুষের অন্তর্বিরোধিতা। তাই ভয়, তাই সংশয় অবিশ্বাস সংকীর্ণতা পরশ্রীকাতরতা। তাই স্বজনবন্ধু পরিবৃত হয়েও সে একা।

এই মানবিক ব্যর্থতাকে নানারকম বস্তু দিয়ে নানারকম বহিরানুষ্ঠান দিয়ে কেবলি চেপে রাখবার চেষ্টা চলে। কিন্তু মনের গভীরে মানুষ হয়ে উঠবার যে অন্তরতম আকাঙ্ক্ষা মাঝে মাঝে কেঁদে কেঁদে ওঠে, তার ব্যর্থতার বেদনা কেমন করে মুছে ফেলি! আমাদের সমাজব্যবস্থা বহির্মুখীনতাকে বিশেষ করে প্রশ্রয় দেয়, কারণ অন্তরে মনমেলানো সুর কেমন করে জাগাতে হয় তা জানা নেই। তাই বাহিরের দিক থেকে মানুষে মানুষে যোগাযোগ স্থাপনে কত আনুষ্ঠানিক আয়োজন, রীতিনীতির কড়াকড়ি। আমরা ভাবি রাখিডোর বাঁধলে ভ্রাতৃভাব জেগে উঠবে। আমরা ভাবি নববর্ষে ছাপান রংবাহার কার্ড পাঠালেই শুভেচ্ছা সত্য হয়ে উঠবে। মনে প্রীতি থাক না থাক রাখি বাঁধবো; কার্ড পাঠাবো। নইলে সমাজের তিরস্কার-দৃষ্টি অনাচারীর উপর পড়বেই পড়বে। কিন্তু এ সব তো ভস্মে ঘি ঢালা। ব্যবহারিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে যোগাযোগের সৃষ্টি হয়, তার সার্থকতা ব্যবহারিক জীবনের গণ্ডী পেরিয়ে যেতে পারে না। সে যোগাযোগ কখনো প্রাণস্পর্শে উজ্জীবিত হয়ে উঠতে পারে না। তার সাহায্যে মানুষ কখনো মন-মেলানো আনন্দের সক্রিয় অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে না। বার্ট্রাণ্ড রাসেল যথার্থই বলেছেন:

"By this means an external harmony of man with man is established, but it will not be a stable harmony until men have achieved a genuine harmony within themselves, and have ceased to regard a part of themselves as an enemy to be vanquished." যে genuine harmonyর কথা তিনি বলেছেন তার উৎস অন্তরে, জৈবিক অস্তিত্বের রূপান্তরে তোমার-আমার আত্মীয়তায় আমাদের মানবিক পরিচয়ে। মানুষ যেদিন এই genuine harmonyর সন্ধান পাবে সেদিন সে প্রকৃত মানবত্বের দিকে যাত্রা শুরু করবে। সেদিনই তাকে যথার্থ মানুষ বলা চলবে। এই হল আত্মবিকাশের জন্য আত্মক্রান্তির সাধনা।

সেদিন কি আসবে? আসবে বলেই তো বিশ্বাস। যুগ যুগ ধরে মানুষ আশা করে আসছে সে এক নূতন মানবিক সমাজ গড়ে তুলবে। যদি মানুষই না জন্মাল তবে সে সমাজের সম্ভাবনা কোথায়? আর জৈবিক মানুষটার মৃত্যু না ঘটলে আত্মিক মানুষের জন্মই বা হবে কেমন করে?

বহুদিন সঞ্চিত আশা মানুষ অমৃতত্ব লাভ করবে। অমৃতত্বের অর্থ এই নয় যে, মৃত্যু তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। সত্তাহীনতাই তো তার মৃত্যু। সে তো বেঁচে আছে শুধু জৈবিক অর্থে।

মানুষ কেমন করে এই প্রতিদিনের মরে-থাকার হাত থেকে মুক্তি পাবে? কোন পথে তার মুক্তি? 'দুর্গং পথস্তৎ'—কঠিন সেই পথ। সে পথের ইঙ্গিত দিয়ে বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন:

"The road to it is the same as that recomended to the man who wanted to found a new religion : Be crucified and rise again on the third day." সত্যিকারের বাঁচার পথ মৃত্যুর তোরণদ্বার দিয়েই। প্রত্যহ মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া, জৈবিক জীবনের খণ্ডতা বিচ্ছিন্নতা সংকীর্ণতা লোভকাতর সংশয় ভয়-ঈর্ষা অনাত্মতার মৃত্যু। সেই মৃত্যুর বুকে দাঁড়িয়েই বিদ্রোহী মানুষ তখন ইউজীন ও নীলের ল্যাজারাসের মত বলতে পারবে 'there is no death'। এমনি করেই নবজন্মের সূচনা, এমনি করেই শুরু হবে আত্মিক জীবনের।

বার বার মানুষ হার মানে নিজের কাছে, তবু হার স্বীকার করতে পারে না। বার বার হার মানা মানুষটির অন্তরতম প্রার্থনা হল: অসতো মা সদ্‌গময়। দূর হোক অসত্তা, যাত্রা শুরু হোক সত্তার পানে। আমি মৃত্যু-স্পৃষ্ট, অমৃতের সন্ধান দাও আমাকে। আমার জৈবিক অস্তিত্ব অনাত্মতার অন্ধকারে ঢাকা, আমি আত্মিক সত্তার আলোয় প্রকাশিত হতে চাই।

সত্তাহীন মানুষের এই সত্তাবোধের আকুতি, মুমূর্ষু মানুষের এই মৃত্যুঞ্জয়ী জীবনের তৃষ্ণা—আরো গভীর হোক নিবিড় হোক, আরো মর্মস্পর্শী হোক।

ইতিহাসের নিয়ম ঃ উত্থান-পতন ও কয়েকটি কথা

নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত

ইস্কাইলাসের বা নিউ টেস্টামেন্টে একটি সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ, জ্ঞানগর্ভ, দার্শনিক আলোচনা অধ্যাত্মবাদের উত্তুঙ্গে অবস্থিত ধর্ম-বিশ্বাসী জনসাধারণের মনকে বিশেষভাবে নাড়া দিতে পারে। হয়ত এর মধ্যে কিছুটা সত্য নিহিত আছে, কিন্তু সেই সত্যকে একমাত্র ধ্রুব ভেবে চুপ করে বসে থাকা মূর্খতার পরিচায়ক।' নিশ্চিত পতনের হাত থেকে রোম সাম্রাজ্যকে রক্ষা করা দুঃসাধ্য না হলেও একেবারে সহজসাধ্য ছিল না। কারণ বিশাল রোম সাম্রাজ্য যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল সেখানে পতন ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। তবু ইতিহাস দ্বারা নিউটেস্টামেন্টের উক্তি কতদূর সমর্থিত সে প্রশ্ন থেকেই যায়। একটি সাম্রাজ্যের পতনে কোন দার্শনিকের চিত্ত অক্ষত থাকতে পারে বা সামান্য দুঃখের কারণ হতে পারে, কিন্তু ইতিহাসের মানদণ্ডে একটি সাম্রাজ্যের পতন বিরাট ঘটনা। ক্রীতদাস শ্রেণীর ওপর অকথ্য অত্যাচার এবং জনসাধারণের অসহ্য জীবন যাত্রার মধ্যেই রোমান সাম্রাজ্যের পতনের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। জনগণের বক্তব্য ও দাবীকে মেনে নেওয়ার অক্ষমতা, একনায়কত্ব এবং অত্যাচারী মনোভাব রোমান সম্রাটকে দ্রুত পতনের দিকে নিক্ষিপ্ত করেছিল। মধ্যযুগে, রাজার কর্তৃত্ব এবং জনগণের ক্ষমতা সম্পর্কে, মরগিসলিও বা অলথুসিআস উল্লিখিত তত্ত্বে গণতন্ত্রের সমর্থন পাওয়া যায়। সার্বভৌম ক্ষমতায় স্বীকৃতি যদিও উপরিউক্ত লেখকদ্বয়ের রচনায় পাওয়া যায় তবু রুশোর সার্বভৌম ক্ষমতার স্বীকৃতি সম্পর্কিত মতবাদই বলিষ্ঠ। কিন্তু রোম সাম্রাজ্যের পতন শুধু সার্বভৌম ক্ষমতার অভাবে হয়েছিল এমন যুক্তি বিশ্বাসযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য নয়। সভ্যতা এবং সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন বিশ্বজনীন সত্য। রোম সাম্রাজ্যের, যে কারণেই হোক, যেমন পতন হয়েছিল তেমনি রোম সাম্রাজ্য গড়ে ওঠার বহু বহু বৎসর আগে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবরা ধ্বংস হয়েছিল ন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে গিয়ে। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ যা বলেছেন তাকে যদি বিশ্লেষণ করা যায় তবে একটি সাম্রাজ্যের পতন সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে ন্যায় এবং অন্যায়ের সংঘাতেই উত্থান পতন সংঘটিত হয়।

ইতিহাসের পৃষ্ঠা পর্যালোচনা করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, উত্থান এবং পতনের চক্রাবর্ত আবর্তনে সুগঠিত অনেক দেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি, বহু মূল্যবান জীবন ধ্বংসের হাত থেকে নিস্কৃতি পায়নি। শুধুমাত্র রোম সাম্রাজ্যের পতন বা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাহিনীই পৃথিবীর ইতিহাসের একমাত্র ঘটনা নয়, দিনান্তে অনেক সভ্যতাই ধ্বসে পড়েছে।

ইতিহাস সম্পর্কে টোয়েনবি, কার, ওয়েলস এমনকি রবীন্দ্রনাথ কি মত পোষণ করেন সে সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা প্রয়োজন। অন্যান্য মনীষীদের মন্তব্যের আলোকে বাদ প্রতিবাদ করার সুবিধা থাকলেও এ কথা মেনে নিতে হয় যে, ইতিহাসের পঠন পাঠন শুধুমাত্র একটি কালের মধ্যে সীমায়িত না করে, বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র ইতিহাস, যদিও ইতিহাস বিচ্ছিন্ন নয়, সৃষ্টি করে ইতিহাস পাঠের চেষ্টা করা হয় তবে তাকে অপচেষ্টা বা ইতিহাসের খণ্ডিত জ্ঞানাংশ আহরণে ব্যর্থ চেষ্টা ছাড়া আর কি

আখ্যা দেওয়া যেতে পারে ? যদিও ইতিহাস অধ্যয়নের প্রতিবাদে টোয়েনবি ও রবীন্দ্রনাথ তাঁদের যে বলিষ্ঠ মন্তব্য স্থাপন করেছেন তা স্মর্তব্য। ওয়েলসের বিশ্ব ইতিহাস রচনায় প্রয়াস নিন্দিত হলেও তা নন্দিত হয়েছিল, আর এই অভিনন্দনে ইতিহাস সম্পর্কে ব্যাপক এবং নতুন উদ্ভাসিত চিন্তার প্রচ্ছায়া পরিলক্ষিত। কিন্তু ইতিহাস ব্যাপক হোক বা খণ্ডিত হোক সভ্যতার উত্থান হলে পতন অবশ্যম্ভাবী কিনা তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। কোন ঐতিহাসিক এই মত পোষণ করেন যে ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে যেদিন সভ্যতা শীর্ষবিন্দুতে পৌছেও আরও উন্নত হওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। তাঁদের মতে, সভ্যতা উন্নতির চরম শিখরে পৌছানোর পর আস্তে আস্তে ক্ষয় হতে থাকে এবং কিছুকাল পরে দ্রুত, সম্পূর্ণভাবে, ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

উত্থান পতন বলতে কি বুঝি এ প্রশ্ন উঠতে পারে। ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক, ও দার্শনিক দৃষ্টিভংগীতে বিচার করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে উত্থান-পতন শুধুমাত্র ইতিহাসের নয়—কালেরও নয়। একটি বিশেষ অবস্থার উত্থান বা পতন, যদিও তা কোন বিশেষ কালের গর্ভেই সংগঠিত, হতে পারে এবং তা ইতিহাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রশ্ন উঠতে পারে ইতিহাস কালের দাস না কাল ইতিহাসের দাস? এই বিতর্কমূলক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আমাদের জানা দরকার কাল কি? ঐতিহাসিকের কাছে কাল এবং ইতিহাস দুই-ই একাকার হয়ে যায়। মুসকিল হয় ইতিহাসে অচেতন পাঠকদের নিয়ে। তাঁদের এক বোঝাতে চাইলে অন্য বোঝেন, সাধারণভাবে বললে গূঢ় অর্থ খোঁজেন। প্রসঙ্গত রাস্কিনের একটি উক্তি করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন: "I tell them plain duty, and they tell me that my style is charming." এ ধরণের অভিজ্ঞতা যদি কোন ঐতিহাসিকের কপালে জোটে তবে দুর্দশার অন্ত থাকে না।—ইতিহাসে উত্থান বা পতন শুধুমাত্র সভ্যতা বা রাজ্যের নয় শিল্প-সংস্কৃতির উত্থান-পতনও ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত।

উত্থান-পতনই ইতিহাসের একমাত্র রীতি নয়। তবু ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে দেখতে পাই সব সময়েই একটা ভাঙা-গড়ার খেলা চলেছে। আদিকালের সমাজে যে দাস ব্যবস্থা ছিল তা আর আজ নেই। সে কালে দাস সমাজে উৎপত্তির বিভিন্ন রকম ইতিহাস আমাদের চোখে পড়ে। ভারতের দাস ব্যবস্থার সঙ্গে রোমের দাস-প্রথার আপাতঃ দৃষ্টিতে কোন মিল ছিল না। কিন্তু সব দাস ব্যবস্থারই মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এক্সপ্লয়টেশন। এই দাস ব্যবস্থা এশিয়া আফ্রিকাতেই প্রথম শুরু হয় এবং পরবর্তীকালে পৃথিবীর অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে বলে অনুমিত হয়। ইতিহাসের রীতি অনুসারে এই প্রথাও একদিন ভেঙে পড়েছিল। অবশ্য প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে—আধুনিক সমাজে যে দুটি শ্রেণী রয়েছে, ক্যাপটালিষ্ট ও প্রলেতারিয়, তার মধ্যে মধ্যযুগীয় সমাজ-চেতনার প্রচ্ছায়া দেখি।

য়ুরোপের অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগে ক্যাথলিক ধর্মযাজক এবং ধর্মগুরুরা ধর্মের মিথ্যা ব্যাখ্যা করে জনসাধারণের মনে ভীতি সঞ্চার করে তাদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করত। সাধারণ, অশিক্ষিত, মানুষের অজ্ঞতার সুযোগে তারা সহজেই রক্তশোষক জোঁকের ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু মার্টিন লুথারের আবির্ভাবে মানুষ নিজেকে চিনতে শিখল, ধর্মের দোহাই দিয়ে আর তাদের ঠেকিয়ে রাখা গেলনা।—আমরা প্রথমে যে কথা বলেছি—একটা ভাঙা-গড়ার খেলা

চলেছে—তা' ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু ইতিহাসের একমাত্র রীতি নয়।

থুকিডিডিস ইতিহাস সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখেছেন বা ধনঞ্জয় ইতিহাসকে যে-আসনে স্থাপন করেছেন তাকে তৎকালীন যুগের মানদণ্ডে প্রগতিশীল ইতিহাস-চর্চা বলা যেতে পারে। থুকি-ডিডিসের যুগে ইতিহাস-চর্চার অনেক অসুবিধা ছিল। কারণ, সে যুগে ইতিহাসের উপাদানের অভাব ছিল। তবু তিনি যেটুকু লিখেছেন তাতে তাঁর ইতিহাস চেতনা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। আজকের দিনের ঐতিহাসিকের চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র উপাদান। তাঁদের প্রতিটি পদক্ষেপ যুক্তি-তর্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষদর্শনের ফলে ইতিহাস রচনা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ইতিহাসের মূল কথা 'সত্যভাষণ'। এখন স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে, প্রত্যক্ষদর্শনের 'পরে রচিত সত্যভাষণই কি একমাত্র ইতিহাসের রীতি? ইতিহাসের অন্য কোন কর্তব্য আছে কিনা। আসলে ইতিহাস গল্পকথা নয় আবার খবরের কাগজও নয়। ইতিহাস ইতিহাসই। এর একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। একটা নিজস্ব সত্তা আছে। আধুনিক ইতিহাস বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত। নিছক কল্পনার পাখায় ভর করে বা সাহিত্যের টুকি-টাকি থেকে ইতিহাস রচনার যে প্রয়াস ঐতিহাসিকদের মনে জেগেছিল, তা আজ প্রায় অচল। অবশ্য প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের অধিকাংশই সাহিত্যের উপর নির্ভর করে লেখা। কিন্তু সে যুগের বৈজ্ঞানিক ইতিহাস লেখা হয়নি এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু বর্তমান ইতিহাস সম্পূর্ণই বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—কল্পনার স্থান নেই। মোট কথা ইতিহাসের রূপ-রীতির পরিবর্তন হয়েছে। একই ধারায় ইতিহাস চিরকাল বয়ে যেতে পারে না। নদী যেমন মাঝে মাঝে তার পথ পরিবর্তন করে ভিন্ন পথে বিপুল জলরাশি নিয়ে বয়ে চলে তেমনি ইতিহাসও এক রূপ-রীতির পথ ত্যাগ করে অন্য পথে তার স্তূপিকৃত ঘটনা রাশিকে নিয়ে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বয়ে চলে। এই পথ পরিবর্তন, যাকে আমরা রূপ-রীতির পরিবর্তন বলে চিহ্নিত করেছি, তা সাধারণ ঘটনা নয়। একটা যাত্রাপথ বন্ধ হলেই তো আরেকটির সন্ধানে মানুষকে বেরুতে হয়। আর ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে চলে তৎকালীন যুগের মানুষ। যেমন অষ্টাদশ শতাব্দীতে ক্যাথারিন জোসেফ ফ্রেডরিক ম্যারিআ-থেরেসা ইতিহাসের গতিপথকে এক নতুন রূপে রূপায়িত করেছিল। আবার ফ্রান্সের দার্শনিকগণ আলোকবর্তিকা নিয়ে নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন। অত্যাচারিত নিপীড়িত জনসাধারণ ফ্রান্সের বুকে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়েছিল। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, যুগ শিক্ষালাভ করে ইতিহাস এবং সমসাময়িক ঘটনা থেকেও। ফরাসী বিপ্লবের সমসাময়িক ঘটনা আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের বিপ্লব থেকে ফরাসীরা বিপ্লবের অগ্নিশিখাকে প্রজ্জলিত করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। যদিও এই বিপ্লবের পেছনে আরও নানা কারণ ছিল। ইতিহাস একই ধারায় চিরকাল চলে না—এই দৃষ্টান্ত আমরা ভারতীয় ইতিহাস এবং পৃথিবীর সব দেশের ইতিহাসেই দেখি। এই পথ পরিবর্তনের সময়েই তো উত্থান-পতনের রূপটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বৃহদ্রথকে হত্যা করার সঙ্গে সঙ্গে একটি নতুন শাসক গোষ্ঠির উদ্ভব হোল। মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পতন হোল—উত্থান হোল আর একটি নতুন শক্তির।—এতো গেল গেল রাষ্ট্রিক ইতিহাস। এর আয়ুর যে কোন নিশ্চয়তা নেই তাও আমরা জানি। আজ যে গুপ্ত সাম্রাজ্য বা রাজপুত শক্তি বৃদ্ধি পেল

আগামী কালই তা হূন বা মোগল আক্রমণে বিধ্বস্ত হতে পারে। ক্ষমতা একজনের হাত থেকে অপরের হাতে যেতে পারে। এই হাতবদল এবং রাজা রাজনীতির ইতিহাসই ইংলণ্ডের ইতিহাসের মূল কথা। কিন্তু ভারতের ইতিহাস ঠিক তা নয়। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "ইংরেজী স্কুলের ছাত্র ভারতের ইতিহাসে সেই রাষ্ট্রীয় ধারার পথই খুঁজিতে থাকে। খুঁজিয়া না পাইলে বলে ভারতের ইতিহাস নাই। কিন্তু এ কথা মনে রাখা দরকার ভারতের ইতিহাস সেখানেই ভারতের সমস্যা যেখানে।"—শুধু ভারতেরই নয় পৃথিবীর সব দেশেরই রাষ্ট্রিক ইতিহাস ছাড়াও আর একটি ইতিহাস থাকে। সেই ইতিহাসই আসল ইতিহাস। এই ইতিহাস হচ্ছে মানুষের ইতিহাস। উঁচুতলার মানুষ থেকে সাধারণ মানুষ সকলের সম্পর্কে ন্যায্য ভাবে আলোচনা ও বিচার বিবেচনা করা হয়। সমাজ-সভ্যতার উত্থান-পতন ও গতিধারাই ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। এই সমাজ-সভ্যতা যাদের নিয়ে গড়ে ওঠে তাদের বাদ দিয়ে রাজা ও রাজ্যজয়ের গল্প বলে কোন লাভ নেই।

আমাদের ইতিহাস-শিক্ষায় কিছু গলদ থেকেই যায়। ইতিহাস-শাস্ত্র পাঠ নেওয়ার কালে আমরা স্মৃতিশক্তিকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকি। সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাসকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকি। এই যে সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন যা প্রাণান্তকর চেষ্টায় মুখস্ত করে পরীক্ষার পাতা ভরিয়ে তুলি তাকেই যদি 'ইতিহাস' ধরে নিই তবে আমরা ঐতিহাসিক-মগ্নতা থেকে বিচ্যুত হব। কোন রাজার পর কোন রাজা সিংহাসন পেল বা কোন বংশের পর কোন বংশ রাজত্ব করল এবং তাদের জন্ম-মৃত্যু ও উত্থান-পতনের ইতিহাসই একমাত্র ইতিহাস নয়। যুগের সমাজ সভ্যতার উন্নতি-অবনতি ও উত্থান পতনই ইতিহাসের মূল কথা। আর এই সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে সমস্ত মানুষই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কারণ মানুষকে নিয়েই গড়ে ওঠে সমাজ-সস্কংতি। এই সমাজ-সংস্কৃতিরও আবার উত্থান-পতন আছে। কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। যেমন দ্বাদশ কী ত্রয়োদশ শতাব্দীর সমাজ এখন টিকে নেই। সে-যুগের সংস্কৃতিও আজ স্মৃতির বিবর্ণ পৃষ্ঠায় স্থান করে নিয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে-সমাজ-সংস্কৃতির বিকাশ হয়েছিল আমরা সেই সমাজ-সাংস্কৃতিক জীবন থেকে সরে এসে আর এক নতুন সমাজ-সংস্কৃতি গড়ে তুলেছি। ভবিষ্যতেও সমাজ-সংস্কৃতির বিবর্তন হবে। এই বিবর্তনের ইতিহাস ইতিহাসের অন্তর্গত। যে-কৃষক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বা যে শ্রমিক প্রাণান্ত চেষ্টা করে উৎপাদন করে চলেছে তাদের কথাও এই ইতিহাসে বলা হয়েছে। সমস্ত সাধারণ মানুষের উত্থান-পতনের কথা আমাদের জানা দরকার। নয় তো আমাদের ইতিহাসে জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

উত্থান-পতন যে ইতিহাসের নিয়ম তা আমরা দেখেছি। কিন্তু ইতিহাসের শুরু হলো কবে থেকে ? যদিও বেদ-বেদান্তে ইতিহাসের উল্লেখ দেখি তথাপি মানুষের ইতিহাস চেতনা হয়েছে সভ্য হওয়ার অনেক পরে। কবে থেকে মানুষ পুরাতত্ত্ব সম্পর্কে আগ্রহী হলো তা চিন্তনীয়। রুশো কল্পিত সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই যে ইতিহাস চেতনা সকলের মধ্যে দেখা দিয়েছিল তা ঠিক নয়। আসলে সভ্যতা বিকাশের শুরু থেকেই ইতিহাসের শুরু। যখন মানুষ মানুষের পর্যায়ে উন্নীত হয় নি তখন তার কোন ইতিহাসই ছিল না এমন ধারণা কাউর থাকতে পারে।

নব্য প্রস্তর কি তারও আগের মানুষের কথাও আমরা ইতিহাসে পড়ি। তখন থেকেই মানুষ সভ্যতার আলো জ্বালতে চেষ্টা করেছে। ডারউইন মানুষের ক্রমবিকাশের কথা বলেছেন। ডারউইন তত্ত্বেই মানুষ সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সভ্যতা বিকাশেই ইতিহাসের শুরু এমন উক্তি করলে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে প্রাক-সভ্যযুগের যে-সমস্ত তত্ত্ব বা তথ্য আমরা জানতে পারি তা' কি ইতিহাসের বহির্ভূত। ইতিহাসে তা তো অপ্রয়োজনীয় নয়! ইতিহাসে যে কটি বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন তার মধ্যে 'সত্যভাষণ' একটি। এ কথা পূর্বেই বলেছি। মানুষের চোখে যখন সভ্যতার আলো লাগেনি তখন তারা নিশ্চয়ই তাদের বর্তমান কাহিনী বা নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক উপাদান রেখে যান নি। তাই কিছুটা কল্পনার পাখায় ভর করে ইতিহাসের মত যুক্তিনির্ভর বিজ্ঞানকে গড়ে তুলতে হয়। সিন্ধু-সভ্যতা তার যে ঐতিহাসিক উপাদান বুকে করে দাঁড়িয়ে আছে তৎকালীন যুগের কথা জানাতে তাই যথেষ্ট। সে যুগের জনসাধারণের জীবনযাত্রা সম্পর্কে আমরা অবহিত হতে পারি ঐ যুগের ঐতিহাসিক উপাদান থেকে।

ইতিহাসকে বর্তমান অস্বীকার করতে পারে না অতীতের কাছে বর্তমানের অনেককিছুই শিক্ষণীয় আছে। পণ্ডিত ব্যক্তিরা বলেন—'হিষ্ট্রি রিপিট্‌স্ এগেন।' অর্থাৎ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়। উক্তিটি যুক্তিনির্ভরও বটে। তবু এটুকু আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, বর্তমান শুধু অতীত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিই নয়—নতুন কিছু ঘটনাও ঘটে। বরঞ্চ বলা চলে অতীতের আলোকবর্তিকা নিয়ে বর্তমানের পথে চলতে চলতে ভবিষ্যতের পথকে আবিষ্কার করে। আবার বিচ্যুতি যে নেই তা-ও বলা যায় না। অনেক ক্ষেত্রেই ইতিহাসের একটি ক্ষেত্রের সঙ্গে অপর একটি ক্ষেত্রের অমিলটা আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কিন্তু ইতিহাস পর্যালোচনা করলে অন্ততঃ একটি নিয়ম আমাদের সামনে খুব স্পষ্ট ভাবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তা হচ্ছে সমাজ-সভ্যতা-সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন।

রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনস্টাইন, বন্ধুত্ব-ইতিহাস

অশ্রুকুমার সিকদার

দুই বন্ধু ও টমসন সাহেব

১৯২১ সালে এডোয়ার্ড টমসনের রবীন্দ্রজীবনী ও সমালোচনা বিষয়ক গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়, নাম 'Rabindranath Tagore, His Life and Work'। এই গ্রন্থের বিস্তৃততর রূপ 'Rabindranath Tagore, Poet and Dramatist' যখন ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয় তখন টমসন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপক। পরবর্তী বছরে আহ্‌মেদাবাদে অবস্থানকালে সেই বই রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়লে তিনি বিশেষ ক্ষুব্ধ হন। প্রায় তৎক্ষণাৎ তিনি চিঠি লেখেন (রবীন্দ্রজীবনী ৩),

এই বইয়ে Thompson অনেক জায়গাতে খুব flippant এবং dogmatic ভাবে তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন—যাতে তাঁর অন্তর্নিহিত ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেয়েছে।...অথচ মোটের উপর তিনি যে আমাকে নিন্দা করেছেন তা নয়, যেভাবে ভালো ছেলেকে স্কুলমাষ্টার উৎসাহ দিয়ে থাকেন কতকটা সেই সুরে।...যেখানে তিনি আমার ইংরেজি লেখা নিয়ে আলোচনা করেছেন সেখানে তাঁর অবজ্ঞা আমি স্বীকার করে নিতে পারি।...কিন্তু যেখানে ভাষা বাংলা সেখানে তিনি যদি ভোলেন এ-ভাষা আমার, এ-ভাষার অনেকখানি আমার নিজের হাতে-গড়া, তাহলে বুঝব তার একমাত্র কারণ তিনি ইংরেজ, আমি বাঙালি। সমসাময়িক কোনো ফরাসী বড় লেখকের সম্বন্ধে তাঁর বিচারে ও ভাষায় এর চেয়ে অনেক বেশি সতর্ক ও সংযত হতেন।...টমসন তাঁর নিজের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংস্কারের কুহেলিকা থেকে দূরে থেকে যদি লিখতেন তাহলে আমাকে ভালোই বলুন আর মন্দই বলুন এই একটা অবজ্ঞা ও মুরুব্বিয়ানা মিশ্রিত স্বাদ ওর মধ্যে থাকত না।...এক দিকে আমাদের ভাষায় তাঁর নিতান্তই অগভীর অভিজ্ঞতা এবং অন্যদিকে আমাদের দেশের সম্বন্ধে তাঁর সুগভীর অবজ্ঞা—এই দুই-এর মিশালে তাঁর বই এমন অস্পষ্ট এবং ভঙ্গী এমন উদ্ধত হয়েছে।

আহেমেদাবাদ থেকে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে এগারোই এপ্রিল ফিরলেন। ফিরে 'বাণী-বিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়' এই ছদ্ম নামে তিনি টমসনের বইয়ের তীব্র সমালোচনা লিখছেন, সেই সমালোচনা 'রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রেঃ টমসনের বই' প্রবাসীর শ্রাবণ ১৩৩৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। একই সংখ্যায় সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লেখেন 'রেভারেণ্ড টমসনের পণ্ডিতমন্যতা' প্রবন্ধ। বিচিত্রার ভাদ্র ১৩৩৪ সংখ্যায় আক্রমণাত্মক প্রবন্ধ লেখেন নীহাররঞ্জন রায়। এবং এপ্রিল মাসেরই ২০ তারিখে রবীন্দ্রনাথ তীব্র মনঃক্ষোভ প্রকাশ করে চিঠি লেখেন বন্ধু রোটেনস্টাইনকে,

Form your letter it is evident that you have read Thompson's book about myself. It is one of the most absurd books that I have ever read dealing with a poets life and writings. All through his pages he has never allowed his readers

to guess that he has a very imperfect knowledge of Bengali language which necessarily prevents him from realising the atmosphere of our words and therefore the colour and music and life of them. He cannot make distinction between that which is essential and non-essential and he jumbles together details without any consideration of their significance. For those who know Bengali his presentation of the subject is too often ludicrously disproportionate. He has been a school master in an Indian school and that comes out in his pages too often in his pompous spirit of self-confidence even in a realm where he ought to have been concious of his limitations. The book is full of prejudices which have no foundation in facts; as for instance when he insinuates that I lack in my admiration for Shakespear—or that I have an antipathy against Englishmen. Of course, I have grievances against the British Government in India, but I have a genuine respect for the English character which has so often been expressed in my writings. Then again, being a Christian missionary his training makes him incapable of understanding some of the ideas that run all through my writings—like that of the Jeevan-devata... On the whole, the auther is never afraid to be unjust, and that only shows his want of respect. I am certain he would have been much more careful in his treatment if his subject were a continental poet of reputation in Europe. He ought to have realised his responsibility all the more because of the fact that there was hardly anyone in Europe who could judge his book from his own first hand knowledge. But this has only made him bold and safely dogmatic, affording him inpunity when he built his conclusions upon inaccurate data.

সমকালে লেখা দুইটি চিঠিতেই লক্ষ্য করি অভিযোগ এক, স্কুলমাষ্টারি ধরণ, অবজ্ঞার অভাব, ইউরোপীয় লেখক হলে লেখক অনেক বেশি সতর্ক হতেন এবং এই বই পাঠে বাংলাভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠকের ভ্রান্ত ধারণা জন্মানোর ভয়।

রোটেনস্টাইন পূর্বোদ্ধৃত দীর্ঘ ক্ষুব্ধ চিঠিটি আত্মজীবনীতে প্রকাশ করেন নি।[১] তিনি শুধু এই বলে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে আরনেস্ট রীস আদৌ বাংলা জানতেন না অথচ তাঁর লেখা 'Slighter' বইটি রবীন্দ্রনাথের পছন্দ হলো, পছন্দ হলো না টমসনের বই যিনি মোটামুটি বাংলা জানতেন। টমসনও এই চিঠি দেখে মর্মাহত হন, কারণ তিনি স্তাবক ছিলেন না বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গুণগ্রাহী ছিলেন। কিছুদিন পরে (১৬ মার্চ ১৯৩১) টমসন তাঁর বই সম্বন্ধে বিলেতি কাগজে প্রতিক্রিয়া, রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা পাশ্চাত্যে কমে যাওয়ার কারণ এবং বিলাতে তাঁর প্রতি অবজ্ঞার সম্ভাব্য রাজনৈতিক ফল সম্বন্ধে রোটেনস্টাইনকে যে চিঠি লেখেন সেটি রোটেনস্টাইন

'Since Fifty' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। প্রথম অভিযোগ তাঁর বিলেতি কাগজগুলির বিরুদ্ধে,

This book got quite a fair amount of space—but the space was so witlessly used.

তারপর বলেছেন রবীন্দ্রনাথের প্রতি অবজ্ঞার কারণ সাহিত্যের হাওয়া বদল—

Tagore has been unlucky in this—so far as the English influence on his work goes he belongs to the Tennysonian age, but he has the misfortune to come up for judgmant by the age of T. S. Eliot and Aldous Huxley. He won't get justice now—nothing could get him justice. Leonard woolf, for example, in the Nation—a paper very friendly to India—said there was not a single quotation in my book which did not seem to him altogether worthless. But he ought to have been the daemonic energy and fierceness of Sea-Waves, if of nothing else. A literature in which every poet was like T. S. Eliot and every novelist like E. M. Forster would be fairly arid. We do need less narrow canons of criticism.

এই পর্যন্ত সবই ভালো, কিন্তু এর পরে প্রবেশ করেছে সম্ভাব্য রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ায় উৎকণ্ঠা; ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ইংরেজদের অবজ্ঞার ফলে ভারতীয়গণ মূল ইউরোপখণ্ডের সঙ্গে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করছে অনুমান করে উদ্বিগ্ন, কারণ

This fact has even a political importance.

তিনি প্রস্তাব করেছেন অকস্‌ফোর্ড বা কেম্ব্রিজ থেকে ভারতীয়দের মধ্যে সম্মানসূচক ডিগ্রি দিয়ে খুশি করা হোক, কারণ অন্যেরা তো বটেই, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও বলা যায়—

An occasional F. R. S. or doctorate of Oxford or Cambridge would give him more pleasure than anything else. (২)

তাঁর বই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিরোধী মনোভাবের কথা জেনে টমসন বিশেষ ক্ষুণ্ণ হন এবং তাঁর যে বিলম্বিত মানসিক প্রতিক্রিয়া সেটি প্রকাশ পায় রোটেনষ্টাইনকে লেখা (১৪ মে ১৯৩২) তাঁর পত্রে। এই পত্রের যে অংশ বিশেষ Speaight বিরচিত রোটেনষ্টাইন জীবনীতে মুদ্রিত হয়েছে তা এই—

He has kept steady resentment for what he considers the 'detraction' of my book—where as most people outside India think I showed a mushy mind by what they consider my absurd overpraise. His appetite for flattery has grown to absurdity since his first success. He lives amid incense, and India, outside Bengal and the Punjab, half resents, half laughs at it. He does not want honest friendship.

যখন ভুল বোঝাবুঝি হয় তখন দুই পক্ষই অবিচার করে। টমসন ভুলে গিয়েছিলেন বাংলাদেশ যখন রবীন্দ্রনাথকে বন্দনা করে তখন বাংলা ভাষায় আত্মপ্রকাশকারী কবিসার্বভৌমকে

করে, আর বঙ্গের বাহিরে অন্যেরা যখন 'over praise'-এ ক্ষুব্ধ হয় তখন তারা ইংরেজির অনভ্যস্ত পোষাক-পরা রবীন্দ্রনাথকে জেনে ক্ষুব্ধ হয়। কিছু অভিযোগ সত্য হলেও টমসনের প্রতি রবীন্দ্রনাথও খানিকটা অবিচার করেছিলেন। সেই অবিচার কালগত দূরত্ব এখন পুষিয়ে দিচ্ছে।

রোটেনষ্টাইন ও গোল্ডেন বুক

রোটেনষ্টাইনের জীবনীকার Robert Speaight আরো একটি ভ্রান্ত তথ্য পরিবেশন করেছেন যখন তিনি লিখেছেন সপ্ততিবর্ষে রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেবার জন্য অভিনন্দনবাণী ও প্রশস্তিবচন সম্বলিত 'The Golden Book of Tagore'-এর ভূমিকা রোটেনষ্টাইন লিখেছিলেন। বস্তুত 'Golden Book of Tagore'-এর উদ্যোগের সঙ্গে রোটেনষ্টাইনের কোন সম্পর্ক ছিল না; উদ্যোক্তা ছিলেন জগদীশচন্দ্র, গান্ধিজি, রোঁলা, আইনস্টাইন ও পালামাস। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদনা করেন, তিনিই ভূমিকা লেখেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যেরা যেমন অভিনন্দনবাণী লিখে পাঠান, রোটেনষ্টাইনও তেমনি পাঠিয়েছিলেন। তাঁর মন্তব্যের মূল অংশ এই—

What can I say of Rabindranath? Homage has been paid to him by the East and by the West. Wherever he has passed—and what lands has he not visited?—garlands have been hung around his neck and men and women taken the dust from his feet.

Few men have lived to know such fame as has won. His books are read in every tongue; throughout India his songs are sung. In Europe and America his name stands for India herself, and like Einstein's it stands for tolerance, for mutual understanding among the peoples of the earth...

His heart was young at 50; at 70 his heart is young still. For beneath his ripe wisdom lies, deep-seated, a rich wit, a laughing humour, genial, most human.

To strive for perfection is natural to exceptional man, but others are suspicious of those who assume perfection. That mantal Rabindranath has never worn; his sense of values, his humour, would not permit him to be measured by such a garment. For he shares the qualities and feelings to which man is heir. To be more, or less than a man, Rabindranath would never aim.

Hence his songs and stories stir our hearts as do great folk-songs, telling, as they do, of the joys and sorrows of every man and of every woman. Through Rabindrnath India's humblest villagers speak to the world. To be the flute of God and to be the flute of men likewise, what nobler end can a poet achieve?

লেখাটির মধ্যে সৌহার্দ্যের ব্যক্তিগত তাপের চেয়ে যদিও ভদ্র দূরত্বের ভাব বেশি ফুটে

ফুটে উঠেছে, তবু বড় চমৎকারভাবে রোটেনষ্টাইন রবীন্দ্রনাথকে ঈশ্বর ও মানুষের বাঁশী বলে বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু Golden Book সংকলনের ব্যাপারে অন্তরাল থেকে অবশ্য রোটেনষ্টাইন বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে বাধ্য হন। এই প্রসঙ্গে দার্জিলিং থেকে বিদেশী বন্ধুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির (২৬ জুন ১৯৩১) অংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য,

This present celebration of my 70 th birthday has its significance in the fact that I have won my right to claim a recognition as the poet who has had its two births, one among his own people and another in the freedom of humanity.

This great fact has its intimate relation to your own friendship which had been offered to me when I was still in the shadow of obscurity. Others are sending me today their greetings of praise along with their felicitations from all parts of the world but you anticipated this event, and your homage, as coming from a representative of world culture, was the first one that I received in my life.

কিন্তু সেই প্রথম সমাগম ও বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে অনেক ব্যবধান দাঁড়িয়ে গেছে—বিশেষত ইংরেজ গুণমুগ্ধদের মনোভাবে। অভিনন্দনগ্রন্থের উদ্যোক্তাগণ তাড়া দিয়েও শ' ইয়েটস্ প্রভৃতির লেখা আদায় করতে না পেরে রোটেনষ্টাইনের শরণাপন্ন হন—আত্মজীবনীর তৃতীয় খণ্ড 'Since Fifty'-তে তিনি লিখেছেন,

I was asked to whip them up.

১৯৩১ সালের ২১শে আগষ্ট দু-দুটো কেবল গ্রাম এই উদ্দেশে রোটেনষ্টাইনের কাছে প্রেরিত হয়েছিল। প্রথমটির প্রেরক সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, তিনি লিখলেন—

Your contribution to Golden Book of Tagore greatly welcome. No response however from other English friends yet Kindly persuade Masefield Yeats Well (অর্থাৎ Wells) Shaw Galsworthy to send greetings contribution before end of September.

দ্বিতীয়টি ঐ তারিখেই শান্তিনিকেতন থেকে পাঠান কবির (Barindranath নাম হয়েছিল তারবার্তা প্রেরণ বা গ্রহণের ত্রুটিতে) একান্ত সচিব অমিয় চক্রবর্তী মহাশয়—

British friends of Tagore practically unrepresented in Golden Book Will you kindly arrange send messages or contribution from Shaw Wells Masefield Galsworthy Sturge Moore, Barrie Yeats, George Russel, Max Beerbohm and others by end of Septr stop Keen disappointment Felt absence of adequate English contribution stop Earnestly hoping your co-operation.

রোটেনষ্টাইনের তাড়নায় ৪ঠা সেপ্টেম্বর ইয়েটস্ তাঁকে লিখলেন ('Since Fifty'-তে উদ্ধৃত)

Probably I shall send nothing because I hate sending mere empty compliments and have time for nothing else. I shall write to Tagore privately. I shall have plenty to say when I have not to remember that other men are looking over my shoulder.

সেই কথানুযায়ী বাস্তবিকই ইয়েটস্ রবীন্দ্রনাথকে ব্যক্তিগত পত্র লেখেন ; তিনি লেখেন,

They wrote me sometime ago to ask me to contribute to your Golden Book. I forgot and then Rothenstein wrote to me, but his letter, delayed in the post, only reached me two days ago...What an excitement it was the first reading of your poems, which seemed to come out of the fields and the rivers and have their changelessness !

এই ব্যক্তিগত চিঠিই শেষ পর্যন্ত Golden Book-এ ছাপানো হয়, কিয়দংশ বর্জন করে।

ইতিমধ্যে জন কয়েকের লেখা পাওয়া গেল, কিন্তু তাতে তুষ্ট না হয়ে, বিশেষ করে শ' ও ওয়েলসের রচনা না পেয়ে 'Prof. Santiniketan University & Secretary to Dr. R. N. Tagore' অমিয় চক্রবর্তী শান্তিনিকেতন থেকে রোটেনস্টাইনকে এক দীর্ঘ পত্র লিখলেন ৯ই অক্টোবর তারিখে,

We are extremely sorry, however, not to have heard either from Wells (৩) or from Shaw both of whom are close friends of Tagore. Apart from the fact that they are held in high esteem by our countrymen Tagore personally cherishes warm regard for both of them and I know he will feel pained if they do not join us in our common rejoicing. Our celebrations have been accepted by most people as a symbol of fellowship between the finest minds of the West and the East—Tagore himself is concerned in it almost entirely from that view-point—and we shall all feel very deeply disappointed indeed if two of our leftist literary idols keep away from us on this occasion. I do hope you will again use your influence in securing some written words from them which should be sent by air mail post directly to me here to hasten matters.

I feel ashamed to put you to all this trouble but I know I can count upon your friendly forbearance.

পুনশ্চে লিখলেন, সম্ভব হলে ম্যাকস বীয়ারবম ও ভাস্কর এপষ্টাইনের লেখা পাঠাতে। এদিকে 'close friends' দ্বয়ের অন্যতম শ' প্রায় উত্যক্ত হয়ে রোটেনষ্টাইনকে যে চিঠি দিলেন তাঁর অংশ বিশেষ রোটেনষ্টাইন 'Since Fifty' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন—

To the devil with these Nitwitiketant idiots ! I spend half the year telling them to put my name to anything they like that will please Tagore, and the other

half telling you to tell them so. I know by bitter experience that these people who fasten themselves on the birthdays of the eminent and beg unspontaneous and worthless messages are all over the place—but I have n't any room to let myself go. Tell them for fiftieth time to put my name and be d—d !

বাকি রইলেন ওয়েলস। অথচ ঠিক যে সময় পুনঃ পুনঃ তাঁর অভিনন্দনবাণী চাওয়া হচ্ছে তার ঠিক অব্যবহিত পূর্বে জেনিভায় ওয়েলসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়েছিল। জেনিভার 7 Rue de l' Universite´ ঠিকানা থেকে ১৯৩০ সালের আগষ্ট -সেপ্টেম্বর মাসের কোনো তারিখে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ রোটেনষ্টাইনকে সাক্ষাতের বিবরণ দেন,

H. G. Wells came to see me yesterday and I was delighted. I felt that his thoughts are being grouped on a large background of history and his thoughts stimulated my mind.

সেই সাক্ষাতের বিস্তারিত বিবরণ আছে অমিয় চক্রবর্তীর 'সাম্প্রতিক' গ্রন্থের 'এইচ, জি, ওয়েলস' প্রবন্ধে। নিতান্ত সম্প্রতিকালে এই সাক্ষাৎ সত্ত্বেও, রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক থেকে দুর্লঙ্ঘ্য দূরত্বের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও, শেষ পর্যন্ত বাণী পাঠাতে ওয়েলস উৎসাহ বোধ করেননি। হয়তো রোটেনষ্টাইনের প্রাগুক্ত জীবনীকারের কথাই সত্য—

Wells felt disinclined to make any fuss about Tagore. He did not think much of his poetry.

অথবা অন্য কোন অজ্ঞাত কারণে হয়তো ওয়েলস কুণ্ঠা বোধ করেছিলেন।

অবশেষে Golden Book প্রকাশিত হলো। এই গ্রন্থে সঙ্কলিত স্তুতিবচন পড়ে কবির মনের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া রোটেনষ্টাইন অনুমান করার চেষ্টা করেছেন আত্মচরিতের তৃতীয় খণ্ডে। এই প্রসঙ্গে ইয়েটসের কাছ থেকে যে চিঠি পেয়েছিলেন সেই চিঠির কথা রোটেনষ্টাইনের মনে পড়ে গিয়েছিল—

Do you remember a saying quoted by Max Muller from an old Indian text, 'One thing will never go out of the world. the vanity of the Saints,'

১। আত্মজীবনীর তৃতীয় খণ্ডে 'Since Fifty' প্রকাশের পূর্বে রোটেনষ্টাইন রবীন্দ্রনাথ লিখিত চিঠি তাতে ছাপানোর অনুমতি চাহিলে রবীন্দ্রনাথ লেখেন (২৫শে জুন ১৯৩৯—হুটন গ্রন্থাগার সংগ্রহে সর্বশেষ চিঠি)—"As regards your using my letters in your third volume of autobiography, you have most certainly my enthusiastic consent but do be discreet about the material that you use. I have of course every faith in your judgment." এই 'discreet' হবার অনুরোধেই রোটেনষ্টাইন চিঠিটি প্রকাশ করেননি, এমন অনুমান করা চলে।

২। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের স্বাদ পাওয়া সত্বেও আয়ারল্যাণ্ডবাসী ইয়েটসের মাথায় এই জাতীয় প্রস্তাব ঢুকেছিল। কুল পার্ক থেকে তিনি ২৫শে নভেম্বর ১৯১২ তারিখে এডমণ্ড গস্‌কে লিখলেন—"I think it would be an imaginative and notable thing for us to elect him (অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ) to our Committee. He is the great poet of Bengal though eligible for election because his Engljsh tra nslatlon of his work alone. I think from the English point of view too it would be a fine thing to do, a pieco of wise Imporialism, for he is worshipped as no poet of Europe is."

৩। রোটেনষ্টাইনের বাড়িতে ডিনারে ওয়েলসের সঙ্গে পরিচিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে হয় ('পথের সঞ্চয়')—"মানুষটি সজারু জাতীয় নহে। সম্পূর্ণ মোলায়েম। দেখিতে পাইলাম, ইঁহার প্রখরতা চিন্তায়, কিন্তু প্রকৃতিতে নয়।"

বাংলা কথাসাহিত্যে নিষিদ্ধ প্রেম

অনঙ্গমোহন রুদ্র

বঙ্কিমচন্দ্র—রবীন্দ্রনাথ—শরৎচন্দ্র

বাংলা কথাসাহিত্যে নরনারীর প্রণয় সম্পর্কের বিচিত্রমুখিতা প্রকাশ লাভ করেছে এবং 'সবচেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে' তার চিন্তা ভাবনা, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি আশা-আকাঙ্ক্ষা মনের নিভৃত প্রদেশের যেসব সর্পিল সঙ্কীর্ণ পথে বিচরণ করে, এই প্রণয়ের আলোকে শক্তিমান লেখকেরা তাকে আবিষ্কার করেছেন। মানব-মনে প্রেমের বিচিত্র গতি-পথ বুঝি অন্তহীন; তাই আজো তার আবিষ্কারের শেষ হয়নি। আবিষ্কৃত বাঁধা পথে অনুবর্তনের ফাঁকে ফাঁকে মানবমনের অনাবিষ্কৃত আলোআঁধারি গলিপথ এখনও মাঝে মাঝে আলোকিত হয়ে ওঠে।

বাংলা কথা-সাহিত্যের প্রথম প্রভাতেই আমাদের উপন্যাস-সাহিত্যের জনক বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী স্পর্শে সমাজে নরনারীর প্রেম সম্পর্কের বৈচিত্র্য প্রথম দেখা গেছে। বঙ্কিম-সাহিত্যে পাঠক-মাত্রেই এই বৈচিত্র্য সম্বন্ধে অবহিত। তাঁর কপালকুণ্ডলা এবং মনোরমার জীবনে প্রেমের রহস্য আমাদের বিস্ময়বিষ্ট করে, রজনীর জীবনে প্রেমের বিকাশ আমাদের মনকে করুণায় আর্দ্র করে তোলে। কিন্তু আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এদের দেখা মেলে না। আমাদের প্রত্যহিক জীবনে সমাজেও যারা আছে, তাদের দেখাও আমরা প্রথম পেয়েছি বঙ্কিম-সাহিত্যে। সেখানে আমরা পতিপ্রাণা সূর্যমুখীকে পেয়েছি, পারিবারিক জীবনে শুদ্ধতার বেদীতে প্রতিষ্ঠিত স্বাতন্ত্র্যের অস্ফুট প্রতিমা ভ্রমরকে দেখছি; দেখেছি শিশিরশিক্ত শেফালির মত শোভা ও সৌরভের করুণ পেলবতায় কুন্দনন্দিনীকে। আবার দেখেছি কুলত্যাগিনী বিধবা রোহিণীকে ও সধবা শৈবলিনীকে। কিন্তু আমরা সবাই জানি, সমাজ যাকে অনুমোদন করে না, প্রচলিত নীতি-শাস্ত্র তাকে স্বীকৃতি দেয়-না, বঙ্কিম সেই সমাজ-নীতি-বিগর্হিত প্রেমকে পাপ বলে মনে করেছেন ও সে পাপের শাস্তি-বিধান করেছেন। উনিশ শতকের নব্য-মানববাদ ও উপযোগিতাবাদ বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়কে এক্ষেত্রে ক্ষমাশীল করতে পারেনি। সংবেদনশীল স্রষ্টা হৃদয়ের প্রসার এক্ষেত্রে বুদ্ধির শাসনে সংকুচিত। এ কারণে বঙ্কিম-সাহিত্য আধুনিককালের সমালোচকদের কাছে বিরূপ সমালোচনার বিষয় হয়েছে। নীতি-শিক্ষকের ভূমিকায় ঔপন্যাসিক বঙ্কিম যেখানে অবতীর্ণ, সেখানে তাঁর সৃষ্টি বহু-আলোচিত। কিন্তু বঙ্কিম-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের অন্য দুই দিকপাল—রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র—এদিক থেকে কতটা অগ্রসর হয়েছেন, আমাদের মনে এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

পুরুষ-শাসিত সমাজে স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষে নারীর প্রেম অপরাধ। আমাদের সমাজে সে অপরাধ গুরুতর। বিধবার জীবনে প্রেম সেই দিক থেকেই স্বীকৃতি পায় নি। আইন-সম্মত বিধবা বিবাহ বঙ্কিমের কাছে নীতি-সম্মত বলে মনে হয় নি। তাই কুন্দরপ্রেম ও বিবাহ নগেন্দ্রনাথের পরিবারে তথা তাদের জীবনে কল্যাণের প্রতিকূলে গেছে। রোহিণী ও গোবিন্দলালের জীবনে বিবাহের মন্ত্রটুকুও উচ্চারিত হয় নি; সুতরাং সেই প্রণয়ের পরিণতি ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। এ

আমরা বঙ্কিম সাহিত্য পাঠক মাত্রেই জানি এবং এ সম্বন্ধে প্রখ্যাত সমালোচকদের বিশ্লেষণও আমাদের অজানা নয়। কিন্তু একটা কথা স্বীকার করতেই হয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র যাকে অকল্যাণমূলক মনে করেছেন, তার প্রতিকূলে মত প্রকাশে তাঁর-সাহসের অভাব হয় নি। কোনও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তাঁকে স্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসার পথে কোনরূপ বিচলিত করে নি। সমাজনেতা বঙ্কিম পত্রপত্রিকায় বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহনিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে দৃঢ়ভাবে যে মত প্রকাশ করেছেন, উপন্যাসেও তাঁর সেই মত অভিব্যক্ত হয়েছে। সে অভিব্যক্তিতে শিল্প-সুষমা রক্ষিত হয়েছে কি না তা ভিন্ন প্রশ্ন। কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যে যে নারী বলে—

'যাবো না বাসর কক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী,
আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী,'

নারী-স্বাতন্ত্র্যের ম্যানিফেষ্টো হাতে নিয়ে সে-নারী রবীন্দ্র-উপন্যাসে প্রবেশ করে কতখানি স্বাতন্ত্র রক্ষা করেছে—

'চোখের বালি' বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাসে একটি মাইলষ্টোন। তার সর্বাঙ্গীণ অভিনবত্ব, যুগান্তকারী মনোবিশ্লেষণ ও বলিষ্ঠ অগ্রবর্তিতা স্বীকার করেও বিনোদিনী চরিত্রের পরিণতি সম্বন্ধে পাঠকমনে প্রশ্ন না উঠে পারে না। রোহিণীচরিত্রে তার ঐ পরিণতির বীজ ছিল কি না এ প্রশ্ন যেমন স্বাভাবিক ভাবেই ওঠে, তেমনি বিনোদিনী চরিত্রের আবির্ভাব ক্রমবিকাশ ও পরিণতির সঙ্গতি সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠা বোধ হয় অসম্ভব নয়। যদি কোন মুগ্ধ রবীন্দ্র-সাহিত্য-পাঠক এ-কালের গণ্ডীতে দাঁড়িয়ে বলেন যে, বিধবা বিনোদিনীকে রবীন্দ্রনাথ বিহারীর সঙ্গে পারিবারিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহস পান নি, কিংবা এ প্রতিষ্ঠাকে তার অবচেতন মনের সংস্কার স্বীকৃতি দিতে পারে'নি, তাহলে তাঁকে দোষ দেওয়া যাবে কি? শরৎচন্দ্র 'পল্লী সমাজে' রমা ও রমেশের বিষাদময় পরিণতি সৃষ্টি করেছেন পল্লীসমাজের প্রেক্ষাপটে ; প্রচলিত সংস্কারের গণ্ডীকে চূর্ণ করা সম্ভব হয় নি। রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তের মিলনে বঙ্কুর মা অভ্রভেদী বাধা হয়ে উঠেছিল। সাবিত্রী ও সতীশের মিলনকে অসম্ভব করে উপেন্দ্রের জবানীতে শরৎচন্দ্র ত্যাগের প্রতিমা সাবিত্রীর পদপ্রান্তে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, যেমন করে যুগ যুগ ধরে পুরুষ আপন স্বার্থের যূপকাষ্ঠে নারীকে বলি দিয়েছে তাকে দেবীর প্রশস্তি শুনিয়ে। পতিতার প্রেমকে সাহিত্যে সহৃদয় স্বীকৃতি দান বঙ্কিমের চিন্তারও অগোচর ছিল। এদিক থেকে শরৎচন্দ্রের হৃদয়ের প্রসার এবং অভিনবত্বের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। 'চোখের বালিতে' বিধবা বিনোদিনীর নারী-হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তির স্বীকৃতি ও রূপায়ণ তার মনের গহন অরণ্যকে উদ্ভাসনের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই বঙ্কিমচন্দ্রকে অতিক্রম করে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন। রোহিণীর বিশশতকীয় রূপায়ণ বিনোদিনী।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বাল-বিধবার যে ভাবে পদস্খলন ঘটা স্বাভাবিক রোহিণীর ক্ষেত্রে তাই দেখা গেছে। তার প্রেম গোবিন্দলালের কাছেও শ্রদ্ধা পায় নি. বঙ্কিমের কাছেও অনুমোদন পায় নি। তার আত্মপ্রকাশ স্বভাবতই নিরাবরণ ও স্থূল। বিনোদিনী নাগরিক সভ্যতার মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই কাল ও সমাজ তাদের সমস্ত জটিলতা নিয়ে তার আত্মপ্রকাশকেও জটিল করে তুলেছে। উনিশ শতকে রেনেসাঁসের যুগে নারীর মানব-মূল্য স্বীকৃত

হলেও মধুসূদন ছাড়া আর কেউ বোধহয় নারীপ্রেমের সম্ভাব্য সকল রূপের স্বীকৃতি দিতে পারেননি। কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র নারী-জীবনে প্রেমের সমস্যাগুলিকে তুলে ধরেছেন, কিন্তু রক্ষণশীল সমাজ-নীতির রক্তচক্ষুতে নারীর হৃদয়বৃত্তিকে শাসন করেছেন। রোহিণী তাই বঙ্কিমের দৃষ্টিতে পাপিনী, পিশাচী। তার ব্যক্তমূল্য সেখানে অস্বীকৃত। বিনোদিনী রবীন্দ্র দৃষ্টিতে নারীই। আশা-মহেন্দ্রের সুখের নীড়ে সে আগুন জ্বেলেছে। ভীরু কপোতী আশার প্রতি কবির স্বাভাবিক সহানুভূতি সত্ত্বেও বিনোদিনীকে কবি পিশাচী ভাবতে পারেন নি। রোহিণী চরিত্রে প্রজাপতি-বৃত্তি আরোপ করে ঈপ্সিত পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে বঙ্কিম নিশাকরকে হঠাৎ আমদানী করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিহারীর প্রতি বিনোদিনীর প্রেমকে পূজারূপে অভিহিত করেছেন; বিনোদিনীকে 'ব্যাধ-ব্যবসায়ী, বা বিহারীকে 'অনবধান মৃগ' বলতে চান নি। কিংবা নারী-চরিত্রের চরম অবমাননায় বায়রনের মত বলতে চান নি—'She then prefers him in the plural number.'।

তবু বিনোদিনী চরিত্রের শেষ রক্ষা হল কি? হিন্দু বিধবা রমণীর অন্যপুরুষের উদ্দেশে উদ্যত চুম্বনকে প্রেমের মূল্যে বিচার করে পূজার নৈবেদ্য বলা বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে অসম্ভব ছিল। নারীর মানব মূল্যকে স্বীকার করে নিয়ে অবস্থা-নির্বিশেষে নারীর প্রেমের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নিয়েই রবীন্দ্রনাথ তা করতে পেরেছেন। তবু সেই প্রেমকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়নি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে। বিনোদিনীকে তিনি কাশী পাঠিয়ে দিয়ে সমাজে বিহারীর মাথা অবনত রাখতে চেয়েছেন। বিহারীর বিবাহ-প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে বিনোদিনী যে কথা বলেছে, তা তো রবীন্দ্রনাথেরই কথা। এই উক্তিতে কলঙ্কিনী বিনোদিনীর নিষ্কাম প্রেম-মাহাত্ম্য প্রচারিত হতে পারে, কিন্তু রক্ত-মাংসের নারী বিনোদিনীর চরিত্রের স্বাভাবিক পরিণতি প্রকাশ পায় নি। আসলে রোহিণীও পিশাচী নয়, বিনোদিনীও নিষ্কাম প্রেমের পূজারিণী নয়। অতৃপ্ত প্রবৃত্তি, রুদ্ধ কামনা ও হৃদয়বৃত্তি নিয়ে তারা রক্তমাংসের নারী। তবু দুই যুগের দুই ভিন্ন দৃষ্টির শিল্পীর হাতে তারা শেষ পর্যন্ত ভিন্নরূপে গঠিত হয়ে উঠেছে। চিন্তায় ও সংস্কারমুক্তিতে এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষাকৃত অনেকখানি অগ্রবর্তী হলেও শেষপর্যন্ত তাঁর অবচেতন সংস্কার-বুদ্ধি তাঁকে বিনোদিনী চরিত্রের পরিণতি স্বাভাবিক করতে দেয় নি। অথবা প্রেম সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন আদর্শবাদ রোহিণী ও বিনোদিনীকে বিভিন্ন পরিণতি দিয়েছে; একজন সমাজবিগর্হিত প্রেমের নায়িকাকে চরম শাস্তি দিয়েছেন, অন্যজন নায়িকাকে নিষ্কাম প্রেমের পূজারিণী রূপে তীর্থে নির্বাসিত করেছেন। শেষপর্যন্ত দুই শিল্পীই আদর্শবাদীর ভূমিকা নিয়েছেন।

'তিন সঙ্গী'তে 'ল্যাবরেটারি-'গল্পে 'মোহিনী' চরিত্রের কথা অবশ্যই এ আলোচনায় মনে আসে। মোহিনীর ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ দুঃসাহসিকভাবে সব সংস্কারকে ঝেড়ে ফেলে এগিয়ে এসেছেন। এখানে রবীন্দ্রনাথ অতি আধুনিক সাহিত্যিকদেরও তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। বোধহয় অস্তিবাদিদের চেয়েও এখানে তিনি পেছিয়ে নেই। কেবল বিষয়ে নয়, তার উপস্থাপনের ভঙ্গী এবং ভাষাতেও। স্বামীর সাধনার প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখতে মোহিনী অলৌকিক সতীত্বে জলাঞ্জলি দিয়ে যেন প্রকৃত সতী হয়ে উঠেছে। সম্ভবত কবির তাই বক্তব্য। তবে মোহিনী এবং নীলা ভিন্ন সমাজের নারী সেইজন্য তাদের কথা এখানে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয় নি।

শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে সমাজ-নিষিদ্ধ প্রেমকে শুধু স্বীকৃতিই দেন নি, তার ক্ষেত্রকেও প্রসারিত করেছেন। সমাজের সাধারণ জীবন-যাত্রার অন্তরালে বারবনিতাদের জীবনেও পবিত্র প্রেম যে মুকুলিত হয়ে উঠতে পারে তা একাধিক উপন্যাসে তিনি দেখাবার প্রয়াস পেয়েছেন। সুতরাং বিধবার জীবনে প্রণয় তাঁর রচনায় উল্লেখযোগ্য স্থান পাওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। উপেক্ষিত ও নির্যাতিতদের প্রতি শরৎচন্দ্রের যে সহৃদয় পক্ষপাত, তাই তাঁকে নির্যাতিত নারীত্বের প্রতিও সহানুভূতিশীল করেছে। তাঁর রচনায় সমাজের কু-সংস্কারের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্থানে স্থানে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শরৎসাহিত্যে নিষিদ্ধ প্রেমের প্রতিষ্ঠা দেখা যায় নি। শরৎচন্দ্র এই রমণীদের জন্য চোখের জল ফেলেছেন কিন্তু তাঁর সামাজিক ব্যক্তি-সত্তা এবং শিল্পীসত্তা একীভূত হয়ে সমাধান দিতে পারে নি।

বিধবার জীবনে সমাজ-নিষিদ্ধ প্রেমকে শরৎচন্দ্র প্রথম বোধহয় 'বড়দিদি' গল্পে রূপায়িত করেছেন। রচনাটি অপরিণত হলেও নরনারীর বিধি-বহির্ভূত প্রেম সম্পর্কের স্বীকৃতিতে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ভঙ্গির বৈশিষ্ট্য এখানে ফুটে উঠেছে। ইতিপূর্বে 'শুভদা'র কাত্যায়নী চরিত্রে তার আভাস ছিল। 'বড়দিদি'গল্পে মাধবী ও সুরেনের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রেম বিকশিত হয়ে উঠেছে উভয়েরই প্রায় অগোচরে। গল্পটির পরিণতিতে বিধবা মাধবীর হৃদয়াবেগ তার আজন্মের সংস্কারের উপর জয়ী হয়েছে। অবশ্য মাধবীর শেষদিকের আচরণ স্বাভাবিক বলে স্বীকার করা শক্ত। রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তের জীবনে প্রেমের যে বিকাশ দেখা গেছে, তা অনেকখানি সমাজ-সংস্কারের বাইরে, কোথাও তাদের সম্পর্ক সঠিক পরিচয়ে প্রকাশিত নয়। বিধি-সম্মত বন্ধনে কখনও তারা আবদ্ধ হল না। বন্ধনহীন প্রেমের গ্রন্থি নিয়েই শেষ পর্যন্ত তাদের পরস্পর আকর্ষণ-বিকর্ষণ চলেছে। দুটি ছিন্নমূল জীবন এই প্রেমকে আশ্রয় করে কোথাও বদ্ধমূল হতে পারে নি। অবশ্যই এ প্রেম চিত্রণে শরৎচন্দ্রের শ্রদ্ধার অভাব কোথাও একটুকুও নেই।

চরিত্রহীনের নায়িকা সাবিত্রী বিধবা এবং কুলত্যাগিনী। চরম দুর্যোগের জীবনে মেসের দাসী রূপেই পাঠকের সঙ্গে তার পরিচয়। প্রথম জীবনের নির্বোধ পদস্খলন ছাড়া সাবিত্রীকে কোন পাপ স্পর্শ করেনি। সতীশকে সাবিত্রী ভালোবেসেছে কোন মোহ নিয়ে নয়, তার হৃদয়ে বিকশিত প্রেম শতদলে নিষ্কামভাবে সে তার দয়িতের পূজা করেছে। সতীশের মঙ্গল-কামনায় নিজে স্বেচ্ছায় চরম অবমাননাকে বরণ করে নিয়েছে। প্রাণপণ সেবায় সতীশকে অধঃপতন থেকে বাঁচিয়েছে। এই অকৃত্রিম প্রেমের পুরস্কার স্রষ্টা শরৎচন্দ্র শেষপর্যন্ত সাবিত্রীকে দিতে পারেন নি। উপেন্দ্রকে বিধাতার ভূমিকায় বসিয়ে সাবিত্রীর প্রেম দেউল থেকে বিগ্রহ ছিনিয়ে নিয়ে তিনি সরোজিনীর হাতে তুলে দিয়েছেন। এতে সাবিত্রীর জীবনের ট্রাজেডি শিল্পধর্মে উপন্যাসকে কতখানি উন্নীত করেছে তা ভিন্ন প্রশ্ন। কিন্তু বোধহয় শরৎচন্দ্র বুঝি নিষিদ্ধ প্রেমকে সমাজে প্রতিষ্ঠা দিতে সাহস করেন নি।

কিরণময়ী আর একটি অদ্ভুত ও জটিল চরিত্র। সে রোহিণী ও বিনোদিনীর সগোত্র। স্বামী হারাণের জীবদ্দশায় স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক শিক্ষক-ছাত্রী পর্যায়ের এবং রসহীন ছিল তাই অনঙ্গ-ডাক্তারের সঙ্গে তার জীবনের কলঙ্কময় অধ্যায়। উপন্দ্রকে দেখামাত্র সে নাকি তাকে ভালোবেসেছিল। বিধবা হবার পরে উপেন্দ্রর একান্ত স্নেহভাজন ভাই দিবাকরকে নিয়ে সে

আরাকানে পালিয়েছে। উপেন্দ্রর মরণাপন্ন অবস্থায় ফিরে এসে এই উন্মার্গগামিণী শেষ পর্যন্ত উন্মাদিনী হয়েছে। তবু শরৎচন্দ্র বঙ্কিমের মতো কঠোর হয়ে পিস্তল উদ্যত করেন নি। মানব-হৃদয়ের অন্তস্তলে যে জটিলতা আছে, সহানুভূতির সঙ্গে তাকে আলোকিত করার চেষ্টা করেছেন। দাম্পত্য জীবনে স্বামীরকাছে প্রেমের স্পর্শটুকু সে পেল না, পূর্ণ যৌবনা অসামান্য রূপবতী যে নারী প্রেম-তৃষ্ণাতুর হয়ে খুঁজেছে মনের মানুষকে, যার কাছে তথাকথিত সতীত্বের কোন মূল্য নেই, তারও জীবনে বিশেষ ব্যক্তির জন্য প্রেম থাকা অসম্ভব নয়। প্রেমাস্পদকে না পাওয়ার প্রতিক্রিয়ায় ভুল করা তার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। শুধু এই অপরাধেই তার জন্য কঠোর সামাজিক বিধান দিতে হবে এমন কথা শরৎচন্দ্রের কাছে শ্রদ্ধেয় মনে হয় নি। তাই উপেন্দ্রের মৃত্যুকালে উন্মাদিনী কিরণময়ীর নিদ্রিত রূপটি পাঠকের মনে ঘৃণার সঞ্চার না করে করুণারই সঞ্চার করে। শরৎচন্দ্র এখানে রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনীর মতো কিরণময়ীকে কাশী না পাঠিয়ে স্বাভাবিক পরিণতিই দান করেছেন। অবশ্য সমাজে কিরণময়ীর স্থান নির্দেশ করা সম্ভব হয় নি ; তার মস্তিষ্ক-বিকার লেখককে এক্ষেত্রে রক্ষা করেছে। তবু কিরণময়ীর পরিণতি সঙ্গতিহীন নয়।

সধবা হিন্দুরমণীর জীবনে পরকীয়া প্রেমকে সমস্যা হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম উপস্থাপিত করেছেন। শৈবলিনীর জীবনে প্রতাপের প্রতি প্রেমের দুর্বার আকর্ষণ তীব্র জটিলতার সৃষ্টি করেছে। শৈবলিনীর 'বাল্য প্রণয়ের অভিসম্পাত'—তার পরবর্তী জীবনে তীব্র ঝঞ্ঝার মত এসে তাকে, গৃহত্যাগিনী করেছে। স্বামী চন্দ্রশেখর 'ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত'। উভয়ের বয়সের পার্থক্যও অনেকখানি। তার উপর চন্দ্রশেখরের অচঞ্চল দৃষ্টি পুঁথির পাতায়, দেবসেবায় ও বাইরের কাজকর্মে। চন্দ্রশেখর মাতৃবিয়োগের পর বিবাহ করতে চেয়েছিলেন কাজকর্মের প্রয়োজনে একজন বিশ্বাসী দাসীতেই যা হতে পারে। শৈবলিনীর দিকে দৃষ্টি দেওয়ার অবকাশ তাঁর নেই। তাই অবহেলিত শৈবলিনী তার দীর্ঘ অবকাশে নিরুপদ্রবে বাল্যপ্রণয়ের স্মৃতি রোমন্থন করে। স্বামীর প্রেম ও সোহাগ যদি তার অবকাশক্ষণকে ভরে রাখতো, তাহলে বোধহয় তার জীবনের গতি ভিন্নমুখী হতে পারতো। মোটকথা তা হয়নি এবং শৈবলিনী গৃহত্যাগ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাকে ক্ষমা করেন নি, শৈবলিনীর জীবন্তে নরকদর্শনের কথা পাঠকদের জানা আছে। রমানন্দ স্বামীর যোগবলের অলৌকিক ক্ষমতা সত্ত্বেও শৈবলিনীর হৃদয় প্রতাপের প্রতি আকর্ষণকে অস্বীকার করতে পারে নি। তাই প্রতাপের জীবনের মূল্যে বঙ্কিমচন্দ্র সংসারে শৈবলিনীর পুনঃ প্রতিষ্ঠাকে নিষ্কণ্টক করতে চেয়েছেন। পুরুষের হৃদয়ে পরস্ত্রী সম্বন্ধে প্রেম বঙ্কিমের কাছে অপরাধ বলে মনে হয় নি। প্রতাপ যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুকালে রমানন্দ স্বামীর কাছে শৈবলিনীর প্রতি তার গভীর প্রেমকে সে ভাষায় ব্যক্ত করে গেছে, তাই থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি। প্রৌঢ় স্বামীর যুবতী পত্নী শৈবলিনী যদি স্বামীর প্রতি কর্তব্য পালন করে গৃহে বসে প্রতাপের প্রতি প্রেমকে অন্তরে লালন করতো, বঙ্কিম তার জন্য কি শাস্তি বিধান করতেন জানি না ; তবে সম-অপরাধে (?) প্রতাপের জন্য কোনও শাস্তি বিধান করেন নি। প্রতাপ তাঁর মানসপুত্র, আদর্শ চরিত্র। তাই প্রতাপের প্রশস্তি ও তার জন্য অনন্ত স্বর্গকামনা। হাস্য রসাত্মক রচনায় অন্যত্র পুরুষ ও নারী সম্বন্ধে যে 'Brass pot ও Earthen pot'-এর কথা বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, বোধকরি সেই মানসিকতা তাঁর রচনায়

নারী প্রেমের দিক নির্দেশ করেছে। এ শুধু হাস্যরস সৃষ্টি নয়, নারী সম্বন্ধে তাঁর সামন্ততান্ত্রিক চিন্তার লঘু ভঙ্গীতে প্রকাশ। তাঁর উপন্যাসগুলিতে নারী চরিত্রে প্রেমের বিকাশ ও পরিণতির ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ পেয়েছে। সেই জন্য নারীর ক্ষেত্রে চিত্তে অন্যপরতা অপরাধ, পুরুষের ক্ষেত্রে কিন্তু তা নয়। প্রতাপ রূপসীকে অনন্যচিত্ত প্রেম দিতে পারে নি, বিবাহিতা পত্নীর প্রতি কর্তব্য করে গেছে। শৈবালিনীর মানসিক স্থৈর্যের গ্যারান্টি হিসাবে প্রতাপের মৃত্যু বরণ শৈবলিনীর প্রতি তার প্রেমকে মহিমান্বিত করেছে, কিন্তু রূপসীর পক্ষে তা কল্যাণের নয়ঃ রূপসীর প্রতি কর্তব্যবোধেও প্রতাপ এই আত্মনাশে ক্ষণিকের জন্যও দ্বিধাগ্রস্ত নয়। অবশ্য শৈবলিনীর প্রতি প্রতাপের প্রেমের মহত্বকে লঘু করা আমার উদ্দেশ্য নয়; বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গীর বিশ্লেষণের দৃষ্টান্ত হিসাবেই একথা উল্লেখ করতে চেয়েছি।

বঙ্কিমচন্দ্রেম মত রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গী রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের রচনায় অবশ্যই নেই। তবু বিচার করে দেখা দরকার সধবার জীবনে অন্য পুরুষের প্রতি প্রেম দাম্পত্য জীবনে সেখানে কি ধরণের সমস্যা সৃষ্টি করেছে এবং তাঁরা সমাধানের ইঙ্গিতই বা কি দিয়েছেন। 'নষ্টনীড়' রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস নয়, বড় গল্প। তবু বিষয়ের সাম্য হেতু তাকে এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছি।

চন্দ্রশেখর যেমন যুবতী পত্নীর মনোরঞ্জনের প্রয়োজন বোধ না করে পুঁথি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন. চারুলতার স্বামী ভূপতিও তেমনি খবরের কাগজ নিয়ে ব্যস্ত। উভয় ক্ষেত্রেই রক্তমাংসের মানুষ যুবতী পত্নী অবহেলিত। একজনের দাসীর প্রয়োজন সাধিত হয় পত্নীর দ্বারা, অন্যজনের 'কাগজের আবরণ' ভেদ করে স্ত্রীর পক্ষে স্বামীকে অধিকার করা দুরূহ হয়ে ওঠে। শৈবলিনীর বাল্য প্রণয়ের ব্যর্থ স্মৃতি ছিল; সেই স্মৃতির রোমন্থনে তার নির্জন অবকাশ অতিবাহিত হয়। ক্রমশঃ প্রতাপের স্মৃতি তাকে ব্যাকুব, গৃহবিমুখ ও প্রতাপ-অভিমুখী করে তোলে। চারুলতার সে ইতিহাস নেই, তার স্বামী মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষ। স্ত্রীকে দাসী মনে করার মতো মনোবৃত্তি তাঁর নেই। তবে চারুর জাগ্রত যৌবন ও নারীত্ব সম্বন্ধে তিনি অন্ধ। মানুষ চারুকে অবমাননা না করে তিনি তার অবকাশ যাপনের সঙ্গী জুটিয়ে দিয়েছেন অমলকে। স্বামী হিসাবে স্ত্রীর মনোরঞ্জনের, তার মনের ক্ষুধাকে তৃপ্ত করার তার প্রেমকে ধীরে ধীরে বিকশিত করে তুলে পরস্পর আদান-প্রদানে দাম্পত্য জীবনের প্রেমকে নিবিড় করে তোলার কেংন কথাই ভূপতির মনে আসে নি। এই অনবধানতার রন্ধ্রপথে তাদের দাম্পত্য জীবনে সর্বনাশ প্রবেশ করেছে। অমল সেখানে নিমিত্ত মাত্র। পরস্ত্রী শৈবলিনীর ছায়া এড়িয়ে প্রতাপ চন্দ্রশেখরের তথা শৈবলিনীর দাম্পত্য জীবনকে রক্ষা করতে চেয়েছিল। অমলও সে মুহূর্তে ভূপতির বাহ্য সর্বনাশের সঙ্গে গৃহের অভ্যন্তরের সর্বনাশকে বুঝতে পেরেছে, সেই মুহূর্তে সরে গিয়ে চারু ও ভূপতির নীড়কে রক্ষা করার চেষ্টা করেছে। প্রতাপ যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করেছে শৈবলিনীর গার্হস্থ্য জীবনকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে; অমল বিয়ে করে বিলেত পালিয়েছে চারু ও ভূপতির নষ্ট-প্রায় নীড়কে সুস্থির করতে। কিন্তু ইতিমধ্যে নীড় প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। (এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'দুই বোন' উপন্যাসে ঊর্মিমালাকে বিলেত পাঠিয়ে শশাঙ্ক ও শর্মিলার দাম্পত্য জীবনে প্রেমের সমস্যার সমাধান মনে পড়ে।)

ভূপতি যখন বাইরের আঘাতের হৃদয়-ক্ষতে দাম্পত্য প্রেমের প্রলেপ দিতে চেয়েছেন, তখন

চারুলতার হৃদয় সরে গেছে তাঁর কাছ থেকে অনেক দূরে, সমুদ্রপারে প্রবাসী দেবরের উদ্দেশে। চারু গৃহত্যাগ করে নি। সে নিরুপায় ভাবে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছে মনে মনে। বিবাহের সূত্রে সে ভূপতির সঙ্গে আবদ্ধ, আবার হৃদয়ের গভীরে প্রেম নির্ঝর জেগে উঠেছে, অমলের সোনার কাঠির ছোঁয়ায়। সে ভূপতির জন্য ডিমের কচুরিও ভাজে, লুকিয়ে অমলকে টেলিগ্রামও পাঠায়। তার বুদ্ধি তার সংস্কার ভূপতির প্রতি কর্তব্যে তাকে অনুপ্রাণিত করে; তার হৃদয় অমলের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সে একালের ভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু সেকালের খুঁটিতে বুদ্ধি তার বাঁধা। তাই বিধি-সম্মত সম্পর্ক তার অস্থি-মজ্জায় দৃঢ়প্রবিষ্ট; কিন্তু তার শিরায় ও ধমনীতে বিধি-বহির্ভূত প্রেম-তরঙ্গ প্রবাহিত। সেইজন্য ভূপতি তার আশ্রয় ও অবলম্বন অমল তার আরো অনেকখানি। এই উভয় সঙ্কটে চারু নিরুপায়। চারু 'শেষের কবিতা'র অমিতের মতো প্রেমের দুই রূপে বিশ্বাস করলে বলতে পারতো—অমল তার আকাশ, ভূপতি তার নীড়। কিন্তু কবি সে তত্ত্ব এখানে তুলতে চান নি। তাই চারুর জীবনে এর সহজ সমাধানের উপায় হিসেবে তিনি অমলকে অপ্রাপনীয় করে তুলেছেন দুটি উপায়ে। প্রথমটি অমলের বিবাহ, দ্বিতীয়টি তার বিলাত প্রবাস। স্বামী-সঙ্গ বঞ্চিত অবহেলিত সধবা নারীর জীবনে সম্ভাব্য নিষিদ্ধ প্রেমকে সমস্যা হিসেবে রবীন্দ্রনাথও তুলে ধরলেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের মতো পতিকে নারীর চরম গতি ঘোষণার মধ্যে সমাধান খোঁজেন নি। প্রাণহীন দেহের বোঝা চন্দ্রশেখরও বইলেন, ভূপতিও বহন করতে রাজী হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ চারুকে 'পাপীয়সী' মনে করেন নি, তার জন্য শাসন-যষ্টিও উদ্যত করেন নি। বরং তার প্রেমের প্রতি কবির শ্রদ্ধা গল্পে একটি করুণ আবহ রচনা করেছে। রমানন্দের হাতের পুতুল চন্দ্রশেখর পাথর; শৈবালিনীর প্রায়শ্চিত্ত চিত্তের শুদ্ধি করণ ও সংসারে তার পুনঃ-প্রতিষ্ঠার জন্যই যেন সব কর্মতৎপরতা ও আয়োজন। অন্যপক্ষে ভূপতি রক্ত-মাংসের মানুষ, তারই বিবাহিত পত্নী তাকে আশ্রয় করে, তার দৈনন্দিন জীবনকে পীড়িত মথিত করে অন্যপুরুষকে ধ্যান করবে—ভূপতির কাছে তা অসহ্য বোধ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই যেন ভূপতি বলেছেন, 'চলো চারু আমার সঙ্গেই চলো।' নিরুপায় নারীর অসহায় অবস্থায় ভূপতি হয় তো করুণা করতে চেয়েছেন। কিন্তু চারুর আত্মসম্মান তখন জেগে উঠেছে। শৈবলিনীর মতো সে চরম অবমাননাকে মেনে নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে 'সতীর পরম তীর্থ পতির চরণ' করতে চায় নি। অমলের বিচ্ছেদ ও ব্যাকুলতায় মুহূর্ত আগে যাকে একমাত্র অবলম্বন বলে মনে করেছিল, সেই ভূপতির অশ্রদ্ধার দৃষ্টি তার ব্যক্তিত্বকে জাগিয়ে তুলেছে এবং যে শান্তভাবে স্বামীর করুণাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু চারুর জীবনে প্রেম এখানে সমস্যাকে ঘনীভূত করেই তুললো। গল্পের স্বল্প পরিসরে তার সমাধান হয় তো সম্ভব হয় নি। গল্পগুচ্ছের তৃতীয় খণ্ডে 'পয়লা নম্বর' 'বোষ্টমী' ইত্যাদি গল্পেও সমস্যা উপস্থিত। রবীন্দ্রনাথের কথা-সাহিত্যে নারী-স্বাতন্ত্র্যের ঘোষণা ও তার বিধি-বহির্ভূত প্রেম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত; কিন্তু এজাতীয় প্রেম কোথাও সমাজ-প্রতিষ্ঠ নয়।

'নৌকা ডুবি' উপন্যাসে রমেশ ও কমলার সমস্যা বিধি বহির্ভূত প্রেমের সমস্যার রূপ নিতে পারতো। অবস্থার বিপাকে তাদের সে দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তার মধ্যে প্রেমের সঞ্চার ও ক্রমবিকাশ উপন্যাসে বিশেষ জটিলতা সৃষ্টি করতে পারতো। কিন্তু কবি সেদিকে না গিয়ে তাদের

চরিত্রের পরিণতি অস্বাভাবিক করে তুলেছেন। নলিনাক্ষের জন্য কমলার ব্যাকুলতা ও রমেশকে সহজে ব্যথাহীন চিত্তে তার ছেড়ে যাওয়ার মধ্যে কবির সে দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পেয়েছে তা বঙ্কিমের মতই রক্ষণশীল। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে তথাকথিত নারীধর্ম ও পতিপ্রেম সম্বন্ধে কমলার হঠাৎ ব্যাকুলতা তার চরিত্রের পরিণতিকে হাস্যকর করেছে। কবির অবচেতন মনের সংস্কার বুদ্ধি তাঁর শিল্পকেও এখানে ক্ষুণ্ণ করেছে। গ্রন্থটির প্রকাশকাল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অব্যবহিত পরে এবং গোরা রচনার অল্পদিন আগে। এই যুগে কবির মনে যে হিন্দু জাতীয়তাবাদ কিছুরূপ ধারণ করেছিল, জানি না, নৌকাডুবির রচনা কালে তার প্রভাব কাজ করেছে কি না।

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে নিখিলেশ বিমলা সন্দীপ সম্পর্কে যে সমস্যা সৃষ্টি করেছিল তার কারণ যাই হোক না কেন কবি তার সহজ সমাধানের পথ গোড়া থেকে করে রেখেছিলেন সন্দীপকে ভিলেন চরিত্ররূপে পরিকল্পনা করে। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিকই বলেছেন, "...যদি সে নিখিলেশের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী পদবাচ্য হইতে পারিত, তবে এই অগ্নি পরীক্ষার কি ফল হইত, বলা যায় না।' বিমলা সন্দীপের প্রতি মোহগ্রস্ত হয়েছিল, তাকে ভালো বাসেনি। সে মোহ যখন তার ভেঙ্গেছে, তখন সে স্বামীর পদপ্রান্তে আশ্রয় নিয়েছে। মোটকথা, বিমলার পতিপ্রেমে গোড়াতেও হিন্দু নারীর অন্ধ সংস্কার ছিল, শেষেও সেই সংস্কার দূরীভূত হল। মাঝখানে সন্দীপের আবির্ভাবের অধ্যায়টি একটি আকস্মিক উৎপাতের মতো। এই পর্বের ঝঞ্ঝা বাত্যার পর বিমলা ব্যাকুল হয়েছে নিখিলেশের ক্ষমার জন্য, নিখিলেশের তো আইডিয়ার ভূত নেমে গেছে। কিন্তু সন্দীপের প্রতি বিমলার ক্ষণিক মোহ যদি প্রেমে পরিণত হত, সন্দীপ যদি বিমলার কল্পনার আদর্শ পুরুষ হত তাহলে নিখিলেশের পা জড়িয়ে ধরে—'না না না, তোমার পা সরিয়ে নিয়ো না, আমাকে পুজো করতে দাও।'—বলতে পারত কি? নিখিলেশও কি ভাবতে পারত—'যে পূজা সত্য সে পূজার দেবতাও সত্য...'? তেমন ক্ষেত্রে বিমলার জীবনে প্রেমের সমস্যাকে কবি সমাধান করতেন কি ভাবে জানি না; তবে যা ঘটেছে তাতে বিমলার পতিপ্রেমে আবহমান কালের হিন্দু সংস্কার মিশিয়ে পতি দেবতার পূজার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 'যারে বলে ভালোবাসা, তারে বলি পূজা'—এ দৃষ্টি কোণ থেকে দেখেও বিমলার পূজাকে আতিশয্য না বলে পারা যায় না। এই পূজার আতিশায্যও বিমলা জোর পায় না মনে। তাদের দাম্পত্য প্রেমে যে বিরাট ভাঙন ঘটেছে, তা জোড়া লাগবে কি? 'দেবতা নতুন সৃষ্টি করতে পারেন কিন্তু ভাঙ্গা সৃষ্টিকে ফিরে গড়তে পারেন এমন সাধ্য কি তাঁর আছে?' আদর্শবাদী নিখিলেশ ক্ষমা করছে বিমলাকে। নিখিলেশ যে আগুন নিয়ে খেলা করতে চেয়েছিল, সেই আগুনে বিমলা পুড়েছে, নিখিলেশেরও হৃদয় দগ্ধ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত নিখিলেশের ক্ষমা স্নিগ্ধ দৃষ্টি বিমলার জীবনের দগ্ধ ক্ষতকে শীতল করতে চেয়েছে। নিজের অপরাধকে স্বীকার করে বিভ্রান্ত পত্নীকে আবার যে নিখিলেশ গ্রহণ করতে চাইলো, এখানেই বঙ্কিমের চিন্তার চেয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার প্রগতিশীলতা। তবে দাম্পত্য প্রেমের প্রতিই যেন রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাতিত্ব। দাম্পত্য প্রেমের সমস্যামূলক উপন্যাসগুলিতে প্রায় তা দেখা গেছে।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে দাম্পত্য প্রেমের সমস্যা জটিল হয়ে উঠেছে সবচেয়ে বেশী 'গৃহদাহে'।

'শ্রীকান্ত'—দ্বিতীয় পর্বে অভয়ার সমস্যাও এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'চরিত্রহীনে'র কিরণময়ীর কথা ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে। বিপ্রদাসের বন্দনার কথাও এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। অভয়ার সমস্যা ও তার সমাধান স্পষ্ট ও জটিলতা বর্জিত। অভয়ার বর্মাপ্রবাসী স্বামী অন্যনারীর সঙ্গে সংসার পেতেছে। অভয়ার প্রতি প্রেম তো দূরের কথা, কর্তব্যবোধটুকুও তার নেই। সেই দাম্পত্য জীবন ভ্রষ্ট অত্যাচারী পুরুষের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে অভয়া রোহিণীকে নিয়ে সংসার পেতেছে। কিন্তু শরৎচন্দ্র অভয়ার এই নির্ভয় সিদ্ধান্ত ও নতুন জীবন প্রতিষ্ঠাকে বাংলাদেশের সমাজের বাইরে বর্মার পটভূমিতে স্থাপন করেছেন, নারী প্রেমের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধা সত্ত্বেও বাংলাদেশের সমাজে সমাজ বহির্ভূত প্রেমকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি।

গৃহদাহ উপন্যাসে মহিম অচলা সুরেশের সম্পর্ক তীব্র জটিলতা সৃষ্টি করেছে। এই জটিলতা সৃষ্টির জন্য মুখ্যত সুরেশ ও কেদারবাবু দায়ী। অবশ্য অচলা এবং মহিমের দায়িত্বও সেই সঙ্গে আছে। এই চরিত্রগুলির প্রত্যেকটিতে এমন একটি করে দুর্বলতা আছে যা জটিলতা সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। তবে প্রত্যক্ষভাবে সুরেশই এই জটিলতার জাল বুনেছে। সে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে রোগজীর্ণ বন্ধুর প্রতি, চরম শঠতা করেছে বন্ধুপত্নীর প্রতি। কিন্তু এই বিশ্বাসঘাতকতা ও শঠতার জন্য অচলার দোলাচল মনোভাব এবং পরোক্ষ প্রশ্রয় বহুলাংশে দায়ী। সুরেশের শঠতাও বিশ্বাসঘাতকতার অব্যবহিত পরও অচলা সুরেশের প্রতি যে স্নিগ্ধ ব্যবহার করেছে, কোনও পতিপ্রেম পরায়ণা নারীর পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। সমাজ, সংস্কার, রাগ দ্বেষ ইত্যাদির ঊর্ধ্বে যে স্তরে উঠলে তা সম্ভব, অচলা সেই স্তরের বলে কেউ চিন্তা করতে পারেন না। সর্বনাশের গুরুত্ব অচলার উপলব্ধির বাইরে ছিল না। তা সত্ত্বেও নিজের উদ্ধারের চিন্তা বর্জন করে ভয়ঙ্কর প্রতারকের জ্বরতপ্ত ললাটে করস্পর্শ বুলিয়ে অচলা তাকে তৃপ্ত করেছে। এ নিরুপায় নারীর অসহায় অবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ, তার মনের নিভৃত প্রদেশ গুপ্ত পথে সঞ্চয়শীল কোনও রহস্যের চকিত প্রকাশ। সে মহিমকে ভালোবেসে বিয়ে করেছে; সে ভালবাসা তো তার মিথ্যা নয়, আবার সুরেশের প্রতি তার অজ্ঞাতে লালিত দুর্বলতাও অসত্য নয়। তার প্রেম কেবল মহিমের প্রতিই সূর্যমুখীর মত ঊর্ধ্বমুখ হয়ে থাকেনি। ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত তার মন মহিম ও সুরেশের মধ্যে নিয়মিত ভাবে না দুললেও মাঝে মাঝে দুর্বল মুহূর্তে দুলেছে। মহিমের কর্তব্য কঠোর মনোভূমির বহির্ভাগে প্রতিহত হয়ে কখনও সে তার মন একান্তভাবে সুরেশ অভিমুখী হয়নি, একথা বলা যায় না।

মোট কথা, যে কারণেই হোক, অচলার জীবনে পতি ভিন্ন অন্য একটি পুরুষ এসে স্থান জুড়ে বসেছে। অচলা এই পুরুষটিকে ভালবাসে কিনা জানে না। একদা রুগ্ন স্বামীর সেবায় দিনরাত নিজেকে নিযুক্ত রেখে সে এর সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা যখন করেছে তখনই প্রকারান্তরে এ সম্ভাবনা স্বীকৃত হয়েছে। মহিম সুরেশের মধ্যে কাকে তার হৃদয় প্রেম অর্ঘ্য নিবেদন করতে চায়, এ খবর সঠিক তার জানা ছিল না। একদিকে তার সংস্কার তাকে স্বামীর পদপ্রান্তে টেনেছে, অন্যদিকে এই শিক্ষিতা যুবতীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ তাকে স্বামী বিমুখ করে তুলেছে। এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের অভিমানে ও নারী-প্রেমে সহজাত ঈর্ষায় সে পরপুরুষের সামনে স্বামীর প্রতি প্রেমহীন

আনুগত্য স্বীকারে তিক্ত অনিচ্ছা ঘোষণা করেছে। অথচ এই শিক্ষিতা আপাত সংস্কারমুক্ত আধুনিকার সতীত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস ও সংস্কার সাধারণ বাঙালী হিন্দু রমণীর মতই রক্তে প্রবিষ্ট। তাই পরস্ত্রী-লোলুপ সুরেশের মুখে মৃণালের সতীত্ব গৌরব শুনে 'এই নারী জীবনের সতীত্ব যে কত বড় সম্পদ এতদিন পরে তাহার পরিপূর্ণ মহিমা আজই যেন তাহার চোখের সম্মুখে সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হইয়া দেখা দিল।' নিজের সতীত্বের গৌরবকে ঘোষণা করে সেদিন অচলা বলেছিল, 'সংসারে শুধু মৃণালই একমাত্র সতী নয় সুরেশবাবু! এমন সতীও আছে, যারা মনে মনেও একবার কাউকে স্বামীত্বে বরণ করলে, সহস্র কোটি প্রলোভনেও আর তাদের নড়ানো যায় না; এদের কথা আপনি ছাপার বইয়ে পড়তে না পেলেও সত্য বলে জেনে রাখবেন সুরেশবাবু!'

অথচ সেই অচলাই মহিমকে চেঞ্জে নিয়ে যাওয়ার পথে অপরিচিতা নারীর জিজ্ঞাসার উত্তরে সুরেশকে স্বামী বলে পরিচয় দিয়েছে, আচারে ব্যবহারে সুরেশের মধ্যেকার আদিম পশুটাকে জাগিয়ে তুলেছে এবং শেষ পর্যন্ত যতখানি সর্বনাশের জন্য প্রস্তুত ছিল না, তাও ঘটে গেছে। সুরেশ যখন তাকে যেখানে খুশী যাওয়ার স্বাধীনতা দিতে চেয়েছিল তখন বা তারপরে অচলা আর স্বামীর কাছে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করেনি; করলে মহিম তাকে হয়তো গ্রহণ করত। যে অপরাধ সে নিজে করেনি, তার জন্য মহিম তাকে আর গ্রহণ করবে না এই অমূলক আশঙ্কায় নিতান্ত লোকলজ্জার ভয়েই কি অচলা সুরেশের সঙ্গে ডিহরীতে রয়ে গেল স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে? দেহের পবিত্রতাও একদিন এই লোকলজ্জার ভয়ে রামবাবুর স্নেহের পীড়নে সে খুইয়েছে। সুরেশের লালসার কাছে সে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করবে কিনা, এ দ্বন্দ্ব ইতিপূর্বেই তার মনে দেখা দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত মিথ্যা সম্মান, প্রীতি ও শ্রদ্ধার মোহ' অচলার এই দ্বন্দ্বের অবসান করে দিল। লেখক বলতে চেয়েছেন মহিমের প্রতি অচলার গভীর প্রেম ছিল এবং অচলার নিজেরও তা জানা ছিল না। মৃত্যুকালে সুরেশ মহিমের কাছে বলেছে 'অচলা যে তোমাকে কত ভালবাসত, সে আমিও বুঝিনি তুমিও বোঝোনি—ও নিজেও বুঝতে পারেনি।' সুরেশ বুঝেছিল ভূতের বোঝার মত অচলার মন ছাড়া দেহের বোঝা বইতে হচ্ছিল বলে; বলেছিল—'মন ছাড়া যে দেহ, তার বোঝা এমন অসহ্য ভারী এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।' কিন্তু মহিমের প্রতি গভীর প্রেম ডিহরীর দিনগুলিতে সুরেশের প্রতি অচলাকে কাঠ করে তুলেছিল? সম্ভবতঃ তা নয়। তার আজন্মের শিক্ষা-দীক্ষা যদিও তাকে একমাত্র পুরুষের প্রতি অনন্যচিত্ত হতে শেখায়নি, তবু সতীত্ব সম্বন্ধে বাঙালী নারীর সহজাত সংস্কার তার মধ্যে ছিল। সুরেশের মুখ থেকেও নিজের সম্বন্ধে যে বিশ্লেষণ সে শুনেছে তাতে তার প্রতি সুরেশের কোন শ্রদ্ধা আছে এ কথা বিশ্বাস করার জোর পায়নি। বরং এই পরপুরুষের সঙ্গে নিন্দিত জীবন যাপন গ্লানিতে তার মনকে কালো করে তুলেছে। এইরকম জীবন যাপনের লজ্জা ও অপমান তাকে অহরহ পীড়িত করেছে। সুরেশের কাছে স্বেচ্ছায় নিঃশেষে আত্মসমর্পণে তার মনের বাধা ছিল এইখানে। মোটকথা, অচলার মনের দুই প্রকোষ্ঠে একটিতে মহিম, অন্যটিতে সুরেশের অবস্থান। এদের একজনকেও অস্বীকার করে অন্যজনের প্রতি অনন্যচিত্ত হওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই দ্বিধা-চিত্ত নারীর জীবনে প্রেমের দ্বন্দ্ব উপস্থাপনেই শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব। এখানে প্রেমের প্রচলিত ত্রিকোণ দ্বন্দ্ব নেই। একই চিত্তের দুই পিঠে যে দুই

বর্ণবৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে তাকেই রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন তিনি। এই দ্বন্দ্বই অচলার জীবনে প্রেম সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের অভাব সৃষ্টি করেছে।

কিন্তু শরৎচন্দ্রই বা কোন পরিণতিতে অচলাকে নিয়ে এসে দাঁড় করিয়েছেন? সুরেশের মৃত্যুর পর অচলা অতঃপর করণীয় সম্বন্ধে মহিমের আদেশ চেয়েছে। 'উপদ্রুত, অপমানিত, ক্ষতবিক্ষত নারী হৃদয়ের বৈরাগ্যকে' মহিম চিনতে পারেনি; তাই অচলা তার কাছে অনাবশ্যক বোঝা বলে মনে হয়েছে। অচলার কাছ থেকে সে পালিয়ে যেতে চেয়েছে। কিন্তু মহিমের মনে হয়েছে 'আজ তাহার শক্তির ডাক কেবল সহিবার জন্য পড়ে নাই—সামঞ্জস্য করিবার জন্যও পড়িয়াছে।' কিন্তু মহিম তা পেরেছে কি? রেলষ্টেশনে মৃণালকে অচলার উপায় নির্দেশ করতে বলে পালিয়েছে মহিম। রামবাবু যে ধর্মের খোলসটাকে রক্ষা করতে কাশী ছুটেছিলেন, তারই প্রাণের সন্ধান সহজ বুদ্ধিতে মৃণাল নিজের মত করে পেয়েছিল। তাই অচলার উপায় সম্বন্ধে ইঙ্গিতটা সে তৎক্ষণাৎ মহিমকে শুনিয়েছে দ্বিধাহীন ভাবে। অবশ্য রক্ত মাংসের মানুষ মহিমের আচরণ এখানে অস্বাভাবিক হয়নি। কিন্তু শরৎচন্দ্র তাকে সামঞ্জস্য বিধানের ডাক দিয়ে প্রেম তিতিক্ষা ও ত্যাগের প্রতিমা মৃণালের হাতেই অচলাকে সমর্পণ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রে আমরা প্রেমের এই দ্বৈতলীলা ও উপদ্রুত নারীর প্রতি লেখকের সহানুভূতি ও ক্ষমা কল্পনা করতে পারি না। রবীন্দ্রনাথের রচনায় অনুরূপ প্রেমের ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতা ও সহানুভূতি দেখতে পেলেও এতখানি প্রসার ও প্রকাশের এত বৈচিত্র্য দেখিনি। অচলা সুরেশের ডিহরী প্রবাস ও পরিণতির অনুরূপ ঘটনা ও পরিণতি অমল চারুলতা কিংবা সন্দীপ বিমলার ক্ষেত্রে কবি সৃষ্টি করেননি; বোধহয়, এতখানি অগ্রসর হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। ক্ষমা রবীন্দ্রনাথের কাহিনীর পরিণতিতেও আছে। তবে স্বামীর কাছ থেকে সরাসরি তা এসেছে কতকটা রক্তমাংসের উত্তাপহীন আদর্শবাদের মত, ভূপতির ক্ষেত্রে তা না হলেও নিখিলেশের ক্ষেত্রে নিশ্চয় করে বলা যায়। মহিমের ঘৃণা, আশঙ্কা, প্রেম মিলে তার পলায়নে তাকে রক্তমাংসের মানুষ বলেই মনে হয়। মোট কথা, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে সমাজ-নিষিদ্ধ প্রেমের স্পষ্ট বিবর্তন লক্ষ্য করা যায় এবং সম্ভবতঃ শরৎচন্দ্রই তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বাস্তবনিষ্ঠ ও সংস্কারমুক্ত। অবশ্য 'ল্যাবরেটরি' গল্পের মোহিনীর কথা বাদ দিয়েই একথা বলা যায়।

বঙ্কিম উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা

অশোক কুণ্ডু

বিমলা (দুর্গেঃ ১।১ ॥

'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের নারীচরিত্রগুলির মধ্যে বিমলাই সর্বাপেক্ষা সক্রিয়। এই চরিত্রে বেশকিছু অতি নাটকীয়তা থাকলেও, চরিত্রটিকে জীবন্ত বলে মনে হয়।

বিমলা যে সাধারণ শ্রেণীর স্ত্রীলোক নয়, তা' বঙ্কিম প্রথম থেকেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। শৈলেশ্বরের মন্দিরে অপরিচিত পুরুষ জগৎসিংহের সঙ্গে কথাবার্তায় সে যথেষ্ট বাকচাতুর্যের পরিচয় দিয়েছে। বিমলা যে প্রগলভা ও রসিকা সেকথা প্রথম থেকেই জানা যায়। তবে গজপতি বিদ্যাদিগগজকে নিয়ে রসিকতাটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে, এতে বিমলাচরিত্রের অনেকখানি গুরুত্ব নষ্ট হয়েছে।

বিমলার বয়স পয়ত্রিশ বৎসর। কিন্তু তার রূপে ও সাজগোজে সে যৌবনকে ধরে রেখেছে। দশম পরিচ্ছেদে বঙ্কিম বিমলার রূপের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। এই রূপ বর্ণনার মধ্যে বঙ্কিম বিমলাকে একটু সম্ভাদরের স্ত্রীলোকরূপে অঙ্কন করেছেন। প্রথমাবধি অবশ্য বিমলাকে পরিচারিকা বলা হয়েছে। এবং বিমলার এই ধরণের রূপের আগুনে এককালে বীরেন্দ্র সিংহ ও পরে কতলু খাঁ আত্মাহুতি দিয়েছে। বিমলাচরিত্র সম্বন্ধে সাধারণ নীতিবাগীশ মানুষের ধারণাটি জগৎসিংহকে লিখিত বিমলার পত্রের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে—'আমি মহা পাপীয়সী, বহুবিধ অবৈধ কার্য করিয়াছি…।' 'বিমলা নীচ জাতি সম্ভবা বিমলা মন্দভাগিনী, বিমলা দুঃশাসিত রসনা-দোষে শত অপরাধে অপরাধিনী ; কিন্তু বিমলা গণিকা নহে। যিনি এখন স্বর্গে গমন করিয়াছেন (বীরেন্দ্রসিংহ) তিনি বিমলার অদৃষ্ট-প্রসাদে যথাশাস্ত্র তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিমলা একদিনের তরে নিজ প্রভুর নিকটে বিশ্বাসঘাতিনী নহে'।

বিমলা যথার্থই বীরেন্দ্রসিংহকে ভালবাসত, তাই পরিচারিকার পরিচয়েও সে স্বামীগৃহে থাকতে দ্বিধা করেনি। স্বামীহন্তা কতলুখাঁকে হত্যা করায় অতি নাটকীয়তা থাকলেও তার স্বামীভক্তির পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। কেবলমাত্র স্বামীপ্রেমে নয়, স্নেহশীলতাতেও বিমলাচরিত্র মহিয়সী। সপত্নীকন্যা তিলোত্তমার প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা। নিজের প্রাণের বিনিময়ে সে ওসমানপ্রদত্ত অঙ্গুরীয় তিলোত্তমাকে দান করে তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র বিমলার সমগ্র পরিচয়টি অল্প অল্প করে, রহস্য উন্মোচনের মত, প্রকাশ করেছে। প্রথমেই জগৎসিংহের মুখে মানসিংহের নাম শুনে বিমলার চমক, মানসিংহের পুত্রের সঙ্গে তিলোত্তমার বিবাহ সংগঠনে বিমলার উদ্যোগের সময় অভিরাম স্বামীর ভর্ৎসনা পাঠককে এই চরিত্রটি সম্বন্ধে যথেষ্ট কৌতূহলী করে তোলে। সেই কৌতূহলের অবসান ঘটে 'বিমলার পত্রে'র দ্বারা।

উপন্যাসের মধ্যে বিমলাচরিত্রের প্রয়োজন ছিল প্রধানতঃ দুটী কারণে—তিলোত্তমা ও জগৎসিংহের প্রণয় সংগঠনে এবং কতলুখাঁর হত্যায়। তাছাড়া বিমলাকৃত অসাবধানতার সুযোগ

নিয়েই পাঠান সৈন্যরা গড়মান্দারণ দুর্গ অধিকার করেছে। পাঠান সৈনিক রহিমশেখকে ভুলিয়ে মুক্তিলাভ করার ঘটনায় বিমলার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

সমগ্র উপন্যাসে এই চরিত্রটি অগ্নিশিখার মতই জ্বাজ্বল্যমান। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র শেষরক্ষা করতে পারেন নি। জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার পুনর্মিলনকালে তাকে আশমানির সঙ্গে পরিহাসরত অবস্থায় দেখিয়ে, কতলুখাঁ-হত্যায় পতিশোকাতুরা রমণীর চিত্রটি লঘু করে ফেলেছেন।

বিষ্ণুরাম সরকার (রজনী ২।৫) ॥
বাঞ্ছারাম মিত্র তাঁর কলিকাতা নিবাসী আত্মীয়কুটুম্ব বিষ্ণুরাম সরকারকে উইলের একজিকিউটর নিযুক্ত করেন। এই বিষ্ণুরামবাবুর সততাতেই শেষপর্যন্ত রজনী বিষয়সম্পত্তি লাভ করে।

বিসমার্ক (রাজঃ ২।২) ॥
জার্মান রাজনীতিবিদ। তিনি ১৮৫১ খ্রীঃ—১৮৮৮ খ্রীঃ পর্যন্ত জার্মানীর বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। নামোল্লেখ মাত্র আছে।

বুকনেয়র (রজনীঃ ৩।৩) ॥
জার্মান দার্শনিক। বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে ইনি একাধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ব্যোমকেশ (মৃণাঃ ১।৫) ॥
হৃষিকেশের পুত্র ব্যোমকেশ পাপিষ্ঠ। মৃণালিনীর প্রতি তার অনুরাগ জন্মে। তাই সে রাত্রে গোপনে মৃণালিনীকে আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে তার নামে পিতার কাছে মিথ্যা কথা রটায়। এটি যথার্থ প্রেমের লক্ষণ নয়, লম্পটের প্রবৃত্তি মাত্র। কিন্তু শেষপর্যন্ত ব্যোমকেশকে মৃণালিনীর জন্যই নবদ্বীপে গিয়ে যবনের হাতে প্রাণত্যাগ করতে হয়েছে। তখন তার মুখে কিন্তু মৃণালিনীর জন্য তীব্র আকুতি শোনা যায়।

ব্রজেশ্বর (দেঃ চৌঃ ১।৫) ॥
'দেবী চৌধুরাণী' নায়িকাপ্রধান উপন্যাস হলেও, নায়ক হিসাবে যদি কাউকে গ্রহণ করতে হয় তা'হলে সে প্রফুল্লর স্বামী ব্রজেশ্বর। কিন্তু ব্রজেশ্বরের মধ্যে বঙ্কিম যে সব উপাদানের সমাবেশ করেছেন তাতে নায়ক হিসাবে তাকে গ্রহণ করতে পাঠকের সঙ্কোচের ভাব কাটতে চায় না।

ব্রজেশ্বর নিতান্ত সাধারণ ব্যক্তিত্বহীন চরিত্র। অন্ধ পিতৃভক্তিই তার জীবনের একমাত্র অবলম্বন। বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থখানি পিতৃদেবকে উৎসর্গ করার ফলেই ব্রজেশ্বরের চরিত্রে এ গুণটির বাড়াবাড়ি ঘটেছে কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ করার অবকাশ আছে। ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তি কোন যুক্তিবিচার মানে না, পিতার আদেশে নিরীহ প্রথমা পত্নী প্রফুল্লকে ত্যাগ করতে তার বাধে না, আবার তারপর নয়ানবৌকে ও টাকার লোভে সাগরবৌকে ঘরে নিয়ে আসতেও তার আপত্তি

নেই। বঙ্কিমচন্দ্র সেকালের দোহাই দিয়ে ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তিকে সমর্থনও জানিয়েছেন। 'বাপের সাক্ষাতে বাইশ বছরের ছেলে—হীরের ধার হইলেও সেকালে কথা কহিত না—এখন যত বড় মূর্খ ছেলে, তত বড় লম্বা স্পীচ ঝাড়ে।' (১।৫)।

ব্রজেশ্বর পিতার আদেশে প্রফুল্লকে তাড়িয়েই দিত। কিন্তু প্রফুল্লের সঙ্গে গোপন সাক্ষাতে তার অন্তরের অতৃপ্ত প্রেমাকাঙ্ক্ষা, যা দুই স্ত্রীর মধ্যে পায় নি, জেগে উঠল। প্রেমের জাগরণের সঙ্গে তার অন্তরে দৃঢ়তাও এসেছিল পিতার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার। প্রফুল্ল বারণ না করলে পিতার নিকট কিছু বলা ব্রজেশ্বরের পক্ষে তখন অসম্ভব ছিল না।

শুধু তাই নয়, প্রফুল্লকে ব্রজেশ্বর আশ্বাস দিয়েছে—'...যাহাতে আমি দুই পয়সা রোজগার করিতে পারি, সেই চেষ্টা করিব। যেমন করিয়া পারি, আমি তোমার ভরণ-পোষণ করিব।' (১।৬)

অবশ্য অনেকে বলতে পারেন, স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য তো তেমন কোন ব্যস্ততা দেখায় নি ব্রজেশ্বর। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, প্রফুল্ল ও ব্রজেশ্বরের প্রথম সাক্ষাতের পর ব্রজেশ্বর বেশি সময় পায়নি। কিছুদিনের মধ্যেই প্রফুল্ল অপহৃতা হল। ব্রজেশ্বর সে রাত্রেই প্রফুল্লের খোঁজে গিয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এসেছে।

ব্রজেশ্বর প্রফুল্লর মৃত্যু সংবাদ শুনে যেভাবে মুষড়ে পড়েছিল, তাতে তার মনের গভীরে পিতার প্রতি বিদ্বেষ ও স্ত্রীর প্রতি ভালবাসার নীরব দ্বন্দ্বেরই পরিচয় মেলে। বঙ্কিম এই অংশের বর্ণনা দিয়েছেন—'প্রফুল্লের জন্য যখন বড় কান্না আসিত, তখন মনকে প্রবোধ দিবার জন্য বলিতেন—

'পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব দেবতাঃ॥

এইরূপে ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে ভুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ব্রজেশ্বরের পিতাই যে প্রফুল্লের মৃত্যুর কারণ, সেই কথা মনে পড়লেই, ব্রজেশ্বর ভাবতেন—

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।'

প্রফুল্ল গেল, কিন্তু পিতার প্রতি তবুও ব্রজেশ্বরের ভক্তি অচলা রহিল। (১।১৬)

এ পর্যন্ত ব্রজেশ্বরকে সহ্য করা যায়। কিন্তু তারপর দেবী চৌধুরাণীর কাছে ব্রজেশ্বরের ব্যবহার নিতান্তই ব্যক্তিত্ব বর্জিত। রঙ্গরাজের সঙ্গে ব্রজেশ্বরের যুদ্ধোদ্যমে কিছু বীরত্বের আভাস আছে, কিন্তু দেবীর নৌকায় সাহেবকে অকারণ চপেটাঘাতে কোন পৌরুষ প্রকাশ পায় নি।

ব্রজেশ্বরের নারীর প্রতি কোন শ্রদ্ধা নাই। তাই—'যে দেবী চৌধুরাণীর নামে উত্তর-বাংলা কাঁপিত, তাহার কাছে আসিয়া ব্রজেশ্বরের হাসি পাইল। মনে ভাবিলেন, 'মেয়েমানুষকে পুরুষে ভয় করে, এ তো কখনও শুনি নাই। মেয়েমানুষ তো পুরুষের 'বাঁদী'। (২।৫) এই মনোভাব সেকালেরই মনোভাব। কিন্তু ব্রজেশ্বর দেবীকে নিয়ে রঙ্গরাজের সঙ্গে যে রসিকতা করেছে তাতে তার চরিত্রগৌরব বাড়েনি।

যে দেবীর ডাকাতি কার্যে ব্রজেশ্বরের ঘৃণা, সেই দেবীকে অপরিচিতা নারী জেনেও মুখচুম্বনের হঠকারিতা নিতান্তই দুর্বলচিত্ত রূপোন্মাদের লক্ষণ। দেবীর অর্থ নিয়ে কার্যোদ্ধার করে সেই অর্থ

সঞ্চয়ের উপায় সম্বন্ধে ঘৃণা পোষণই দেবীকে গঞ্জনাদান নিতান্তই সংকীর্ণ চিত্তের পরিচয়।

উপন্যাস মধ্যে ব্রজেশ্বর সর্বদাই পিতার পুত্রমাত্র থেকে গেল। কোন কাজই সে করতে পারে না। পিতা দেবীর অর্থসংগ্রহ করান কিনা সে জানে না। প্রফুল্লর সঙ্গে বিবাহের পরও তার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করে। অবশেষে মাতার সাহায্যে ব্যাপারটির সুসমাধান ঘটলে সে আনন্দিত হয়।

ব্রজেশ্বরের সাদামাঠা চরিত্রে উপন্যাসের আদর্শবাদের কোন ক্ষতি হয়নি। বরং এই রকম সাধারণ স্বামীর প্রতি অসাধারণ প্রফুল্লর ভালবাসার দ্বারা তার নিষ্কামধর্মের মহিমা আরও পরিস্ফুট হয়েছে।

ব্রহ্মচারী (বিষঃ ৩৪ পরিঃ) ॥

সূর্যমুখীর গৃহ ত্যাগের পর এই ব্রহ্মচারী তাঁকে মৃত্যুমুখ থেকে উদ্ধার করেন এঁরই চেষ্টায় সূর্যমুখী স্বামীর কাছে ফিরে আসতে পারেন। চরিত্রটি পরোপকার প্রবৃত্তির প্রকৃষ্ট উদাহরণস্বরূপ।

ব্রহ্মঠানদি (দেঃ চৌঃ ১।৩) ॥

ব্রহ্মঠানদি ব্রজেশ্বরদের বাড়িতে কি সম্পর্কে সকলের ঠানদি তা জানা নেই, তবে তার সঙ্গে সকলেরই মধুর সম্পর্ক। ব্রজেশ্বরকে তিনি যারপরনাই স্নেহ করেন, তাঁর মন বোঝার ভার পড়ে তাঁর উপর। সাগরবৌ তাঁর চরকা ভেঙে আবার রূপকথা শোনার জন্য আবদারও করে। ব্রহ্মঠানদি মধুর বাৎসল্য রসের উৎস।

ব্রহ্মানন্দ ঘোষ (কৃঃ উঃ ১।১) ॥

কৃষ্ণকান্তের আশ্রিত। সে একজন নিরীহ ভালমানুষ। কৃষ্ণকান্ত তাকে দিয়েই লেখাপড়ার কাজ করাতেন। ব্রহ্মানন্দ সাধারণ মানুষের মতই লোভী। তাই হরলালের একহাজার টাকার লোভে সে উইল জাল করতে সম্মত হয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত সাহসে কুলাল না। ব্রহ্মানন্দ একটু কবিতাপ্রিয়ও ছিল। সে রোহিণীর নামে কলঙ্কের কথা শুনে গোবিন্দলালকে পত্র লিখেছে—'ভাই হে! রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়—উলুখড়ের প্রাণ যায়।'

গান্ধীজির জীবনপ্রভাত ॥ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য। **বিদ্যাসাগর** ॥ নমিতা চক্রবর্তী। জিজ্ঞাসা—কলিকাতা-৯। মূল্য ২'০০

আজকের বাংলাদেশের দিকে চাইলে মনে হয় চিন্তার দৈন্য সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। একদিন যে এই বাঙালী চিন্তায়, কর্মে, জ্ঞানে সারা ভারতবর্ষকে এগিয়ে দিয়েছিল আজ সেই বাঙালী অন্তহীন হতাশায় আচ্ছন্ন, আত্মকলহের গ্লানিতে জর্জরিত। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করি নিজেকে, এই দৈন্যগ্রস্ত হীনতার কি কারণ। অন্যান্য সব কথার মধ্যে যেটা বড় হয়ে দাঁড়ায় সেটা হলো কতকগুলি বিশেষ মূল্যবোধের অপসারণ ও লুপ্তি। আজ শ্রদ্ধা, বিনয়, চর্চা প্রভৃতির প্রতি বাঙালী যুবক সম্প্রদায় বিমুখ, আত্মগঠনে যে পরিমাণ অলস, চেতনাহীন নিষ্ফল উত্তেজনার আলোড়নে সেই পরিমাণ উন্মুখ। পঠনপাঠনে, সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যায়, খেলাধূলায় রাজনৈতিক আন্দোলনে সেই আত্মগঠনের প্রয়াস নেই, অন্যের উপর দায় চাপানোর ও ত্রুটি সন্ধানের তৎপরতা আছে তার ফল কি আজকের বাঙলাদেশের মানসিক মানচিত্রই তা ধরিয়ে দিচ্ছে।

এই যখন দেশের অবস্থা তখন নাটক-নভেল, সস্তা রাজনৈতিক পুস্তিকার ভীড় ঠেলে কিছু বই-য়ের দেখা পাওয়ার দরকার যেখানে জীবনগঠনের সাধনার ইতিহাস আছে। যে জীবন সৌখীন রাজনীতির দলীয় কলহের উত্তেজনায় অবসিত নয়, যে জীবন কোন গুরুর পুঁথির অনুশাসনের মাপে নিজের বোধ আর বুদ্ধিকে ছেঁটে নেয় নি, যে জীবন গড়ে উঠেছে পলে পলে নিজের অভিজ্ঞতা, ভুল-ভ্রান্তি ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে। সেই জীবনের বাল্য কাহিনী রচনা করেছেন শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য। বাল্যকাহিনীর মধ্যেই আছে কেমন করে কোন উপাদান থেকে গান্ধীজির মতো এক বিরাট জীবন গড়ে উঠলো। গান্ধীজির আত্মচরিতে ও অন্যান্য পূর্ণাঙ্গ জীবনীতে এ-সব কাহিনী আছে কিন্তু তবু এই সরল গদ্যে প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা বইটির প্রয়োজন ছিল। বাঙালী তরুণ জানুক 'চালাকি করিয়া মহৎকর্ম হয় না'—তার পিছনে কি পরিমাণ অনুশীলন থাকে, কি পরিমাণ সাধনা থাকে। গ্রন্থটি ছাপার জন্য প্রকাশককে ধন্যবাদ, লেখককে অভিনন্দন—কিন্তু এই সুপরিকল্পিত গ্রন্থটির অধিকতর প্রচার প্রয়োজন। প্রকাশককে সে ব্যাপারে যত্নবান হতে অনুরোধ করি—শুধু তাঁর স্বার্থে নয় দেশের স্বার্থেই।

আর একখানি বই ওই সঙ্গেই হাতে এসে পড়লো। নমিতা চক্রবর্তীর বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কয়েকখানি তথ্যসমৃদ্ধ গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনার চেষ্টা ইতিপূর্বে বাংলায় হয়েছে তবু শ্রীমতী চক্রবর্তীর গ্রন্থের অনাদর হবে না। চণ্ডীচরণ, শম্ভুচরণ বা বিনয় ঘোষের জীবনী সকলের জন্যে নয়। যাদের অবকাশ আছে, তথ্যবিচারের দৃষ্টি আছে তারা ঐ সব গ্রন্থ থেকে বেশি উপকৃত হবেন। যাঁরা বহুকালের মধ্যে দেশের দিকে দৃষ্টিকে জাগ্রত রেখেছেন, দেশনেতাদের জীবনীর মধ্য থেকে প্রাণবায়ু সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন এই গ্রন্থটির জন্য তাদের অপেক্ষা ছিল।

আর একবার বলতে ইচ্ছে করে জীবনীচর্চার ধারা অব্যাহত হোক, দেশের তরুণসমাজের উপর এই সব জীবনের প্রভাব পড়ার পথ যেন খোলা থাকে।

সোমেন্দ্রনাথ বসু

সবেমাত্র বেরিয়েছে
ক্রীমটি সত্যিই ভাল!

SADHANA
Beauty
CREAM
ANTISEPTIC
Indispensable for Women
সাধনা
বিউটি
ক্রীম

Regd No. C-315 Phone : 23-5155 February '68 (0'50) Central Regd. No. R.N.2602/57 SAMAKALII

সমকালীন

পঞ্চদশ বর্ষ ॥ ফাল্গুন ১৩৭৪

Orient
ENGINEERED
TO OUTLAST
MANY MANY SUMMERS
Orient
CEILING FAN
GUARANTEED FOR TWO YEARS
ORIENT GENERAL INDUSTRIES LTD.
CALCUTTA-54
ASP/OGI-2/66

Statement in Form IV of the Registration of Newspapers (Centrel) Rules, 1956.

SAMAKALIN

1.	Place of Publication	Calcutta.
2.	Periodicity of its Publication	Monthly.
3.	Printer's Name	Anandagopal Sengupta.
	Nationality	Indian.
	Address	24, Chowringhee Road, Calcutta.
4.	Publisher's Name	Anandagopal Sengupta.
	Nationality	Indian.
	Address	24, Chowringhee Road, Calcutta.
5.	Editor's Name	Anandagopal Sengupta.
	Nationality	Indian.
	Address	24, Chowringhee Road, Calcutta.
6.	Names and address of individuals who own the newspapers and partner or shareholders holding more than one per cent of the total capital.	Anandagopal Sengupta. *Propietor.* 24, Chowringhee Road, Calcutta-13.

I, Anandagopal Sengupta, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief. (Sd.) A. G. SENGUPTA.

Dated, 1st March, 1968. *Signature of Publisher.*

সবেমাত্র বেরিয়েছে
ক্রীমটি সত্যিই ভাল
SADHANA
Beauty
CREAM
ANTISEPTIC
Indispensable for Women
সাধনা
বিউটি
ক্রীম
S Ph. 2/67

ইনি স্কুলের একজন শিক্ষক। দেশ ও জাতির প্রতি অনলস সেবার স্বীকৃতি হিসেবে তিনি একটি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছেন। এই পুরস্কার বা এই সম্মানই অবশ্য তাঁর আনন্দের উৎস নয়। তিনি বলেন, "আমার সন্তানরা তাদের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে আর সেই জন্যই আমি সুখী। আমার দুটি মেয়ে। একটি মেয়ে কলেজের লেকচারার হয়েছে অন্যটি ডাক্তারি পড়ছে। ছেলেমেয়ে কম হওয়াই

ভালো কারণ তাতে ছেলেমেয়েদের যেমন উপযুক্তভাবে মানুষ করা যায় তেমনি নিজেদেরও দুর্ভাবনা কম থাকে। আমি সেজন্যই সুখী।"

ইনি সুখী।

আপনি ?

পঞ্চদশ বর্ষ ১১শ সংখ্যা

ফাল্গুন তেরশ' চুয়াত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

মনোমোহন চক্রবর্তী

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বাঙ্গলার চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসত মহকুমার অন্তর্গত কাঠোর গ্রামে মনোমোহনের জন্ম হয়। মনোমোহনের পিতা দ্বারিকচন্দ্র চক্রবর্তী কলিকাতার হিন্দু কলেজ হইতে সিনিয়র স্কলারশিপ্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী শিক্ষা বিভাগে যোগদান করেন। হুগলী ও বাঁকুড়া জেলায় কিছুদিন কাজ করার পর তিনি পুরীর সরকারী বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধানশিক্ষক নিযুক্ত হন। এই সময়ে বর্তমানকালের ওড়িশা রাজ্য বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিছুদিন পর তিনি পুরী জেলার স্কুলসমূহের সহকারী পরিদর্শকের পদলাভ করেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারিকচন্দ্র কটকের সরকারী ট্রেনিং স্কুলের অধ্যক্ষপদে আসীন হন ও দীর্ঘ কর্মজীবনান্তে এই স্থান হইতেই অবসর গ্রহণ করেন। একজন অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ ও সচ্চরিত্র পুরুষ হিসাবে ওড়িশা রাজ্যের জনসাধারণের নিকট দ্বারিকচন্দ্র বিশেষ সম্মানভাজন ছিলেন। ওড়িয়া ভাষায় তিনি কয়েকটি পাঠ্যপুস্তকও রচনা করেন।

মনোমোহন পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। পিতার কর্মস্থল কটকেই তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কটক রাভেন্‌শ্ কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্ররূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে রাভেন্‌শ্ কলেজের ছাত্ররূপে মনোমোহন বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকত্ব লাভ করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা ফ্রীচার্চ ইন্সটিটিউশনের ছাত্র হিসাবে তিনি উদ্ভিদ-বিদ্যায় (Botany) সর্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ডিগ্রি অর্জন করেন। অতঃপর আইন অধ্যয়ন করিয়া ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মনোমোহন বি-এল্ উপাধি লাভ করেন। এই বৎসরই তিনি প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং কটকের ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট্‌পদে নিযুক্ত হন (মার্চ, ১৮৮৬)। আবাল্য ওড়িশায় বাসহেতু মনোমোহন এই প্রদেশ এবং ইহার অধিবাসিদের প্রতি বিশেষ অনুরাগাপন্ন ছিলেন। ওড়িয়া ভাষাতেও তাঁহার বিশেষ দক্ষতা জন্মে। সংস্কৃত ভাষাতেও মনোমোহনের বিশেষ অধিকার জন্মিয়াছিল।

ইংরাজ শাসনকালে যাঁহারা ওড়িশার প্রাচীন ইতিহাসাদি আলোচনার সূত্রপাত করেন তাঁহাদের মধ্যে এণ্ড্রু ষ্টার্লিং, আই-সি-এস (১৭৯৩-১৮৩০), ডাঃ উইলিয়াম হাণ্টার, জন বীমস্‌ (আই-সি-এস) ও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও কটকে ডেপুটিম্যাজিস্ট্রেটরূপে কর্মরত থাকাকালে ওড়িশায় প্রাপ্ত কয়েকটি প্রাচীন তাম্র শাসনের পাঠোদ্ধারপূর্বক এতৎ সম্বন্ধে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে (J. A. S. B) কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রচিত "এণ্টিকুইটিস্‌ অফ্‌ উড়িষ্যা" গ্রন্থটি দুইখণ্ডে যথাক্রমে ১৮৭৫ ও ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ছাত্রজীবনে এই দুই বাঙ্গালী মণীষীর দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়াই সম্ভবতঃ মনোমোহন কর্মজীবনে প্রবেশ করিয়া ওড়িশার ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চায় মনোনিবেশ করেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৭ পর্যন্ত সুদীর্ঘ একাদশ বর্ষকাল মনোমোহন ওড়িশার কটক, যাজপুর, পুরী প্রভৃতি স্থানে কর্মরত ছিলেন। এই সময় তিনি ওড়িশার পুরাবৃত্ত ও প্রাচীন সাহিত্য উত্তমরূপে অধিগত করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ওড়িশার বিভিন্ন স্থাপত্য কীর্তিস্থানগুলি পরিদর্শন করেন এবং বহু তাম্রশাসন, শিলালিপি, প্রাচীন পুঁথি প্রভৃতি সংগ্রহ করেন। এই সব উপকরণের সাহায্যে তিনি ওড়িশার অন্ধকারাচ্ছন্ন অতীতকে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে আলোচনা করায় মনোনিবেশ করেন। মনোমোহনের পূর্বসূরীগণ সময়, সুযোগ ও উপকরণের অভাব অথবা অন্যকারণবশতঃ বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে অগ্রসর হইতে পারেন নাই, বহু দোষ-ক্রটি তাঁহাদের রচনাগুলিকে ভারাক্রান্ত করিয়াছিল। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের পূজারীগণ কর্তৃক পুরুষানুক্রমে লিখিত ও রক্ষিত 'মাদলাপঞ্জী'গুলির উপর রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা অতিরিক্ত আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন। ওড়িশার প্রাচীন ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে 'মাদলাপঞ্জী'গুলি মূল্যবান মনে করিলেও মনোমোহন ইহাদের উপর পূর্ণরূপে নির্ভর করেন নাই। তাম্রশাসন, শিলালেখ ও প্রাচীন পুঁথি প্রভৃতিতে লিপিবদ্ধ বিবরণের আলোকে তিনি 'মাদলাপঞ্জী'গুলির সাক্ষ্য কতদূর বিচারসহ তাহা নিরূপণ করেন। মাদলাপঞ্জীগুলি যে বহু ভ্রমপ্রমাদ ও অতিশয়োক্তিবহুল মনোমোহনের এই মতটি প্রসিদ্ধ ইংরাজ ভারততত্ত্বজ্ঞ জন ফেথ্‌ফুল ফ্লীট্‌ কর্তৃক সমসাময়িককালেই সমর্থিত হয়। ওড়িশায় প্রাপ্ত প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও ওড়িয়া সাহিত্য অধ্যয়ন মনোমোহনের গবেষণায় বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। ওড়িশার প্রাচীন সাহিত্যসাধকগণ সম্বন্ধেও মনোমোহন গবেষণায় ব্রতী হন। ওড়িশাবাসীর সংস্কৃত ও ওড়িয়া ভাষা চর্চার ইতিহাস রচনায় মনোমোহনই প্রথম পদক্ষেপ করেন।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে মনোমোহন কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৮৯২ হইতে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মনোমোহন সোসাইটির জার্নাল ও প্রসিডিংসে ওড়িশার ভূগোল, প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস ও প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে অনেকগুলি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করিয়া প্রকাশ করেন

(১ক—ঞ)। ওড়িশা সম্পর্কিত তাঁহার আরও দুইটি প্রবন্ধ "বিহার য়্যাণ্ড ওড়িশা রিসার্চ সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয় (২ক—খ)। এই প্রবন্ধ গুলি ডিমাই সাইজের প্রায় আড়াইশত পৃষ্ঠা অধিকার করিয়া আছে। ওড়িশা সম্বন্ধে গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলি ব্যতীত মনোমোহন রচিত উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি পুস্তিকাটিও উল্লেখযোগ্য (৩)। গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত কটক ও বালেশ্বর জেলা দ্বয়ের "গেজেটিয়র"এ ওড়িশার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধীয় অধ্যায়গুলি মনোমোহন কর্তৃক রচিত হয় (১৯০৬-৭)।

মনোমোহনের সমসাময়িক ও পরবর্তীকালে যাঁহারা ওড়িশার ইতিহাসাদি আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই মনোমোহনের গবেষণায় উপকৃত হইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক রীতিতে ওড়িশার ইতিহাস, ইতিহাসবর্ণিত স্থানসমূহের অবস্থিতি, ঐতিহাসিক পাত্রদের কালানুক্রম, প্রাচীন গ্রন্থকর্তা ও গ্রন্থ রচনাকাল এবং সাধারণভাবে প্রাচীন সাহিত্য-সংস্কৃতি আলোচনায় তিনি যে একজন পথিকৃৎ ছিলেন একথা ওড়িশার বর্তমান পণ্ডিতগণ কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিয়া থাকেন (দ্রঃ—Orissa Historical Research Journal, Vol VI, PII)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ওড়িয়া ভাষায় এম-এ পাঠ-ক্রম প্রবর্তিত হইলে এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নালে ১৮৯৭-৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত মনোমোহন রচিত ওড়িশার ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক নিবন্ধটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পাঠ্য নির্বাচিত হয় (১-ঙ)। এই সময়ে মনোমোহন জীবিত ছিলেন না।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের পর হইতে মনোমোহন গয়া, জাহানাবাদ, মেদিনীপুর, শ্রীরামপুর হাওড়া, হুগলী, চব্বিশ পরগণা, খুলনা ও ত্রিপুরায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে কার্য করেন। মধ্যে মধ্যে কলিকাতাতেই তিনি বিশেষ কোন কাজের ভারপ্রাপ্ত হইতেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বাঙ্গলা দেশ বিশেষতঃ কলিকাতা বা সন্নিহিত অঞ্চলে অবস্থানের জন্য মনোমোহন কলিকাতাস্থিত এশিয়াটিক সোসাইটির কর্মধারার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। এশিয়াটিক সোসাইটির অনেকগুলি সভায় তিনি প্রবন্ধাদি পাঠ করেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি অশোকের অনুশাসনাবলীতে পশু সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গ বিষয়ে তাঁহার একটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (৪)। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও মৌলিক গবেষণায় দক্ষতার স্বীকৃতি স্বরূপ মনোমোহনকে অতিসম্মানিত 'ফেলো'রূপে সম্মানিত করেন।

ওড়িশার প্রাচীন ইতিহাস আলোচনায় যে-কোন গবেষকের পক্ষে যেমন মনোমোহনের রচনাবলীর শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই প্রাচীন বাঙ্গলার ইতিহাস, ভূগোল ও শিল্পকলা সম্বন্ধীয় আলোচনায়ও এই কথা প্রযোজ্য। বাঙ্গলার ইতিহাস আলোচনায় যাঁহারা ধুরন্ধররূপে পরিচিত তাঁহারা সকলেই বাঙ্গলার রাজগণের ও প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী পণ্ডিতগণের কাল নির্ণয়ে, তাম্র শাসনাদির পাঠোদ্ধারে, ইতিহাস বর্ণিত অধুনা বিস্মৃত স্থানসমূহের সঠিক অবস্থিত নির্দ্ধারণ প্রভৃতি বিবিধ প্রসঙ্গে মনোমোহনের গবেষণার সাহায্য লইয়াছেন। বাঙ্গলাদেশের প্রামাণ্য ইতিহাস ঢাকা বিশ্বদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত "হিষ্ট্রি অফ বেঙ্গল" (১ম ও ২য় খণ্ড) পুস্তকের বহুস্থানে মনোমোহন লিখিত নিবন্ধাবলী হইতে বহু উপাদান এই গ্রন্থের সুবিজ্ঞ লেখকগণ অকুণ্ঠ স্বীকৃতি সহ ব্যবহার করিয়াছেন। বাঙ্গলার ইতিহাসের ও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের কয়েকটি প্রসঙ্গে মনোমোহনই

প্রথম আলোচনার সূত্রপাত করেন। এই সব আলোচনার সূত্র ধরিয়া পরবর্তী গবেষকেরা আলোচ্য বিষয়ে সাফল্য লাভ করিয়াছেন। পরবর্তী গবেষণায় মনোমোহনের বহু সিদ্ধান্ত অকাট্য প্রমাণিত হইয়াছে। বাঙ্গলার ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে মনোমোহনের বহু গবেষণামূলক রচনা এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয় (৫, ক-চ)। ওড়িশার ন্যায় বাঙ্গালীর ঘনিষ্ঠতম প্রতিবাসী মিথিলার ইতিহাস সম্পর্কেও মনোমোহন সোসাইটির জার্নালে একটি দীর্ঘ নিবন্ধ প্রকাশ করেন (৫-ছ)। প্রাচীন ওড়িশার সাহিত্য আলোচনায় মনোমোহন যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন প্রাচীন বাঙ্গলা ও মিথিলার সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনাতেও তাঁহার সেই কৃতিত্ব পরিস্ফুট হয়। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গাধিপ লক্ষ্মণ সেনের সমকালে ধোয়ী নামে একজন বাঙ্গালী কবি "পবন-দূত" নামে সংস্কৃত ভাষায় এক কাব্য রচনা করেন। মেঘদূতের অনুকরণে লিখিত এই পুস্তকের কাব্য-সৌন্দর্য ব্যতীত বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির এক সভায় "পবন-দূত" কাব্যের বিষয় সর্বপ্রথম শিষ্ট-সমাজের গোচরীভূত করেন। মনোমোহন এই সংবাদ পাইয়া বহুদিনের পরিশ্রমে পবন-দূতের একটি পুঁথি বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের রঘুরাম তর্করত্নের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন এবং ইহা সম্পাদন করিয়া এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত করেন (৫-জ)। পরে তিনি এই ধোয়ী কবি ও সেনরাজকালে বাঙ্গালী কবিগণের সংস্কৃত রচনা সম্বন্ধে এই জার্নালে আর ও দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (৫, ঝ, ঞ)। শেষোক্ত প্রবন্ধটিতে অনিরুদ্ধ, ঈশান, উদয়ন, উমাপতি ধর, কেশব সেন, জয়দেব, যোগেশ্বর, ধোয়ী, পশুপতি, বলভদ্র, বল্লাল সেন, ধর্মাধিকরণ, মাধব সেন, বেতাল, ব্যাস, সরণ, শ্রীধরদাস প্রভৃতি কবিদের পরিচয় প্রদত্ত হয়। ইহাদের অনেকেরই নাম সর্বপ্রথম মনোমোহনের রচনাটি হইতেই পাওয়া যায়। শ্রীধরদাস "সদুক্তি কর্ণামৃত" নামে একটি অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য সংগ্রহের সঙ্কলন কর্তা। ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে মনোমোহনই সর্বপ্রথম সদুক্তি-কর্ণামৃতের অস্তিত্বের প্রতি পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

জগতে মস্তিষ্কচর্চার ইতিহাসে বাঙ্গালীর নব্য-ন্যায় একটি বিশিষ্ট কীর্তি। বাঙ্গালীর এই কীর্তি-উদ্ধারে মনোমোহনই সর্বপ্রথম সাধক। দীর্ঘকাল পরিশ্রমের পর ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে মনোমোহন এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে একটি সুদীর্ঘ নিবন্ধে যথাক্রমে বাঙ্গলা ও মিথিলায় নব্য-ন্যায় চর্চার ইতিহাস বিবৃত করেন (৫-ট)। এই প্রবন্ধে যে ৪৩ জন নৈয়ায়িকের পরিচয় প্রদত্ত হয় তাহাদের মধ্যে ২৩ জন ছিলেন বঙ্গ-সন্তান। এই প্রসঙ্গে সুধী পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন—"বিগত অর্ধশতাব্দী মধ্যে তিনজন মাত্র মনীষী স্বয়ং পুঁথিপত্র ঘাঁটিয়া নব্য-ন্যায়ের ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন—৺মনোমোহন চক্রবর্তী, শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ (S. B. Studies III IV) ও ৺ফণিভূষণ তর্কবাগীশ (ন্যায় পরিচয়), ইহাদের লেখা আমাদের নিত্য-সহচর ও পথ প্রদর্শক।" (বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, বঙ্গেনব্যন্যায়চর্চা, ভূমিকা, পৃঃ-১২)।

ন্যায় শাস্ত্রের ইতিহাস চর্চার সঙ্গে সঙ্গে মনোমোহন বাঙ্গলা ও মিথিলায় স্মৃতি শাস্ত্র চর্চা সম্বন্ধেও অতি উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে মনোমোহন ভবদেব ভট্ট সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ আলোচনা প্রকাশ করেন (৫-ঠ)।

ভবদেব ভট্ট সর্বকালের বাঙ্গালীর মধ্যে একজন অতি বিশিষ্ট পুরুষ। ইনি একাদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। বীরভূম জেলার সিদ্ধল গ্রামনিবাসী এই পণ্ডিত বঙ্গরাজ হরি বর্মার সান্ধিবিগ্রাহিক মন্ত্রী ছিলেন। ইনি ভুবনেশ্বরের অনন্তবাসুদেবের মন্দির নির্মাণ করান। ইনি স্মৃতিশাস্ত্র বিষয়ে কর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি, প্রায়শ্চিত্ত নিরূপণম্‌, সম্বন্ধ বিবেক ইত্যাদি নামে অনেকগুলি স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেন, এই গ্রন্থগুলি সমসাময়িক ও উত্তরকালীন বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত করিত। বাঙ্গলা দেশের লোক-স্মৃতিতে 'ভাটরাজা' নামে পরিচিত ভবদেব ভট্টের জীবন ও কৃতির পূর্ণ বিবরণ ইতিহাসসম্মতভাবে বাঙ্গালী পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপনের কৃতিত্ব মনোমোহনের প্রাপ্য। ভবদেব ভট্ট ব্যতীত সেন-পূর্বকালীন জীমূতবাহন ও সেনযুগীয় অনিরুদ্ধ, বল্লাল ও হলায়ুধ এবং পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর শূলপানি, কুল্লুক, শ্রীকর আচার্য, শ্রীনাথ, হরিদাস তর্কবাগীশ, রঘুনন্দন, অচ্যুত চক্রবর্তী, রামভদ্র, গোবিন্দানন্দ প্রভৃতি স্মার্ত পণ্ডিতদের বিশদ পরিচয়যুক্ত মনোমোহন রচিত একটি প্রবন্ধ দুইভাগে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয় (৫-ণ)। নব্য-ন্যায় সম্পর্কীয় নিবন্ধে মনোমোহন উল্লিখিত পণ্ডিতদের সম্পর্কে যে কালনির্ণয় করিয়া দেন তাহা উত্তরকালে প্রাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে সাধারণভাবে সঠিক প্রমাণিত হইয়াছে। সেনরাজ-কালে যাঁহারা সংস্কৃত কাব্য রচনা করেন অথবা স্মার্ত পণ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ করেন ইঁহাদের সঠিক কাল নির্ণয়ে ও বাঙ্গলা ও মিথিলার নব্য-ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্রের ধারাবাহিক বিবর্তনের যথাযথ বিবরণ রচনায় মনোমোহনের দান চির-স্মরণীয়।

সংস্কৃত-সাহিত্যের একনিষ্ঠ ছাত্র মনোমোহন কবি কালিদাস সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি ও লণ্ডন এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে মনোমোহনের কালিদাস সম্বন্ধে একাধিক গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হয় (৫, ত ; ৬ক-খ)।

সিকিমের তাম্রমুদ্রা সম্বন্ধেও মনোমোহন এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (৭)।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাস হইতে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাস পর্যন্ত বাঙ্গলা প্রেসিডেন্সীর জেলাগুলির বিবরণ (গেজেটিয়ার্স) সঙ্কলনের জন্য মনোমোহনকে বঙ্গীয় সরকার এই কার্যের সহকারী অধিকর্তা নিযুক্ত করেন। এই গেজেটিয়ার্সগুলি ও. ম্যালি নামে একজন ইংরাজ রাজকর্মচারী দ্বারা সর্বপ্রথম সঙ্কলিত ও প্রকাশিত হয়। এই সময়ে গেজেটিয়ার্সগুলির সামগ্রিক পুনর্লিখনের কাজে মনোমোহন সাধারণভাবে ও. ম্যালির সহায়তা করেন। এই সুসংস্কৃত গেজেটিয়র প্রকাশের সময় হুগলী ও হাওড়া জেলার গেজেটিয়র সম্পাদকরূপে ও. ম্যালির সহিত মনোমোহন চক্রবর্তীর নামও উল্লিখিত হয় (কলিকাতা ১৯০৯, ১৯১২)। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট কর্মদক্ষতার জন্য তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে মনোমোহনকে বঙ্গীয় সরকার বাঙ্গলাদেশের জেলা ও বিভাগগুলির পুনর্গঠন সম্বন্ধে একটি 'রিপোর্ট' রচনার জন্য একটি বিশেষ পদে নিয়োগ করেন। এই 'রিপোর্ট' রচনা (৮) মনোমোহন কর্তৃকসম্পন্ন হইলে তাঁহাকে পুনরায় চব্বিশ পরগণার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করা হয়। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলা

ম্যাজিস্ট্রেটের পদে উন্নীত হইয়া তথায় কর্মে যোগদান করেন।

দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কর্মের গুরুশ্রমের অবসরটুকু মনোমোহন অধ্যয়ন ও নিবন্ধ রচনায় ব্যয় করিতেন, ইহার ফলে অকালেই তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ছয় মাসের অবকাশ লইয়া মনোমোহন কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন ও এই বৎসরের অক্টোবর মাসে তিনি চাকুরি হইতে পূর্ণ অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের বৎসরকালের মধ্যেই ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর তিনি কলিকাতার এণ্টালী পল্লীস্থ ১৪ সংখ্যক পামার বাজার রোডস্থ স্বীয় বাসভবনে পরলোকগমন করেন। এই সময় তাঁহার বয়স হইয়াছিল মাত্র ৫৬ বৎসর। মৃত্যুকালে তিনি তিন ভ্রাতা, একটি ভগ্নী, বিধবা পত্নী, নয়টি পুত্র ও চারিটি কন্যা রাখিয়া যান।

বিশ্বস্ত সুদক্ষ রাজকর্মচারী ও প্রশাসক মনোমোহন লোক-সমাজে বিনয়ী, মিষ্টভাষী ও পরোপকারীরূপে খ্যাত ছিলেন। কলিকাতায় নিজ বাস পল্লীতে তিনি "কমলা লাইব্রেরী" নামে একটি পাঠাগার, একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এণ্টালী পল্লীতে মনোমোহন স্থাপিত "কমলা-লাইব্রেরী" এখনও বিদ্যমান আছে, এই লাইব্রেরীতে মনোমোহনের একটি চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মনোমোহনের মৃত্যুর পর তাঁহার স্মরণার্থ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে নভেম্বর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক পরিষদ মন্দিরে একটি শোক-সভা আহুত হয়। এই সভার সভাপতিরূপে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিদ্যা-চর্চার নানা ক্ষেত্রে মনোমোহনের বিপুল দানের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরবর্তীকালে পরিষদ-মন্দিরে মনোমোহনের একটি আলেখ্য রক্ষিত হয়।

মনোমোহন তাঁহার প্রথম জীবনে বাঙ্গলা সাময়িকপত্রে দুই একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। উত্তর জীবনে তিনি বাঙ্গলা লিখিবার অবসর পান নাই। দুর্ভাগ্যের বিষয় মনোমোহনের পুস্তকাকারে মুদ্রিত রচনার পরিমাণ অতি অল্প। সারা জীবনের সাধনায় রচিত মনোমোহনের অমূল্য নিবন্ধগুলি কয়েকটি গবেষণামূলক পত্রিকার কয়েকশত পৃষ্ঠাতেই শুধু নিবদ্ধ রহিয়াছে। পুস্তকাকারে মুদ্রিত মনোমোহনের রচনার পরিমাণ অতি অল্প। অবশ্যই মনোমোহনের রচনাগুলির মূল্য অদ্যাপিও হ্রাস পায় নাই। উড়িষ্যার প্রাচীন ইতিহাস ও সাহিত্য, প্রাচীন বাঙ্গলার ইতিহাস, ভূগোল, সংস্কৃত কাব্য, ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্র প্রভৃতি নানা বিভাগে মনোমোহনের রচনাগুলি অর্ধ-শতাব্দীরও অধিককালের ব্যবধানে জিজ্ঞাসু গবেষকদের নিকট সমভাবেই আদরণীয় আছে। বিদ্যা-চর্চা মনোমোহনের জীবিকা ছিল না। প্রশাসন কার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়াও তিনি দৈনন্দিন জীবনে জীবিকার সহিত সম্পর্ক রহিত বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা করিয়া দেশের জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে অল্পায়ু জীবনে গবেষণা কার্যে মনোমোহন যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহার তুলনা অতীব বিরল।

(১) Journal of the Asiatic Society of Bengal.
(ক) Troy Weights and genoral currency of ancient Orissa, 1892.
(খ) Rama tankis, 1892.
(গ) Uriya Inscriptions of the 15th & 16th centuries, 1893.

(ঘ) Two Copper plate inscriptions of Kulastambha—Deva, 1895.

(ঙ) Notes on the language and literature of Orissa 1897, 1898.

(চ) Date of Jaganatha Temple of Puri, 1898.

(ছ) An inscription of Kapilenera Deva, 1900.

(জ) Chronology of the Eastern Ganga Kings of Orissa, 1903.

(ঝ) Certain unpublished drawings of antiquities of Orissa and northern ci(ars, 1908.

(ঞ) Notes on the geography of Orissa in the sixteenth century, 1916.

(২) Journal of the Bihar and Orissa Research Society.

(ক) Oriya Copper plate inscription of Ramachandra Deva 1916.

(খ) An Oriya inscription from Konaraka, 1917.

(৩) Caves of Khandagiri and Udaigiri in Puri district—Pub. by Govt of Bengal.

(৪) Animals in the inscriptions of Pyadasi (Memoris of Asiatic Society), 1906.

(৫) Journal of the Asiatic Society of Bengal.

(ক) An inscription of Nayapala Deva, 1900.

(খ) Notes on the Geography of old Bengal, 1908.

(গ) Certain disputed or doubtful events in the history of Bengal, Muhammadan Period, 1908, 1909.

(ঘ) Bengali temples and their general characteristic, 1909.

(ঙ) Notes on Gaur and other old places of Bengal, 1909.

(চ) Pre-Mughal mosques of Bengal, 1910.

(ছ) History of Mithila during pre-Moghul period, 1915.

(জ) Pavanadutam by Dhoyika with an appendix on Sena Kings, 1905

(ঝ) Supplementary notes on Dhoyika and on the Sena Kings, 1906.

(ঞ) Sanskrit literature in Bengal during Sena Rule, 1906 (157-176).

(ট) History of Nabya Nyaya in Bengal and Mithila, 1915 (P. 259-292).

(ঠ) Bhatta Bhavadeva of Bengal, 1912.

(ড-ণ) Contributions to the history of Smriti literature in Bengal and Mithila, P I (Bengal), P II (Mithila), 1915.

(ত) On the genuineness of the eighth canto of Kumar-Sambhabam, 1916.

(৬) (ক) Date of Kalidasa J. R. A. S. (Lond) 1903.

(খ) Kalidas and Guspta Age J. R. A. S. 1904.

(৭) Sikkim Copper Coins (J. A. S. B), 1909.

(৮) A summary of the changes in the jurisdiction of Districts in Bengal (1757-1916), Calcutta, 1918.

ঘরেবাইরে বটতলা

জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ জ্বালার প্রস্তুতি থাকে ভোরবেলায় সলতে পাকানোয়। বিশ্বসভ্যতার যে দৃষ্টি-গ্রাহ্য প্রমাণ-সাহিত্য তার ভোরবেলাকার খবর আনতে গেলেও এ সত্য প্রমাণিত হয়। বাংলা দেশে যা উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ঘটেছে সাহিত্যের ক্ষেত্রে সে ঘটনারই পূর্বসূরী বিলেতের ষোড়শ শতাব্দী।

সাহিত্যের একটি চরম ধাপ মুদ্রণ। শতং বদ মা লিখ এ নির্দেশকেই যখন জ্ঞানী-গুণীরা বিবর্তিত করে বলেছিলেন শতং লিখ মা ছাপ (কথাটা কি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের?) তার অনেক আগে থেকেই লেখকেরা লিখেছেন। তালপাতার পুঁথি থেকেই এ রীতির রেওয়াজ। কিন্তু 'লেখা কুমারী' 'ছাপা সুন্দরী' হয়ে উঠল মুদ্রণযন্ত্রের সহবাসে। পুঁথির ছিন্নপত্রে যার স্থান তিনি যখন মুদ্রণের সূর্যম্পশ্যা হলেন তখন সভ্যতার প্রথম কিরণে সাহিত্যের রূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল বই কি। এই মুদ্রণের 'মূল্য' কি অপরিসীম একটু আলোচনা করলেই তা বোঝা যেতে পারে। এরকম মুদ্রাযন্ত্রই বাংলা সাহিত্যকে 'মৌখিক' পাঁচালী থেকে লিখিত গদ্যের রূপ দিল। বস্তুত বাংলা দেশে গদ্যের পদাঙ্ক এঁকেছে এই মুদ্রাযন্ত্রই। মুখে মুখে ধরে রাখা ছন্দবদ্ধ কবিতার পাশে এখন 'গদ্য' সাহিত্যও এসে দাঁড়াল।

এতদিন লেখক সত্যিই লিখতেন (কতকটা হাতে লেখা পত্রিকারই আত্মীয় ধরা যেতে পারে) এবং সে 'লেখা'র পাঠক হতেন কেবলমাত্র রাজা। একটিমাত্র খামখেয়ালী রাজার আনুকূল্যই তখন লেখকের কল্পনার কামনা। কালিদাস থেকে ভারতচন্দ্র এই রীতিরই স্বপ্ন। কিন্তু খামখেয়ালী রাজা যে লেখকের 'জাত' নষ্ট করবার বদভ্যাসে ব্রতী হয়ে লেখাটারই 'জাত' মেরে দিতেন অন্যখানে তা লেখকেরাও জানতেন। পোষা ঐতিহাসিক কাফি খাঁ অথবা 'রাজকবি' ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল (যা নাকি না পড়ে ফেলে রাখলে রস গড়িয়ে পড়ে যেত!) এই রাজারই অত্যাচার। কর্মহীন ঐশ্বর্য নরকের দ্বারপথে নিয়ে যেত রাজাকে। হারেমের 'একনিষ্ঠা সতী' তখন পানসে হলেও লেখকের 'রস'-সম্ভার পরিবেশন অরুচিকর মনে হতো না। তাই অক্ষম রাজার যৌন ব্যভিচারের উপকরণ হয়ে উঠত রাজকবির 'রসরচনা-সম্ভার'। আর একটিমাত্র রাজার কৃপা, দয়া, দাক্ষিণ্য, আনুকূল্য এই ছিল লেখকজীবনের ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ।

কিন্তু 'মুদ্রণ' আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে রাজার এই একনায়কত্ব ঘুচল। রাজার রাজত্বকালেও তাঁর পারিষদবর্গও বঞ্চিত থাকল না। যৌন ব্যভিচারের ক্ষেত্রে তৃতীয়জন ক্রাউড হলেও অশ্লীল রস উপভোগের ক্ষেত্রে শুধু তৃতীয় কেন, গোষ্ঠিবদ্ধ উপভোগটাই রাজারা ভালবাসতেন। কিন্তু রাজার যুগ পেরিয়ে এখন 'বাবু'র হুজুগ 'বাবু'ই এখন সমাজের চূড়ামণি। সমাজ সংস্কার-এর নামে সমাজ শাসন, সতীদাহ, কৌলীন্যপ্রথার ধারক, বাহক ও সংরক্ষক। আর সন্ধ্যার অন্ধকারে এই বাবুরাই পোষা বুলবুলি অথবা কবির লড়াই দেখেন শোনেন—খিস্তি খেউড়ের জন্য লাঠিয়াল সম্পাদক রাখতেও

পেছুতেন না। আবার ভিন্নদলের সম্পাদককে গুম করতেও ইতস্তত করতেন না।

জীবনস্বত্বে ভাঁড় কেনারই বিকৃত বিবর্তন হয়েছিল ভাড়াটে সম্পাদক রাখায়। নোটের ঘুড়ি ওড়ানর মতই বিকৃত বিলাস ছিল তত্ত্বগত ভাবে যৌন চর্চা? বিপুল অর্থ ও নারীদেহ ভোগে পুরুষকে চিরযৌবনের মৌরসী পাট্টা দিতে পারে না বলেই এবার চাই বিকৃত বাসনা উপশমের উপযুক্ত মাধ্যম। ঘরের কোণে 'Blue print' দেখা অথবা কীলারের ঘরে দুমুখো আয়না রাখা হয়তো এই প্রবৃত্তিরই বিবর্তন।

সত্যি সে এক বিচিত্র যুগ। 'মুদ্রণ' শিল্পের প্রত্যুষের কথা বলছি। ধরা যাক ষোড়শ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের কথা। সবে তখন মুদ্রাযন্ত্র তার ডানা মেলেছে বিলেতের আকাশে। কিন্তু ইতিহাস একই। ইংল্যাণ্ডে সাহিত্য জগতেও রাজা বা বাবুর রাজত্বের যখন অবসান হল, একরাতেই তখন সাহিত্যের ভাগীদার হল জনসাধারণ। তারা সবাই পড়তে পারেন—মতামত প্রকাশ করতেও পারেন। আফগানিস্থানের ব্যবসাদার এখনও ষোড়শী কুমারী এনে নবাবের হারেমে ভরতে পারেন কিন্তু। সাহিত্য রাজসভার নবরত্ন আজ অন্দরমহল ছেড়ে এসে দাঁড়িয়েছেন বহুজনের হাটে। সবাই পাঠক-সমালোচক হতে বাধা নেই।

কিন্তু এই পাঠক সমালোচকদের একটু দেখা যাক। অদম্য ধনস্পৃহায় দুহাতে বণিকের মানদণ্ড ও রাজদণ্ড নিয়ে ওরা তখন পৃথিবীর তিনভাগে ছড়িয়ে পড়েছে। জলদস্যুতা তখন ওদের জীবিকা, রাজ্য জয় ওদের লক্ষ্য। অবশ্যই মুখে বাইবেলের বাঁধা বুলি (এ বাইবেল ছাপাতেও মুদ্রাযন্ত্রটি এদের কম উপকার করে নি।) কিন্তু রাজনর্তকী এখন বাইরের ডাকে সাড়া দিলেও নৃত্যসুধা পান করার মত মনের অবসর কোথায়। সাহিত্যের ভোজে পাত পাতার সময় কই জলদস্যুদের। মনেপ্রাণে শতকরা একশ ভাগ ব্যবসায়ীর জাত তখন এই মুদ্রাযন্ত্রের ভোরবেলাটিকে কাজে লাগাতে চাইল অন্যভাবে। বহু বল্লভতাকেই তখন আদিরসের ভিয়েনে চাপিয়ে মুখরোচক করে তুলল। অতি সংক্ষিপ্ত এবং অতি উত্তেজক। তীর থেকে অনেক দূরে এবং এক নাগাড়ে অনেক দিন থাকার অসুবিধা জলদস্যুরাও তখন এ বইয়ে মেটাতে পারল। ছোট্ট ছোট্ট বইয়ে সাহিত্য-সুন্দরী তখন যৌনতার স্বল্প বসনে নেমে এল জলদস্যুদের আহ্বানে। অশিক্ষিত জলদস্যুরা সুদূর সমুদ্রে বসেও মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে জৈবিক চাহিদা মেটাবার নতুন উপায় পেয়ে খুশি হল।

ক্রমশ জন্ম নিল বিলেতী বটতলা 'জনসভার সাহিত্য'। কিন্তু ব্যবসার নিয়মই হল: নাল্পে সুখম্ অস্তি, আরো লাভের লোভ। পাইরেসী যার রক্তে, কমার্সিয়াল পাইরেসীর নামে তারা যে এবার 'লিটারারী পাইরেসী সুরু করবে এ আর নতুন কথা নয়। দরিদ্র লেখকের নাকের ডগার থেকে টাকা রেখে অতি অল্প দামে আমূল কপিরাইটে হাত বাড়ালো পাইরেটরা। বহু পাঠকের দরবারে আপন সাহিত্য হাজির করার প্রথম সুযোগ পেয়ে দরিদ্র লেখকও জ্ঞাতসারেই হয়তো লোভের দরজায় পা দিল। শুরু হল, 'বিলেতী বটতলার ভোরবেলা'।

কিন্তু পাঠক মানেই তো শুধু যৌন রসের খদ্দের নয় 'বৃদ্ধ' ও বালকরা রয়েছে, বালকদের অবশ্য Purchasing power নেই কিন্তু বৃদ্ধরা? সস্তায় স্বর্গে যাবার টিকিট পাবার জন্য ধর্মগ্রন্থের চাহিদা বাড়ছে 'বৃদ্ধ' জনসাধারণের কাছে। তারা রামায়ণ মহাভারত চান আর 'সুধী' বৃদ্ধরা চান

খ্যাত লেখকের সাহিত্য সম্ভার, সস্তায়। ১৬৩৬ সালে হামস্ক্রে ছাপালেন মিলটনের কাব্য সঙ্কলন। জেকব ট্রয়লাস ছাপালেন নাটক ট্রয়লাস ও ক্রেসিডা—১৬৯৭ সালে ভার্জিলের অনুবাদ।

কিন্তু এসবই আজকের ভাষ্যে 'প্রেস্টিজ পাব্লিকেশন'। সেল নেই জেনেও এসব বই ছাপাতে হত, খিস্তি খেউড়ের সঙ্গে ভারসাম্য রাখবার জন্য। আসল উদ্দেশ্য কিন্তু স্বতন্ত্র। প্রকাশক বুঝেছেন পাঠক কি চায়—লেখককে তাঁরা বুঝিয়েছেন বেষ্ট সেলার বইয়ের জন্য কি কি চাই। রাতের গোপন অন্ধকারে শিকারী হায়নার মত প্রকাশকের দল লোকের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াতেন কপিরাইটের আশায়। 'রাতারাতি' ও 'সচিত্র' ছাপাতে হবে সেসব বই। 'রাতারাতি' কারণ 'জানাজানি' হয়ে গেলে অন্য প্রকাশক হামলে পড়বে লেখকের কাছে আর 'সচিত্র' কারণ যৌন বইয়েরও শেষসীমা আছে। এবার ছবি না দিলে আর পাঠক কিনতে উৎসাহ পায় না। লেখক টাকার গন্ধে ফরমাইসি পাণ্ডুলিপিতে আদি রসের ভাণ্ডার উজার করে দিলেন। একা কৃষ্ণচন্দ্রের পক্ষেও ভারতচন্দ্রকে এতটা উলঙ্গ করা সম্ভব হত কিনা সন্দেহ।

হেথা নয় হেথা নয়—যৌনতার শেষ সীমায় এসে প্রকাশক এবার নতুন ফন্দি ও ফিকির খুঁজলেন। এবার চাই নামী লেখকের দামী বইয়ের সস্তা সংস্করণ। লেখক-প্রকাশকদের কপিরাইট ফাঁকি দিয়ে রাতের অন্ধকারে অবৈধ সংস্করণ প্রকাশ করতে হবে। বাজারে যে বই দু' পাউণ্ডে পাওয়া যাচ্ছে সে বই আমরা দোব দু' শিলিং-এ। কারণ আমরা তো লেখককে কপিরাইটের পয়সা দোব না। দিনের আলোয় ন্যায্য গণ্ডায় কপিরাইট দিয়ে যে বই ছাপাবে সে এখন লোকসানের টাল সামলাক।—কোর্ট কাছারীও ছিল অবশ্য—অভিযোগ ক্ষেত্রবিশেষে আইন আদালতেও গড়াত কিন্তু প্রকাশকের নাম তো অজানা—তাই দোষী 'অজ্ঞাত', (কতকটা অধুনা একই নামের লেখকের ব্যাপারে আজকাল যা ঘটে থাকে) শাস্তি দেবার পাত্র খুঁজে পাওয়াই শক্ত।

কিন্তু বিলেতী বটতলার সবটুকুই কি লণ্ডনের গ্রাব ষ্ট্রীটের নিছক অন্ধকার? না, নিজেদের অজান্তে এরা পৃথিবীর পরম উপকারও করে গেছে। মুদ্রাযন্ত্রের বয়ঃসন্ধিকালটুকু পার করে গৌরবময় যৌবনের সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে গেছে তাকে। এরাই পৃথিবীতে প্রথম সেক্সপীয়ারের বইও প্রকাশ করেছে। ফ্রাঙ্ক মাম্বি বলেছেন ১৫৯৪ সালে জন ডাণ্টার নামে এক পাইরেট প্রকাশকই সেক্সপীয়রের টিটাস এনড্রোনিকস ছাপিয়ে ছিলেন সর্বপ্রথম—১৫৯৭ সালে আবার রোমিও জুলিয়েট। অবশ্য এবার ছদ্মনামে।

বিলেতের এই বটতলাটুকু না থাকলে হয়তো বহু নাটকেরই সন্ধান পাওয়া যেত না। সেযুগে সাহিত্য ছিল দৃশ্য-নাটকে। রাজার যুগ পেরিয়ে বাবুর হুজুগে। আর নাটক থিয়েটারে চলাকালীন তার কপিরাইট থাকত থিয়েটারের মালিকের। নাটক অভিনয় বন্ধ হলে তার নাট্যকার তা মুদ্রিত ও প্রকাশ করতে পারতেন। কিন্তু নাটকটি সম্বন্ধে কৌতূহল তো তখন থিতিয়ে যাবে! বটতলা তো আর প্রতীক্ষা করতে পারে না ততদিন! প্রকাশক এখন টিকিট কেটে হলে ষ্টেনোগ্রাফার ঢুকিয়ে দিতেন, তারা সর্টহ্যাণ্ডে গোটা নাটকটি টুকে আনত। এইভাবেই কুখ্যাত ডাণ্টার রোমিও জুলিয়েট প্রকাশ করেছিলেন। ১৬০২ সালে আর্থার জনসনও ঐভাবেই 'দি মেরী ওয়াইভস অফ উইণ্ডসর' নাটকটি প্রকাশ করেন। এক্ষেত্রে অবশ্য নাট্যকার জানতেন কিন্তু

থিয়েটারের মালিক জানতেন না। নাট্যকার Hey wood তার নাটক'কুইন এলিজাবেথের' ভূমিকায় তাই লিখেছেন। দ্যাট সাম বাই ষ্টেনোগ্রাফী ড্রিয়ু
দি প্লট : পুট ইট ইন প্রিণ্ট
স্কেয়ার্স ওয়ান ওয়ার্ড ট্রু

কিন্তু তবু এই পাইরেটরাই সেদিন নাটককেও বইয়ের পাতায় ধরতে চেয়েছিলেন! এটাও কম কথা নয়। সেক্সপীয়রের প্রথম প্রকাশক জনডাণ্টারের প্রকাশক চরিত্রটি অবশ্য মোটেই সুবিধের ছিল না। বহু অশ্লীল যৌন সাহিত্যরও প্রকাশক তিনি। 'দি রিটার্ণ ফ্রম পার্নামাস' নাটকে ডাণ্টার চরিত্রটি সেদিন আশ্চর্যভাবে ধরা পড়েছে। সেখানে ডাণ্টার কোন এক 'ইনজেনিও সো' নামক বইয়ের পাণ্ডুলিপির খদ্দের। লেখকের দৃপ্ত দাবী বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে তিনি আদিরস পরিবেশনে চূড়ান্ত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন এবং এতে বাজার মাত হবেই। ডাণ্টার কিন্তু এই লেখকেরই আগের 'রগরগে' বই ছাপিয়ে প্রত্যাশিত 'মুনাফা' পান নি। অবশেষে ডাণ্টার নিমরাজি হলেন কিনতে, দাম দিতে চাইলেন চল্লিশ শিলিং ও এক বোতল মদ। লেখক অবশ্য অন্তত একটা স্যুটের দাম চাইলেন। ডাণ্টার পাণ্ডুলিপির নাম জানতে চাইলেন। লেখক বললেন—'এ ক্রনিকেল অফ কেমব্রিজ কাকোণ্ডম'। উত্তেজক নামটা শুনে ডাণ্টার রাজী হলেন। তখন বটতলার লেখক প্রকাশক দুজনে মিলে মদ খেতে গেলেন পার্শ্ববর্তী কোন বারে। ডাণ্টারের এই নির্ভুল চরিত্র-বর্ণনা! যেকোন পাইরেট প্রকাশকেরই এই চরিত্র। সাহিত্য সভ্যতা সংস্কৃতির গালভরা গল্প তাঁরা বলতেন না। কেবলমাত্র লাভের জন্যই তাঁরা বইয়ের ব্যবসা করতেন। বই তাঁদের কাছে অন্যতম পণ্যদ্রব্য মাত্র, তাই বই বিক্রী তাঁদের কাছে টাকা পেটার একটা বাহন ছাড়া আর কিছুই নয়। নাটক টোকা, পাণ্ডুলিপি চুরি, অশ্লীল চরিত্রের বই ছাপান—এ সবই তাঁদের ব্যবসা, কোন 'কীর্তি' নয়। তারা সে দাবী করার কথা কোনদিন কল্পনা করতে পারতেন কিনা সন্দেহ!

এযুগে স্বীকৃতভাবে বই প্রকাশ হত খুবই কম। বছরে হয়তো কেবলমাত্র একখানা, বড় জোর পাঁচখানা। কিন্তু অবৈধ সন্তানের জন্ম হত প্রচুর। এ ছাড়া ভাল বই এরা পাত্তা দিত না মাঝে মধ্যে দু' একটা কাব্য সঙ্কলন ইত্যাদি যাও বা ছাপাতেন তা Prestige-এর জন্য নয় কপিরাইট ফাঁকি দিয়ে রাতের গোপনে ছাপিয়ে সস্তায় বিক্রির জন্যে। এর জন্য লেখক কিন্তু কপিরাখটের বাবদ তার টাকা পেতেন না। ফলে স্বীকৃত ভাবে যাঁরা কপিরাইট কিনতেন তারাই বিব্রত হতেন। ১৭০৯ সালে রাণী এ্যান কপিরাইট এ্যাক্ট পাশ করিয়ে এই অবৈধ সন্তানদের জন্মরোধ করলেন। এখন কেবল রাতের অন্ধকারে যৌন বই ছাপান হতে থাকল। কিন্তু বটতলা সম্রাটদের স্বুবর্ণযুগ ক্রমশই শেষ হয়ে যেতে লাগল, কারণ মূদ্রাযন্ত্রের জন্মের পর ভোর তখন কেটেছে। কৈশোর-লীলা পেরিয়ে মূদ্রাযন্ত্র তখন অজস্র সম্ভাবনায় মুকুলিত।

এ্যাডিসন তাই বলেছেন—একদল ডাকাত ছিল তখন যাদের আমরা লেখকেরা বলি পাইরেট; এই পাইরেটরাই পৃথিবীতে নতুন বই ছাপা হলেই তা সে উপন্যাস কবিতা অথবা ধর্মপুস্তক যাই হোক না কেন, ছোট সাইজে তার নকল বই ছাপাত, বিক্রি করতো কম দামে যেমন চোররা চোরাই মাল বিক্রী করে কম দামে।

রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনষ্টাইন, বন্ধুত্ব-ইতিহাস

অশ্রুকুমার সিকদার

রবীন্দ্র তোষামোদের প্রতিক্রিয়া

পাশ্চাত্যে রবীন্দ্রপ্রতিভার অনুরাগীদের বিরক্তির অন্যতম কারণ ছিল ভারতীয় রবীন্দ্রানুরাগীদের ভক্তি, ভাবালুতা, অতি উচ্ছ্বাস, যা কোনো কোন ক্ষেত্রে প্রায় তোষামোদের পর্যায়ে পড়ে। এই দোষে শুধু যে ভারতীয় ভক্তবৃন্দ দোষী ছিলেন তা নয়, রবীন্দ্রনাথের পাশ্চাত্যদেশীয় ভক্তদের মধ্যেও এই রোগ সংক্রামিত হয়েছিল। পাশ্চাত্যের এই 'disgusting' রোগকে ডি, এইচ, লরেন্স নাম দিয়েছিলেন, 'wretched worship of Tagore attitude' (ওটোলিন মোরেলকে লেখা চিঠি মূর সম্পাদিত পত্রাবলীর প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য)। পাশ্চাত্যে অনেক ব্যক্তি আছে, বিশেষত মহিলা, যারা কোনো প্রফেট, এমনকি মেকি প্রফেট পেলেও তার দলে জুটে যেতে দেরি করে না। রোটেনষ্টাইনের প্রথম থেকেই ভয় হয়েছিল বুঝি এই জাতীয় অনুরাগীর ভিড় রবীন্দ্রনাথের চারিদিকে গড়ে ওঠে ; এই আশঙ্কার কথা তিনি 'Men and Memories'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ করেছেন--

I was concerned only lest Tagore's saintly looks, and the mystical eliment in his poetry, should attract the Schwarmerei of the sentimentalists who abound in England and America, and who pursue idealists even more humgrily than ideals. Tagore had, indeed, all the qualities to attract such.

রোটেনষ্টাইনের এই আশঙ্কা যে নিতান্ত মিথ্যা ছিল না তার প্রমাণ আছে জ্যাকব এপষ্টাইনের আত্মজীবনীতে। এপষ্টাইন যখন রবীন্দ্রনাথের ব্রোঞ্জে তৈরি আবক্ষমূর্তি নির্মাণে রত তখন—

He posed in silence and I worked well. On one occesion two American women came to visit him, and I remember how they left him, retiring backwords, with their hands raised in worship···He carried no money and was conducted about like a holy man.

এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথকে নয়, রবীন্দ্রানুরাগীদেরই দোষী করেছেন তাঁরা, যাঁরা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পেয়েছিলেন মনীষা, কবিপ্রতিভা, বন্ধুত্বের এবং মানবতার উত্তাপ। Speaight তাঁর বইতে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন—আরনেষ্ট রীস একদা সান্ধ্যভোজের টেবিলে বলেন প্রত্যেক কবিরই 'Vanity' থাকে। কবির পার্শ্ববর্তী দুই শিষ্য হাত তুলে প্রতিবাদ করেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মৃদু হেসে বলেন—'Yes, Mr. Rhys is right. I am full of it.' (১) এই ঘটনার উল্লেখ করে Speaight জানিয়েছেন—

It was, in fact, the sycsphantic flattery of Tagore's diciples which both

amused and irritated the Rothenstein family.

ইংরেজরা বিশেষ করে আত্মপ্রকাশে অনুচ্ছ্বাসিত, ইংরেজি ভাষাই নাকি উনভাষণের ভাষা, তাই তারা আবেগের অতি প্রকাশকে সন্দেহের চোখে দেখে, অতিবাদী আবেগকে তারা আন্তরিক বলে বিশ্বাস করতে পারে না। এই জাতীয় অতি আবেগ প্রবণতার উদাহরণ উক্ত জীবনীকার দিয়েছেন রোটেনষ্টাইনকে লেখা (২৪ ডিসেম্বর ১৯১২) ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের পত্রাংশ উদ্ধার করে—

To sit down to write to you is like sitting down to prayer or meditation. All petty interests and mundane vanities, giddy fancies and self pleasing humours, all the sweet and secret indulgence of fond self-love and fonder self-conceit must be laid aside, like the day's clothes at the doors of the temple when the gong is sounded for evening worship; laid aside with a high and holy resolve, with solemn abjurations and renunciations, which, as they strip to the skin, leave one fresh and pure, innocent and free, as in the prime from the hand of God...My friend, this is what you are to me, to Tagore, to Sen...

মনে হতে থাকে লেখার ঝোঁকে কথার পর কথা সাজানো হয়েছে, বাক্য দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে, বক্তব্য অস্পষ্ট হয়েছে, বন্ধুত্বের গভীরতা প্রতিপাদন হয়নি বরং অতিবাদে সন্দিগ্ধ ইংরাজের চোখে এই বন্ধুবন্দনা আন্তরিকতা বিবর্জিত অর্থহীন উচ্ছ্বাস বলে মনে হয়েছে। এই জাতীয় উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ, ভাবালুতায় গদগদ, বিতর্কবিরহিত ভক্তির আবেগ রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে থাকতো বলে তা রবীন্দ্রমনীষার অনুরাগীদের পক্ষে ক্ষোভের কারণ হয়েছিল। আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডে রোটেনষ্টাইন সেই মনঃক্ষোভের কথা বলেছেন—

No man's company gives me more pleasure than Tagore's but among his diciples I am uncomfortable...These men who specialise, as it were, in idealism, give me the sense of discomfort that I feel among other men who do not practise but preach. I marvel always at Tagore's patience with such, who weaken his artistic integrity by flattery, as they weakened Rodin's.

অন্যত্র তিনি আবার বলেছেন খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পাশে এসে জুটেছিল এইসব স্তাবকের দল, যারা কোনো কোনো সময় তাঁর মত সত্যদর্শীকেও বিভ্রান্ত করেছিল। রোটেনষ্টাইনের আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ড থেকে উদ্ধৃত করছি—

But great fame is a perilous thing, because it affects not indeed the whole man, but a part of him, and is apt to prove a tyrannous waste of time. Tagore, who had hitherto lived quietly in Bengal, devoting himself to poetry and to his school would grow restless. As a man longs for wine or tobacco, so Tagore could not resist the sympathy shown to a great idealist. He wanted to heal the wounds of the world...No man respected truth ; strength of character, single mindedness

and selflessness more than Tagore ; of these qualities he had his full share. But he got involved in contradictions. Too much flattery is as bad for a Commoner as for a King. Firm aud frank advice was taken in good part by Tagore, but he could not always resist the sweet syrup offered him by injudicious worshippers. (২)

এই খ্যাতির বিড়ম্বনা সম্বন্ধে একেবারে অচেতন ছিলেন না। রোটেনষ্টাইনকে লেখা তাঁর অনেকগুলি চিঠিতে সেই সচেতনতার পরিচয় পাই। আর্বানা থেকে ১৫ ডিসেম্বর ১৯১২ তারিখে যখন এই চিঠি লিখলেন তখন খ্যাতির বান ডাকেনি অথচ তখনই রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

This fame in a foreign land has a strange fascination and I am afraid it was growing upon me ; I was unconsciously getting into the habit of expecting it more and more. But I must get out of it.

শান্তিনিকেতন থেকে লিখলেন ৬ জুলাই ১৯১৭ তারিখে—

This sudden reputation, which like a bombshell, has burst upon the once delightful obscurity of my solitude has not yet fully spent its force. It seems to have caused a permanent disturbance in the atmosphere of my life giving rise to a perpetual tornads of duststorm. I am struggling to fly away from this, but has become a part of myself.

এই খ্যাতি, স্তুতি যে পরিণামে শিল্পের সত্যকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে এই ভয় রবীন্দ্রনাথের মনেও যে জেগেছিল তার প্রমাণ বন্ধুকে লেখা ২৫ জুলাই ১৯১৯ তারিখে লেখা চিঠির কয়েকটি বাক্য—

One must have ample privacy and leisure to be fully true to oneself...It is the sub-concious mind which is creative—and to inrade its silence with ceaseless chatter is to make its sterile.

সম্পূর্ণ সচেতন হওয়া সত্ত্বেও তথাকথিত শিষ্যের দল কবিকে গুরু ও প্রবক্তার আসনে বসিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বকে কিছু পরিমাণে প্রভাবিত করেছিল একথা রোটেনষ্টাইন-পুত্র স্যার জনের আত্মজীবনী 'Summer's Lease' পড়লেও মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এক জায়গায় তিনি লিখেছেন—

Bearded, Wearing a turban and a long soutane of undyed silk, he would be seated serenely like a Budha with worshippers at his feet. In the presence of worshippers, as he was too often, his eyes would assume a faraway look and his voice a dreamy intonation, which together evoked an ideal personification of the wisdom of the East...My father loved and admired Tagore, but he often became impatient of the attitudes of the public personality.

তিনি আরো বলেছেন ব্যক্তি ও বন্ধু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রবক্তা রবীন্দ্রনাথের 'dichotomy' মার্কিনদেশ থেকে ফেরার পর আরো বেশি প্রকট হয়েছিল, যে মার্কিনদেশে তিনি 'extraordinary

adulation'-এর সঙ্গে অভ্যর্থিত হয়েছিলেন।

যদিও হয়তো মজার খেলা হিসাবেই আরম্ভ হয়েছিল কিন্তু সম্পর্কের সমস্ত ভুল বোঝাবুঝি, তোষামোদে বিরক্তি, জাতিবৈরীগত কারণ, জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সংঘর্ষ ভাষা পেয়েছে সেই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধীয় সনেটটিতে যেটি এক সন্ধ্যায় রোটেনষ্টাইন তদীয় পত্নী অ্যালিস এবং পারিবারিক বন্ধু ম্যাক্স বীয়ারবম পর্যায়ক্রমে এক এক চরণ করে রচনা করেছিলেন। এই সনেটটি Speaight রোটেনষ্টাইনের জীবনচরিতে উদ্ধার করেছেন।

A. Tagore, thy nature once so clear we knew
M. Before you sailed from India's coral strand
R. That nature once we thought to understand
A. Is now become a thing for fashion's view,
M. Equivocal in form, subfuse in hue
R. Obnoxious to the scent, a thing to brand,
A. What might it yet have been had not this land
M. Unfortunately made a pet of you ?
R. Now turn a turbid ear to what I fain
A. Would tell you while there is yet time and hope.
M. Could'st thou but be a bright black boy again
R. Along the Ganges ghats where many a corpse
A. Would caution thee and tell thee to use soap
M. As to the Orpens (sometimes ealled the Orps).

যতক্ষণ ভারতবর্ষে ছিলেন কবি, বিখ্যাত হননি, ততক্ষণ পিঠ চাপড়ানো যেত তাঁকে স্বচ্ছস্বভাবী বলে, এখন তিনি হয়েছেন 'a thing for fashion's view'—শেষ কথাটায় কোনো সত্য নেই বললে অন্যায় হবে। ম্যাকস বীয়ারবম রচিত অষ্টম চরণটি একটি প্রচ্ছন্ন যমকের জন্য লক্ষণীয়—'made a pet of you' ইশারা হচ্ছে 'made a poet of you'; ইংল্যাণ্ডও তাঁকে 'poet' খ্যাতি দিয়েছে, আবার তিনি পাশ্চাত্যের ফ্যাশনেবল মহিলাদের 'pet'-এও পরিণত হয়েছেন। সময় থাকতে এখনো তাঁকে 'bright black boy again' হবার পরামর্শের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে সাম্রাজ্যবাদী paternalism-এর মুরুব্বিয়ানা। গঙ্গার ঘাটে ভাসমান শবদেহের চিত্রকল্পে ভূষিত যে দ্বাদশ চরণটি রোটেনষ্টাইন রচনা করেছেন তাকে অনুপ্রাণিত করেছে ভারত ভ্রমণকালে বারাণসীতে তাঁর অবস্থানের স্মৃতি। অ্যালিস সাবান ব্যবহারের যে পরামর্শ দিয়েছেন সে আসলে সভ্য হবারই পরামর্শ।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রচর্চা ও রোটেনষ্টাইন

'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথের চিত্রচর্চার খবর মেলে—'সে কেবল ছবি আঁকার ইচ্ছাটাকে লইয়া

আপনমনে খেলা করা।' অনেক পরে ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন, ঐ যে চিত্রবিদ্যা বলে একটা বিদ্যা আছে তার প্রতিও আমি সর্বদা হতাশ প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিপাত করে থাকি…।

প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে চিত্রবিদ্যার প্রতি গভীরভাবে আসক্ত হয়ে তিনি এক অনাবিষ্কৃত পূর্ব জগতের দ্বার উদ্ঘাটিত করলেন। রোটেনষ্টাইন জানতেন তৎকালীন ইংরেজ শাসিত আমলাতান্ত্রিক পরিবেশে ভারতীয় শিল্পীরা যাতে সুযোগ পায় তার জন্য রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট চেষ্টা করতেন উপরমহলে লেখালেখি করে, নিজের প্রভাব বিস্তার করে। সেই সব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাবান রোটেনষ্টাইনের বন্ধুত্ব রবীন্দ্রনাথ নিজের অনুকূলে ব্যবহার করতেন। কিন্তু যেদিন এনড্রুজ গুরুতর সংবাদ বহনের ভঙ্গিতে এসে বলেছিলেন 'Gurujee is making lines !' (৩) সেদিনও রোটেনষ্টাইন বুঝতেও পারেননি ('Since Fifty'-তে লিখেছেন)—

That Tagore was to give fresh lead to Indian artists, away from the imitations of old subjects and methods, towards a more vigoroses use of the brush.

১৯৩০ সালে শেষবার ইউরোপ যাত্রার পূর্বে তিনি ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯ তারিখে লেখা রবীন্দ্রনাথের যে চিঠি পেলেন তাতে রবীন্দ্রনাথ জানালেন—

If I ever have an opportunity I should like to show you some pictures that I have done myself with the hope of once again being started with your appreciation as in the case of Gitanjali.

প্রথম জয়যাত্রায় সাথী ছিল গীতাঞ্জলির তর্জমার পাণ্ডুলিপি, এবারে সঙ্গী প্রায় চারশত চিত্র। কাপ মার্তাঁ্যা থেকে ৩০ মার্চ ১৯৩০ তারিখে রবীন্দ্রনাথ স্বীয় চিত্রাবলী প্রসঙ্গে যে দীর্ঘ চিঠি লিখলেন তাতেই রোটেনষ্টাইন রবীন্দ্রনাথের এই নতুন শিল্পাবেগের পূর্ণ পরিচয় পেলেন এবং তিনি 'Since Fifty'-তে এই চিঠিটি উদ্ধৃত করেছেন। যাতায়াতের খরচ বহনের দায়িত্ব নিয়ে তিনি রোটেনষ্টাইনকে কাপ মার্তাঁ্যায় আমন্ত্রণ করলেন এবং লিখলেন—

I find that you already know that of late I have suddenly be n seized with the mania of producing pictures. The praise which they had won from our own circle of artists I did not take at all seriously till some of them attracted notice of a Japanese artist of renown whose appreciation came to me as a surprise. Some European painters who lately visited our Ashram strongly recommended me to have them exhibited in Berlin and Paris. Thus I have been persuaded to bring them with me, about four hundreds of them. I still feel misgivgs and I want your advice. They certainly possess psychological interest being products of untutored fingers and untrained mind. I am sure they do not represent what they call Indian art, and in one sense they may be original,—revealing a strangeness born of my utter inexperience and individual limitations. But I strongly desire to have your opinion before they are judged by others in Europe.

কিন্তু রোটেনষ্টাইন আসতে পারলেন না। এই বিষয়ে জীবনীকার Speaight মন্তব্য করেছেন—

William, not perhaps without a secret relief, was unable to discharge the offices of candid friend.

সুতরাং রবীন্দ্রচিত্রাবলীর মূল্যায়নের সুযোগ থেকে রোটেনষ্টাইন বঞ্চিত হলেন। পরের চিঠিতে (১৭ এপ্রিল ১৯৩০) রবীন্দ্রনাথ জানালেন মে মাসের শেষে তিনি লণ্ডনে যাবেন এবং তখন তাঁর চিত্রাবলী 'these vagaries of mine' বন্ধুকে দেখাবেন। ইতিমধ্যে ২রা মে ভিক্টোরিয়ো ওকাম্পোর অবাধ অর্থব্যয়ে ও অদম্য উৎসাহে প্যারিসে রবীন্দ্রনাথের প্রথম চিত্র-প্রদর্শনী হলো, একদিন যে ঘটনা রবীন্দ্রনাথের অকল্পনীয় মনে হয়েছিল তা বাস্তবে পরিণত হল। (৪) প্রদর্শনীর অব্যবহিত পরে (৯ই মে) রবীন্দ্রনাথ প্যারিস থেকে শ্রীযুক্তা রোটেনষ্টাইনকে লিখলেন তিনি লণ্ডনে যেয়ে তাঁদের সময়ের অনেকটা ভাগ অধিকার করবেন, কারণ 'the number of my pictures has grown inordinately large'। প্যারিস প্রদর্শনীর খবর দিয়ে আরো লিখলেন—

In Paris these pictures have found wide appreciation which relieves me of the burden of my diffidence. But I want your husband's judgement and advice before I venture to exhibit them in London.

২রা জুন বার্মিংহামের চিত্রপ্রদর্শনীতে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকতে পারলেন না। ৪ঠা জুন ইণ্ডিয়া হাউসে ফ্রান্সিস ইয়াংহাজব্যাণ্ডের সভাপতিত্বে রবীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। রবীন্দ্রজীবনী (৪) থেকে জানা যায় প্রদর্শনীর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ মাইকেল স্যাডলার এবং ম্যুরহেড বোনকে ছবি দেখান; রোটেনষ্টাইনকে দেখান কিনা জানা যায় না। এই প্রদর্শনী সম্বন্ধে রোটেনষ্টাইন লিখছেন (Since Fifty)—

I fear Tagore was disappointed, they made little impression on English artists, yet the drawings though in the nature of dream drawings had a strange vitality and showed a healthy departure from somewhat effeminate drawings of the contemporary Bengal School.

চিত্রশিল্পের প্রগতির কেন্দ্র ছিল না লণ্ডন, লণ্ডন বরং ছিল রক্ষণশীলতার দুর্গ—সেই কারণে এই গাঢ় রঙের দুঃস্বপ্নময় অতিপ্রাকৃত জগতের ছবিগুলির যে সেখানে আদর হয় নি তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু লক্ষণীয় যে এই 'dream drawings'গুলির 'strange vitality' রোটেনষ্টাইনকে নাড়া না দিয়ে পারে নি, যদিও তিনি শিল্প বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হিসাবে তখন রক্ষণশীলতার ব্যূহে বন্দী।

কবি এর পরে জার্মানীতে গেলেন এবং যে বার্লিন তখন নব্য চিত্ররীতির নিরীক্ষাগারের মর্যাদায় ভূষিত সেখানে ১৬ই জুলাই রবীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন হলো। প্রদর্শনীর সাফল্যের খবর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ জেনিভা থেকে ২৪শে আগষ্ট রোটেনষ্টাইনকে লিখলেন—

In Germany my pictures have found a very warm welcome which was far

beyond my expectation, five of them have got their permanent place in Berlin National Gallery, and several invitations have come from other centres for their exhibition. This has a strange analogy with the time which followed the Gitanjali publication,—it is sudden and boisterous like a hill stream after a shower and line the same casual flood may disappear with the same emphasis of suddenness.

ভাগ্যের পরিহাস এই যে রোটেনষ্টাইন নিজে চিত্রী হওয়া সত্বেও পাশ্চাত্ত্যে চিত্রী রবীন্দ্রনাথের পরিচিতিতে কোনো সাহায্য করতে পারলেন না, অথচ সেখানে কবি রবীন্দ্রনাথের পরিচিতিতে যাঁরা সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে তিনিই ছিলেন অগ্রগণ্য। অথবা নিজের শিল্পে স্বকীয় রীতি ব্যতীত অন্য রীতিকে সমাদর করা কঠিন বলেই হয়তো রবীন্দ্রনাথের চিত্রাবলীর সত্যকার মূল্যায়ন তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি।

মার্কিনদেশে প্রদর্শনীর পর ইংল্যাণ্ডে রবীন্দ্রচিত্রাবলীর প্রদর্শনী হোক এই ইচ্ছা সম্ভবত রোটেনষ্টাইন প্রকাশ করেছিলেন। সেই কারণে রবীন্দ্রনাথ বোধহয় আর একবার লণ্ডনে প্রদর্শনীর জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে ঐ ব্যয়সাধ্য কাজে তাঁর মনে কুণ্ঠা ছিল। সেই দ্বিধাজড়িত ইচ্ছার কথা জানি রোটেনষ্টাইনকে শান্তিনিকেতন থেকে লেখা ২৪ মার্চ ১৯৩১ সালের চিঠিতে—

My dear Friend, The present economic condition in Bengal is severely critical. The jute which is the mainstay of our peasants remains unreaped in the field owing to an abnormally low price. We who mainly depend upon our income from the land are desperately devising curtailment of expenditure to an extreme limit. In such an atmosphere of compulsory self-immolation I do not feel the least enthusiasm about spending my money over my picture exhibition. However, let me know the probable cost if I venture to proceed about it. The picture which are in the American gallery waiting to be brought to you are all mounted and only require framing. I hardly feel sanguine about their sale and my empty pocket cannot afford to be reckless. The money that I have earned in previous exhibitions has vanished like raindrops upon an arid land—and therefore I cannot help asking you to be wisely cautious about your advice.

এর পরেও তিনি একবার ভেবেছিলেন (১২ অক্টোবর ১৯৩৪ তারিখে লেখা চিঠি দ্রষ্টব্য) 'in the gathering evening of my life' আর একবার বন্ধুবর্গসন্দর্শনে বিলাত ভ্রমণ করা যায় কিনা, যদি যাওয়া সম্ভব হয় ভেবেছিলেন সঙ্গে নতুন ছবি নিয়ে যাবেন—

Which are done with that daring in techique and style that only an untrained and presistently impulsive dreamer can achieve. (৫)

রোটেনষ্টাইনের চিঠির জবাবে আবার লিখলেন (২৮ নবেম্বর ১৯৩৪)—

It was a great delight to get your letter and to know you welcome the idea of an exhibition of my pictures in London.

মাইকেল স্যাডলারকে লিস্টার গ্যালরি কর্তৃপক্ষ যে চিঠি লিখেছে স্যাডলারের কাছ থেকে তার প্রতিলিপি পেয়ে তিনি তাঁর সচিবকে গ্যালারির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ করতে বলেছেন এই খবর দিয়ে তিনি লিখলেন শেষে—

As you know already it cannot be managed before the autumn next.

এদিকে সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে জয়ন্তী উৎসবের অঙ্গ হিসাবে ১৯৩১ সালের বড়দিনে স্বদেশে সর্বপ্রথম কবির চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা হলো এবং দর্শকমণ্ডলী দিশাহারা বোধ করলো এই উন্মার্গগামী ব্যাকরণবিধ্বংসী চিত্রাবলীর সম্মুখীন হয়ে। স্বদেশী শিল্পানুরাগীদের এই প্রতিক্রিয়া তাঁদের বিপর্যস্ত মনোভাবের কথা রোটেনষ্টাইনকে রবীন্দ্রনাথ জানালেন অনেক পরের একটি চিঠিতে (১১ জুন ১৯৩৭)—

With ruthless freedom of an invader, I have been playing havoc in the complacent & stagnant world of Indian art and my people are puzzled for they do not know what judgement to pronounce upon my pictures. But I must say I am enjoying hugely my role as a painter.

(১) রবীন্দ্রনাথ নিজেই রোটেনষ্টাইনকে একটি চিঠিতে (২৬ নবেম্বর ১৯৩২) বলেছেন—"Poets are proverbially vain and I am no exception."

(২) রোটেনষ্টাইন রবীন্দ্রনাথকে ২৮ এপ্রিল ১৯২১ তারিখের চিঠিতে লেখেন—"You must admit you have taken full advantage of your jug of wine! My prayers will be for your noble venture."

(৩) Speaight এই ঘটনার বিবরণ দিচ্ছেন—"One day when he (এনড্রুজ) and Tagore were both staying with the Rothensteins in London, he entered the drawing room, his hands above his head, and chanting with great solemnity: 'The Babu is making lines, the Babu is making lines.' The meaning of this incantation was not immediately clear; but it signified that Tagore was sketching upstairs." রোটেনষ্টাইনের পুত্রও এই বিবরণের প্রতিধ্বনি করেছেন। ইংরেজ এনড্রুজ 'sketching'-এর জায়গায় 'making lines'-এর মত অদ্ভুত ইংরেজি বলতে পারতেন কিনা জানি না—এই ব্যাপারে রোটেনষ্টাইন ও তাঁর জীবনীকার একমত। কিন্তু এনড্রুজ যে রবীন্দ্রনাথকে 'Babu' বলেন নি—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ, Speaight-এর বিবরণ ও রোটেনষ্টাইন-পুত্রের সাক্ষ্য সত্বেও। কিন্তু ঘটনা বর্ণনায় এই বিকৃতি Speaight-এর বইয়ের ছিদ্রান্বেষী, নিন্দুক স্বভাবের একটি প্রমাণ—"On another occasion, when Tagore was descanting upon art, Elizabeth

Rothenstein broke the reverential silence by asking him what medium he used. 'A wandering spirit guides my hand', came the grave reply. 'No,' she explained, 'I mean, do you work in oils or watercolour, or how ? There was a significant, pause, and then—'with a "stylo", answered Tagore." যাঁর পরিবারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথের মত শিল্পী জন্মেছেন, যিনি নন্দলাল বসুকে অনুপ্রাণিত করেছেন, শান্তিনিকেতনে কলাভবনের প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাঁর সম্বন্ধে এই জাতীয় উক্তি সর্বৈব মিথ্যা বলেই সন্দেহ হয়। যদি কিছু সত্য থাকেও, বিকৃতির ভেজালে সেই সত্যটুকুও মিথ্যায় রূপান্তরিত।

(৪) জগদীশচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি (চিঠিপত্র ৬)—"শুনে আশ্চর্য হবেন, একখানা Sketch book নিয়ে বসে বসে ছবি আঁকছি। বলা বাহুল্য, সে-ছবি আমি প্যারিস সেলোন—এর জন্য তৈরী করচি নে, এবং কোনো দেশের ন্যাশন্যাল গ্যালারী যে এগুলি স্বদেশের ট্যাক্স বাড়িয়ে সহসা কিনে নেবেন এ রকম আশঙ্কা আমার মনে লেশমাত্র নেই।" এই শেষ আশঙ্কাও সত্য হয়েছিল।

(৫) রোটেনষ্টাইনকে লেখা আর একটি চিঠিতে (১২ মার্চ ১৯৩৮) তিনি স্বীয় চিত্রের এই স্বপ্নগ্রস্ততার কথা বলেছেন—"And then this painting, it has become a regular playmate of mine, giving me just the distraction I need from literary talkativeness. It is like dreaming."

বঙ্কিম উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা

অশোক কুণ্ডু

ভবানন্দ (আনন্দ ঃ ১।৬) ॥

ভবানন্দকে আমরা সন্ন্যাসীরূপেই 'আনন্দমঠে' দেখি। তার কোন পূর্বজীবনের কথা বলা হয় নি। তবে মনে হয় সন্ন্যাসজীবনে সে নারীসঙ্গ লাভ করে নি। তাই কল্যাণীকে দেখে তার আসক্তি জন্মেছিল। কল্যাণীকে প্রাণদান করে গোপনে রেখেছিল নিজের আয়ত্তে আনবার জন্য। কিন্তু ভবানন্দ কোনদিন নীচ প্রবৃত্তির বসে কল্যাণীর উপর জোর করে নি। কল্যাণীকে সে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিল, যেহেতু একবার তার মৃত্যু হয়েছে, অতএব সে পুনরায় বিবাহ করতে পারবে।

ভবানন্দের মধ্যে এক শুষ্ক তৃষ্ণার্ত প্রাণের হাহাকার শুনতে পাই। তাই কল্যাণী যখন বলে—'কিসের জন্য এ সব অতল জলে ডুবাইবে? তখন ভবানন্দ বলে—'তোমার জন্য…যেদিন তোমার প্রাণদান করিয়াছিলাম, সেইদিন হইতে আমি তোমার পাদমূলে বিক্রিত। আমি জানিতাম না যে, সংসারে এ রূপরাশি আছে। এমন রূপরাশি আমি কখন চক্ষে দেখিব জানিলে, কখন সনাতনধর্ম গ্রহণ করিতাম না।

ভবানন্দের এই রিক্ত প্রাণের হাহাকার আরো তীব্র হয়ে বাজে, যখন দেখি সে বিশ্বাসঘাতক নয়, সে ভীরু কাপুরুষ নয়। তাই সত্যানন্দ প্রেরিত ধীরানন্দের সন্তানসেনার সর্বনাশ সাধনের প্ররোচনায় সে সম্মত হতে পারে নি। ভবানন্দ বলেছে—'আমি ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া থাকিব, কিন্তু, বিশ্বাসহন্তা নই।'

ভবানন্দ পাপকাজ করেও শেষপর্যন্ত ত্যাগ ও মহত্বের দ্বারা সকলের হৃদয় জয় করেছেন। মৃত্যুকালে সে গুরুদেবের আশীর্বাদ পেয়েছে—পরলোকে তাহার বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হইবে।'

ভবানী পাঠক (দেঃ চৌঃ ১।১১) ॥

ভবানী পাঠক দস্যুসর্দার। তিনি প্রফুল্লর দীক্ষাগুরু। ভবানী পাঠক নামে একজন বিহারী ব্রাহ্মণ দস্যুসর্দারের কথা ইতিহাসে আছে। কিন্তু তিনি ডাকাতি করতেন কোন মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস থেকে ভবানী পাঠকের নামটি গ্রহণ করলেও, ইনি সম্পূর্ণ নূতন উপাদানে প্রস্তুত। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর দেশে দুর্বলের উপর প্রবলের অত্যাচারের সময়, তিনি ডাকাতি করে গরীব জনসাধারণকে সমস্ত অর্থ বিতরণ করতেন।

ভবানী পাঠক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ—'গায়ে নামাবলি, কপালে ফোঁটা, মাথা কামান। দেখিতে গৌরবর্ণ, অতিশয় সুপুরুষ, বয়স বড় বেশি নয়।' ভবানী পাঠক শাস্ত্রজ্ঞও বটেন। প্রফুল্লকে দীর্ঘ পাঁচবছর ধরে তিনি শিক্ষাদান করেছিলেন।

ভবানী পাঠকের প্রফুল্লকে তাঁর ডাকাতদলের প্রধানরূপে নির্বাচিত করার কি কারণ থাকতে পারে তা বোঝা যায় না। তিনি নিজেই তো সর্দারপদের যথেষ্ট উপযুক্ত। দু'টি কাজের জন্য

ভবানী পাঠক প্রফুল্লকে নির্বাচিত করেছিলেন—প্রথমত দোকানদারি সাজাবার জন্য, দ্বিতীয়ত প্রফুল্লর অর্থের জন্য।

প্রফুল্লকে রাণীপদে অধিষ্ঠিতা করেই ভবানী পাঠক উপন্যাসের অন্তরালে চলে গেছেন। দু'এক-বার সাধারণ কাজে তাঁর দেখা পাওয়া গেল। কিন্তু তখন আর তাঁর হাতে কোন কর্তৃত্ব নেই বলেই মনে হ'ল।

এই উপন্যাসে ভবানী পাঠকের বিস্তারিত কার্যকলাপ অপ্রয়োজনীয়বোধে বঙ্কিম তাঁকে অল্প সময়ের জন্যই উপস্থিত করেছেন। 'ইংরেজ রাজ্য শাসনের ভার গ্রহণ করিল। রাজ্য সুশাসিত হইল। সুতরাং ভবানী ঠাকুরের কাজ ফুরাইল। দুষ্টের দমন রাজাই করিতে লাগিল। ভবানী ঠাকুর ডাকাইতি বন্ধ করিল।

তখন ভবানী ঠাকুর মনে করিল 'আমার প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন' এই ভাবিয়া ভবানী ঠাকুর ইংরেজকে ধরা দিলেন, সকল ডাকাইতি একরার করিলেন, দণ্ডের প্রার্থনা করিলেন। ইংরেজ হুকুম দিল, 'যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে বাস।' 'ভবানী পাঠক প্রফুল্ল চিত্তে দ্বীপান্তরে গেল।' (৩।১৪)।

ভানুমতী (সীতা: ৩।২১)॥

সীতারাম তাঁর চিত্তবিশ্রামে যে সমস্ত সুন্দরীদের এনে জমায়েৎ করেছিলেন তাদের একজনের নাম ভানুমতী। এই ভানুমতী সীতারামকে বলেছে—মহারাজ! আজ জানিলে বোধহয় যে, সত্যই ধর্ম আছে। আমরা কুলকন্যা, আমাদের কুলনাশ, ধর্মনাশ করিয়াছ, মনে করিয়াছ কি, তার প্রতিফল নাই? আমাদের কাহারও মা কাঁদিতেছে, কাহারও বাপ কাঁদিতেছে, কাহারও স্বামী কাঁদিতেছে, কাহারও শিশুসন্তান কাঁদিতেছে—মনে করিয়াছিলে কি, সে কান্না জগদীশ্বর শুনিতে পান না? মহারাজ, নগরে না, বনে যাও, লোকালয়ে আর মুখ দেখাইও না; কিন্তু মনে রাখিও যে, ধর্ম আছে।'

ভুবনেশ্বরী (রজনী ১।২)॥

রামসদয় মিত্রের প্রথমা স্ত্রী। তিনি চিররুগ্না।

ভ্রমর (১।১০)॥

ভ্রমর চরিত্রের মূল সুর হল পতি প্রেম। পতিগতপ্রাণা এই নারীর জীবনে যে কালবৈশাখীর ঝঞ্ঝা নেমে এসেছে তাতে তার পতিপ্রেম আরো মহনীয় হয়ে উঠেছে।

ভ্রমর সার্থকনামা। শুধু রঙ কালো বলেই নয়, তার গুঞ্জনে হরিদ্রাগ্রামের জমিদারবাড়ী সদাই মুখরিত। সপ্তদশী বালিকা ভ্রমর সংসারের কাজে অনভিজ্ঞা, এমন কি দাসী চাকরানী পর্যন্ত কেউ তাকে মান্য করে না। তা না করুক ভ্রমরের তাতে কিছু এসে যায় না। সে যাকে খুশি যখন তখন চড়-চাপড়টা মেরে বসে, আবার পুরস্কৃতও করে। গোবিন্দলালের সঙ্গেও এমনি তার ঝগড়া লেগেই আছে। গোবিন্দলালও ভ্রমরকে রাগিয়ে আনন্দ পায়। পরে বঙ্কিম যখন বলেছেন ভ্রমরের প্রথম সন্তানের মৃত্যু হয়েছিল, তখন সেটা বিশ্বাস করাই শক্ত হয়ে পড়ে।

সুখী ভ্রমরের সুখ বেশিদিন সইল না। রোহিণীর আবির্ভাব হল গোবিন্দলালের জীবনে।

স্বামীর প্রতি রোহিণীর অনুরাগের কথা শুনে ভ্রমরের রাগ হল রোহিণীর উপর। সে রোহিণীকে মরতে বলল। রোহিণী মরল না, কিন্তু ভ্রমরের কপাল পুড়ল। ভ্রমর স্বামীর সঙ্গে বন্দরখালিতে যেতে না পারায় বিষণ্ণ। তার সেই বিষণ্ণতার সুযোগে গ্রামের রটনাও রোহিণীর প্রতারণা সরলা ভ্রমরকে বিপর্যস্ত করেছে। ভ্রমর কোনদিনই গুরু বিষয়ের চিন্তা করেনি। তাই মাথা ঠিক রাখতে না পেরে স্বামীকে যে পত্র লিখেছে তাতে কঠোরতা থাকলেও, অভিমানের সুরটি প্রবল।—'তুমি যখন বাড়ী আসিবে, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া খবর লিখিও—আমি কাঁদিয়া-কাটিয়া যেমন করিয়া পারি পিত্রালয়ে যাইব।'

ভ্রমর জেদী। গোবিন্দলালের আসার খবর শুনে সে সত্যই বাপের বাড়ী গেল। এদিকে গোবিন্দলাল বা তার মা কেউই ভ্রমরকে আনতে উৎসাহী হল না। হলে নিশ্চই ভ্রমর আসত। তারপর কৃষ্ণকান্ত মৃত্যুশয্যায় ভ্রমরকে উইল করে সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে তার ভাল করতে গিয়ে মন্দই করল। গোবিন্দলালের অভিমান আরো তীব্রতর ভাবে ভ্রমরের প্রতি বর্ষিত হল। কিন্তু ভ্রমর বুঝতে পেরেছে যে ব্যাপারটা ক্রমশঃ জটিলতর হয়ে উঠছে। তাই ভ্রমর সব অভিমান বিসর্জন দিয়ে গোবিন্দলালের পায়ে ধরে কেঁদেছে।

তারপর ভ্রমরের জীবনে নেমে এসেছে দুঃখের অমানিশা। সেই দুঃখের অভিঘাতে বালিকা ভ্রমর হয়ে উঠেছে দৃঢ়চিত্ত মহিয়সী নারী। গোবিন্দলালকে বিদায় দেবার সময় সে বলেছে—'তবে যাও—আর, আসিও না। বিনাপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও কর।—কিন্তু মনে রাখিও, উপরে দেবতা আছেন। মনে রাখিও—একদিন আমার জন্য তোমাকে কাঁদিতে হইবে। মনে রাখিও—একদিন তুমি খুঁজিবে, এ পৃথিবীতে অকৃত্রিম আন্তরিক স্নেহ কোথায়?—দেবতা সাক্ষী! যদি আমি সতী হই কায়মনোবাক্যে তোমার পায়ে আমার ভক্তি থাকে, তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে। আমি সেই আশায় প্রাণ রাখিব। এখন যাও, বলিতে ইচ্ছা হয়, বল যে, আর আসিব না। কিন্তু আমি বলিতেছি—আবার আসিবে—আবার ভ্রমর বলিয়া ডাকিবে—আবার আমার জন্য কাঁদিবে। যদি একথা নিষ্ফল হয়, তবে জানিও—দেবতা মিথ্যা ধর্ম মিথ্যা ভ্রমর অসতী! তুমি যাও, আমার দুঃখ নাই! তুমি আমারই—রোহিণীর নও।' (১।৩০)

ভ্রমরের কথা সত্য হয়েছে অক্ষরে অক্ষরে। গোবিন্দলালকে খুনের দায় থেকে বাঁচিয়েও তার প্রতি ঘৃণাবশতঃ পুনরায় এক সঙ্গে বসবাস করবার চেষ্টা করেনি ভ্রমর। গোবিন্দলালকে ভ্রমর পরে যে পত্র লিখেছে, তাতে ভ্রমরের কঠোরতা দেখে আমরা বিস্মিত হই।

কিন্তু সব রাগ-দুখ-অভিমান-ঘৃণার মধ্যেও ভ্রমরের কাছে একমাত্র সত্য স্বামী। তাই মৃত্যুকালে স্বামীর 'চরণযুগল স্পর্শ করিয়া পদরেণু লইয়া মাথায় দিল। বলিল, 'আজ আমার সকল অপরাধ মার্জনা করিয়া, আশীর্বাদ করিও জন্মান্তরে যেন সুখী হই।'

সূর্যমুখীর মত ভ্রমরেরও স্বামীপ্রেমে অংশীদার জুটেছে। কিন্তু দুজনের দুরকম। সূর্যমুখীর স্বামীপ্রেম হিন্দুনারীর প্রাচীন আদর্শমণ্ডিত। স্বামীর দোষ-গুণ সেখানে সবই সূর্যমুখী মাথায় করে নিয়েছে, স্বামীর সুখই তার সুখ। কিন্তু ভ্রমর এই সাধারণ হিন্দুনারীর পতিপ্রেমের ধারণা থেকে

স্বতন্ত্র। স্বামীর অপরাধ সে মেনে নেয়নি। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে সূর্যমুখীর চরিত্র প্রথম থেকেই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। কিন্তু 'কৃষ্ণকান্তরে উইল'-এ ভ্রমর কোমল থেকে ক্রমে ক্রমে কঠোরতায় এসে পৌঁছেছে। তার চরিত্রের এই ক্রমবিকাশ তাকে জীবন্ত করে তুলেছে।

ভ্রমরের মাতা (কৃঃ উঃ ১।২৪)॥

ভ্রমরের প্রতি স্নেহবশত তাদের প্রেমদ্বন্দ্বের সঙ্কট সময়ে কন্যাকে বাপেরবাড়ী নিয়ে এসে কন্যার কিঞ্চিত সর্বনাশ সাধন করেছেন।

মণিমালিনী (মৃণাঃ ১।২)॥

মণিমালিনী মৃণালিনীর সখী। সে মাধবাচার্যের শিষ্য হৃষিকেশের কন্যা। মাধবাচার্য মৃণালিনীকে শিষ্যগৃহে রেখে গেলে মণিমালিনী এবং মৃণালিনীর মধ্যে সখ্য জন্মে। উভয়েই সমবয়সী, তাই বন্ধুত্ব ভালই জমে। মণিমালিনীর মন সাধারণ গৃহস্থের মতই সংস্কারাবদ্ধ। তাই মৃণালিনীর ও হেমচন্দ্রের অবৈধ মিলনের কথা শুনে, 'মণিমালিনী কহিলেন, 'ঐ কথাটি মনে পড়িলেও আমার বড় অসুখ হয়। তুমি কুমারী হইয়া কি প্রকারে পুরুষের সহিত গোপনে প্রণয় করিতে?' অবশেষে মৃণালিনী যখন তার কানে কানে হেমচন্দ্রের বৃত্তান্ত বলেছে, তখনই মনিমালিনী আশ্বস্ত হয়েছে।

তারপর থেকে মৃণালিনীর প্রতি তার আস্থা জন্মেছে। তাই ভ্রাতার মৃণালিনীর প্রতি ব্যবহারে সে ভ্রাতাকেই দোষী মনে করেছে। কিন্তু তার সামর্থ হয় নি মৃণালিনীকে ফেরাবার।

মৃণালিনী কিন্তু সুখের দিনেও মণিমালিনীকে ভোলে নি। তাই—'মৃণালিনী মাধবাচার্যের দ্বারা হৃষিকেশকে অনুরোধ করাইয়া মণিমালিনীকে আপন রাজধানীতে আনাইলেন। মণিমালিনী রাজপুরীর মধ্যে মৃণালিনীর সখীর স্বরূপ বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বামী রাজবাটীর পৌরহিত্যে নিযুক্ত হলেন।'

মতিবিবি বা লুৎফ-উন্নিসা বা পদ্মাবতী (কপাঃ ২।১)॥

মতিবিবি চরিত্রটি যেমন বিচিত্র, তেমনি জটিল। মতিবিবিকে 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের মূল-কাহিনীর উপনায়িকা এবং উপকাহিনীর নায়িকা বলা যেতে পারে।

পদ্মাবতী নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী। কিন্তু বিবাহের অল্পকাল মধ্যেই নবকুমারের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ হয়। পদ্মাবতীর পিতা রামগোবিন্দ ঘোষাল। পিতার সঙ্গে পদ্মাবতী একবার পুরুষোত্তম দর্শনে যায়। পথে পাঠানেরা রামগোবিন্দকে বন্দী করে ধর্মান্তরিত করে। ফলে নবকুমারের পিতা আর পদ্মাবতীকে গৃহে স্থান দেন না। তখন পদ্মাবতীর বয়স মাত্র ১৩ বৎসর। সেই বয়সে স্বামীর প্রতি তার কোন অনুরাগ না জাগাই ছিল স্বাভাবিক।

তারপর পদ্মাবতী পিতার ধর্মান্তর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে নিজের নাম গ্রহণ করল লুৎফ-উন্নিসা। লুৎফ-উন্নিসা পদ্মাবতীর জীবনের কলঙ্কজনক অধ্যায়। মুঘল রাজপুরীতে নিজ প্রভাব বিস্তার করে লুৎফ-উন্নিসা তখন ফুলে ফুলে মধু আহরণ করে বেড়াতে থাকে। লুৎফ-উন্নিসার এই পাপজীবনে কোন বৈচিত্র্য নেই। সে বুদ্ধিমতী। বুদ্ধির খেলায় সে চেয়েছিল ভারত সম্রাটের প্রধানা মহিষী

হতে। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মেহের-উন্নিসা, পরবর্তীকালে যিনি নূরজাহান বেগম নামে খ্যাত।

মতিবিবি ছদ্মনাম গ্রহণ করে বাংলাদেশে এসেই পদ্মাবতী চরিত্রে পরিবর্তন দেখা দিল। পথে দেখা হল নবকুমারের সঙ্গে। সে চিনতে পারল পূর্বস্বামীকে। সেই মুহূর্তে তার হৃদয়ে জাগলো পরিবর্তন। যে ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার লোভে মতিবিবি শাহজাদাকে হাত করার চেষ্টা করেছে, সেই মতিবিবিই তখন অনায়াসে তার সমস্ত গহনা কপালকুণ্ডলাকে দান করে দিতে পারে। শুধু তাই নয়, আগ্রায় গিয়ে সে সেলিমের প্রেমও প্রত্যাখান করে, কারণ—"লুৎফ-উন্নিসার হৃদয় পাষাণ। সেলিমের রমণীহৃদয়জিৎ রাজকান্তিও কখন তার মন মুগ্ধ করে নাই। কিন্তু এইবার পাষাণ মধ্যে কীট প্রবেশ করিয়াছিল।"

কীটই বটে! নবকুমারের প্রতি প্রেম, পদ্মাবতীকে অনুশোচনায় বিদ্ধ করে শুচিশুভ্র করে তুলতে পারত। কিন্তু, সে আঘাত পেল নবকুমারের কাছে প্রণয়নিবেদনে ব্যর্থ হয়ে। মতিবিবি এতকাল প্রেম পেয়েই এসেছে, প্রত্যাখ্যাত হবার অভিজ্ঞতা তার নেই। তাই স্বাভাবিকভাবেই সে 'যেন তেন প্রকারেন' নবকুমারকে পাবার বাসনা করল। তাই সে প্রথমেই কপালকুণ্ডলাকে সরাবার মতলব করেছে, কাপালিকের সঙ্গে পরামর্শ করেছে।

তবে তখনো পদ্মাবতীর মনে নারীসুলভ কোমলতা কিছু ছিল। না হইলে কপালকুণ্ডলাকে হত্যা করবার জন্য কাপালিকের আগ্রহে সেও সম্মতি জানাতে পারত। তাছাড়া সে ধনরত্ন দিয়ে কপালকুণ্ডলাকে সুখে রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু বিনিময়ে চেয়েছিল স্বামী।

পদ্মাবতীর স্বার্থসিদ্ধি—অর্থাৎ কপালকুণ্ডলার সম্মতিদানের পরই উপন্যাসে আর তাকে দেখা যায় না। উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যে তখন আর তার কোন প্রয়োজন ছিল না বলেই বঙ্কিম তার কথা আর উল্লেখ করেন নি।

পদ্মাবতী চরিত্রটি এই উপন্যাসে জটিলতা বৃদ্ধি করেছে এবং কাহিনীর পরিণতিকে গড়ে তুলতে সাহায্যে করেছে।

মদনসেন (মৃণাঃ ৪।১) ॥ সেনবংশীয় রাজা মদনসেনের উল্লেখমাত্র আছে।

মদনদেব (যুগঃ ৬ষ্ঠ পরিঃ) ॥ দ্রঃ রাজা মদনদেব।

মনাইম খাঁ (দুর্গেঃ ১।৩) ॥ মনাইম খাঁ আকবরের সেনাপতিরূপে দাউদখাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন।

মনোরমা (মৃণাঃ ২।২) ॥

মনোরমা একটি রহস্যময়ী চরিত্র। কখন বালিকা, কখন প্রৌঢ়া। কখন তাকে দেখি হেমচন্দ্রের সঙ্গে বালিকাসুলভ আচরণ করতে, কখন দেখি পশুপতির সঙ্গে দৃঢ়ভাবে তর্কবিতর্ক করতে, আবার কখন দেখি নির্জন অরণ্যে একাকী বসে থাকতে, কখন যবনসেনার সন্ধান বলে দিতে।

মনোরমা পশুপতির বিবাহিতা স্ত্রী। কিন্তু তার দ্বারা স্বামীর প্রাণহানি হবে এই আশঙ্কায়

বিবাহের পরই তাকে স্বামীর কাছ ছাড়া করা হয়। কিন্তু ভাগ্যচক্রে সেই পশুপতিকেই মনোরমা আবার ভালবাসে। মনোরমা জানে সে বিধবা। পশুপতির সঙ্গে মনোরমার প্রণয়ের ইতিহাস বঙ্কিম অনুক্ত রেখেছেন। এমনিভাবে মনোরমাকে রহস্যময়ী রেখে বঙ্কিমচন্দ্র এই চরিত্রের আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছেন। মনোরমা যে পশুপতিকে যথার্থ ভালবাসে তার প্রমাণ সর্বত্রই ছড়ানো। একদিকে পশুপতির প্রতি প্রেমের আকর্ষণ, অন্যদিকে পশুপতির আচরণের প্রতি ঘৃণা—এই দুয়ের দ্বন্দ্বে মনোরমার জীবন বিপর্যস্ত। তবে এই দ্বন্দ্বে মনোরমার জীবনে বিস্ময় ফল দেখান হয়নি। মনোরমা অনেকটা ভাগ্যের হাতে ক্রীড়নক হয়ে শেষ পর্যন্ত স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দিয়েছে।

মনোরমা (ইন্দিরা) ॥ রাঁধুনী থাকাকালীন ইন্দিরার ছদ্মনাম।

মনোহর দাস (রজনী ২।২) ॥
মনোহর দাস হরেকৃষ্ণ দাসের এক ভাই। তাঁর সঙ্গে শচীনচন্দ্রের পিতামহ বাঞ্ছারাম মিত্রের নিগূঢ় বন্ধুত্ব ছিল। উভয়ে মিলিতভাবে প্রচুর অর্থোপার্জন করেন।

মবারক (রাজঃ ২।১) ॥
মবারকচরিত্র ভালো ও মন্দ, পাপ ও পুণ্যের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত। মবারক একদিন ভালবেসে দরিয়াকে বিবাহ করেছিল, কিন্তু কেন যে তাকে ত্যাগ করল তা যায় না। সম্ভবত শাহাজাদী জেব-উন্নিসার রূপবহ্নিতে আত্মাহুতি দিয়ে দরিয়ার স্নিগ্ধ সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করেছিল। কিন্তু মবারক হৃদয়ে যে ভদ্র মার্জিত বিবেকবোধ বর্তমান ছিল তার প্রভাবেই পাপের স্রোতে নির্বিকারচিত্তে সে গা ভাসিয়ে দিতে পারেনি। তাই তাকে, জেব-উন্নিসাকে বিবাহ প্রস্তাব করতে দেখা যায়। কিন্তু শাহাজাদীর প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস ছিল না। ঘটনাচক্রে দরিয়ার উপকার ও প্রেমের গভীরতার পরিচয় পেয়ে মবারক তাকে নিয়ে পুনরায় সুখের সংসার পাতল। কিন্তু এই সুখ বেশিদিন সইল না। শাহাজাদীর রোষানলে প্রাণত্যাগ করতে হল। কিন্তু আবার যখন জেব-উন্নিসার সঙ্গে মবারকের দেখা হল তখন সেই সুপ্ত রূপোন্মাদনা জেগে উঠল। এবার কিন্তু শাহাজাদী মবারকের প্রতি যথার্থই প্রেমাসক্ত। কিন্তু মবারক জানে দরিয়ার প্রতি যে অবিচার করেছে, সেই পাপের ফল তাকে ভোগ করতেই হবে। তাই দরিয়াকে দেখে সে নিজের ভবিষ্যৎবাণী নিজেই করেছে—"ইয়া আল্লা! আমাকে মরিতেই হইবে।" মবারকের প্রেমজীবনের এই দ্বন্দ্বসংঘাতেই সে এত জীবন্ত।

মবারকচরিত্রে আর একটি দ্বন্দ্ব প্রভুভক্তি ও কৃতজ্ঞতাবোধকে কেন্দ্র করে দেখা দিয়েছে; ঔরঙ্গজেব তার প্রতি যতই অবিচার করুন না কেন, মবারক বিশ্বাসঘাতক হতে চায়নি। কিন্তু জীবনদাতা মাণিকলালের কৃতজ্ঞতাবশত তার অনুরোধে সে মুঘলসৈন্যদের বিপথে চালিত করেছে। কিন্তু তার বিনিময়ে সে রাজসিংহের কাছে পুরস্কার চেয়েছে মৃত্যু।

মবারক যথার্থ বীর এবং মহৎ চরিত্র। চঞ্চলকুমারীকে সম্মুখে দেখে মবারকের আচরণ ভদ্রতাবোধ ও বীরত্বের চূড়ান্ত সীমা স্পর্শ করে।

টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের প্রথম সমাবর্তন

১৪ই জানুয়ারী সকালবেলা টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের প্রথম বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠান উপলক্ষে কলিকাতা তথ্য কেন্দ্রের প্রেক্ষাগৃহ জনসমাগমে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য, উপাচার্য, বিশ্বভারতী।

সমবেত কণ্ঠে বৈতানিকের বেদগানের পর অপরূপ এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে সভাপতি মহাশয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এই সমাবর্তনে ইনষ্টিটিউটের পক্ষ থেকে শ্রীপ্রমথনাথ বিশীকে তাঁর সুদীর্ঘকালের রবীন্দ্রসাহিত্য সাধনার সম্মানে এবং বিষ্ণুপুর ঘরাণার শিল্পী রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্যতম স্বরলিপিকার শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তার চিরজীবনের সঙ্গীতসাধনার সম্মানে "রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য" উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের ছয়জন শিক্ষার্থী—যাঁরা এই প্রতিষ্ঠানের দুই বছরের রবীন্দ্রসাহিত্য বিষয়ক পাঠক্রম সমাপ্ত করে উপাধি লাভের যোগ্য বিবেচিত হয়েছেন তাঁদের "রবীন্দ্রজ্ঞানতীর্থ" উপাধিতে ভূষিত করেন। অভিজ্ঞানপত্র প্রদানের প্রাক্কালে তিনি তাঁদের উদ্দেশ্যে বলেন রবীন্দ্রজীবনাদর্শের অনুশীলন যেন তোমাদের কাছে পুঁথিগত বিদ্যামাত্র না হয়ে থাকে, তোমাদের জীবন ও কর্মে আচার ও আচরণে এই অনুশীলন সত্য হয়ে উঠুক এই আশীর্বাদ করি। অভিজ্ঞানপত্র-সহ প্রদত্ত পদ্মফুলটি তাঁর আশীর্বাদের প্রতীকরূপে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সঞ্চার করেছিল।

ডঃ শান্তিকুমার দাশগুপ্তের সম্পাদকীয় বিবৃতি এই প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচী ও অগ্রগতি সম্বন্ধে দর্শক সাধারণের মনে বিশেষ আলোকপাত করে। তিনি বলেন ১৯৬৫ সালে মুষ্টিমেয় কয়েকজন রবীন্দ্রানুরাগীর ঐকান্তিক প্রয়াসে এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম। কবির আবির্ভাবপূত এই কলকাতা শহরে রবীন্দ্রসাহিত্যের সামগ্রিক অনুশীলন কেন্দ্রের অভাব কবির অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব অনুধাবনের পরিপন্থী এই উপলব্ধি এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রেরণা দিয়েছিল। ইনষ্টিটিউটের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী সম্বন্ধে ডঃ দাশগুপ্ত বলেন রবীন্দ্রসাহিত্য ও সঙ্গীতের নিয়মিত ক্লাস, রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কর্মধারা বিষয়ে উচ্চতর গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ, রবীন্দ্র-গবেষণা বিষয়ক গ্রন্থপ্রকাশ, রবীন্দ্রনাথের রচনা ও তাঁর ব্যক্তি মানস সম্বন্ধীয় আলোচনার জন্য নিয়মিত আলোচনা সভার আয়োজন প্রভৃতি ইনষ্টিটিউটের নিয়মিত কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

ডঃ দাশগুপ্তের জানান, ১৯৬৫ সালের জুলাই মাস থেকে নিয়মিত রবীন্দ্রসাহিত্যের ডিপ্লোমা কোর্সের ক্লাস শুরু হয়। ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া গেছে। প্রথম

শিক্ষার্থীদল এই সমাবর্তনে তাঁদের অভিজ্ঞানপত্র গ্রহণ করেছেন। ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকেও যেমন, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকেও তেমনই অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেছে। তাঁরা স্বেচ্ছায় বিনা পারিশ্রমিকে এই অধ্যাপনা-ব্রত গ্রহণ করেছেন। এঁরা সকলেই ইনষ্টিটিউটের সদস্য।

কয়েকখানি মাত্র বই নিয়ে ইনষ্টিটিউটের গ্রন্থাগারটির গোড়াপত্তন হয়েছিল। সদস্য, সহৃদয় বন্ধু ও ছাত্রছাত্রীদের সক্রিয় সহযোগিতায় এটি গড়ে উঠছে ক্রমশ। তথাপি যা হয়েছে প্রয়োজনের দিক বিচারে তার পরিমাণ সামান্যই, করণীয় আরও অনেক কিছু আছে।

গত তিন বছরে ইনষ্টিটিউটের প্রকাশন বিভাগ বৈতানিক প্রকাশনীর সহযোগিতায় যে সকল বই প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে আছে 'মালিনী'—নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও সৌম্যেন্দ্রনাথ বসু (মালিনী নাটকের আলোচনা), "রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি জিজ্ঞাসা"—কিরণশশী দে (রবীন্দ্রসঙ্গীতের পরিবর্তিত স্বরলিপি বিষয়ক আলোচনা), "রবীন্দ্র প্রসঙ্গ"—ক্ষিতিমোহন সেন (রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক প্রবন্ধ সঙ্কলন), "আমার বাল্যকথা"—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিখ্যাত রচনার পুনর্মুদ্রণ), "রবীন্দ্র-বাণী" (রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি সঙ্কলন), "ঘরের মানুষ গগনেন্দ্রনাথ"—দ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায় (মহান শিল্পীর স্মৃতিকথা), "The Poet's Philosophy of Life"—সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (রবীন্দ্র জীবন দর্শনের আলোচনা)। "Tagore Studies" নামক একখানি ইংরেজি পত্রিকা সুযোগ্য সম্পাদকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে প্রকাশার্থে প্রস্তুত হচ্ছে। ডঃ ভূদেব চৌধুরী এই পত্রিকাটির সম্পাদক। ইনষ্টিটিউটের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীদের কয়েকটি গবেষণা গ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। এগুলির মধ্যে আছে "সাময়িক পত্রে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ"—সঙ্কলক অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বসু, "রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ"—অধ্যক্ষা মৃণালিনী দাশগুপ্ত, "সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ"—শ্রীমতী জয়ন্তী রায়, "রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বাক্ প্রতিমা"—অধ্যাপক দেবদাস জোয়ারদার, "Rabindranath Tagore in Defence of Freedom"—অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বসু।

১৯৬৫ সাল থেকেই ইনষ্টিটিউটে শিক্ষার্থী, সদস্য ও সাধারণ শ্রোতাদের জন্য নিয়মিত সেমিনারের আয়োজন করা হয়ে আসছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য তাঁর ভাষণে এই রবীন্দ্রানুশীলন কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা বিশ্লেষণ করে দেখান। তিনি বলেন রবীন্দ্রনাথের সহস্রমুখী প্রতিভার সর্বাঙ্গীণ অনুশীলন যে ক্ষেত্রে এক এবং অদ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথের সন্ধান দেবে সেইখানেই আমাদের শ্রম সার্থক। স্বাভাবিক ও সঙ্গত কারণে টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের সঙ্গে বিশ্বভারতীর একটি আত্মিক যোগসূত্র স্থাপিত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সভাপতির ভাষণে শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন যে মৃত্তিকার রস পান করে রবীন্দ্র-জীবনের মূল শিকড়টি এমন বজ্র-ধারক বীর্য সঞ্চয় করেছিল ও রবীন্দ্রজীবন-বনস্পতি ফুল-ফোটানোর এমন অতুলনীয় শক্তি লাভ করেছিল, সেই মৃত্তিকার ধাতুগত জ্ঞান ও তার স্বলক্ষণই সম্বন্ধে ধারণা রবীন্দ্রপ্রতিভার ধারণার জন্যে অপরিহার্য। সেই মৃত্তিকা হচ্ছে উপনিষদ, বুদ্ধ বোধিজাত সর্ব মানবের মুক্তি ধর্ম, আনুষ্ঠানিকতার নিগড়-মুক্ত মধ্যযুগের সাধকদের মানব-ধর্ম ও ভারতের বিশ্বাত্মবাদ। সেই মৃত্তিকা হচ্ছে উনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহন যে চিন্তার ও ভাবধারার প্রভাব

এনেছিলেন বাঙলার জীবনে—যুক্তি, ভক্তি, বিচার ও নিষ্ঠার চতুর্ধারার প্রবাহ-সিক্ত মানস-মৃত্তিকা। বক্তা বিশ্লেষণ করে দেখান কবির জীবনে একদিকে রামমোহন ও অন্যদিকে মহর্ষির প্রভাব কি অপরিসীম। জ্ঞানে, বিশ্বাত্মবাদে, যুক্তিমার্জিত সংস্কার স্বীকারে রবীন্দ্রনাথ যেমন রামমোহনের অনুগামী তেমনি ভক্তিতে, দেশাত্মবাদে ও উপনিষদ ব্রহ্মবাদের ধারণায় তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পথাবলম্বী। তিনি বলেন, শুধুমাত্র এই দুই ধারা প্রবাহের রসেই রবীন্দ্র-জীবন বিকশিত হয়নি, বিজ্ঞান-কুতূহলী মন, ঐতিহাসিক দৃষ্টি, অচেনা আলোকের টানেই নিরন্তর পথিক-বৃত্তি মানসজগতে, অনুষ্ঠানের নিগড়-মুক্ত ব্রাত্যসত্তা, সোশালিজমের মহৎ দিককে পরম সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে স্বীকৃতি দান—এই চিরন্তন নবীনতা ও চিত্তের এই অসীম ঔদার্য ও মানবতা রবীন্দ্রনাথের জীবনকে জ্যোতির্ময় করেছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর অসামান্য প্রকাশ ক্ষমতা যা চির বিস্ময়ের বস্তু। রবীন্দ্রনাথকে যথার্থভাবে জানতে হলে তাঁর সত্তার ভিত্তি ও তাঁর সত্তার বিচিত্র প্রকাশ-লীলাকে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয় রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিসত্তা সম্বন্ধে অত্যন্ত ভাসা ভাসা এক পেশে ধারণা নিয়ে সাধারণতঃ আমরা তাঁর বিচিত্র সৃষ্টির রস গ্রহণে বা বিচারে প্রবৃত্ত হই।

টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের বিষয় বলতে গিয়ে তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিসত্তা, সাধনা ও সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা সর্বসাধারণের মধ্যে প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে 'টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট'-এর প্রতিষ্ঠা। তিন বৎসর হল এই পাঠচক্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এখানে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশে যে নবযুগ-চেতনার উন্মেষ হয়েছিল সেই সূচনা থেকে সুরু করে রবীন্দ্রপ্রতিভা-জাত প্রতিটি সৃষ্টির অনুশীলন করা হয়। সভাপতি মহাশয় এ প্রসঙ্গে আরও বলেন পৃথিবীর প্রতিটি দেশে সেই দেশের মহৎ স্রষ্টার জীবন ও সাধনা নিয়ে আলোচনার্থে এক একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। যেমন শেক্‌স্‌পীয়রের জীবন ও সাহিত্য দিয়ে গবেষণার জন্য ইংলণ্ডে অনুশীলন-কেন্দ্র গড়ে উঠেছে বা মহাকবি গ্যেটের অনুশীলন-কেন্দ্র আছে জার্মানীতে। রবীন্দ্রনাথের জীবনও সৃষ্টি নিয়ে আলোচনা ও গবেষণার উদ্দেশ্য নিয়ে কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে নি এতদিন। এ বিষয়ে আমাদের দেশে টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউটই প্রথম ব্রতী ও সূচনাকার। তিনি সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে স্বাগত জানিয়ে বলেন রবীন্দ্র-চৈতন্যের অপূর্ব দ্যুতি যে আলো জেলেছে আপনাদের জীবনে, যে অন্তহীন আনন্দ ধারায় আপনাদের চিত্তকে উদ্ভাসিত করেছে, আজকের উৎসবে আপনাদের যোগদান সেই আলোর ও সেই আনন্দের কৃতজ্ঞ স্বীকৃতি বলে আমি মনে করি।

পরিবেশ রচনায় সার্থকতায় ও তাৎপর্য বিচারে সমগ্র অনুষ্ঠানটি সমবেত দর্শকদের বিশেষ-ভাবে স্পর্শ করেছিল।

অমর নন্দন

পল্লীপ্রেমিক জসীমউদ্দিন

বাংলাসাহিত্যের বিস্তৃত আঙিনাতে যে-ক'জন পল্লীপ্রেমিকের আবির্ভাব ঘটেছে তাঁদের মধ্যে পরলোকগত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম; স্বর্গত জীবনানন্দ দাশ দ্বিতীয় এবং জসীমউদ্দিন নিঃসন্দেহে তৃতীয়। রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশ বিভক্ত হতে পারে কিন্তু বাংলাসাহিত্য ও সংস্কৃতি চিরদিন অবিভক্ত। এই অবিভক্ত বাংলা সংস্কৃতির পুরোধা হলেন জসীমউদ্দিন। ১৯০৪ সালে ফরিদপুরের তাম্বুলখানা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার পর থেকে গ্রামেই রয়ে গেছেন তিনি।

পল্লীর শ্যামল কোলে তাঁর জন্ম পল্লীতেই তিনি লালিত ও বর্ধিত এবং Back to the Village হলো তাঁর শিল্পী-জীবনের চিরন্তন আহ্বান। নগর সভ্যতার উত্তাপ-উত্তেজনাকে, সমস্ত কোলাহলকে স্বচ্ছন্দে পরিহার করে জসীমউদ্দিন গ্রামকেই আশ্রয় করেছেন। অসহযোগ আন্দোলনে গ্রামকে, তাঁর প্রিয় পল্লীকে উজ্জীবিত করার যে মন্ত্রবীজ রোপিত হয়েছিল তার সঙ্গে তিনি তাঁর মনের একটা অনিবার্য মিল খুঁজে পেয়েছিলেন বলে আন্দোলনেও অবতীর্ণ হয়েছিলেন। পল্লীপ্রেমই ছিল তাঁর কাছে স্বদেশ প্রেম এবং সারাটি জীবন এই পল্লীর জন্যই তিনি পাগলের উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন।'...গ্রাম তাঁর কাছে concept নয় একটা faith। গভীর বিশ্বাসে ও আন্তরিক অনুরাগে তিনি গ্রামকে গ্রহণ করেছেন বলে নিজে উচ্চশিক্ষিত হয়েও, বিদ্বানসমাজে বাস করেও তিনি আচার-ব্যবহারে এখনও গ্রাম্য আছেন—কাব্যসৃষ্টি ও জীবনচর্চা তার কাছে এক হয়ে গেছে।' (বিলুপ্ত হৃদয় ॥ আজহারউদ্দিন খান পৃঃ ৭৭)

প্রিয় পল্লীর মাটিতে কান পেতে দিয়ে জসীমউদ্দিন তার কান্না শুনেছেন। দেশের শতকরা ৮০ জন অশিক্ষিত লোক এই পল্লীর বুকে ছড়িয়ে আছে। তারা অনাদৃত। তারা অবহেলিত। তারা নিষ্পেষিত। তাদের বেদনাই বড় করে বেজেছে জসীমউদ্দিনের প্রাণে। পল্লীপাগল জসীমউদ্দিন পল্লীর শোষিত কৃষাণদের দুঃখে কাতর হয়ে তাই লিখেছেন—

> 'ক্ষুধার আহার মেলেনি যাদের, পরের ক্ষুধার লাগি,
> রচিতেছে সুধা লাঙল খুঁড়িয়া দিবস রজনী জাগি,
> কদাকার এই ধরণীরে যারা করেছে ফসল বাস
> তাহাদের পেটে জ্বলিছে চুল্লি দারুণ ক্ষুধার আস।'

জসীমউদ্দিন যদিও তাঁর সমকালীন কবি কুমুদরঞ্জন, স্বর্গত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস রায় ইত্যাদির মতন প্রকৃতি বর্ণনার দিকে উৎসাহিত হয়েছেন (তাঁর অনেক কবিতাতেই), তথাপি তাঁদের সকলের থেকেই তিনি স্বতন্ত্র স্বভাবের কবি। স্বতন্ত্র স্বভাবের বলছি এই কারণে

যে, যখন তাঁদের অনেকের কবিতার মধ্যেই আমরা গ্রাম্যচেতনার সঙ্গে সম্পূর্ণ সচেতন হতে দেখি না তাঁদের অনেককে, তখন একমাত্র জসীমউদ্দিনই তাঁদের সকলের থেকে আগে অগ্রসর হয়ে পল্লীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন। এইখানে তাঁর মগ্ন থাকা। এইখানেই তাঁর অবসেসান।

পল্লীপাগল জসীমউদ্দিন কেবলমাত্র পল্লীর প্রকৃতি ও নিসর্গ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন নি। পল্লীর মানুষগুলির জন্য এক অসীম সহানুভূতি ও বেদনাবোধ ছিল তাঁর। আর সেই উপলব্ধি ও বোধেরই অভ্রান্ত দর্পণ হলো 'নক্সিকাঁথার মাঠ' ও 'সোজনবাদিয়ার ঘাট'। শিক্ষিত মানুষের জন্য পাণ্ডিত্যগর্বী রচনাকারের অভাব আমাদের মতন এই অশিক্ষিত দেশেও খুব আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু সাহিত্যের বিমল আনন্দধারাতে দেশের ব্যাপক জনসাধারণকে, বিশেষতঃ অশিক্ষিত জনসাধারণকে অবগাহনের সুযোগ দেবার মতন লেখক বড় কম আছে এই দেশে। কিন্তু একেবারে নেই একথা বলতে পারি না। জসীমউদ্দিনই তো ছিলেন এই মূঢ়ম্লান মূকমুখের ভাষার যোগানদার। কী গভীর প্রেম থেকেই না তিনি বলেছেন, 'দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণকে আনন্দ দেওয়া—শিশুদের জন্যে' যেমন শিশুসাহিত্য, আমার মনে হয় আমাদের অশিক্ষিত জনসাধারণের জন্য তেমনই একটা সাহিত্যের প্রয়োজন আছে।'

রবীন্দ্রনাথ যে ক্ষেত্রে, 'এইসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা···' আহ্বানটুকু রেখেই নিজ কর্তব্য শেষ করেন সেখানে জসীমউদ্দিন তাঁর 'সোজন বাদিয়ার ঘাটে' নমঃশূদ্রের ম্লান মেয়ে দুলী ও মুসলমান সোজনের প্রেমের কবিতা লেখেন সুগভীর নিষ্ঠার সঙ্গে।

পল্লীপ্রাণ জসীমউদ্দিন পল্লীর সর্বহারা নির্যাতিত মানুষগুলির জন্য গভীর মমতায় আর্দ্র, ঘনীভূত। সুগভীর করুণায় বিগলিত।

বেদনার কবি তিনি। মস্তিষ্কজীবী নন, মনোজীবী। তাঁর 'বালুচর' কাব্য গ্রন্থ থেকে 'রঙিলা নায়ের মাঝি' পর্যন্ত সকল রচনার মধ্যেই বাংলাদেশের পল্লীর বুকের বেদনা যেন দানা বেঁধে রয়েছে।

কাঁচা ধানের পাতার মত কচিমুখের মায়া, জোনাকি মেয়েরা সারারাত জাগি জ্বালাইয়া দেয় আলো, কুমড়ার ফালির মত মন, এই পল্লীপ্রেমিককে সর্বদা আকর্ষণ করেছে। তাই কোনদিনের জন্যই নাগরিক জীবনের আঙিনাতে তিনি পা বাড়ান নি।

রচনার বিষয়বস্তুতেতো বটেই, প্রকাশের ভাবভঙ্গিতেও তিনি পরিপূর্ণভাবে আপন পল্লীপ্রিয়তাকে রক্ষা করেছেন। নিচের ছত্রকটি থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে—

আড়িয়ামেঘা, হাড়িয়ামেঘা, কুড়িয়া মেঘার নাতি ;
নাকের নোলক বেচিয়া দিব তোমার মাথার ছাতি।
কৌটাভরা সিঁদুর দিব, সিঁদুর মেঘের গায়,
আজকে যেন দেয়ার ডাকে মাঠ ডুবিয়া যায় !'

(নক্সীকাঁথার মাঠ)

পল্লীপাগল জসীমউদ্দিনের চোখে কোথাও বাংলাদেশের পল্লীগ্রাম সমালোচনার বিষয়ে পরিণত হয় নি। পল্লীকে দেখেন নি তিনি কোন ক্ষমাহীন দুর্বাসার দৃষ্টি নিয়ে। তিনি তাকে দেখেছেন প্রেমিকের চোখে। অসীম ক্ষমায়, ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি।

জসীমউদ্দিনের পল্লীপ্রিয়তার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে তার নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতে।

কাব্য ॥ রাখালী, নক্সীকাঁথার মাঠ, বালুচর, ধান ক্ষেত, রঙিলা নায়ের মাঝি, সোজন বাদিয়ার ঘাট, রূপবতী, মাটির কান্না, গাঙের পাড়।

গীতিনাট্য ॥ পদ্মাপার, বেদের মেয়ে, মধুমালা, পল্লীবধূ ইত্যাদি গ্রন্থগুলিতে। কিন্তু নক্সীকাঁথার মাঠকেই আমরা পল্লীপাগল জসীমউদ্দিনের সাহিত্যিকমনের সবচেয়ে সুখী সমাবেশ বলে গ্রহণ করবো। বাংলা-সাহিত্যে আমাদের ইতিপূর্বে এমন গ্রন্থ কেউ আর উপহার দেন নি। ভবিষ্যতে দেবেন বলেও আশা নেই। জসীমউদ্দিনের এই পল্লীউন্মাদনাকে বাংলাদেশের আর কোন্ কবির সঙ্গে তুলনা করলে সঙ্গত হতে পারে, তা আমার জানা নেই।

পূর্বপাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গকে জুড়ে বাংলাসংস্কৃতির যে বিরাট কর্ষণক্ষেত্র সেখানে কোন্ কবি হলধর কিসের ফসল ফলাচ্ছেন জানি না? তবে একথা ঠিক বাংলা সংস্কৃতির চিরন্তন আকুতি যে হননে নয়, তা যে সৃজনে, রক্ষণে এই বোধ পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক লেখকদের লেখা থেকে যেমন পূর্বপাকিস্তানের লেখকদের লেখা থেকেও আমরা উদ্ধৃতি করতে পারি অজস্র পরিমাণে এই সৃজনশীল সাহিত্য (বাংলা সাহিত্য) কোন খণ্ডিত ভৌগোলিক পরিবেশে থমকে দাঁড়িয়ে থাকবার নয়। এর আহ্বান, মহান সংহতির পাঞ্চজন্য দেশে দেশে, কালে কালে। এ সাহিত্যের সাধকেরা প্রত্যেকেই তাই সীমাখণ্ডিত, আন্তর্জাতিক—দেশে দেশে তাঁদের যে ঘর আছে সে ঘরকেই তারা খুঁজে বেড়াচ্ছেন অনবরত—অনবরত সেই আদিতম প্রভাত থেকে। রবীন্দ্রনাথ থেকে একদিন যে মাধুকরী ভ্রমণ শুরু হয়েছে। জসীমউদ্দিনে তা ক্ষণিকের অতিথিশালা খুঁজে পেয়েছে। তারপর আবার যাত্রা শুরু হয়েছে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে—শুরু হয়েছে নিঃশব্দ অদিতির মতন।

সুখরঞ্জন চক্রবর্তী

অনুভব কবিতা-প্রচারের সাতটি পুস্তিকা

কবিতা যদি হয় ব্যক্তিরই, অর্থাৎ কবিরই, উদাত্ত বাণী মাত্র, আপত্তি নেই। তা না হয়ে তা যদি হয় শুধু আশপাশের শপথটি ধরার একটি প্রয়াসমুখর প্রকাশ—নিজেকে, অর্থাৎ কবির ব্যক্তিস্বরূপটিকে, সেই অনেকের সঙ্গে একাত্ম করার স্বভাবসিদ্ধ প্রণালীর মাধ্যমেই, বলাই বাহুল্য—তাতেও আপত্তি নেই। আবার উল্টে যদি এই দুটি ধারা মিলতে পারে একটি প্রয়াসের মোহানায়, অর্থাৎ ব্যক্তিগতের উদাত্ত স্বরে যদি ধ্বনিত হতে পারে সর্ব বা অন্তত বহুজনীন অভিনিবেশ, তাহলে তো কথাই নেই, সশ্রদ্ধ সানন্দ হাততালি। কিন্তু এই তিনটির একটিও হতে পারল না যে-লেখা, সে আবার আরো এক শ্রেণীর প্রয়াস—অর্থাৎ এই নিয়ে লেখার চার রকমের বড় বড় ভাগ হল এবং শেষ শ্রেণীর এই লেখা আর যাই হোক, রসপদবাচ্য কবিতা হবে না।

রসের সংজ্ঞা নিয়ে মাথা ঘামাতে আমি বসি নি এবং জানি, উগ্রপন্থী সনাতন রসবাদীদের কেউ কেউ যাঁরা এখনো বেঁচে মরে আছেন, তাঁরা হয়তো হৈ-হৈ রৈ-রৈ করে এগিয়ে আসবেন, বলবেন, কবিতায় ব্যক্তিগতভাবে যা সার্থক, তা-ই সমষ্টিগতভাবে সার্থক, ব্যক্তি ও সমষ্টির ভেদ এখানে থাকা শুধু অনুচিতই নয়, কার্যত নেইও; এবং আরো বড়ো যা, তা হচ্ছে, একমাত্র ব্যক্তিগতভাবে চরিতার্থ হয়েই কবিতা সর্বজনীনতার দাবি করতে পারে। কিন্তু দেশে-দেশে গত বেশ কয়েক দশক ধরে আমরা ভিড়ের মহিমার একটি আভাসে দীপ্যমান ক্রমশই হয়েছি—হচ্ছি, ভিড়ের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক নিয়ে আলোচনায় দেশদেশান্তরের কবিতাকে মাততে দেখেছি—দেখছি এবং আমাদের এই নিজের দেশেও, এই ১৯৬৮-র বিপ্লবী বাংলায়, এ-প্রসঙ্গের অনেক মোহাবরণ ঘুচে গেছে। প্রত্যক্ষ জানি, কবিতাতেও ব্যক্তি আছে ও ভিড় আছে এবং ভিড়ের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক আছে—সুতরাং আর মিথ্যা নির্বোধ তর্কের কচকচিতে অন্য কারুর লোভ থাকুক বা না থাকুক, আমার নেই।

সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে অনুভব কবিতা-প্রচার পুস্তিকামালার যে প্রথম সাতটি পুস্তিকা আমাকে পাঠানো হয়েছে, উপরি উক্ত চার রকমের লেখারই কিছু কিছু নমুনা তাদের মধ্যে ইতস্তত দেখছি। এক ধরণের পাশ্চাত্য কবিতার প্রভাবে আমাদের কবিতাতেও বহিরঙ্গের প্রাধান্য সংক্রান্ত যে ধুনো উঠেছিল কিছুকাল আগে, দেখে ভালো লাগছে যে তা ইতিমধ্যেই বেশ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। অর্থাৎ কীভাবে বলছি (ছন্দে না সরাসরি গদ্যে এবং ছন্দে হলে কোন বা কোন ছন্দে, বা কোন মৌলিক ছবির সৃষ্টি করতে পারছি বা না পারছি, ইত্যাদি), সেটা যেমন ধর্তব্য, কী বলছি, সে প্রসঙ্গও সমান প্রাধান্য পাচ্ছে। বহিরঙ্গ দিয়ে শুধু তাকলাগালেই চলবে না, বক্তব্যেরও একটা মূল্য আছে, আমাদের অধিকাংশ কবিদের ইদানিংকার এই বিশ্বাসে কবিতারই স্বাস্থ্য সূচিত হচ্ছে বলে

মনে করি। গৌরাঙ্গ ভৌমিক কর্তৃক সম্পাদিত ও অনুভব প্রকাশনীর পক্ষে দেবকুমার বসু কর্তৃক প্রকাশিত এ পুস্তিকাগুলি (প্রাপ্তিস্থান : সিগনেট বুক শপ, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলকাতা-১২) হল একে একে : রাম বসুর 'হে অগ্নি, প্রবাহ', শঙ্খ ঘোষের 'এখন সময় নয়', কৃষ্ণ ধরের 'আমার হাতে রক্ত', শান্তি লাহিড়ীর 'অস্থি মজ্জা মাংস ইত্যাদি', সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখীর সময়', পরেশ মণ্ডলের 'প্রতিবিম্ব' এবং সত্য গুহের 'এ যেন বার বেলা'। প্রচ্ছদ বাদ দিলে প্রতিটি পুস্তিকা ১৬ পৃষ্ঠার এবং প্রতিটির দাম পঞ্চাশ পয়সা।

এই পুস্তিকামালার পরিকল্পনার সঙ্গে যাঁরা জড়িত, সর্বপ্রথমেই তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ না জানিয়ে পারি না। পরিকল্পনাটি হয়তো অভিনব নয়, না আমাদের দেশে (এ ব্যাপারে আরো কয়েকটির মধ্যে বুদ্ধদেব বসুর সাম্প্রতিক ও সশ্রদ্ধ দৃষ্টান্ত অনেকেরই মনে পড়বে), না সাহিত্যে সমৃদ্ধ অন্যান্য দেশে। তবু এই মুহূর্তের বাংলা দেশে অন্য কেউ বা অন্য কোনো সংস্থান হয়তো এমন একটি কর্তব্যে ব্রতী নন, অনুভব প্রকাশনীর প্রতি কৃতজ্ঞতার একটি অতি বিশিষ্ট কারণ নিহিত সেই সত্যের মধ্যে। তা ছাড়া এঁরা যা করছেন, তার একটা জরুরী দরকারও ছিল, কারণ এ সম্বন্ধে বোধহয় সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে আমাদের সমস্ত সাহিত্য শাখার মধ্যে একমাত্র কবিতাই তার যুগোপযোগী দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন। এ পুস্তিকামালার স্থান অল্প হলেও খুব অল্প নয়, তাতে এক-একটি কবির বেশ কয়েকটি কবিতা ধরতে পারে, কবি তাঁর স্বরূপটিকেও ধরতে পারেন (যা সম্ভব নয় পত্রিকার মাধ্যমে মাত্র একটি বা দুটি ছোট ছোট কবিতায় প্রকাশে) এবং একই সঙ্গে আকারের চটীত্বের জন্যই তাঁকে বা তার রচনাকে গ্রহণ করতে চাওয়া পাঠকসাধারণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়। যেন ছোট্ট বই, কয়েক মিনিটের মধ্যেই পাতার পর পাতা উল্টে শেষ করে ফেলতে পারি, বুঝলাম বা নাই বুঝলাম যায় আসে না—এমন একটা ভাব জাগা স্বাভাবিক হতে পারে। এদিকে দামও প্রায় দু'কাপ চা'র সমান, তাই কিনতে যেমন ক্রেতার পক্ষে ততটা গায়ে লাগে না, প্রকাশক বা সম্পাদক যদি বিনা মূল্যে বিলি করতে চান রসিক সজ্জনের মধ্যে, তাঁদেরও তেমন মনঃপীড়ায় ভুগতে হয় না। অন্যদিকে যাকে বলে যথার্থ কাব্যগ্রন্থ, প্রকাশকরা সহজে তাতে হাত দিতে চান না, বহু কবিকে নিজের পয়সায় বই বার করতে হয়তো অনেকে পেরেও ওঠেন না, শুধু বিনা পারিশ্রমিকে পত্রিকায় প্রকাশিত হন। এই সব নানা দিক থেকে আলোচ্য পুস্তিকা-মালায় কয়েকটি অনস্বীকার্য গুণ রয়েছে।

পরিকল্পনাটির প্রতি যদিও আমার স্তুতিবাদ নির্ভেজাল, শুধু মুদ্রণসক্রান্ত দু'একটি কথা প্রকাশক ও সম্পাদকের দ্বারে সবিনয়ে পেশ করতে চাই। বেশ কয়েকটি ছাপার ভুল চোখে পড়ল, যা কবিতার পক্ষে সহজে মার্জনীয় নয়—কেন, কবিদের দিয়ে প্রুফ পড়িয়ে নেওয়া যায় না কি? দ্বিতীয়ত, একটির পর একটি কবিতা বড্ড ঠাসা-ঠাসা ভাবে ছাপা, স্থানে স্থানে যেন আরো একটু বেশি করে জায়গার দরকার ছিল। তৃতীয়ত, কি কবিতায় কি কবিতার নামে, টাইপ নিয়েও বোধহয় আরো সন্তোষজনক পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবকাশ থাকতে পারে। সর্বশেষে প্রচ্ছদে দেখছি একটি ব্লকই পুস্তিকা হতে পুস্তিকান্তরে মুদ্রিত হচ্ছে, শুধু কবিদের রঙটা পাল্টে। কিন্তু পুস্তিকামালার সংখ্যা যেভাবে বেড়ে চলেছে (যদিও সেটা সুখকর এবং স্বাভাবিক), তাতে ব্যবহার করার মত

নিত্য নতুন উপযুক্ত রঙের অভাব শীঘ্রই জাগতে বাধ্য—সুতরাং প্রচ্ছদ প্রসঙ্গে সম্পাদক ও প্রকাশকের পক্ষে হয় তো ভিন্নভাবে চিন্তা শুরু করা বাঞ্ছনীয় হতে পারে। আমার নিজের ধারণা যদিও তাদের বর্তমান আকারেও এ পুস্তিকামালা কোনো অর্থেই দৃষ্টিকটু নয়, তা একটু চেষ্টা করলে হয়তো আরো অনেক বেশি আঙ্গিক শোভনতা পেতে পারে, খরচ একেবারে না বাড়িয়েও।

অথ কবি ও কবিতাপ্রসঙ্গ। কবিতাকে যে শ্রেণীর পাঠক আমার মত করে পেতে চেয়েছেন, তাঁদের নীরব অথবা লিখিত অভিনন্দন রাম বসু পেয়ে আসছেন বহুদিন এবং এটাকে ব্যক্তিগতভাবে আমি কম শ্লাঘার বস্তু মনে করি না যে আমাদের অপেক্ষাকৃত নবীন কবিদের মধ্যে সেই প্রবীণেরই (কেন না অনেকটা ও ক্রমশঃই মোহমুক্ত, এই অর্থে) একটি অতি উল্লেখযোগ্য সংকলনী ('হে অগ্নি প্রবাহ') দিয়েই এ পুস্তিকামালার সূত্রপাত হয়েছে। আশপাশের মানুষের শপথের প্রতিশ্রুতিতে যাঁদের কবিতাদীপ্ত, রাম বসু নিঃসন্দেহে সেই কবিদের অন্যতম—বিশেষত তাঁর ইদানিংকার কাব্যে এমন একটি সহজ স্বচ্ছ দ্যুতির পরিচয় পাচ্ছি, যা তাঁর বক্তব্যকে একটি গভীর গম্ভীর মহিমায় সত্যে ক্রমশই মণ্ডিত করছে। এ সঙ্কলনেই রয়েছে তাঁর প্রত্যয়ের স্পষ্ট স্বীকার বার বার, যেমন এই উদাহরণে:

আমাদের কারো জীবন আর একার জীবন নয়
আমাদের কারো মৃত্যু আর একার মৃত্যু নয়
('দুই বাহু প্রসারিত করে যাবো')

তাঁর যে-কবিতাগুলি বড় বেশি করে ভালো লাগল, সেগুলি হল 'হে অগ্নি, প্রবাহ', 'বরবর্ণি নক্ষত্র আমার', 'তোমার পায়ের নিচে', 'এত অন্ধকারে', 'ভিয়েতনাম', 'ছায়ার নিচে', 'দ্বিতীয় বসন্ত', 'দুই বাহু প্রসারিত করে যাবো', ও 'গায়ত্রী'। মানছি তাঁর প্রত্যয়ের সঙ্গে মিশ্রিত আছে এক ধরণের অনিবার্য ক্রোধও, যাতে কখনো কখনো তিনি সংযমের চৌকাঠ পেরিয়েছেন, যেমন 'ভিয়েতনাম কবিতায়:

আমি জানি মানুষের ভিতরের যা কিছু
কলুষ, দুঃস্বপ্ন ও প্রাগৈতিহাসিক তার নাম মার্কিন
আমি জানি মানুষের ভিতরের যা কিছু মহৎ
যা কিছু অমোঘ ও সম্ভাবনা তার নাম ভিয়েত নাম।

কিন্তু সেই একই কবিতায় আছে এমন সুন্দর গাম্ভীর্যের অনবদ্য অংশও:

কিছু শব্দ আছে আমি উচ্চারণ করতে ভয় পাই
কিছু ধ্বনি আছে আমাকে রোমাঞ্চিত করে
কিছু মুখ আছে যার উজ্জ্বলতা অন্ধ করে দেয়
ভিয়েত নাম
মানুষের, বিবেকের বিবেকের হে দিব্য বিভূতি
আমার প্রণাম, আমার প্রণাম।

অথবা: ভারতের উত্তাপ, বিবেকের স্নিগ্ধতা, অরণ্যের উদারতা—
আমরা চাই তোমার সত্য

আমরা চাই তোমার সূর্য
আমরা বলি শুদ্ধতার মন্ত্র : ভিয়েত নাম।

কখনো আবার এই কবি যেমন ব্যক্তিগতভাবে উদাত্ত তেমনি অভীপ্সায়-অভিনিবেশে সর্বজনীন :

আমরা সারা জীবনে অনুশোচনার দামে এক মুহূর্তের
আহ্লাদ কিনি। আর অপরিসীম অন্ধকারের ভিতর দিয়ে
কোথায় এগিয়ে যাই, জানি না!
হে হরিৎবর্ণ সোম, আজ আমাদের চারপাশে যা ঝরে পড়েছে
তার নাম আর্তনাদ।
হে দ্যাবা-পৃথিবী, আমরা আজ বিচ্ছেদের অরাজক
উন্মাদনা ছাড়া কিছু জানি না!
হে ঋতুগণ তোমরা যাকে সত্য বলতে আমরা কি তাকেই
বলি জীবন? অথবা সেই শুচিনদী আমাদের অন্তর্গত
বলে মর্মরিত কণ্ঠ এখনো বাজে ঘুমে—যাকে বলি স্বপ্ন?
হে অগ্নি, আমরা আশ্রয় চেয়েছি তোমার ভিতরে যেন
তেজঃপুঞ্জ আমাদের আর দগ্ধ না করে।
হে নদী, আমরা আশ্রয় চেয়েছি তোমার ভিতরে যেন
অন্ধকার জলরাশি আমাদের গ্রাস না করে।
হে নিষুৎবান্ বায়ু, আমাদের হৃদয়ের আস্তীর্ণ কুশবনে তুমি
এস যেন আর আর্তনাদ শুনতে না হয় কখনও।
হে নারী, যে তুমি প্রেমিকা জননী, আমাদের আচ্ছাদিত
কর যেন কৃষ্ণপক্ষের নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করে চেতনা।
হে অদিতি, আমাদের ব্যাপ্ত কর একটি নিটোলে যেন
হৃদয় হয় হেমাগ্নি; কবিতা হয় বাক্‌রূপ ধ্বনি। ('গায়ত্রী')

শঙ্খ ঘোষ ('এখন সময় নয়'), সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ('নীলকণ্ঠ পাখীর সময়') এবং শান্তি লাহিড়ী ('অস্থি মজ্জা মাংস ইত্যাদি'), যে যার নিজগুণে স্বতন্ত্র হয়েও মুখ্যত ব্যক্তিগত পথেরই পথিক ও তাই স্বভাবতই রাম বসু থেকে তাঁদের সুর ভিন্ন প্রকৃতির—যদিও এঁদের তিনজনের মধ্যে শঙ্খ ঘোষকে আমার সবচেয়ে ভালো লাগে, হয়তো তার বাচনভঙ্গীর সঙ্গে আমি বিশেষ একটি আত্মীয়তা বোধ করি বলেই। উদাহরণস্বরূপ শঙ্খ ঘোষের 'কোন ভাষায়' হতে একটি অংশ তুলে দিই :

এই পৃথিবী না থাকলে থাকত শুধু অন্ধকার। কিছুই থাকতো না এই সৌরলোক না থাকলে। কিন্তু কোথায় থাকত সেই না-থাকা, কোন পাত্রে? এই অন্তহীন নাস্তি যখন হা-হা করে এগিয়ে

আসে চোখের ওপর, দুলে ওঠে রক্ত— তখন তুমি কথা বলো মহা শূন্যে অন্ধকারের ফুটে ওঠার মতন সেই তোমার ভাষা হোক প্রথম আবির্ভাবের মতো শুচি, কুমারী—শস্পের মতো গহন, গভীর।

এই তো, এই তো রাত্রি হলো। বলো এখন তুমি কথা বলো।

এ ছাড়া অন্যান্য যে সব কবিতা তাঁর এই সঙ্কলনে ভালো লাগল, সেগুলি হল 'সময়' 'এমনি ভাষা', 'ঘুম', 'ঘর ১', 'প্রতীক্ষা' ও 'গুল্ম, ঈথার'। তার মধ্যে যা সবচেয়ে নজরে পড়ার মত, তা তাঁর লেখনীর সাবলীলতায় এক হীরক জ্যোতি, যা মনকে মুগ্ধ না করে পারে না। স্থানাভাব সত্ত্বেও একটি গোটা কবিতা এখানে উদ্ধৃত করার লোভ সামলানো দায় ঠেকছে:

কড়িকাঠ থেকে বুকের রক্ত পর্যন্ত ঝুলে পড়া মাকড়শা
অনেকদিন পরে ঢুকতে গেলে জাল জড়িয়ে ধরে মাথায়
বলে, এসো এসো, এই তো কতো গ্রীষ্ম বর্ষা
কতো শীত হেমন্ত বসে আছি তোমার প্রতীক্ষায়, এসো—
বলে ভিজে অন্ধকারে মনোহীনতার গন্ধে টেনে নিতে নিতে
শুষে নেয় আমার সমস্ত উদ্ভিদ, আমার অন্তরাত্মা। ('প্রতীক্ষা')

সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়েরও এক অনস্বীকার্য সাবলীলতা, তবে তাঁর আরো ভালো কবিতা বোধহয় আগে দেখেছি। মুখ্যত রোম্যান্টিক ও লিরিক কবি হলেও তিনি কিন্তু চিরাচরিতের ধার দিয়েও যান না, এবং তাঁর কবিতায় প্রায়ই এমন একটি মিষ্টি আমেজ পাই যা কিছু কম মৌলিক নয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে 'চড়াই'-এর এই দুটি পঙক্তি নেওয়া যায়:

আমাদের চার ধারে হাত-পাতা দিনের আলোক
আনমনে তুলে নেয় কালকের হারানো পালক।

তবে শুধু সেই মিষ্টত্বই নয়, কখনো কখনো উদাত্ত হতেও জানেন তিনি এবং আমি তো অন্তত নীচের পঙক্তিগুলি একাধিকবার পড়তে একেবারেই বিব্রত বোধ করব না:

নাগরিক আমি জানি বন্ধ্যা সভ্যতার
অশালীন সময়ের অনেক হৃদ্যতা
অনিচ্ছায় সহ্য করে যাই।
নীরবতা—দেয়ালের মত নয়।
বিবেকের অহিংস হরতাল।
দু হাত বাড়িয়ে আমি মানুষের স্পর্শ নিতে গেছি
ঘ্রাণ
রঙ
আলো—
প্রতিবার ব্যাহত হয়েছে রিক্ততায়,
চোখের দু'তীর ঘিরে কুয়াশার সিঁড়ি
পায়ে পায়ে অগ্রসর হই

এক পা
দুই পা
আকাশের বুকে পাতা সিঁড়ি বেয়ে।
সিঁড়ি
সিঁড়ি
আর সিঁড়ি।
কত সিঁড়ি।
এই সিঁড়ি বেয়ে আমি উঠে যেতে পারি
স্বাতি-তারা
তোমার চোখের জলে সমস্ত নক্ষত্র যদি জলে পুড়ে যায়।
মৃত্যুর অনেক ইচ্ছা শরীরে ভাঁজে ভাঁজে
সিঁড়ির মতন।
তারও উর্ধ্বে চলে যেতে পারি এই সিঁড়ি বেয়ে
যদি তুমি বল, যদি তুমি—
স্বাতি-তারা! ('সিঁড়ি')

পরের কবি শান্তি লাহিড়ীর এই স্বীকার প্রশংসনীয়:

আমি এই অস্থির শব্দটি নিরুপায় হয়ে লিখে ফেলি,
কবিতা লেখার জন্য হতে ভালো লাগে না কৌশলী!
(উনিশ নং কবিতা)

কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর অভিজ্ঞতার প্রকাশের প্রয়াসে মুখ্যত কৌশলীই তিনি এবং যদিও আরো দূরে যাওয়ার অঙ্গীকার হয়তো তাঁর রচনায় অনুপস্থিত, সেই কৌশলটিও তারিফ না করে পারি না। কেমন কৌশল, তার একটু পরিচয় দিই:

উৎসবে কেবল মনে পড়ে ছেঁড়া ঘুড়ি বাঁশের লাটাই
ক্যালেণ্ডারে সব আছে শুধু সেই বালকটি নেই,
যে শুধু আকাশ ধরে রেখেছিল জামার পকেটে
কাজের ছুতোয় এসে, নদীর কিনারা ধরে হেঁটে
অবশেষে একদিন পৌঁছে গেল বিরাট প্রাসাদে
ছাদের উপর বসে এখন সে স্থূল অবসাদে। (দুই নং কবিতা)

অবশ্য এই কৌশলের মাধ্যমেই হঠাৎ-হঠাৎ কিছু স্মরণীয় উক্তি এসে পড়ে। যেমন:

অশোক নিঃশব্দে মরে গেল। গ্যাসের আলোয়
সহরতলীর সেই বিখ্যাত মাতাল ঘরে যায়
সামাজিক বেশ্যাগুলি একে একে স্বামীদের কাছে
তুলে ধরে শারীরিক উৎকোচ প্রস্তাব।

বাসার ঠিকানা জানা নেই, তবু মধ্য রাত
বড় মনোরম স্থিতি মনে পড়ে জলের লণ্ঠন
রিক্সাওলা বয়ে আনে, বাবু, কতদূর ? কোন ঘর ?
দীর্ঘ দেউড়ি খুঁজে বলি, ব্যস, এইখানে রেখে দাও। (একুশ নং কবিতা)

আশা করি এটা আমার নিজেরি অক্ষমতা এবং তা যদি সত্য হয় তো কবির কাছে সবিনয় মার্জনা চাইছি, কিন্তু সত্য গুহকে ('এ যেন বারবেলা') বোঝা আমার সাধ্যাতীত ঠেকল। মনে হয়, শব্দ যেখানে অর্থপূর্ণ হয় এবং অভিজ্ঞতা সংজ্ঞা পায় প্রকাশে, সে-রাজ্যের প্রতি কবি যাত্রা শুরু করেছেন, পৌছোন নি এখনো। তাঁর 'তুলসী মুখুজ্জে, রেবা, বাসুদেব, রেবতীমাসিমা। সব কে কেমন আছো ?'-র সঙ্গে 'এরপর মানুষের আর পথ নেই। এরপর অনন্ত কালরাত। ঈশ্বর তোমাকে পথ দেখাবেন। ওঁ-ম্-মা !!!'-র যদি কোনো সম্পর্ক থাকে তো সে-সম্পর্ক হয়তো সেই 'অনন্ত কালরাতেই' নিমগ্ন, ভোরের আলোয় আজো তা প্রস্ফুটিত হয় নি। তবে আবেগ এঁর অসাধারণ, বোধহয় বলতে চানও অনেক কিছু —আশা রাখলাম, একদিন এঁর বক্তব্য বোঝার সৌভাগ্য হবে।

পরেশ মণ্ডলের সংকলনের ('প্রতিবিম্ব') নামেই তাঁর কবিতার প্রকৃতি পরিচয়। বক্তব্যহীন (হয়তো অনুভূতিহীনও) দৃশ্য ছবির সৃষ্টিতেই তাঁর সমস্ত প্রয়াস নিঃশোষিত মনে হয়। একটি উদাহরণই যথেষ্ট :

ঘরের কোণে পুরনো গীটার
ছেঁড়া তারে জং
বাঁকা রোদ
ধুলো
ছাদের টবে রজনীগন্ধা
পুরনো গীটার
ঘরের কোণে
গীটার ('গীটার')

বৃহৎ মানব সমাজের সঙ্গে কবির সম্পর্কযুক্ত আমাদের সেই যে-প্রথম কথা, রাম বসুর পরে তাতে আবার ফিরি কৃষ্ণ ধরের সংকলনের ('আমায় হাতে রক্ত') প্রসঙ্গে। কৃষ্ণ ধরকে বলতে শুনি :

উঁচু গলায় কে গান গাইছে,
ভাই বলে কারা আমায় ডাক দিল
আমি স্বেচ্ছাবন্দী হলাম নরকে
উজ্জ্বল মানুষ হে, আমায় করুণা করো ॥ ('আমার হাতে রক্ত')

এ-কবির মধ্যে বৃক্ষের সকল প্রতিশ্রুতিপূর্ণ চারাগাছ ইতিমধ্যেই দেখছি এবং মনে রাখবার মত তাঁর অন্যান্য বহু পংক্তির মধ্য হতে একাংশ এখানে তুলে দিই :

জানি তার বিশালতা পরিব্যপ্ত
তোমার সুনীলে

অণুতে অণুতে তার জয়ধ্বনি
মিলায় অখিলে
তথাপি সে মিল খুঁজি অস্তিত্বের
পরতে পরতে
বনানীর রক্তিম পলাশে, অন্তরীক্ষে
স্তম্ভিত বিস্ময়ে।
খুঁজতে খুঁজতেই আহা, পেয়ে যাই ডানা
দুরন্ত বাসনা
জ্বলে ওঠে শেষ বার প্রত্যাশার অসম্ভব মিলে।

('মিল খুঁজি মেঘে, চন্দ্রে')

সব সমালোচনাতেই সমালোচকের নিজস্ব (অর্থাৎ, যা হয় তো অন্যলোকের কাছে যুক্তিযুক্ত না-ও ঠেকতে পারে) ভালো-লাগা মন্দ-লাগার প্রশ্ন থাকে, আমার এ-প্রয়াসেও নিশ্চয় রইল। তবু সকল ভালো-মন্দ বিচারের পরেও বলব, বহু ভালো কবিতা পড়ার সুযোগ পেলাম এই পুস্তিকামালার মাধ্যমে। প্রকাশনটির বহুল প্রচার কামনা করি।

লোকনাথ ভট্টাচার্য

আনন্দে
উৎসবে...
প্রাত্যহিক প্রয়োজনে..
সবার মনোরঞ্জনে...
কেশতৈল
কেশরঞ্জন

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্র সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

পঞ্চদশ বর্ষ ॥ চৈত্র ১৩৭৪

সমকালীন

Orient
ENGINEERED
TO OUTLAST
MANY MANY SUMMERS
Orient
CEILING FAN
GUARANTEED FOR TWO YEARS
ORIENT GENERAL INDUSTRIES LTD.
CALCUTTA-54
ASP/OGI-2/66

নিয়মাবলী

সমকালীন

প্র ব ন্ধে র মা সি ক প ত্রি কা

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখে) বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক সাড়ে সাত টাকা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীনে' প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদি নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়। **গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না**—'সমকালীন' প্রবন্ধের পত্রিকা।

'সমকালীন'এর গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে, রসিক সমালোচকদের দ্বারা **শিল্প, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান** ও **সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ** ও **কাব্য গ্রন্থের** বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দুখানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোন ২৩-৫১৫৫

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

চৈত্র
তেরশ' চুয়াত্তর

পঞ্চদশ বর্ষ
১২শ সংখ্যা

কোম্পানীর নথিপত্রে কলকাতার প্রথম হাসপাতাল

নারায়ণ দত্ত

সম্প্রতি এক গবেষণায় জানা গেছে যে রাজা তৃতীয় জর্জ এক বিচিত্র রোগে ভুগছিলেন বলেই তাঁর রাষ্ট্রশাসনে তত দক্ষতা দেখা যায়নি। গবেষকরা এইখানেই থামেন নি। তাঁরা সেই রোগের খুঁটিনাটি সব লক্ষ্য করে সেই রোগ যে হানোভার বংশের অনুক্রমিক, তাও আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু দুঃখের কথা, পঞ্চম মুঘল সম্রাট শাজাহান কি রোগে ভুগেছিলেন শেষটায়, সেটা ইউরেশিয়া কিনা, মুঘল হেকিমরা তাঁর কি চিকিৎসা করেছিলেন, বাবরের মৃত্যু আর হুমায়ুনের আরোগ্য—এই রহস্যের আসল মীমাংসা কি, আকবরের মৃত্যুরোগটা রক্তক্ষয়ী আমাশয় কিনা, রাজ্যাভিষেকের পর ঔরঙ্গজেবের যে দীর্ঘ জ্বর ভোগ হয়েছিল এবং তরমুজ খাবার ফলে যা হঠাৎ বেড়ে যায় সেটা কি রোগ তা নিয়ে আমাদের দেশে কোন গবেষণার কথা আমরা বোধ করি এখনও ভাবতেও পারি না। অতদূর না হয় না গেলাম। খাস এই কলকাতা শহরে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে দারুণ অজীর্ণ হত। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় তাঁর 'আত্মজীবনচরিত'-এ সে সম্বন্ধে লিখেছেন—'তৎকালে মফঃস্বলের যে সকল লোক প্রথমে কলিকাতায় যাইতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই অজীর্ণ হইত। এ পীড়াকে 'লোনালাগা' কহিত। যাঁহারা তথায় অল্পকাল থাকিয়া প্রত্যাগমন করিতেন, তাঁহারা বাড়িতে আসিয়া লোনা কাটাইবার নিমিত্ত কাঁচা থোর খাইতেন, ঘোল ও কল্মির ঝোল পান করিতেন এবং গাত্রে কাঁচা হলুদ মাখিতেন।' শোনা যায় স্বয়ং বিদ্যাসাগর ছেলেবেলায় কলকাতায় গিয়ে এই রোগে ভোগেন এবং তাঁকে বাড়ি পাঠিয়ে দিতে হয়। জানি না আজ পর্যন্ত কলকাতার সেই আদ্যিকালের রোগটা নিয়ে, তার লক্ষ্য, পরিচয়, নিবৃত্তি নিয়ে কোন রকম আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে কিনা।

অথচ তার প্রয়োজন আছে। নানা কাজ। ব্যাপারটি কঠিন। দায়িত্বটি দুরূহ। কিন্তু অতীত কলকাতার সার্থক সমাজচিত্র আঁকবার চেষ্টায় এই গবেষণার প্রায়াজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় নেই। অবশ্য বর্তমান প্রবন্ধে এইসব বিষয়ে আলোকপাত করা উদ্দেশ্য নয়। তবু এই গবেষণার ব্যবস্থা থাকলে কোম্পানীর নথিপত্রে সেকালের কলকাতার রোগ ও তার নিরাময় বিধি—তার বিভিন্ন আয়োজন সম্বন্ধে যে অনেক বেশি আলোকপাত করা সম্ভব হত এটা নিঃসন্দেহ।

কোম্পানীর নথিপত্রে প্রথম যে হাসপাতাল সম্বন্ধে উল্লেখ দেখা যায় তাতে বিলেতের কোর্ট অব ডিরেক্টররা স্বীকার করেন যে কলকাতার কাউন্সিল বার দুই তিন তাদের কাছে কলকাতায় হাসপাতাল তৈরি করার জন্যে ধর্ণা দেয়। অবশ্য লক্ষণীয় যে এই দরবার কলকাতার ইংরেজ-বাসিন্দাদের জন্যে নয়। তার সৈন্যসামন্তদের জন্যে। সতেরশ' সাত সালের ষোলই অক্টোবরের কলকাতার প্রথম হাসপাতাল তৈরির হুকুমে লেখা ছিল : "Having abandance of our soldiers and seamen yearly sick (this year more particularly our soldiers), and the doctors representing to us that for want of a hospital or convenient lodging for them, is mostly the occasion of their sickness, and such a place will be highly necessary ...it is therefore agreed that a convenient spot of ground near the Fort pitched upon to build a hospital on..." এ থেকে দেখা যাচ্ছে কলকাতার যে প্রথম হাসপাতাল তৈরী হয়, সামরিক কারণে। এবং আরও দেখা যাচ্ছে কোম্পানীর ক্যাম্প থেকে দেওয়া হয় দু-হাজার টাকা। লিডেনহল ষ্ট্রীট থেকে আরও হুকুম হয় যে এছাড়া যা খরচ হবে তা যেন দেশী বিদেশী যে সব জাহাজ কলকাতার গঙ্গায় এসে ভিড়বে তাদের কাপ্তেন বা কমাণ্ডারদের কাছ থেকে চাঁদা স্বরূপ আদায় করা হয়। কলকাতার বাসিন্দাদের কাছ থেকেও চাঁদা আদায়ের হুকুম হয়। এসব টাকা যেন আব্রাহাম অ্যাডামসের হাতে দেওয়া হয়। এবং অ্যাডামস সাহেবকেই বলা হয়, কাউন্সিলের নির্দেশানুযায়ী এই হাসপাতাল তৈরি করতে। এই অ্যাডামস কোম্পানীর ষ্টোরকিপার ছিলেন এবং পরে জনকোম্পানীর কেশিয়ার হন। এবং জানা যায় দু-হাজার টাকায় অ্যাডাম সাহেব হাসপাতাল তৈরি শেষ করতে পারেননি। আরও পাঁচ হাজার টাকা তিনি নিয়েছিলেন।

কলকাতার প্রথম হাসপাতাল সম্বন্ধে এর পরে যে উল্লেখ পাওয়া যায় কোম্পানীর চিঠিপত্রে সেটা উইলিঅম হ্যামিলটন এবং রিচার্ড হার্ভের কতকগুলি সুপারিশ উপলক্ষে। হ্যামিলটন এবং হার্ভে উভয়েই ছিলেন কোম্পানীর ডাক্তার এবং এই হ্যামিলটনই সারম্যান সাহেবের সঙ্গে দিল্লী দৌত্যে গিয়ে ফররুকসীয়রের নেকনজরে পড়েন। কলকাতার হাসপাতালের ইতিহাসে এই ডাক্তারদের সুপারিশগুলি খুবই দরকারী। সেগুলি হচ্ছে—

(ক) কোম্পানী হাসপাতালে ব্যবহারের জন্যে তিরিশটি চৌকি আর বিছানাপত্র, কুড়িটি গাউন এবং কুড়িটি গড়া—একধরণের মোটা কাপড় সরবরাহ করেন।

(খ) অবিবাহিত সব অসুস্থ সৈনিক হাসপাতালে থাকতে বাধ্য থাকবে।

(গ) পথ্যের জন্যে অসুস্থদের টাকা দিতে হবে দৈনিক। হার—সাধারণ সৈনিক চার আনা, কর্পোরেল ছয় আনা, এবং সার্জেণ্ট আধুলি।

(ঘ) হাসপাতালে পাহারা চাই। ডাক্তারের হুকুম ছাড়া রোগীরা যাতে চলে যেতে না পারে এবং হাসপাতালে কড়া মাদক দ্রব্য আনতে না পারে তার জন্য এই প্রহরা।

(ঙ) হাসপাতালের জন্যে একজন ষ্টুয়ার্ড রাখা হল। কাপড়চোপড় সব তারই চার্জে থাকবে। ষ্টুয়ার্ডের মাহিনে হবে ত্রিশ টাকা। কাঠ তেলের খরচ ঐ থেকেই সে বহন করবে।

(চ) ছয়টা কাঁসার পাত্র, ছয়টা সসপ্যান, কুড়িটা চামচ সমেত এককুড়ি প্লেট এবং আরও বারটা পাত্র চাই হাসপাতালের জন্যে।

এই সূত্রে আরও জানা যায় ডাক্তারবাবুদের কোয়ার্টার তখন হাসপাতাল থেকে বেশ দূরে ছিল। এবং ডাক্তারবাবুদের এই সব সুপারিশ কোম্পানী গ্রহণ করে লেখে: 'All of which are unanimously agreed to, Being for the better preservation of Sick Soldiers health...' এটা হচ্ছে বি[illegible]আগষ্ট, সতেরশ' তের সালের কথা। দেখা যাচ্ছে তিন বছর পরে—সতেরশ' ষোল সালের ডিসেম্বরে হাসপাতালের আবার নতুন সব নিয়ম কানুন হয়। এতে কোম্পানী একেবারে সদাব্রত বলে ঠিক করে যে কোম্পানীর পয়সায় ডাক্তারদের প্রেসকিপসন অনুযায়ী হাসপাতালের যে সব ওষুধ থাকবে না সেগুলি বাজার থেকে কিনে দেওয়া হবে। অসুস্থদের জন্যে চৌকি বা তক্তপোষ এবং কম্বল, কাপড়, কাঠ, কাঠকয়লা, পাত্র প্যান ইত্যাদি যাই দরকার হোক না কেন সবই কোম্পানী কিনে দেবে। রোগীর পথ্য, মোমবাতি, তেল, সবই সৈন্যদের মাসিক বেতন থেকে কেটে নেওয়া হবে এবং এই খরচ কখনও চার আনার বেশি হবে না। তবে রোগীরা মাইনে হাতে না পেলে এই টাকা নেওয়া যাবে না। হাসপাতালের বাসনপত্র এবং অন্যান্য জিনিস, সবই থাকবে ষ্টুয়ার্ডের তাঁবে এবং হারালে দায়ী থাকবে সেই।

এই প্রসঙ্গে নতুন একজন ষ্টুয়ার্ডের নাম পাওয়া যাচ্ছে ইনি রিচার্ড ওয়ারেন। এঁর উপর হুকুম হয় হাসপাতালে থাকবার। এবং ইনি স্বেচ্ছায় তাতে রাজি হয়েছিলেন বলে মনে হচ্ছে। এঁর জন্য কোম্পানী দশ টাকা খোরাকীর বন্দোবস্ত করেন। এবং দেখা যাচ্ছে আগে যে তিরিশ টাকা মাইনেতে ষ্টুয়ার্ড নিয়োগ করার কথা বলা হয়েছিল, সেটা যেকারণেই হোক, বাতিল হয়ে গেছে। কেন না, ওয়ারেন অন্য একটা কাজ করত কোম্পানীর এবং সে কাজের জন্যে প্রতি মাসে তন্‌খা পেত পনের টাকা। আরও দেখা যাচ্ছে, এই সময় থেকে হাসপাতালে রোগবেশীর সময় ছয় জন, অন্য সময় চার জন হাড়ি—খুব সম্ভব—ময়লা পরিষ্কারের জন্য রাখা হচ্ছে। আরও চাকরি পাচ্ছে দু'জন ধোপা। অবশ্য এরও আগে সতেরশ' দশ সাল নাগাদ হাসপাতালে ব্যারাক এবং চারিদিকে দেওয়াল দেওয়া হয়। এবং আরও হুকুম হয় যে কয়েকজন অফিসারও সৈন্যদের সঙ্গে ব্যারাকে থেকে শৃঙ্খলা বজায় রাখবে। কিন্তু কেন? কারণটা বিশেষ প্রণিধান যোগ্য: "There being a great many European soldiers in the Garrison who if they lodge about the towne as usuallly will create sickness and other in convenience to themselves and others.' এই থেকে সেকালের হাসপাতালের রোগীদের রোগ সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন দেখা দেয়। সে রোগ কি সংক্রামক? সেটা কি 'ফিরঙ্গ রোগ'?

এধরণের সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। অবশ্য ঠিক এই সময়ের না হলেও সতেরশ' ছেষট্টি

সাল নাগাদ কোম্পানীর একটা চিঠিপত্র পাওয়া যাচ্ছে যাতে ফিরঙ্গ রোগে ভুগছে এমন সৈন্যদের ওপরে কোম্পানী কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করে। ঐ বছর বাইশে সেপ্টেম্বর তারিখের এক নির্দেশে ঠিক হয়—'a distinction should be made between those men who are recived into the Hospital on account of common and natural disorders, and veneral cases.' শুধু তাই নয়। এই বিশেষ রোগগ্রস্ত সৈন্যদের পথ্য বাবদ তাদের মাহিনা থেকে তিন টাকার জায়গায় পাঁচ টাকা কাটার হুকুম হয়। কোম্পানীর এই নতুন আদেশে নির্ধারিত হার ছিল নিম্নরূপ :

ব্যারাকে যাবার সময়—সাধারণ রোগে কোম্পানী দেবে সৈন্যপ্রতি—১০৲ টাকা
কণ্ট্রাকটর দেবে—৫৲ টাকা
রুগ্ন সৈন্যরা দেবে—৩৲ টাকা
একুনে—১৮৲ টাকা

যৌন রোগাক্রান্ত হলে—কোম্পানী দেবে—৫৲ টাকা
কণ্ট্রাকটর দেবে—৫৲ টাকা
রুগ্ন সৈন্যরা দেবে—৫৲ টাকা
একুনে—১৫৲ টাকা

রণক্ষেত্রে থাকার সময় এই হার বাড়ত। সেটা ছিল নিম্নরূপ—

সাধারণ রোগে—কোম্পানী দেবে—৮৲ টাকা
কণ্ট্রাকটর দেবে—১০৲ টাকা
সৈন্য দেবে—৩৲ টাকা
একুনে—২১৲ টাকা

যৌন রোগাক্রান্ত হলে—কোম্পানী দেবে—৩৲ টাকা
কণ্ট্রাকটর দেবে—১০৲ টাকা
সৈন্য দেবে—৫৲ টাকা
একুনে—১৮৲ টাকা

উপরিউক্ত হারে রুগ্ন সৈন্যদের খোরাকী বাবদ টাকা আর্মির সারজনদের দেবার হুকুম দেয় কোম্পানী। কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই যায়—এখানে যে কণ্ট্রাকটরদের কথা বলা হয়েছে, তারা কারা? কেনই বা তারা কোম্পানীর সৈন্যদের রোগ-ভোগের সময়ে তাদের খোরাকীর খরচ বহন করবে? কোম্পানীর সেরেস্তার কাগজ থেকে এই সমস্যার কোন জবাব পাওয়া যায় না।

শুধু তাই নয়, দেখা যাচ্ছে, কলকাতার প্রথম এই হাসপাতালের যিনি স্থান নির্ধারণ করেছিলেন তিনি শুধু স্থপতি নন, রসিক। কেননা সতেরশ' তেপ্পান্ন সালের উইলিঅমওয়েলস-এর আঁকা ফোর্ট উইলিঅম দুর্গ এবং শহর কলকাতার একাংশের যে ম্যাপ আছে তাতে কবরখানার একেবারে লাগোয়া ছিল সেই প্রথম হাসপাতাল। এর মধ্যে কি এই প্রচ্ছন্ন রসিকতাটা ছিলনা যে সেকালের হাসপাতালে যাওয়া আর কবরে যাওয়া সমার্থক? এই সময়েই কাপ্তেন অ্যালেকজাণ্ডার হ্যামিলটন প্রাইভেট ব্যবসায়ী বা 'ইণ্টারলোপার' হিসেবে কলকাতা ঘুরে যান। তাঁর সেকালের

হাসপাতাল সম্বন্ধে উক্তিটিও সমান ঠাট্টার: 'The Company has a pretty good Hospital of Calcutta, where many go in to undergo the Penance op Physick, but few come out to give Account of its opration.' কোম্পানীর নথিতেও দেখা যাচ্ছে (বাঙলা থেকে লিডেনহল ষ্ট্রীটে পাঠানো চিঠিপত্রের সারাংশ) হ্যামিলটনের এই বর্ণনা কিছু মিথ্যে নয়। তবে সতেরশ' আঠার সাল নাগাদ অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়েছে। কোম্পানী দাবী করেছেন— 'Soldiers that dreaded going thither now desire it.'

তবে হ্যামিলটন সাহেব প্রেটিগুড হসপিট্যাল—বা বেশ ভালো হাসপাতাল বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট নয়। এটাও কি ব্যঙ্গোক্তি? বোধ হয় তাই, কোম্পানীর পুরণো কাগজপত্রে দেখা যাচ্ছে যে প্রায় সাত হাজার টাকা ব্যয়ে ঐ একতলা বাড়ীটি তৈরি হলেও তার নিত্য-মাথার ওপর ওপর বাড়ী পড় পড়। এবং কলকাতার শহর স্থপতিরা তার খোঁজ রাখেন। তাঁরা বার বার সেটিকে মেরামত করেছেন। সতেরশ' আঠার সালের এপ্রিল মাসে ঐ হাসপাতাল সারানোর জন্যে খরচ হচ্ছে একশ' ষাট টাকা এক আনা। অক্টোবরে খরচ হচ্ছে তিনশ' সাতাত্তর টাকা তের আনা তিন পাই। এই সময়ে বেশ বড় রকমের সারানর কাজে হাত দেওয়া হয়, কেননা এই সময়ে হাসপাতালটাকে 'আউট অব অর্ডার' বলে ঘোষণা করা হচ্ছে। এবং এই একবারই নয়, গঙ্গার কূল বরাবর বলেই বোধ হয় হাসপাতালটা বার বার নষ্ট হয়ে গেছে এবং বার বার তাকে সারানর আবেদন করেছেন টাউন ইঞ্জিনিয়ার।

এবং এইরকম র-ঠ করে চলতে চলতে সতেরশ' আটাশ সালের সতেরই ডিসেম্বর ফোর্ট উইলিয়মের নতুন গভর্ণর জন ডীন এক হুকুমে বলেন যে বকসী চার্লস হ্যামটন তাঁকে জানিয়েছেন যে হাসপাতালটার অবস্থা সংশয়জনক কাজেই কাপ্তেন টমাস স্নো ও জন এলোফ যেন একটা সমীক্ষা করে একটা রিপোর্ট তৈরি করে তাঁকে দেয়। এই রিপোর্ট হতে হতে বছর ঘুরে যায় এবং সেটা পেয়ে হাসপাতালটাকে তখনকার মত মেরামত করে বর্ষার পর একেবারে নতুন করে তৈরি করার হুকুম হয়। পাঠক সাধারণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যে সেই রিপোর্টটা তুলে দেওয়া হল

To the honourable John Deane, Esq. tc.

Honourable Sir and Sirs,

Porsuant to an order of tbe Council of the 4th instant we have survey'd the Hospital and find all the Beams and most of the window and Door frames Rotten insomuch that We apprehend that the Roof will be danger of falling in the next rains unless timely prevented by shoring all the Beams.

We are, tc.,
Thomas Snow
John Aloffe.

এই রিপোর্টের তারিখ নেই। সম্ভবত: এগারই মে। সতেরশ' তিরিশ। কেননা ঐ দিনে আর একটি সুপারিশ করে, ওঁরা শেঠেদের বাগান ও পেরিন্স এর মধ্যে একটা নালা কেটে শহরের

জলনিভাশের প্রস্তাব করেছিলেন। সে যাই হোক, এই মেরামতের ফলে হাসপাতালটা টিকেই গেল না, অচিরে তার কলেবর বৃদ্ধি হয়ে দোতলা হল। কেননা, এই সময়ে কোম্পানীর ডাক্তারবাবুরা ফতোয়া দিলেন যে একজন ডাক্তারকে সদাসর্বদা হাসপাতালে থাকতে হবে রোগীদের সেবা করার এবং এই ডাক্তারবাবুর জন্যেই হাসপাতালে দোতলাতে দুটো ঘর তৈরির হুকুম হল। হাসপাতালের একপাশে একটা ঔষধের দোকানঘরও বানানর আদেশ হল।

কিন্তু হাসপাতালটার বুঝি ভাগ্য বিরূপ কেন না এই উন্নতির পরেই কলকাতার বুক তোলপাড় করে এল সতের শ' সাইত্রিশ সালের সেই কালঝড়। গোবিন্দলাল মিত্তিরের নবরত্ন মন্দিরের চূড়ো যাতে ভেঙে যায়, আছড়ে পরে গড়ের সামনে কলকাতার প্রথম ইংরেজ চার্চের মাথাটা, তছনছ হয়ে যায় কলকাতা। আর তার হাত থেকে বাদ যায়না হাসপাতালের বাড়িটা। এবং ঝড়ে জলে কলকাতাতে থৈ থৈ করছে। থাকবে কোথা কোম্পানীর মালপত্র, তার বাণিজ্যের পসরা? হাসপাতাল ছাড়া আর জায়গা কোথা? রোগী নয়, সেই তছনছ হওয়া হাসপাতাল সেদিন কোম্পানীর মালের গুদাম হয়ে উঠল।

এমনি করে মাল আর মানুষ নিয়ে কাল কাটাতে কাটাতে আবার হাসপাতালটার অবস্থাটা খারাপ হয়ে উঠতে লাগল এবং সতেরশ' চুয়ান্ন সাল নাগাদ গ্রে আর ফুলারটন বলে দুই সাহেব রিপোর্ট করলেন যে হাসপাতাল সারাতে হবে। কাজটা ঠিক হয়েছিল কিনা বলা না গেলেও দেখা যাচ্ছে, সিরাজদৌল্লার কলকাতা আক্রমণের সম্ভাবনায় হাসপাতালটা ভেঙে ফেলার একটা পরিকল্পনা ছিল। অন্য এক প্রতিরক্ষা পরিকল্পনায় যুদ্ধকালে এই হাসপাতালের অবস্থিতি যে ইংরেজদের খুবই সাহায্য করবে এইধরণের মন্তব্যও করা হয়। সে যাই হোক পলাশীর যুদ্ধের বছর দুয়েকের মধ্যে যখন কলকাতায় ইংরেজরা যেমন থিতু হয়ে বসলেন, তাদের এই হাসপাতালটাকে সম্প্রসারণের কথা চিন্তা করতে হতে লাগল এবং সতেরশ উনষাট সালে ছয়ই সেপ্টেম্বরের এক সিদ্ধান্তে জানা গেল যে পনের হাজার টাকায় গ্রে বলে এক সাহেবের গদী কিনে সেখানে হাসপাতাল বসান হয়েছে। কিন্তু এতেও স্থান সংকুলান হল না। অথচ কোম্পানী তখন ফেয়ারলি প্লেসের পুরণো দুর্গো ছেড়ে গোবিন্দপুরে নতুন ফোর্ট তৈরীর কাজে ব্যস্ত। কাজেই সারম্যান সাহেবের বাগানটার কাছে কোম্পানী গাছ কেটে খড় দিয়ে ছাওয়া একটা নতুন হাসপাতাল-বাড়ি তৈরি করে ফেললে। বলা হল এই তৈরির কাজ হবে কাপ্তেন গ্রীনের তত্ত্বাবধানে, কেননা গুরুটিতে সাহেব ঐ ধরণের বাঙলো তৈরি করে সুনাম কিনেছে।

সতেরশ' ছেষট্টি সাল নাগাদ আবার একটা রব উঠল, হাসপাতালটাকে সারাতে হবে। ফর্টনম বলে এক সাহেব কোম্পানীকে জানালেন যে দুর্ঘটনা এরাবার বাসনা থাকলে কোম্পানী যেন হাসপাতালটা সারাবার ব্যবস্থা করে। গ্রে সাহেবের যে মোকামটি কোম্পানী কিনেছে সেটার অবস্থাও তথৈবচ। লিডেনহল স্ট্রীটের বোর্ড দেখলে, আচ্ছা কারবার তো, নিত্যি হাসপাতাল সারাও। তারা বাঙলায় হুকুম পাঠালে, ঐ দুটো বাড়িই বিক্রি করে দাও। তাছাড়া অন্তবর্তী কালের জন্যে কোম্পানী পুরণো ফোর্টউইলিয়মে একটা হাসপাতাল চালাতে বললে।

এবং এই হুকুমের ফলেই দেখা যাচ্ছে এই দুই বাড়ি—যার দাম ছিল একচল্লিশ হাজার পাচশ'

চুয়ান্ন টাকা-এক আনা তিন পাই সেটা চারশ' চৌদ্দ টাকায় বিক্রি হয়ে গেল। কলকাতার প্রথম হাসপাতালের বুকে এমনি করে একদিন যবনিকা পড়ে গেল।

কিন্তু এ তো গেল কলকাতার প্রথম হাসপাতালের কথা, সেখানে মুখ্যত: সামরিক বাহিনীর চিকিৎসা হত। কিন্তু কলকাতার সাহেব রোগী, কালা রোগী তাদের জন্য কলকাতায় হাসপাতাল হল কবে? কালা রোগীরা গুটি গুটি কি কোন দিন সাহেব ডাক্তারের হাসপাতালে ওষুধ আনতে গিয়েছিল, না চিরকালই কবিরাজের বড়ির ওপর নির্ভর করেছিল? কিইবা রোগ হত তখন কলকাতায়। 'ডিসটেম্পার' বলে যে রোগটার কথা কলকাতার পুরোণো নথিপত্রে রয়েছে, সেটা আসলে কি রোগ? 'আগু' জ্বর বলতে কি ম্যালেরিয়া বোঝাত? চার্লস ডিকেন্স যাকে বর্ধমান ফিভার বলেছিলেন 'অল দি ইয়ার রাউণ্ডে'? কোম্পানীর নথিপত্র এসব বিষয়ে খুবই অন্যমনস্ক। তবু তারই সূক্ষ্মসূত্র ধরে, পারিপার্শ্বিক অন্যান্য সমস্ত প্রমাণসহকারে এইসব বিষয়ে মোটামুটি আলোকপাত করার চেষ্টা করা যেতে পারে। ঐ বিষয়ে বারান্তরে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

বটতলার ভোরবেলা

জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়

ষোড়শ শতাব্দীতে বিলেতী গ্রাবষ্ট্রীটের ইতিহাসের সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর চিৎপুর রোডের ইতিহাস একাকার হয়ে গেছে। কলিকাতার বটতলার ভোরবেলায় এল 'বাবু' বিবি বাইজীর যুগ। সাতসমুদ্র পেরিয়ে জলদস্যুরা এদেশে এসে প্রথমেই নাবিক জলদস্যু সুলভ রীতিতে এখানকার 'রীতি'র নীতি বন্ধন শিথিল করল। সমাজের নিয়মের অত্যাচারে অবশ্য কলকাতার নাগরিক সমাজ এমনিতেই মরণাপন্ন তাই অতি অনায়াসেই তখন এই নতুন 'সংস্কার' বরণ করে নিল। সামান্য অর্থ পোষা স্তাবকদের বিলিয়ে শতগুণ ঘরে তুলত বিদেশী বণিকরা। আর নীতির বাঁধন ভেঙ্গে এই বিস্তৃত শ্রেণীটি অর্থকৌলিন্যে এক নতুন সমাজ সৃষ্টি করলো যার মূলধন কেবল অর্থ আর দুর্নীতি।

এর আগে একনজরে কলকাতার প্রথম দিঝটা ভেবে নেওয়া যাক। ডিহি কলকাতা নয় শুধু সুতানটির গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ছিল তখন পিলগ্রিমস রোড—চিত্রেশ্বরী মন্দির যাবার পথ। চিৎপুর রোডেরই গা বেয়ে ভাগীরথী নদী—যে নদীতে নৌকা বেয়ে ১৬৯০র এক বৃষ্টি-টিপ-টিপ দুপুরে চার্নকের নৌকা এল মোহনটুনী ঘাটে। পথের পাশেই free port এর মত হাটখোলায় খোলা দরে বিকোতো অঢেল সুতো। জঙ্গলকাটা বাসিন্দে শেঠ বসাকেরা দাদন দিয়ে সে সুতো করাত বরানগরের চাষী দিয়ে। সালকে ঘুষুড়ী থেকে আসা তাঁতীরা সেখানে তাঁতীপাড়ার সৃষ্টি করল সে সুতো রপ্তানী হত শুধু বিদেশে। কিন্তু নাবিক বণিকদের রাতের প্রয়োজন মোটাবার জন্য জলদস্যুর অন্তর্বাণিজ্য হত নিম্নবাংলার 'বালিকারা। জলদস্যুর হঠাৎ 'হানা'র ফসল এসে উঠতো শোভাবাজারের গোলপাতার ছাউনীতে। হাটে সুতো আর ঘাটে নটি, সুতানটির এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

ডিহি কলকাতার এই প্রথম পর্ব। এর পরের পর্বে এল শোভাবাজার সোনাগাছি। কিন্তু সোনাগাছির শুরু থেকেই কি কলঙ্কিত? তা বোধ হয় নয়। নাবিক আর বণিকের প্রয়োজনে সোনাগাছির পরবর্তী জীবনে লোকালাইজেসন শুরু হলেও আগে সোনাগাছির কোন পৃথক পরিচয় ছিল না। সোনাগাছির নামকরণের ঐতিহাসিক সূত্র সোনা গাজির মসজিদ। আজও মসজিদ (পীরের দরগা) আছে এ পাড়ায়, আছে মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট। বন্দরের উপকণ্ঠে অবস্থান বলেই ভৌগোলিক কারণে সেখানে পতিতালয়ের সৃষ্টি হয়েছিল পরবর্তী যুগে।

লোকালাইজেশনের ফলে আজ সোনাগাছি গভীর অর্থব্যঞ্জক হয়ে উঠলেও সোনাগাছি চিরদিনই পতিতা-পাড়া ছিল না। যখন সোনাগাজির মসজিদপাড়া হিসেবে সোনাগাছির নাম ছিল তখনকার একটি বর্ণনা দেওয়া যাক। সোনাগাজির দরগায় কুনী বুনি বাসা করিয়াছিল।—চারিদিক সেওলা ও বোনাজে পরিপূর্ণ; স্থানে স্থানে কাকের ও শালিকের বাসা; ধাড়ীতে আধার আনিয়া দিতেছে—চিলে চিঁ চিঁ করিতেছে—কোনখানেই একফোটা চুণ পড়ে নাই—রাত্রি হইতে কেবল শেয়াল কুকুরের ডাক শোনা যাইত ও সকল স্থানে সন্ধ্যা দিত কি না, তাহা সন্দেহ। নিকটে

একজন গুরুমহাশয় কতকগুলি ফরগুল গলায় বাঁধা ছেলে লইয়া পড়াইতেন। ছেলেদের লেখাপড়া যত হউক বা না হউক, বেতের শব্দে ক্রমে তাহাদের প্রাণ উড়িয়া যাইত। সোনাগাছির গুমর কেবল উক্ত গুরুমহাশয়ের দ্বারাই রাখা হইয়াছিল। কিঞ্চিৎ প্রান্তভাগে দুই একজন বাউল থাকিত তাহারা সমস্ত দিন ভিক্ষা করিত, সন্ধ্যায় তারা পরিশ্রমে অক্লান্ত হইয়া শুয়ে শুয়ে মৃদুস্বরে গান করিত। সোনাগাছির এইরূপ অবস্থা ছিল।'

এরপরই আলালের ঘরে দুলাল বাবু মতিলালের আগমনে সোনাগাজির কপাল ফিরে গেল। দিবারাত্র নৃত্য-গীত বাদ্য হাসিখুশী, বড়ফট্টাই, ভাঁড়ামো, নকল ঠাট্টা, বটভেরা, ভাবের গালাগালি, আমোদের ঠেলাঠেলি, চড়ুইভাতি, বনভোজন, নেশা একাদিক ক্রমে চলিয়াছে। যেন রাতারাতি মতিলাল হঠাৎ বাবু হইয়া উঠিয়াছেন।

এরফলে প্রথমেই গুরুমশায় উদ্বাস্তু হলেন। ছেলেদের নামতা ঘোষাতেই মতিলাল বলল 'এবেটা এখানে কেন মেউ মেউ করে ? গুরুমহাশয়ের যন্ত্রণা হইতে আমি বালক বয়সেই মুক্ত হইয়াছি আবার গুরুমহাশয় নিকটে কেন। ওটাকে ত্বরায় বিসর্জন দাও। এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে পারিষদরা পণ্ডিতমশায়কে ঢিল মেরে উৎখাত করলেন। অর্থাৎ সোনাগাছির প্রথমপর্বে একটি পাঠশালা হত্যা করা হল। ইতিহাসের পরিহাসে আমরা দেখতে পাব একদিন আরেকটি পাঠশালাই সোনাগছির উপর এই হত্যার প্রতিশোধ নেবে। কিন্তু সে স্বতন্ত্র কথা ; আমরা এখন সোনাগাজির কথা বলছি।

সোনাগাজির প্রাথমিক পর্বের পর সেখানে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব পড়ে বলে মনে হয়। সোনাগাজির অপর দিকেই বেনেটোলার গোস্বামী পাড়া, সোনার গৌরাঙ্গ নিমুগোঁসাইয়ের রাসযাত্রা হুতোমের নকসা থেকে সোনাগাছির একটি বর্ণনা পাওয়া যায় যাতে লক্ষণীয় যে মদ্যপ নায়ক সোনাগাছিতে মদ্যপান করতেন কিন্তু পতিতা কাম্য ব্যখ্যা করতেন না। 'সন্ধ্যার পর সোনাগাছির বড় জাঁক, প্রতি ঘরে ধূনোর ধোঁ, শাঁকের শব্দ ও গঙ্গাজলের ছড়ার দরুণ হিন্দুধর্ম মূর্তিমন্ত হয়ে সোনাগাছি পবিত্র করেন, মনে রাখতে হবে একসময়ের সোনাগাছি ঠিক আজকের পরিচয়ের পূর্ব অবস্থা। কারণ 'রামহরি বাবুর সোনাগাছিতে বাস। দু'চার ইয়ার ও গাইয়ে বাজিয়ে কাছে থাকে ; সন্ধ্যার পর বেড়াতে বেরোন সকালে বাড়ী আসেন, মদ্যও বিলক্ষণ চলে। অর্থাৎ মদ্যপবাবু রামহরির রাত কাটে অন্যত্র, তিনি সোনাগাছিতে বাস করে—রাত কাটান অন্যত্র। আমার অনুমান অন্য প্রসঙ্গে হুতোম সুস্পষ্ট করেছেন এই বলে যে বেনেটোলার দ্বীপচাঁদ গোস্বামীর কলকেতায় জন্ম, কিন্তু কখনও সোনাগাছিতে ঢোকেন নাই অর্থাৎ তখনও সোনাগাছিতে পতিতার বসবাস সুরু হয়নি সোনাগাছির চরিত্রহীন বাসিন্দাকে রাত কাটাতে যেতে হত অন্যত্র।

এই সময় সোনাগাছিটা ঠিক পাঁড়াগেয়ে বাবুদের কলকাতার বাসা করার জায়গা। এ রীতি অবশ্য আলালের ঘরের দুলাল মতিলালের আমল থেকেই। খাস সুতানুটির খোলা হাটের কাছাকাছি বাসা থাকার সুবিধার জন্য অনেক জমিদারই কলকাতায় বাসা করতেন সোনাগাছিতে। ধীরে ধীরে তখন এই সব বাবু জমিদারের চাহিদা অনুযায়ী সুতানটির ঘাটপাড়া থেকে পতিতারাও উঠে আসতে লাগে সোনাগাছিতে।

২

অবশ্য এর মানে এই নয় যে সোনাগাছিতে যারা বাসা করতেন তারা সবই 'উনপাঁজুরে'। 'দুই একজন জমিদার কলিকাতায় এসে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা ও প্রশংসা নিয়ে যান। তারা সোনাগাছিতে বাসা করেও সে রঙ্গে বিরত হন না; বরং তাদের চালচুল দেখে অনেক সহুরে তাক্ হয়ে থাকেন। আবার কেউ কাশীপুর বোঁড়স্যা ভবানীপুর ও কালীঘাটে বাসা করে চব্বিশঘণ্টা সোনাগাছিতেই কাটান। তার পরদিন প্রিয়তমার হাত ধরে যুগলবেশে জ্যেঠা খুড়া বাবার সঙ্গে পুলিসে হাজির হন।'

সোনাগাছির এই পর্বটুকুর চূড়ান্ত বর্ণনা আমরা পেয়েছি হুতমের সাপ্তাহিক নকশায় (চণ্ডী লাহিড়ী সংকলিত)—পাঠক। আপনি যদি অপরাহ্ণে কোনদিন চিৎপুর রোড দিয়ে গতিবিধি করে থাকেন তবে বারাঙ্গনাদের বারান্দায় বার ও বাহার দেবার বিষয়টি বিলক্ষণ অবগত আছেন, বার বিশেষে সে বারের বাহার দেখলে ধর্মরাজ্যও স্বর্গরাজ্য বলে বোধ হয়, এমনটি দুই সহোদরে অথবা পিতাপুত্রে একত্রে ঐ প্রকাশ্য মার্গে গমনাগমন করতে হলে, অধোবদনে চক্ষুমুদ্রিত করে যেতে হয়, কিন্তু তাতেও আবার গাড়ী বা অশ্বের পায়ের নীচে পড়বার আশঙ্কা! পথের দুধারি বারাণ্ডায় বিনাপণে ঐরূপ বাহারের ঘটা। এই নকসার রচনা সাল ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল অর্থাৎ এই সময় সোনাগাছির জের সরাসরি চিৎপুর রোডেই উপস্থিত। কিন্তু মনে রাখতে হবে সোনাগাছি চিৎপুর রোডের ওপরেই নয়; ভিতরে এবং দূরে। ১৮৫৬ সালের ১৯শে নভেম্বর সংবাদ প্রভাকরে কালীপ্রসন্ন সিংহের বক্তব্য অনুযায়ী। 'অতিপুর্বে সোনাগাছি নামক স্থানে বেশ্যাদিগের বাসস্থান ছিল অদ্যাপি তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।' আমরা এই আদি সোনাগাছির কথাই এখানে আলোচনা করছি।

এই সোনাগাছির পাশাপাশি শোভাবাজার। শোভাবাজার নবরত্ব 'সভা' থেকেই হয়ত এই 'সভা বাজার'। অন্তত ডঃ সুকুমার সেনের তাই মত। কিন্তু নামকরণের দায়িত্বটা শোভারাম বসাকেরও হতে পারে। বর্তমান শোভাবাজার রাজবাড়ী জমিতে আগে শোভাবাজারে বাগান ছিল। সেখানে 'জলজ জমির উপযোগী' ফসল ফলত। আর সেই সব শাকসবজীই চিৎপুর রোডের প্রধান পথের ধারে বিক্রি হত। ১৭৩৮-৫২ পর্যন্ত শোভাবাজারটি বসত এই জলজ জমিতেই। পরে রাজবাড়ীর কথা হলে উঠে এসে চিৎপুর রোডে ধারে এই বাজার বসত ('ঐ স্থানের বাজারটি উঠিয়া আসিয়া চিৎপুর রোডের ধারে বসে')। হলওয়েলের এই মত। এই বাজারের কাছেই শোভারাম বসাকের রথতলা ঘাট যার আগের নাম সুতানটি ঘাট বা হাটখোলা।

উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার পথ চিৎপুর রোডের পথ। দক্ষিণমুখী। তাই আমরা এবার দক্ষিণ দিকেই এগোব।

পায়ে পায়ে আমরা সুতানটি ঘাট থেকে শোভাবাজার পেরিয়ে সোনাগাছিতে গেছি। সোনাগাছির সৃষ্টি স্থিতি আমাদের মূল বক্তব্য নয় কিন্তু সোনাগাছির উপকণ্ঠেই বাংলা সাহিত্যের আঁতুর ঘরটিকে স্বীকার করতে হবে। আঁতুর ঘর কে যাঁরা নোংরা বলে অস্বীকার করেন তারাই নার্সিং হোমে নার্সের হাতে সানিটারী টাওয়েলে মোড়া সদ্যজাত শিশুকে দেখে উৎফুল্ল হন। এখানে নার্সিং হোম—কলেজ ষ্ট্রিট। প্রকাশক আর স্যানিটারী টাওয়েলটি অভিজাত প্রচ্ছদপট বলে

দিলেই আর নবজাতকটি অচেনা মনে হয় না।

মনে রাখতে হবে সোনাগাছির উপকণ্ঠে জাত বটতলার মুদ্রাযন্ত্রের ভাবগত নৈকট্যের জন্য কেউ যেন এদের একাত্মক বলে সন্দেহ না করেন। প্রকৃত পক্ষে বটতলা একটি পৃথক 'বৃত্তি'— স্বতন্ত্র লাভজনক ব্যবসা মাত্র।

বটতলার 'রূপ' জানতে গেলে অবস্থানটি নির্দিষ্ট করা দরকার। পরবর্তীকালে অবশ্য বটতলা একটি কালচার, যুগ বা সাহিত্য পর্যায়ের নামে হয়ে দাঁড়ালেও সৃষ্টির সুরুতে বটতলা একটি স্থানের নাম ছিল। সম্ভবত কেন নিশ্চয় বটগাছের নীচে বসত এই বটতলা। নিমতলা তালতলার পরই তখন বটতলা। স্থান মাহাত্ম্য অনস্বীকার্য। শোভাবাজার তখন আধুনিক ডাক্তারখানা বা শশ্মান ঘাটের পাশে ফটোর দোকানের মত 'দিবারাত্র খোলা থাকে'। শোভাবাজারেই একটি বটগাছের নীচে বাঁধান প্লাটফর্মে চার্ণক সাহেব হুঁকো খেতে খেতে সুতোর দরদস্তুর করতেন। বটগাছের নীচে হুঁকো খাওয়ার গল্প চার্ণক সাহেবের নামে বহুজায়গায় চলছে তাই এটা বিশ্বাস্য নাও মনে হতে পারে কিন্তু বটতলা যে বাঁধান ছিল সেটা মেনে নিতেই হবে। 'বান্ধা বটতলায় তারে দিয়াছি ছাপিতে' এ ছত্রটি সুধু ছন্দের প্রয়োজনে না ব্যবহৃত হয়ে থাকে তবে তা নিশ্চয়ই।

কিন্তু 'বটতলা'টি ঠিক কোথায় ছিল? দেহাতী যাত্রী হাওড়া ষ্টেশন থেকে নেমে দোতলা বাসে উঠে হ্যারিসন রোড চিৎপুর রোডের মোড়কে বটতলা বললেও স্পষ্ট করে তারা নির্দেশ করতে পারে না। (তারা বোধহয় বড়তলা ষ্ট্রীটকে বোঝান, বড়তলা বটতলা নয় বড়বাজারের অংশ বিশেষ)। বাঁশতলা, আমড়াতলার মতই বটতলাও তাদের কাছে অ-নির্দিষ্ট। এমনকি খোদ 'বটতলা' থানার ও. সি. কি স্পষ্ট করে বলতে পারবেন। ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন 'বটতলা যে শোভাবাজার পল্লীর অন্তর্গত ছিল সে বিষয়ে সমসাময়িক সাক্ষ্য রহিয়াছে বটতলার বইয়ের পৃষ্ঠায়'। কিন্তু বটতলার বইগুলির সাক্ষ্য ঐতিহাসিক অথবা ভৌগোলিক প্রমাণে ব্যবহার করা যায় কি? তাই হয়ত ডাঃ সেনও তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন কিন্তু সিদ্ধান্তের সমর্থনে উদ্ধৃতি পরিবেশন করেননি।

এই সোনাগাছি পেরিয়ে দক্ষিণ দিকে আরেকটু এগিয়ে গরানহাটায় হাজির হতে হবে। পথের দিক থেকে এই এগোনটা একশ গজ হলেও ইতিহাসের দিক থেকে কম নয়। গরানহাটায় আসা মানেই সোনাগাছি পর্বের শেষ দিক ও বাংলা দেশের শিক্ষা আন্দোলনের প্রথম দিকে এসে পড়া! চিৎপুর রোড ও গরানহাটা ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে বাঙালীর শিক্ষার প্রথম পদক্ষেপ ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী দাঁড়িয়ে রয়েছে। মোটামুটি ভাবে আমরা আগে সোনাগাছির মূল স্থান নির্দেশ করেছি এবার ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীটি ঠিক কোথায় অবস্থিত ছিল জানতে পারলেই দেখা যাবে বটতলার ভৌগোলিক অবস্থার ব্যাখ্যা সহজতর হবে। 'এই পুস্তক শোভাবাজার বটতলার দক্ষিণাংশে উক্ত যন্ত্রালয়ে পাইবেন অথবা 'সহর কলিকাতার শোভাবাজার বটতলার দক্ষিণ' এই সব উক্তিকেই সম্ভবতঃ ডাঃ সুকুমার সেন শোভাবাজার ও বটতলাকে একই পল্লীর অন্তর্গত অনুমান করেছেন। কিন্তু ১৮৩৪ সালের ২২শে মার্চ জর্জ এডওয়ার্ড মলিনস সংবাদপত্রে ঘোষণা করেছিলেন যে বটতলার ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী থেকে তিনি সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন (his interest has ceased

in the Oriental Seminary of Buttollah) অর্থাৎ ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী তখন বটতলায়। মলিনস আরও বলেছেন যে he has established a school on his own account and responsibility at Sobhabazar, Chitpure Road No 280'। মলিনসের এই নতুন স্কুলের নাম ছিল মিনার্ভা একাডেমী। মিনার্ভা একাডেমীকে শোভাবাজারে প্রতিষ্ঠিত করার সময় কিন্তু মলিনস আর বটতলা বলেননি। অর্থাৎ বটতলার ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী থেকে তিনি যাচ্ছেন শোভাবাজারের মিনার্ভা একাডেমীতে। নিশ্চয়ই এর পর বটতলা আর শোভাবাজার একই পল্লীর অন্তর্গত বলা চলে না। কিন্তু এবার জানা দরকার ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর সঠিক অবস্থান। কারণ মোটামুটি ভাবে বটতলাও ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী এখন কাছাকাছি। আমরা জানি ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী (১৮২৯ খৃষ্টাব্দে) ছিল গরানহাটা ষ্ট্রীটে। গৌরচন্দ্র আঢ্যের এই স্কুল যখন গোরাচাঁদ বসাকেরষ্ট্রীটে অবস্থিত ছিল তখন বালক রবীন্দ্রনাথ সেখানে 'কান্নার জোরে' ভর্তি হয়েছিলেন। পরে অবশ্য ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করে বর্তমান জায়গায় উঠে আসে। ১৮৩৬ সালের ১৩ই ডিসেম্বর সংবাদ পূর্ণোচন্দ্রোদয় গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলটিকে বটতলাতেই বলেছেন। বর্তমান ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীটি ছিল জগমোহন বসাকের বাড়ী। জগমোহন বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। 'তিনি তাহার বাটীতে একটি মফ্তাবখানা (বিদ্যালয়) স্থাপন করিয়া ইংরাজী শিক্ষক, জ্ঞানবান পণ্ডিত ও সুদক্ষ মৌলবী' নিযুক্ত করেন। ইহাই কলিকাতায় বিদ্যালয়ের প্রথম অঙ্কুর উদ্ভূত হয়। সম্ভবতঃ এই মফ্তাবখানাটিই ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর বীজ। (১৮২০ খৃষ্টাব্দে) এই মফ্তাবখানাটি গোরাচাঁদ বসাকের ষ্ট্রীটে অবস্থিত ছিল। পতিতালয়ের পাড়াটি যে তখন সোনাগাছির চাক ভেঙ্গে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল তার বিবরণ সমসাময়িক সংবাদপত্রে ধরা পড়েছে। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী সোনাগাছি ও গরানহাটা ষ্ট্রীট এই তিনটি এক সময় সংবাদপত্রের পাতায় স্থান পেয়েছিল একই সঙ্গে, তার কারণ একটু কৌতূহলোদ্দীপক। 'পাঠশালা (মফতাবখানা!) সন্নীকটে হীনমতি বেশ্যাবর্গের ব্যসন কার্য বালকবৃন্দের বিদ্যাবিষয়ক ক্রটিকর বিবেচনা' করে পতিতাদের বাসস্থান অন্যত্র স্থানান্তরিত করার জন্য সংবাদ প্রভাকর ও ইংলিশম্যানে বহু লেখক পত্রাঘাত করেছেন। ফলতঃ 'স্কুলাধ্যক্ষগণ' 'বারাঙ্গনাদের' স্কুলের আশপাশ থেকে হটিয়েও দিয়েছিলেন। এর ফলে মেদিনীপুর থেকে 'কস্যচিৎ বাসভ্রষ্ট বারাঙ্গনাং' সংবাদ প্রভাকরে পত্রাঘাত করে জানায় হীন বেশ্যাকেই সরান হয়েছে কিন্তু কুলীনকুল ললনাদেরও সরান হয়নি। পত্র লেখিকার মতে অনেক কুলবধু জল আনবার ছলে স্কুলের পাশের গলিতে মনোহরণ বেশে যাতায়াতের পথে বঙ্কিম নয়নে বিলোল কটাক্ষ হানতেন ছাত্রদের। বারাঙ্গনার প্রশ্ন স্বল্প বস্ত্রে আচ্ছাদিতা এই সব সর্বসাধারনের লোচনানন্দদায়িনী সুলোচনারা নবনিতম্ববাগুরা বিস্তার করত যখন স্কুলের পাশ দিয়ে যেতেন তখন কি স্কুলের ছেলেরা চোখে হাত চাপা দিয়ে থাকত! ফুলবাণ কি তাদের পরাভূত করত না, কন্দর্প হত দর্পশূণ্য! বারাঙ্গনারা এর পরে 'সতীবধূ'দের নামে বলেছেন এরা নাকি দিনে পতিতাবৃত্তি করত ও রাত্রে শ্বাশুড়ী ননদের ভয়ে স্বামী সহবাস করত তবু তারা পতিতা বিবেচিত হল না কেন! বারাঙ্গনাদের এ পত্র ১২৬১ সালের তেশরা আশ্বিন সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হবার পর ১২৬৪ সালের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ সংবাদ প্রভাকরে

সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এর আগে ১১ই জ্যৈষ্ঠ কালী প্রসন্ন সিংহের সম্পাদনায় বিদ্যোৎসাহিনী সভা এব্যপারে সভা আহ্বান করে প্রস্তাব দিল—'বেশ্যাগণের বাসকরিবার নিমিত্ত এক নির্দিষ্ট পল্লী নিরূপিত হয় তন্নিমিত্ত লেজিসলেটিভ কৌন্সেলে আবেদন অর্পণ।

স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে সোনাগাছির রেশ এসে ঠেকেছে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর পাশের গলিতে। অর্থাৎ ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী আর সোনাগাছি ঠিক পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল। আর ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী বসত গরানহাটা ষ্ট্রীটে। গরানহাটা ষ্ট্রীটের ভেতর থেকে স্কুলটিকে বৃন্দাবন বসাক এবার তার কাছারী বাড়িতে (যেখানে আগে জগমোহন বসাক থাকতেন) নিয়ে এলেন। গরানহাটার সঙ্গে গঙ্গার যোগাযোগ স্থাপনকারী কোন সরল রাস্তা ছিল না। এই রাস্তা নির্মাণ করার জন্য বৃন্দাবন বসাকের ভদ্রাসন ভাঙ্গতে হয়েছিল। বৃন্দাবন বসাকের ভদ্রাসনেই যদুপণ্ডিতের বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৭৪ সালে এই বিদ্যালয় অন্যত্র সরে গিয়ে হয় আহিরীটোলা বঙ্গবিদ্যালয়।

বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট, গরানহাটা ষ্ট্রীট যেখানে চীৎপুর রোডে মিশেছে সেই মোড়েই বটতলা। ২৮০ নং চিৎপুর রোড শোভাবাজার, বটতলা নয় কিন্তু ৩৩৫নং চিৎপুর রোডটি বটতলা।

১৩১৯ (১৯১২) সালে সিদ্দিকিয়া প্রেসে মুদ্রিত 'রেজওয়ান সাহা কাব্যে'র শেষে প্রকাশক মফিজউদ্দিন আম্মেদ (ঐ ঠিকানা নিবাসী) বলেছেন

'গ্রহস্ত গ্রাহককারি যে জন হইবে
বটতলা আসিয়া তল্লাস করিবে।
তালাশ করিলে পাবে আবশ্যক জার।'

সে যাক্, ডাঃ সুকুমার সেনের মতে বটতলার প্রথম প্রেসের মালিক বিশ্বনাথ দেব; ছাপাখানা স্থাপিত হয়েছিল ১৮২০ খৃষ্টাব্দের হয়ত দুই এক বৎসর আগেই। অবশ্য ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের আগে মুদ্রিত বইয়ে প্রেসের নাম ছিল না। এসময় কলকাতায় পাঁচটি প্রেসের প্রমাণ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে দুটি প্রেস পটলডাঙ্গায় লল্লুলালের সংস্কৃত প্রেস অপরটি ১২৫ (৯৫!) চোরবাগান ষ্ট্রীটে হরচন্দ্ররায়ের 'বাঙ্গালি' প্রেস। বটতলা হাটের প্রথম হাটুয়া গঙ্গাকিশোর। গঙ্গাকিশোর শ্রীরামপুরের কাছে বহরা গ্রামে বাস করতেন। শ্রীরামপুরে প্রেসে তিনি কিছুদিন কর্মকারক (কম্পোজীটর?) এর কাজ করেন। এরপর তিনি কলকাতায় এসে ১৮১৬ সালে বৌবাজারের করিম এ্যাণ্ড কোম্পানীর ছাপাখানায় বাংলা বই ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল প্রকাশ করেন। 'ইহাই ছাপার হরফে প্রথম সচিত্র বাংলা পুস্তক'। এছাড়াও গঙ্গাকিশোর গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী, লক্ষ্মীচরিত্র, বেতাল পঞ্চবিংশতি, চাণক্য শ্লোক ইত্যাদি প্রকাশ করেন। এছাড়াও গঙ্গাকিশোর স্বরচিত কিছু বই সচিত্র প্রকাশ করেছিলেন। রাজনারায়ণ বসু বাল্যজীবনে এসব বই দেখেছিলেন।

এই সময় রামমোহনের বক্তব্যের বাহন ছিল লাল্লুলালের 'সংস্কৃত' প্রেস। পটলডাঙ্গায় এই সংস্কৃত প্রেস থেকে রামমোহনের বই প্রকাশিত হত।

গঙ্গাকিশোর ছিলেন উদ্যোগী পুরুষ। তিনি বটতলার বাজার বুঝেছিলেন এর ফলে প্রচুর লাভও করেছিলেন। অদূরে রামমোহন গঙ্গাকিশোরের এই ব্যবসায়িক বুদ্ধি লক্ষ্য করেছিলেন।

বহরা গ্রাম নিবাসী হরচন্দ্র রায় রামমোহনের আত্মীয় সভার সভ্য ছিলেন। রামমোহন দেখেছিলেন তার বক্তব্য বেশী লোকের কাছে সুলভে পৌঁছে দেবার বাহন হতে পারেন বটতলার গঙ্গাকিশোর। রামমোহনের কবিতাকারের সহিত বিচার বইয়ের প্রকাশক হিসেবে এবার গঙ্গাকিশোরের নাম দেওয়া গেল। কিন্তু হরচন্দ্র রায় মাধ্যমে রামমোহন গঙ্গাকিশোরকে হয়ত আরও নতুন মতলব দিয়েছিলেন। ব্যবসায়িক প্রতিভায় এ মতলব adopt করে নিলেন গঙ্গাকিশোর। হরচন্দ্ররায় ৪৫ নং চোরাবাগান ষ্ট্রীটে প্রতিষ্ঠা করলেন বেঙ্গলী প্রিন্টিং প্রেস, সঙ্গে রইলেন গঙ্গাকিশোর। গঙ্গাকিশোরের সম্পাদনায় এখান থেকেই প্রকাশিত হল ভারতের প্রথম সংবাদপত্র বেঙ্গল গেজেটি। প্রকাশক হরচন্দ্র রায়। লেখক বলাবাহুল্য রামমোহন। তাঁর পৃথক বই তলবকার উপনিষদ, কঠোপনিষদও প্রকাশিত হল 'বাঙ্গালি প্রেস' থেকে।

বটতলা সাহিত্যের 'ব্রহ্মা' গঙ্গাকিশোরই রানমোহন-আঙ্গিকে ব্রাহ্মণ সেবধির অগ্রদূত। তাই সে হিসেবে তিনি বাংলার জন ডাস্টার। গঙ্গাকিশোর তাঁর বেঙ্গল গেজেটটি, গেজেটির প্রথমত্ব ইত্যাদি বিস্তৃত বিষয় এখানে উল্লেখ করলাম না কারণ বটতলার এই ফসলটি অন্য আঙ্গিকে ইতিহাসে স্থান পেয়েছে।

কিন্তু বটতলার ভগীরথ গঙ্গাকিশোরকে মনে রাখতেই হবে কারণ গঙ্গাকিশোরই হচ্ছেন first who concived the idea of printing works in the clrent language as a means of acquiring wealth. গঙ্গাকিশোর হিন্দু ক্রেতার "Pulse" অনুভব করার জন্য ইউরোপীয় প্রেস (ফরিস এ্যণ্ড কোং) থেকে কতকগুলো বই প্রকাশ করেছিলেন এবং রেডী সেলও পেয়েছিলেন। এরপর তিনি অফিস, বইয়ের দোকান খুলে ছবছর মুদ্রণ ব্যবসা চালিয়েছিলেন।

অবশ্য এরপর বেঙ্গল গেজেটি উঠে যাওয়ার পর থেকেই হরচন্দ্র গঙ্গাকিশোরের মতান্তর শুরু হয়। এবং হরচন্দ্ররায়ের বেঙ্গলী প্রেস উঠে যায়। গঙ্গাকিশোর জন্মগ্রাম বহরায় প্রত্যাবর্তন করেন। হরচন্দ্র পৃথক ব্যবসা শুরু করেছেন। গঙ্গাকিশোরের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে বটতলার প্রথম পর্ব শেষ হয়ে গেল। কিন্তু 'বটতলা' প্রবণতাটি তখন সমাজদেহে পূর্ণশক্তিতে বিরাজমান। তাই রামমোহন সম্বাদকৌমুদী প্রতিষ্ঠা করলেও বারটি সংখ্যা প্রকাশের পরই সেখান থেকে ভবানীচরণ ছুটে বটতলায় প্রবেশ করেন। সাফল্যও অর্জন করেছেন তিনি। গঙ্গাকিশোর মুদ্রণ যুগের প্রত্যুষে যে পথের সন্ধান দিয়ে গেলেন কলকাতায় উনবিংশ শতাব্দীর পঙ্গুসমাজদেহে ভবানীচরণ সে পথের প্রয়োগ করলেন একটু স্বতন্ত্র ভাবে। তিনি হিন্দু, প্রাচীনপন্থী, সংরক্ষণশীল। হয়ত এইজন্যই রামমোহনের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ঘটেছে। কিন্তু গঙ্গাকিশোরের সঙ্গে রামমোহনের মতান্তর হয়নি। গঙ্গাকিশোর কবিতাকারের সহিত বিচারও প্রকাশ করেছেন আবার বটতলার নিজস্ব বইও প্রকাশ করেছেন। কারণ গঙ্গাকিশোরের কাছে বটতলা একটি ব্যবসা, বই একটি পণ্যদ্রব্য মাত্র। ভবানীচরণের কাছেও হয়ত তাই ছিল কিন্তু সে সম্বন্ধে তার নিজের ধারণাই হয়ত সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারেনি। তিনি হয়ত ভেবেছিলেন প্রাচীনপন্থী ধনীদের সঙ্গে আপোষ করলেই অর্থে অভাব ঘটবে না—বিধর্মী রামমোহনের চেয়ে এদিকটাই তাঁর নিরাপদ বলে মনে হয়েছিল। আগেই বলেছি কলকাতার সভ্যতা গঙ্গানদীর মতই সর্বদা দক্ষিণ অভিমুখী।

১৮১৬ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাকিশোরের বটতলা ব্যবসা যখন তুঙ্গে তখন তিনি সংবাদপত্রের জন্যে চোরবাগানে সরে গেলেন হরচন্দ্র রায়ের সঙ্গে। এদিকে বটতলার দক্ষিণে আরেকটি প্রেস এল বটতলার বইয়ের দামের সঙ্গে 'কম্পিটিশন' করতে। 'সিন্ধুযন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকাল ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের এদিকে নয়।' অর্থাৎ ১৮২৯ খৃষ্টাব্দেও যদি সিন্ধুযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তবে আমাদের তত্ত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে কারণ "পাক রাজেশ্বর" গ্রন্থের আখ্যাপত্রে আছে 'কলিকাতার চোরাবাগানের সুধাসিন্ধু যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল'। জোড়াবাগান বটতলার দক্ষিণে। ডঃ সুকুমার সেন সুধাসিন্ধু প্রকাশিত ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের বই পেয়েছেন। মনে রাখতে হবে সুধাসিন্ধু যন্ত্রের মালিক ছিলেন বটতলা নিবাসী কালীশঙ্কর দত্ত। স্বয়ং বটতলা নিবাসী হয়েও তিনি যুগের সঙ্গে চলতে গিয়ে হয়ত একটু দক্ষিণে সরে এসেছিলেন। কালীশঙ্কর দামের ব্যাপারে বটতলার বাজারেও রিডাকসন সেলের আলোড়ন এনেছিলেন। ১৮৩৭ সালের ২৯শে এপ্রিল কালীশঙ্করও গঙ্গাকিশোরের অনুসরণে 'সম্বাদ সুধাসিন্ধু' নামে 'নূতন সম্বাদপত্র' প্রকাশ করলেন 'বিন্দুতুল্য অর্দ্ধেন্দু মূল্যে' বিক্রীর জন্য। গঙ্গাকিশোরও যখন সাপ্তাহিক সম্বাদপত্রের দাম করেছিলেন আটআনা তখন কালীশঙ্করের 'রিডাকশন সেল' থেকেই বোঝা যায় কম দামে বেশি বিক্রীর আকর্ষণ নিয়েছিলেন সুধাসিন্ধু। ১৮৫৬ সালে সুধাসিন্ধুর দুটি বইয়ের উদাহরণে এই সত্য আরও প্রকট।

কৃত্তিবাসের আদিপর্ব রামায়ণ রামকৃষ্ণ মল্লিকের প্রেসে ১৮৩১ সালে তিনটাকায় বিক্রী করেছিল। কিন্তু ১৮৫৬ সালে সুধাসিন্ধুর দাম হল দু আনা মাত্র। কালিদাস কবিরাজের বেতাল পঞ্চবিংশতিও ভবানীচরণের সমাচার চন্দ্রিকা প্রেসে দুটাকা দামে বিক্রী হলে ১৮৫৬ সালে সুধাসিন্ধু চার আনায় বিক্রী করেছে। আজকের যুগে ক্রমশই বইয়ের দাম বেড়ে যায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে, কিন্তু সেদিন ঘটত অন্যরকম।

১৮৩০ সালে ভবানীচরণ বটতলার আরেক প্রতিভা। তিনি দাম কমিয়ে কমপিটিশন করতে চাননি বরং তিনি ক্রেতার ধর্মবোধে সুড়সুড়ি জাগিয়েছিলেন এজন্যে। ১৮৩০ সালে তিনি 'বিশুদ্ধ হিন্দুমতে' শ্রীমদভাগবত ছাপিয়েছিলেন। এজন্য তিনি ব্রাহ্মণ কম্পোজিটার দিয়ে টাইপ সেট করিয়ে গঙ্গাজলে ছাপার কালি গুলেছিলেন। তার বদলে বইটির দাম করেছিলেন ছাপার আগে তিরিশ টাকা ও পরে চল্লিশ টাকা। ছাপার আগে পরে দামের ব্যতিক্রমের রীতি অবশ্য আজও বর্তমান। ডঃ সুকুমার সেনের মতে "পুঁথির ধরণে সংস্কৃত গ্রন্থ বোধহয় ভবানীচরণ প্রথম ছাপাইবার উদ্যোগ করেছিলেন।" অর্থাৎ 'খাঁটি' জিনিষ সরবরাহ ছিল ভবানীচরণের মূলনীতি। 'রক্ষণশীল হিন্দু' ভবানীচরণ বাজার একসপ্লয়েট করার এই সহজ সুযোগ নিয়েছিলেন তার সমাচার চন্দ্রিকায় পত্রে রামমোহনকে আঘাত করে। বীরভূমের গরীব ব্রাহ্মণ এইভাবে বটতলার বাজারের আরেকটি বন্ধ দুয়ারের চাবি ভেঙ্গেছিলেন।

একটা কথা বটতলার বই অর্থে প্রথমেই পাঠকের মনে পড়ে তা হোল আদি রসাক্রান্ত, কুৎসিত মুদ্রণ, পাতলা চটি বই যার দাম অত্যন্ত কম। অর্থাৎ বটতলার বইয়ের অনান্য দোষগুণের সঙ্গে 'খুব সস্তা'র বৈশিষ্ট্যটিও একদা জড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সস্তার ব্যাপারটি বটতলার মধ্যযুগের ব্যাপার। প্রথমদিকে গঙ্গাকিশোর ভবানীচরণরা সস্তার দিকে নজর দেননি পরে সুধাসিন্ধুরা যেমন

দিয়েছিলেন। সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় প্রথম সস্তা প্রেসগুলো বটতলার অন্তর্গত নয় 'শুধু কলিকাতায় কেন, সকল বাংলা ছাপাখানার মধ্যে প্রথম সস্তা প্রেসগুলি বটতলার সীমানার বহু দূরে অবস্থিত ছিল।' অথবা 'বটতলা' যুগ যখন প্রতিষ্ঠিত তখন কম্পিটিশনে নামবার জন্য অনেক সস্তায় বই দিয়ে বাজী মাৎ করতে শুরু করে দিলে বটতলার মধ্য যুগে। এবং তারা এসেছিলো বটতলার বাইরে থেকে।

এর কারণ বটতলার প্রথম যুগে যাঁরা বই কিনতেন তারা ধনী। তখনও বটতলার বই সর্বসাধারণের জন্য নয়। ধনী 'বাবু' পরিষদ, মদ ও বাঈজী সহযোগে তখন বই পড়তেন। এ কথা প্রথম জানা যায়, ১৮২৩ সালে সংবাদপত্রের জনৈক অজ্ঞাত নামা লেখকের পত্রে। 'বাবুদিগের নিকটে আগত মাত্র সমাদর পুরঃসরে মূল্য প্রদানপূর্বক গ্রহণ করিয়া দিবারাত্রি তদামোদে আমোদিত হইয়া থাকেন।' ১৮১৫ সালে গঙ্গাকিশোর কলকাতায় এসে বই ছাপাতে শুরু করতেন। বটতলার বই ছাপা হত অজস্র পৌছত রাজ দরবার থেকে সুদূর পল্লীগ্রাম পর্যন্ত। সবচেয়ে বড় কথা বটতলার বই পল্লীগ্রামে পৌছত প্রকাশকের নিজের চেষ্টায়—প্রকাশকই ফেরী করতেন বই। রামমোহন এই সুবিধার কথা সহজে বুঝে নিলেন। রামমোহন চাইছিলেন এমন একটি প্রকাশ মাধ্যম যে প্রচুর বই প্রকাশ করবে এবং সবই পৌছে দেবে গ্রামে গ্রামে। হরচন্দ্রের দৌত্যে রামমোহন-গঙ্গাকিশোর বন্ধন সম্ভব হয়। ব্রাহ্মণ সেবধির অগ্রদূত এল গঙ্গাকিশোরের বাঙ্গাল গেজেটি। বাঙ্গাল গেজেটিতে 'প্রাজ্ঞ হিন্দু' ওলাওঠা রোগের জন্য ওলা দেবীর স্মরণাগত হতে পাঠককে নিষেধ করলেন। বলা বাহুল্য এই প্রাজ্ঞ হিন্দু স্বয়ং রামমোহন। লোকহিতকর বহু প্রবন্ধ লিখলেন তিনি। এই বটতলার বই প্রকাশ করে গঙ্গাকিশোর যে অর্থ উপার্জন করলেন সেই অর্থেই তিনি প্রথম বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ করলেন।

১৮২০ সালে যে সব বইয়ের তালিকা পাওয়া গেল রেভারেণ্ড লং সাহেবের তালিকায় গীত গোবিন্দ রস পদাবলী চৈতন্য চরিতামৃত। কিন্তু বটতলার আসল ফসল এ নয়। ডঃ সুকুমার সেনের মতে একটি তালিকা অনুসরণ করলে দেখা যায় বটতলায় ইসলামী সাহিত্যের কদর ছিল। সাহিত্য নয় কেচ্ছা।

কিবা আছে কেতাবে শুন ভাই জান
একে একে কহিতেছি করিতেছি বয়ান
এছলামী বাঙ্গালায় কেচ্ছা রচনা হইবে
ইহার নাকেতে লোগ পাওছিবে সকলে।

এই এছলামী কেচ্ছার হোতা ছিলেন অবশ্য হিন্দু প্রকাশকেরাই। মোটামুটিভাবে বলা চলে বটতলার প্রকাশকমাত্রেই হিন্দু ছিলেন তখন। প্রথমত যদি আমরা মুসলমানী 'কেচ্ছা'র আলোচনা শুরু করি তাহলে দেখব মুসলমানী কেচ্ছা অনেক সময় লেখক স্বয়ং বটতলা থেকে অনেকদূরেই আগাম খরচে প্রকাশ করতেন। সম্প্রতি আধুনিক কবি যেমন নিজের খরচে নিজের বাড়ি থেকেই প্রকাশ করেন তাঁর কাব্য। অবশ্য বটতলাতে মুসলমান প্রকাশক এসেছিলেন কিছু পরে যখন বটতলার নাম আজকের 'কলেজ স্ট্রীট' হয়ে গিয়েছিল। ডঃ সুকুমার সেনের মতে মির্জাপুরের মুন্সী হেদাতুল্লার প্রেস এদিক দিয়ে প্রথম। তারপর শিয়ালদহে মহাম্মদ কেরামতুল্লার মহাম্মদি যন্ত্র (১৮৩৫ সালের

আগে স্থাপিত), কাদেরিয়া যন্ত্র ও রহমানি যন্ত্র। শেষের দুটি যন্ত্রে প্রকাশিত ১৮৫৫-৫৬ সালের বই পাওয়া গেছে।

অবশ্য 'বটতলার হিন্দু প্রকাশকেরাও বহু ইসলামী বাংলা গ্রন্থ ছাপাইয়াছিলেন' যেমন রামলাল শীল ছাপিয়েছিলেন সৈয়দ হামজার হাতেমতাই, গরীবুল্লার 'ইউসুফ সুলেখা' এরাদতউল্লার গোলে বকাওলি, মোহাম্মদ দানশের 'চাচার দরবেশ'। ডঃ সুকুমার সেনের মতে মুসলমান প্রকাশকেরা হিন্দু অপেক্ষা বেশি রক্ষণশীল ও প্রাচীন পন্থী ছিলেন। যথা পয়ার প্রীতি। শুধু আখ্যাপত্র বা উৎসর্গে নয় পুস্তকের বিজ্ঞাপনেও মুসলমান প্রকাশক পয়ার পছন্দ করতেন। গোলামহোসেনের 'দেল-রওসন মুর্চাল্লি বা নছিহাতুল এছলাম-এর বিজ্ঞাপনে এর উদাহরণ পাওয়া যায়। ডঃ সুকুমার সেনের মতে 'ইসলামী বাংলা কাব্যের কবিরা প্রায়ই উপসংহারে মুখর হইয়াছেন প্রকাশকের প্রশংসা গুঞ্জনে।' গরানহাটার এ্যাংলোইণ্ডিয়ান প্রেসে প্রথম মুসলমান প্রকাশক কাজি সফিউদ্দিন আনুমানিক ১৮৫০-৬০ সালে তাঁর সোলেমানি প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। এর আগে তিনি গরানহাটা স্ট্রীটের এ্যাংলোইণ্ডিয়ানপ্রেসে বই ছাপাতেন। কাজি সফিউদ্দিনের পুত্র কাজি সাহা ঠিক পিতার ব্যবসা চালিয়ে গিয়েছিলেন।

বটতলার ফসলগুলোর রসিক ছিলেন 'বাবু'রা এ কথা ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন। আর এই 'বাবু'জাতটা ব্যাখ্যা করারও প্রয়োজন রয়েছে। বটতলার ফসল (!) হুতোমের নকসা থেকেই উদ্ধার করা যাক কিছুটা। অন্ততঃ ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত ও সরস সারটুকু পাওয়া যাবে এতে।

'নবাবী আমল শীতকালের সূর্যের মত অস্ত গেল। মেঘান্তের রৌদ্রের মত ইংরেজদের প্রতাপ বেড়ে উঠলো। বড় বড় বাঁশঝাড় সমূলে উচ্ছন্ন হলো। কঞ্চিতে বংশলোচন জন্মাতে লাগল। নবোমুন্সী, ছিরে, বেনে ও পুঁটেতেলী রাজা হল। সেপাই পাহাড়া, আসা সোটাও রাজা খেতাপ, ইণ্ডিয়া রবরের জুতো ও শান্তিপুরের ডুরে উড়নির মত রাস্তায় পাদাড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগলো। কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভ, মানসিংহ, নন্দকুমার, জগৎশেঠ প্রভৃতি বড় বড় ঘর উচ্ছন্ন যেতে লাগলো, তাই দেখে হিন্দুধর্ম কবির মান বিদ্যার উৎসাহ পরোপকার ও নাটকের অভিনয় দেশ থেকে ছুটে পালালো। হাফ আখড়াই, ফুলআখড়াই পাঁচালী ও যাত্রার দলেরা জন্মগ্রহণ করলে; শহরের যুবক দল গোখুরী, ঝকমারী ও পক্ষীর দলে বিভক্ত হলেন। টাকা বংশগৌরবকে ছাপিয়ে উঠলো। রামা, মুদ্দফরাস, কেষ্টা বাগদী, ব্রেচো মল্লিক ও ছুচো শীল কলকেতার কায়েত বামুনের মুরুব্বী ও শহরের প্রধান হয়ে উঠলো। এ সময়ে হাফ-আখড়াইয়ের সৃষ্টি।'

এবার হুতোম বর্ণিত বারোইয়ারী পুজোর প্রথম রাত্রে বারোইয়ারী তলার বর্ণনায় সেদিনকার কথা সুস্পষ্ট হবে। শুধু বারোইয়ারী তলার বদলে বটতলা পড়লে আমাদের বক্তব্যটিও অস্পষ্ট থাকবে না। 'বারোইয়ারীতলায় সং গড়া শেষ হয়েছে। বারোইয়ারী তলায়' ভালো কত্তি পারবো না মন্দ করবো, কি দিবি তা দে,' 'বুক ফেটে দরজা,' ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে, কানাপুতের নাম পদ্মলোচন, 'মদখাওয়ার বড় দায়' 'জাত থাকার কি উপায়' হাড়-হাবাতে মিছরির ছুরি' প্রভৃতি নানাবিধ সং হয়েছে।' প্রতিমার দুপাশে দুটো সং বেশ ধার্মিক ও ক্ষুদে নবাব। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে বটতলার যে বইগুলোর নামের সঙ্গে এই সব সংএর নাম মিলে যাচ্ছে।

অর্থাৎ যে বছরে বারোইয়ারীতলায় যে যে সং খুব নাম করত বটতলা-প্রকাশকরা বইয়ের নাম দিতেন সেই সংয়ের নামে। বটতলা বইয়ের মুদ্রিত বিজ্ঞাপন ছিল না। ফেরীওয়ালার কণ্ঠে এই সব সংয়ের নাম নিশ্চয়ই ক্রেতাকে কাবু করত।

বারোইয়ারীতলায় অবশ্য শুধু সং হত না পুজোর সময়। খ্যামটা নাচেরও আয়োজন হত। 'খ্যামটা বড় চমৎকার নাচ।…অনেকে ছেলেপুলে, ভাগ্নে ও জামাই সঙ্গে নিয়ে একত্রে বসে—খ্যামটা' অনুপম রসাস্বাদনে রত হন। বারোইয়ারীতলায় খ্যামটা স্বরু হতো বাইনাচের শেষে। 'সহরের নন্নী, শুন্না, মুন্নী, খন্নী, সন্নী প্রভৃতি ডিগ্রী মেডেল ও সার্টিফিকেট ওয়ালা বড় বড় বাঈজীরা বাইনাচ নাচতেন খ্যামটা নাচতো 'গোলাপ, শ্যাম, বিধু, খুদু, মনি ও চুনি প্রভৃতি খ্যামটাওয়ালীরা', এরপর কেত্তন আর কেত্তনের শেষে বাউল স্বরে গান শুরু হত বারোইয়ারী তলায়।

কিন্তু বারোইয়ারীতলার নামই কি বটতলা? বাই খ্যামটা হাফ আখরাই সংএর প্লাটফর্ম বারোইয়ারীতলার সঙ্গে একটি আটচালার ইতিহাসও মনে রাখতে হবে। নবকৃষ্ণ কবির বড় পেট্রন ছিলেন। রামবসু, হরু ঠাকুর, নিলু, রামপ্রসাদ ঠাকুর, জগা প্রভৃতি কবিওয়ালার মান নবকৃষ্ণ দিয়েছিলেন। নবকৃষ্ণের দেখাদেখি তখন ধনীদের মধ্যে 'কবি' পোষার রেওয়াজ শুরু হয়। বাগবাজার-রূপচাঁদ পক্ষীর দল সৃষ্টি করেন নবকৃষ্ণের সভার এক ইয়ার শিবচন্দ্র ঠাকুর। শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাগবাজার-ভিকরমেশন' করে এই পক্ষীর দলকে উড়তে শেখান। পক্ষীর দলের একটি 'পবলিক' আটচালা ছিল। সেইখানে এসে পাখি হতেন, বুলি ঝাড়তেন ও উড়তেন। এ ছাড়াও বোসপাড়ার ভেতরেও দুচার গাঁজার আড্ডা ছিল। এখন আর পক্ষীর দল নেই…পাখিরা বুড়ো হয়ে মরে গেছিল।…আড্ডাটি মিউনিসিপাল কমিশনারেরা উঠিয়ে দেছেন, এখন কেবল তার রুইন মাত্র পড়ে আছে।' দু একটা আধমরা বুড়োগোছের পক্ষী এই আটচালার ধ্বংসাবশেষে বসে বসে ঝুমুর শুনতেন তার পরও।

এখন এই আটচালা কি বারোইয়ারীতলাই কি বটতলার ছবি? বারোইয়ারীতলার যে সং নাম করত সে বছর বটতলার বইয়ের নামও হত তাই। এর ফলে আমাদের অনুমানও ঘনীভূত হয়। বটতলা বারোইয়ারীতলা যদি একাত্মক হয় তবে হয় তো আটচালাও তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। আটচালার ইতিহাসের সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার বাবুসভ্যতা (যা হুতোমের মতে টাকার ধনে ধনী কিন্তু 'বনেদী' নয়) পুরোপুরি জড়িয়ে রয়েছে। এরই সক্রিয় সাক্ষী নিধুবাবু।

রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনস্টাইন, বন্ধুত্ব-ইতিহাস

অশ্রুকুমার সিকদার

দুই বন্ধু ও বিশ্বভারতী

রোটেনস্টাইনকে লেখা পত্রাবলীর, মধ্যে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যায়তন সম্বন্ধে প্রথম উল্লেখ পাই আর্বানা থেকে লেখা ১৬ জানুয়ারি ১৯১৩ তারিখের চিঠিটিতে। অবশ্য রোটেনস্টাইন যখন ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন তখন পরিচয়ের পর রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বোলপুর আশ্রমে যাবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। তিনি সে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেননি। পূর্বোল্লিখিত চিঠির মধ্যে আছে আশ্রমের অস্বস্তিকর আর্থিক অবস্থার কথা, যে কারণে পাশ্চাত্যের কাছে কবিকে হাত পাততে হয়েছিল। তিনি লিখলেন—

I have got a disquieting letter by this mail from Bolpur giving me the details of debts and liabilities incurred by my school. Some of debts are of urgent nature.

ঐ চিঠিতেই পরে তিনি রোটেনস্টাইনকে নিরুদ্বিগ্ন হতে বলেন—

Please don't be least anxious about this financial difficulty with regard to my school. My master claims more sacrifice from me, and I must gladly prepare myself for that.

এই ১৯১৩ সালেই মার্কিনদেশে প্রবাসযাপন কালে কিছু মার্কিনীর সঙ্গে বিদ্যালয় সম্বন্ধে আলোচনা হওয়ায় কবির মনে হয়েছিল এই ধনীর দেশে চেষ্টা করলে হয়তো বিদ্যালয়ের অর্থাভাব ঘুচানো সম্ভব। তিনি সেই অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনার ভিত্তিতে জগদানন্দ রায়কে লিখেছিলেন (রবীন্দ্রজীবনী ২)—

ওখানে একটা টেকনিক্যাল বিভাগ স্থাপন করা, দুই একটি ল্যাবরেটরির পত্তন করা, পাকশালার সংস্কার এবং হাসপাতালের প্রসারসাধন খুব দরকার বলে মনে করি।

আবার এই সময় থেকেই শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তিনি দেখতে শুরু করেছেন। তবে তিনি কোনো দিন প্রচার করা, ভিক্ষা করে বেড়ানোর ব্যাপারে চারিত্রিক কুণ্ঠা কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

অপ্রত্যাশিতভাবে নোবেল পুরস্কারের টাকা হাতে আসায় আর্থিক অস্বস্তি কিছুদিনের জন্য দূর হলো এবং কিছু কিছু প্রয়োজনীয় উন্নতিবিধান তিনি করতে পারলেন। এই বিষয়ে তিনি রোটেনস্টাইনকে (১৫ জুন ১৯১৪) লিখলেন—

Our vacation is over and I am on my way to Bolpur to resume my work··· Financial difficulties being somewhat slackened I am going to introduce some costly improvements in my school this year. Your Nobel Prize and the successful sale

of my English works have made me recklessly and I am spending in anticipation of an income which may fail to keep pace with my expensive schemes...In all my calculations I am fairly moderate but in carrying them out my spirit takes delight in pushing them aside and running ahead of them.

এই প্রসঙ্গে রোটেনষ্টাইনকে লেখা আর একটি চিঠির (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৫) অংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোন আন্তরিক প্রবর্তনায় রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কোন আনন্দে শিক্ষাদান করতেন তিনি এবং কোন শিক্ষাদান পদ্ধতি তাঁর উৎকৃষ্ট বলে মনে হতো, তার আভাস এই পত্রাংশে মেলে। তিনি লিখছেন,

For the last few months I have plunged headlong into my school work. I teach three classes in the morning and the rest of the day I spend writing text books for my boys. These works that do not depend upon the fitfulness of inspiration are soothing, unpretentions commonplaceness is restful to the mind...

I have a genuine love for all young things feeding their minds with ideas and watching the grow give me great delight. As my method of teaching is not at all mechanical and is adventuresome it bring its surprises every day keeping fresh my enthusiasm. I am sure you would enjoy watching me giving lessons to a class of quite young boys of the average age of fourteen, explaining to them in Bengali, Shelley's Hymn to Intellectual Beauty and his ode to the west wind. I can assure you that they understand these twopoems in all their depth of truth and wealth of imagination. It is my experience that, if perfectly treated, the lessons that are difficult are more stimulating and attention compelling, and thus in a manner easier in the long run, than obviously easy lessons. The claim upon the students mental concentration itself and their glow of pride in overcoming difficulties are of greater help for their growth of mind than anything that may be in lessons themselves.

এই পত্রাংশ থেকে বোঝা যায়, আপাতদৃষ্টিতে কবিস্বভাবের বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথ কেন, কোন আন্তরিক প্রয়োজনে, বারবার বিঘ্নের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও, এই বিদ্যাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় এত সময় ও শক্তি ব্যয় করেছিলেন।

১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন মার্কিনদেশ সফরে দ্বিতীয়বার এলেন তখন তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য বিশ্বভারতীর জন্য অর্থসংগ্রহ। একটি পত্রে তিনি এই সময় লেখেন (রবীন্দ্রজীবনী ২)—

My intitution at Bolpur will accept food from all men and thus renounce the caste for good.

অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে, রথীন্দ্রনাথকে লিখিত চিঠি থেকে জানা যায়, শান্তিনিকেতনে

'সর্বজাতিক মনুষ্যত্বচর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে'। যে ইচ্ছা অন্তরে এইভাবে অঙ্কুরিত হয়েছিল সেই ইচ্ছাই বিশ্বভারতী পরিকল্পনায় পরিণতি পায় এবং ১৯১৮ সালে শান্তিনিকেতনে আগন্তুক একদল গুজরাটি ব্যবসায়ীর কাছে এই পরিকল্পনা প্রথম প্রকাশ করলেন। এই বৎসর পৌষ উৎসবের পরের দিন বিশ্বভারতী গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হল। ১৯১৯ সালের মার্চ ও এপ্রিল মাসে কলকাতায় তিনি যে দুটি বক্তৃতা দিলেন—'Center of Indian Culture' এবং 'Message of the Forest'—তার মধ্যে তিনি বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করলেন। দ্বিতীয়বার ভ্রমণকালে অর্থসংগ্রহের জন্য যান্ত্রিকভাবে বক্তৃতা করতে করতে বিরক্ত হয়ে কবি দেশে ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু বিশ্বভারতীকে বাস্তবে রূপ দেবার প্রয়োজনে অর্থসংগ্রহের উদ্দেশে কবি তৃতীয়বার ১৯২০ সালে মার্কিনদেশে গেলেন। যাত্রার পূর্বে লণ্ডনে অবস্থানকালে তিনি রোটেনষ্টাইনকে লিখলেন (৩১ জুলাই ১৯২০)—

I am desperately in need of raising funds for my school—and I see no other way but lecturing in America which is for more partical for me than highway robbery or motor car raids, considering my training and other circumstances.

গিয়ে দেখলেন তিনি, কবির আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কথায় সবাই উদাসীন অথচ বেরিয়েছিলেন 'চিরদিনের মতো আশ্রমের অভাব মোচনের' স্বপ্ন নিয়ে। কিন্তু পাঁচ মাস ব্যাপী ভ্রমণ একেবারে ব্যর্থ হলো—মনের থেকে অর্থসংগ্রহের মতো কাজের তিনি অনুপযুক্ত ছিলেন; যুদ্ধোত্তর মার্কিনদেশের মনোভাবে নিউইয়র্কের কোলাহলে তিক্ত-বিরক্ত এবং হতাশ কবি অধিকাংশ সময় কাটালেন হোটেলকক্ষে বন্দী হয়ে। সহ্য করতে হলো তাঁকে এই জাতীয় খবরের কাগজে বিদ্রূপে—

We nominate oblivion for Sir Rabindranath Tagore because his 'mystical' poems have been acclaimed chiefly by the psendocultured because in all his portraits he takes care to look as much like a holy man and a saint as possible because he is the chief of all the Mahatmas and Swami who swarm over here to spread their information about India and finally because they visit the United States every few years, collect a comfortable sum in lecture fees and depart, giving out interviews in which they denounce America for her Materialism.

মার্কিনদেশে যাওয়ার পথে বা মার্কিনদেশ থেকে ফেরার পথে রোটেনষ্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী সম্বন্ধে আলোচনা হয়। রোটেনষ্টাইন যথারীতি তাঁকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন কিন্তু জীবনচরিতকারের বিবরণ অনুযায়ী, তিনি রবীন্দ্রনাথকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন,

If a poet were to retain his creative virtue intact, he could not allow himselelf to be swamped in administrative detail.

মার্কিনদেশের থেকে বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার বোঝা বহন করে আনার পরেও রবীন্দ্রনাথ

পাশ্চাত্যের বন্ধুদের উপর আশা ছেড়ে দেননি। সেন-নদী তীরবর্তী ধনী ইহুদী কাপের নিবাস Autor du Monde থেকে রবীন্দ্রনাথ (১৭ এপ্রিল ১৯২১) রোটেনষ্টাইনকে স্মরণ করিয়ে লিখলেন—

Let me remind you of our conversation about the International University. If was decided that a committee should be formed in England which would help the committee in india about the selection of teachers and students belonging to Europe and about other matters which would be more convenient for them to deal with. I hope it will be possible for you with the help of Mr. Montague and Lord Carmichael and other sympathisers to make a draft of rules and a list of names of those who will be likely to join us.

এই চিঠিতে দুই বন্ধুর মধ্যে সহযোগের ভাব পাই, কিন্তু মাত্র এক সপ্তাহ পরে লেখা (২৪ এপ্রিল) চিঠিতে সুর বদলে গেছে, নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে কোন কারণ ঘটেছে যা এই সুরপরিবর্তনের জন্য দায়ী।

When I sent my appeal to western people (১) for International Institution in India I made use of the word "University" for the sake of convenience. But that word not merely has an inner meaning but outher assosiation in minds of those who use it, and that fact tortures my idea into its own rigid shape. It is unfortunate. I should not allow my idea to be pinned to a word like a dead butterfly for a foreign museum...I saved my Santiniketan from being trampled into smoothness by the steamroller of your education department...I am proud of the fact that it is not a machine made article perfectly modelled in your workship—it is our very own. If we must have a university if should spring from our own life and be suspained by it...Now I am beginining to discover that it was more an ambition than ideal which dragged me to the gate of the rich west. I must have been the vision of a big undertaking that lured me away from my seclusion in search of big means and big results. And I am being punished deep in my heart...This is the first time in my life when I have come to the foreign door asking for help and co-operation. But such help has to be bought with a price that is ruinous...Very likely I shall never be able to work in harmony with a board of trustees, influential and highly respectable, for I am a vagabond at heart...This letter of mine is only to let you know that I free mysolf form the bondage af help and go back to the great Brotherhood of the Tramp, who seem helpless, but who are recruited by God for his own army.

এই চিঠিতে তুমি আমির ভেদ, একজন শাসক দেশের অন্যজন শাসিত দেশের নাগরিক, এই ভেদ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে—একদিকে 'তোমাদের' শিক্ষাবিভাগ, 'তোমাদের' কারখানা, অন্যদিকে 'আমাদের' শান্তিনিকেতন। মার্কিনদেশে অর্থপ্রার্থনার অবমাননা এই চিঠিতে পরম আত্মধিক্কারসহ প্রকাশ পেয়েছে। রোটেনষ্টাইন ট্রাষ্টিবোর্ডের প্রস্তাব করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ জানালেন তিনি মন্ত্রহীন ভবঘুরে, কোনো বোর্ডের সঙ্গে কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। (২) অথচ যে রোটেনষ্টাইনের কাছে অভিযোগ করে লিখছেন তিনিই তো সতর্ক করে বলেছিলেন কবিত্বের ধর্ম অক্ষুণ্ণ রাখতে গেলে সংগঠনে প্রতিষ্ঠানে অতিমাত্রায় জড়ানো চলে না। ভাগ্যের আর একটি পরিহাস এই, 'তোমাদের' শিক্ষাবিভাগ যে বিদ্যায়তনকে স্টীম রোলারে পিষ্ট করতে পারেনি, 'আমাদের' শিক্ষাবিভাগ তাই করতে পেরেছে অর্থসাহায্যের অস্ত্রে—যে 'bondage of help' থেকে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে অতীতে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

মার্কিনদেশে অর্থসংগ্রহের জন্য বক্তৃতাভ্রমণকালে কবির কোনো কোনো ঘটনায় সন্দেহ হয়েছিল ব্রিটিশ সরকারের হস্তক্ষেপেই বিশ্বভারতী সম্বন্ধে মার্কিনবাসীর এমন ঔদাসীন্য। এক সভানুষ্ঠানে জনৈক অধ্যাপক মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করে বসেন ব্রিটিশ সরকার শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধতা করেন কিনা। বিক্ষুব্ধ কবি ব্রিটিশ জাতির প্রতিনিধি হিসাবে রোটেনষ্টাইনকে আক্রমণ করে এই তীব্র চিঠি লিখলেন (৮ই মে ১৯২১)—

My dear friend, when I was in America the British agency thwarted me in my appeal to the people for the proposed University. An American friend, who is struggling against obstacles to raise funds for this object has lately informed me that the British Consul in his town is hindering him. I am not trusted. How can I be certain that this mistrust which has nearly killed my mission by its antagonism will not kill it by its help? But possibly your point is that trying to be independent will not furhtuer my cause. That is true. It would be pesumptuous for me to imagine that my project can thrive against suspicion lurking in the minds of British authorities. At the same time I feel strongly that it is far better to allow it openly to be strangled by that mitrust than to be fettered by its help. I remember your suggesting to me once in cource of conversation that exuberant protestation of friendliness towards me on the part of the Continental people of Europe was easy because they had no responsibility with regard to such demonstrations. You were right. For disinterested relationship is the only pure channel through which sympathy and Co-operation can have a clear flow...When I, who belong to a subject race under British rule, am too warmly received in America or in other Western countries, the British agency may feel uneasy—for their interest in me and in my project

is not purely human and simple. Your contention is that the man who is sofer in mind accepts such facts as facts and deal with them accordingly and that it is a sign of moral drunkenness to be able to think that one can ignore them in pride of his self-sufficiency. But of one thing you may be certain that I have a natural power of resistance in me against intoxication produced by praise, and my mind at the present moment is not in a daze of drunkenness. I am not in the least oblivious of the fact that the breath of official suspiciousness can blight in a moment my cherished scheme.

এই পত্রে শাসক ও শাসিত জাতির মধ্যে যে অনিবার্য দূরত্ব এবং শাসকের প্রতি শাসিতের যে অভিযোগ তার সমস্তই তীব্র ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। যতই মূল ইউরোপ ভূখণ্ড তাঁকে বন্দনা করেছে, ততই সন্দিগ্ধ ইংরাজ মনে করেছে এই ব্যক্তি-পূজা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত, আর রবীন্দ্রনাথ ততই দেখেছেন ভারতীয়ের প্রতি আচরণে ইংরাজের সঙ্গে ইয়োরোপবাসীর পার্থক্য। রোটেনষ্টাইন চেয়েছেন ইংরেজ শাসনের 'facts'-এর সীমার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যথাসাধ্য সাফল্য অর্জন করুন, রবীন্দ্রনাথ সেই 'facts'-কে অস্বীকার করতে চেয়েছেন। এইভাবে দুই বন্ধুর মধ্যে রাজনৈতিক মতভেদ অনিবার্যভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, যা বন্ধুত্বকে করেছে বিভ্রান্ত। এই চিঠির পর দীর্ঘ দিন দুইজনে পত্রবিনিময় বন্ধ ছিল, যতদিন রোটেনষ্টাইন প্রথমে চিঠি লিখে মৌনের তুষার ভঙ্গ না করেছিলেন।

এর পরে, যখন দুজনের মধ্যে সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তখন শান্তিনিকেতনের খবরাখবর রবীন্দ্রনাথ রোটেনষ্টাইনকে নিয়মিত জানিয়েছেন। সম্ভবত ১৯২২ সালে লেখা একটি পত্রে জানাচ্ছেন বিশ্বভারতী প্রসারিত হচ্ছে এবং অনেক সহায়ক আসছেন সাহায্য করতে। ইয়োরোপ থেকে অধ্যাপকবৃন্দ শিক্ষক হিসাবে এবং প্রতিষ্ঠানের সুহৃৎ হিসাবে তার শ্রীবৃদ্ধিতে সচেষ্ট আছেন। এই বছরই ১৯২২ সালে পৌষ-উৎসবের পরের দিন ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সভাপতিত্বে বিশ্বভারতীর উদ্বোধন হলো এবং বিদ্যায়তন জনসাধারণের হাতে অর্পিত হলো। এই খবর রবীন্দ্রনাথ রোটেনষ্টাইনকে দিয়েছিলেন কিনা তার প্রমাণ সংরক্ষিত পত্রাবলীতে নেই। ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন ইংলণ্ড ভ্রমণান্তে মার্কিনদেশে রয়েছেন তখন বিশ্বভারতীর জন্য ইংরেজ বন্ধুমণ্ডলী Tagore's University Fund নামে এক অর্থভাণ্ডার খুললেন। এই ফাণ্ডের ভাণ্ডারী R. O. Mennel এই বিষয়ে রোটেনষ্টাইনকে যে চিঠি লেখেন সেটিও হুটন গ্রন্থাগারের পত্রসংগ্রহে সংরক্ষিত রয়েছে। চিঠিটি এই—

41, Eastcheap
London, E. C. 3
14th November, 1930

Professor William Rothenstin, M. A.
Principal of the Royal College of Arts,
South Kensington,

Dear Professor Rothestine,

You were kind enough to sign the appeal for Tagore's University Fund. The response has been a little disappointing barely 200 pound having come in so far.

I have therefore have it reprinted as enclosed, 89 with facsimile signatures (৩) and am now sending it individually to people likely to be interested.

I shall be grateful if you kindly do me the further favour of letting me have a list of names and addresses of such people as you think I might suitably approach.

Yours sincerely,
R. O. Mennel.

বিশ্বভারতী বিষয়ে রোটেনষ্টাইনকে লেখা শেষ চিঠিতেও (১৫ নবেম্বর ১৯৩১) প্রতিষ্ঠানের অর্থকষ্টের কথা পাই। দেশে একে অর্থনৈতিক বিপর্যয়, তারপর বাংলাদেশে বন্যার ধ্বংসলীলা, এর মধ্যে

Visva-Bharati is in a sorry plight, for we have nearly come to the end of our tether.

১। প্রধানত মার্কিন দেশের জন্য প্রচারিত হয়েছিল এই আবেদন।

২। এই কথা রবীন্দ্রনাথ অন্যত্রও রোটেনষ্টাইনকে জানিয়েছেন (১৩ জুলাই ১৯২২)—"I was afraid that such a board would be dominated over by beaurocrats whose policy is to view all our doing distrust."

৩। রোটেনষ্টাইন ব্যতীত অন্যান্য স্বাক্ষরকারী ছিলেন মেসফিল্ড, মাইকেল ম্যাডলার, লরেন্স হাউজম্যান, এডোয়ার্ড টমসন, এভেলিন আণ্ডারহিল, ফ্রান্সিস ইয়াংহাজব্যাণ্ড প্রমুখ ব্যক্তিগণ।

বঙ্কিম উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা

অশোক কুণ্ডু

নসীমুদ্দিন (চন্দ্রঃ ৩।৩) ॥
শৈবলিনী বন্দী প্রতাপের অনুসরণ করতে চাইলে নবাব এই 'বিশ্বাসী, বলিষ্ঠ এবং সাহসী খোজাকে' তার সঙ্গে যেতে আদেশ দেন।

মহম্মদ আলি (মৃণাঃ ২।৬) ॥
বখতিয়ার খিলজির বিশ্বস্ত লোক। ইনিই বখতিয়ারের বক্তব্য পশুপতির কাছে ব্যক্ত করেন। মহম্মদআলি চতুর ব্যক্তি। কথাবার্তা তাঁর মার্জিত। এবং তিনি যথার্থ বীর। অঙ্গীকারমত বখতিয়ার পশুপতির সঙ্গে ব্যবহার না করায় মহম্মদ আলি অনুতপ্ত হন। তাই তিনি গোপনে পশুপতিকে মুক্তিদান করেন। মহম্মদ আলি যবনকুলের পাপ অনেকটা মোচন করেছে।

মহম্মদ ইরফান (চন্দ্রঃ ৬।৩) ॥ মীর কাসেমের অনুচর।

মহম্মদ ঘোরি (মৃণাঃ ২।৬) ॥
'মৃণালিনী' উপন্যাসে উল্লেখমাত্র আছে।

মহম্মদ ঘোরি ভারতে মুসলমান রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি একজন অসাধারণ বীর ছিলেন। ইনি ১১৭৬ খ্রীঃ প্রথম ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। তারপর ক্রমে ক্রমে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। ১২০৫ খ্রীঃ ঘোরনগরে প্রত্যাগমনের কালে সিন্ধুতীরে এক অসভ্য পার্বত্যজাতিদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মহম্মদ তকি (চন্দ্রঃ ৩।৩) ॥
দ্রঃ তকি খাঁ।

মহেন্দ্র সিংহ (আনন্দঃ ১।১) ॥
মহেন্দ্রই 'আনন্দমঠে'র সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের বাইরের মানুষ, যাকে উপন্যাসের মধ্যে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত করা হয়েছে। পদচিহ্ন গ্রামের অবস্থাপন্ন ব্যক্তি হয়েও ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কবলে পড়ে মহেন্দ্রকে স্ত্রী-কন্যা নিয়ে গৃহত্যাগ করতে হয়েছে। মহেন্দ্র স্ত্রী-কন্যার প্রতি স্নেহশীল ও কর্তব্যপরায়ণ। কন্যার জন্য দুধসংগ্রহে গিয়ে সে স্ত্রী-কন্যাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে। তারপর স্ত্রীর সন্ধানকালে সে সিপাহীদের হাতে ধৃত হয়েছে। মহেন্দ্র শক্তি-বান পুরুষ। একজনসিপাহীর আঘাতের প্রত্যুত্তর সে উপযুক্তভাবেই দিয়েছে।

মহেন্দ্রের জীবনে পরিবর্তন দেখা দিল ভবানন্দ ও সত্যানন্দের প্রভাবে এসে এবং তাদের উদ্দেশ্যের কথা শ্রবণ করে ও দেবীমূর্তী দর্শন করে। কিন্তু এ পরিবর্তন একেবারে আকস্মিক বলে মনে হয় না। দেশের দারুণ দুর্দিনের প্রতি মহেন্দ্রের মত বুদ্ধিমান লোক নিশ্চয়ই সচেতন ছিল। এই অরাজকতার মধ্যে তার মন বিষিয়ে উঠেছিল। তাই যে মুহূর্তে মহেন্দ্র স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার একটা উপায় দেখতে পেল, সেই মুহূর্তেই তার মন সেই দিকে ছুটে গেল। কিন্তু মহেন্দ্রের সর্বাপেক্ষা বড় বাধা স্ত্রী-কন্যা। একদিকে দেশের জন্য সর্বত্যাগী সন্তানধর্ম যেমন তার কাছে আকর্ষণের বস্তু, অন্যদিকে কল্যাণময়ী স্ত্রী কল্যাণী ও স্নেহময়ী কন্যা সুকুমারী তার হৃদয়রাজ্য অধিকার বসে আছে। মহেন্দ্রের এই বন্ধন নিজ হাতে মোচন করেছে—কল্যাণী, বিষ খেয়ে। তা' নাহলে হয় তো মহেন্দ্রের পক্ষে সন্তানধর্ম গ্রহণ করা সম্ভব হত না।

তারপর মহেন্দ্র সন্তানধর্মে দীক্ষা নিয়েছে। সত্যানন্দের সঙ্গে নগরের কারাগারে থাকাকালে মহেন্দ্রের মনে একবার সন্তানধর্মের মহাব্রতে দ্বিধা জেগেছিল। সত্যানন্দের অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেয়ে তার ভক্তি অচলা হল।

মহেন্দ্রের ওপর সত্যানন্দ এক গুরুভার অর্পণ করলেন। পদচিহ্ন গ্রামে গিয়ে গড় তৈরীর ভার পড়ল মহেন্দ্রের ওপর। এরপর মহেন্দ্রকে আর স্বতন্ত্র করে চেনা যায় না। সন্তানসেনার অঙ্গ হিসাবে তখন সে ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যবর্জিত। যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা গেল মহেন্দ্রকে কামান নিয়ে শত্রু আক্রমণ করতে।

তারপর সন্তানসেনার প্রাথমিক কার্য শেষ হলে, মহেন্দ্র—কল্যাণী ও সুকুমারীকে পেয়ে আনন্দিত চিত্তে গার্হস্থ্য-ধর্মে ফিরে এসেছে। কিন্তু শেষে দুটি ঘটনায় মহেন্দ্রের চরিত্র কিছুটা কালিমালিপ্ত হয়েছে। প্রথমতঃ ভবানন্দকে লক্ষ্য করে মহেন্দ্রের উক্তি—'ভবানন্দ ঠাকুর কি বিশ্বাসী ছিলেন?' আপত্তিজনক। তখন ভবানন্দ মৃত। সে মৃত্যু তিনি বীরের-মত বরণ করেছেন। মহেন্দ্র সেসব জেনেও ভবানন্দকে ক্ষমা করতে করতে পারেনি, এটা তার সঙ্কীর্ণতার পরিচয়। পুরুষবেশী শান্তির সঙ্গে স্ত্রী কল্যাণীকে দেখে মহেন্দ্র যেভাবে 'রুষ্ট' হয়েছে তাতে তার ইন্দ্রিয় জয়ের কোন মহিমা বর্তমান থাকেনি।

আসলে—মহেন্দ্র উপন্যাসের প্রথমে যেমন সাধারণ মানুষ ছিল, উপন্যাসের শেষেও তেমনি দোষ-গুণ সম্পন্ন সাধারণ মানুষরূপেই গার্হস্থ্য ধর্মে ফিরে এসেছে। মাঝখানে কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। মহেন্দ্র এবং কল্যাণীর বিচ্ছেদকে কেন্দ্র করে যে অন্তর্বেদনার প্রকাশ স্বাভবিক ছিল বঙ্কিম তার গতি রুদ্ধ করে ভালই করেছেন। এর ফলে মহেন্দ্রের চরিত্র আংশিক হলেও কাহিনীর উদ্দেশ্য বজায় থেকেছে।

মার্ক আন্তনি (রাজঃ ৭।২) ॥
রোম সেনাপতি। মিশর জয় করতে এসে তিনি সেখানকার রাণী ক্লিওপেট্রার রূপে মুগ্ধ হয়ে কর্তব্যপথ হতে ভ্রষ্ট হন। শেষপর্যন্ত তাঁকে আত্মহত্যা করতে হয়।

উপন্যাসে নামোল্লেখমাত্র আছে।

একটি বিস্ময়কর চিত্র প্রদর্শনী

শ্রীমান অনমিত্র চক্রবর্তীর চিত্রপ্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিলাম গত ১২ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায়। একাডেমী অব ফাইন আর্টস-এর তিনটি কক্ষে একশ' সাততি ক্যানভাস নিয়ে ছিল এই প্রদর্শনী। বেশিরভাগই তেলরঙ, কিছু প্যাস্টেল ও জল-রঙও-ও ছিল। সবকটিরই অঙ্কনকাল ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৮-র মধ্যে। ন্যূনাধিক বৎসর আগে শ্রীমান অনমিত্রের শিল্পী-জীবন সুরু, এর মধ্যে তার মোট সৃষ্টির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে পাঁচশটির কিছু বেশি। যাঁদের কাছে অনমিত্রর বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচিতি এখনও হয়নি তাঁদের জন্য এত পরিসংখ্যানের শেষে জানাতে হয় যে শিল্পীর বয়স দশ বৎসর।

শিশুশিল্পের সঙ্গে আমরা সবাই অল্প বিস্তর পরিচিত, শিশু-শিল্পী আমাদের ঘরে ঘরে। সব স্বাভাবিক শিশুরাই নাচে, গান গায়, গল্প বানায়, তার সঙ্গে ছবিও আঁকে। তাদের তরুণ প্রাণের উচ্ছ্বাস প্রকাশ পায় এই বিবিধ পথে। এ তাদের খেলা। আমরা প্রাপ্ত বয়স্কীরা স্নেহবশে তাদের অপরিণত ব্যক্তিত্বের সব কিছু আব্দার দুষ্টুমী ও ডানপিটেমীর সঙ্গে এই খেলা গান-নাচ-আঁকাকেও ভালবেসে ফেলি। সামর্থ্য ও যত্ন থাকলে উপকরণও যোগাই, বিশেষ শিশুর মধ্যে কোনও শিল্পের প্রতি স্পষ্ট প্রবণতা দেখতে পেলে তাকে উৎসাহ দিই, সম্ভব হলে পরবর্তীকালে তাকে ঐ বিষয়ে দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করি। এইটাই সাধারণ রেওয়াজ।

অর্থাৎ 'শিশু-শিল্প'কে দেখা হয় শিশুসুলভ বলে। হয় তা খেলা, নয় তো ভবিষ্যৎ কৃতিত্বের ইঙ্গিতমাত্র। স্বভাবতই শিল্প-উৎকর্ষ, সৃজন-প্রতিভা, কলা-দক্ষতা ইত্যাদি বিচারে সাধারণ বা প্রাপ্তবয়স্ক সুলভ যে মাপকাঠি ব্যবহার করা হয় তার প্রয়োগ শিশু-শিল্পীদের ক্ষেত্রে হয় না। শিশুদের প্রতিভার ও দক্ষতার মূল্যায়ণ অন্য শিশুদেরই তুলনায় হয়। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মতন তাদেরও তুলনামূলক বিচার সমবয়স্কদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, বয়সানুপাতিক মাপকাঠিগুলি অনুসৃত হয়েই থাকে, তা সে সজ্ঞানে হক বা না হক। মোটের উপরে আমাদের চিন্তাধারায় শিশু-শিল্প ও ও শিশু-শিল্পী যথাক্রমে শিল্প ও শিল্পীর থেকে পৃথক ও বিশিষ্ট। সাধারণভাবে বলতে গেলে, শিল্পী অন্তত কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণ না করা পর্যন্ত এই বিভেদ থেকে যায়। যদিও তখনও তার শিক্ষানবিশীর ভাবটা ঠিক যেন কাটে না।

দর্শক ও সমালোচকদের স্তম্ভিত ও বিমূঢ় করে অনমিত্রের অনন্য সাধারণ প্রতিভা এই প্রচলিত বিভেদকে এক অনায়াস অবহেলায় অস্বীকার করেছে। 'জিনিয়াস্' কথাটির সার্থক প্রতিশব্দ আমাদের না থাকলেও আমাদের দেশে 'জিনিয়াস্'-এর প্রাদুর্ভাব এক এক সময়ে পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে। অনমিত্র 'জিনিয়াস্' কিনা জানি না কিন্তু একটি বিশেষ সংঘটনা বা phenomenon বটেই। তার প্রথম ও প্রধান কারণ হল শিল্পী হিসাবে অনমিত্রর মধ্যে শিশুসুলভ লক্ষণগুলির প্রায় সম্পূর্ণ

অনুপস্থিতি। 'শিল্পী হিসাবে' বললাম এই জন্য যে তার বয়সটাত অস্বীকার করতে পারি না কিছুতেই। child prodigy—যার কোনও সরল প্রতিশব্দ খুঁজে পাচ্ছি না—প্রকৃত অর্থেই child prodigy' মানুষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে অনেকবারই আবির্ভূত হয়েছে শুনেছি। আমি নিজে কখনও সন্মুখীন হইনি কোনও child prodigy-র প্রতিভার। বোধ হয় আমরা কেউই বিশেষ হইনি। তাই অনমিত্রের সৃজনী শক্তির বিশ্লেষণ দূরে কথা আলোচনাও এত দুরূহ।

Child prodigy-রা অনেক সময়েই বয়সের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণতর বিকাশের পরিবর্তে ক্রমশ সৃজন-বিরলতার দিকে পেছুতে থাকে। জানি না অনমিত্রের ভবিষ্যতে সেইরকম কোনও ঋণাত্মক সম্ভাবনা ঘটবে না উজ্জ্বলতর ফসল দেখা দেবে। কিন্তু সাধারণভাবে child prodigy সম্বন্ধে এই ধরণের অনুমানমূলক আলোচনার স্থান থাকলেও অনমিত্রের সম্বন্ধে তা আমার মতে অবান্তর: অনমিত্রকে যে genius না বলে ও phenomenon বলতে বাধ্য হয়েছি তার দ্বিতীয় কারণ শিল্পী হিসাবে তার দারুণ সম্পূর্ণতা। ভুল বোঝার ঝুঁকি নেব না, 'সম্পূর্ণতা' বলতে চাইছিনা যে তার শিল্পকর্ম এই পাঁচশ'টি ক্যানভাস-এই সমাপ্ত হয়েছে। যদি ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতির সমসাময়িক অনতিউর্বরতার দিকে তাকাই তাহলে প্রার্থনা করতেই হবে যে অনমিত্র তার সৃষ্টি প্রবণতাকে বর্তমান অকৃপণ ধারায় অবিরাম বয়ে নিয়ে চলুক। কিন্তু শিল্পী হিসাবে তার সম্পূর্ণতা সেই অর্থে যে অর্থে অল্প জনাকতক আধুনিক (প্রাপ্ত বয়স্ক) চিত্রকর সম্পূর্ণতার প্রসাদ পেয়েছেন। অনমিত্রের ভবিষ্যত সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা এইমুহূর্তে অপ্রাসঙ্গিক কারণ তার শিল্পকর্ম অত্যন্ত আশ্চর্যজনক-ভাবেই পরিণত, শিক্ষনবিশীর বা নিছক বয়সগত কাঁচা হাতের ছাপ প্রায় অনুপস্থিত।

এর থেকে পৌছোই অনমিত্রের তৃতীয় বৈশিষ্ট্যটিতে: তার সহসা সয়ম্ভু প্রকাশ। অতি উচ্চ সফলতাপ্রাপ্ত শিল্পীও নিজের ক্রমপরিণতির ইতিহাস রেখে যান বিভিন্ন সময়ে কৃত বিভিন্ন চিত্রের সোপানগুলিতে। শিক্ষক বা গুরুর দীক্ষাতেই হক বা আত্মগত শিক্ষাতেই হক তাঁরা ক্রমশ দক্ষতা অর্জন করেন, দৃষ্টি লাভ করেন এবং চিত্র-ক্রমের মধ্য দিয়ে ক্রমশ বিশিষ্টরূপে ব্যক্তিগত শৈলীর সন্ধান পান। একেবারে প্রথম থেকেই masterpiece তাঁদের কাছ থেকে সচরাচর পাই না, সমজদার বা সমালোচক তা আশা করেন না। অথচ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনও গুরুর-ই দীক্ষা যে নেয়নি কোনও শিক্ষারই সময় যে পায়নি সেই শিশু অনমিত্র সহসা আবির্ভূত হয়েছে কিন্তু অভিভূতকারী চিত্র-সম্ভার নিয়ে। জন্মান্তরবাদ মানি না, এই অদ্ভুত ঘটনার কারণও জানি না। তবে বহুদিন ধরে বহু শিল্পীর উদয়াস্তের সঙ্গে পরিচিত থেকেও এ ধরণের একটি ব্যাপারের জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। ১৯৬৬ সালে যেদিন অনমিত্রর প্রথম প্রদর্শনী দেখি সেদিন সবচাইতে বেশি করে এই কথাটিই মনে হচ্ছিল যে চর্চা না করে এমনটি শিখল কি করে? এ যেন এক রাত্রের ব্যবধানে শূন্য প্রান্তরকে তাজমহলে রূপান্তরিত দেখার মতন।

এবং এই ত্রিবিধ কারণে—শিশুসুলভ লক্ষণগুলির অনুপস্থিতি, শিল্পী হিসাবে তার দারুণ সম্পূর্ণতা ও তার সহসা স্বয়ম্ভু প্রকাশ—অনমিত্রের চিত্র প্রদর্শনী দর্শকের মনে এক বিপুল বিস্ময় ও দ্বন্দ্বের জাগরণ ঘটায়। ১৯৬৬ সালে কোনও কোনও মহলে এই দ্বন্দ্বের নিরসন (?) কল্পে গুজব চালু করা হয়েছিল যে আসলে কোনও খ্যাতনামা শিল্পী অনমিত্রর বেনামীতে ছবিগুলি এঁকে দিয়েছিলেন।

১৯৬৭ সালের প্রদর্শনীটির খবর আমার জানা নেই, তবে ১৯৬৮ সালে অনুষ্ঠিত অনমিত্রর তৃতীয় একক প্রদর্শনীটির সম্বন্ধে কোনও কোনও পাণ্ডিত্যাভিমানী সমালোচক অনমিত্রর এই অক্লান্ত শিল্প-প্রয়াস দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে ব্যবস্থা দিয়েছেন যে অনমিত্রের মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান হক ও প্রাপ্তবয়স্করা অনমিত্রকে নিয়ে 'সোরগোল'টা থামিয়ে ফেলুন !

প্রথমোক্ত গুজবটি সম্ভবত ঈর্ষা প্রণোদিত হলেও আমার কাছে তার খানিকটা যৌক্তিকতা আছে : অনমিত্রর চিত্রে এমন বলিষ্ঠভাবে একটি সম্পূর্ণ ও পরিণত শিল্পী প্রকাশ পেয়েছে যে প্রাপ্ত-বয়স্ক ও আত্মবিশ্বাস সম্পন্ন মানুষ ছাড়া তার পিছনে আর কাউকে ভাবতে মন থমকে যায়। যদিও কেন একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন শিল্পী খামোখা অন্যের বেনামীতে আঁকতে থাকবেন তার সদুত্তর মেলে না। কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত বিজ্ঞতাটুকু আমার কাছে অত্যন্ত অবান্তর ও অ-সংস্কৃত বলে মনে হয়েছে। শিল্পীর সার্থকতা তার সৃষ্টিতে—কোনও আপতিক ঘটনায় নয়। কোনও শিল্পীর শিল্পকর্মের চরম বিচার সম্ভব ঐ শিল্পকর্মের উপরেই—তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বিবিধ ঘটনা সমাবেশের উপরে নয়। যদিও তাঁর শিল্প-প্রতিভার প্রকৃতি ও বিকাশকে বুঝতে ঐসব ব্যক্তিগত তথ্যগুলি সহায়ক হতে পারে। এবং সেই হিসাবে কোনও সময়ে সমালোচক বা শিল্প-ঐতিহাসিকবৃন্দ অনমিত্রর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহে ও বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হতে পারেন তার শিল্প-প্রতিভার উপরে আলোকপাত করার জন্য। কিন্তু তার বেশি নয়। বিশেষতঃ, যেহেতু এই শিল্পীর বয়স মাত্র দশ বৎসর সেই হেতু তার চিত্রের জন্য পৃথক মাপকাঠি তৈরি করলে বা অল্পবয়স্কতার কথা মাথায় রেখে বিচলিত হলে শুধু যে এই অনন্যসাধারণ শিল্পীর প্রতি আমরা অবিচার করব তাই নয় সমালোচক বৃত্তিরই প্রতি অন্যায় করব এবং সমজদার চিত্রামোদীদের বিভ্রান্ত করে তুলব।

নিজেকে যিনি বহুদর্শী সমালোচক বলে মনে করেন ও বিশেষ প্রতিপত্তিশালী সম্প্রদায়ের মুখপাত্র হিসাবে গণ্য করেন তাঁর কাছ থেকে আরও আপত্তিকর হল অনমিত্রর চিত্রপ্রদর্শনী ও শিল্প-প্রতিভা সম্বন্ধে প্রাপ্তবয়স্কদের আশ্চর্যভাব প্রকাশে বিরত থাকবার উপদেশ। প্রাপ্তবয়স্করা এইরকম একটি অপূর্ব সংঘটনার সম্মুখীন হলে কি করবেন ? আমার ব্যক্তিগতভাবে কোনও শিল্প-নিদর্শন দেখে মুগ্ধ হতে হলে অনেক সময়ে বাধ্য হয়েই নিস্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। সেটা হল অভিভূত হবার অবস্থা। অনেকেরই হয়ত এরকমটি হয়। কিন্তু সমালোচকের বৃত্তি যাঁর তিনিও কি সোচ্চার না হয়ে থাকবেন ? অথবা যাঁর পরিবারে এই রকম একটি আশ্চর্য শিশু জন্ম নিয়েছে তাঁর কি নিঃশব্দ ও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকাটা উচিৎ ? না তাঁর পক্ষে উচিৎ হবে দর্শক সাধারণকে ঐ সৃষ্টিগুলি দেখবার সুযোগ করে দেওয়া এবং তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ?

আমি স্বীকার করি যে দৃষ্টি আকর্ষণ করার ব্যাপারটি প্রচার-মূলক এবং প্রচার বেশি হলে আমাদের অনেক সময়ে বিরক্তি উৎপাদিত হয় শুধু নয়, প্রতিভাবান শিল্পী (তা সে বয়সে শিশু না হলেও) অতিমাত্রায় আত্মসচেতন হয়ে নিজের প্রতিভার অপমৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারেন। এই ভরসাটুকু রাখব যে শ্রীমান অনমিত্রর আত্মীয় ও শুভানুধ্যায়ীরা এই বিপজ্জনক সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন। কিন্তু একথাও তো স্বীকার না করে পারছি না যে শিল্পের ক্ষেত্রে, ভারতবর্ষে, যদি 'প্রসারের' তেমন ব্যবস্থা থাকত, তা হলে 'প্রচারের' আদৌ প্রয়োজন হত না। অর্থাৎ

সমালোচকদের যা একটি প্রধান কর্তব্য, সাধারণ ও শিল্পরসিককে আকৃষ্ট করা সার্থক শিল্পের প্রতি, তাতে যদি এই বিশেষ সমালোচকটি অবহেলা না করতেন, তা হলে হয়ত প্রদর্শনীর যাঁরা উদ্যোক্তা তাঁদেরও এত প্রয়াসী হতে হত না সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। দ্বিতীয়ত, আজ দেশে সরকারী দাক্ষিণ্যে সংস্কৃতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে দানছত্র তো বহু বহু চালু হয়েছে। সেখানে এই অনস্বীকার্যরূপে উপস্থিত শিল্পীর শিল্পকে স্থায়ীভাবে ও ব্যাপকভাবে সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছিয়ে দেবার কোনও ব্যবস্থাই কি করা যেত না ? সেই রকম উপযুক্ত ব্যবস্থা হবার পরও যদি শ্রীমান অনমিত্রর পরিবার ও বান্ধব মহল থেকে প্রচারমূলক সোরগোল চলতে থাকত তা হলে সমালোচকের তিরস্কার বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে পারতাম। এবং তা যখন হয়নি তখন এই বিশেষ শ্রেণীর সমালোচকের মন্তব্যগুলিকে অদূরদর্শী ও অসূয়া প্রণোদিত বলে মনে করা ছাডা উপায় কি ?

আমি বরং বলব যে শ্রীমান অনমিত্রর এই প্রতিভা স্থায়ী হক বা না হক, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকুক বা কমতির দিকে চলুক এখনই, এই মুহূর্তে তার যা সৃষ্টি সম্ভার সে বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষিত হক, সর্বত্র তা নিয়ে আলোচনা হক। এই বয়সে নবীন অথচ সার্থকতায় প্রবীণ, শিল্পী আধুনিক শিল্পের ধারায় অকুণ্ঠ স্বীকৃতি ও যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হক।

এবং সেই দৃষ্টি নিয়ে আমার একটি বিশেষ অনুরোধ এই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাদের কাছে। বিশেষ প্রয়াস করে হলেও তাঁরা যেন পরবর্তী প্রদর্শনীর আয়োজনের সময়ে শ্রীমান অনমিত্রর স্বল্প বয়সের তথ্যটি মন থেকে মুছে ফেলেন। 'শিশু-শিল্পী' যাই আঁকে তাই প্রদর্শনযোগ্য হয় সে কারণে যে কারণ এই শিল্পীর ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। প্রাপ্তবয়স্ক, স্বীকৃত শিল্পীর চিত্র-প্রদর্শনীর সময়ে যেমন শুধু সেই চিত্রগুলিই প্রদর্শিত হয় যেগুলি সার্থকতার প্রসাদে ধন্য, শ্রীমান অনমিত্রর প্রদর্শনীতেও যেন নির্বিচারে ছবি না এসে শুধু সু-নির্বাচিত সার্থক সৃষ্টিগুলিই আসে। এটা তার প্রতি প্রাপ্তবয়স্কদের অবশ্য কর্তব্য।

মিহির সিংহ

শিল্পে সাহিত্যে স্বাধীনতা : কয়েকটি চিন্তা

শিল্প-সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় যে-সমস্ত শিল্পী শিল্পচর্চা করেন তাঁদের মধ্যে বর্তমানে যোগাযোগ আছে কি না এ প্রশ্ন যদিও অবান্তর তবু রবীন্দ্রযুগের থেকে বিচ্ছিন্ন এ যুগকে বোঝাবার জন্য বলতে পারি যে যদি কোন একটি সভাতে শিল্প বিভাগের বিভিন্ন বিভাগীয় শিল্পী—যথা, কবি, ঔপন্যাসিক, চিত্রকর, ভাস্কর—আহূত হন তবে হয়ত দেখা যাবে যে তাঁরা তেমন মিশতে না পেরে অবশেষে শিল্প সাহিত্যের বাইরে কোন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনায় মুখর হয়ে উঠেছেন। বর্তমানের এ পরিস্থিতি নিশ্চয় সুখকর নয়। প্রতিটি বিভাগের সঙ্গে প্রতিটি বিভাগের সম্পর্ক নিবিড়। ভাষা বা প্রকাশভঙ্গী ভিন্ন হলেও বক্তব্য যে অনেক সময়েই এক তা বলাই বাহুল্য। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে শিল্প-সাহিত্যের প্রতিটি বিভাগ পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, তেমনি বিশেষ আর কোন শিল্পী-সাহিত্যিকে দেখিনি।

সাহিত্যর বক্তব্য শিল্পত্বের মধ্যেই সীমায়িত কি না প্রশ্ন উঠতে পারে। লরেন্সের উপন্যাসে যে বিকৃতি দৃষ্ট হয় তাকে শিল্পের বাইরে (?) স্থাপন করলেও বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে সাহিত্য হিসেবে তা অনুল্লেখ্য নয়। তবু লরেন্সের রচিত সাহিত্য শিল্প হিসেবে কতটুকু মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য এমন প্রশ্ন সর্বদাই ওঠে। শুধু লরেন্সই বা কেন গ্যেটে দান্তে থেকে শুরু করে, আমাদের কালিদাস থেকে শুরু করে, আজকের এলিয়ট বা এজরাপাউণ্ড বা অতি আধুনিক বাঙালী শিল্পী-সাহিত্যিকগণ তাঁদের শিল্প-রচনায় শিল্পী হিসেবে কতটুকু উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন এ প্রশ্ন বার বার আমাদের নাড়া দেয়। আধুনিক সমালোচনা সাহিত্যে শিল্পের শিল্পত্ব সম্পর্কে বিতর্কের শেষ হয় নি। বরঞ্চ অনেক সময়ে এধরণের আলোচনাই প্রাধান্য পায় কারণ এটা একটা ফ্যাশানে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। —শুধু আজকের কতিপয় সমালোচক নন অনেকেই এইমত পোষণ করেন যে 'আর্টস ফর আর্টস' অর্থাৎ শিল্পের জন্যই শিল্প। শিল্পের সৃষ্টি শিল্পের জন্য এ উক্তির ব্যাখ্যা ঠিক কেমন ভাবে আমাদের কাছে উপস্থিত করা হয় তা'ও ভেবে দেখা দরকার। এল গ্রেকো বা মিকালেঞ্জেলোর চিত্রে অথবা অনরে দ্যমিয়ের চিত্রের ভাষায় কোন বক্তব্য প্রকাশ পেলো তাও বিচার্য।

স্যুর রিয়ালিষ্টিক চিত্রকলা সম্পর্কে কোন কোন চিত্র-রসিক এবং সমালোচকের আগ্রহ অনেক সময়েই একটু বেশি দেখা যায়। স্বয়ং শিল্পীর মনে এই স্যুর রিয়ালিজমের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও চিন্তনীয়। আধুনিক চিত্রকলার স্যুর রিয়ালিজমের সঙ্গে অনেক আধুনিক কবির কবিতার সুরগত এবং মূলগত মিল লক্ষণীয়। কিন্তু তবুও অনেক সময়েই দেখা যায় চিত্রকরের সঙ্গে কবির, চিত্র এবং কবিতা প্রসঙ্গে, আলোচনা স্বচ্ছ নয়। ক্রমশঃ শিল্প-সাহিত্যের প্রতিটি বিভাগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। এখনও কয়েকজন কবি-শিল্পী আছেন যাঁরা শিল্প-সাহিত্যে একাত্মা। এবং তাঁরা অক্লান্ত সাধনা করে চলেছেন উভয় শিবিরের শিল্প--সৌন্দর্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। কবি বিষ্ণু দে-র যামিনী রায়ের

চিত্রকলা সম্পর্কিত আলোচনায় তাঁর শিল্পী-প্রজ্ঞার যে আলোক উদ্ভাসিত হয়েছে তাতে যামিনী রায়কে জানতে সুবিধা হয়। পিকাসো সম্পর্কে বিষ্ণুদের মন্তব্য মূল্যবান—তা বলাই বাহুল্য। আধুনিক কবিগণ নিপুণ চিত্রকল্পের, রঙের ও ধ্বনির ব্যবহারে কৃতিত্ব এবং শিল্পীমনের পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু সমকালীন কোন চিত্রকরের বা ভাস্করের শিল্প-ভাষা সম্পর্কে অনেক সময়ে তাঁদের অজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে। এই সঙ্গে আর একটি বিস্ময় আমাদের মনে জাগে বর্তমান ঔপন্যাসিক এবং কবি গল্পকারের সম্পর্ক, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে। ঔপন্যাসিকের কাছে আধুনিক কবিতা অনেক দূরের ব্যাপার—কবিতা তাঁদের কাছে অনেক সময়েই দুর্বোধ্য, অবোধ্য ও নিরর্থক। অবশ্য কবিঔপন্যাসিক বা ঔপন্যাসিককবির কাছে কবিতাকে উপন্যাসের নিকটআত্মীয় মনে হতে পারে। ছোট গল্প ও কবিতার সম্পর্ক বিচারকালে বলা যেতে পারে যে কিছু কিছু আধুনিক ছোটগল্প লেখা হয়েছে যার সঙ্গে আধুনিক কবিতার মিল লক্ষ্যণীয়। আধুনিক চিত্রকলার সঙ্গে আধুনিক নাটকের প্রকৃতিগত মিলটা একটু বেশি। অ্যাবসার্ড নাটকের সঙ্গে আধুনিক অ্যাবসার্ড চিত্রকলার মিলটা খুব নিকটের। কোন একটি বিশেষ মুহূর্তের বিমূর্ত চিত্রই এই শিল্পকলার বিষয়বস্তু। এখানে ঘটনা প্রধান নয়। যেমন বেকটের 'ওয়েটিং ফর গোদো'-তে কোন ঘটনা নেই। যোগসূত্রহীন কয়েকটি মুহূর্তের চিত্রই বেকটের এই নাটকের বিষয়বস্তু। কোন অ্যাবসার্ড চিত্রকরের সঙ্গে বেকটের 'ওয়েটিং ফর গোদো'র হয়ত সাদৃশ্য পাওয়া যাবে কিন্তু আশঙ্কা হয় শিল্প শুধু মুষ্টিমেয়র এক্তিয়ার ভুক্ত না হয়ে যায়। বর্তমানে মনে হয়, শিল্পীর থেকে শিল্প ও শিল্পী ক্রমশঃই দূরে সরে যাচ্ছে। শুধু বিমূর্ত চিত্র ও ন্যাট্যরীতি কেন বাস্তব সমস্যা নিয়ে লিখিত ইবসেনের 'অ্যান এনিমি অব দ্য পিপল' বা 'এ ডলস হাউস' নাটক যখন পড়ি তখন সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে এজাতের কবিতা, চিত্র গল্প সবকিছু। যদিও এক্ষেত্রে শিল্পীগণ সকলেই মূলতঃ একই চিন্তাধারায় চিন্তিত তথাপি তাদের মধ্যে একটা বৈসাদৃশ্য বর্তমান—যা বর্তমান প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদেই বলেছি।

সব চিত্রই শিল্প নয়। সব কাব্য সাহিত্যও শিল্প নয়। শিল্প হিসেবে সার্থক সৃষ্টি সব পাঠক-দর্শকের মনোরঞ্জন করতে না পারে কিন্তু রুচিবান, বোধ্যা এবং সমঝদার পাঠকের বা দর্শকের হৃদয় জয় করতে পারে। এখন প্রশ্ন ওঠে শিল্পের যদি এই অবস্থা হয় যা' কিছু লোকের গোচরে এবং অধিকাংশ লোকের অগোচরে এবং অধিকাংশ লোকের অগোচরে থেকে যায় তবে সে শিল্প কতটুকু সার্থক এবং কাঙ্খিত? সাম্প্রতিক কালের উপন্যাস গল্পে যে যথেচ্ছাচার চলেছে তার জন্য দায়ী কারা—লেখক না পাঠক? আবার এই শিল্পে আর্ট কতটুকু আছে সে প্রশ্ন স্বাভাবিক-ভাবেই এসে যায়। ইদানীং 'আর্টস ফর আর্ট' কথাটা বেশ চালু হয়ে গেছে। এই শিল্পের জন্য শিল্পর দোহাই দিয়ে আজ শিল্প-সাহিত্যজগতে যে অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য মার্কিনী চিন্তাধারা পুষ্ট লেখকগোষ্ঠিই দায়ী। এঁদের সৃষ্টিকে ঠিক 'শিল্প' বলে অভিহিত করা যায় না। বিংশ শতাব্দীর ইংরেজ সাহিত্যিক লরেন্স চেয়েছিলেন 'টু মেক অ্যান অ্যাডজাষ্টমেন্ট ইন কনসিয়াসনেস টু দ্য ফিজিক্যাল রিয়ালিটি।' যদিও লরেন্স বিরাট প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তথাপি তাঁর সাহিত্যে যৌন বিকৃতির জন্য অপাংক্তেয় এবং ধিকৃত। রবীন্দ্র-সাহিত্য যেখানে শিল্পত্বের দাবী রাখে সেখানে লরেন্সের বা ঐ পর্যায়ের অন্যান্য রচনাগুলি নয়। সব সাহিত্যই শিল্প কিনা এ প্রসঙ্গে

আলোচনা করা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর শিল্প-সাহিত্য প্রসঙ্গে অনেকেই আলোচনা করেছেন। সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্র-কর্মের আলোচনা কালে সমালোচককে অনেক সময়ে বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয় এই জন্যে যে, রবীন্দ্র-আলোচনার জন্য আরেক রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রয়োজন। বক্তব্যটিকে আরেকটু পরিস্কারভাবে বললে এই বলতে হয় যে—সাহিত্যের প্রতিটি বাতায়নে এবং শিল্পের বিভিন্ন রীতিতে যার নিত্য অনায়াস যাতায়াত ও যাঁর প্রতিটি চিন্তার উত্তুঙ্গতা অনেক সময় বিশেষ বিভাগীয় সমালোচক কর্তৃক অনির্ণেয় তার সামগ্রিক কর্ম বিশ্লেষণ প্রায় অসাধ্য ব্যাপার। অবশ্য ইদানিং রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে-সমস্ত আলোচনা প্রকাশিত হচ্ছে তার মধ্যে অধিকাংশই স্থূল। অ্যাকাডেমিক লেখা। বুদ্ধদেব বসু এবং বিষ্ণু দে রচিত রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সাম্প্রতিক প্রবন্ধ দু'টি ১ উল্লেখ যোগ্য। দুটি গ্রন্থের প্রকাশকালের সামান্য কিছু ব্যবধান এবং বিষয়বস্তু ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে বিষ্ণু দের প্রবন্ধটিই নতুন দিগন্তের দ্বার খুলে দিয়েছে। —লরেন্স যে 'ফিজিক্যাল রিয়ালিটি'র উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন সে সম্পর্কে সমালোচকগণের মন্তব্য স্পষ্ট। ইদানিং অবশ্য লরেন্স-চিন্তিত বাস্তবতার দিকে অনেকেই ঝুঁকছেন। বাস্তবতার নামে চলেছে উচ্ছৃঙ্খলতাণ্ডব নৃত্য। 'রিয়ালিটি'কে তুলে ধরতে গিয়ে বার বার নির্মম ভাবে পদদলিত হচ্ছে 'রিয়ালিটি'। এর জন্য দায়ী শিল্পী স্বয়ং। মানে-র অলিম্পিয়া শিল্প হিসেবে স্বীকৃত। কারণ, বাস্তব কথা বলতে গিয়ে তিনি শিল্পের টুটি চেপে ধরেননি। কবিতাতেও ঐ একই প্রশ্ন ওঠে কবিতা-শিল্প কি? বাস্তবের সঙ্গে শিল্পের সমন্বয়ই শিল্পসৃষ্টির বড় কথা। দান্তের বিখ্যাত লাইন: 'ও মেসসের চিন, কোমেল তেম্পো এ্যা রিভোলতো আ দান্নো নোস্ত্রো এ দেল্লি নোসত্রি দিরি'। এতে কাব্য আছে, শিল্প আছে, আবার বাস্তবের কথাও আছে। জীবন ও ছন্দ যে ঘূর্ণ্যমান কালের চাকায় দীর্ণ হয় তা শাশ্বত সত্য, বাস্তব। এবং এই উক্তিটির মধ্যে গূঢ় দর্শন বর্তমান। 'গীতা'তে-ও এই দর্শনের কথা বলা হয়েছে।—সব সাহিত্য-চিত্র-ভাস্কর্য-ই শিল্প নয়। কোন শিল্পও বাস্তব বহির্ভূত নয়। শিল্পের সঙ্গে বাস্তব অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত।

কবিতা অনুভূতির ব্যাপার। যদিও বাস্তবের মাটিতে পা রেখে কবি 'কবিতা' বলেন তবু তাঁর অদৃশ্য ডানা দুটো সুনীল আকাশের দিকে যেন সর্বদাই বিস্তৃত। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের একটি কথা উদ্ধৃত করা যায়:…'শব্দের বস্তুটা হইতেছে তাহার অর্থ। মানুষ যদি কেবলমাত্র হইত বাস্তব, তবে তাহার শব্দ কেবল মাত্র খবর দিত সুর দিত না। কিন্তু বিস্তর শব্দ আছে যাহার অর্থপিণ্ডের চারিদিকে আকাশের অবকাশ আছে, একটা বায়ুমণ্ডল আছে,…এই সমস্ত অবকাশ-ওয়ালা কথা লইয়া আকাশ বিহারী কবিদের কারবার। এই অবকাশের বায়ুমণ্ডলেই নানা রঙিন আলোর রঙ ফলাইবার সুযোগ; এই ফাঁকটাতেই ছন্দগুলি নানা ভঙ্গিতে হিল্লোলিত।' চিত্র সৃষ্টিতে যেমন রঙ তুলি অবশ্য প্রয়োজনীয়—তেমনি কবিতা রচনায় শব্দ। এই শব্দ দ্বারাই রসের সৃষ্টি—এই শব্দ দ্বারাই জীবনের প্রতিষ্ঠা হয়। সজীবতাকে ঘিরেই বাস্তবতা। জীবন যেমন বাস্তবে সত্য, মৃত্যুও তেমনি। বাস্তবে সবুজ শ্যামল বনানী যেমন আছে তেমনি আছে ধূসর মরুপ্রান্তর। শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে যে কবিতা রূপ ইমারত সৃষ্টি হলো তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে কি করে? কবির দক্ষতায়। কবিতা বুঝতে হলে পাঠকের অনুভূতি থাকা একান্ত প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক

চিত্রকলা বুঝতে হলেও সম্যক বোধ এবং অনুভূতি থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। প্রশ্ন উঠতে পারে গদ্য শিল্প বা গদ্য কবিতা বুঝতে হলেও কি অনুভূতির দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন আছে? যে কোন ধরণের কবিতায় বা শিল্পে শিল্পত্ব থাকলেই বোধগম্য হওয়ার জন্য শিল্পবোধ ও অনুভূতি একান্ত প্রয়োজনীয়। অনেক চিত্রকরের ছবিতেই বাস্তবের ছায়া পড়েছে এবং তা শিল্প হিসেবে রসোত্তীর্ণ। বাস্তব জগতকে স্বীকার করে লেখা কোন কবিতা শিল্প হিসেবে কোন রসোত্তীর্ণ হয়নি এমন কথা বললে মিথ্যা বলা হয়। শিল্প-সাহিত্যের সমঝদারদের অনুভূতি বোধ থাকা একান্ত প্রয়োজন। এই অনুভূতি বোধ থেকেই চিন্তা করার ক্ষমতা জন্মায়!

কবিতা অনেকেই লিখেছেন। র‍্যাঁবো মালার্মে এলিঅট ইয়েটস্ শুধু নন লোরকা রিলকে রবীন্দ্রনাথ এমন কি এই বর্তমান শতাব্দীর বাঙালী কবি জীবনানন্দ সুধীন দত্ত বুদ্ধদেব বসুও উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখেছেন। বিষ্ণু দে এখনও লিখছেন। 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা, মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য'-র ভিতর দিয়ে যে ভাস্কর্য শিল্পকে তুলে ধরেছেন তা' পাঠকমনকে নাড়া দেয়। শ্রাবস্তীর কারুকার্য যেন আমাদের চোখে সামনে ভেসে ওঠে।

শিল্পী এবং কবি-সাহিত্যিকের শিল্পচর্চার স্বাধীনতা অনেক ক্ষেত্রেই স্বীকৃত। অন্ততঃ বর্তমানে আমাদের দেশের শিল্পী সাহিত্যিকগণ শিল্প-চর্চায় চরম স্বাধীনতা ভোগ করছেন। নয়ত 'স্বয়ং নায়ক' 'পাতাল থেকে আলাপ' করে 'প্রজাপতি'র নেশায় মেতে উঠতে পারত না। এই স্বাধীনতার পরোয়ানা নিয়ে অনেকেই যথেচ্ছাচার করছেন। এর ফলে শিল্প-সাহিত্যের ক্ষতি হচ্ছে। তাই প্রশ্ন ওঠে শিল্পী-সাহিত্যিকদের স্বাধীনতা কতটুকু থাকা দরকার। স্রষ্টাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করলে না কি সৎ শিল্প সৃষ্টি হতে পারে না। শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে সার্ত্রের বক্তব্য কতটুকু গ্রহণযোগ্য সে প্রশ্ন থেকেই যায়। বর্তমানে শিল্পী-সাহিত্যিকগণ চরম স্বাধীনতা পেলেও তাদের মধ্যে একটা বিরাট অপূর্ণতার কথা বর্তমান প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদেই করেছি। শিল্পী-মানসের বিকারই যদি একমাত্র সার্থক শিল্প হয় তবে সে শিল্প ধিকৃত হোক। প্রত্যেককেই সমাজের জন্য ভাবতে হবে—কিছু করতে হবে। সমাজকে বাদ দিয়ে ব্যক্তির মূল্য কতটুকু! শিল্প-রচনায় মার্কসীয় দৃষ্টি-ভঙ্গী আরোপ করাই যুক্তি-সঙ্গত।

নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত

১। বুদ্ধদেব বসুর 'কবি রবীন্দ্রনাথ' বিষ্ণু দের রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা' প্রবন্ধদ্বয় রবীন্দ্র চর্চার ইতিহাসে নতুন সংযোজন। বিষ্ণুদের প্রবন্ধটি লেখক সমবায় সমিতি কর্তৃক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

মালিনী। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও সোমেন্দ্রনাথ বসু। রবীন্দ্র-প্রসঙ্গমালা-৬। টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, কলিকাতা-২০। মূল্য—১'০০ টাকা।

সাহিত্যরচনার রীতির দুটো দিক আছে। একটি বহিরঙ্গউপাদানে গঠিত, অন্যটি লেখকের অন্তর্নিহিত চিন্তাধারায় পুষ্ট। কি নাটক, কি কাব্য অথবা উপন্যাস, ছোট গল্প—সর্বক্ষেত্রেই আমরা বাইরে থেকে একটা সীমা নির্দেশ করে দিয়েছি। কিন্তু সেই নির্দেশকে মেনেও প্রত্যেক সাহিত্যশিল্পী তাঁর ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের দাবিতেই কিছুটা নূতনত্ব আনার প্রয়াসী হন। এখানে সাধারণগ্রাহ্য রীতি—বিশিষ্টতার মর্যাদা লাভ করে।

রীতি সম্বন্ধে এই কথাগুলি বলার তাৎপর্য এই যে টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট-এর 'মালিনী' নামে পুস্তিকাটিতে রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' নাটকের যে দুইটি আলোচনাকে স্থান দেওয়া হয়েছে—তাকে স্থূলভাবে নাট্যরীতিরই উপরিক্ত দু'দিকের আলোচনা বলতে পারি।

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'গ্রীক নাট্যকথা ও মালিনী' প্রবন্ধটি নাটকের বহিরঙ্গ রীতির—অর্থাৎ 'মালিনী' নাটকে গ্রীক নাট্যকলার প্রভাব কতখানি, তার আলোচনা। আর সোমেন্দ্রনাথ বসুর প্রবন্ধের কেন্দ্রীয় বিষয় 'মালিনী' নাটকে গৃহীত রবীন্দ্রনীতির ভালো-মন্দ দিকগুলির আলোচনা।

'মালিনী' নাটকের উপর গ্রীক নাটকের প্রভাব যে আছে এ সূত্রটি রবীন্দ্রনাথ নিজেই ধরিয়ে দিয়েছেন ভূমিকাতে। তারপর গ্রীকনাট্যকলার সঙ্গে মালিনীর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছাত্রমহলে সুবিদিত। বর্তমান আলাচনায় নিষ্ঠা ও পাণ্ডিত্য যথেষ্ট আছে, কিন্তু উদ্ধৃতি বাহুল্যে ও আলোচনার জটিলতা দ্বারা পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর নেই।

সোমেন্দ্রনাথ বসু-র, 'মালিনী' শীর্ষক আলোচনাটিতে টি, এস, এলিয়ট এর Objective Correlative-থিওরি প্রয়োগে নূতনত্ব এসেছে। তিনি প্রমাণ করেছেন—'মালিনী নাটকে ঘটনার কার্যকারিতা যে পরিমাণে আছে, সে পরিমাণে ঘটনা সন্নিবেশ নেই। রবীন্দ্রনাথের যা কিছু সবই ভাল—এই ধরণের সমালোচনায় যখন আমরা অভ্যস্ত, তখন কোনকিছুর নেতিবাচক সমালোচনা দুঃসাহসের পরিচয় সন্দেহ নেই। এই আলোচনায় 'মালিনী' সম্বন্ধীয় অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ও স্থানলাভ করেছে। তিনি যেমন মালিনী পূর্ববর্তী রবীন্দ্রনাট্য ধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি এই নাটকের স্বপ্নঘটিত উৎপত্তি, নাটকের প্রতিষ্ঠাভূমিতে মৈত্রী ও মঙ্গলরূপী ধর্মবোধ-এর সম্বন্ধেও আলোচনা করেছেন। "মালিনী'র মূল কাহিনী রবীন্দ্রনাথ সেখান থেকে গ্রহণ করেছেন, সেই 'মহাবস্তু-অবদানে'র পরিচয়ও আছে। তবুও স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে এগুলির আরো একটু বিস্তারিত আলোচনা হলে, গ্রন্থটির গুরুত্ব বাড়তো বলে মনে হয়।

অশোক কুণ্ডু

পঞ্চদশ ॥ বর্ষ ১৩৭৪ মে ১৯৬৭—এপ্রিল ১৯৬৮

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্রিকা
সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সূচীপত্র

বৈশাখ

জ্যৈষ্ঠ

আষাঢ়

শ্রাবণ

ভাদ্র

আশ্বিন

কার্তিক

অগ্রহায়ণ

পৌষ

মাঘ

ফাল্গুন

চৈত্র

সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড ॥ কলিকাতা ১৩

আনন্দে
উৎসবে...
প্রাত্যহিক প্রয়োজনে..
সবার মনোরঞ্জনে...
পরিনামরমনীয়
কেশতৈল
কেশরঞ্জন